মহাজীবনের কাব্য

নির্মলেন্দু গুণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মহাজীবনের কাব্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মহাজীবনের কাব্য

নির্মলেন্দু গুণ

কথাপ্রকাশ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উৎসর্গ

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

আমার রক্তের ভিতরে যিনি
একটি স্বাধীন দেশের
স্বপ্নবীজ বপন করেছিলেন–

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রাককথন

আমি সত্যসন্ধানী, স্বীকারোক্তিমূলক সাহিত্য-ধারার লেখক। আমি সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় আমার জীবনের অভিজ্ঞতালব্ধ সত্যকে প্রকাশ করার চেষ্টা করেছি। আমি চেয়েছি আমার ভিতরের সত্য-আমিটিকে আবিষ্কার করতে। তার মুখোমুখি দাঁড়াতে। সামাজিক আমির পাশাপাশি, আমার আমি বলেও যে একটা আমি আছে—তার লীলাকে তুচ্ছ বলে ভাবিনি, বরং আমার রক্তের ভিতরে তার উপস্থিতিকে উপভোগ করেছি প্রাণভরে।

কী কারণে জানি না, আমার প্রথম কাব্যগ্রন্থ, *প্রেমাংশুর রক্ত চাই*, ১৯৭০, প্রকাশের সময় থেকেই আমার মনে হয়েছিল, আমি বিধাতার আশীর্বাদপুষ্ট এক অনন্য-জীবনের অধিকারী। আমি কবি, কবি এবং কবি। আমি বিশ্বাস করেছি, প্রকৃতির কোনো দুর্জ্ঞেয়-রহস্যের কারণেই, এই বঙ্গদেশে আমার কবিজন্ম সাধিত হয়েছে। আমি বিশ্বাস করেছি, এই সমাজে, এই সময়ে আমার মতো একজন নীলকণ্ঠ কবির প্রয়োজন ছিল। না হলে বাঙালির হাজার বছরের স্বাধীনতার স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করে, খণ্ডিত বাংলার একটি অংশকে একটি পূর্ণ-রাষ্ট্রের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার সংগ্রামে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমর্থনে বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্বপ্নকাব্য রচনার ক্ষেত্রে শূন্যতা থেকে যেত।

আমার কবি হয়ে ওঠা, পূর্ব পাকিস্তানের বাংলাদেশ হয়ে ওঠা এবং শেখ মুজিবের বঙ্গবন্ধু হয়ে ওঠা—পরস্পরের হাত ধরে অগ্রসর হওয়া এই তিনটি প্রতিপাদ্যই আমার আত্মজীবনীতে যথাযথ গুরুত্বের সঙ্গে বর্ণিত হয়েছে। আমার আত্মজীবনী তাই আমাদের ইতিহাসের প্রামাণ্য দলিলও বটে। একই সঙ্গে আমার হয়েও সে আমাদের। আমার আত্মজীবনী বাংলাদেশেরও জীবনী। বঙ্গবন্ধুরও জীবনকথা। সে একের ভিতরে তিন।

সম্প্রতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আত্মজীবনী *অসমাপ্ত আত্মজীবনী* নামে প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিটি আত্মজীবনীই অসমাপ্ত। আমার ক্ষেত্রে 'অসমাপ্ত' কথাটা আরও অনেক বেশি সত্য। আমার বয়স এখন আটষট্টি। আমার জীবনবৃত্তান্তে লিপিবদ্ধ সময়কাল আপাতত আমার জীবনের প্রথম তিরিশ বছর। ১৯৪৫ থেকে ১৯৭৫। পুরোপুরি তিরিশ বছরও নয়। ১৯৭১-এর মে থেকে ১৯৭৫-এর ১৫ আগস্ট ও তৎপরবর্তী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছুটা সময় আমার রচনায় অনুপস্থিত রয়ে গেছে। সময়ের ধারাবাহিকতা ডিঙিয়ে রচিত হয়েছে *রক্তঝরা নভেম্বর*

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৯৭৫। এই গ্রন্থটিকে আমার আত্মজীবনীর চতুর্থ পর্ব হিসেবে গ্রন্থের অন্তে যুক্ত করেছি। যুক্ত করেছি গ্রন্থটিকে প্রকাণ্ড করার জন্য নয়, দলছুট সময়খণ্ডকে যতটা সম্ভব এক মলাটের ভিতরে, আমার জীবন-তরীতে তুলে নেবার জন্য।

আমি ক্রীড়ামত্ত, কিছুটা অলস প্রকৃতির মানুষ। আমার যাপিত সময়ের তুলনায় তাই আমার লিখিত রচনার পরিমাণ হয়তোবা কিছুটা কমই হয়েছে। কিন্তু সম্প্রতি আবিষ্কৃত আমার আরও একটা বড় সমস্যা হচ্ছে, রচনার কম নিয়ে আমার ভিতরে অসন্তুষ্টি নেই, অতৃপ্তির বোধ নেই। ফলে আরও বড়মাপের লেখক হওয়ার লোভে, অর্থের প্রলোভনে বা সাহিত্যিক দায়বোধে তাড়িত হয়ে আমি আমার অসমাপ্ত জীবনকথা সমাপ্ত করতে বসব, এমনটি নাও হতে পারে। সেই সম্ভাবনাই বরং বেশি। তাই এখন পর্যন্ত মনের আনন্দে আমি আমার জীবনের জীবনী যতটুকু রচনা করেছি, ততটুকুকেই একত্র ক'রে এক-মলাটের মধ্যে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করলাম। আমার আংশিক-জীবনীর আকৃতি দেখে আমি নিজেই ভীত, অন্যদের কী দশা হবে তাই ভাবছি। আমার আত্মজীবনী বাংলা সাহিত্যের আত্মস্মৃতিমূলক শ্রেষ্ঠ-রচনাসমূহের পাশে স্থান পাওয়ার যোগ্য হলো কি-না, সে-কথা ভবিষ্যতই বলবে। তবে এই জীবনীগ্রন্থে হাজার বছরের বাঙালি-জীবনের শ্রেষ্ঠ-সময়খণ্ডই যে বর্ণিত হয়েছে, এ-ব্যাপারে সন্দেহ করার অবকাশ নেই।

আমি বিশ্বাস করি আমার আত্মজীবনী পাঠ করে পরবর্তী প্রজন্মের পাঠক-পাঠিকাগণ অবশ্য-অবশ্য উপকৃত হবেন। আমাকে জানবার পাশাপাশি তারা লক্ষপ্রাণের মূল্যে মুক্ত আমাদের দেশটিকে জানবেন, ষাট ও সত্তর দশকের উত্তাল-সময়ের রাজনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাসকে জানবেন।

অনেক ভাবনাচিন্তার পর আমি আমার আত্মজীবনীর নাম স্থির করেছি *মহাজীবনের কাব্য*। তারপরও ভাবছি, কী জানি, আবার কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন রাখিনি তো?

আত্মজীবনীর অখণ্ড সংস্করণ প্রকাশে আমাকে প্ররোচিত করার জন্য স্নেহভাজন কবি সৈকত হাবিব ও বিপুলাকৃতির গ্রন্থটি সানন্দে-সযত্নে প্রকাশ করার জন্য প্রকাশক মোহাম্মদ জসিম উদ্দিনকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

৮ জানুয়ারি ২০১৩ — নির্মলেন্দু গুণ
কামরাঙ্গীর চর, ঢাকা ১২১১

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সূচি

মহাজীবনের কাব্য
(পৃষ্ঠা ১১-৬৭৬)

পরিশিষ্ট
(পৃষ্ঠা ৬৭৯-৭০৪)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মা বিছানায় শুয়ে আছেন পশ্চিম দিকে শিয়র দিয়ে। তাঁর শীর্ণ-দীর্ঘ শরীর একটি নকশী কাঁথা দিয়ে জড়ানো। একটু আগেই বালতির জল দিয়ে বাবা তাঁর মাথা ধুইয়ে দিয়েছেন। অয়েলক্লথে ঢাকা বালিশের উপরে ছড়ানো মা'র কালো চুল থেকে টুপটাপ জল গড়িয়ে পড়ছে বালতিতে। অনেক দিন পর আজ মায়ের জ্বর একটু কমতির দিকে। থার্মোমিটার দিয়ে বাবা মা'র গায়ের উত্তাপ পরীক্ষা করলেন, তারপর নিজের হাতে রান্না করা শুকতো নিয়ে বসলেন তাঁর শিয়রে। মায়ের অসুখের সময় বাবা নিজেই রান্না করে আমাদের খাওয়াতেন। বাবা মাকে মুখে তুলে খাইয়ে দিচ্ছেন। মা খেতে চাচ্ছেন না। তাঁর মুখে রুচি নেই। একটা ছোট মলা মাছ চিবুতে-চিবুতে তিনি তাকালেন আমার দিকে। আমি টেবিলের ওপর দাঁড়িয়ে তোরঙ্গে তুলে রাখা একটা ছোট রবারের বল পেড়ে সবেমাত্র মাটিতে লাফিয়ে পড়েছি; নিঃশব্দে, বিড়ালের মতো মায়ের দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে ঘর থেকে দ্রুত বেরিয়ে যেতে পারি। আড়-চোখে আমি মাকে দেখছিলাম, তখনই মায়ের চোখ পড়ে গেল আমার চোখে। রক্তশূন্য, রুগ্ন-পাণ্ডুর দু'টি চোখ। মা কথা বলতে পারেন না। চোখের ইঙ্গিতে তিনি আমার বাবার সাহায্য নিলেন। বাবা মায়ের চোখের ভাষা বুঝতেন। তিনি আমাকে ডাকলেন।

'এদিকে আয়, তোর মায়ের কাছে একটু বস।'

আমি দূর থেকে আড়-চোখে আমার অসুস্থ মাকে দেখছিলাম। বাবার ডাকে প্রথমে বাবার দিকে, পরে মায়ের দিকে তাকালাম। বাবা বুঝলেন, এই তাকানোর অর্থ হচ্ছে— চলে যাবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা।

মা'র বুক চিরে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো।

বাবা বললেন, 'যা, তাড়াতাড়ি ফিরে আসবি। তোর মায়ের শরীরটা আজ ভালো নয়।'

মায়ের শরীরটা যে ভালো নয়, তা আমিও বুঝতে পারতাম; কিন্তু তাঁর শরীর যে এতটাই খারাপ— তা বুঝবার মতো বয়স তখনও আমার হয়নি। সবেমাত্র চার বছরে পা দিয়েছি। মাতৃপ্রীতির চেয়ে খেলাধুলার প্রতিই আমার আকর্ষণ বেশি। আমার ধারণা, খেলার সময় চলে যাবে, মা-তো আর চলে যাবে না; আগে একটু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খেলে আসি, তারপর বেশি সময় নিয়ে মায়ের পাশে বসা যাবে। এই ভেবে, কিংবা এত কিছুই না ভেবে আমি দৌড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যাই।

ওটাই ছিল আমার মায়ের সঙ্গে শেষ দেখা।

আমার মা সম্পর্কে আমার আর কোনো স্মৃতি নেই। শুধু ঐ দৃশ্যটাই আমার চোখে স্থির হয়ে আছে। অন্যরা যখন তাদের মায়ের স্মৃতিচারণ করে, আমি তখন মৃত্যুশয্যায় শায়িত আমার মাকে কল্পনায় দেখতে পাই। আমার মাকে দাঁড়ানো অবস্থায় আমি কখনো দেখেছি বলে মনে পড়ে না।

দুপুরের দিকে মা মারা যান। সেদিন ছিল ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৪৯।

আমার বড় ভাইয়ের নাম পূর্ণেন্দু। আমরা তাকে দাদামণি বলে ডাকতাম। তার বয়স তখন দশ। বড় বোন রূপালী ছয় বছরের। বয়সে দু'বছরের বড় হলেও তাকে আমি দিদি বলে ডাকতাম না। নাম ধরেই ডাকতাম। তার ডাকনাম ছিল রূপু। দাদামণি এবং রূপর মাঝখানে আমার একটি বড় ভাই ছিল। মহাকবি কালিদাসের সঙ্গে মিলিয়ে বাবা তার নাম রেখেছিলেন কালিদাস। তিন বছর বয়সে কালিদাস ম্যালেরিয়ায় মারা যায়। কালিদাসকে আমি দেখিনি, আমার জন্মের আগেই কালিদাস মারা যায়। আমার ছোট বোন সোনালি, দুই বছরের। সোনালির ছোটটির নাম দুলালী, ওর বয়স মাস ছয়েকের মতো।

আমাদের দুই ভাই ও তিন বোনকে নিয়ে বাবা অকূল সাগরে ভাসলেন। আমার ঠাকুরমা তখনো বেঁচে। তিনি বাবার সঙ্গে থাকতেন না। বছরের অধিকাংশ সময়ই তিনি থাকতেন ময়মনসিংহ শহরে, আমাদের জ্যাঠামশাইর সঙ্গে। গ্রামের বাড়িতে এলে থাকতেন আমার কাকার সঙ্গে। আমার বাবার সঙ্গে ঠাকুরমার সম্পর্ক খুব খারাপ ছিল। ঠাকুরদাকে (১৮৪০-১৯২০) আমি দেখিনি, তিনি আমার জন্মের অনেক আগেই লোকান্তরিত হয়েছিলেন। ঠাকুরদার অবর্তমানে ঠাকুরমাই ছিলেন সংসারের কর্ত্রী। পারিবারিক সম্পদ ভাগ-বাঁটোয়ারার প্রশ্নে আমাদের পরিবারে তখন প্রায় প্রতিদিনই কলহ লেগে থাকত। আমার ঠাকুরমার সুস্পষ্ট পক্ষপাত ছিল তাঁর বড় ও ছোট ছেলের প্রতি। আমাদের বাড়ির বড় ঘরগুলো এবং অস্থাবর সম্পদের প্রায় সবই ছিল আমার কাকার হেফাজতে। আমরা যে ঘরটিতে থাকতাম, সেটি ছিল অত্যন্ত ছোট। আমাদের থাকার ঘরটি আমাদের প্রকাণ্ড বাড়ির সঙ্গে একেবারেই মানানসই ছিল না। ঠাকুরমা বিশাল আকৃতির বড় ঘরের বারান্দায় বসে, শীতের সকালে রোদে গা গরম করতেন। কাজের মেয়েরা তাঁর গায়ে ও পায়ে গরম সর্ষের তেল মাখিয়ে দিত। কাকার ঘরের বারান্দাটি খুবই উঁচু ছিল। আমি কৌতূহলী চোখ মেলে আমার ঠাকুরমাকে দেখতাম। তাঁর পাশে গিয়ে বসবার ইচ্ছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থাকলেও সাহস পেতাম না— তিনিও ভয় ভাঙিয়ে কখনো আমাকে কাছে ডাকতেন বলে মনে পড়ে না। নিজেকে ঠাকুরমার করুণা-প্রত্যাশী অনাথ ভিখিরির মতো মনে হতো। আমাদের কাকাত ভাইবোনেরা আমাদের ঘরে খুব একটা আসত না, আমরাও ওদের ঘরে খুব একটা যেতাম না। আমরা খেলতে যেতাম পাশের বাড়িতে। নিজেদের বাড়িতে আমাদের অবস্থান ছিল অনেকটাই শরণার্থীর মতো।

বাবা আমাদের নিয়ে, বিশেষ করে আমার ছয় মাসের ছোট বোন দুলালীকে নিয়ে অত্যন্ত বিপদের মধ্যে পড়লেন। তাঁকে ঐ বিপদ থেকে উদ্ধার করার জন্য আমার ঠাকুরমা, আমার কাকীমা কিম্বা আমার জেঠিমা— কেউই এগিয়ে আসেননি। আমার দাদু ও দিদিমা আমার মায়ের বিয়ের আগেই লোকান্তরিত হয়েছিলেন। দুই মামা ছিলেন, তাঁরাও ভারতে চলে গেছেন। আমার মায়ের একমাত্র বড় বোন, আমার মাসিমা থাকতেন পশ্চিমবঙ্গের কৃষ্ণনগরে। তিনি আজও বেঁচে আছেন, তাঁর বয়স এখন নব্বই প্রায়। তাঁর বড় ছেলে নামজাদা ইতিহাসবিদ ডক্টর অসীম রায়। বাবা মাসিমাকে অনুরোধ করে চিঠি লিখলেন, যাতে তাঁর বোনের রেখে-যাওয়া ছেলেমেয়ের দু'একজনের লালন-পালনের দায়িত্ব তিনি গ্রহণ করেন।

আমার মাসিমা ছিলেন সত্যিকারের সংসার-অভিজ্ঞ মানুষ, তিনি বাবাকে পুনরায় বিয়ে করার পরামর্শ দিয়ে চিঠি লেখেন। ঐ পরিস্থিতিতে ওটাই ছিল যথার্থ সিদ্ধান্ত। কিন্তু ঐ সিদ্ধান্ত কার্যকর করাটা খুব সহজ ছিল না। ব্যাপারটা ছিল সময় ও সুযোগসাপেক্ষ। পাঁচ-পাঁচটি সন্তানের মাতৃত্বভার গ্রহণ করার জন্য কোনো মহীয়সী নারী তৈরি হয়ে বসে ছিলেন না, যে খুব সহজেই তাঁর সন্ধান মিলবে। অকল্পনীয় ধৈর্য্য, দৃঢ় মনোবল এবং অন্তহীন অপত্য স্নেহের জোরেই বাবা তাঁর জীবনের দুঃসহ দিনগুলো একা-একা পাড়ি দিতে থাকলেন। বাবার পাশে দাঁড়াবার মতো আপনজন কেউ নেই। তিনি একা! তাঁকে ঘিরে আমার পাঁচ-পাঁচটি ছোট ছোট ভাইবোন— একটি একেবারে দুগ্ধপোষ্য শিশু। অনাদরে, অবহেলায় এবং অপুষ্টিতে অসুস্থ। বাবার তখনকার মানসিক অবস্থার কথা কল্পনা করে আমি আজও শিউরে উঠি; কিন্তু বাবার মুখে আমি কোনোদিন তাঁর দুঃখদীর্ণ দিনগুলোর কথা শুনিনি। তিনি ছিলেন চাপা স্বভাবের মানুষ। প্রচণ্ড আত্মসম্মানবোধ এবং জেদের সমন্বয় ঘটেছিল বাবার মধ্যে। দুঃখের গল্পগুলো না শুনিয়ে, তিনি তাঁর জীবনের আনন্দের গল্পগুলোই শুধু আমাদের বলতেন। বাবার এই স্বভাবটি কিছুটা আমার মধ্যে আছে।

আপনজনদের কাছ থেকে কোনোরকম সাহায্যের আশ্বাস না পেয়ে বাধ্য হয়েই তখন রক্তসূত্রে আপন নয়, এমন সব মানুষের সন্ধানে বেরুলেন। আমাদের গ্রামের উত্তরপ্রান্তে , সেনপাড়ায় ঘতু সেনের নিঃসন্তান এক বিধবা ছিলেন, তিনি বাবার সাহায্যে এগিয়ে এলেন। লালন-পালনের জন্য আমার ছোট বোন দুলালীকে তাঁর হাতে তুলে দেয়া হলো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাঙা পুতুলের মতো আমার ঐ ছোট বোনটির কথা আমার বেশ মনে আছে। বাবা প্রায় প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যা দুলালীকে দেখতে সেনবাড়িতে যেতেন। আমিও বাবার সঙ্গে যেতাম। আমরা দুলালীর জন্য প্রয়োজনের অতিরিক্ত দুধ নিয়ে যেতাম। আমি বাবাকে মাঝে-মাঝে প্রশ্ন করতাম, 'বাবা, এই আবুটি কে?'

বাবা বলতেন, 'এ তোর বোন, দুলালী।'

সেনবাড়িতেই দুলালীর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। আমার অন্য ছোট বোন, সোনালিকে আমি চিনতাম, কিন্তু দুলালীকে নিজেদের ঘরে দেখেছি বলে আমার মনে পড়ে না। সে-বাড়িতে গিয়ে আমি দুলালীর সঙ্গে খেলা করতাম, কিন্তু সেই খেলা বেশিক্ষণ স্থায়ী হতো না। বাবা আমাকে ফেরার জন্য তাড়া দিতেন।

বাবা বলতেন : 'ও আরও একটু বড় হোক, তারপর ওকে আমরা আমাদের বাড়িতে নিয়ে যাব।'

বাড়িতে যে মা নেই, এ কথা আমার মনেই পড়ত না। দুলালীকে রেখে সেনবাড়ি থেকে চলে আসার সময় আমার মনে খুব কষ্ট হতো। বাড়ি ফিরেই বাবা আমাদের জন্য রান্না চড়াতেন। তখন ক্ষুধার জ্বালায় দুলালীর কথা আমার মনে থাকত না।

আমার মামার বাড়ি কিশোরগঞ্জ জেলার অষ্টগ্রামে। আমার মা ছিলেন অষ্টগ্রামের দত্ত পরিবারের মেয়ে। আমি ছোটবেলায় আমাদের বাড়িতে একটি বই দেখেছিলাম, বইটির নাম 'অষ্টগ্রামের দত্তবংশ'। ঐ চটি বইটি বাবার টেবিলের একপাশে থাকত। বাবা প্রায়ই ঐ বইয়ের পাতা উল্টাতেন। মনে হয় অষ্টগ্রামের দত্তবংশের একটি কন্যাকে বিয়ে করতে পারার গোপন গৌরববোধ ছিল তাঁর মনে। অষ্টগ্রামে মামাদের বড় বাড়ি ও প্রচুর জমিজমা থাকলেও তাঁরা গ্রামের বাড়িতে থাকতেন না। ময়মনসিংহ শহরে তাঁদের বাড়ি ছিল, ওখানেই তাঁরা থাকতেন। দেশভাগের কিছু আগ-পিছু তাঁরা ভারতে চলে যান। বড় মামা মাধ্যমিক বোর্ডের চাকরি নিয়ে চলে যান দিল্লীতে, ছোট মামা কলকাতায় ব্যাংকের চাকরি পান। বাড়ি করেন বেলঘরিয়াতে।

ঈশ্বরগঞ্জের রায় পরিবারে আমার একমাত্র মাসিমার বিয়ে হয়েছিল। মেশোমশায় ছিলেন উকিল। ওঁরাও ঈশ্বরগঞ্জের বাড়ি-জমি ফেলে রেখে পশ্চিমবঙ্গের কৃষ্ণনগরে চলে গিয়েছিলেন। অষ্টগ্রামে মামার বাড়িতে আমি কোনোদিনই যাইনি। বলা যায়, আমাদের মামাবাড়ি থেকেও ছিল না। মামা-মাসির সঙ্গে বাবার পত্র-যোগাযোগ ছিল। এইটুকুই। আমাদের দুই মামা এবং মাসিমাকে আমরা ছবির মধ্যেই দেখতাম। বাস্তবে তাঁরা থেকেও ছিলেন না। আমার দাদু ও দিদিমাকে তো আমি হারিয়েছিলাম আমার জন্মের অনেক অনেক আগেই।

আমি যখন গোর্কির ছেলেবেলা পাঠ করি, তখন গোর্কির দিদিমার জন্য আমার খুব ঈর্ষা হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার মাসিমার কাছ থেকে শুনেছি, অষ্টগ্রামের দত্তদের পূর্বপুরুষ ছিলেন মনসামঙ্গলের আদি কবি কানাহরি দত্ত। আমার মা না থাকায়, মা-সম্পর্কে আমার জানার কোনো অবকাশই ছিল না; বাবাও মা সম্পর্কে কিছুই বলতেন না। আমিও ঐসব প্রশ্ন করে বাবাকে কষ্ট দিতাম না। 'কে আর হৃদয় খুঁড়ে বেদনা জাগাতে ভালোবাসে।' জীবনানন্দের এই পঙক্তিটি বাবার বেলায় ছিল খুবই প্রযোজ্য।

১৯৭১-এ, কলকাতায় আমার মাসিমার সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হয়। মাসিমার কাছেই আমি আমার মা এবং আমার মাতৃকুল সম্পর্কে প্রথম কিছু কিছু তথ্য জানতে পারি। মাসিমা ঠাকুরঘরে বসে চণ্ডীদাসের পদাবলী আবৃত্তি করতেন। ঘটনাটি আমার মনে দাগ কাটে। ঠাকুরঘরে চণ্ডীদাস? এমন কাব্যপ্রীতি তো সহজলভ্য নয়।

আমি মাসিমার কাছে জানতে চাই, আমার মায়েরও কাব্য-সম্পর্কিত কোনো দুর্বলতা ছিল কিনা। মাসিমা তখন আমাকে জানান যে, আমার মায়ের কাব্যপ্রীতি ছিল তাঁর চেয়েও বেশি। আমার মা মনসামঙ্গলকাব্য পুরোটাই মুখস্থ বলতে পারতেন।

শুনে আমি অবাক হই। মাসিমা তখন একটু গর্বের সঙ্গেই দাবি করেন যে, তাঁরা কানাহরি দত্তের বংশধর।

মনসামঙ্গলের আদি রচয়িতা সম্পর্কে ড. অসিত বন্দ্যোপাধ্যায় যে সংশয় প্রকাশ করেছেন, সেই সংশয় নিরসনকল্পে অষ্টগ্রামে তদন্ত করা যেতে পারে।

মনে হয় আমার মাতৃকুলসূত্রেই আমি কিছুটা কবিত্বশক্তি লাভ করেছিলাম। আমার মার নাম ছিল বীণাপাণি। অনেক অনুসন্ধান করেও আমার পিতৃকুলে আমি কোনো কবির সন্ধান পাইনি। পিতৃকুলে সম্ভবত আমিই প্রথম।

আমার ঠাকুরদার নাম রামসুন্দর গুণ। এনট্রান্স পাস করে তিনি ময়মনসিংহের জজকোর্টে চাকরি পেয়েছিলেন। তিনি ছিলেন খুবই দরিদ্র পিতার সন্তান। চাকরিসূত্রে তিনি পরিবারের ভাগ্য পরিবর্তন করেন। তাঁর বড় ভাই, নবকিশোর গ্রামে থাকতেন, ঠাকুরদা শহর থেকে চাকরির বেতন গ্রামে পাঠাতেন, নবকিশোর ঐ টাকায় জমিজমা ক্রয় করতেন। একপর্যায়ে গৌরীপুরের জমিদারদের কাছ থেকে তিনি একটি চারগ্রামের (ডেমুরা, চাপারকোণা, সাধুহাটি ও কাশতলা) তালুকদারিস্বত্ব ক্রয় করেন। ঐ তালুক ক্রয়ের সূত্রে আমাদের পদবী দীর্ঘ হয়— গুণের সঙ্গে যুক্ত হয় চৌধুরী।

আমার ঠাকুরদা, তাঁর প্রথম স্ত্রীর মৃত্যু পর পার্শ্ববর্তী ডেমুরা গ্রামের হরিশ্চন্দ্র দত্তের কন্যা কামিনীসুন্দরীর সঙ্গে দ্বিতীয়বার বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হন। তাঁর প্রথম স্ত্রীর গর্ভে দুই পুত্র এবং এক কন্যার জন্ম হয়েছিল। দ্বিতীয় স্ত্রীর গর্ভে ছিল তিন পুত্র। ঐ তিন পুত্রের মধ্যম পুত্র বাসুদেব, আমার পিতা।

বাবার বৈমাত্রেয় দুই ভাইয়ের ছোটজন, অর্থাৎ ঠাকুরদার দ্বিতীয় পুত্র সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করে পরিবার থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি আর ফিরে আসেননি। আমরা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দীর্ঘদিন আমাদের ঐ সন্ন্যাসী হয়ে সংসার থেকে পালিয়ে যাওয়া জ্যাঠামশাইর অপেক্ষায় থেকেছি। গৌরবর্ণ ও উন্নত নাসাবিশিষ্ট সুঠামদেহী যে কোনো সন্ন্যাসীকেই আমরা আমাদের জ্যাঠামশাই বলে ভ্রম করতে ভালবাসতাম। ছোটবেলায় দেখেছি, জ্যাঠামশাই সন্দেহে যে কোনো সন্ন্যাসীকেই আমাদের বাড়িতে সযত্নে খাওয়ানো হচ্ছে। আমরা মনে করতাম, আমাদের ঐ সন্ন্যাসী জ্যাঠামশাই নানারকমের ছদ্মবেশ ধরে আমাদের দেখা দিতে এবং দেখে যেতে আসছেন।

এক সময় আমিও ভাবতাম, বড় হয়ে সন্ন্যাসী হব, যদি জ্যাঠামশাইর দেখা পাই। কল্পনায় আমি আজও আমার জ্যাঠামশাইকে খুঁজে বেড়াই। তিনি কেন সন্ন্যাসী হয়ে সংসারত্যাগী হয়েছিলেন, সে কথা আমার খুব জানতে ইচ্ছে করত। এখনও করে। তিনি কি আজও বেঁচে আছেন? থাকতে তো পারেন। হিসেবমতো তাঁর বয়স এখন এক শ'র কাছাকাছি হওয়ার কথা। একজন সন্ন্যাসীর জন্য এক শ' বছর এমন বেশি সময় নয়।

আমার সবচেয়ে বড় জ্যাঠামশাই, বড়দাসুন্দর গুণ এন্ট্রাস পাস করে স্কুলে শিক্ষকতা করতেন। আমাদের বাড়ির লাইব্রেরীতে যেসব বই ছিল, সেগুলোর প্রায় প্রত্যেকটির মধ্যেই আমি তাঁর চমৎকার স্বাক্ষর দেখেছি। গ্রন্থের তালিকা থেকে বোঝা যায় তিনি ইংরেজ কবিদের খুব ভক্ত ছিলেন। তখন অবশ্য স্কুল-কলেজের পাঠ্যসূচিতে সর্বত্র ইংরেজ কবিদেরই প্রাধান্য ছিল। শেক্সপীয়র, শেলী, বায়রন, মিল্টন— এঁদের কবিতার বই তাঁর সংগ্রহে ছিল। ওখানেই আমি ইংরেজ কবিদের নাম প্রথম জানতে পারি। বিভিন্ন কবির কবিতার পাশে তিনি ইংরেজিতে নানারকমের মন্তব্য লিখতেন। তিনি ভালো ইংরেজি জানতেন এবং সম্ভবত তিনি একজন নীরব কবিও ছিলেন। আমার জন্মের পরও তিনি বেঁচে ছিলেন, কিন্তু আমি তাঁকে দেখেছি বলে আমার মনে পড়ে না। তাঁর চমৎকার ইংরেজি হাতের লেখা আজও আমার চোখে লেগে আছে।

ঠাকুরদার হাতের লেখাও খুব সুন্দর ছিল। তাঁর প্রিয় গানের একটি স্বহস্ত লিখিত পাণ্ডুলিপি এখনও আমাদের বাড়িতে রক্ষিত আছে। শতবর্ষের ধকল সইবার পরও তাঁর ঐ হস্তলিখিত গানগুলো অনায়াসে পাঠ করা যায়। তাঁর প্রিয় গানের অধিকাংশই ছিল রামপ্রসাদী। তাঁর হস্তাক্ষর ছিল কিছুটা নজরুলের মতো।

একই খাতায় তিনি আমাদের বংশলিপিও লিখে রেখে গেছেন। তালপাতায় তাঁর স্বহস্ত লিখিত কিছু বেদমন্ত্রও আমি দেখেছি। ঠাকুরদা কর্তৃক লিপিবদ্ধ আমাদের বংশলিপিটি নিম্নরূপ :

পিতৃকুল

পিতা → রামকিশোর গুণ

পিতামহ → বিষ্ণুরাম গুণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পিতামহী → চণ্ডিকা
প্রপিতামহ → মুক্তরাম গুণ
প্রপিতামহী → মাধবী
বৃদ্ধপ্রপিতামহ → রাঘবগোবিন্দ গুণ
বৃদ্ধপ্রপিতামহী → প্রভাবতী
জ্যেষ্ঠ পিতামহ → দুর্গারাম গুণ
তৎপত্নী → মহামায়া
খুল্লপিতামহ → কৃষ্ণরাম গুণ
তৎপত্নী → রুক্মিণী
খুল্লপ্রপিতামহ → রূপরাম গুণ
তৎপত্ন → সুদক্ষিণা

মাতামহকুল
মাতামহ → আনন্দীরাম হোড়
প্রমাতামহ → হরিবল্লভ
বৃদ্ধপ্রমাতামহ → নরোত্তম
মাতামহী → সাবিত্রা
প্রমাতামহী → যমুনা
বৃদ্ধপ্রমাতামহী → চণ্ডিকা

মাসিগণ
অভয়া
বিজয়া
বিদ্যা
কিম্বরী ও পরমেশ্বরী

মৃতা-তিথি
পিতা → অগ্রহায়ণের শুক্লা পঞ্চমী
মাতা → চৈত্রের শুক্লা ত্রয়োদশী
পিতামহী → কার্তিকের শুক্লা অষ্টমী

'লেখা-পড়া করে যে গাড়ি ঘোড়া চড়ে সে'— কথাটা আমার ঠাকুরদার জীবনে সত্য হয়েছিল। গাড়িতে না চড়লেও চার বেহারার পাল্কিতে চড়ে তিনি নেত্রকোনা পর্যন্ত যেতেন, তারপর নেত্রকোনা থেকে রেলগাড়িতে চড়ে যেতেন ময়মনসিংহ। বারহাট্টা তখনও রেলপথে ময়মনসিংহের সঙ্গে যুক্ত হয়নি। রেললাইনটি পরে (১৯৩২) বারহাট্টা হয়ে মোহনগঞ্জ পর্যন্ত প্রসারিত হয়।

*****

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার ঠাকুরদা পাণ্ডববর্জিত দুর্গম এলাকার মানুষের মধ্যে বিদ্যা বিতরণের কাজে ব্রতী হয়েছিলেন। তিনি আমাদের অকালপ্রয়াত একমাত্র পিসিমার স্মৃতিরক্ষার্থে আমাদের বাড়ির ভিতরে 'স্নেহলতা বালিকা বিদ্যালয়' নামে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। পারিবারিক তহবিল থেকেই ঐ স্কুলের শিক্ষকদের বেতন দেয়া হতো, ছাত্রীদের কাছ থেকে কোনো বেতন নেয়া হতো না। স্কুলটি পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত ছিল। এলাকার বিভিন্ন গ্রাম থেকে মেয়েরা এসে স্নেহলতা বালিকা বিদ্যালয়ে পড়ত। ঐ স্কুলটি সরকারি অনুদান বা স্বীকৃতি পায়নি। তারপরও ঐ স্নেহলতা বালিকা বিদ্যালয়টি দীর্ঘদিন চালু ছিল। পরে অর্থাভাবে ঐ স্কুলটি বন্ধ হয়ে যায়। স্নেহলতা বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি ঠাকুরদা আমাদের বাড়ির সামনে একটি মিডল ইংলিশ স্কুলও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সরকারি চাকরির প্রভাব খাটিয়ে ঐ স্কুলটির জন্য তিনি প্রয়োজনীয় সরকারি স্বীকৃতি এবং বার্ষিক অনুদান— দুই-ই সংগ্রহ করেন। ঐ স্কুলটি ছিল ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত। ওটাই পূর্ব-নেত্রকোনার প্রথম স্কুল (১৯১০ খ্রিঃ) দূরদূরান্ত থেকে ছাত্ররা এই স্কুলে পড়তে আসত।

১৩২৭ সালের ৭ই পৌষ (১৯২০ ইং) আমার ঠাকুরদা লোকান্তরিত হন। আমার বাবা, তাঁর বৈমাত্রেয় বড় বড়দা গুণ মহাশয়ের উৎসাহে আর্টিস্ট হওয়ার উদ্দেশ্যে বাড়ি ছেড়ে কলকাতায় যান এবং কলকাতার ন্যাশনাল আর্ট স্কুলে ভর্তি হন। সংসারের আয়-উপার্জনের ব্যাপারে বাবার খুব একটা উৎসাহ ছিল না। শিল্পীদের মতোই তিনি কিছুটা সংসারবিমুখ মানুষ ছিলেন। আর্টিস্ট হওয়ার ইচ্ছেটা তিনি কোথা থেকে পেয়েছিলেন, জানি না। তাঁর আর্টিস্ট হওয়ার ব্যাপারে ঠাকুরমার সমর্থন ছিল না। ঠাকুরদার মৃত্যুতে আমার ঠাকুরমা সংসারে একচ্ছত্র কর্ত্রীতে পরিণত হয়েছিলেন। যে জ্যাঠামশাই বাবাকে আর্টিস্ট হওয়ার ব্যাপারে উৎসাহ যুগিয়েছিলেন, তিনি ছিলেন বাবার বৈমাত্রেয় ভাই। ঠাকুরমার অবর্তমানে সাংসারিক ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে ঠাকুরমা আমাদের বৈমাত্রেয় জ্যাঠামশাইর সকল অধিকার হরণ করেন। ফলে বাবার পক্ষে ঠাকুরমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে কলকাতায় থেকে আর্ট স্কুলে পড়াশোনা করাটা ক্রমেই দুরূহ হয়ে ওঠে। ঠাকুরমা চাইতেন না আর্টিস্ট হওয়ার পেছনে বাবা পরিবারের অর্থের অপচয় করেন। আমার আপন জ্যাঠামশাই এবং আমার কাকা এ ব্যাপারে ঠাকুরমাকেই সমর্থন করতেন। আমার আপন জ্যাঠামশাই বিএ পাস করে ময়মনসিংহ জজকোর্টে পেশকারের চাকরি করতেন। তিনি ছিলেন খুব হিসেবি লোক। আমার কাকা রামগোপালপুরের জমিদারবাড়িতে একসময় ম্যানেজার ছিলেন; পরে ঐ চাকরি ছেড়ে দিয়ে তিনি গ্রামে চলে আসেন। আমাদের তালুকদারির অন্তর্ভুক্ত প্রজাদের কাছ থেকে খাজনা আদায় করার ব্যাপারে কাকা ছিলেন পারদর্শী। এলাকায় তাঁর প্রভাব-প্রতিপত্তি বাবার চাইতে অনেক বেশি ছিল। তিনি ছিলেন সাত গাঁয়ের মোড়ল, বিচারক পরে ময়মনসিংহ জজকোর্টের জুরিবোর্ডের অন্যতম অনভিজ্ঞ এবং

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিছুটা উদাসীন প্রকৃতির মানুষ। তিনি সংসারের দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে নানা ব্যর্থতার পরিচয় দিতেন। এই নিয়ে ভাইদের মধ্যে মনোমালিন্য হতো। বাবা যখন তাঁর বৈমাত্রেয় অগ্রজের সমর্থনে আর্টিস্ট হওয়ার জন্য কলকাতা চলে যান, তখন ঐ কলহ এবং মতান্তর আরো তীব্র রূপ নেয়। কিছুদিন বাড়ি থেকে বাবার নামে নিয়মিতই টাকা পাঠানো হতো, কিন্তু এ ব্যবস্থাটা বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। বছরখানেক পর বাবার নামে টাকা পাঠানো বন্ধ করে দেয়া হয় এবং গ্রামে এসে সংসারের দায়িত্ব গ্রহণের জন্য বাবাকে নির্দেশ দিয়ে পত্র দেয়া হয়। বাবা তখন বাধ্য হয়েই আর্ট স্কুলের পড়া চুকিয়ে দিয়ে গ্রামে ফিরে আসেন।

ময়মনসিংহ শহরে ঠাকুরদা কিছু জমি কিনেছিলেন। বাবার ওপর ঐ জমিতে বাড়ি তৈরি করার দায়িত্ব বর্তায়।

শহরের কেন্দ্রস্থল, রামবাবু রোডের পাশেই দিনরাত কঠোর পরিশ্রম করে বাবা বাড়ি তৈরির কাজ সম্পন্ন করেন। তিনভাগে বিভক্ত ঐ বাড়ির প্রতিটি ইউনিট ছিল স্বতন্ত্র এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ। রবীন্দ্রনাথের ময়মনসিংহ আগমনের কাছাকাছি সময় বাবার বাড়ি তৈরির কাজ শেষ হয়। ফলে রবীন্দ্রনাথের প্রভাবে, শান্তিনিকেতনের অনুকরণে বাড়িগুলোর নামকরণ করা হয় উত্তরায়ণ, সঞ্চয়ন এবং দক্ষিণায়ন।

বাড়ি তৈরির কাজ শেষ করে বাবা গ্রামে ফিরে আসেন। ঠাকুরমাকে নিয়ে জ্যাঠামশাই দক্ষিণায়নে বসবাস শুরু করেন। উত্তরায়ণ এবং সঞ্চয়ন ভাড়া দিয়ে দেয়া হয়। বাড়ির নামকরণ ও নির্মাণ-কৌশলে বাবার শিল্পীমনের ছাপ লক্ষ্য করা যায়।

কলকাতা আর্ট স্কুলে কিছুদিন পড়াশোনা করার সুবাদেই আমার মায়ের সঙ্গে বাবার বিয়ে সম্ভব হয়েছিল বলে আমার ধারণা। তা না হলে আমার মাতুল পরিবার বাবাকে মায়ের যোগ্যপাত্র বিবেচনা করত বলে মনে হয় না।

বিয়ের পর অষ্টগ্রামের দত্তকুলোদ্ভব মায়ের সঙ্গে ডেমুরার দত্তকুলোদ্ভব ঠাকুরমার সম্পর্কের ক্রমশ অবনতি ঘটতে থাকে। মায়ের অবাধ্য হয়ে কলকাতায় পড়তে যাওয়া এবং সংসারের কাজে অবহেলা প্রদর্শনের জন্য বাবার সঙ্গে ঠাকুরমার সম্পর্কটা পূর্ব থেকেই খারাপ ছিল। আমার শহুরে মায়ের সঙ্গে ঠাকুরমা যখন শাশুড়ির গ্রাম্য দাপট খাটাতে গেলেন, তখন মায়ের সঙ্গেও তাঁর অঘোষিত স্নায়ুযুদ্ধের সূচনা হয়। ক্রমশ তা প্রকট রূপ ধারণ করে।

খুব ভোরে পুকুরে প্রাতঃস্নান করার রেওয়াজ আছে গ্রামে, বিশেষ করে সধবাদের। শীতের দিনেও তা থেকে রেহাই ছিল না। আমার মা ছোটবেলা থেকেই শহরে মানুষ হয়েছিলেন। গ্রাম্যজীবনের অভিজ্ঞতা তাঁর কমই ছিল। তিনি ঠাকুরমার নিয়ম না মেনে টিউবঅয়েলের তোলা জলে স্নান করতেন। বাবা ছিলেন কিছুটা স্ত্রৈণ প্রকৃতির। তিনি প্রকাশ্যেই টিউবঅয়েল থেকে মায়ের জন্য স্নানের জল তুলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিতেন। ঠাকুরমা ব্যাপারটা লক্ষ্য করেন এবং এ নিয়ে বাবা-মাকে নানা কটু কথা শোনান। ঠাকুরমা মাকে বাড়ির পেছনের পুকুরে প্রাতঃস্নান করার নির্দেশ দেন।

বাড়ির পেছনের পুকুরটির প্রতি ঠাকুরমার ব্যক্তিগত দুর্বলতা ছিল। সেই বিশেষ দুর্বলতার কারণ হলো, ঠাকুরদার দ্বিতীয় বিয়ের পর তার এক জ্ঞাতিভাই, সম্পত্তি নিয়ে যার সঙ্গে আদালতে মামলা চলছিল, নিমন্ত্রণ পেয়েও আমাদের বাড়িতে আসেননি, উপরন্তু বিদ্রূপচ্ছলে তিনি নাকি মন্তব্য করেছিলেন এই বলে যে, 'রামসুন্দরের সুন্দরীকে তো পুকুরঘাটেই দেখতে পাব। বাড়িতে যাওয়ার দরকার কি?'

কথাটা ঠাকুরদার কানে পৌঁছলে তাঁর আত্মমর্যাদায় আঘাত লাগে। তিনি খুবই মর্মাহত হন। নববিবাহিত সুন্দরী স্ত্রীকে ঐ জ্ঞাতিভ্রাতার চোখের আড়ালে রাখার মানসে তিনি তখন রাতারাতি বাড়ির পেছনের ঐ পুকুরটি খনন করেন। পুকুরের চারপাশে ঘন জঙ্গল ঢাকা থাকায় বাইরে থেকে বোঝার উপায়ই ছিল না, ভিতরে একটি টলটলে জলের পুকুর আছে।

প্রিয়তমা পত্নীর জন্য সম্রাট শাহজাহান গড়েছিলেন তাজমহল, রামসুন্দর দিয়েছিলেন পুকুর। এক ঢিলে দুই পাখি মেরেছিলেন আমার ঠাকুরদা। জ্ঞাতিশত্রুকেও জব্দ করেছিলেন, স্ত্রীর মনও জব্দ করেছিলেন। কবি হলে তিনি পুকুরটির নাম রাখতেন কামিনীসরোবর। সঙ্গত কারণেই ঠাকুরমার গোপন দুর্বলতা ছিল ঐ পুকুরটিকে ঘিরে। তাঁর প্রিয়-পুকুরে প্রাতঃস্নানের ব্যাপারে আমার মায়ের অনীহা বোধকরি ঠাকুরমার দুর্বলতার জায়গাটিতেই আঘাত করে থাকবে। ঠাকুরদার মৃত্যুকে অকালমৃত্যু বলা না গেলেও আমার ঠাকুরমা সত্যিকারের বাল্যবিধবাই ছিলেন। ঠাকুরদার সঙ্গে তাঁর বয়সের পার্থক্য প্রায় তিরিশ বছর। অল্প বয়সের বিধবা শাশুড়িদের সঙ্গে পুত্রবধূদের সম্পর্ক নানা কারণেই খুব সুখের হয় না। তবে অন্য দুই পুত্রবধূর সঙ্গে আমার ঠাকুরমার সম্পর্ক মোটামুটি ভালো ছিল।

শেষ পর্যন্ত আমার মা, ঠাকুরমার কটুকথার অত্যাচারে, জেদ করেই কামিনী সরোবরের ঠাণ্ডা জলে প্রাতঃস্নান করতে শুরু করেন। এর ফল আমার মায়ের জন্য খুবই ক্ষতিকর হয়। উপর্যুপরি সন্তানের জন্ম দিতে দিতে এমনিতেই তাঁর শরীর ভেঙে পড়েছিল, পুকুরের ঠাণ্ডা জলে স্নান করে তিনি অচিরেই নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হন এবং অল্পদিনের ব্যবধানেই মারা যান। আমার মায়ের অকালমৃত্যুর জন্য আমার ঠাকুরমা কমবেশি দায়ী।

ঠাকুরমা সম্পর্কে বলবার মতো আমার কোনো সুখস্মৃতি নেই। সবারই ঠাকুরমা থাকে, আমারও ছিল। ব্যস, এ পর্যন্তই। ঠাকুরমার ঝুলি থেকে দুঃখ ছাড়া আমি আর কিছুই পাইনি। নিজের ঠাকুরমা সম্পর্কে এসব কথা লিখতে গিয়ে আমার মনে প্রশ্ন জাগছে, ঠাকুরমার অত্যাচারে কষ্ট পেয়ে আমার অসহায় মা কি ঈশ্বরের কাছে কখনও আমার মতো এক কবিপুত্রের প্রার্থনা করেছিলেন?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাবার আর্টস্কুলে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা সম্পন্ন হয়নি, এ নিয়ে বাবার মনে খুব দুঃখ ছিল; কিন্তু ছবি আঁকা তিনি একেবারে ছেড়ে দেননি। ছবি আঁকতেন গ্রামের বাড়িতে বসেই। বিয়ের পর মায়ের উৎসাহেই বাবা বেশকিছু ছবি আঁকেন। তাঁর আঁকা ছবির অধিকাংশই নষ্ট হয়ে যায়। কিছু ছবি মা নিজের উদ্যোগে বাঁধিয়ে এনেছিলেন; কালের করালগ্রাস থেকে সেই ছবিগুলো রক্ষা পায়। আমার মায়ের মৃত্যুর পরও ঐ ছবিগুলো দীর্ঘদিন আমাদের গ্রামের বাড়িতেই ছিল। পরে আমার বড় ভাই ঐ ছবিগুলো ভারতে নিয়ে যান।

একটি ছবিতে দেখা যাচ্ছে, জনৈকা রমণী স্নানশেষে ঘরে ফিরছেন— তার ভেজা গায়ের সঙ্গে লেপ্টে থাকা ভেজা শাড়িটি তাঁর গাত্রবর্ণের স্নিগ্ধ শ্যামলতাকে প্রকাশ করছে। রমণীর নগ্নপদযুগলের ওপর শাড়ির লাল পাড়টা পড়ে আছে দেবীপায়ের যুগলপদ্মের মতো। তাঁর দীর্ঘ কালো কেশদাম একটা ডোরাকাটা গামছা দিয়ে জড়ানো। মুখ বাঁ-দিকে ঈষৎ ঘোরানো, মনে হয় অঙ্কনরত শিল্পীর দিকেই রমণীর দৃষ্টি নিবদ্ধ।

একটিতে ছবির নায়িকা স্নানশেষে শুকনো শাড়ি পরেছেন। তাঁর পিঠের উপরের এলানো ভেজা চুল এই চিত্রে বন্দী হয়েছে খোঁপায়। সলজ্জ প্রশান্তিতে ভরা তাঁর স্নিগ্ধ মুখশ্রী। চোখের দৃষ্টি মাটির দিকে নোয়ানো। তাঁর দীর্ঘ শীর্ণ দৈহিক গঠন এবং লম্বাটে মুখাকৃতি দেখে অনুমান করি, এই দুই ছবিরই মডেল ছিলেন আমার মা। শিল্পচর্চা অব্যাহত রাখতে পারলে বাবা যে একজন উঁচুমানের শিল্পী হতে পারতেন, এ ব্যাপারে আমার একটুও সন্দেহ নেই।

মনে হয়, মাকে মডেল করে ছবি আঁকার ব্যাপারটিও আমার ঠাকুরমার চোখে পড়ে থাকবে এবং তিনি তা পছন্দ করেননি। এটাও ঠাকুরমার সঙ্গে আমার মায়ের সম্পর্ক নষ্ট হওয়ার একটা কারণ হতে পারে। অথচ আমি বাবার মুখেই শুনেছি, ঠাকুরমার বাবা হরিশ্চন্দ্র দত্ত মহাশয়ও চমৎকার ছবি আঁকতেন। সেদিক থেকে বলা যায়, পুত্রের মধ্যে পিতৃকৃতীর নিদর্শন লক্ষ্য করে বাবার শিল্পচর্চার প্রতি ঠাকুরমার দুর্বলতা থাকাটাই ছিল স্বাভাবিক, কিন্তু বাস্তবে তেমনটি হয়নি। কেন হয়নি তা এক রহস্যময় ব্যাপার।

সংসার-জালে জড়িয়ে পড়ার ফলে ক্রমেই বাবা ছবি আঁকার উৎসাহ-উদ্যম হারিয়ে ফেলেছিলেন। মায়ের আকস্মিক মৃত্যুতে বাবার শিল্পীজীবনের ইতি ঘটে। তিনি ছবি আঁকা একেবারে বন্ধ করে দেন। বাবা যে শিল্পী ছিলেন, তা জানার কোনো অবকাশই আমাদের হয়নি। আমাদের দাদামণি যখন আমাদের ঘরে অযত্নে লালিত ছবিগুলো ভারতে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন, তখন ঐ ছবিগুলোর প্রতি তাঁর বিশেষ আগ্রহের কারণ সন্ধান করতে গিয়েই আমি প্রথম জানতে পারি যে, ঐ ছবিগুলো বাবার আঁকা। আমি বাবার দিকে খুব কৌতূহলী চোখে তাকাই। ছবি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এঁকে দেয়ার জন্য বাবার কাছে আমি বায়না ধরতে থাকি, কিন্তু বাবা কিছুতেই ছবি আঁকতে রাজি হন না, নানা ছুতোয় তিনি আমার আবদার এড়িয়ে চলেন। মনে হয় বাবা যেন মনে মনে প্রতিজ্ঞাই করেছিলেন, আর ছবি আঁকা নয়।

আমার মা কি বাবাকে ছবি আঁকতে নিষেধ করে গিয়েছিলেন? কী জানি? একবার বাবা আমার আবদার এড়াতে পারেননি। আমাদের বাড়িতে রবীন্দ্রজয়ন্তী পালন করার রেওয়াজ ছিল। রবীন্দ্রস্নেহধন্য রবীন্দ্রসঙ্গীত বিশেষজ্ঞ শ্রীশৈলজারঞ্জন মজুমদারের প্রদত্ত তথ্যানুযায়ী জানতে পারি যে, রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন সর্বপ্রথম পালিত হয়েছিল নেত্রকোনায়।

'গ্রন্থের পরিশিষ্টে' এ ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের একটি প্রাসঙ্গিক পত্র সংযোজিত হলো।

শৈলজাবাবু আমাদের দূর-সম্পর্কের আত্মীয় ছিলেন। তাঁর বাড়ি ছিল বারহাট্টার পার্শ্ববর্তী মোহনগঞ্জ থানায়। শৈলজাবাবু রসায়নবিজ্ঞানী হলেও কবিগুরুর নির্দেশে তখন শান্তিনিকেতনে সঙ্গীত বিভাগের শিক্ষক হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। পূজার ছুটিতে বাড়ি এসে শৈলজাবাবু রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন পালনের উদ্যোগ নেন। ওটাই ছিল শান্তিনিকেতনের বাইরে রবীন্দ্রজয়ন্তীর শুরু। পরবর্তীকালে, পাকিস্তান হওয়ার পর রবীন্দ্রনাথের পাশাপাশি নজরুল ইসলামও যুক্ত হন। নজরুলজয়ন্তীও কি নেত্রকোনাতেই প্রথম পালিত হয়েছিল!

বারহাট্টায়, বারহাট্টা ক্লাবের উদ্যোগে তখন একটা সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল গড়ে উঠেছিল। ঐ ক্লাবে রবীন্দ্র ও নজরুলজয়ন্তী হতো। আমরা ঐসব অনুষ্ঠানে রচনা প্রতিযোগিতায় এবং কবিতা আবৃত্তিতে অংশ নিতাম। নজরুলের জীবনকাহিনী পাঠ করে আমি খুবই অবাক হই। নজরুলের শৈশব ছিল অত্যন্ত দুঃখের। বৈরী ভাগ্যের বিরুদ্ধে কী সংগ্রাম করেই না নজরুল কবি হয়েছিলেন। নজরুলের সংগ্রামী জীবন আমাকে খুবই আকৃষ্ট করে। আমি তাঁর সঙ্গে এক ধরনের নৈকট্য অনুভব করি। আমি আমাদের বাড়িতে নজরুলের জন্মদিন পালনের সিদ্ধান্ত নিই এবং বাবাকে নজরুলের একটা ছবি এঁকে দিতে বায়না ধরি। বাবা এবার আর আমার কথা ফেলতে পারেননি। তিনি অনেকদিন পর মোটা কাগজ আর কাঠের পেন্সিল নিয়ে ছবি আঁকতে বসেন। নজরুলের ঝাঁকড়াচুলের সেই বিখ্যাত ছবিটাকে মডেল করে বাবা নজরুলের একটা চমৎকার ছবি এঁকে দেন।

আমাদের বাড়ির সামনের কাছারিঘরের বারান্দায় স্টেজ তৈরি করি এবং স্টেজের পেছনের কালো পর্দার (মায়ের কালো শাড়ি) মাঝখানে বাবার আঁকা নজরুলের পেন্সিলস্কেচটা সেঁটে দিয়ে আমরা এগারই জ্যৈষ্ঠ পালন করি। বাবা হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান গাইতে পারতেন। আমাদের উৎসাহ দেয়ার জন্যই ঐ অনুষ্ঠানে বাবা একটি নজরুলগীতিও পরিবেশন করেছিলেন। ওটাই ছিল আমার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাবার আঁকা শেষ ছবি। ঐ ছবি আঁকার পর বাবা আরও তিরিশ বছর বেঁচে ছিলেন, কিন্তু তাঁকে আর কোনো ছবি আমি অনেক চেষ্টা করেও আঁকাতে পারিনি। ছবি আঁকার কথা বললেই বাবা হাসতেন, সেই হাসি ছিল খুবই রহস্যময়।

আমার মায়ের মৃত্যুর পর বছরখানেকের মধ্যেই বাবা পুনরায় বিয়ে করেন। এবারও সেই কিশোরগঞ্জেই। এবারও এক দত্ত-পরিবারে। বাবা যেন কিছুতেই কিশোরগঞ্জ এবং দত্তবংশের প্যাঁচ থেকে বেরিয়ে আসতে পারছিলেন না। আমার নতুন মায়ের সঙ্গেও ঠাকুরমার সম্পর্ক শুরু থেকেই শীতলরূপ ধারণ করে। আমার নতুন মা স্বাস্থ্যে এবং কলহশক্তিতে আমার আপন মায়ের চেয়ে সবল হওয়ায় সংসারে প্রবেশ করার অল্পদিনের মধ্যেই তিনি স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি ভাগ করে দেয়ার জন্য ঠাকুরমার ওপর চাপ সৃষ্টি করতে সমর্থ হন। ঠাকুরমা শুধুমাত্র জমি ভাগ করে দিতে রাজি হন। অস্থাবর সম্পদের অধিকাংশই ঠাকুরমা নিজের দখলে আগলে রাখেন। আমরা যে ঘরটিতে থাকতাম, কিঞ্চিৎ সংস্কার সাধন করে বাবা ঐ ঘরটির নামকরণ করেন 'ছিন্নকুটির'। নতুন মায়ের স্নেহচ্ছায়ায় ছিন্নকুটিরে শুরু হয় আমাদের নতুন জীবন।

অল্পদিনের মধ্যেই ঠাকুরমা পরলোকগমন করেন। মৃত্যুর সময় তিনি ময়মনসিংহে, তাঁর বড় পুত্রের সঙ্গে ছিলেন। জ্যাঠামশাই ঠাকুরমার মৃত্যুর সংবাদ বাবাকে জানাননি। কাকার কাছে চিঠি দিয়েছিলেন, কাকা সে সংবাদ বাবাকে জানাননি। লোকমুখে খবর পেয়ে বাবা দ্রুত ময়মনসিংহে যান, কিন্তু ততক্ষণে ঠাকুরমার দাহ সম্পন্ন হয়ে যায়। বাবা ঠাকুরমাকে শেষবারের মতো দেখার সুযোগ থেকেও বঞ্চিত হন। এভাবেই আপন পুত্রের সঙ্গে আপন মায়ের অনিবার্যপ্রায় এক দুঃসহ সম্পর্কের অবসান ঘটে।

AMARBOI.COM

আমার নতুন মা আমাদের সংসারে এসেই এমন সব সমস্যার সম্মুখীন হন, যেগুলো মোকাবিলা করার মানসিক প্রস্তুতি থাকলেও বাস্তব অভিজ্ঞতা তাঁর আদৌ ছিল না। আমি খুব ছোট ছিলাম। মায়ের মৃত্যু আমার মনে মোটেও রেখাপাত করেনি। আমি খুব সহজেই নতুন মায়ের সঙ্গে মানিয়ে নিলাম। আমার মনে হলো, আমার মা যেন মৃত্যুর পর আরো মোটাসোটা হয়ে ফিরে এসেছেন। আমি অচিরেই আমার নতুন মায়ের আঁচলধরা পুত্রে পরিণত হই। এই মা-টি যে আমার আসল মা নয়, তা আমাকে কেউ বোঝাতেই পারত না। রান্নাঘর থেকে পুজোঘর পর্যন্ত আমি মায়ের অষ্টপ্রহরের সঙ্গী বনে যাই। আমার ছোট বোন সোনালিও মাকে সহজেই মেনে নিতে পারল। সমস্যা হলো আমার দাদামণি এবং বড় বোন রূপালীকে নিয়ে। বিশেষ করে আমার দাদামণি কিছুতেই বাবার দ্বিতীয় বিয়েকে মেনে নিতে পারলেন না। মায়ের সঙ্গে তার প্রকাশ্যে বিরোধ দেখা দিলো। এই বিরোধের মধ্যে বাবা ভীষণ নাজুক অবস্থায় পড়লেন। সে এক দুঃসহ অবস্থা। আমাদের বৈমাত্রেয় জ্যাঠামশাইয়ের একমাত্র পুত্র শান্তনু, আমরা তাঁকে বড়দা বলে ডাকতাম, বাবার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুর্দিনে বাবার সাহায্যে এগিয়ে আসেন। বড়দা তখন বিএ পাস করে কিশোরগঞ্জের রামানন্দ হাইস্কুলে শিক্ষকতা করতেন। তিনি দাদামণিকে সঙ্গে করে কিশোরগঞ্জে নিয়ে যান এবং রামানন্দ স্কুলে ভর্তি করে দেন। সংসারে সাময়িকভাবে শান্তি ফিরে আসে। সেনবাড়ি থেকে দুলালীকে আমাদের ঘরে ফিরিয়ে আনা হয়। বাবা কিছুটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচেন। ছোট বোনটিকে কাছে পেয়ে আমরাও খুব আনন্দে দিনাতিপাত করতে থাকি। কিন্তু সেই আনন্দের দিনগুলোর দ্রুত অবসান হয়।

কিছুদিনের মধ্যেই আমার নতুন মা অন্তঃসত্ত্বা হন এবং সন্তানের জন্ম দেয়ার জন্য পিত্রালয়ে চলে যান। তাঁর অনুপস্থিতে দুলালীকে আবার তার পুরনো আশ্রয়ে, সেনবাড়িতে পাঠিয়ে দেয়া হয়। হঠাৎ একদিন দুপুরে দুলালী তার অনিশ্চিত জীবনের ইতি টেনে মৃত্যুর কোলো ঢলে পড়ে। তার কী অসুখ হয়েছিল জানি না। মাতৃহীনতার চেয়ে বড় অসুখ আর কী আছে? আমার মনে পড়ে, চোখ দুটো তুলসীপাতায় ঢাকা অবস্থায় মৃত দুলালীকে শুইয়ে রাখা হয়েছে আমাদের বাড়ির উঠোনে, তার ছোট দেহখানিকে ঘিরে খেলা করছে নারকেলগাছের চিরলপাতার আলো-ছায়া। আমার মার মৃত্যুতে আমি কাঁদিনি— দুলালীর জন্য কেঁদেছিলাম।

আমাদের গ্রামের নাম কাশতলা। কাশ মানে সর্দিকাশির কাশ নয়, কাশফুলের কাশ। এই ব্যাপারটিকে স্পষ্ট করে তোলার জন্যই আমি আমাদের গ্রামের নামটিকে পাল্টে রেখেছিলাম কাশবন। কাশবন নামটা অনেকেই গ্রহণ করেছিল। চিঠিপত্রেও আমরা কাশবন ব্যবহার করতাম। পোস্টঅফিসের পিয়নরাও জানত, কাশবন মানেই কাশতলা। বারহাট্টা রেলস্টেশন থেকে মাইল দেড়েক দক্ষিণে এই কাশবন। বারহাট্টা থেকে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের চওড়া-উঁচু সড়ক আমাদের বাড়ির সামনে দিয়ে ডেমুরা-চাপারকোণা হয়ে বিষ্ণাই (বিষ নাই) নদীর তীর পর্যন্ত গেছে। ঐ বিষ্ণাই নদী পেরুলেই আটপাড়া থানার শুরু। আমাদের আশপাশের কয়েকটি গ্রামের নাম বারঘর, গরমা, গোবিন্দপুর, আন্দাদিয়া, গুহিয়ালা, যোগীশাসন, যশমাধব, রসুলপুর, নন্দুরা, ঘিতন, ডেমুরা, চাপারকোণা, সাবুহাটি ইত্যাদি। বাংলাদেশে কত সুন্দর সুন্দর নামের গ্রাম যে আছে! যশমাধব এবং ডেমুরা এই দুটো গ্রামেই শুধু মুসলমানদের বাস ছিল। অন্য গ্রামগুলোর সবাই ছিল হিন্দু। যশমাধবের দারোগাবাড়ি ছিল খুব বিখ্যাত। সংগ্রামী জননেতা আজিজুল ইসলাম খান ঐ দারোগাবাড়ির মানুষ। ঐ গ্রামের আলতাফ ভাই নির্বাক নজরুলের চরিত্রে অভিনয় করতেন নজরুলজয়ন্তীতে। তাঁর চেহারা ছিল অবিকল নজরুলের মতো। ঐ গাঁয়ের রফিক খাঁ সাহেব বাবার বন্ধু ছিলেন। তাঁর বড় ছেলে জনাব তাহের উদ্দিন খান ছিলেন আমাদের ইংরেজির শিক্ষক, পরে তিনি সরকারি কলেজের অধ্যাপক হন। তার ছোট ভাই আছাবউদ্দিন ছিলেন কবিয়াল। বারহাট্টা ক্লাবের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে যশমাধবের সংস্কৃতিবান মুসলমানদের অগ্রণী ভূমিকা ছিল। ডেমুরা গ্রামের মনফর খাঁ ছিলেন ধনী কৃষক— একপর্যায়ে আমাদের তালুকদারির একটা অংশ ক্রয় করে তিনি তালুকদার হয়েছিলেন। তাঁর বড় ছেলে মালেক স্যার বিএ পাস করে বারহাট্টা স্কুলে শিক্ষকতা করতেন— আমি তাঁর বাড়িতে প্রাইভেট পড়তে যেতাম। ডেমুরার আবুল হোসেন ডাক্তার বাবার বন্ধু ছিলেন। ঐ গ্রামের মুসলমান ছেলেরা দল বেঁধে আমাদের বাড়ির ওপর দিয়েই বারহাট্টায় পড়তে যেত, ওদের সঙ্গে আমাদের ভাব ও বন্ধুত্ব ছিল খুবই গভীর।

আরেকটি বর্ধিষ্ণু মুসলমানপ্রধান গ্রাম ছিল বিক্রমশ্রী ও মোহনপুর। মোহনপুর গ্রামের বিখ্যাত ঠাকুর পরিবার মাত্র কয়েক পুরুষ আগেও ছিল ব্রাহ্মণ। ঐ পরিবারের অন্যতম অধ্যাপক আবদুল হান্নান ঠাকুর, বাংলা একাডেমীর একজন উপপরিচালক।

প্রখ্যাত বিজ্ঞানী এবং প্রাক্তন মন্ত্রী ড. ইন্নস আলীর বাড়ি বিক্রমশ্রী গ্রামে। তিনি জন্মেছিলেন একটি চাষী-পরিবারে। মেধার জোরে জীবনে অভাবিত প্রতিষ্ঠা লাভের পর তিনি গ্রামের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিন্ন করেন, এমনকি তাঁর পিতার সঙ্গেও তিনি যোগাযোগ রাখতেন না। এলাকায় তাঁর সম্পর্কে অনেক খারাপ গল্প চালু ছিল। এই কৃতী বিজ্ঞানীকে ঘিরে আমাদের এলাকাবাসীর মনে একই সঙ্গে ছিল গর্ব এবং ক্ষোভ। তিনি একেবারেই গ্রামে যেতেন না। আমরা শুধু নামেই তাঁকে জানতাম।

AMARBOI.COM

'গুণ' পদবীটা একটু ব্যতিক্রম ধরনের। আমাদের পূর্বপুরুষ নিজেদের কায়স্থশ্রেণীর হিন্দু বলে দাবি করতেন। বাবা-কাকার কাছে শুনেছি আমাদের পূর্বপুরুষ বর্গীয় হামলার সময় পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান থেকে পালিয়ে পাণ্ডববর্জিত পূর্ববাংলায় এই প্রত্যন্ত নিম্নাঞ্চলে এসে বসতি স্থাপন করেছিলেন। আরব্য রজনীর দেশ থেকে আসা মুসলমানদের গল্পের মতোই নিজেদের সম্ভ্রান্ত প্রমাণ করার জন্যই আমাদের বাবা-কাকারা এই গল্পটি বানিয়েছিলেন কিনা জানি না। তবে এটা ঠিক যে, বর্ধমান খুব দূরের নয় এবং বর্গীয় হামলার ব্যাপারটাও ঐতিহাসিকভাবে সত্য। বারহাট্টার নিকটবর্তী কালিকা, আধমাইল দক্ষিণে গরমা এবং প্রায় মাইল দক্ষিণে অবস্থিত কাশতলা— এই তিনটি গ্রামেই 'গুণ'দের বাস।

শিক্ষাদীক্ষা এবং ধনবলে ঐ তিন গ্রামের মধ্যে কালিকার গুণরাই ছিল শীর্ষে। কালিকার মোহিনী গুণের সাত পুত্রের একজন ছাড়া বাকি সবাই ছিলেন উচ্চশিক্ষিত। ক্ষিতিন্দ্রমোহন ছিলেন নামকরা ডাক্তার। বিলেত থেকে এফআরসিএস পাস করে এসে কলকাতার নীলরতন মেডিক্যাল কলেজে অধ্যাপনা করতেন। ড. অতীন্দ্রমোহন গুণ ছিলেন কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক। পঙ্কজমোহন গুণ ছিলেন ইপিসিএস। তাঁদের এক ভাই অতসীমোহন গুণ বেঙ্গল সিভিল সার্ভিসে দ্বিতীয় হয়েছিলেন। ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় মহকুমা হাকিম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হিসেবে কর্মরত থাকা অবস্থায় তিনি একদিন মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন। মালতীকাকার (পঙ্কজমোহন) কাছে শুনেছি, একটা অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথের ওপর বক্তৃতা দেবার সময়ই তাঁর মানসিক ভারসাম্য হারানোর ব্যাপারটা প্রথম ধরা পড়ে। হঠাৎ পাগল হয়ে যাওয়ার কারণেই কাকীমা অতসীকাকাকে ত্যাগ করেছিলেন, নাকি দুজনের মধ্যকার সম্পর্ক কোন কারণে খারাপ থাকার কারণেই কাকা পাগল হয়েছিলেন; তা জানবার কোন উপায় ছিল না। কালিকার বিরাট প্রাচীরঘেরা দালানসমৃদ্ধ বাড়ির ভিতরের একটি নির্জন ঘরে আমাদের ঐ পাগল কাকাকে বন্দী করে রাখা হতো। অনেকেই তাঁকে দেখতে যেত। চমৎকার স্বাস্থ্য, চওড়া কপাল, গৌরবর্ণ ও দীর্ঘদেহী অতসীকাকার মুখভর্তি দাড়ি ছিল। শান্ত অবস্থায় তিনি যখন কলকাতা থেকে আসা স্টেটস্‌ম্যান পত্রিকার পাতায় নিমগ্ন থাকতেন, তখন তাঁকে রামকৃষ্ণ পরমহংসের মতোই মনে হতো। কিন্তু প্রায়ই তিনি উন্মাদের মতো আচরণ করতেন। শরীরে প্রচণ্ড শক্তি ছিল বলে তাঁকে তখন সামাল দেয়াই কঠিন হয়ে পড়ত। এ জন্যই একপর্যায়ে তাঁর হাতে-পায়ে শিকলবেড়ি দেয়া হয়েছিল। স্নানের প্রতি তাঁর ছিল প্রবল অনীহা, চার-পাঁচজনে মিলে ধরাধরি করে তাকে পুকুরে স্নান করাত। আমরা আমাদের কাকীমাকে কখনো গ্রামের বাড়িতে আসতে দেখিনি। কাকার একমাত্র কন্যাটিকে নিয়ে তিনি কলকাতায় চলে গিয়েছিলেন। আমি প্রায়ই ঐ কাকাকে দেখার জন্য কালিকার বাড়িতে যেতাম। তাঁকে দেখে আমার খুব কষ্ট হতো, তাঁর সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে করত— কিন্তু সাহস পেতাম না। তিনি উদাস দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতেন, কারো সঙ্গেই কথা বলতেন না। উন্মত্ত অবস্থায় রাগে বন্দী সিংহের মতো গোঁ-গোঁ করতেন এবং উত্তেজনায় ছটফট করতেন।

পরে একসময় চিকিৎসার জন্য তাঁকে ভারতের রাঁচি মানসিক হাসপাতালে পাঠানো হয়—ওখানেই তাঁর দুর্বিষহ জীবনের অবসান ঘটে।

গরমা এবং কাশতলার গুণদের মধ্যে ঐ পর্যায়ে উচ্চশিক্ষিত কেউ ছিল না। এলাকায় ও এলাকার বাইরে কালিকার গুণরাই ছিলেন বাকি সকল গুণ পদবীধারীদের গৌরবের কারণ। অবশ্য শিক্ষক হিসেবে গরমা গ্রামের মণীন্দ্র গুণ, কাশতলার বড়দা সুন্দর গুণ এবং শ্যামেন্দ্র গুণ মহাশয়ের খুব খ্যাতি ছিল। কাশতলার হীতেশ গুণ ফুটবল খেলোয়াড় হিসেবে নাম করেছিলেন।

আমাদের বাড়িটা বড়-বাড়ি হিসেবে পরিচিত ছিল। শহুরে জীবনের স্বপ্ন চোখে নিয়েই যে নির্মাতারা এই বাড়িটি তৈরি করেছিলেন, তা সহজেই বোঝা যেত। বাড়ির সীমানা ঘেরা ছিল কাঁটামন্দির ঝোপ দিয়ে। পাকিস্তান হয়ে যাওয়ার পরও নিয়মিতভাবে আমাদের বাড়ির সৌন্দর্য পরিচর্যার খাতে অর্থ ব্যয় করার রেওয়াজটি চালু ছিল। একদা এক ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট, মি. গ্রাহাম সাহেব আমাদের বাড়িতে এসেছিলেন। তিনি আমাদের বাড়ি দেখে মুগ্ধ হন। মোহনগঞ্জের কংগ্রেস অফিসে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অগ্নিসংযোগের ব্যাপারে তদন্ত করতে তিনি এসেছিলেন ময়মনসিংহ থেকে— এলাকার প্রথম এন্ট্রাস পাস, সরকারি কর্মচারী, আমার ঠাকুরদা রামসুন্দর গুণের নামের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল— সেই সূত্রেই তিনি আমাদের বাড়িতে আসেন। আমাদের গ্রামের বাড়ি সম্পর্কে গ্রাহাম সাহেবের প্রশংসার ফল হয়েছিল এই যে, আমাদের সাধ্য হ্রাস পাওয়ার পরও বাড়িটি সুন্দর রাখার ব্যাপারে আমার বাবা ও কাকার সাধের ঘাটতি ছিল না। প্রকাণ্ড কাণ্ডবিশিষ্ট দীর্ঘ পামগাছ, বিলাতি সুপারির সুসজ্জিত ঝোপ, চিরসবুজ ঝাউ, দীর্ঘদেহী ইউক্যালিপ্টাস, সুগন্ধ পত্রবিশিষ্ট কর্পূরবৃক্ষ আমাদের গণ্ড-গ্রামের বাড়িটাকে দিয়েছিল এক পৃথক বৈশিষ্ট্য। বাড়ির সামনের ফুলের বাগানে নানারকমের বিরল গোলাপের চাষ হতো। গেণ্ডিফ্লাওয়ার গাছে যখন ফুল ফুটত, সারা বাড়ি মৌ মৌ করত তার গন্ধে। আমার বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিশেষ করে বাবার পৃথক হয়ে যাওয়ার পর থেকেই ঐ ফুলের বাগানটির দৈন্যদশা শুরু হয় এবং পরিচর্যার অভাবে ক্রমশ বাগানটির অপমৃত্যু ঘটে। পরিচর্যা ছাড়া যে গাছগুলো বাঁচার শক্তি রাখে সেগুলোই শুধু মাথা তুলে সাক্ষীগোপাল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। বাবা ও কাকার মধ্যে আমাদের বাড়িটি ভাগ হয়ে যায়। আমাদের অংশে বাবা একটি ছোট্ট ফুলের বাগান করেন, তাঁর ফুলগাছের পাশাপাশি ঐ বাগানে তখন একইসঙ্গে কিছু অর্থকরী মৌসুমী শাকসবজির চাষও যুক্ত হয়। নিছক সৌন্দর্যচর্চার সাধ্য ক্রমশ লোপ পেতে থাকে। জমিদারি ও তালুকদারি প্রথার উচ্ছেদ হয়ে যাওয়ার ফলে আমাদের উপরি আয়ের পথ বন্ধ হয়ে যায়।

আমাদের পাশের বাড়িতে একজন জ্যাঠামশাই ছিলেন। আমরা তাঁকে সাধু জ্যাঠামশাই বলে ডাকতাম। তিনি গৌরীপুরের জমিদার বাড়িতে কাজ করতেন। সপ্তাহান্তে বাড়িতে আসতেন। পরে একসময় চাকরি থেকে অবসর নিয়ে তিনি গ্রামের বাড়িতে এসে বসবাস করতে শুরু করেন। তাঁর এক কন্যা এবং দুই পুত্র ভারতে চলে গিয়েছিল। বাড়িতে শুধু জ্যাঠামশাই এবং জেঠিমা থাকতেন। জমির আয়ে প্রচুর উদ্বৃত্ত হতো, হুণ্ডি করে ভারতে ছেলেদের কাছে তিনি টাকা পাঠাতেন। তিনি নবদ্বীপ গিয়ে মন্ত্র নিয়েছিলেন। কপালে তিলক কাটতেন; গায়ে নামাবলি পরিধান করতেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত ধর্মপরায়ণ। প্রতি সন্ধ্যায় বাড়িতে ভাগবত গীতা পাঠের আসর করতেন। সেসব আসরে এলাকার অনেকেই আসতেন। আমিও আমার নতুন মায়ের সঙ্গে গীতাপাঠ শুনতে যেতাম। বাবা কখনও যেতেন না। তিনি বাড়িতে নিজেই একা একা কখনো কখনো গীতাপাঠ করতেন। দেশের সম্পদ ভারতে পাচার করার অপরাধ মোচনের জন্যই কিনা জানি না, তিনি প্রায় বাড়িতে মহোৎসবের আয়োজন করতেন। সেইসব মহোৎসবে প্রচুর লোকসমাগম হতো। শত শত লোক মহাপ্রভুর প্রসাদ পেত। অষ্টপ্রহরব্যাপী হরিণাম চলত গীতাপাঠের পাশাপাশি। হ্যাজাক-লাইটের আলোয় সারা বাড়ি ঝলমল করত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার ভালো লাগত দুপুরের সেই মহাভোজ উৎসবটি। কলার পাতা বিছিয়ে শত শত লোক বসে যেত লাবড়া-খিচুড়ির আশায়। আমাদের গ্রামের নিম্নবর্গীয় হদী সম্প্রদায়ের সবাই ছিল মহাপ্রভু ভক্ত। এরা প্রসাদ মুখে তোলার আগে মহাপ্রভুর নামে একটা লাচাড়ি কাটত। একজন উচ্চকণ্ঠে সুর করে বলত :

'ডাইল খাইলাম খিচুড়ি খাইলাম
আরও খাইলাম ভাজি—
মহাপ্রভুর প্রসাদ খাইয়া
মন করলাম রাজি।'

সমস্বরে সবাই তখন বলত :

'হরি বোল, হরি বোল।'

ঐ গণভোজে আমাদের অংশগ্রহণ করতে দেয়া হতো না। এলাকার ভদ্রলোকের জন্য ভেতর বাড়িতে পৃথক বন্দোবস্ত থাকত। কিন্তু সেখানে ঐ লাচাড়ি পাঠের ব্যবস্থা ছিল না। এলাকার নিম্নবর্ণের হিন্দুদের সঙ্গে মিলে লাচাড়ি পাঠে অংশ নেয়ার জন্যই আমি কলার পাতা বিছিয়ে হদীদের ভিতরে চুপ করে বসে যেতাম। আমাকে তুলে আনার জন্য তখন চেষ্টা চলত, আমি কিছুতেই উঠতে রাজি হতাম না। আমার বিদ্রোহী আচরণে আমাকে হদী বলে ক্ষেপাত; কিন্তু আমার বাবা আমাকে কখনও এ নিয়ে বকাবকি করতেন না। তিনি আমার কাণ্ডকারখানা দেখে শুধু হাসতেন। আমি জানতাম, বাবা আমার পক্ষেই আছেন।

কাউকে না জানিয়ে, একদিন হঠাৎ করেই সাধু জ্যাঠামশাই ভারতে চলে যান। তাঁর দেশত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই মহোৎসব ও মহোৎসবের আসরে লাচাড়ি পাঠের ব্যাপারটা বন্ধ হয়ে যায়। সাধু জ্যাঠামশাই চলে যাবার পর আমাদের গ্রামে আর কখনও মহোৎসব হয়নি।

আমার লেখাপড়ার হাতেখড়ি হয় আমার নতুন মায়ের হাতে। আমার এই মা আমার ঐ মায়ের মতো এতটাই শিক্ষিত ও সংস্কৃতিবান পরিবার থেকে আসেননি, কিন্তু পড়াশোনার ব্যাপারে তিনি ছিলেন দারুণ উৎসাহী। শুধু স্নেহ দিয়ে নয়, প্রয়োজনীয় শাসনের মাধ্যমে সন্তানদের শিক্ষিত করার নীতিই তিনি গ্রহণ করেছিলেন। আমাদের জন্য তাঁর এই নীতিটা শেষবিচারে খুবই কাজের হয়েছিল। তাঁর শাসনটা যে স্নেহ বা বাৎসল্যের অভাবহেতু— তা আমাদের কখনোই মনে হতো না। মায়ের আগ্রহে এবং কিছুটা নিজের মেধা ও স্মৃতিশক্তির জোরে অল্পদিনের মধ্যেই আমি বাংলা ও ইংরেজি বর্ণমালাগুলো শিখে ফেলি। আমাদের বাড়ির সামনের স্কুলটি ঝড়ে ভেঙে পড়েছিল। বেশ ক'বছর ধরেই ওটা ভাঙা-অবস্থায় মাটিতে মুখথুবড়ে পড়েছিল। ওটাকে পুনরায় দাঁড় করিয়ে চালু করার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্যাপারে কেউই কোনো উদ্যোগ নিচ্ছিল না। আমরা ওটাকে খেলাঘরের মতো ব্যবহার করতাম। গ্রামে তো শহরের মতো পার্ক নেই— ওখানে ছোটদের পিছল খাওয়ারও ব্যবস্থা নেই, কিন্তু গ্রামের ছেলে-মেয়েরাও পিছল খেতে ভালবাসে। পরিত্যক্ত স্কুলঘরটি আমাদের সেই অভাব পূরণ করে দিয়েছিল। আমরা হামাগুড়ি দিয়ে ঐ স্কুলের টুই পর্যন্ত উঠে যেতাম এবং টুই থেকে পিছল খেয়ে সবুজ ঘাসের মধ্যে নেমে আসতাম। নাটবল্টুর ঘষা লেগে পশ্চাৎদেশে যে ব্যথাটা পেতাম, আনন্দের আতিশয্যে তা ভুলে যেতে মোটেও সময় লাগত না।

এ স্কুলটি দীর্ঘদিন অকেজো অবস্থায় পড়ে থাকার কারণে আমার প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর পড়াটা আমাকে বাড়িতে মা-বাবার কাছেই শিখতে হয়। মা আমাকে রীতিমতো পাঁচালি পাঠের যোগ্য করে তোলেন। এত অল্প বয়সে আমাদের ভাই-বোনদের আর কেউই লক্ষ্মীর পাঁচালি পাঠ করতে পারত না। প্রধানত আমার নতুন মায়ের আগ্রহেই পরে আমাকে বারহাট্টা স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীতে ভর্তি করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। আমাদের গ্রামের বড় ভাইরা তখন ঐ স্কুলে পড়তেন। ছোটদের বাড়িতে পড়ারই নিয়ম ছিল। বারহাট্টার ঐ উচ্চ বিদ্যালয়টি কালিকার গুণরা স্থাপন করেছিলেন। স্কুলটির পুরো নাম সিকেপি ইন্সটিটিউশন— করোনেশন কৃষ্ণপ্রসাদ ইন্সটিটিউশন। স্কুলের নামকরণের মধ্যে ইংল্যান্ডের রাজতন্ত্রের প্রতি আনুগত্য প্রকাশিত হয়েছে। কৃষ্ণপ্রসাদ ছিলেন কালিকার মোহিনী গুণের পিতা।

অনেকটা জায়গা জুড়ে কম্পাউন্ড। উত্তর-দক্ষিণে লম্বালম্বি পাকা ভিটির ওপর দুটো লালরঙের টিনের ঘর, ভেতরে লোহার স্ট্রাকচার। পশ্চিমের ভবনটি ছিল প্রাইমারি এবং পূর্বের ভবনটি ছিল সিক্স থেকে টেন পর্যন্ত— হাইস্কুল ভবন। প্রতিটি ভবন টিনের পার্টিশান দিয়ে শ্রেণীতে শ্রেণীতে ভাগ করা ছিল। প্রতিটি শ্রেণীকক্ষে ছাত্রদের বসার জন্য ছিল কাঠের বেঞ্চ এবং দেয়ালে ছিল প্রকাণ্ড কালো ব্লাকবোর্ড টানানো; শিক্ষকদের বসার জন্য ছিল একটি চকি, তার ওপর চেয়ার এবং টেবিল। টিচার্স রুম, স্কুলের লাইব্রেরী এবং প্রধান শিক্ষকের কার্যালয় নিয়ে একটি পৃথক পাকা দালান ছিল স্কুলের দক্ষিণ সীমানায়। ঐ ভবনের লাগোয়া একটি ছোট পুকুর। আমাদের মুসলমান স্যাররা ঐ পুকুরের জল দিয়ে নামাজের সময় অজু করতেন। পরে একসময়ে স্কুলের ভেতরে একটি টিউবঅয়েল বসানো হয়। স্কুলের ভেতরের কম্পাউন্ডটাই ছিল একটা ফুটবলের মাঠ হবার যোগ্য—কিন্তু ঐ কম্পাউন্ডটাকে ফুটবল মাঠ হিসেবে ব্যবহার করা হতো না, পাশেই আমাদের একটা প্রকাণ্ড খেলার মাঠ ছিল। কম্পাউন্ডের ভেতরে ভলিবল, ব্যাডমিন্টন, রিং খেলা এবং দাড়িয়াবান্দা খেলার ব্যবস্থা করা হতো। টিফিন পিরিয়ডে এবং শীতের দিনে স্কুলের ছুটির পর ভলিবল, ব্যাডমিন্টন ইত্যাদি খেলা হতো। বড় মাঠে হতো ফুটবল এবং ক্রিকেট খেলা। এমন চমৎকার একটি স্কুলে ভর্তি হতে কে না গর্ব বোধ করে!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রকাণ্ড আকৃতির চারটি রেইনট্রি গাছ ভবন দুটোর ওপর স্নিগ্ধ ছায়া দিত এবং বৃষ্টির দিনে রেইনট্রির পাতা থেকে টিনের চালে জল পড়ত মিষ্টি সুরের তাল বাজিয়ে। চৈত্রের দুপুরে রেইনট্রি গাছের পাতার ওপর দিয়ে, শুকনো পাতায় মর্মরধ্বনি বাজিয়ে আমরা দল বেঁধে হাঁটতাম। হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষককে বলা হতো রেক্টর। রেক্টর সাহেবের নাম ছিল আবদুল হেকিম খান। একটু ছোটখাটো চেহারা, চমৎকার সুঠাম স্বাস্থ্য, মুখে মুঘল বাদশাহদের মতো ঘন পাকা চাপদাড়ি। সর্বদা মাথায় সাদা টুপি পরে থাকতেন। স্কুলের সামনের রাস্তার ওপারেই ছিল তাঁর বাসভবন। তিনি সবসময়, রোদ বা বৃষ্টি না থাকলেও ছাতা মাথায় দিয়ে স্কুলে আসতেন। শীতের দিনেও ব্যতিক্রম ছিল না। কৌতূহলী চোখে দূর থেকে আমি তাঁকে ভয়ে ভয়ে দেখতাম।

প্রাইমারী সেকশনের প্রধান শিক্ষক ছিলেন একজন হিন্দু। তাঁর নাম রাজেন্দ্র সরকার। বারহাট্টা থেকে সাত মাইল দূরে মোহনগঞ্জে ছিল তাঁর বাড়ি। ইচ্ছে করলে তিনি বারহাট্টায় বাড়ি ভাড়া করে থাকতে পারতেন—ওটাই স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু তিনি তা করতেন না। তিনি সাত মাইল দূরে থেকে নিয়মিত পদব্রজে স্কুলে যাতায়াত করতেন। দীর্ঘ দেহ ও চমৎকার স্বাস্থ্য ছিল তাঁর। তিনি আমার বাবার বন্ধু ছিলেন। বাবা যখন পঞ্জিকায় ভালো দিনক্ষণ দেখেশুনে আমাকে বারহাট্টা স্কুলে ভর্তি করাতে নিয়ে যান, তখন খুব অনিবার্যভাবেই ঐ রাজেন্দ্রবাবুর হাতে আমাকে সঁপে দেওয়া হয়।

ক্লাস শুরুর পূর্বেই রেজিস্ট্রার খাতায় আমার নাম উঠানো হয়। স্কুলে ভর্তি করে দিয়ে বাবা বাড়িতে চলে যান। আমি তখন অকূল সাগরে একা। ঢং ঢং করে ক্লাস শুরুর বেল পড়লে রাজেন্দ্র স্যার আমাকে সঙ্গে নিয়ে তৃতীয় শ্রেণীর জন্য নির্ধারিত কক্ষটিতে প্রবেশ করেন। তিনি আগে আগে হাঁটেন—আমি তাঁর পেছনে পেছনে যাই। ক্লাসের ছাত্রদের দিকে তাকিয়ে ভয়ে আমার বুক কবুতরের বুকের মতো কাঁপে। ছাত্ররাও ফ্যাল ফ্যাল করে আমার দিকে তাকায়। এ আবার কোন চিড়িয়া—এমন একটা ভাব তাদের চোখেমুখে ফুটে ওঠে। সে এক অতিশয় করুণ অভিজ্ঞতা। আমি আমার বাবার মুখটি স্মরণ করার চেষ্টা করে, বুকে সাহস সঞ্চয় করে ক্লাসের পেছনের দিকে, পশ্চিমের দিকে খোলা একটি জানালার পাশে রক্ষিত বেঞ্চে গিয়ে বসি। রাজেন্দ্র স্যার ছাত্রদের কৌতূহলী দৃষ্টিকে আমার ওপর থেকে সরিয়ে নেন ছাত্রদের হাজিরা খাতায়। নাম ডাকা শুরু হয়। স্যার একেক জনের নাম ডাকেন, ছেলেরা উপস্থিত বলে সাড়া দেয়। বুঝতে পারি, একটু পরেই আমার নামও এমনিভাবে ডাকা হবে। আমি সাহসে বুক বেঁধে সে ডাকে সাড়া দেবার জন্য প্রস্তুতি নিতে থাকি।

এমন সময় এমন একটি মজার ঘটনা ঘটে, যা আমার দৃষ্টিকে অলৌকিক যাদু বলে পশ্চিমের খোলা জানালা দিয়ে দৃশ্যমান রেলস্টেশনের দিকে চুম্বকের মতো টেনে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিয়ে যায়। মোহনগঞ্জগামী সকালের ট্রেনটি তখন সবেমাত্র স্টেশনে এসে থেমেছে। ক্লাসের বেঞ্চে বসে এমন চমৎকারভাবে ট্রেনটিকে দেখা যাবে—আমি ভাবতেও পারিনি। প্রকাণ্ড ইঞ্জিনের চোঙ দিয়ে তখন আকাশ কালো করে ভোঁস ভোঁস করে কালো ধোঁয়া নির্গত হচ্ছে। ইঞ্জিনের বিভিন্ন ছিদ্রপথ দিয়ে নির্গত হচ্ছে বাষ্প। মাথায় কালো কাপড়-বাঁধা একটা লোক ইঞ্জিনের চুল্লির ভিতরে একটা বিরাট আকৃতির হাতা দিয়ে কয়লা ঠেলে দিচ্ছে। আমার দৃষ্টির উল্টোদিকে আছে বলে আমি চুল্লিটা দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু কয়লা পেয়ে জ্বলে ওঠা চুল্লির ভিতরের অগ্নিকুণ্ডটি আমি কল্পনায় বেশ দেখতে পাচ্ছি। সামান্য একটু বিশ্রামের অবকাশ পেয়ে ড্রাইভার সাহেব তার উঁচু সিটে বসে সানন্দে সিগারেট ফুঁকছেন। ট্রেনযাত্রীরা কেউ কামরা থেকে নামছে, কেউ ভিড় ঠেলে কামরায় উঠছে। কেউবা জীবনপণ করে দৌড়াচ্ছে ট্রেন ধরতে। কী চমৎকার দৃশ্য! মন বলছে পালাই। ছুটে যাই ওখানে। একটিমাত্র ধানক্ষেত মাঝখানে। ওটা পেরুলেই স্টেশন। ওখানে পৌঁছাতে পারলে, চোখের আশ মিটিয়ে কত মজা করেই না দেখা যাবে ট্রেনটিকে—বিশেষ করে ইঞ্জিনের চালক ঐ রহস্যময় মানুষটিকে। বাড়ি আর ক্লাসের কথা ভেবে খারাপ হয়ে যাওয়া আমার মনটা মুহূর্তেই পাল্টে গেল। আনন্দ আর উত্তেজনায় আমার বুক কাঁপতে থাকল।

হঠাৎ স্বপ্নের ভেতরে আমি অনুভব করলাম আমার চুলের মুঠোতে একটি হাত। ঐ হাত আমার স্বপ্ন ভঙ্গ করে, চুলের মুঠো ধরে হ্যাঁচকা টানে আমাকে ক্লাসের মধ্যে দাঁড় করিয়ে দিল। স্টেশন ছেড়ে যাওয়া ইঞ্জিনের ঝক-ঝক শব্দটা অতিক্রম করে তখন আমার কানে এলো ছাত্রছাত্রীদের সম্মিলিত অট্টহাস্য। আমি প্রতিদিন চৌদ্দ মাইল হাঁটা, স্বাস্থ্যবান রাজেন্দ্র স্যারের বজ্রমুঠির ভেতরে নিজেকে ঝুলন্ত অবস্থায় আবিষ্কার করলাম। একটু আগে আমার বাবা যে আমাকে স্যারের হাতে যথার্থ অর্থেই সঁপে দিয়ে গেছেন, সে ব্যাপারে আমার আর একটুও সংশয় থাকল না। লজ্জায়-ব্যথায় আমার চোখে জল এসে গেল।

'মনটা কোথায়?'—রাজেন্দ্র স্যারের গম্ভীর প্রশ্ন।

আমার তখন সব মনে পড়ল। রাজেন্দ্র স্যার নাম ডাকছিলেন এবং ছাত্রছাত্রীরা তাঁর ডাকে 'উপস্থিত' বলে সাড়া দিচ্ছিল। ব্যাপারটাতে আমি বেশ মজাই পাচ্ছিলাম। আমিও উপস্থিত বলার জন্যই তৈরি হচ্ছিলাম মনে মনে। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য। তার চেয়ে অনেক বেশি মজার ব্যাপার হয়ে ট্রেনটা তখন কেন যে স্টেশনে এসে থামল। আমি স্যারের প্রশ্নের জবাবে কিছুই বলতে পারলাম না। মাথা নত করে চুপ করে থাকলাম। স্যার তাতে আরও ক্ষেপে গিয়ে আমাকে পুরো ক্লাসের সময়টা দু'হাতে দুই কান ধরে দাঁড়িয়ে থাকার নির্দেশ দিলেন।

আমার ইস্কুল জীবন শুরুর দিনটি যে এমন করুণ হবে, তা কে জানত?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যথাসময়ে আমার ঐ আত্মভোলা আচরণের কথা আমার বাবার কানে পৌঁছলে বাবা আমাকে আর কখনও পেছনের বেঞ্চে না বসে ক্লাসের ফার্স্ট বেঞ্চে বসবার নির্দেশ দেন। ওখানেই ভালো ছেলেদের বসার নিয়ম। আমি তাই করতে শুরু করলাম এবং অল্পদিনের মধ্যেই অনুভব করলাম, শিক্ষকদের নাকের ডগায় মাছির মতো লেগে থাকাটা মোটেও শোভন কাজ নয়। ভালো ছাত্রদের তা করা উচিত নয়। শিক্ষকদের কাছ থেকে যত দূরে থাকা যায়, ততই মঙ্গল। কিন্তু আমি চাইলে কী হবে! আমি যতই তাঁদের দৃষ্টির আড়ালে থাকার চেষ্টা করি ততই তাঁরা আমাকে খুঁজে বের করেন এবং সামনের বেঞ্চে নিয়ে আসেন। স্কুলের শিক্ষকরা আমার বাবার বন্ধুস্থানীয় ও পরিচিত হওয়ার কারণে আমার পুরো স্কুলজীবনটাই প্রবল অশান্তিতে কাটে। তাঁদের ফাঁকি দেওয়ার জন্য, বাধ্য হয়েই তখন আমাকে নিত্যনব কৌশলের সন্ধান করতে হয়। অচিরেই আমি সাফল্যের মুখ দেখতে পাই। চেষ্টা থাকলে উপায় হয়—কথাটা মিথ্যা নয়। ম্যালেরিয়া জ্বর এ ব্যাপারে আমাকে বেশ সাহায্য করেছিল।

আমি আমার বুকের মধ্যে দুলালীর জন্য গভীর কষ্ট বহন করে বেড়াতাম। আমার বাবা তা বুঝতে পারতেন। বাবা আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলতেন, 'দূর বোকা, তোর মা যেমন ফিরে এসেছে, ঠিক তেমনি দুলালীও আবার ফিরে আসবে।' আমার মায়ের ব্যাপারে বাবার কথা সত্য প্রমাণিত হওয়ার পর থেকে আমি বাবার কথা বিশ্বাস করতাম। কিছুদিন পর আমার নতুন মা যখন মামাবাড়ি থেকে ফিরে এলেন, তখন দেখলাম বাবার কথাই ঠিক, আমার মায়ের কোলে একটি ছোট্ট ফুটফুটে বোন। অনেকটা দুলালীর মতোই। কী সুন্দর পিটপিট করে তাকাচ্ছে আমার দিকে। বাবা ফিরে আসা দুলালীর নতুন নাম রাখলেন ঝিল্লি। রূপালি-সোনালি-ঝিল্লি। বাবা মিলিয়ে মিলিয়ে খুব সুন্দর নাম রাখতে পারতেন। ঝিল্লির পর আমাদের আর কোন বোন হয়নি। হলে, বাবা নির্ঘাৎ বিপদে পড়তেন। তখন দিল্লি বা বিল্লি নাম রাখা ছাড়া বাবার আর উপায় থাকত না।

রূপালি ও সোনালি— আমি যখন রাতে আমার এই দুই বড়-ছোট সহোদরার মাঝখানে শীতের রাতে লেপ টানাটানি করে ঘুমাতাম, তখন মনে হতো জন্মের আগে আমার মায়ের পেটের ভেতরেও আমি এদের মাঝখানে এভাবেই চাপা পড়ে ছিলাম।

দাদামণি বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ায় আমার অবস্থাটা দাঁড়াল, তিন বোনের মধ্যে এক ভাই। ৩ : ১। এমন চমৎকার বোন-ভাগ্য নিয়ে পৃথিবীতে জন্মেছিলাম বলেই বোধহয় ছোটবেলা থেকেই মেয়েদের প্রতি আমার অসম্ভব রকমের দুর্বলতা ছিল। এদের দ্রুত লম্বা হওয়া কালো লকলকে চুল, রক্তিম আভাযুক্ত টলটলে নরম গাল, হরিণের মতো টানা সুন্দর চোখ—এদের মিষ্টি কণ্ঠস্বর, চর্বিবহুল শুভ্র ত্বকের লাবণ্য—সব মিলিয়ে আমার মনে হতো, আহা এরা কী সুন্দর! আমি যদি এদের মতো হতে পারতাম? আসলে আমি আমার স্বাস্থ্য ও দৈহিক সৌন্দর্যের ব্যাপারে একধরনের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হীনম্মন্যতায় ভুগতাম। এমনিতেই আমি দেখতে সুন্দর ছিলাম না, আমার গাত্রবর্ণ ছিল বাকি সবার চাইতে কালো, স্বাস্থ্যও সকলের চেয়ে খারাপ। এর ওপর আবার প্রায়ই গায়ে খোস-পাঁচড়া হতো, নাক থেকে সর্দি ঝরতো নায়াগ্রার জলপ্রপাতের মতো। কোনো কারণেই আমাকে আকর্ষণীয় মনে হতো না। ফলে নিজেকে বোনদের কাছে আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য আমি নতুন পথের সন্ধান করতে থাকি।

মুখে মুখে ছড়া বানাই। বোনদের নিয়ে রাজা-উজির মারা গালগপ্পের আসর বসাই। এসবের পাশাপাশি বিভিন্ন মৌসুমী ফল এনে বোনদের মধ্যে বিতরণ করি, অনেকটা রাষ্ট্রপতির রিলিফ বিতরণের মতো। কোথাও একটু বিশেষ কৃতীর পরিচয় না দিতে পারলে যে বিশিষ্টতা অর্জন করা সম্ভব নয়, তা আমি খুব ছোটবেলা থেকেই বুঝতে শুরু করি। পাতলা দেহের সুবিধাটুকু কাজে লাগিয়ে আমি আম, জাম, লিচু এবং কুলের সময় কুলগাছের এমনসব অগম্য ডালে পৌঁছে যেতে শুরু করি, যা আমার অন্য ভাইয়েরা ভাবতেও পারত না। মেয়েরা ফল খুব ভালোবাসে, কিন্তু ফল সংগ্রহের ব্যাপারে প্রাকৃতিকভাবেই এরা ছেলেদের ওপর নির্ভরশীল— সেই নির্ভরশীলতাকে পুঁজি করে আমি বোনদের ওপর প্রবল দাপটে আমার আধিপত্যবাদী স্বপ্নকে চরিতার্থ করতে শুরু করি। আমি আমগাছের সবচেয়ে পাকা আমগুলো লিচুগাছের সবচেয়ে পাকা লিচুগুলো পাড়তে পারতাম। আসলে আমার বোধহয় ছোটবেলায় কোন ওজনই ছিল না। নিজের ও পরের মিলিয়ে আমার মোট বোনের সংখ্যা ছিল প্রায় এক ডজনের কাছাকাছি। আমার রাজত্বকালে এরা সবাই আমার অনুগত ভক্তে পরিণত হয়েছিল। আমাকে নিয়ে তাদের এতই গর্ব ছিল যে, একটি বিশেষ প্রাণীর সঙ্গে আমাকে তুলনা করতেও তারা দ্বিধা করত না। ব্যঙ্গ করার জন্য নয়, আনন্দের আতিশয্যে, সিনসিয়ারলিই তারা কথাটা বলত। বাইরে একটু বিব্রত বোধ করলেও ভেতরে ভেতরে আমি পুলকই অনুভব করতাম। বানর প্রাণীটিকে আমার খুব আপনজন বলেই মনে হতো। আমার বড় বোন রূপালির সঙ্গে আমার একটা পৃথক সম্পর্ক ছিল। ছোটবেলায় হাম বসে গিয়ে সে প্রায় চিররুগ্ন হয়ে পড়েছিল। তাকে সুস্থ করে তোলার জন্য বাবা তার পেছনে প্রচুর অর্থ এবং শ্রম ব্যয় করতেন। প্রায়ই সে অসুখে শয্যাশায়ী থাকত। সে শ্বাসকষ্টে খুব ভুগত। বাবা তার শয্যাপাশে ঘন্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিতেন। রূপালির পেছনে বাবার এরূপ অর্থব্যয় এবং সময় নষ্ট করা নিয়ে আমার নতুন মায়ের সঙ্গে প্রায়ই বাবার মনোমালিন্য দেখা দিত। ছোট হলেও আমি বুঝতে পারতাম, রূপালিকে বাবা খুব ভালবাসতেন, কিন্তু মা বিরক্ত হন। আসলে রক্তের গলগ্রহ না হলে, অসুস্থ মানুষকে ভালবাসা বেশ কঠিন। রুগ্ন বলেই রূপালি পড়াশোনা করতে পারত না। বাবা বলতেন, 'ঠিক আছে, তোর পড়াশোনার দরকার নাই।' কিন্তু মা বাবার স্নেহের এই আদিখ্যেতা দেখে রাগ করতেন। মা তাকে পড়াশোনার জন্য চাপ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিতেন। আমার জেদী রুগন বোনটি মায়ের কথায় কর্ণপাত করত না, ফলে এক সময় মা তাকে প্রহার করতেন। আমি লুকিয়ে লুকিয়ে বিভিন্ন তাজা ফল পেড়ে এনে তাকে খেতে দিতাম। প্রায়ই শয্যাশায়ী থাকত বলে সে আমাদের দৌড়ঝাঁপের খেলাগুলোতে অংশগ্রহণ করতে পারত না। একটু দৌড়ঝাঁপ করলেই তার কাশি শুরু হয়ে যেত এবং একসময় কাশির সঙ্গে রক্ত বেরুত। তার অসুস্থতার কথা ভেবেই আমি তার সঙ্গে লুডু এবং কড়ি খেলতাম। ছেলে না হওয়ার জন্যই যে রুপু দাদামণির পথ অনুসরণ করতে পারেনি, তার বক্ষচাপ, ক্ষোভ থেকে আমি তা বেশ বুঝতে পারতাম। তার শারীরিক অসুস্থতার কারণে আমাদের অনেক আনন্দই মাটি হয়ে যেত। একবার রোগশোকে কাতর হয়ে, মনের দুঃখে আত্মহত্যা করবার চেষ্টা করে সে ব্যর্থ হয়েছিল। রূপালির জন্য আমার খুব কষ্ট হতো। ভাই হয়ে বোনের কষ্ট দূর করতে না পারার কারণে আমার মন কেমন করত।

ফলের প্রতি আমার জন্মের দুর্বলতা। আমাদের বাড়িতে আম, জাম, কাঁঠাল, লিচু, এইসব ফলের গাছ ছিল, কিন্তু আমাদের ভাই-বোনদের সংখ্যা ক্রমাগত বেড়ে যাওয়ার ফলে আমাদের সকলের চাহিদা পূরণ হতো না। নজরুলের 'লিচু চোর' কবিতাটি আমার ফল-সমস্যার সহজ সমাধান এনে দিলো। আমার মনে হলো নজরুল নিশ্চয়ই ছোটবেলায় লিচু চুরি করতেন, আর ফল চুরি করাটা এমন কিছু দোষেরও নয়; লক্ষ্মীপূর্ণিমার রাতে ফল চুরি করার ব্যাপারে একধরনের ধর্মীয় স্বীকৃতি ছিল। আমাদের গ্রামাঞ্চলে ঐ পূর্ণিমার রাতে আমরা সমবয়সী ভাই-বন্ধুরা মিলে বিভিন্ন বাড়ি থেকে নারকেল, আম, জাম্বুরা ইত্যাদি চুরি করতাম। এই বদঅভ্যাসটা লক্ষ্মীপূর্ণিমা চলে যাবার পরও থেকে যেত।

AMARBOI.COM

আজকের মতো গ্রামের মানুষ তখন গাছের ফল চোখে চোখে পাহারা দিয়ে রাখত না, ফলে ফল চুরি করাটা তুলনামূলকভাবে সহজও ছিল। তা ছাড়া গুণ বংশের ছেলেরা যে পথ দিয়ে যাতায়াত করে সেই পথের পাশের বাড়িঘরের লোকজনরা ভাবতেও পারত না যে, ঐ বংশে আমার মতো একজন পাকা ফল চোরের আবির্ভাব ঘটেছে। বারঘর, গুহিয়ালা, গরমা— এইসব গ্রামের খুব কম আম-কাঁঠালের গাছই আছে, যে-গাছের আম-কাঁঠাল-লিচু আমি পরখ করে দেখিনি। কাঁঠালের কষ হাত থেকে তুলে ফেলবার জন্য আমি পকেটে সরিষার তেল রাখতাম, আর কাঁচা আম ছোলার জন্য ছিল ঝিনুকের চাকু। গাছের পাতার আড়ালে দ্রুত আত্মগোপন করা এবং প্রয়োজনবোধে অনেক উঁচু থেকে মাটিতে লাফিয়ে পড়ে দৌড়ে পালাবার ব্যাপারে আমি এতটাই সিদ্ধিলাভ করেছিলাম যে, আমাকে হাতেনাতে ধরে ফেলাটা খুবই দুরূহ ব্যাপার ছিল। চৌর্যবৃত্তির আশ্রয় না নিলে আমি শৈশবে যে পরিমাণ ফল-ফলাদি ভক্ষণ করেছি, তার এক শতাংশও আমার কপালে জুটত কিনা সন্দেহ। ঈশ্বরের কৃপায় শৈশবে আমাকে ফলের কষ্ট ভোগ করতে হয়নি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাবা যখন রবীন্দ্রনাথের 'দুই বিঘা জমি' কবিতাটি আমাদের আবৃত্তি করে শোনাতেন তখন উপেনের জন্য আমার খুব মন খারাপ হতো। বেচারা নিজের গাছের দুটো আম পর্যন্ত খেতে পারল না। কী অন্যায়! উপেন চুরি করলেই পারত আমার মতো। বাড়িতে আমার একটি বাফার স্টক ছিল ফলের। বলা বাহুল্য, তার পুরোটাই ছিল বিভিন্ন জনের গাছ থেকে গোপনে সংগ্রহ করা। গাছ থেকে নিজের হাতে পেড়ে পাকা আম খাওয়ার অভিজ্ঞতাই আলাদা— এই অভিজ্ঞতা যাদের নেই, আমের প্রকৃত স্বাদ তাদের কখনই জানার কথা নয়। শহরের বাজার থেকে কেনা আম-কাঁঠাল-লিচু-নারকেল আমার কাছে নকল বস্তু বলেই মনে হয়। এগুলোর সেই স্বাদ কোথায়? সদ্যপাড়া পাকা ফলের স্বাদই পৃথক, এর কোনো বিকল্প হয় না।

আমাদের ড্রিল মাস্টার ছিলেন নজর আলী স্যার। তিনি আমাদের বাংলাও পড়াতেন। তাঁর হাতের লেখা ছিল চমৎকার। তাঁর উৎসাহেই সুন্দর হস্তাক্ষরের প্রতি আমাদের আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। ক্লাস শুরু হওয়ার পূর্বে আমরা শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়ে সবাই স্কুলের ভেতরের মাঠটিতে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াতাম। পাকিস্তানের চাঁদতারাখচিত সাদা সবুজ নিশানটি আমাদের সামনে পতপত করে উড়ত। কিছুক্ষণ ড্রিল করার পর শুরু হয় জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া। নজর আলী স্যারের সঙ্গে গলা মিলিয়ে আমরা সমস্বরে গাইতাম :

'পাক সারজমিন সাদ বাদ,
কিশওয়ারে হাসিন সাদবাদ।
তু নিশান আজমে আলীশান,
আরজে পাকিস্তান।'

কথাগুলোর অর্থ আমাদের বোধগম্য হতো না, কিন্তু সুরটা বেশ ভালো লাগত। ঢাকায় ভাষা-আন্দোলন হয়ে গেছে, কিন্তু মফস্বলের এই স্কুলটিতে তখনো সে সংবাদ পৌঁছায়নি। বাষট্টিতে মেট্রিক পাস করে, কলেজে ভর্তি হওয়ার আগে ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে কোনো কিছু শুনেছি বলে আমার মনে পড়ে না। প্রাইমারী স্কুলে তখন উর্দু ছিল বাধ্যতামূলক। খালেক মৌলবী স্যার আমাদের উর্দু পড়াতেন। বাংলা, ইংরেজি, উর্দু—এই তিন ভাষার অত্যাচারে আমাদের জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। উর্দু পড়া না পারার জন্য একদিন খালেক মৌলবী স্যার আমাকে খুব নির্দয়ভাবে প্রহার করেন। তাঁর বেত্রাঘাতে আমার পায়ে দাগ পড়ে গিয়েছিল। উর্দুর প্রতি আমার কোনো বিদ্বেষ ছিল না। খালেক স্যারকে আমি বেশ পছন্দই করতাম। বাঙালি ছেলেমেয়েদের ওপর উর্দু চাপিয়ে দেয়ার বিরুদ্ধে দেশে যে তখন একটা ভাষা আন্দোলন চলছিল, তা আমার জানবার কথা নয়, কিন্তু খালেক মৌলবী স্যার তা জানতেন এবং তিনি ছিলেন ভাষা-আন্দোলনের বিরুদ্ধে। ফলে বাংলা এবং ইংরেজি না পারার মতো উর্দু না পারার ব্যাপারটিকে তিনি সহজভাবে নিতে পারেননি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিশোরগঞ্জের নেজা-ই-ইসলামী পার্টির নেতা মৌলানা আতাহার আলী খান সাহেব একবার বারহাট্টায় জনসভা করতে এসেছিলেন। খালেক মৌলবী স্যার স্কুলের ছাত্রদের নিয়ে মিছিল করে ইস্টিশনে গিয়েছিলেন তাঁকে আনতে; তাঁকে বীরোচিত সংবর্ধনা জানাতে। আমিও সেই মিছিলে ছিলাম। ওটাই ছিল আমার কোনো মিছিলে প্রথম অংশ নেয়া। 'নারায়ে তকবীর—আল্লাহু আকবার' 'পাকিস্তান-জিন্দাবাদ' 'আতাহার আলী-জিন্দাবাদ' ইত্যাকার ধ্বনিতে বারহাট্টার আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত করে মিছিল করে শহর প্রদক্ষিণ করার স্মৃতি আমার মনে উজ্জ্বল হয়ে আছে। বিশেষ করে 'নারায়ে তকবীর-আল্লাহু আকবর' কথাটার মধ্যে যে ছন্দোধ্বনির চাতুর্য আছে তা আমাকে খুবই মুগ্ধ করেছিল। আমি বাড়িতেও এই স্লোগানটি একা একাই দিতাম। খালেক স্যারের নেতৃত্বে আমি ইসলামী আন্দোলনে অংশ নিচ্ছি, সে রকম কথা তখন আমাকে কেউ বলেনি, আমারও মনে হয়নি।

মিলাদুন্নবী উপলক্ষে স্কুলে হযরত মুহাম্মদ (সঃ)-এর ওপর রচনা প্রতিযোগিতা হতো। আমি একবার ঐ রচনা-প্রতিযোগিতায় অংশ নিই। আমার হাতের লেখা খুব সুন্দর ছিল। বিভিন্ন রচনা পাঠ করে আমি বেশ যত্ন-সহকারে মুহম্মদ (সঃ) সম্পর্কে আমার রচনাটি তৈরি করি। কী আশ্চর্য, আমার রচনাটিই বিচারকদের বিচারে প্রথম স্থান লাভ করে। আমাকে একটি হালকা সবুজ রঙের চায়নিজ কলম উপহার দেয়া হয়। রচনাটি কোনো হিন্দু ছাত্রের লেখা—এই বিবেচনায় বিচারকরা আমাকে সেদিন বেশি নম্বর দিয়েছিলেন—এমন হীন ভাবনা আমারও মনে আসেনি, অন্য কেউ আমাকে এমন কথা বলেননি।

AMARBOI.COM

আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের মধ্যে মতি, হেলাল, হাশিম, ওয়াহেদ, হোসেন আলী—এরা সবাই ছিল মুসলমান। ওরা প্রায়ই আমাদের বাড়িতে আসত। বাবা এদের পুত্রবৎ স্নেহ করতেন। তবে ঝগড়ার সময় ওরা আমাদের 'মালাউন' বলে গাল দিত, আমরাও উল্টো ওদের 'গরুখাউরা' বলে গাল দিতাম। ছোটদের ঝগড়ায় বড়রা নাক গলাতেন না। পরস্পরকে গাল দেবার স্বাধীনতাটা তখনও আমাদের পুরোপুরি ছিল। ভালোবাসার মতো ঘৃণা প্রকাশেরও স্বাধীনতা থাকা চাই। তা না থাকলে ভালোবাসা যে কতটা মেকি হয়ে যায়, পরবর্তী জীবনে তা আমি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছি।

আমার দাদামণি বড়দার সঙ্গে কিছুদিন কিশোরগঞ্জে কাটাবার পর হঠাৎ একদিন পালিয়ে ভারতে চলে যান। কলকাতায় আমার ছোটমামা থাকেন, তাঁর ওখানেই গিয়ে ওঠে। দীর্ঘদিন দুশ্চিন্তায় থাকার পর, ছোটমামার পত্রে বাবা দাদামণির সংবাদ পেয়ে কিছুটা চিন্তামুক্ত হন। মাতৃহীন বড় পুত্রের প্রতি বাবার স্বাভাবিক দুর্বলতা ছিল। পুনরায় বিয়ে করার কারণে ঐ দুর্বলতার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল একধরনের অপরাধবোধ। দাদামণি সর্বদাই নিজেকে সংসার থেকে বিতাড়িত বলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মনে করতেন এবং বাবার স্নেহকে সন্দেহের চোখে দেখতেন। ফলে বাবা ও আমাদের সঙ্গে দাদামণির দূরত্ব ক্রমশ বাড়তে থাকে।

ভারতে যাতায়াতের জন্য তখন সবে পাসপোর্ট চালু হয়েছে। দাদামণির পাসপোর্ট ছিল না। আমাদের এক জ্ঞাতি-বোন, লীলাদির বিয়ে হয়েছিল গারো পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত বাঘরা নামক একটি গ্রামে। ঐ গ্রাম থেকে সীমান্তের দূরত্ব ছিল মাত্র কয়েক মাইল। আমাদের ভগ্নিপতি শ্রী সতীশ সরকার মহাশয় ছিলেন ঐ এলাকার একজন প্রতিপত্তিশীল ধনী জোতদার। তাঁর সাহায্যেই দাদামণি মেঘালয় সীমান্ত দিয়ে আসাম হয়ে কলকাতা যাতায়াত করার একটি সহজ পথ আবিষ্কার করেন। পাকিস্তান ও ভারতের সীমান্তরক্ষীদের মধ্যে তখন একটা লিখিত ভদ্রলোকের চুক্তি ছিল; এরা মাথাপিছু দশ-বিশ টাকার বিনিময়ে লোকজনদের সীমান্ত পার করে দিত।

পূর্ব-পাকিস্তান থেকে ভারতে চলে যাওয়া উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের জন্য তখন ভারত সরকার সুযোগসুবিধা দিচ্ছিল। বিধান রায় তখন পশ্চিম-বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। দাদামণি একদিন বিধান রায়ের সাথে দেখা করেন এবং অজানা কারণে তাঁর অতৃপ্ত অপত্যস্নেহের কৃপাদৃষ্টি লাভে সমর্থ হন। কলকাতা থেকে গ্রামে ফিরে এসে দাদামণি যখন বাবার সঙ্গে বিধান রায়ের কৃপালাভের গল্পটি বলতেন, বাবার মুখটি স্নিগ্ধ প্রশান্তিতে ভরে যেত। দাদামণির মুখে বিধান রায়ের গল্প শুনতে শুনতে আমরা তাঁকে ভালোবেসে ফেলেছিলাম। বিধান রায়ের মতো ডাক্তার তখন ভূ-ভারতে দ্বিতীয় কেউ ছিল না।

দাদামণি আমাদের জন্য চকোলেট নিয়ে আসতেন। ঐ চকোলেটের গন্ধ এখনও আমার নাকে লেগে আছে। এক সময় আমার ধারণা ছিল বকুল এবং গন্ধরাজের গন্ধই বুঝি শ্রেষ্ঠ—চকোলেটের গন্ধের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার পর আমার সেই ধারণা পাল্টে যায়। আমরা মহানন্দে চকোলেট চুষতাম। দাদামণি আমাদের কৌতূহলী চোখের সামনে খুব পাতলা সাদা কাগজ দিয়ে বানানো সিগারেট খেতেন। ঐ সিগারেটের গন্ধকে তখন চকোলেটের গন্ধের চাইতেও মধুর মনে হতো। শুধু সিগারেট খাওয়ার স্বাধীনতা লাভের জন্য আমি তখন দাদামণির মতোই বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যাবার কথা ভাবতাম। কিন্তু সাহস পেতাম না। আমার দাদামণি ছিলেন অত্যন্ত স্বাস্থ্যবান, সাহসী এবং দুর্বিনীত প্রকৃতির— তার কথা আলাদা।

দাদামণি বাড়িতে এসে বেশিদিন থাকতেন না। বাবা যখন বাড়িতে থাকতেন না, সেই ফাঁকে তিনি ধান-পাট কম দামে বিক্রি করে দিতেন। মা ক্ষুব্ধ হলেও বেশি কিছু বলতে সাহস পেতেন না। বাবা বাড়ি ফিরে এলে নালিশ করতেন। বাবা না শোনার ভান করতেন। কিছুদিন বাড়িতে কাটিয়ে, ইচ্ছেমতো দু'হাতে টাকা উড়িয়ে যাবার সময় বাবার কাছ থেকে কিছু টাকা নিয়ে কলম্বাসের মতো তাঁর নবআবিষ্কৃত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পথে আসাম হয়ে কলকাতা ফিরে যেতেন। যাবার আগে আমার বাবা এবং কাকাকে পরামর্শ দিতেন ভারতে চলে যাবার জন্য। সেখানে পূর্ববঙ্গ থেকে চলে যাওয়া উদ্বাস্তুদের কী কী সুবিধা দেয়া হচ্ছে, তার একটা লোভনীয় চিত্র তুলে ধরতেন, যাতে তাঁরা ভারতে যেতে রাজি হন। দাদামণি যে সেখানে খুব একা বোধ করতেন, তা বলাই বাহুল্য।

কিন্তু ঐ নিঃসঙ্গতার দিকটা তখন আমাদের চোখে পড়ত না। কলকাতার মতো বিরাট ও বিখ্যাত শহর থেকে আমাদের মতো অজ গ্রামে ফিরে আসা দাদামণিকে আমরা রূপকথার রাজপুত্র বলেই ভাবতাম। দাদামণিকে খুশি করার জন্য বাবা ভারতে চলে যাবার বিষয়টি নিয়ে গুরুত্বের সঙ্গে আলোচনা করতেন, কিন্তু দাদামণি চলে যাবার পর বাবার দেশত্যাগের উৎসাহে ভাটা পড়ত।

বিধান রায়ের জন্য দাদামণি বাজার থেকে শুঁটকি মাছ কিনতেন। ময়মনসিংহের শুঁটকি মাছ নাকি বিধান রায়ের খুব পছন্দ। সেই শুঁটকি মাছ কতটা বিধান রায়ের পাকঘর পর্যন্ত পৌঁছাত তা জানার সুযোগ ছিল না। তবে শুঁটকি মাছের ঝোল দিয়ে ডাইনিং টেবিলে বসে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বিশ্ববিখ্যাত ডাক্তার বিধান রায় পরম তৃপ্তিতে ভাত খাচ্ছেন, এ রকম একটা দৃশ্য কল্পনা করে আমি খুব রোমাঞ্চিত এবং গর্বিত বোধ করতাম। পিতৃমাতৃস্নেহ থেকে বঞ্চিত দেশত্যাগী পুত্রের ওপর বিধান রায়ের মতো মানুষের কৃপাদৃষ্টি পড়েছে, এই ভেবে বাবাও এক ধরনের স্বস্তি বোধ করতেন।

[এই গ্রন্থ প্রকাশিত হওয়ার পর আমার দাদামণি ঘটনাটি সংশোধন করে দিয়ে বলেছেন শুঁটকি মাছ তিনি ডাক্তার বিধান রায়ের জন্য নয়, তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারির জন্য সংগ্রহ করতেন।]

ছোট মামার পত্রে ঘটনার আংশিক সত্যতা প্রমাণিত হওয়ার পর দাদামণিকে নিয়ে বাবার দুশ্চিন্তার অনেকটাই অবসান ঘটে। পরে বিধান রায়ের সুপারিশেই নির্মাণাধীন দুর্গাপুর প্রোজেক্টস লিমিটেডে দাদামণি একটি চাকরি লাভ করে, যা তার পক্ষে স্বাভাবিকভাবে পাওয়া অসম্ভব হতো। সেই চাকরির সূত্রে তিনি একটি কোয়ার্টারও লাভ করেন। পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তু পুনর্বাসনে বা পশ্চিমবঙ্গের উন্নতির পেছনে বিধান রায়ের অসামান্য অবদান রয়েছে, কিন্তু সেজন্য নয়—আমার দাদামণির প্রতি প্রদর্শিত অনুগ্রহের কারণেই বিধান রায় আমাদের পরিবারের সকল সদস্যের কাছেই প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তিত্বে পরিণত হন এবং তাঁর মৃত্যুতে দুঃখ পাওয়ার সঙ্গত কারণ সৃষ্টি হয়। এই পৃথিবীতে কে যে কখন কার কাজে লাগে, তা বলা খুবই কঠিন। বিধান রায় কি ভাবতে পেরেছিলেন, অজস্র স্মরণীয় অবদানে সমৃদ্ধ তাঁর জীবনের সঙ্গে এ রকমের একটি তুচ্ছ ঘটনার কথা পূর্ব-বাংলার একজন কবির ছেলেবেলায় একদিন এইভাবে লিপিবদ্ধ হবে? না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এলাকার হিন্দুদের মধ্যে দেশ ছেড়ে ভারতে চলে যাবার প্রস্তুতি চলছিল। সবাই সেই প্রস্তুতিপর্বটা যথাসম্ভব গোপনে রাখার চেষ্টা করতেন। ডেমুরা এবং চাপারকোনা গ্রামে আমাদের কিছুসংখ্যক জেলে-প্রজা ছিল। এদের কৃপায় আমরা বড় বড় রুই কাতলা মাছ খেতে পারতাম। এরা হঠাৎ করে ভারতে চলে যাবার সিদ্ধান্ত নেয় এবং বাবার কাছে ভারতে যাবার মাইগ্রেশন ফরম পূরণ করিয়ে নেবার জন্য আসে। বিনিময় করার মতো ধনসম্পত্তি এদের ছিল না। দেশে মুসলমানদের অত্যাচারও ছিল না। কিন্তু ওরা যখন জানতে পারে যে মাইগ্রেশন করে ভারতে চলে গেলে ভারত সরকার তাদের বাড়ি জমি দেবে, তখন তারা ভারতে চলে গিয়ে ভারত সরকারের দেয়া সুযোগসুবিধা গ্রহণ করতে চায়। বাবা খুব চমৎকার হস্তাক্ষরে এদের মাইগ্রেশন ফরমগুলো যথাযথভাবে পূরণ করে দিতেন। ফলে দ্রুতই ওরা মাইগ্রেশন পেয়ে যেত। বিনিময়ে ওরা বাবাকে মাথাপিছু কিছু টাকা দিত। মনে পড়ে আমার হাতের লেখা ভালো ছিল বলে আমিও মাইগ্রেশন ফরম পূরণ করার কাজে বাবাকে যথাসম্ভব সাহায্য করতাম।

আমার বাবা ও কাকা আমাদের বাড়ি-জমি বিনিময় করার জন্য আসাম থেকে আসা মুসলমানদের সঙ্গে দরকষাকষি করতেন। তখন আসাম থেকে মুসলমানরা আমাদের এলাকায় সবে আসতে শুরু করেছে। আমাদের ইচ্ছে ছিল পশ্চিমবঙ্গের কোথাও সুযোগ পেলে তা গ্রহণ করার, আসামের প্রতি আমাদের আগ্রহ কম। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানরা এমনিতেই এ দেশে কম আসত। যারাও আসত তারাও আমাদের মতো গণ্ডগ্রাম পর্যন্ত আসতে আগ্রহ দেখাত না। যে দু'একজনের সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল, তাদের আগ্রহ ছিল আমাদের ময়মনসিংহ শহরের বাসা পর্যন্ত, গ্রামের বাড়িজমি নয়। অন্যদিকে আসাম থেকে যারা আসত তাদের ময়মনসিংহের বাড়ি বিনিময় করার মতো সঙ্গতি ছিল না। তারা ছিল তুলনামূলকভাবে গরিব। ফলে ব্যাটেবলে কিছুতেই হচ্ছিল না। চলে যাবার ইচ্ছে থাকলেও সুযোগের অভাবেই আমরা থেকে যাচ্ছিলাম। আসামের ডিব্রুগড়ে আমার নতুন মায়ের বড় বোন থাকতেন। আমাদের মেশোমশায়ের নাম ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত। তিনি বাবার কাছে চিঠি লিখতেন। তাঁর চিঠিতে আসামে বসবাসকারী বাঙালিদের সঙ্গে অসমিয়াদের সংঘর্ষের আশংকা ব্যক্ত হতো। তিনি বাবাকে প্রথম আসামে এসে পরে আসাম থেকে পশ্চিমবাংলায় যাবার সুযোগ গ্রহণ করার পরামর্শ দিয়ে চিঠি লিখতেন। দাদামণিও বাবাকে চিঠি লিখতেন চলে যাবার জন্য। আমাদের এলাকায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হতো না, কিন্তু দেশের কোথাও না কোথাও কিছু ঘটনা ঘটত। কলকাতার কাগজে সেসব সংবাদ ফলাও করে প্রকাশিত হতো। সেই সংবাদ পড়ে দাদামণি, মাসিমা ও ছোট মামা খুব বিচলিত হতেন। তারাও বাবাকে দেশত্যাগের ব্যাপারে বিলম্ব না করার পরামর্শ দিয়ে চিঠি লিখতেন। আমি খুবই ছোট,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেশত্যাগের ঠিক বাস্তব প্রয়োজনটা কোথায়, তা আমার বোধগম্য হতো না। কিন্তু আমি প্রায়ই দেখতাম—আকাশ থেকে খসে পড়া তারার মতো প্রায়ই আমাদের আশপাশের গ্রাম থেকে এক-একটি পরিবার রাতের অন্ধকারে হঠাৎ উধাও হয়ে যাচ্ছে। তাদের পরিত্যক্ত শূন্য ভিটের দিকে তাকিয়ে আমার বুকটা কান্নায় হু-হু করে উঠত। এদের মধ্যে আমার স্কুলের সহপাঠীরাও থাকত। স্কুলে গিয়ে জানতাম অরুণ আর স্কুলে আসবে না। ওরা ভারতে চলে গেছে। যাবার আগে একবার আমাকে বলেও যায়নি। কী নিষ্ঠুর!

পাশের বাড়ির ভানুদা, চিনিদা ওরা অবশ্য প্রকাশ্যেই গেলেন। কোনোরকম বিনিময় ছাড়া, বাড়ি-জমি ফেলে রেখেই ভারতে চলে গেলেন। তাঁদের দুই বোন, জ্যোতি এবং প্রীতি দাদাদের সঙ্গে চলে গেল। প্রীতি ছিল আমর বয়সী। আমার খেলার সাথী। জ্যোতিদি ছিলেন আমার খুব প্রিয়। আমাকে খুব স্নেহ করতেন। চলে যাবার সময় তাদের কী কান্না। যেন জন্মান্তরে যাত্রা। খুব প্রিয়জনের মৃত্যু ছাড়াও মানুষ যে এমন করুণ করে কাঁদতে পারে, তা আমার জানা ছিল না। প্রতিটি ফলের গাছ, প্রতিটি প্রিয় ফুলের গাছ আঁকড়ে ধরে ওরা কাঁদল। কাঁদল পুকুরঘাটে দাঁড়িয়ে। কাঁদল বকুলগাছ আর তুলসীতলায় শেষবারের মতো প্রণাম করতে গিয়ে মাটির ওপর লুটিয়ে পড়ে। কাঁদল আমাকে বুকের ঠিক মাঝখানটায় জড়িয়ে ধরে। ঐ বেদনাবিধুর দৃশ্যটি আমার মনে এমন দাগ কেটেছিল যে, স্বর্গরাজ্যের হাতছানিতেও আমার মন গ্রামের বাড়ি ছেড়ে ভারতে যেতে রাজি ছিল না।

কিন্তু আমার কথার কী মূল্য আছে? বড়রা বাড়ি-জমি বিনিময়ের আলাপ চালিয়ে যেতেন আসাম থেকে সদ্য আসা রুস্তম আলী সরকারের সঙ্গে। আসাম থেকে আসা ঐ রুস্তম আলী লোকটাকে আমার বেশ ভালো লেগেছিল। তাঁকে দেখলেই আমার সোহরাব-রুস্তমের গল্পটা মনে পড়ত। তিনি কি ঐ গল্পের কেউ? তাঁর হাতে ছিল একটি চমৎকার রিস্টওয়াচ। নাম সায়মা। আমার আগ্রহ দেখে তিনি হাত থেকে খুলে ঐ দামি ঘড়িটা আমার হাতে পরিয়ে দিয়েছিলেন। আমাদের কারোরই হাতঘড়ি ছিল না। বাবার একটা পকেটঘড়ি ছিল, সেটি প্রায় ড্রয়ারের মধ্যেই থাকত এবং চলত না। একটা বড় দেয়ালঘড়ি ছিল, সেটি ছিল কাকার ঘরে। হাত দিয়ে ধরে সেটি আমার দেখার অধিকার ছিল না।

রুস্তম আলী সাহেব আমার সঙ্গেও কথা বলতেন। আমাদের পড়ার টুলের পাশে, একটা জলচৌকি টেনে নিয়ে তাতে আরাম করে বসে আমাদের আসামের গল্প শোনাতেন। আমরা কী পড়ছি তার খোঁজ-খবরও নিতেন। যদিও তিনি আসাম ছেড়ে পূর্ব-পাকিস্তান চলে আসবেন, তবু তাঁর মুখে আমরা শুনতাম আসামের প্রশংসা। তিনি বলতেন ওখানকার পড়াশোনার মান এখানকার চেয়ে উন্নত। বলতেন, আসামের রাস্তা-ঘাট, জল-হাওয়া, স্কুল-কলেজ সবই ভালো। শুধু হিন্দু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এবং অসমিয়াদের অত্যাচারের ভয়েই তিনি চলে আসতে বাধ্য হচ্ছেন। তিনি আসামের প্রতি আমাদের আগ্রহ বাড়াবার জন্যই হয়তো এগুলো বাড়িয়ে বলতেন। ইংরেজিজ্ঞান পরীক্ষা করার জন্য তিনি মাঝে মাঝে আমাদের ইংরেজিতে প্রশ্ন করতেন। ইংরেজিতেই ঐসব প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। কলিকাতা হুগলী নদীর তীরে অবস্থিত—এই তথ্য এবং ঐ বাক্যের ইংরেজি আমি তাঁর কাছেই শিখি। আমার সব ভাইবোনের মধ্যে আমিই যে পড়াশোনায় ভালো—তিনি তা আমার বাবাকে বলতেন। আমার ইংরেজি ভাষার প্রতি প্রীতি নির্মাণের ক্ষেত্রে রুস্তম আলী সরকার সাহেবের একটা প্রচ্ছন্ন ভূমিকা ছিল।

আমাদের সঙ্গে শেষপর্যন্ত বনিবনা না হলেও আমাদের গ্রামের গিরিশ সিংহের সঙ্গে তিনি তাঁর বাড়ি-জমি বিনিময় করতে সমর্থ হন। অল্পদিনের ব্যবধানেই তিনি আসামে চলে যান এবং দ্রুতই তাঁর দুই পত্নীর ছোটটিকে নিয়ে আমাদের গ্রামে ফিরে এসে গিরিশ সিংহের বাড়িতে দখল নেন। সঙ্গে দু'তিনটি ছেলেমেয়েও আসে। গিরিশ সিংহরা আসামে চলে যায়। কিছুদিনের মধ্যেই আসাম থেকে ক্রমান্বয়ে জামাল শেখ, রেজত আলী, টকুর বাপ, চিরু শেখ এবং রহম আলীরা আমাদের গ্রামে আসে। ক্রমশ আমাদের গ্রামে হিন্দুদের সংখ্যা হ্রাস পেতে থাকে। আমাদের আশপাশের হিন্দুপ্রধান গ্রামগুলোতেও মুসলমানদের আগমন ঘটতে থাকে। এতদিন আমাদের গ্রাম ও আশপাশের সাধুহাটি, বারঘর, আন্দাদিয়া, পরমা, যোগীশাসন গ্রামগুলো ছিল হিন্দুপ্রধান; দেখতে দেখতে তা মুসলমানপ্রধান এলাকাতে পরিণত হয়।

আমাদের দেশত্যাগের ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত আলাপ-আলোচনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। গ্রামে মুসলমানদের আগমন ঘটায় আমাদের জীবনের সঙ্গে নতুন বৈচিত্র্য এসে যুক্ত হয়। শুরু হয় মোরগের ডাকে ঘুম ভাঙার দিন। আমার গ্রামের দক্ষিণ পাড়ায় একটি মাটির ভিটি ও টিনের চালার মসজিদ তৈরি হয়। উলু এবং শঙ্খধ্বনির পাশাপাশি সকাল-সন্ধ্যা আজানের ধ্বনি ভেসে আসতে থাকে। রোজা এবং ইফতারের ব্যাপারটিকে আমরা এবার খুব কাছে থেকে দেখার সুযোগ পাই। টিপকলের জল নিতে মুসলমান মেয়েরাও আমাদের বাড়িতে আসতে শুরু করে। তারা মার সঙ্গে গল্প করে। ঠোঁট লাল করে মায়ের দেয়া পান-সুপারি খায়। আমি মায়ের পাশে বসে খুব কাছ থেকে তাদের দেখি। তাদের গল্প শুনি। তারাও খুব কৌতূহলের সঙ্গে আমাদের চালচলন লক্ষ করে। এদের মধ্যে কয়েকটি বেশ সুন্দরী মেয়ে ছিল। কালো নাকে রুপার নোলক দুলত। ঘোমটার আড়াল থেকে চৈত্রের দমকা হাওয়ায় যখন ওদের সুন্দর টলটলে মুখখানা পাতার আড়ালের ফলের মতো ফুটে বেরুত—আমি মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে থাকতাম—মনে হতো মুসলমান মেয়েদের কোথায়ও একটা পৃথক সৌন্দর্য আছে। ওরা সবাই ছিল আমার বড়—ওটাই আমার সুবিধে—মুখের দিকে হা করে তাকিয়ে থাকলেও ওরা শাড়ির

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আঁচল দিয়ে মুখ ঢেকে ফেলত না। ওরা যখন টিপকলে জল তুলত, জল পানের ছলে আমি গিয়ে কলের পাশে হাজির হতাম। তৃষ্ণায় আমার বুক ফেটে যায়। ওরা কলসি সরিয়ে আমাকে জলপানের সুযোগ দেয়। আমি কলের মুখ ডান হাতে চেপে ধরে তাতে মুখ লাগিয়ে ইচ্ছেমতো জলপান করে পেট ঢোল করি, আর জল পানের ফাঁকে আড়চোখে তাকিয়ে দেখি কালো মুখে সাদা নোলকের দুলুনি।

প্রত্যেক স্কুলেই দু'একজন আদু ভাই থাকে। আমাদের স্কুলেও ছিল। আমাদের আদু ভাইয়ের নাম ছিল রফিজ। বারহাট্টা রেলস্টেশনের পাশেই গোপালপুরে তাঁর বাড়ি। রেলস্টেশন পেরিয়েই আমরা প্রতিদিন স্কুলে যেতাম। প্লাটফরমে বিছানো পোড়া ময়লার গুঁড়ার ওপর দিয়ে হাঁটতে আমার খুব মজা লাগত। আমার মনে হতো বুঝি সদ্য-ভাজা কালো মুড়ি আমরা পায়ের তলায় মাড়িয়ে যাচ্ছি।

স্কুলে যাবার পথে প্রতিদিনই দেখতাম রফিজ একটি চায়ের স্টলে বসে আড্ডা দিচ্ছে। বয়সে সে আমার চেয়ে ঢের বড়। কিন্তু পড়াশোনায় সে ছিল একেবারে মহাখারাপ যাকে বলে। সে ছিল মায়াধারী মানুষ। এক একটি ক্লাসের মায়া ত্যাগ করতে তার বেশ কয়েক বছর লেগে যেত। আমি যখন তৃতীয় শ্রেণীতে স্কুলে ভর্তি হই তখন রফিজ সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র। আমি যখন পঞ্চম শ্রেণীতে উঠি রফিজ তখনও সপ্তম। আমরা তাকে ভয় করলেও শিক্ষকরা তাকে ভয় করতেন না। তাঁরা ছিলেন খুবই সাহসী। তাঁরা বলতেন, রফিজ নাকি একজন আদর্শ গর্দভ। পরীক্ষা করলে রফিজের মগজে গোবর পাওয়া যাবে। কিন্তু রফিজ বলত মিথ্যা কথা, সব মিথ্যা...আমাকে নিয়ে একটা গভীর ষড়যন্ত্র চলছে। আমি শিক্ষকদের কথা নয়, রফিজের কথাই বিশ্বাস করতাম। রফিজ ছিল খুব দুর্বিনীত ছাত্রনেতা। আমরা মনে মনে যাদের নাম নিতে সাহস করতাম না—রফিজ সেইসব শিক্ষকদের নাম ধরে অশ্লীল ভাষায় গালাগাল করত। একসময় রফিজের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যায়। আমাদের স্কুলের রেক্টর সাহেবকে পরিবর্তন করেই সে তাঁর ভাগ্য পরিবর্তন করার উদ্যোগ নেয়। একদিন স্কুলে যাবার পথে রেলস্টেশনের রফিজ আমাদের গতিরোধ করে এবং স্কুলে না গিয়ে তার সঙ্গে মোহনগঞ্জ যাবার নির্দেশ দেয়। রফিজের নির্দেশ অমান্য করার সাহস বা ইচ্ছা—কোনোটাই আমাদের ছিল না। রফিজের নেতৃত্বে ট্রেনে চড়ে যদি বিনা পয়সায় মোহনগঞ্জ ভ্রমণ করতে পারি, তাহলে আমাদের দীর্ঘদিনের একটা লালিত স্বপ্ন পূরণ হয়। আমি রফিজের নির্দেশে স্কুলে যাবার চিন্তা পরিত্যাগ করে স্টেশনে দাঁড়িয়ে গেলাম। একটু পরেই মোহনগঞ্জের ট্রেন আসবে। অনেকের সঙ্গে আমিও ঐ ট্রেনে চড়ব। কি মজা! কী উদ্দেশ্যে রফিজ আমাদের মোহনগঞ্জ নিয়ে যাচ্ছে—তা জানবার বাসনা একবার মনের মধ্যে উঁকি দিলেও তাকে জিজ্ঞেস করে কারণ জানার সাহস সঞ্চয় করতে পারিনি। রফিজের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মতো লোক যে আমাদের মতো চুনোপুঁটিদের তার কাছে যোগ্য বলে মেনেছে, তাতেই আমাদের আনন্দের অন্ত নেই। আমরা জানতাম, রেল ভ্রমণের জন্য টিকিট কাটার ব্যবস্থাটি অন্তত রফিজের বেলায় প্রযোজ্য নয়। রেললাইনটি বলতে গেলে রফিজের বাড়ির উঠোন দিয়েই গেছে। সেই রফিজ আমাদের নেতা। টিকিট আবার কাকে বলে? রেল-কোম্পানির গাড়িতে যে চড়েছি ওটাই রেলের ভাগ্য!

আমাদের দ্বিধা, আতঙ্ক ও অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে অল্পক্ষণের মধ্যেই ট্রেন এলো। রফিজ প্রায় ছাগলখেদা করে আমাদের একটি কামরায় তুলে দিল। ট্রেন আমাদের স্কুলের পাশ দিয়েই যায়। আমরা ক্লাসে বসে ঐ ট্রেন দেখি। আজ আমি ঐ ট্রেনের ভেতরে। স্কুল অতিক্রম করে যাবার সময় আমার বুক অজানা আশংকায় কাঁপে। স্কুলে আবার জানাজানি হয়ে যাবে না তো? রাজেন্দ্র স্যারের চেহারাটা মনে পড়ে। স্কুল থেকে আমাকে দেখা যাচ্ছে না তো? আনন্দে আর উত্তেজনায় কখন যে অতিথিপুর অতিক্রম করে গেছি, খেয়ালই করিনি। হঠাৎ দেখি ট্রেন মোহনগঞ্জে এসে গেছে। যাত্রীরা দ্রুত ট্রেন থেকে নেমে যাচ্ছে। এটাই এই লাইনের শেষ স্টেশন। আমরাও রফিজের নির্দেশে এবং যাত্রীদের ঠেলায় পড়ি-মরি করে কামরা থেকে, নির্ভুলভাবে বলতে গেলে, মাটিতে গড়িয়ে পড়লাম। বিরাট স্টেশন। বিরাট মানে বারহাট্টার চেয়ে বড় বলেই তা বিরাট। সিলেট জেলার পূর্বাঞ্চলের মানুষও এই ট্রেনেই যাতায়াত করে। ফলে স্টেশনে অনেক যাত্রী ফিরতি ট্রেনের অপেক্ষায় আছে। মোহনগঞ্জ মাছের জন্য বিখ্যাত। এখান থেকে মালগাড়ি বোঝাই করে মাছ পাঠানো হয় ঢাকা ও ময়মনসিংহে। রেললাইনের পাশেই মাছের বড় বড় আড়ত। সেখানে মাছ আর মাছ। এত মাছ আমি একসঙ্গে কখনও দেখিনি। উপরে নিচে বরফ-গুঁড়া দিয়ে ঢেকে মাছ ভরা হচ্ছে বেতের তৈরি টুকরিতে। মাছভর্তি বেতের টুকরিগুলো মোটা সুচ দিয়ে সেলাই করেছে শ্রমিকরা—একদল সেই টুকরিগুলো মাথায় করে বোঝাই করছে মালগাড়িতে। মালগাড়ির ভেতর থেকে বরফ গলে গলে চুইয়ে পড়ছে নিচে। ঐ মনোহর দৃশ্যটি বেশিক্ষণ দেখার অধিকার ছিল না আমাদের। রফিজ এসে আমাদের সবাইকে লাইন করে দাঁড়াবার নির্দেশ দিলেন। আমরা তার নির্দেশমতো অত্যন্ত সুশৃঙ্খলভাবে দুই লাইনে দাঁড়ালাম। তখন রফিজ আমাদের কয়েকটি স্লোগান শিখিয়ে দিলো।

'নারায়ে তকবীর, আল্লাহু আকবর' এবং 'পাকিস্তান-জিন্দাবাদ' এই দুটো স্লোগান আমি খালেক স্যারের কাছে আগেই শিখেছিলাম, কিন্তু পরের দুটো স্লোগান আমাদের কাছে ছিল একেবারেই অচেনা। নতুন স্লোগান দুটোর প্রথমটি হলো 'বারহাট্টা স্কুলের হেডমাস্টারের—পদত্যাগ চাই, পদত্যাগ চাই' দ্বিতীয়টি : 'দুর্নীতিবাজ আবদুল হেকিম—মুর্দাবাদ, মুর্দাবাদ'।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রফিজের নেতৃত্বে আমাদের দৃপ্ত মিছিল এগিয়ে চলল বাজারের দিকে। ঐদিন ছিল বুধবার। মোহনগঞ্জের সাপ্তাহিক বাজারের দিন। লোকে বাজার লোকারণ্য। ভিড় ঠেলে আমরা এগিয়ে চলেছি। আমাদের সম্মিলিত কণ্ঠের কোরাস-চিৎকারে মোহনগঞ্জের আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত হচ্ছে। আমরা সংখ্যায় পঁচিশ-তিরিশের মতো। রফিজ আমাদের নিয়ে বাজারের বিভিন্ন দোকানে ঢুকছে এবং লোকজনের কাছে তার আন্দোলনের কর্মসূচীটি ব্যাখ্যা করছে। শেষে বলছে আসল কথাটি, আন্দোলনের জন্য অর্থ সাহায্য চাই। হাটবার বলে ব্যবসায়ীরা খুব ব্যস্ত। রফিজের সঙ্গে তর্ক করে সময় নষ্ট না করে কিছু টাকা রফিজের হাতে গুঁজে দিয়েই তারা দোকানের সামনে দণ্ডায়মান ঝামেলাটিকে বিদায় করছিল। রফিজের পকেট ভরে উঠেছিল টাকায়। তার পরিতৃপ্ত মুখের দিকে তাকিয়ে আমরা বুঝতে পারছিলাম যে, আন্দোলনের আশু-লক্ষ্যটি সফল হচ্ছে। ঠিক এমন সময় ঘটল বিপদ। সব মানুষ একরকম হয় না। জনৈক বেয়াড়া টাইপের ব্যবসায়ী আমাদের নেতাকে ধরে ঘরের ভিতরে আটকে ফেলল। রফিজ যতই তার আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তার ব্যাখ্যা করে, ঐ ব্যবসায়ী ভদ্রলোক ততই রেগে যান। একপর্যায়ে তিনি তার দোকানের কর্মচারীদের নির্দেশ দেন লাঠিপেটা করে আমাদেরকে বাজার ছাড়া করতে এবং রফিজকে পুলিশের হাতে সোপর্দ করার জন্য একজনকে পাঠান থানায়। দোকানের কর্মচারীরা ছিল সত্যিকারের ডাঙ্গা প্রকৃতির। রফিজের প্রতি আমরা যতটা অনুগত ছিলাম, ঐ দোকানের কর্মচারীরা তাদের মালিকের প্রতি তার চেয়ে বেশি অনুগত ছিল। তারা আমাদের সত্যি সত্যিই লাঠি নিয়ে তাড়া করল। ছাত্র বলে আমাদের একটুও ভয় করল না। কী বিপদ! এরকম একটা পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য আমাদের কোনো প্রস্তুতি ছিল না। রফিজের কাছ থেকেও এ ব্যাপারে আমরা কোনো পূর্ব ধারণা পাইনি। ফলে মুহূর্তের মধ্যে আমাদের দৃপ্ত-মিছিল ভেঙে ছত্রখান হয়ে গেল। কথায় বলে জান বাঁচানো ফরজ। ঐ দোকানে আমাদের নেতাকে ফেলে রেখেই আমরা স্টেশনের উদ্দেশ্যে প্রাণপণ দৌড়াতে থাকলাম।

স্টেশনে পৌঁছে দেখি গাড়ি ছাড়ার উপক্রম হয়েছে। ট্রেন ফেল করলে রাতের ট্রেনে বাড়ি ফিরতে হবে। আগে অবশ্য সে রকমই কথা ছিল। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে মনে হলো ভালোই হয়েছে—দিনে দিনে বাড়ি ফেরা যাবে। ভাবলাম ভগবান যা করেন ভালোর জন্যই করেন; মঙ্গলের জন্য করেন। ভাগ্যিস ঐ বেয়াড়া ব্যবসায়ীটা ছিল। কিন্তু রফিজকে ছাড়া ট্রেনে উঠতে আমাদের সাহস হচ্ছিল না। দুশ্চিন্তায় যখন চোখে সর্ষে ফুল দেখছি ঠিক তখনই দেখা গেল ছাড়া পাওয়া পকেটমারের মতো উর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে ছুটতে আমাদের নেতা রফিজ স্টেশনের দিকে আসছে। একটু আগে সে ঐ দোকানে কেমন ছিল জানি না, কিন্তু আমরা তাকে খুবই ক্ষিপ্ত ও উত্তেজিতরূপেই দেখতে পেলাম। সেনাপতি যেভাবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সৈনিকদের রণক্ষেত্র পরিত্যাগের নির্দেশ দেয়, রফিজ তেমনি আমাদের নির্ভয়ে গাড়িতে ওঠার নির্দেশ দিলো। আমরা দ্রুত ট্রেনে উঠলাম। রফিজ সঙ্গে থাকলে টিকিটের দরকার পড়ে না। এই লাইনের সব টিটিই রফিজের চেনা। আর আমরা হচ্ছি রফিজের লোক। বিকেলের দিকে আমরা নিরাপদে বারহাট্টায় ফিরে এলাম। বারহাট্টার মাটিতে পা রেখেই মনে পড়ল সারাদিন আমাদের পেটে কিছু পড়েনি। ঐ রেক্টর খেদানোর আন্দোলনে মোহনগঞ্জ বাজার থেকে সেদিন কত টাকা উঠেছিল এবং ঐ রুদ্র ব্যবসায়ীর খপ্পর থেকে রফিজ শেষ পর্যন্ত কিভাবে মুক্তি পেয়েছিল— তা আমাদের আর জানা হয়নি। আমরা যে ভালোয় ভালোয় বাঘের খাঁচা থেকে ফিরতে পেরেছিলাম, তাতেই আমাদের আনন্দের সীমা ছিল না। ঐ ঘটনার পর থেকে রফিজ আর স্কুলে যেত না—ব্যর্থ বিপ্লবের নায়কদের মতোই সে পালিয়ে বেড়াত। পরদিন রফিজের অনুসারীদের শাস্তি হয়েছিল কান ধরে বেঞ্চের ওপর এক ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকা। কিন্তু যে রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতাটি আমরা সেদিন লাভ করেছিলাম, তার তুলনায় শাস্তিটা ছিল নিতান্তই সামান্য। গুরু পাপে লঘু দণ্ড!

আমাদের গ্রামে একজন খুব জনপ্রিয় রামমঙ্গল গায়েন ছিলেন। তাঁর নাম নরেন্দ্র গাইন। ঐ গাইন পরিবারের ছেলেমেয়েরা স্কুলে ভর্তি হওয়ার সময় তাদের পদবী হিসেবে গুণ-ই ব্যবহার করত। নরেন্দ্র গাইন বলতেন, গাইন হচ্ছে গুণ-এর আদি রূপ। আমরা নরেন্দ্র গাইনের দাবি স্বীকার করতাম না, বরং এই পদবী ব্যবহার করার জন্য আমরা ওদের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করতাম। আমার মনে হতো নরেন্দ্র গাইনের দাবির মধ্যে কিছুটা সত্যতা আছে। হয়তো আমাদের পূর্ব-পুরুষেরা পেশা ও পারদর্শিতার মূলধারাটি রামমঙ্গল গানের ভেতর দিয়েই রক্ষিত হয়ে থাকবে।

AMARBOI.COM

রামমঙ্গল গানের জগতে নরেন্দ্র গাইন ছিলেন এক জীবন্ত কিংবদন্তি। তাঁর জীবদ্দশায়, তাঁর সামনে দাঁড়াবার মতো রামমঙ্গল গায়ক ময়মনসিংহ জেলায় আর কেউ ছিল না। সপ্তখণ্ড রামায়ণ তাঁর মুখস্থ ছিল। রামমঙ্গল প্রদর্শনের জন্য তাঁর একটি চার সদস্যের ছোট গানের দল ছিল। গ্রামের সেনপাড়ায়, নীরদ সেনের বাড়িতে হরিপূজা উপলক্ষে প্রতি বছর রামমঙ্গলের আসর বসত। ঐ বাড়িতে সারারাত জেগে থেকে আমি রামমঙ্গল গান শুনতাম। শত শত লোক পিনপতন নীরবতার মধ্যে বসে নরেন্দ্র গাইন পরিবেশিত রামমঙ্গল গান শুনত। আমাদের বাড়িতে কখনও তিনি রামমঙ্গল পরিবেশন করেননি। এ নিয়ে তাঁর মনে ক্ষোভ ছিল। তাঁর এই নিষেধ কৃতী এবং জনপ্রিয়তাকে আমার বাবা-কাকা যে খুব একটা মর্যাদা দিতেন না—তার পেছনে কার্যকর ছিল এক ধরনের প্রচ্ছন্ন ঈর্ষাবোধ। নরেন্দ্র গাইন বেশিদিন গ্রামে থাকতেন না। বিভিন্ন এলাকায় তিনি রামমঙ্গল গেয়ে বেড়াতেন। রামমঙ্গল ছিল তাঁর নেশা এবং পেশা। রামমঙ্গল গেয়ে যা পারিশ্রমিক পেতেন ওটাই ছিল তাঁর জীবিকা নির্বাহের উপায়। জমিজমা খুব একটা ছিল না বললেই চলে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেনবাড়ির হরিপূজার সময়, দিনে মহোৎসব হতো এবং রাতে হতো রামমঙ্গল। ঐ নিয়মটা দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছিল। রাত দশটার দিকে পালা শুরু হতো। চলত সারা রাত ধরে। আমি রামমঙ্গলের আসরে বসেই আসন্ন সূর্যের আভায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠা ভোরের আকাশ দেখতে পেতাম। কীভাবে যে শীতের দীর্ঘ রাত কেটে যেত, টেরই পেতাম না। নরেন্দ্র গাইন জাদুকরের মতো দর্শক-শ্রোতাদের মনোমুগ্ধ করে বসিয়ে রাখতেন। মাঝখানে ওঠা যাবে না, এমন প্রস্তুতি নিয়েই দর্শক-শ্রোতারা তাঁর গান শুনতে বসতেন।

তিনি ছিলেন দীর্ঘদেহী এবং গুণদের মতোই ছিলেন উন্নত নাসাবিশিষ্ট, প্রশস্ত বক্ষ ও সুঠাম স্বাস্থ্যের অধিকারী। যৌবনে নজরুলের মতোই মাথাভর্তি বাবরী-ঝাঁকড়া চুল ছিল তাঁর। চোখ দুটোও ছিল বেশ বড়োসড়ো এবং ভাসা ভাসা। আসরে বসে অনেক সময় নিয়ে তিনি সকলের সামনেই মেকআপ নিতেন। নাটকে এবং যাত্রাগানে দর্শকের দৃষ্টির আড়ালে কুশীলবদের মেকআপ নেবার যে ধারাটি ছিল, তিনি সেই ধারাটি পাল্টে দিয়েছিলেন। প্রায় ঘণ্টাখানেক সময় নিয়ে তিনি সাজতেন। সামনে একটি ছোট্ট আয়না নিয়ে মেয়েদের মতো বসে মুখে রঙ মাখতেন। রঙটা তৈরি করতেন সফেদার সঙ্গে কিঞ্চিৎ মেটে আবীর মিশিয়ে। তা ছাড়া রক্তচন্দন এবং শ্বেতচন্দনও ব্যবহার করতেন কপালে তিলক ও বাহুতে স্বস্তিকা চিহ্ন কাটার জন্য। তাঁর মুখমণ্ডলের রঙ গায়ের গেরুয়া বসনের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে যেত। গেরুয়া রঙের ধুতির সঙ্গে গেরুয়া রঙের পাঞ্জাবি পরতেন তিনি। একটা গেরুয়া রঙের উত্তরীয় রাখতেন গলায় ঝুলিয়ে। পালা পরিবেশনের সময় ঐ উত্তরীয়টা দৃশ্যের পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে দ্রুত স্থান পরিবর্তন করত। কখনও তিনি তা মাথায় পাগড়ি করে বাঁধতেন, কখনও বাঁধতেন কোমরের সঙ্গে আঁট করে, কখনও চোখের জল মোছার কাজে ব্যবহার করতেন, কখনও বা ওটা আলতো করে ঝুলিয়ে দিতেন গলায়। পালা শুরুর আগে তিনি কিছুক্ষণের জন্য ধ্যানে বসতেন। তাঁর ঐ ধ্যানমগ্ন রূপ দেখে মনে হতো, তিনিই রামায়ণের রচয়িতা, স্বয়ং বাল্মীকি।

তাঁর ধ্যান ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে হারমোনিয়াম, খোল, করতাল বেজে উঠত। তখন নরেন্দ্র গাইন ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াতেন। তাঁর ধ্যানক্লান্ত মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হতো, এইমাত্র তিনি অন্য কোনো উর্ধ্বলোক থেকে মর্ত্যলোকে পতিত হয়েছেন। তিনি করজোড়ে দর্শকদের কাছে জানতে চাইতেন, কোন পালাটি তারা শুনতে আগ্রহী। অধিকাংশ শ্রোতার আগ্রহকেই তিনি আমল দিতেন। তাঁর দলের একজনের নাম ছিল হরেন্দ্র। তাঁর বাড়ি ছিল পাশের গ্রাম বারঘরে। খোল বাজানো ছাড়া তাঁর কাজ ছিল গায়েনের সঙ্গে কথোপকথনের ভেতর দিয়ে শ্রোতাদের মধ্যে রস পরিবেশন করা। নরেন্দ্র গাইন তাঁকে উদ্দেশ্য করে নানা রকমের প্রশ্ন ছুঁড়ে দিতেন— হরেন্দ্র সেই সব প্রশ্নের এমন রসালো উত্তর দিতেন, শুনে আমাদের পেটে হাসিতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খিল লেগে যেত। ধর্মরসে আপ্লুত অত্যন্ত আবেগঘন ও অতিশয় জটিল মুহূর্তগুলোও হরেন্দ্র ও নরেন্দ্র এই দুয়ের মধ্যকার সংলাপ বিনিময়ের মধ্য দিয়ে হঠাৎ করেই দূরের আকাশ ছেড়ে আমাদের আটপৌরে জীবনের স্তরে নেমে আসত। তখন মনে হতো, অযোধ্যা থেকে নয়, রামমঙ্গলের চরিত্রগুলো আমাদের আশপাশের গ্রামগুলো থেকেই উঠে এসেছে। আমার শিশুমনে বিশেষ করে আবেদন সৃষ্টি করত হনুমান চরিত্রটি। নরেন্দ্র গাইন এই হনুমান চরিত্রটিকে এমন চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তুলতেন, মনে হতো রামমঙ্গল নয়, এই পালাগুলোর নাম হনুমানমঙ্গল রাখলেই শ্রেয় হয়। ভক্তি এবং বীরত্বের এমন অপূর্ব রামমঙ্গলের হনুমান ছাড়া আর অন্য কোথায় আছে?

আমি বাড়িতে আমার মাকে রামায়ণ পাঠ করে শোনাতাম। নিজের আগ্রহেও পড়তাম। কিন্তু রামায়ণের প্রকৃত রস এবং এর অন্তর্নিহিত কাব্যশক্তির সঙ্গে বলাই বাহুল্য যে, আমার নিবিড় পরিচয় ঘটেছিল নরেন্দ্র গাইন পরিবেশিত রামমঙ্গল শুনে এবং তাঁর অপূর্ব সফল অভিনয় দেখার মধ্য দিয়ে। আশ্চর্য কুশলতায় তিনি রামায়ণের মূল চরিত্রগুলোর দ্বন্দ্ব-সংঘাত, ভক্তি-প্রেম, ছলনা ও কৌতূহলকে এমন নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারতেন, মনে হতো মঞ্চে গায়েন একা নন— একা হয়েও তিনি বহু। তিনিই সব। তিনি যখন রাম তখন রাম, যখন লক্ষ্মণ তখন লক্ষ্মণ, যখন সীতা তখন সীতা, যখন রাবণ তখন রাবণ, যখন তিনি বীরশ্রেষ্ঠ হনুমান—তখন তাঁকে একজন মূর্তিমান হনুমান বলেই ভ্রম হতো। শুধু আমি নই, বড়রাও তাঁর এই গায়নক্ষমতাকে দেবদত্তরূপেই বিবেচনা করতেন।

বড় ও মহৎ শিল্পীদের মতোই তাঁর ব্যক্তিজীবন খুব সুখের ছিল না। স্ত্রীর সঙ্গেও তাঁর সম্পর্ক ভালো ছিল না। তাঁর ছেলেমেয়েরাও লেখাপড়ায় ভালো করতে পারেনি। জমিজমাও করেননি। শুধু বাড়ি ও বাড়ির সামনের একখণ্ড জমিই ছিল সম্বল। ফলে বৃদ্ধ বয়সে তাঁকে নিদারুণ অর্থকষ্ট ভোগ করতে হয়। প্রায় বিনা চিকিৎসাতেই একদিন তিনি অকালমৃত্যু বরণ করেন। শক্তিশেলবিদ্ধ লক্ষ্মণের মতো তাঁকে বাঁচানোর জন্য গন্ধমাদন পর্বত থেকে বিশল্যকরণী নিয়ে কোনো হনুমান এগিয়ে আসেনি।

নরেন্দ্র গাইনের মৃত্যুতে আমাদের জীবন থেকে রামমঙ্গল প্রায় লুপ্ত হয়ে যায়। তাঁর ছাত্র সেনপাড়ার বেনু সেন কিছুদিন চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু মানুষের মনে নরেন্দ্র গাইনের উজ্জ্বল স্মৃতি সচল থাকার কারণেই তিনি সফল হতে পারেননি। রামহীন রামায়ণের মতোই নরেন্দ্র গাইনহীন রামমঙ্গলের প্রতিও এলাকায় মানুষের কোনো আগ্রহ ছিল না।

আষাঢ় মাসে রথযাত্রা আর চৈত্র মাসে বারুণীর মেলা বসত বারহাট্টায়। বারহাট্টা কালীবাড়িতে তখন প্রকাণ্ড একটা কাঠের রথ ছিল। ঐ রথটিকে দেখে আমি মহাভারতে বর্ণিত রথের কথা ভাবতাম। রথের দিন বৃষ্টি ছিল অনিবার্য। ঐদিন বৃষ্টি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না হলেই মানুষ অমঙ্গলের আশংকা করত। বৃষ্টি অবশ্য হতোই, কম আর বেশি। বৃষ্টি-কাদায় একাকার হয়ে যাওয়া রথের রশি ধরে টানার সময় শুরু হতো এক হুলুস্থূল কাণ্ড। কাদার ভেতরে বসে যাওয়া রথের চাকা নড়তেই চায় না। কিন্তু শত শত পালোয়ান পুণ্যার্থীর ঐক্যবদ্ধ টানে রথ যখন নড়ে উঠত তখন কী আনন্দ! কর্দমের মধ্যে পুণ্যার্থীর পদতলে পিষ্ট হওয়ার ভয়ে আমি রথের রশি ধরতে সাহস করতাম না, দূর থেকে দেখতাম। মনে পড়ত রবীন্দ্রনাথের কবিতা : 'রথ ভাবে আমি দেব, পথ ভাবে আমি/মূর্তি ভাবে আমি দেব, হাসেন অন্তর্যামী'।

চৈত্রসংক্রান্তিতে বসত বারুণীর মেলা। রথের মেলা শুরু হতো সকাল থেকে, চলত দুপুর পর্যন্ত। বারুণীর মেলা শুরু হতো দুপুরের দিকে, চলত রাত পর্যন্ত। রথের মেলায় বৃষ্টি কাদার জন্য ভিড় কিছু কম হতো কিন্তু বারুণীর সময় বৃষ্টি-কাদার উৎপাত না থাকায় মহিলাদের সংখ্যা যেমন বৃদ্ধি পেত, তেমনি ছোট ছোট ছেলেমেয়েরাও বারুণীতে দল বেঁধে আসত। আমি আমার ছোট ভাইবোনদের নিয়ে বারুণীর মেলায় যেতাম। ছোট বোনদের মাটির পুতুল, কাচের চুড়ি, কানের দুল, চুল বাঁধার জন্য লাল মখমলের ফিতে কিনে দিতাম। ছোট ভাইদের কিনে দিতাম বেলুন, টমটম আর রাবারের বল। আমার নিজের পছন্দ ছিল রঙ-বেরঙের ঘুড়ি আর বাঁশের বাঁশি। বাঁশি বাজিয়ে শ্রীকৃষ্ণ রাধাকে পাগল করেছিলেন, বাঁশি কেনার সময় ঐ গল্পের কথা আমার মনে পড়ত। কল্পনায় আমি আমার বোনদের কাউকে কাউকে রাধা বলে ভাবতাম। ক্রেতা-বিক্রেতাদের দরকষাকষির কলকোলাহলের মধ্যে বেসুরো বাঁশির আওয়াজ মিলেমিশে এক ভৌতিক পরিবেশের সৃষ্টি করত। তার ওপরে ছিল বড়দের হাত থেকে বিচ্যুত হয়ে যাওয়া ছেলেমেয়েদের আর্তচিৎকার। ঐ ছোট্ট মেলাটিকেই তখন মেলায় উন্মত্ত পুরো পৃথিবী বলেই ভ্রম হতো। বড়দের প্রণাম করে পরবী হিসেবে পাওয়া পয়সা যেত ফুরিয়ে, কিন্তু আমাদের কিছুই প্রায় কেনা হতো না। আগামী বছরের মেলায় কিনব, এই ভেবে কিনতে না-পারা প্রিয় জিনিসগুলোর ওপর সেবারের মতো চোখ বুলিয়ে, সন্ধ্যার দিকে বাড়ির পথে পা বাড়াতাম। আমার পেছনে আমার ছোট দুটো ভাই আর বোন। অনেক ভাইবোন থাকার কী যে আনন্দ! হঠাৎ করেই আমার মনের মধ্যে উঁকি দিত আমার ভারতে চলে যাওয়া দাদামণির মুখ, আর অসুস্থতার কারণে মেলায় যেতে না-পারা রূপালির কান্নাভেজা চোখ।

একবার বারুণীর সময় আমি আমার ভাইবোনদের জাদু দেখিয়ে কিছু উপরি পয়সা কামাই করেছিলাম। আমাদের স্কুলের বার্ষিক অনুষ্ঠানে জাদু দেখাতে এসেছিলেন এক জাদুকর। তিনি বিচিত্র সব জাদু দেখিয়ে আমাদের মুগ্ধ করেছিলেন। ঐ জাদুকরের দুটো জাদু আমি নিজে পরীক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিই। আমার মনে হয় ঐ দুটো জাদু আমার পক্ষে দেখানো সম্ভব।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১. ব্লেড ভক্ষণ ও

২. জ্যান্ত কবুতর ছানা ভক্ষণ

দুপুরের দিকে আমি জাদু দেখানোর সময় স্থির করি— কারণ ঐ জাদুকর দুপুরের দিকেই আমাদের স্কুলে জাদু প্রদর্শন করেছিলেন। মধ্যের বাড়ির এক জেঠিমার ঘর থেকে জাদুকরের জন্য একটি নিরীহ কবুতর ছানাকে চুরি করে সংগ্রহ করা হয়। জাদু প্রদর্শনের স্থান নির্ধারণ করা হয় পাশের বাড়ির যাদুদার ঘরে। যাদুদার নামের সঙ্গে যাদুর কোনো সম্পর্ক ছিল না—ঘটনাটি কাকতালীয়ভাবেই ঘটে। যাদুদা ছিলেন আমাদের জ্যাঠতুতো বড় ভাই। যাদুদারা ছিলেন দুই ভাই। বড়টি মাধুদা ভারতে চলে গিয়েছিলেন। জ্যাঠামশাই-জেঠিমা পরলোকগত, একমাত্র বড় বোন লীলাদি বিবাহিত। পুরো বাড়িটিতে যাদুদা একাই থাকতেন উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া তাঁর বিশাল সাম্রাজ্য নিয়ে। তাঁর ঘরটি ছিল আমাদের সকলের দুষ্টুমির নিরাপদ আশ্রয়।

আমার ভাইবোনেরা আমার জাদু দেখার জন্য দুপুরের দিকে ঐ ঘরে সমবেত হয়। স্কুলের বার্ষিক অনুষ্ঠানে দেখা ঐ জাদুকরের অনুকরণে আমি আমার প্রস্তুতি গ্রহণ করি। দর্শকদের সঙ্গে দূরত্ব সৃষ্টির জন্য চকি বিছিয়ে একটি ছোটমতো মঞ্চও তৈরি করা হয়। আমার এক বোন আমার গায়ে মন্ত্র পড়া জল ছিটিয়ে দেয়। আমি তখন মানুষরূপী রাক্ষসে পরিণত হই। আমার খুব ক্ষুধা পায়। তখন আমি কিছু খাওয়ার জন্য হাউ-মাউ করে কবুতরটির জন্য হাত বাড়াই। একজন দূর থেকে আমার দিকে কবুতরের বাচ্চাটিকে ছুঁড়ে দেয়—আমি এমন ভাব দেখাই যেন কাছে এলে আমি তাকেও খেয়ে ফেলতে পারি। কবুতরের বাচ্চাটিকে হাতের মুঠোর মধ্যে পেয়ে আমি উল্লাস প্রকাশ করতে থাকি। অতি অভিনয় আমার কাল হয়। উল্লাসের মধ্যে লক্ষ্য করিনি যে কবুতরের বাচ্চাটির পদযুগল ভালো করে বাঁধা হয়নি। কবুতরটি ছিল নিতান্তই বেরসিক এবং যাদুকরের নিরীহ শিকার হতে অনিচ্ছুক। আমার যাদু দেখাবার মাশুল গুনবার জন্যই যে এই ধরাধামে তার আগমন ঘটেছে, তা সে এত সহজে স্বীকার করতে রাজি ছিল না। ফলে আমি যখন চকিত হেঁচকা টানে তার মস্তক ছিন্ন করে তার রক্ত পান করার জন্য মুখের কাছে নিয়েছি তখনই সে তার সমস্ত শক্তিকে পদযুগলে সংহত করে আমার নাকে মুখে এমন জোরে খামচা লাগায় যে, শুধু কবুতরের রক্তে নয়, কবুতরের নখের আঁচড়ে আমার রক্তেও আমার মুখমণ্ডল রঞ্জিত হয়ে যায়। যন্ত্রণা সইবার চেষ্টা করে আমি ব্যর্থ হই। তখন কবুতরের রক্ত পান করা ও তার জ্যান্ত মাংস ভক্ষণ করার পরিবর্তে তাকে রান্না করে খাওয়ার কথা ভাবতে বাধ্য হই। দ্রুত দৃশ্যপট পাল্টে যায়। নকল রাক্ষস তখন এক অসহায় কিশোরে পরিণত হয় এবং আহত জাদুকরের পরিচর্যায় উপস্থিত দর্শকদের ব্যস্ত দেখা যায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমিও দমবার পাত্র নই, কিছুক্ষণের মধ্যেই আমি সুস্থ হয়ে উঠি এবং আমার দ্বিতীয় জাদুটি প্রদর্শনের জন্য তৈরি হই। সপ্রাণ কবুতর ভক্ষণে ব্যর্থ হলেও নিষ্প্রাণ ব্লেড ভক্ষণে আমি অভাবিত সাফল্য প্রদর্শন করি। আমার জাদু প্রদর্শনের খবর অল্পক্ষণের মধ্যেই আমার বাবার কানে পৌঁছে। তিনি এসে কান ধরে আমাকে বাড়িতে নিয়ে যান। আমাকে নিয়ে তখন তাঁর মহাদুশ্চিন্তা দেখা দেয়। আমার মুখমণ্ডলের ক্ষতস্থানে ডেটল প্রয়োগ করা হয় কিন্তু আমার পাকস্থলির ভেতর থেকে স্টেনলেস স্টিলের ব্লেড দুটো কীভাবে বের করা যায় তা নিয়ে মহাচিন্তায় পড়েন। খুব স্বাভাবিকভাবেই আমার প্রাতঃকৃত্যের প্রতি তাঁর উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি পায়। পূর্বনির্ধারিত অজানা কারণে ঈশ্বর ঐ জাদুকরের সহায় ছিলেন, তাই আমার বড় কোনো বিপদ হয়নি। কিন্তু বাবার চোখে ঘুম নেই। যার পুত্রের পাকস্থলিতে গোটাকয়েক স্টেনলেস ব্লেড থাকে তাঁর পক্ষে নিশ্চিন্ত থাকা অসম্ভব।

মোটা মোটা কবিরাজি বই পড়ে বাবা তখন আমার জন্য একটি চমৎকার মহৌষধ আবিষ্কার করেন। স্থির হয় প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে উঠেই আমাকে খালি পেটে এক গ্লাস ষাঁড়ের মূত্র পান করতে হবে। তাতে নাকি আমার পাকস্থলি, কিডনি এবং লিভারের শক্তি বাড়বে। আমাদের গেরস্থি ছিল। বছর ভিত্তিতে কাজে লোক রাখা হতো হালচাষের জন্য। সেই গেরস্থালির কারণে গোয়ালে গরুর অভাব ছিল না। একটি বেশ নাদুস-নুদুস ষাঁড় ছিল গোয়ালে। স্থির হয় ঐ ষাঁড়ের সকালের প্রথম মূত্রটা বালতিতে সংগ্রহ করবে খান বাহাদুর এবং নিদ্রাভঙ্গের পর ওটাই হবে আমার দিনের প্রথম পানীয়। নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে দুশ্চিন্তা শুধু আমার বাবার নয়, আমার নিজেরও হয়েছিল। কারণ ঐ ব্লেড ভক্ষণের কাজটি গোপনে দীর্ঘদিন ধরেই আমি করে আসছিলাম। তাই প্রতি সকালে উষ্ণ খেজুরের রস মনে করে গ্লাসভর্তি ষাঁড়ের মূত্র আমি চোখ বন্ধ করে পান করতে শুরু করলাম।

ঘটনাটি যাতে জানাজানি না হয়, সে জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল। বাবা খান বাহাদুর এবং আমার ভাইবোনদের ডেকে বিশেষভাবে সতর্ক করে দেন। বাবার আবিষ্কৃত ঐ প্রাতঃস্মরণীয় পথ্যটি আমাকে প্রায় মাসখানেক পান করতে হয়েছিল। তাতে আমার স্বাস্থ্যের বিশেষ উন্নতি হয়।

ঘটনাটি অবশ্য শেষ পর্যন্ত গোপনে রাখা সম্ভব হয়নি। ওষুধের আবিষ্কারক নিজেই একদিন তাঁর বন্ধু নারায়ণ কবিরাজ মহাশয়ের নিকট ব্যক্ত করেন। নারায়ণবাবুর ছেলে পুলক ছিল আমারই সহপাঠী। নারায়ণবাবুও আমার বাবার দেখাদেখি পুলককে ষাঁড়ের মূত্র পান করানোর চেষ্টা করেন এবং আমার নাম করে বলেন যে, আমি নিয়মিত তা পান করি। পুলক মহাপুলকে ঐ ঘটনার কথা রাষ্ট্র করে দেয়। ক্লাসের গণ্ডি অতিক্রম করে প্রথমে স্কুলে, পরে স্কুলের গণ্ডি অতিক্রম করে মুখরোচক সংবাদটি সারা বারহাট্টায় ছড়িয়ে পড়ে। লজ্জায় আমার পক্ষে স্কুলে

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যাওয়াই কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। তখন বাবার প্রতি খুব রুষ্ট হলেও পরে আমি আমার বাবার দূরদৃষ্টির প্রশংসা করতে বাধ্য হই।

ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়ার সময় বৃত্তি পরীক্ষা দেয়ার জন্য আমাদের স্কুল থেকে চারজনকে নির্বাচন করা হয়। বৃত্তির পরিমাণ মাসে আট টাকা এবং স্কুলের বেতন ফ্রি। শিক্ষকরা আমাদের বিশেষ যত্নসহকারে তালিম দিতে শুরু করেন। বাবাও আমার জন্য একজন প্রাইভেট শিক্ষক রেখে দেন। বৃত্তি পরীক্ষার জন্য নির্বাচিত হওয়াতে তাঁর খুশির অন্ত নেই। আমিও পরীক্ষায় ভালো ফল করার জন্য সাধ্যমতো পড়াশোনা করতে থাকি। আমাদের অগ্নিপরীক্ষার দিন দ্রুত ঘনিয়ে আসে। ভালো দিন ও লগ্ন দেখে আমরা চারজন—মতি, হেলাল, হুসেন আলী এবং আমি গুরুজনদের কাছ থেকে আশীর্বাদ নিয়ে ময়মনসিংহগামী ট্রেনে চড়ে বসি। মা আমার পকেটে বিষ্ণুপূজার ফুল-দূর্বা গুঁজে দেন। গার্জিয়ানদের পক্ষ থেকে আমার বাবা ও স্কুলের শিক্ষকদের পক্ষ থেকে মালেক স্যার আমাদের সঙ্গে যান।

আমার জ্যাঠতুতো ভাই অতুল্য ময়মনসিংহ শহরের সিটি স্কুল থেকে বৃত্তি পরীক্ষা দিচ্ছিল। বাসায় থাকলে আমার জন্য খুবই সুবিধের হতো পারত, কিন্তু জ্যাঠামশাই আমার ব্যাপারে কোনো আগ্রহ প্রদর্শন না করাতে বাবা আমাকে নিয়ে গাঙ্গিনারপাড়ে একটি হোটেলে উঠলেন। ঐ হোটেল থেকে আমাদের বাসার দূরত্ব মাত্র দুই মিনিটের পথ। আমাদের বাসায় আমাদের সামনে দিয়েই জিলা স্কুলে যাতায়াত করতে হতো। মতি, হেলাল, হুসেন আলী এবং মালেক স্যার বাবার কাছে বাসায় না থেকে হোটেলে থাকার কারণ জানতে চাইলে বাবা কৌশলে সে-প্রশ্নের জবাব এড়িয়ে যেতেন। আমি বুঝতে পারতাম, নিজের হাতে তৈরি করা বাড়িতে প্রয়োজনের সময় উঠতে না পারার দুঃখটা বাবা বুকের ভেতরে পাথরচাপা দিয়ে বেড়াচ্ছেন। বৃত্তি পরীক্ষায় ভালো ফল করে বাবার সেই দুঃখটাকে কিঞ্চিৎ লাঘব করার ইচ্ছেও আমার ছিল, কিন্তু জিলা স্কুলের ঐ লাল ইটের দালানে ঢুকেই আমার মাথা ঘুরে যেত। এত বড় স্কুলে, এত সব অপরিচিত ছাত্র, ততোধিক অপরিচিত রাসগম্ভীর শিক্ষকদের দৃষ্টির সামনে বসে লিখতে গিয়ে আমার হাত কাঁপত। জানা উত্তর লিখতেও ভুল করে ফেলতাম। অসহায় মুহূর্তে আমার মন ছুটে যেত বাইরে অপেক্ষমাণ শত শত উন্মুখ অভিভাবকের ভিড়ে, যেখানে আমার বাবাও আমার জন্য অপেক্ষা করতেন। পরীক্ষা শেষে হল থেকে বেরিয়ে এলেই ভিড়ের ভেতর থেকে বাবা আমাকে দ্রুত খুঁজে বের করতেন। কখনো তাঁর হাতে থাকত সদ্যকাটা একটা কচি সবুজ ডাব, কখনো কমলা, কখনো আপেল। পরীক্ষা কেমন হয়েছে, সে প্রশ্ন করে বাবা আমাকে বিব্রত করতেন না। আমি পরীক্ষা যতটা না ভালো হয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশি বাড়িয়ে বাড়িয়ে বলতাম। বাবা বুঝতে

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পারতেন আমি ভয় করে বাড়িয়ে বলছি। তিনি তখন আমাকে অভয় দিতেন। বলতেন : 'ঠিক আছে, ভয় পাওয়ার কিছু নেই। মোটামুটি ভালো হলেই হলো।'

বাবাকে তখন আমার দারুণ ভালো লাগত। বাবা কী করে যে আমার মনের কথা জানতে পারত! বাবা হলে বোধহয় এসব জানা যায়।

বিকেলের দিকে বাবা আমাদের নিয়ে শহর দেখতে বেরুতেন; এইটুকুন শহর ময়মনসিংহ—তখন কী বিরাট বড় বলেই না মনে হতো। মনে হতো বাবা সঙ্গে না থাকলে আমি নির্ঘাত হারিয়ে যেতাম। গাঙ্গিনার পাড়ের চৌরাস্তার মোড়ে উঁচু জলের ট্যাংকটার পাশ দিয়ে যাবার সময় ভয়ে আমার বুক কাঁপত—কেবলই মনে হতো, যদি ভেঙে পড়ে। এরকম একটা ভয়ঙ্কর জিনিস কেন যে রাস্তার পাশে তৈরি করেছে, ভেবে পেতাম না। ঐ জলের ট্যাংকটা দেখেই আমার মনে হয়েছিল শহরে নিশ্চয়ই বোকা মানুষরাও থাকে।

ব্রহ্মপুত্রের পাড় দিয়ে আমরা হাঁটতাম। এই ব্রহ্মপুত্রের জলে স্নান করেই পরশুরাম মাতৃহত্যার পাপ থেকে মুক্ত হয়েছিলেন। অষ্টমী স্নানের সময় হাজার হাজার হিন্দু দূর-দূরান্ত থেকে এসে পুণ্যস্নান করে এর জলে। নদীর তীর ধরে আমরা চলে যেতাম ভেটারনারি স্কুলে। পরে ঐ ভেটারনারি স্কুলের বিরাট এলাকা জুড়ে গড়ে ওঠে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়। তখন মাত্র কয়েকটি ভবন ছিল। ছিল ঘাসের বিরাট খামার। বিপুল আকৃতির ষাঁড় এবং গাইগুলো দেখে আমার তো চোখ ছানাবড়া—এত বড় গরুও হয় ভূভারতে? বাবা বলতেন, এ রকমের এক-একটা গাই থেকে ২০-৩০ সের পর্যন্ত দুধ পাওয়া যায়। কী আশ্চর্য কথা! এতটা দুধ ওরা কোথায় যে লুকিয়ে রাখে!

ময়মনসিংহে তখন মেডিক্যাল কলেজ ছিল না, ছিল লিটন মেডিক্যাল স্কুল। জনৈক ইংরেজ সাহেবের নামে। একটা রুমে ছিল অনেকগুলো নরকংকাল। নারীকংকালও হতে পারে; কিন্তু আমরা কংকাল বলতে তখন নরকংকালই বুঝতাম। কাচের জানালা দিয়ে আমরা সেই নর-নারীর কংকালগুলো দেখলাম। মানুষের এই পরিণতি দেখে মানুষের জন্য আমার সেদিন খুব মায়া হয়েছিল। ভয়ও পেয়েছিলাম খুব। বাবা আমার ভয় ভাঙিয়ে দিলেন : 'ছাত্ররা এসব কংকাল নিয়ে পড়াশোনা করে, মানবদেহ সম্পর্কে নানা তথ্য জানে। তবে তুই যদি হাতুড়ে ডাক্তার হতে চাস, তাহলে এগুলো তোর না জানলেও চলবে—কিন্তু বড় হয়ে যদি বড় ডাক্তার হতে চাস, তখন এই কংকালগুলো খুব কাজে লাগবে।'

আমি মনে মনে বলতাম : 'না, বাবা, আমি মড়া মানুষের কংকাল আর দেখতে চাই না, এবার চলো ফিরে যাই।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফেরার সময় আমার বুকের রক্ত ভয়ে হিম হয়ে যেত, মনে হতো কংকালগুলোও আমাদের পেছনে পেছনে আসছে। তখন ভূতে বিশ্বাস ছিল খুব। পরে ঐ লিটন মেডিক্যাল স্কুলটি চরপাড়ায় স্থাপিত ময়মনসিংহ মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রাবাসে পরিণত হয়। সে অনেক পরের কথা।

সপ্তাহখানেক ময়মনসিংহে কাটিয়ে, বৃত্তিপরীক্ষা শেষে যখন গ্রামে ফিরে এলাম, তখন সঙ্গত কারণেই বাড়িতে এবং এলাকায় আমার কদর বৃদ্ধি পায়। পরীক্ষার ফল বেরুনোর পূর্ব পর্যন্ত তা অব্যাহত ছিল।

বৃত্তি পরীক্ষার ফল মেট্রিকের মতো ঘটা করে বেরোয় না, কিন্তু নীরবে হলেও এক সময় বেরোয়। বিলম্বে হলেও একদিন সেই ফল বেরুল। আমাদের স্কুলের রেক্টর সাহেবের মাধ্যমে আমরা তা জানতেও পারলাম। জানার পর মনে হলো, না জানলেই ভালো ছিল। ঐ পরীক্ষার ফলটা যদি কোনোদিনই না বেরুত, কী ক্ষতি হতো এই পৃথিবীর? না, আমি বৃত্তি পাইনি, আমাদের চার রত্নের মধ্যে মতিই শুধু পেয়েছে। শুধু বৃত্তি নয়, পুরো জেলার মধ্যে মতি হয়েছে ফার্স্ট। এ এক অভাবিত সাফল্য। স্কুলের জন্য এক বিরল গৌরব। স্কুলে আনন্দের বন্যা বয়ে গেল। শিক্ষক-ছাত্র সবাই খুশি। একজনের আনন্দের বন্যায় আমাদের চারজনের বেদনা খড়কুটোর মতো ভেসে গেল। স্কুল ছুটি দিয়ে দেয়া হলো। ঐ ছুটিটা মতির সাফল্যের আনন্দে, না আমাদের ব্যর্থতার বেদনায়—তা ঠিক বোঝা গেল না।

একই বছরে আরেকটি চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটে, যার জন্য আমাদের স্কুল আবারও ছুটি হয়ে যায়। জেনারেল আইয়ুব খান পাকিস্তানের রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করেন (১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর)। সারাদেশে সামরিক আইন বা মার্শাল ল' জারি করা হয়। রাষ্ট্রক্ষমতার মানে কী, আইয়ুব খানের পূর্বে কারা দেশ চালাচ্ছিলেন এবং কেমন চালাচ্ছিলেন, আমি এসবের কিছুই জানতাম না। এগুলো যে জানবার বিষয়, তাও আমাদের কেউ বলেনি। এসব ব্যাপারে কোনো উৎসাহই আমার ছিল না। রাজনীতির লাইনের মোট চারজনের নাম তখন আমার জানা ছিল—গান্ধী, জিন্নাহ, নেহেরু এবং সুভাষ বসু।

আমার দেখা রাজনীতিবিদ বলতে তখন জানতাম দু'জনকে, মৌলানা আতাহার আলী খান এবং আজিজুল ইসলাম খান। মৌলানা আতাহার আলী শুভ্রশ্মশ্রুমণ্ডিত প্রৌঢ়, বাড়ি কিশোরগঞ্জ; কিন্তু আজিজ ভাই টগবগে বিপ্লবী তরুণ— আমাদের পার্শ্ববর্তী যশমাধব গ্রামে তাঁর বাড়ি। অদূরভবিষ্যতে মৌলানা আতাহার আলী সাহেবই হবেন দেশের রাজা—খালেক মৌলবী স্যারের মুখে আমরা তাই শুনেছিলাম। কথাটা বিশ্বাসও হয়েছিল—কেননা তাঁর জনসভায় প্রচুর লোকসমাগম হতো, পক্ষান্তরে আজিজ ভাইয়ের প্রতি আমাদের সমর্থন থাকলেও তাঁর পেছনে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এলাকার বিপুলসংখ্যক মানুষের সমর্থন ছিল না। ফলে আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতেও খালেক মৌলবী স্যারের কথাটাই সত্য এবং স্বাভাবিক বলে মনে হতো। মৌলানা আতাহার আলী সাহেবের নাম শোনার অপেক্ষাতেই ছিলাম হঠাৎ বিনামেঘে বজ্রপাতের মতোই বারহাট্টার আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে, খালেক মৌলবী স্যারের স্বপ্ন ভঙ্গ করে দিয়ে উচ্চারিত হলো আইয়ুব খানের নাম। আইয়ুব খান হলেন দেশের নতুন রাজা। এমন চমৎকার নাম আমি পূর্বে শুনিনি, ইতিহাসের বইয়েও কোথাও পাইনি। নামটা আমার খুবই পছন্দ হলো।

স্কুলে পত্রিকা আসত, ইংরেজি অবজারভার এবং বাংলা আজাদ। দুই পত্রিকাতেই বেশ বড় করে আইয়ুব খানের ছবি ছাপা হয়েছে। স্যার ক্লাসে ঢুকেই পত্রিকায় ছাপা নতুন মহামানবের ছবিটি আমাদের দেখালেন। সামরিক পোশাক-পরিহিত, দীর্ঘদেহী, প্রজাপতি গুম্ফবিশিষ্ট আইয়ুবকে একজন লৌহমানব বলেই মনে হলো। সিনেমার নায়কদের তখনো দেখিনি, যাত্রাদলের নায়কদের দেখতাম; আমার দৃষ্টিতে তাঁরাই ছিলেন সুপুরুষ। আইয়ুব খান আমার মন থেকে সকল নায়কের ছবি মুছে দিয়ে তাঁর নিজের ছবিটাকে বসিয়ে দিলেন। তাঁর সুদর্শন মূর্তি আমাদের সবারই খুব পছন্দ হলো।

আইয়ুব খান আমাদের গতানুগতিক জীবনে বৈচিত্র্যের স্বাদ যুক্ত করলেন। মার্শাল ল' জিনিসটা কী ও কেমন—তখন কারোরই তা জানা ছিল না। জানা না থাকলেও এটুকু বোঝা গেল যে, ব্যাপারটার মধ্যে একটি তেজী ভাব আছে, শ'বর্ণের ওপরের রেফের মতোই সে হবে দুর্দান্ত, দুর্মর এবং দুর্ভেদ্য।

অল্পদিনের মধ্যেই একদল মিলিটারি এসে উপস্থিত হলো বারহাট্টায়। তারা আমাদের স্কুলের নিকটবর্তী ডাকবাংলোয় এসে উঠল। এর আগে আমরা শুধু মিলিটারির নাম শুনেছি, চোখে দেখিনি। দেখামাত্র আমি তাদের চিনতে পারলাম—এদের সবার চেহারায় সবাই দীর্ঘকায়, স্বাস্থ্যবান, নায়কদের মতো সুপুরুষ—এবং সবারই গাত্রবর্ণ আমার ঠাকুরমার মতো উজ্জ্বল। স্কুলে যাওয়া-আসার পথে আমরা ভয়ে ভয়ে দূর থেকে ওদের দেখতাম। মনে হতো খাঁচা থেকে ছেড়ে দেয়া সিংহশাবকরা গায়ে রোদ পোহাচ্ছে। মনে হতো ময়মনসিংহের পাণ্ডববর্জিত পূর্বপল্লী অবশেষে পঞ্চনদের দেশ থেকে আসা আর্যসন্তানদের পদধূলিতে ধন্য হলো।

বাড়িঘর পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য তারা নির্দেশ দিলেন। রাস্তাঘাট এবং পুকুর-ডোবাও তাদের নির্দেশে দ্রুত পরিষ্কার হয়ে যেতে থাকল। আমরাও আমাদের বাড়ির পেছনের পুকুর (কামিনীসরোবর) থেকে জমে ওঠা জার্মানির দাম দ্রুত পরিষ্কার করে ফেললাম। আমাদের বাড়ির সীমানা বরাবর কাঁটামেন্দির ঝোপগুলো অযত্নে আবর্জনা জঙ্গলে পরিণত হয়েছিল, সেগুলো একেবারে তুলে ফেলে দেয়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হলো। কার বাড়িতে কখন যে মিলিটারি এসে উপস্থিত হয় বলা যায় না। তবে আমাদের বাড়ি যে তাদের দৃষ্টি এড়াবে না তা সহজেই বলা চলে। ফলে আমাদের কাজ বাড়ল। আমার কাকামণি নিজে উদ্যোগী হয়ে বিশেষভাবে আমাদের বাড়ি এবং সাধারণভাবে পুরো গ্রাম পরিচ্ছন্ন রাখার অভিযানের তদারকি করতে শুরু করলেন। উদ্দেশ্য মিলিটারিদের মন জয় করা।

একদিন দুর্নীতির দায়ে বারহাট্টার রেশন ডিলার কুমুদ সরকারকে মিলিটারিরা ইউনিয়ন বোর্ডের অফিস থেকে ধরে নিয়ে গেল। এলাকায় সে সংবাদ ছড়িয়ে পড়ল দাবানলের মতো। বাঘে থাবা দিলে বা সাপে কাটলে মানুষ যেমন অন্তিম মুহূর্তে দ্রুত বিখ্যাত হয়— মিলিটারির হাতে ধরা পড়ার পর কুমুদ সরকারও রাতারাতি খ্যাতির চূড়ায় পৌঁছে গেলেন। আইয়ুব খানের পরই আমাদের কানে এলো কুমুদ সরকারের নাম। মিলিটারিরা ডাকবাংলোয় সংক্ষিপ্ত আদালত বসিয়ে কুমুদ সরকারের বিচার করলেন। শাস্তি নির্ধারিত হলো দশ ঘা বেত্রদণ্ড। বেত্রদণ্ড প্রদানের একপর্যায়ে কুমুদ সরকার অচৈতন্য হয়ে পড়েন। মিলিটারিরা তখন তাঁকে ফুটবল বানিয়ে বাংলোর সামনের মাঠের সবুজ ঘাসের ওপর ফুটবল প্র্যাকটিস করে। লোকমুখে ঐ নৃশংস আচরণের কথা শুনে আমার বাবা ও কাকামণির হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। কুমুদ সরকারের জন্য সমবেদনা বোধ করলেও আমরা তা কোথাও প্রকাশ করলাম না। দুর্নীতির জন্য না হিন্দু-ব্যবসায়ী হওয়ার অপরাধে কুমুদ সরকার এমন শাস্তি পেলেন—এ প্রশ্নের সদুত্তর না পেয়ে এলাকার হিন্দু-মুসলমানরা যখন দ্বন্দ্বে ভুগছিলেন, তখনই একদিন খবর বেরুল যে, ইউনিয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান মৌজালী তালুকদারকেও মিলিটারিরা ধরতে গিয়েছিল। কিন্তু পারেনি। কুমুদ সরকারের ঘটনার পর এলাকার সবাই সতর্ক হয়ে গিয়েছিল। মৌজালী সাহেব বোর্ড অফিসের দক্ষিণের জানালা দিয়ে ইঁদুরের মতো দ্রুত নির্গত হন এবং মাথাসমান উঁচু আমন ধানের ক্ষেতের ভেতরে পালিয়ে যান। মিলিটারিরা তাঁকে আর খুঁজে পায় না।

ঘটনাটি একদিকে হাস্যরসের সৃষ্টি করে, অন্যদিকে হিন্দুদের মনে এই স্বস্তি ভাব এনে দেয় যে, হিন্দুদের প্রতি কোনোরূপ বিশেষ বিদ্বেষ চরিতার্থ করার জন্য আইয়ুব খান পাকিস্তানের রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করেননি। ফলে আমার বাবা-কাকাসহ এলাকার প্রভাবশালী হিন্দুরা দ্রুতই আইয়ুব খানের ভক্ত হয়ে ওঠেন। সামাজিকভাবে অপমানিত এবং শারীরিকভাবে আহত কুমুদ সরকার অল্পদিনের মধ্যেই ভারতে চলে যান। কিছুদিন পলাতক থাকার পর চেয়ারম্যান মৌজালী সাহেবও ডাকবাংলোয় এসে মিলিটারিদের কাছে সারেন্ডার করেন। ততদিনে মার্শাল ল'র প্রথম ছোবলটা চলে গেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মিলিটারিরা চুল ছোট রাখার জন্য নির্দেশ দেয়। তখন চুল ছোট করার জন্য নন্দুরা গ্রাম থেকে খুইদ্যা নাপিতকে আমাদের বাড়িতে ডেকে আনা হয়। ইতোমধ্যেই মিলিটারির পছন্দসই মাপে চুল কাটার ব্যাপারে সে অভিজ্ঞ হয়ে উঠেছিল। আইয়ুব খানের ক্ষমতা দখলের আগ পর্যন্ত আমরা সহজে তার কাছে চুল ছাঁটতে রাজি হতাম না। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে আমরা মুখ বুঁজে খুইদ্যা নাপিতের ভোঁতা ক্ষুরের তলায়, তার ফাঁদসদৃশ দুই হাঁটুর ভেতরে আমাদের 'চিরউন্নত শির' সঁপে দিতে বাধ্য হই। আইয়ুব খান রাতারাতি খুইদ্যা নাপিতের মূল্য ও মর্যাদা বাড়িয়ে দেন। একেই বলে বিপ্লব।

অবশেষে আমাদের বহু প্রত্যাশিত দিনটি আসে। ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের সড়ক ধরে একদিন একদল মিলিটারি এসে আমাদের বাড়িতে উপস্থিত হয়। আমাদের বাড়িটি তখন একেবারে ছবির মতো তকতকে ঝকঝকে। বাড়িঘর পরিষ্কার রাখার সামরিক নির্দেশটি যে এই বাড়িতে বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে পালিত হয়েছে, তা বুঝে মিলিটারিরা খুশি হয়। আমাদের বাড়ির গাড়ি-বারান্দায় চেয়ার টেবিলগুলো তাদের আগমন-দুর্ভাবনায় পূর্ব থেকেই সাজানো ছিল। তারা আরাম করে ঐ সাজানো চেয়ারগুলোতে উপবেশন করেন। আমার কাকার সঙ্গে আকারে-ইঙ্গিতে, ইংরেজি-উর্দু মিশিয়ে তারা আলাপ শুরু করেন। কাকা এক পর্যায়ে বাংলার সঙ্গে কিঞ্চিৎ উর্দু মিশিয়ে সামান্য জলপান করে যাবার জন্য মিলিটারিদের অনুরোধ করেন। ভেতর-বাড়িতে তখন পারিবারিক ঝগড়া ভুলে গিয়ে আমার মা ও কাকীমা একসঙ্গে বসে মিলিটারিদের জন্য টাটকা ঘি দিয়ে লুচি ভাজছিলেন। কিন্তু যাদের জন্য এত আয়োজন, তারা শুধুমাত্র চা খেতে রাজি হন। আর তখনই বিপদ দেখা দেয়। বাড়িতে চা ছিল ঠিকই কিন্তু চিনি ছিল না। তখন দেশ জুড়ে চিনির আকাল চলছে। অনেক মূল্য দিয়েও চিনি পাওয়া ভার। মিলিটারিরা আমাদের আয়োজনের সবচেয়ে দুর্বল জায়গাটিতেই আঘাত করল।

বলল, 'আওর কুছ নেহি, শেরেফ চা নিকলাও।'

গলদঘর্ম হয়ে, অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে ভয়ে-ভয়ে তখন কাকা বললেন, ঘর মে তো চিনি নেহি, শেরেফ খেজুরের গুড় হ্যায়, গুড়ের চা চলে গা, স্যার'?

ভাগ্য ভালো, চিনির ঐ আকালের কথা মিলিটারিরাও জানত। তাই তারা একটুও বিরক্তি প্রকাশ করল না। কুমুদ সরকারকে শাস্তি দেবার একটা কারণও ছিল ঐ চিনি না পাওয়া। কুমুদ সরকার চিনি ব্ল্যাক করেছিল। মিলিটারিরা বলল, 'ঠিক হ্যা, কুছ পরোয়া নেহি, হামরা সাথ ডাক-বাংলো মে চলো, তুমলুগকো চিনি দেয় গা। হামরা সাথ চলো।'

খেজুরের চা চলবে কি চলবে না, সে কথা না বলেই তারা দ্রুত উঠে পড়ল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার কাকাতো ভাই রামেন্দু ভয়ে-ভয়ে চিনি আনতে ছুটল মিলিটারিদের পিছু পিছু। মিলিটারিদের সঙ্গে নিরাপদ দূরত্ব রেখে আমরাও ছুটলাম দল বেঁধে বারহাট্টার উদ্দেশ্যে। ডাকবাংলো থেকে একটু দূরে আমরা দাঁড়িয়ে থাকলাম। কুমুদ সরকারের স্মৃতি আমাদের মনে, বলা তো যায় না, বাঘের খাঁচা থেকে ভালোয় ভালোয় না ফেরা পর্যন্ত আমাদের ভয় কাটবে না। কিছুক্ষণের মধ্যে রামেন্দু একটা পুঁটলি হাতে ডাকবাংলো থেকে বেরিয়ে এলে আমরা তার দিকে দ্রুত ছুটে যাই। ধবধবে সাদা চিনি দেখে আমাদের প্রাণ জুড়িয়ে যায়। তা সের-দুয়েক তো হবেই। আইয়ুব খানের প্রতি কৃতজ্ঞতায় আমাদের মন ভরে যায়। মিলিটারিদের কাছ থেকে আমাদের চিনিপ্রাপ্তির সংবাদ দ্রুত এলাকা থেকে এলাকান্তরে ছড়িয়ে পড়ে।

দীর্ঘদিন ঐ চিনির অংশবিশেষ আমরা যত্নসহকারে মিলিটারিদের জন্য তুলে রেখে দিয়েছিলাম, যদি কোনোদিন তারা আমাদের বাড়িতে এসে বলে, 'শেরেফ চা নিকলাও'?

কিন্তু না, ঐ মিলিটারিরা আমাদের বাড়িতে আর কোনোদিন আসেনি।

আমরা যখন পঞ্চনদের দেশ থেকে আসা মিলিটারিদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ, তখন হঠাৎই একদিন আমাদের প্রিয় ন্যাপনেতা যশমাধবের আজিজ ভাইকে মিলিটারিরা গ্রেফতার করে। দেশের মানুষ যখন আইয়ুব খানের প্রশংসা করার ভাষা খুঁজে পাচ্ছিল না, তখন আজিজ ভাই নাকি আইয়ুব খানের নিন্দা করে কোথায় একটা বক্তৃতা দিয়েছিলেন।

তা এ রকম করলে একটু তো হবেই।

আমাদের গ্রামের দক্ষিণ-পূর্ব দিক ঘেঁষে একটি ছোট্ট নদী আছে। নাম ধলাই। এটি কংস থেকে বেরিয়ে আসা ধনাইখালির একটি শাখা। আমাদের গ্রামের দক্ষিণ-পূর্ব দিক দিয়ে প্রবাহিত হয়ে গিয়ে মিশেছে রাজাখালি নদীর সঙ্গে। ঐ নদীর তীরেই গাঁয়ের শ্মশান। কবরস্থানের মতো শ্মশানের জন্য বিস্তৃত জায়গার প্রয়োজন পড়ে না, কিন্তু আমাদের পূর্ব-পুরুষদের জায়গার অভাব ছিল না বলেই তারা শ্মশানের জন্য অনেকটা জায়গা ছেড়ে দিয়েছেন। নদীতীরেই ঐ উদ্বৃত্ত জায়গাটাকে আমরা খেলার মাঠে পরিণত করেছিলাম। মাঠটি কিছুটা ত্রিকোণাকৃতির ছিল। একটু অসুবিধা হলেও আমরা ঐরকম মাঠে খেলতেই অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম। মাঠটি ছিল খুবই উঁচু, বৃষ্টির দিনেও মাঠে জল জমত না, কাদা হতো না, ফলে আমরা প্রাণভরে ঐ মাঠে ফুটবল খেলতে পারতাম।

বাবার পকেট থেকে এক টাকা চুরি করে এবং এক টাকা চেয়ে নিয়ে মোট দুই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

টাকা চাঁদা দিয়ে আমি একবার আমাদের ফুটবল দলের ক্যাপ্টেন নির্বাচিত হই। আমানত বেপারীর দোকান থেকে আট টাকা দিয়ে একটা টি-শেইপের তিন নম্বর ফুটবল কিনি। ফুটবলের ভেতরে টুকটুকে লাল কোহিনুরের ব্লাডার। চামড়ার ফুটবলের যুগে প্রবেশ করার ঐ দিনটির কথা আমার বিশেষভাবে স্মরণে আছে। এর আগ পর্যন্ত আমরা খেলতাম জাম্বুরা দিয়ে এবং খড় দিয়ে বেণী তৈরি করে তাকে গোল করে দড়ি দিয়ে বেঁধে বলের মতো বানিয়ে। প্রাচীন যুগ অতিক্রম করে, চামড়ার ফুটবলের যুগে প্রবেশ করার ঐ দিনটি ছিল সকলের জন্যই স্মরণীয় অভিজ্ঞতায় ভরপুর। সে কী আনন্দ আমাদের! অবশ্য আমরা ফুটবল খেলার নাম করে যা খেলতাম, তাকে ফুটবল খেলা বলে ফুটবলকে নিয়ে খেলা বলাটাই ভালো। ফুটবল খেলার একটা রীতিনীতি আছে, তাতে খেলার মাঠের আকৃতি যেমন নির্দিষ্ট থাকে, তেমনি নির্দিষ্ট থাকে খেলোয়াড়ের সংখ্যা এবং খেলার সময়সীমা। আমাদের বেলায় সদ্যকেনা ফুটবলটি ছাড়া আর কোনোকিছুই নির্দিষ্ট ছিল না। মাঠটি, পূর্বেই বলেছি ছিল ত্রিকোণাকৃতির, খেলোয়াড়ের সংখ্যা প্রায়ই বাইশ ছাড়িয়ে যেত, দুই দলের খেলোয়াড়ের সংখ্যাসাম্যও সর্বদা রক্ষা করা সম্ভব হতো না। আর খেলার সময়? খেলার আবার সময় কি? যতক্ষণ বল দেখা যাবে, ততক্ষণই খেলা।

আমি ক্যাপ্টেন ছিলাম বলে আমার হেফাজতেই বলটা থাকত। পড়ার টেবিলের ওপর বলটাকে আমি এমনভাবে টানিয়ে রাখতাম যাতে পড়ার ফাঁকে ফাঁকে আমি ঝুলন্ত অবস্থায় বলটাকে দেখতে পারি এবং মাঝে-মধ্যে উঠে দু'একটা ঢুসও লাগাতে পারি। বলের চামড়ায় মাখন লাগালে চামড়া ভালো থাকে, ফুটবলের আয়ু দীর্ঘ হয়। আমার অনুরোধে মা আমার বলের জন্য কিঞ্চিৎ মাখন বরাদ্দ করেন। জমানো দুধ মাখন করে মা মাঠা বানাতেন। মাঠা মন্থনের সময় সাদা মাখন ভেসে উঠত। ঐ মাখন জাল দিয়ে মা ঘি তৈরি করতেন। মাঝে মাঝে ঐ মাখন-মাখা হাত দিয়ে মা আমার পড়ার ঘরে আসতেন এবং আমার নাকে-মুখে মাখন মাখিয়ে দিতেন, যাতে আমার মুখের চামড়া ভালো থাকে। আমি তখন মাকে বলতাম, আমার মুখে মাখন মাখানোর দরকার নেই, বলটার চামড়ায় মাখাও। মাঝে মাঝে আমি বলের জন্য মাখন চুরিও করতাম।

শ্রীকৃষ্ণ নিজের জন্য মাখন চুরি করতেন, আমি চুরি করতাম আমার বলের জন্য। এখানেই শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে আমার পার্থক্য।

এই ছেলেবেলার রচয়িতা যদি বড় হয়ে নামজাদা ফুটবল খেলোয়াড় হতো, তাহলেই বোধহয় বিধাতা রচয়িতার প্রতি সুবিচার করতেন। বড় হয়ে ফুটবল খেলোয়াড় হওয়ার কথাই আমি ভাবতাম। কবি হওয়ার ব্যাপারটি একবারও আমার মাথায় আসত না। আর আমি তা ভাবতে যাবই বা কোন্ দুঃখে? কবি যে হওয়া যায়, কবি যে হতে হয়, এমন দৃষ্টান্ত আমার চারপাশে ছিল না। বাবার মুখে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রবীন্দ্রনাথ, মাইকেল বা নজরুল সম্পর্কে যেসব গল্প শুনতাম তাতে আমার মনে কবি-সম্পর্কিত এমন একটি ধারণাই বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল যে, কবিরা সাধারণ মানুষ নন—তাঁরা ভগবান কর্তৃক প্রেরিত এক বিশেষ ধরনের জীব।

লেখাপড়া করতাম বড় কিছু একটা হওয়ার জন্য। চাকরি করে বাবার দুঃখ দূর করার জন্য। পরিবারের ওপর নেমে আসা অভাবের কালো মেঘটার মুখোমুখি দাঁড়াবার শক্তিলাভের জন্য। লেখাপড়া করতাম বটে, কিন্তু আমার অন্তরের সায় ছিল খেলায়।

বল্টু দিয়ে এক ধরনের খেলা তখন খুব চালু হয়েছিল। আমাদের ভাগ্নে সন্তোষ ছিল আমার সহপাঠী। বল্টু খেলায় ওস্তাদ। সে লেখাপড়ায় আমার সঙ্গে না পারায় শোধ তুলত বল্টু খেলায় আমাকে নাস্তানাবুদ করে। প্রায় নিয়মিতই সে আমাকে হারিয়ে দিত। বল্টু খেলায় হারতে হারতে আমার পিঠ যখন দেয়ালে ঠেকেছে, তখন আমার চোখ পড়ল আমাদের বাড়ির সামনে দীর্ঘদিন ধরে মুখথুবড়ে পড়ে থাকা স্কুলঘরটির দিকে। ঐ বড় টিনের ঘরটিতে নাট-বল্টুর অভাব ছিল না। আমি লুকিয়ে লুকিয়ে ঐ টিনের ঘরের চাল থেকে বল্টু সংগ্রহ করতে থাকি। পরে অন্যরাও ব্যাপারটা জেনে যায় এবং তারাও ঐ ঘর থেকে বল্টু সংগ্রহ করতে থাকে। ফলে কিছুদিনের মধ্যেই ঐ ঘরের টিনের চাল এবং টুইগুলো মূল কাঠামোর কড়ি-বর্গা থেকে আলাদা হয়ে যেতে শুরু করে। আমার বাবা ব্যাপারটা ধরে ফেলেন। বল্টুর বন্ধন থেকে আলগা হয়ে যাওয়া টিন এবং টুইগুলো সহজেই চুরি হয়ে যেতে পারে ভেবে তিনি ছিন্ন হতে বসা টিনগুলো বাড়িতে খুলে নিয়ে আসেন এবং পুনরায় স্কুলটি চালু করার জন্য উদ্যোগ নেন। যোগীশাসনের হরেন্দ্র সরকার এবং যশমাধবের রফিজ খাঁ সাহেবসহ এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয় এবং স্কুলটিকে পুনরায় চালু করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। দীর্ঘদিন মড়া হাতির মতো মাটিতে মুখথুবড়ে পড়ে থাকা স্কুলটি আবার দেখতে দেখতে মাথা তুলে দাঁড়ায়। আমাদের বল্টু খেলার একটি বাস্তব সুফল এভাবেই ফলেছিল। স্কুলটি নবউদ্যমে যাত্রা শুরু করে। কয়েকজন শিক্ষক নিয়োগ করা হয়, আশপাশের গ্রাম থেকে ছেলেমেয়েরা এসে স্কুলে ভর্তি হতে শুরু করে। দীর্ঘদিন পর স্কুলটি চালু হওয়াতে আমাদের গ্রামের হৃত গৌরব ফিরে আসে।

আমরা ভাইবোনরা ক্রমশ বড় হচ্ছি, আমাদের পড়াশোনার খরচ বাড়ছে, সেই সঙ্গে বাড়ছে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম— কিন্তু আমাদের আয়ের নতুন কোনো পথ খুলছে না। বাবা কবিরাজি করে ভাগ্য পরিবর্তনের চেষ্টা করলেন, কিন্তু তাতে লাভের চাইতে ক্ষতিই বাড়ল। দেখা গেল বিনা পয়সার রোগীদের ভিড় বাড়ছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফলে কবিরাজি করে ভাগ্য পরিবর্তনের আশা বাবা ত্যাগ করলেন, শুধু পারিবারিক প্রয়োজনের কথা ভেবেই কিছু কিছু ওষুধ তৈরি অব্যাহত রাখলেন; যেমন লক্ষ্মীবিলাস, শূলহরণ, চ্যবনপ্রাশ ইত্যাদি। আমাকে ছোটবেলায় বাবার তৈরি অনেক কবিরাজি ওষুধ খেতে হয়েছে।

আমাদের জমিগুলো তেমন উর্বর ছিল না। অধিকাংশই ছিল একফসলী। আমন এবং আউশ ধান যা পাওয়া যেত, বছরের খাদ্যচাহিদা পূরণ করতেই তা লেগে যেত। আমাদের জমিগুলো ছিল গ্রামের দক্ষিণপ্রান্তে, ধনাই নদীর তীরঘেঁষে। বর্ষার সময় প্রায়ই নদীর জলে ডুবে যায় বলে সেই জমিতে ধানচাষ খুবই ঝুঁকিপূর্ণ ছিল। পাটচাষ করা হতো। যে বছর পাটচাষ ভালো হতো এবং বাজারে পাটের ভালো দাম পাওয়া যেত, সে বছর আমাদের চিন্তা থাকত না। কিন্তু প্রায়ই হয় পাটের চাষ খারাপ হতো, অথবা পাটের দাম উঠত না, কখনও জাঁক দেয়া পাটের চালি বন্যার জলে ভেসে যেত, মাঝে মাঝে চুরিও হতো।

আমরা যতই বড় হতে লাগলাম, আমাদের অভাবও বাড়তে থাকল। জ্যাঠামশাই ময়মনসিংহ থেকে বাড়িভাড়া বাবদ মাসে ত্রিশ টাকা বাবা ও কাকার নামে মানি-অর্ডার করে পাঠাতেন। তেল নুন গুড় মসলার পেছনেই ঐ টাকা লেগে যায়। গৌরীপুর বাজারে আফতাবউদ্দীন মুন্সীর দোকান থেকে আমরা বাকিতে জিনিসপত্র আনি, বাড়িভাড়ার টাকা এলে সেই বাকি শোধ করা হয়। আমাদের বাড়িভাড়া বাড়ত না, কিন্তু মুন্সীর দোকানের পাওনা টাকার তাগিদ দিতে তিনি প্রায়ই আমাদের বাড়িতে বেড়াতে আসতেন। মাখন সরকারের কাপড়ের দোকানেও আমাদের বাকি বাড়তে থাকে। আমার স্কুলের বেতন, পরীক্ষার ফিস এবং খাতা-বই কেনার পয়সা যোগাড় করা ক্রমশ কঠিন হয়ে পড়ে। বাড়িতে ঢেঁকি চালু করে মা চাল বাঁচাবার উদ্যোগ নিলেন। তাতে মায়ের কাজ তো বাড়লোই, আমাদের ওপরও চাপ পড়লো। ধান উনুনে সিদ্ধ করা, রৌদ্রে শুকনো, তারপর ঢেঁকিতে ছাঁটা— এক বিরাট ঝামেলার ব্যাপার। মায়ের কষ্ট দেখে আমার কষ্ট হতো, আমি মাকে সাহায্য করতাম। মা'র একমাত্র ছোট ভাই, আমাদের প্রদীপ মামা, আমাদের বাড়িতে থেকে বারহাট্টা স্কুলে পড়তেন। তিনি পড়াশোনায় ভালো ছিলেন না। বয়সে আমার চেয়ে বছর তিন-চার বড় হলেও ফেল করতে করতে আমার সহপাঠীতে পরিণত হয়েছিলেন। আমরা ভাইবোন এবং প্রদীপ মামা মিলে ঢেঁকি পাড় দিতাম। মা ঢেঁকির আগায়, লুটের সামনে বসে হাত দিয়ে ধান নেড়ে দিতেন। কিছুক্ষণ পর পর আলগা হয়ে যাওয়া ধানের তুষ কুলা দিয়ে ঝাড়তেন— এই প্রক্রিয়াটা চলতে থাকত যতক্ষণ না ধানের তুষ পুরোপুরি অপসারিত হয়ে ধানের ভেতর থেকে সাদা ধবধবে চালগুলো বেরিয়ে আসে।

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একবার মায়ের ডান হাতের দুটো আঙুল চুরুনের আঘাত লেগে থেঁতলে যায়। আঙুল থেকে চুঁইয়ে রক্তে ভিজে লুটের সাদা চালগুলো লালবর্ণ ধারণ করে। এই দুর্ঘটনার জন্য আমিও কিছুটা দায়ী ছিলাম। মার থেঁতলে যাওয়া আঙুল এবং রক্তে-ভেজা লাল চালের দিকে তাকিয়ে আমার খুব কষ্ট হয়। বাবা তখন এ কাজ করা থেকে মাকে নিবৃত করার চেষ্টা করেন, কিন্তু কিছুদিন বিরতি দিয়ে মা আবার ধান ভানার কাজ শুরু করেন।

আমাদের ঘরে প্রায়ই চাল থাকত না, বিশেষ করে আমন ধান শেষ হয়ে যাওয়ার পর আউশ ধান আসার কয়েকটা দিন ছিল খুবই সংকটপূর্ণ—আমরা পাকতে শুরু করা ধানক্ষেতের দিকে তাকিয়ে থাকতাম। ভালো করে পাকবার সময় না দিয়েই ধান কেটে আনা হতো। বর্ষার দিনে ধান শুকানো যখন দুরূহ হয়ে উঠত, তখনই দেখা দিত বিপদ। পেটে প্রচণ্ড ক্ষুধা নিয়ে ছোট ভাইবোনেরা মায়ের পাশে ঘুরঘুর করত। আমি তখন পড়াশোনা এবং খেলাধুলা ফেলে মায়ের সাহায্যে এগিয়ে যেতাম। সদ্য ঢেঁকিছাঁটা চাল মা তখন উনুনে চড়াতেন।

বাইরে থেকে আমাদের বাড়ির অবস্থা দেখে যেমনটি মনে হতো, ভেতরের অবস্থা ছিল তার বিপরীত। রসুনবাটা দিয়ে মা এক ধরনের ডালের বড়া (গ্রাম্য ভাষায় বলা হতো ডাইলের চটা) তৈরি করতেন, সেই বড়া দিয়ে পান্তা ভাত খেয়ে আমি স্কুলে চলে যেতাম। টিফিনের পয়সা থাকত না, পেটে প্রচণ্ড ক্ষুধা নিয়ে দেড় মাইল হেঁটে বিকেলের দিকে যখন বাড়ি ফিরতাম, তখন নিজেকে খুবই দুঃখী মনে হতো। যে-জেলেরা একসময় আমাদের সস্তায় এবং কখনো বা বিনামূল্যে মাছ দিয়ে যেত, তারা সবাই প্রায় ভারতে চলে গেছে। বাজারে মাছের দাম বাড়ছে। বাজার থেকে মাছ কেনার পয়সা জুটত না। পূর্বে আমার মাছ ধরার ব্যাপারে বাবা আপত্তি করতেন, কিন্তু পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে আর আপত্তি তো করতেনই না, বরং খেলার পেছনে সময় নষ্ট না করে বিকেলে বর্শি নিয়ে মাছ ধরা ও মাঠে গরুকে ঘাস খাওয়ানোর ব্যাপারে আমাকে উৎসাহ দিতে শুরু করেন।

দাদামণি ভারতে চলে যাওয়ায় তাঁর অবর্তমানে আমিই ছিলাম বাড়ির বড় ছেলে। আমাকে কেন্দ্র করেই বাবার ভবিষ্যতের স্বপ্ন আবর্তিত হতে শুরু করে। আমিই তাঁর প্রধান ভরসা—আমি লেখাপড়ায় মোটামুটি ভালো। পরীক্ষায় পাস করে একদিন বড় চাকরি করে পরিবারের ভাগ্য পরিবর্তন করব, এমনটিই তিনি প্রত্যাশা করতেন। আমিও তেমনটিই চাইতাম—কিন্তু বৃত্তি পরীক্ষায় বৃত্তি না পাওয়ায় বাবা যেমন ব্যথিত হন, আমার আত্মবিশ্বাসেও তেমনি চিড় ধরে। অসহায় ডুবন্ত মানুষ যেমন বাঁচার আশায় খড়কুটো আঁকড়ে ধরে, বাবার অবস্থাটাও ছিল তেমনি। সংসারের টানাপোড়েনের মধ্যেও তিনি আমার পেছনে অর্থলগ্নি করতে থাকেন। অংকের জন্য অংকের জাদুকর রামবাবুকে রেখে দেন, ইংরেজির জন্য মালেক মাস্টার এবং বাংলা ও সংস্কৃতের জন্য আমাকে বারহাট্টার প্রখ্যাত পণ্ডিত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হরেন্দ্র গোস্বামীর সংস্কৃত টোলে ভর্তি করিয়ে দেন। বারহাট্টার বুড়ো সাব-রেজিস্ট্রার সাহেবের এক পুত্র জনাব নুরুল হক এমএ পরীক্ষা দিয়ে বারহাট্টায় বসে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন—আমাকে ইংরেজি পড়ানোর জন্য বাবা তাঁকে পাকড়াও করেন। বাবার অনুরোধ তিনি এড়াতে পারেননি, ফলে কিছুদিন আমি তাঁর কাছেও ইংরেজির তালিম নিই। বাবা আমাকে নিয়ে সিভিল সার্ভিসের স্বপ্ন দেখতেন। মালতী কাকা ও অতসী কাকার দৃষ্টান্ত তুলে আমাকে প্ররোচিত করতেন, আমি যেন তাঁদের যোগ্য উত্তরসূরি হতে পারি। তিনি অতসী কাকার মেধার দিকটাই শুধু বলতেন, তাঁর পাগল হয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা যেতেন এড়িয়ে। আমিও একটা বড় কিছু হওয়ার বাসনা বুকে নিয়েই রাত্রে পড়তে বসতাম, কিন্তু নৌকাবিলাসের রাধিকা কৃষ্ণের বিরহে কাতর হয়ে যখন গ্রামের কোনো বাড়িতে করুণ সুরে গান ধরত :

'শ্যামকুণ্ডে মাটি তলি,
যমুনার জলে গুলি'...বা
'না পোড়ায়ো রাধাঅঙ্গ
না ভাসেয়ো জলে'...।

আর সেই গানের সুরে তাল মিলিয়ে রাতের নির্জনতাকে ছিন্নভিন্ন করে যখন বংশীবাদকের আড়বাঁশিটি বেজে উঠত, তখন আমার মন মোগল সাম্রাজ্যের পতনের ইতিহাসকে অতিক্রম করে ছুটে যেত দূরে, আরও দূরে। রাধার বিরহবেদনার সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে যেত আমার কৈশোরিক চিত্তলোক। আমি বই বন্ধ করে মন্ত্রমুগ্ধের মতো গিয়ে হাজির হতাম টপযাত্রার আসরে। আমার চোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ত, কারো চোখে পড়ার আগেই আমি তা মুছে ফেলতাম। ঐ অভিনয়কৃত ঘটনাসমূহ যে সত্য নয়, তা আমার মন কিছুতেই মানতে চাইত না।

আমার মনের মধ্যে সরল আবেগ সৃষ্টির পেছনে বাবার ভূমিকাটাও একেবারে গৌণ ছিল না। তিনি চমৎকার কবিতা আবৃত্তি করতেন। একবার তিনি রবীন্দ্রনাথের 'দেবতার গ্রাস' কবিতাটি আবৃত্তি করে আমাদের শুনিয়েছিলেন। রাখালের মৃত্যু আমাকে এতটাই ব্যথিত করেছিল যে, আমাকে সামলাতে গিয়ে বাবাকে বেশ বেগ পেতে হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের মতো এমন নিষ্ঠুর মানুষ, মনে হয়েছিল পৃথিবীতে আর নেই। তিনি যদি সমুদ্র-দর্শনের আনন্দ দিয়ে মাসির বুকে রাখালকে ফিরিয়ে দিতেন, তাহলে কী ক্ষতিটা ছিল? দুঃখের ভেতর দিয়ে মানুষকে আনন্দ দেওয়াটাই কি কবির কাজ? বাবা আমার প্রশ্নের সদুত্তর দিতে পারতেন না। তিনি আমাকে বুঝাতে চাইতেন, এসব তো সত্য নয়; কল্পনা। বাবা কল্পনা বলে তুচ্ছ করলে কী হবে, আমার মনে হতো, কল্পনাই সত্য। এরপর বাবা আমাকে আর দুঃখের কবিতা আবৃত্তি করে শোনাতেন না। আমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে আপন মনে বলতেন— Life is Mathematics, not poetry.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু বাবা কবিতা না-শোনালে কী হবে, ততদিনে কবিতা এবং কবিদের প্রতি আমার মনের মধ্যে এক ধরনের দুর্বলতা সৃষ্টি হয়ে গেছে। আমাদের আশপাশের গ্রামের কোথাও কোনো কবি আছেন কিনা, সে সম্পর্কে খবর নিতে থাকলাম, কিন্তু পাওয়া গেল না। একজন লোককবির সন্ধান পাওয়া গেল, তাঁর নাম যোগেন্দ্র চক্রবর্তী। তিনি লোকান্তরিত হয়েছেন আমার জন্মের অনেক আগেই। তিনি পার্শ্ববর্তী বারঘর গ্রামের লোক ছিলেন, মুখে মুখে কবিতা বানাতে পারতেন। আমি খাতা-কলম নিয়ে লেগে গেলাম তাঁর কবিতা সংগ্রহের কাজে। সংগ্রহ করতে নেমে দেখলাম মাঠ একেবারে ফাঁকা। যোগেন্দ্র চক্রবর্তীর কথা অনেকেই মনে রেখেছে কিন্তু তাঁর রচিত কোনো সম্পূর্ণ কবিতাই পাওয়া গেল না। এলাকার বিভিন্ন মানুষকে নিয়ে তিনি ব্যঙ্গ কবিতা রচনা করতেন—, সেগুলোর কিছু কিছু সংগৃহীত হলো।

যোগেন্দ্র চক্রবর্তীর কবিতা সংগ্রহ করতে গিয়েই আমি ব্যঙ্গ কবিতা রচনা করার প্রেরণা লাভ করি। বারঘর গ্রামের হাতুড়ে বৈদ্য আবু ডাক্তার হন আমার কবিতার প্রথম শিকার। আবু ডাক্তারের আসল নাম ছিল কৃষ্ণপ্রসন্ন চক্রবর্তী। ডাক্তারি শুরু করার আগে তিনি উচ্চবর্ণের হিন্দুদের যজমানি করে বেড়াতেন। ক্রমবর্ধমান হারে যজমানদের দেশত্যাগ এবং তাদের আর্থিক অবস্থার অবনতি ঘটার ফলে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন আবু ডাক্তার দেখলেন বিপদ, যজমানিতে আর চলবে না। নিম্নবর্গের হিন্দুদের পুরোহিত হওয়ার ব্যাপারে তাঁর আপত্তি ছিল। ফলে শাস্ত্রপাঠের পরিবর্তে তিনি সহজ চিকিৎসা পদ্ধতি করায়ত্ত করার দিকে মনোযোগী হন এবং অত্যন্ত আকস্মিকভাবেই একদিন নিজেকে ডাক্তার বলে ঘোষণা করেন। নিম্নবর্ণের যে হিন্দুরা এতদিন তাঁর ধর্মীয় চিকিৎসার বাইরে ছিল, এবার তারাও তাঁর জীবিকা-উপার্জনের কাঁচামালে পরিণত হয়। নবাগত মুসলমানদের মধ্যেও তাঁর চিকিৎসা দ্রুত প্রসার লাভ করে। আধ্যাত্মিক-পদ্ধতির সঙ্গে কিঞ্চিৎ এলোপ্যাথি মিশিয়ে তিনি এক বিশেষ ধরনের চিকিৎসাপদ্ধতি আবিষ্কার করেন। এলকালি মিকশ্চার বলে একটা ওষুধ তখন বারহাট্টা সরকারি দাতব্য চিকিৎসালয়ে পাওয়া যেত। বিভিন্ন গ্রাম থেকে বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন রোগ গিয়ে সেই দাতব্য চিকিৎসালয়ে হাজির হতো—কিন্তু ফেরার সময় দেখা যেত সব রোগী একই ওষুধ নিয়ে বাড়ি ফিরছে।

আবু ডাক্তার ঐ দাতব্য চিকিৎসালয় থেকেই এলকালি মিকশ্চার তৈরির বিদ্যাটি শিখেছিলেন, পরে ঐ মহৌষধটির সাম্যবাদী প্রয়োগের ক্ষেত্রটিকে তিনি আরও প্রসারিত করেন। তাঁর খ্যাতির আরও একটা কারণ ছিল এই যে, তিনি রোগীদের ভিজিট প্রদানের ক্ষেত্রে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন নিয়ে আসেন। অর্থের একাধিপত্যকে অস্বীকার করে, বাজারে মূল্য সৃষ্টিতে সক্ষম যে কোনো বস্তুকেই তিনি ভিজিটরূপে গণ্য করার সিদ্ধান্ত নেন। ফলে তাঁর প্রসার ও উপার্জন একই সঙ্গে বৃদ্ধি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পায়। আমরা তাঁকে প্রায়ই রোগীদের বাড়ি থেকে আম, কাঁঠাল, আলু, লাউ, কলা-মুলা, নারকেল, চাল-ডাল ইত্যাদি পুঁটলিতে বেঁধে নিয়ে বাড়ি ফিরতে দেখতাম। অনেকে তাঁকে নিয়ে হাসাহাসি করত, কিন্তু তিনি নির্বিকার চিত্তে উচ্চকিত হাসিতে সবকিছুকেই উড়িয়ে দিতেন। এটি ছিল তাঁর এক মোক্ষম কৌশল।

তাঁকে নিয়ে লেখা আমার কবিতাটি প্রথমে ছোটদের মধ্যে এবং পরে বড়দের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ে। একসময় তা আবু ডাক্তারের কানে যায়।

একদিন স্কুলে যাবার পথে তাঁর সঙ্গে আমার হঠাৎ দেখা হয়ে যায়। তিনি সকালের বাজার করে বারহাট্টা থেকে বাড়ি ফিরছিলেন। গরমার কালীঘরের কাছে তাঁর সঙ্গে মুখোমুখি হতেই তিনি একগাল হাসিতে ফেটে পড়েন। আমাকে চিনেও না চেনার ভান করে বললেন : 'নির্মলেন্দু না'?

আমি সম্মতিসূচক মাথা নেড়ে বললাম : 'হ।'

তিনি মৃদু হেসে বললেন, 'তুমি নাকি কবি হইছো?'

বুঝলাম, আসল কথাটা তিনি একটু পরেই বলবেন। কী উত্তর দেব তাই ভাবছিলাম। কবি শব্দটা নিজের সঙ্গে যুক্ত হওয়ায় বেশ লজ্জাও পাচ্ছিলাম। লজ্জায় আমার চোখ মাটির দিকে নুয়ে এলো। আমতা আমতা করে বললাম : 'ঠিক তা নয়, যোগেন্দ্র চক্রবর্তীর কবিতা সংগ্রহ করতে গিয়ে হঠাৎ ইচ্ছে হলো নিজেই একটা... ।'

তিনি আমার মুখের কথা কেড়ে নিলেন। কবি যোগেন্দ্র চক্রবর্তী যে ব্যঙ্গ কবিতা লিখতেন সেটা তাঁর আমার চাইতেও ভালো জানা ছিল। ফলে তাঁর রাগটা যোগেন্দ্র চক্রবর্তী এবং আমার মধ্যে ভাগাভাগি হয়ে গেল। হেসে বললেন : 'ও তুমি যোগেন্দ্রর শিষ্য হইতে চাও?'

আমি মাথা নেড়ে বললাম, 'না, না, তা কি সম্ভব? তিনি অনেক বড় কবি ছিলেন। আমি তো সবেমাত্র... ।'

এ পর্যন্ত বলে আমি আর হাসি চেপে রাখতে পারলাম না। তিনিও আমার সঙ্গে হাসিতে যোগ দিলেন। তারপর সতর্কতার সঙ্গে চারদিকে তাকিয়ে নিয়ে বললেন : 'তোমার কবিতাটা আমাকে দেখাইও তো।'

মনে মনে বললাম, 'আমার কোথায়, এ-তো আপনারই কবিতা।'

আমার আরও একটি ছোট্ট কবিতা ভাইবোনদের মধ্যে বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল। কবিতাটি মাত্র দুই পঙক্তির।

কচি পাঁঠা বৃদ্ধ মেষ
ভগর কবিরাজ,
ডাক্তার এষ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'কচি পাঁঠা বৃদ্ধ মেষ' একটি প্রচলিত প্রবাদ। আমার ভোজনরসিক কাকা প্রায়ই এই প্রবাদটি বলতেন। আমাদের গাঁয়ের হদী সম্প্রদায়ের মধ্যে একজন কবিরাজ (ঝাড়ফুঁকও তার চিকিৎসার অন্তর্ভুক্ত ছিল) ছিলেন, তাঁর নাম ছিল ভগলচন্দ্র সিংহ এবং শচীন্দ্র এষ নামে সেনবাড়ির একজন ঘরজামাই ছিলেন। তিনি ছিলেন একজন স্বঘোষিত ডাক্তার। আমার দুই পঙক্তির কবিতাটি খুবই জনপ্রিয় হয়, গ্রামের ছোটরা চিৎকার করে পথেঘাটে তা আওড়াতে থাকে। ভগল সিংহের সঙ্গে এষবাবুর খুব প্রিয়-সম্পর্ক পূর্বে ছিল না, কিন্তু আমার ঐ কবিতার তাড়া খেয়ে দুই জনের মধ্যে দ্রুত মধুর সম্পর্ক গড়ে ওঠে। মানুষের ওপর কবিতার প্রভাব দেখে আমি ব্যাপারটার মধ্যে বেশ একটা মজা পেয়ে যাই। আমি অনুভব করতে পারি যে, আমার মাথার মধ্যে একটা পোকা ঢুকেছে। বাবার ভাষায় 'কবিতার পোকা।'

গরমা গ্রামের মণীন্দ্র গুণ মহাশয় বারহাট্টা থেকে মাইল চারেক দূরে বাউসি হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। তিনি ছিলেন বিএ, বিএল। আমরা যখন সেভেন ক্লাসে পড়ি তখন তিনি সরকারি প্রধান শিক্ষক হয়ে বারহাট্টা স্কুলে চলে আসেন। তিনি ছিলেন একজন প্রবল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন নিষ্ঠাবান আদর্শ শিক্ষক। যৌবনের প্রথম দিনগুলো তিনি কাটিয়েছিলেন মানিকগঞ্জের ইব্রাহিমপুরে। তেইশ বছর তিনি ঐ স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। তার ছাত্রদের মধ্যে ঢাকার প্রখ্যাত প্রকাশনী সংস্থা খান ব্রাদার্সের প্রতিষ্ঠাতা জনাব মোহাম্মদ আলী খান এবং বাংলা একাডেমীর প্রোগ্রাম অফিসার জনাব মোতাহার আহমদের মুখে আমি মণীন্দ্র গুণ মহাশয়ের অনেক প্রশংসা শুনেছি।

AMARBOI.COM

মণীন্দ্র গুণ মহাশয় ছিলেন আমার জ্ঞাতিভাই। সম্পর্কে ভাই হলেও তিনি ছিলেন আমার বাবার সমবয়সী। তিনি এতটাই রাশগম্ভীর প্রকৃতির মানুষ ছিলেন এবং তাঁর শিক্ষকসুলভ গাম্ভীর্যটা এমনভাবে তিনি সর্বদা বজায় রেখে চলতেন যে, বাড়িতেও তাঁকে আমরা দাদা বলার সাহস পেতাম না। আমরা তাঁর বাড়িতে গেলেও তাঁকে স্যার বলেই সম্বোধন করতাম। তিনি যে আমাদের জ্ঞাতিভাই, এ-কথাটা একসময় আমরা ভুলে যেতে বাধ্য হয়েছিলাম। পড়া না পারলে কিংবা স্কুল বা স্কুলের চৌহদ্দির বাইরে কোথাও কখনো কোনো অশোভন ব্যবহার করে ধরা পড়লে, তিনি ছাত্রদের এমনসব অপমানজনক শাস্তির ব্যবস্থা করতেন যে, কিছুদিন স্কুলে মুখ দেখানোই কঠিন হয়ে পড়ত। তাঁর একটি প্রিয় শাস্তি ছিল হাঁটু মুড়ে, কান ধরে শ্রেণীকক্ষের বাইরের বারান্দায় ছাত্রদের এমনভাবে বসিয়ে রাখা, যাতে অন্যান্য ক্লাসের ছাত্রছাত্রীদের ঘটনাটি নজরে পড়ে। এই শাস্তিটা ছিল তাঁর একেবারে নিজস্ব আবিষ্কার। আর ক্লাসের ভিতরে তো আমাদের নানা রকমের শাস্তি ভোগ করতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হতোই। পরে অপমানিত, শাস্তিপ্রাপ্ত ছাত্রের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে পেতে এমন একটা পর্যায় পৌঁছে যে, ঐ স্যারের দণ্ডভাগ করাটা আমাদের কাছে তেমন একটা অপমান বা অগৌরবের ব্যাপার বলে মনে হতো না।

স্যারের প্রিয়পাত্র হওয়ার জন্য আমাদের চেষ্টার অন্ত ছিল না, কিন্তু কাজটা ছিল খুবই কঠিন। সমগ্র জেলায় বৃত্তি পরীক্ষায় প্রথম হওয়ার পর মতি পর্যন্ত স্যারের কাছ থেকে সমীহ আদায় করতে পারেনি— আর আমরা কোন ছাড়!

একবার স্যারের প্রিয়পাত্র হওয়ার আশায় আমি আমার বন্ধু হুসেন আলীর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করি। হুসেন আলী তখন নিয়মিত বিড়ি খায়। বিড়ি না খেতে না পারলে নাকি তার ভাত হজম হয় না। পড়ায় মন দিতে পারে না। টিফিনের সময় আমরা দল বেঁধে বাজারে যেতাম বুট বাদাম লজেন্স বিস্কুট এইসব কিনতে। আর হুসেন আলী তখন টেন্ডুপাতার 'পরিমল বিড়ি' কিনত। স্যার জানতেন ছাত্রদের মধ্যে বিড়ি খাওয়া চালু আছে—সম্ভবত তিনি সুনির্দিষ্ট অভিযোগও পেয়ে থাকবেন। ক্লাসে ঢুকেই তিনি একদিন আমাকে উদ্দেশ্য করে বললেন : 'তোদের মধ্যে বিড়িখোর কে কে আছিস, দাঁড়া।'

অনেকক্ষণ কেটে গেল, কেউ দাঁড়াল না। দাঁড়াবার কথাও নয়। স্যার হয়তো তেমনটি আশাও করেননি। এবার তিনি বললেন : 'তোদের মধ্যে যে চার-পাঁচজন বিড়ি খানেঅলা আছে, সে আমি খবর রাখি। তোরা যারা বিড়ি খাস না, তোরা বল দেখি কে বিড়ি খায়।'

AMARBOI.COM

হুসেন আলী ছিল আমার পাশে, সে আমার হাতে সঙ্গে সঙ্গে চিমটি কাটল। তার মানে আমি যেন তার বিড়ি খাওয়ার কথাটি না বলি। চিমটি খেয়ে আমি সতর্ক হয়ে পড়লাম। তখন আমার পাশে হুসেন আলী, সামনে স্যার। ভাবলাম স্যারের প্রিয়তা লাভের এই মোক্ষম সুযোগটা হাতছাড়া করাটা ঠিক হবে না। দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললাম, হুসেন আলীর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করব। সিদ্ধান্তের উত্তেজনায় আমার নাড়ীর চঞ্চলতা বৃদ্ধি পেল—সেই চঞ্চলতা স্পর্শ করল হুসেন আলীকেও। সে আবার চিমটি কাটল আমার হাতে, এবার পূর্বের চাইতে আরো জোরে। কিন্তু কাটলে কী হবে, প্রথমবার চিমটি কেটে সে যে ভুলটা করে ফেলেছিল—অজস্র চিমটিতেও তা আর শোধরানোর উপায় ছিল না। ততক্ষণে আমি আমার মন স্থির করে ফেলেছিলাম।

আমাদের দু'জনের মধ্যে যে একটা দ্বন্দ্ব চলছে, স্যার তা বুঝতে পারলেন। মনে হয় হুসেন আলীর দিকে তাঁর পূর্ব থেকেই একটা সন্দিগ্ধ দৃষ্টি ছিল। তিনি আমাকে দাঁড়াতে বললেন। আমি উঠে দাঁড়ালাম। হুসেন আলী তখনও আমাকে প্রাণপণে চিমটি কেটে চলেছে। আমি নির্বিকার। স্যারের দিকে তাকিয়ে বললাম : 'স্যার হুসেন আলী...।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটি আধপোড়া এবং তিনটি তরতাজা 'পরিমল বিড়ি'সহ হুসেন আলী স্যারের হাতে ধরা পড়ল।

যে উদ্দেশ্যে আমি হুসেন আলীর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলাম, সে উদ্দেশ্য সফল হলো না। মাঝখান থেকে ওর সঙ্গে বন্ধুত্বটা নষ্ট হলো। ভেবেছিলাম এবার স্যারের কৃপাদৃষ্টি পড়বে আমার প্রতি। আমাকে আর কান ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে না। কিন্তু তা তো হলোই না বরং উল্টো ফল ফলল। স্যার বললেন :

'যারা এখনও শুরু করেনি কিন্তু শুরু করবে করবে করছে, আমি তাদের চেহারা দেখলেই বুঝতে পারি। নির্মলেন্দু তুমিও দাঁড়িয়ে থাকো।'

অগত্যা আমাকেও হুসেন আলীর সঙ্গে দাঁড়িয়ে থাকতে হলো। তবে কান ধরে নয়, এই যা তফাৎ।

এই দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন শিক্ষকের পাল্লায় পড়ে আমাদের ছাত্রজীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিল। আমরা তাঁর অসুস্থতার জন্য ভগবান ও আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতাম, কিন্তু একদিনের জন্যও তিনি স্কুল কামাই করতেন না। তিনি ছিলেন চিরসুস্থ।

একদিন শিক্ষকের অভাবে আমাদের স্কুল ছুটি হয়ে যাবে, এমন সংবাদ পেয়ে অধীর আগ্রহে আমরা অপেক্ষা করছি। এমন সময় স্যার এলেন আমাদের ক্লাসে। আমাদের ক্লাসে আসার আগে তিনি দশম শ্রেণীতে গিয়েছিলেন। সেখানে ছাত্রদের রেইনি ডে সম্পর্কে একটি ইংরেজি রচনা লিখতে বলে এসেছেন। নবম শ্রেণীর ছাত্রদের জন্য একই রচনা বরাদ্দ হয়েছে বাংলায়। অষ্টম শ্রেণীর জন্য নির্ধারিত হয়েছে সুলতান মাহমুদের ভারত আক্রমণের প্রশ্নটি—আর আমাদের সপ্তম শ্রেণীতে এসে কী কারণে জানি না, আর কোনো প্রশ্ন খুঁজে না পেয়ে তিনি বললেন : 'তোরা চুপ করে বসে কবিতা লেখ। আমি আসছি।'

এই বলে উপরের শ্রেণীগুলোতে তাঁর নির্দেশ কতটা পালিত হচ্ছে, তা তদারকি করার জন্য চলে গেলেন। ষষ্ঠ শ্রেণীতে, ভাগ্য ভালো একজন শিক্ষক ছিলেন। অন্যথায় তাদের ভাগ্যে গল্প লেখার নির্দেশ জুটত বলেই মনে হয়।

স্যার চলে যাওয়ার পর আমরা শর্ষে ফুল দেখতে লাগলাম। তারপর শুরু হলো সাদা কাগজের সঙ্গে কাঠ পেন্সিলের যুদ্ধ। অনেক কাগজ নষ্ট হলো কিন্তু কবিতা হলো না। ক্লাসের সেরা ছাত্র মতি, সর্ববিদ্যাবিশারদ রণজিৎ পর্যন্ত ব্যর্থ। যোগেন্দ্র চক্রবর্তীর কবিতা সংগ্রহ করতাম এবং আবু ডাক্তারকে নিয়ে একটি ব্যঙ্গ কবিতা লিখেছিলাম বলে সকলের দৃষ্টি তখন আমার দিকে নিবদ্ধ। কিন্তু সেই অভিজ্ঞতার কারণে নয়, মনে হয় স্যারের ভয়েই আমার কলম দিয়ে একটি ছোট্ট কবিতা বেরিয়ে এলো। কবিতা না হোক কবিতার মতো একটা কিছু যে হয়েছে তা বেশ বুঝতে পারছিলাম। আমি লিখছি আর কাটছি। এমন সময় স্যার এসে ঢুকলেন ক্লাসে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'কী লিখেছিস পড়।'

যাকেই বলেন পড়তে, সেই চুপ। পড়বে কি? লিখলে তো পড়বে। সবাই মাথা নত করে দাঁড়িয়ে থাকছে। আমার চঞ্চলতা তখন স্যারকে স্পর্শ করল। স্যার পেছনের বেঞ্চে জানালার পাশে বসা আমাকে উঠে দাঁড়াতে বললেন। আমি লজ্জিত মুখে উঠে দাঁড়ালাম। বুঝলাম ক্লাসের অন্তিম ভরসা আমি। সবাই তখন আমার দিকে তাকিয়ে আছে। বুকে সাহস সঞ্চয় করে আমি পড়তে শুরু করলাম :

'আমি এখন পড়ি যে ভাই, বারহাট্টা হাইস্কুলে।
একে অন্যে থাকি হেথায় ভাই-বন্ধু বলে।
এই স্কুলটি অবস্থিত কংস নদের তীরে,
আমাদের বাড়ি হইতে দেড় মাইল উত্তরে।'

ক্লাসের মধ্যে বিদ্যুৎতরঙ্গের মতো একটি আনন্দহিল্লোল বয়ে গেল। সবাই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচল। ক্লাসের ঐ আনন্দ স্যারকেও স্পর্শ করে। আমরা তাঁর চিরবিরক্ত মুখে একটুখানি হাসির ঝিলিক খেলা করতে দেখি। এতক্ষণ তিনি দাঁড়িয়ে ছিলেন, এবার গিয়ে চেয়ারে বসলেন। বললেন, 'আবার পড় তো?'

আমি আবার কবিতাটি পড়লাম। প্রথম পাঠের সময় নিজের কবিতা বলে একটু লজ্জামাখা বিব্রতভাব ছিল, দ্বিতীয়বার পাঠ করার সময় তা দূর হলো, মনে হলো আমি অন্য কোন কবির লেখা কবিতা পড়ছি।

স্যার হেসে ফেললেন। বললেন, 'হঁ। তর কবিতাটি তো হইছে মনে হয়। বান্দর কোথাকার। ব।'

তারপর ছাত্রদের উদ্দেশ্য করে বললেন : 'তোরা কি কছ, হইছে?'

তখন সমস্বরে সবাই বলল : 'হইছে স্যার, হইছে।'

স্যার বললেন : 'যা, আজ তোদের ছুটি।'

মৃদু হেসে তিনি ক্লাস থেকে বেরিয়ে গেলেন। ক্লাসের সবাই তখন আমাকে ঘিরে ধরল। আমার কবিতাটি হয়ে যাওয়াতে তাদের খুশির অন্ত নেই। বন্ধুরা আমাকে কবি বলে ক্ষেপাতে শুরু করল। তাতে আমি যেমন লজ্জা পেলাম, তেমনি একটু গর্বিতও বোধ করলাম। মনে হলো, আমি অন্য সকলের চেয়ে আলাদা। আমার মধ্যে একটা গোপন শক্তি আছে। শুধু মতির জন্য নয়, আমার জন্যও ক্লাস ছুটি হয়।

আমি যখন অষ্টম শ্রেণীতে পড়ি তখন আমাদের স্কুলে একজন নতুন শিক্ষক আসেন। সদ্য বিএ পাস করে এসে চাকরিতে ঢুকেছেন। জীবনের প্রথম চাকরি। তাঁর নাম মুখলেসুর রহমান। বাড়ি ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নবীনগর থানায়। দীর্ঘ দেহ। বড় বড় চোখ। মিষ্টি কণ্ঠস্বর। তাঁর চলাফেরা, কথা বলার ঢং—সবই অন্যদের চেয়ে আলাদা। তিনি সর্বদা পাজামা পাঞ্জাবি পরেন। আমরা বলতাম কবি কবি ভাব।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তিনি কবিতা লিখতেন না কিন্তু চমৎকার কবিতা আবৃত্তি করতেন। প্রথম দিন ক্লাসে ঢুকেই তিনি আমাদের চমকে দিলেন এই বলে যে, তাঁর প্রিয় কবি মাইকেল, রবীন্দ্রনাথ বা নজরুল এই তিন প্রধানের কেউ নন। তাঁর প্রিয় কবি হচ্ছেন জীবনানন্দ দাশ। এমন আশ্চর্য কথা শুনলে কার না কৌতূহল হয়। আমরা স্যারের প্রতি দারুণ কৌতূহলী হয়ে উঠলাম। জীবনানন্দের কথা তখনও আমরা শুনিনি বললেই চলে। পাঠ্যপুস্তকে তাঁর যে একটি কবিতা আছে, সেদিকে আমাদের চোখও পড়েনি। তা থাকলেই বা, তাই বলে তিনি এত বড় কবি? অসম্ভব। আমাদের অন্য শিক্ষকরা তো কেউ এমনটি বলেননি। তবে? ব্যাপারটা কি? মুখলেসুর রহমান স্যার তখন ব্যাপারটা পরিষ্কার করার উদ্দেশ্যে পাঠ্যপুস্তকের অন্তর্ভুক্ত জীবনানন্দের কবিতাটির প্রতি আমাদের সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। আমি বই খুলে কবিতাটির ওপর চোখ রাখলাম। কবিতার নাম 'আবার আসিব ফিরে।' মুখলেসুর স্যার আমাদের কবিতাটি পাঠ করতে বললেন। অনেকেই পড়ল। আমিও পড়লাম। কবিতা পড়তে গিয়ে আমরা সবাই হোঁচট খেলাম। জীবনানন্দের কবিতার সঙ্গে সেই আমাদের প্রথম পরিচয়। এ রকম কবিতা আমরা আগে পড়িনি।

আমাদের আবৃত্তি খুবই নিম্নমানের হলো। স্যার তাতে বিন্দুমাত্র বিরক্ত হলেন না। মাঝপথে কাউকে থামিয়েও দিলেন না। কবিতার ছন্দ বুঝতে না পারার কারণ কবিতাটিকে আমাদের কাছে একটি গদ্যরচনা বলেই মনে হলো। এমন সরাসরি কথা বলার ঢং যে কবিতায় আসতে পারে—তা আমাদের বিশ্বাস হচ্ছিল না। বাক্যগুলো বেশ দীর্ঘ-দীর্ঘ। পড়তে গিয়ে খেই হারিয়ে ফেলার অবস্থা। তবে কবিতার কথাগুলো আমাদের সবারই খুব পছন্দ হলো। কবিতায় ব্যবহৃত চিত্রকল্পগুলো আমাদের খুবই ভালো লাগল। ঐ কবিতায় বর্ণিত প্রকৃতির সঙ্গে আমরা আমাদের চারপাশের প্রকৃতির মিল খুঁজে পেলাম।

মুখলেসুর রহমান স্যার তখন নিজে কবিতাটি আমাদের আবৃত্তি করে শোনালেন। নাটকীয়তাহীন এমন আটপৌরে কবিতার আবৃত্তি আমরা পূর্বে কারও মুখে শুনিনি। স্যারের আবৃত্তি শুনে আমরা মুগ্ধ। স্যার কবিতার ভাবার্থ, ছন্দ এবং উপমা ও চিত্রকল্পগুলো আমাদের বুঝিয়ে বললেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা একই সঙ্গে মুখলেসুর রহমান স্যার ও কবি জীবনানন্দ দাশের ভক্তে পরিণত হলাম।

মুখলেসুর রহমান স্যার খুব বেশিদিন আমাদের স্কুলে থাকেননি, মাত্র বছরখানেক ছিলেন। তিনি ছাত্রদের মধ্যে বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করেন। তাঁর উদ্যোগেই একবার নেত্রকোনা থেকে ডায়নামা এনে আমাদের স্কুলে রবীন্দ্র-নজরুল জয়ন্তী পালন করা হয়েছিল। ওটাই ছিল বারহাট্টায় প্রথম বিজলি বাতির অনুষ্ঠান। বিজলি বাতির আলোয় উদ্ভাসিত বারহাট্টা স্কুল প্রাঙ্গণটিকে সেই রাতে নগরীর মতো লাগছিল। এলাকার হাজার হাজার নারী-পুরুষ, ছোট-বড় ছেলেমেয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এসে ভিড় করেছিল অনুষ্ঠানে। অনুষ্ঠানটিও দারুণ উপভোগ্য হয়েছিল। এলাকার মানুষের মনে আজও সেই রাত্রির স্মৃতি উজ্জ্বল হয়ে আছে।

অসম্ভব জনপ্রিয়তার কারণে স্কুলের কিছু কিছু শিক্ষক ও স্কুল কমিটির কারও কারও সঙ্গে তার মতবিরোধ হয়। তিনি তখন বিএড পড়ার জন্য স্কুলের চাকরি ছেড়ে দেবার সিদ্ধান্ত নেন। যেদিন তিনি বারহাট্টা ছেড়ে চলে যান—সেদিন বারহাট্টায় এক করুণ দৃশ্যের অবতারণা হয়। শত শত ছাত্র বারহাট্টা রেলস্টেশনে গিয়ে তাদের প্রিয় স্যারকে অশ্রুসজল শ্রদ্ধা নিবেদন করে। তাঁর বিদায়ে আমি খুব দুঃখ পাই।

বারহাট্টা ছেড়ে চলে যাবার সময় তিনি আমাদের উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন : 'আবার আসিব ফিরে।' কিন্তু তিনি আর ফিরে আসেননি।

বিএড পাস করার পর শিক্ষকতার চাকরি নিয়ে তিনি ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ফিরে যান। পরে ১৯৭১ সালে তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের ছোঁড়া একটি লক্ষ্যভ্রষ্ট গ্রেনেডের আঘাতে অকালে করুণ মৃত্যু বরণ করেন। ঘটনার দিনে তিনি একটি চায়ের স্টলে বসে চা খাচ্ছিলেন। তখন ঐ চায়ের স্টলে পাকবাহিনীর দোসর একজন কুখ্যাত রাজাকার চা পান করতে ঢুকেছিল। ঐ রাজাকারকে হত্যা করার উদ্দেশ্যেই মুক্তিযোদ্ধারা গ্রেনেড ছুঁড়েছিল। কিন্তু গ্রেনেডটি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে মুখলেসুর রহমান স্যারকে আঘাত করলে তিনি নিহত হন, রাজাকারটি বেঁচে যায়।

AMARBOI.COM

ঢাকার সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্ক ছিল না। ঢাকা সম্পর্কে আমরা বেশি কিছু জানতাম না। কলকাতার কথাই বেশি জানতাম। বড়দের কাছে কলকাতার গল্প পড়তাম। কবিতা গল্প উপন্যাসে ও পত্র-পত্রিকায় কলকাতার কাহিনী বেশি পড়তাম। রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে রহস্যকাহিনীর রচয়িতা নীহাররঞ্জন গুপ্ত এবং স্বপনকুমার পর্যন্ত আমার প্রিয় লেখকদের প্রায় সবাই ছিলেন কলকাতার। বই খুললেই কলকাতা। ঢাকা থেকে প্রকাশিত কোনো বই কখনও আমাদের হাতেই পড়ত না। ব্যতিক্রম ছিল শুধু পল্লীকবি জসীম উদ্‌দীনের বেলায়। তাঁর লেখা 'নকশী কাঁথার মাঠ' ও 'সোজন বাদিয়ার ঘাট' স্কুলের লাইব্রেরী থেকে এনে পড়েছিলাম। ঐ বইগুলো ছিল ঢাকা থেকে প্রকাশিত।

ঢাকায় আমাদের কোনো আত্মীয়স্বজন ছিল না। ফলে ঢাকা থেকে আমাদের বাড়িতে কোনো চিঠিও আসত না। আমাদের আপন মামা-মাসি, আপন ভাই, জ্ঞাতি ভাই-বোনসহ নিকট আত্মীয়স্বজনের অনেকেই কলকাতায় চলে গিয়েছিল। তাদের কাছ থেকে প্রায়ই চিঠি আসত। আমিই ঐসব চিঠি পোস্ট অফিস থেকে নিয়ে আসতাম। বড় হয়ে কলকাতায় যাবার স্বপ্নই দেখতাম। ঢাকা যে আছে, সে কথা আমাদের মনেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পড়ত না। ঢাকার প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি হয় এমন ঘটনা খুব কমই ঘটত; বরং উল্টো ঢাকা থেকে দাঙ্গার খবর আসত। তখন ঢাকার কথা ভেবে আমরা ভয়ই পেতাম।

ঢাকার প্রতি আমার মনে প্রথম আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছিল একটি গান শুনে। গানটি আমার বড় ভাই ও গ্রামের কৃষকদের মুখে শুনতাম। গানটি ছিল ভাওয়াল রাজাদের নিয়ে রচিত একটি পালা গানের অন্তর্গত। গানটির মুখটা আমার মনে আছে।

'মামার একখান মটর গো ছিল
দেখিতে সুন্দর
তাতে চইড়া বেড়াইতেন মামা
ঢাকার শহর।'

ঐ গানের ভিতর দিয়েই আমি সর্বপ্রথম কল্পনায় ঢাকাকে দেখি। মটরগাড়িতে চড়ে না হলেও অন্তত পায়ে হেঁটে হলেও ঢাকাকে স্বচক্ষে দেখা এবং ঐ শহরে ঘুরে বেড়ানোর ইচ্ছা তখন আমার মনে জাগ্রত হয়েছিল। পরে দাঙ্গাবিক্ষুব্ধ ঢাকার খবর শুনে মনটা দমে গিয়েছিল, ঢাকার সুন্দর ছবিটাও আমার মন থেকে মুছে যাচ্ছিল। তখনই আমার বন্ধু মতি ঢাকা সম্পর্কে আমার মনে নতুন করে আগ্রহের সৃষ্টি করে। মতি পাকিস্তান অবজারভার পত্রিকাটির গ্রাহক ছিল। সে নিয়মিত ঐ কাগজ পড়ত ইংরেজি শিখবার জন্য। প্রতিদিন ওর ঠিকানায় ঐ পত্রিকা আসত। স্কুল ছুটির পর আমি প্রায়ই মতির সঙ্গে ওদের বাসায় চলে যেতাম এবং অবজারভার পত্রিকার পাতায় চোখ বুলাতাম। মতির কাছ থেকেই আমি পত্রিকা পড়া শিখি। নিয়মিত পত্রিকা পাঠ করার কারণে ঢাকাসহ সারা পৃথিবীর কোথায় কী ঘটছে, সেসব খবর ছিল মতির নখদর্পণে। শুধু কবিতার বেলায় সে ছিল দুর্বল। ওটা মনে হয় সে আমার জন্যই ছেড়ে দিয়ে থাকবে। ফুটবল বা ক্রিকেট কোনোটিই সে নিজে খেলত না কিন্তু ঐসব খেলার ব্যাপারে ওর প্রচণ্ড আগ্রহ ছিল। বিশেষ করে ফুটবল ছিল ওর প্রিয় খেলা। ঢাকা ফুটবল লীগের প্রতিটি খেলা সম্পর্কে সে খবর রাখত। ঢাকার বিখ্যাত খেলোয়াড়দের মধ্যে কে কোন দলে খেলছে, কেমন খেলছে, কোন দলের চ্যাম্পিয়ন হওয়ার সম্ভাবনা—এসব ব্যাপারে ওর একেবারে নির্ভুল তথ্যভিত্তিক জ্ঞান ছিল। মতির সঙ্গে বন্ধুত্বের কারণেই দূর মফস্বলে থেকেও আমি ওমর, মুসা, গফুর বালুচ, মুরাদ বক্স, প্রতাপ হাজরা ও খামিশার খবর রাখতাম। মতির প্রিয় দল ছিল ভিক্টোরিয়া—মতির কারণে আমিও অকারণেই ভিক্টোরিয়া ভক্ত হয়ে যাই।

কবিতার প্রতি আমার আগ্রহের কথা ভেবেই একদিন মতি আমাকে ঢাকা থেকে প্রকাশিত একটি কিশোর পত্রিকার ঠিকানা সংগ্রহ করে দেয়। পত্রিকার নাম 'রঙধনু'। সম্পাদকের নাম মোসলেম উদ্দিন। আমি ঐ পত্রিকার গ্রাহক হওয়ার জন্য গ্রাহক-চাঁদা পাঠিয়ে ঐ পত্রিকার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে থাকি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিছুদিনের মধ্যেই আমার নামে এক কপি রঙধনু পত্রিকা আসে। পত্রিকাটি আমার খুব পছন্দ হয়।

পত্রিকার শেষ দিকে ছিল রঙধনুর আসরের সভ্য হওয়ার একটি কূপন। আমি তা পূর্ণ করে পাঠাই। জানি পরের সংখ্যায় আসরের নতুন সভ্য হিসেবে আমার নাম ছাপা হবে। আমি ছাপার হরফে আমার নাম দেখতে পাব। প্রবল উত্তেজনার মধ্যে আমার দিন কাটতে থাকে। কিন্তু রঙধনু আর আসে না। পোস্টাফিসের জানালার শিক ধরে আমি তীর্থের কাকে মতো দাঁড়িয়ে থাকি। আমার ব্যাকুলতা দেখে যোগেশ পিয়ন আর রাজ্জাক পিয়ন মুচকি হাসে। তারপর একদিন আমার ভাগ্যাকাশে সত্যিকারের রঙধনুর উদয় হয়। আমার নামে রঙধনু পত্রিকাটির একটি কপি আসে। বেশিক্ষণ খুঁজতে হয় না, অল্পক্ষণের মধ্যেই আমি নতুন সভ্যদের আসরে আমার নামটি মুদ্রিতরূপে দেখতে পাই। আমার সভ্য নম্বর ৫২৫। পোস্টাফিস থেকে স্কুলে পৌঁছার আগেই আমার সভ্য হওয়ার সংবাদ স্কুলে পৌঁছে যায়। তখন ঐ পত্রিকাটি বন্ধুদের হাতেহাতে ফিরতে থাকে। আমার মুদ্রিত নামটির ওপর আমি যে কত সহস্রবার চোখ বুলিয়ে অন্তরে তৃপ্তি লাভ করেছি, রঙধনু সম্পাদকের তা জানবার কথা নয়।

রঙধনুতে কবিতা ছাপার জন্য আমি তখন মরিয়া হয়ে উঠি। গোপনে গোপনে রঙধনুতে কবিতা পাঠাই। কিন্তু ছাপা হয় না। একসময় আমার নিজের ওপর আস্থা নষ্ট হয়ে যায়। বুঝি, আমার কবিতা ছাপার যোগ্য হচ্ছে না। অথচ আমার কবিতা ছাপা চাই। তখন আমার মাথায় একটা দুষ্টু বুদ্ধি খেলা করে। আমি বাড়ির পুরনো পত্র-পত্রিকা খুঁজে, 'প্রবাসী' পত্রিকার পাতা থেকে একটি কবিতা নির্বাচন করি। মনে করি, এই কবিতার রচয়িতার সন্ধান করা রঙধনু সম্পাদকের পক্ষে নিতান্তই অসম্ভব হবে। কবিতার রচয়িতার নাম মধুসূদন দত্ত। উনি যে ঐ মাইকেল মধুসূদন তা তখন আমি ঠিক বুঝতে পারিনি। আমি ভেবেছিলাম, অন্য কোনো মধুসূদন হবে। বাংলা সাহিত্যে যে মধুসূদনের এমন আকাল, তা কে জানত? মাইকেলের কোন কবিতাটি আমি লিখে পাঠিয়েছিলাম—তা আজ আর মনে করতে পারি না। আমি সুন্দর করে কবিতাটি কপি করি। কবিতাটির নিচে ততোধিক সুন্দর করে গোটা গোটা হরফে নিজের নাম লিখে তা রঙধনু সম্পাদকের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিই এবং পরবর্তী সংখ্যাটির জন্য গোপনে অপেক্ষা করতে থাকি।

আমি প্রতিদিনই দুপুরের টিফিনের সময় পোস্টাফিসে চলে যেতাম। একদিন পোস্টাফিসে গিয়ে আমার নামে আসা একটি পত্র পাই। খুব সম্ভব ওটাই ছিল আমার নামে আসা আমার জীবনের প্রথম পত্র। উত্তেজনায় আমার হাত কাঁপে। পত্রের লেখক রঙধনু পত্রিকার সম্পাদক জনাব মোসলেম উদ্দিন সাহেব স্বয়ং। পত্রটি পোস্টকার্ডে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লেখা। পত্রটি পাঠ করে আমি লজ্জায় মরে যাই। সম্পাদক সাহেব আমাকে যথাবিহিত আদর জানিয়ে লিখেছেন। আমি স্মৃতি থেকে যথাসম্ভব তুলে দিচ্ছি :

স্নেহের নির্মলেন্দু,

তুমি রঙধনুতে ছাপার জন্য যে কবিতাটি পাঠিয়েছ, তা মাইকেল মধুসূদন দত্তের কবিতা। তুমি নিজের লেখা কবিতা পাঠাও। অন্যের লেখা কবিতা আর পাঠাবে না।

চিঠির নিচে সম্পাদক সাহেবের স্বাক্ষর।

আমি সম্পাদকের পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হই। এত পুরনো পত্রিকা ঘেঁটে কবিতাটি বের করলাম, আর ঐ সম্পাদক কিনা তা ধরে ফেললেন!

সম্পাদকের নিজের হাতে লেখা পত্র জীবনের শুরুতে খুব কম লেখকের ভাগ্যেই জোটে। আমি সেদিক থেকে ভাগ্যবান বটে। কিন্তু ঐ সৌভাগ্যের বিষয়টি মুখ বুজে সহ্য করা ছাড়া, কাউকে বলার উপায় ছিল না। সম্পাদকের পত্র পাওয়ার আনন্দটা পত্রের বিষয়বস্তুর কারণে একেবারে মাঠে মারা গেল। আমি পত্রটি লুকিয়ে ফেললাম। এমন গুরুত্বপূর্ণ পত্রের মায়া ত্যাগ করাও কঠিন। আবার রাখাটাও কম বিপজ্জনক নয়, কখন কার চোখে পড়ে যায়। বহুদিন গভীর রাতে আমি গোপনে ঐ পত্রটি পড়তাম। পরে একসময় আমি নিজের হাতে ঐ পত্রটিকে বারঘরের খালের জলে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ভাসিয়ে দিই। এমন আত্মঘাতী পত্র, বোকা ছাড়া কে আর সংগ্রহ করে রাখে? 'অগত্যা মধুসূদন' বলে যে প্রবাদটি চালু আছে, আমার সাহিত্য-জীবনের শুরুতেই আমি তার অর্থ কিছুটা বুঝতে পেরেছিলাম।

রঙধনু পত্রিকার সঙ্গে অতঃপর আমি সকল সম্পর্ক ছিন্ন করি। যে পত্রিকা মধুসূদনের কবিতা ছাপে না, সেই পত্রিকা আমার কবিতা ছাপবে? অসম্ভব। বুঝি অযথা সময় ও অর্থ নষ্ট করে লাভ নেই। কবিতা লেখা বাদ দিয়ে আমি পড়াশোনায় মনোনিবেশ করি।

আমার চারপাশে ছিল গান। মাঠের চাষীরা প্রাণ খুলে গান গাইত। যেসব ভিক্ষুক ভিক্ষা করতে আসত আমাদের বাড়িতে, তাদের গলায়ও ছিল গান। ট্রেনে খোঁড়া-খঞ্জ ভিক্ষুকের মুখে ছিল নেত্রকোনার মরমী কবি জালাল খাঁ সাহেবের গান। চাঁন মিয়ার গান। হাটে-বাজারে গান। দেহতত্ত্ব, আধ্যাত্মিক, মারফতী গানই ছিল বেশি; তবে মাঝে মাঝে রামপ্রসাদী এবং কীর্তনও শোনা যেত।

আমাদের গ্রামের হদী সম্প্রদায়টি ছিল গানের পাগল। এদের ছেলেরা ছোটবেলায় যাত্রাদলে গান করত। এদের প্রায় প্রত্যেকের বাড়িতেই গানের সরঞ্জাম থাকত। কারও বাড়িতে হারমোনিয়াম, কারও বাড়িতে খোল, কারও বাড়িতে একতারা বা খঞ্জনি—আর বাঁশির তো কথাই নেই। বাঁশি প্রায় প্রত্যেকের বাড়িতেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছিল। হদীদের ছোট ছোট ছেলেদের মুখে চমৎকার বাঁশি বাজানো শুনে মনে হতো, এরাই হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণের আসল বংশধর। বাঁশি হাতেই ওদের জন্ম।

কয়েক ছিলিম গঞ্জিকা এবং কিছু খিচুড়ি-বাতাসার ব্যবস্থা করলেই আমাদের গ্রামের হদীরা কীর্তনের দল নিয়ে এসে উপস্থিত হতো আমাদের বাড়িতে। তারপর সারা রাত ধরে চলত নামকীর্তন।

এই হদী সম্প্রদায়ের মধ্যে একজন অতি উঁচুমানের সাধক কবি ছিলেন। তাঁর নাম বীরচরণ সিংহ বা বীরচরণ সাধু। তাঁর গানে তুষ্ট হয়ে আমার ঠাকুরদাদা তাঁকে কিছু খাজনামুক্ত ভূমি দান করেছিলেন। আমাদের বাড়ির একটু পেছনেই ছিল তাঁর বাড়ি ও আশ্রম। আমার জন্মের কিছুকাল আগে তিনি লোকান্তরিত হন। বিশেষ করে হদী সম্প্রদায়ের মধ্যে তাঁর গান খুব জনপ্রিয় ছিল। তবে আশপাশের গ্রামের কীর্তনকারদের মুখেও আমি বীরচরণ সাধুর গান শুনেছি বলে মনে পড়ে।

হদী সম্প্রদায়ের মধ্যে লেখাপড়ার প্রচলন ছিল না। এরা লেখাপড়ার ব্যাপারটা আমাদের ওপর ছেড়ে দিয়ে পরম নিশ্চিন্তে জীবন কাটাত। গল্প আছে, একবার এক হদীর পুত্রকে স্কুলে ভর্তি করা হয়েছিল। ছেলেটি স্কুলে যাবার পরপরই অসুস্থ হয়ে পড়ে। অনেক চিকিৎসা করেও তাকে আর সুস্থ করা সম্ভব হয়নি। হদীদের ধারণা, লেখাপড়া শিখতে চাওয়ার জন্যই ঐ ছেলেটির অকালমৃত্যু হয়।

সেই ঘটনার পর ঐ সম্প্রদায়ের মধ্যে লেখাপড়া নিষিদ্ধ হয়ে যায়। আঙুলের টিপসহিতেই যখন কাজ হয় তখন মনুষ্যসৃষ্ট বর্ণমালাগুলোর কাছে নতিস্বীকার করার কোনো প্রয়োজন আছে? প্রয়োজন যে নেই, তা বীরচরণ সাধুর রচিত গান শুনলেই বোঝা যায়। বীরচরণ লেখাপড়া জানতেন না, কিন্তু লেখাপড়া না জানাটা তাঁর ঐ বিখ্যাত গানগুলো রচনা করার পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়নি।

প্রাচীনকালের শ্রেষ্ঠ কাব্যগুলো কীভাবে রচিত হয়েছিল এবং চারপাশের অনুরাগী ভক্তদের স্মৃতিপথ ধরে পরবর্তীকালের মানুষের কাছে কীভাবে পৌঁছেছিল—তার নিদর্শন পাওয়া যায় বীরচরণের গানে। বীরচরণের বেশকিছু গান আমি হদীদের কাছ থেকে সংগ্রহ করি। তাঁর রচিত যে বন্দনাগীতিটি হদীরা কীর্তনের আসর শুরু করার আগে গাইত তা এ রকম :

আমি ডাকি তোমায় বিনয় কর
আইসো প্রভু এই আসরে।
তুমি আসিলে আনন্দ হবে
নিরানন্দ দূরে যাবে।

এই প্রভু হচ্ছেন শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু। ওরা সবাই ছিল মহাপ্রভুর ভক্ত। কত রকমভাবে যে ঐ বন্দনাগীতিটি গীত হতো—মনে হতো রাত্রির নির্জনতাকে ওরা সঙ্গীতের সুরে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বন্দী করেছে। আমাদের চৈতন্যকে ফাঁকি দিয়ে রাত্রি গড়াত ভোরের দিকে। গান থেমে যাবার পর মনে হতো আমরা ভক্তিরসের সুধাসাগর থেকে ছিটকে পড়েছি এক নগ্ন নির্জন নিষ্ঠুর পৃথিবীতে। আমার খুব ইচ্ছে হতো আসরে বসে ওদের সঙ্গে গলা মিলাই। কিন্তু একে তো আমার বেসুরো গলা ওদের সাধা গলার সঙ্গে মিলত না, তা ছাড়া ওরা ছোট-বড় নির্বিশেষে মহাপ্রভুর নামে সকলে মিলে সিদ্ধি সেবন করত বলে পাছে আমার সঙ্গীতপ্রীতি আমাকে সিদ্ধিসেবনে উৎসাহিত করে—এই ভয়ে আমার গুরুজনরাও আমাকে হদীদের গানের আসরে বসতে দিতেন না। তাই বাড়ির সকলের সঙ্গে বারান্দায় বসেই আমাকে গান শুনতে হতো।

বীরচরণের তিনটি গান এখানে তুলে দেয়া হলো :

১

আমায় আর কতদিন মায়াডোরে রাখিবেন হরি।
ওগো সুখে কিবা দুখে, স্বর্গে কি নরকে
যখন যেভাবে থাকি—
শুধু ভক্তিডোরে, তব পদনীড়ে
বাঁধা থাকে প্রাণপাখি।
ও মরিলে ও মরিলে যেন ভুলি না তোমায়
আমার স্থান থাকে যেন শ্রীপাদপদমূলে
পাখি আমার আমার বুলি ছাড়া হে,
ও পাখি বলো সদায় হরি, হরি।

২

আয়রে ও ভাই হরিগুণ গাই
এমন শুভদিন আর হবে নারে ভাই।
এলো দুটি ভাই গৌর-নিতাই
এমন দয়াল আর জগতে কেহ নাই।
তারা করে হরির ধ্বনি, মধুর মধুর শুনি;
আজ কেন ওরে হৃদয় গলে যায়!

লেগেছে হৃদয়ে প্রেমের তুফান
ঘুচে দিতে যত মায়া মোহ জ্ঞান।
তুমি ধর নিতাইয়ের পায় পড়ি হে ডরাই
তবে দয়া করবেন দয়াল নিতাই।

না জেনে মেরেছো নিতাইয়ের মাথায়
কী জানি কী হবে নাহিরে উপায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বীরচরণের প্রাণ কাঁদে অবিরাম
দেখিতে বাসনা গৌর-নিতাই।
হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল...

৩
যদি দীনকে দয়া কর হরি দীনদয়াময়।
হরি হে, অতি অকাতরে,
পশু-পক্ষি কিম্বা নরে
আমি জন্ম নিব বারেবারে
কেবল এসে যদি পাই তোমারে।
তবেই আমার হয়।

হরি হে আমি চাই না শক্তি,
চাই না জীবের পরম মুক্তি
কেবল তোমার চরণের প্রতি
ভক্তি যেন রয়—
হরি হে দীনদয়াময়।

হরি হে, ও সে আসবে যখন
কারে দিবে প্রেমালিঙ্গন?
শূন্য তুল্য হবে জীবন-মরণ
তোমার চরণ বিনা আশা নাই, আশা নাই—
কেবল প্রেমসাগরে হয়ে মগন রয় যেন হৃদয়।

উল্লিখিত গানগুলো প্রতিটি ঘণ্টার পর ঘণ্টা গীত হয়—কিন্তু কখনও পুনরাবৃত্তির ত্রুটি শ্রোতার কর্ণকে পীড়িত করে না। কথা ও সুর মিলেমিশে একাকার হয়ে এমনই এক ইন্দ্রজালের সৃষ্টি করে যে, শ্রোতাচিত্ত ভক্তিরসের এত অতি উচ্চ স্তরে পৌঁছে যায়। নিজ কানে না শুনে ঐ গানগুলোর ভক্তিরসের উচ্চতাকে বুঝানো সম্ভব নয়।

হিন্দুদের দেবদেবীর সংখ্যা সম্ভবত হিন্দুর মোট সংখ্যার চাইতে কিছু বেশিই হবে। আমাদের বাড়িতে বারো মাসে তেরো পার্বণ লেগেই থাকত। আমার বাবার এসব ব্যাপারে আগ্রহ না থাকলেও আমার মা কম খরচে যথাসম্ভব বেশিসংখ্যক দেব-দেবীর পূজা সম্পন্ন করার পক্ষপাতী ছিলেন। বাবা মায়ের ঐরূপ পূজার অভ্যাস নিয়ে মাঝে-মধ্যে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করতেন। কিন্তু মাকে খুব বেশি ক্ষেপাতে সাহস পেতেন না। বাবা ছিলেন শান্তিবাদী এবং পরমতসহিষ্ণু। আমার মায়ের ধারণা হলো, আমাদের পরিবারের ওপর অপদেবতার দৃষ্টি পড়েছে। অপদেবতার হাত থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্যই তিনি নানা দেব-দেবীর পূজা করে চলেছেন। একবার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তিনি এমন একটি পূজার আয়োজন করেন, যার সম্পর্কে আমাদের কোনো ধারণাই ছিল না। পূজাটির নাম বাস্তুপূজা। বাস্তুভিটা থেকে উচ্ছেদ হওয়া বা জমির ফসল নষ্ট হয়ে যাবার ভয়েই ঐ পূজা করার বিধান প্রচলিত। মায়ের আগ্রহে বাবা ঐ অপমানজনক পূজার আয়োজনে সায় দেন। আমাদের নদীতীরবর্তী ঘুনার একটি পরিত্যক্ত বাস্তুভিটায় ঐ পূজার আয়োজন করা হয়। আমরা বাড়ি থেকে পূজার যাবতীয় সরঞ্জাম বহন করে পূজাস্থলে নিয়ে গিয়েছিলাম। পূজার প্রসাদ ছাড়াও ওখানে বনভোজনের মতো দুপুরে রান্না হয়েছিল। আমরা খোলা আকাশের নিচে, খেতের আলের ওপরে বসে কলার পাতা বিছিয়ে দুপুরের প্রসাদ খেয়েছিলাম। ঐ অভিনব পূজা দেখার জন্য গ্রামের লোকজন এসে পূজাস্থলে ভিড় করেছিল। ঐ পূজাটি আর কোথাও কখনও আমি হতে দেখিনি।

পূজার ব্যাপারে আমিই ছিলাম মায়ের প্রধান ভরসা। পূজার প্রয়োজনীয় উপচার সংগ্রহের ক্ষেত্রে আমার বিশেষ পারদর্শিতা ছিল। আমি নদীর ওপারের বারুই পাড়ার পানের বরোজ থেকে তাজা পান, নদীর পাড়ের জঙ্গল থেকে খুঁজে খুঁজে লাল কেয়া ফুল, গণেশের বাড়ির বেলগাছ থেকে সবুজ পল্লববিশিষ্ট বেলপাতার ডাল, আমগাছ থেকে পোকায় কাটেনি এমন পল্লববিশিষ্ট আমের ডগা সংগ্রহ করে আনতাম। তাতে মায়ের পক্ষে দেবদেবীর পূজা করা খুব সহজ হতো। আমার মা হুতোমের পূজাও করতেন। ঐ পূজার জন্য যে ফুল ব্যবহার করা হতো সেগুলোর নামই ছিল হুতোম ফুল। আমাদের গ্রামে ঐ ফুলের অভাব ছিল না। সহজেই সংগ্রহ করা যেত।

তিনি মাঘ মাসে শিয়ালের পূজাও করতেন। পিঠা তৈরি করে তা উঠোনে গর্ত খুঁড়ে তার ভিতরে মাটিচাপা দিয়ে পুঁতে রাখা হতো। মনে করা হতো, রাত্রে শিয়াল এসে যদি গর্তে পুঁতে রাখা ঐসব পিঠা ভক্ষণ করে, তা হলে গৃহস্থের মঙ্গল হবে। বাবা হাসতেন। আমারও হাসি পেত। আমি ভাবতাম তাহলে বিড়াল-কুকুরই বা বাদ যাচ্ছে কেন? তবে মুখ ফুটে বলতাম না। মা যদি দুঃখ পান।

এত পূজা-অর্চনা করার পরও আমার মন বিদ্রোহী হয়ে উঠত। মাঝে-মাঝেই হিন্দুদের দেবদেবীর ক্ষমতা সম্পর্কে আমার মা যেমন ধারণা দিতেন বা ব্রতকথায় তাঁদের শক্তি সম্পর্কে যা বলা হতো, আমার সেগুলো সত্য বলে মনে হতো না। মনসা দেবীর চাইতে চাঁদ সওদাগরের ক্ষমতাকেই মনে হতো অধিকতর বাস্তবসম্মত। অধীনতা স্বীকার করে দেবীকৃপা লাভের ব্যাপারে যে শিক্ষাটা মা প্রচার করেছিলেন, আমার মন তা মেনে নিতে পারছিল না। মা কালীর রুদ্র ভীষণ মূর্তিটাই শুধু আমার মনে কিছুটা ভীতির সঞ্চার করতে পেরেছিল। তাই স্কুলে যাওয়া-আসার পথে বারঘর ও গরমা গ্রামে পাথের পাশে যে দুটো কালীবাড়ি পড়ত—অভ্যাসবশত আমি ঐ দুই কালীকেই প্রণাম করতাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শনিবার বাড়িতে প্রায়ই শনির পূজা হতো। শনির পূজার প্রসাদ ঘরে নিতে নেই। বাইরেই খেয়ে শেষ করতে হয়। এটাই নিয়ম। ঐ পূজায় কাউকে নিমন্ত্রণও করতে হয় না। পূজা-শেষে চারদিকে চারবার ডেকে বলতে হয়—'যার যার মনের সাধ/আওগাইয়া (এগিয়ে এসে) লও শনির প্রসাদ।' ঐ ডাক শুনে যারা আসত তাদের সবার হাতেই শনিপূজার প্রসাদ তুলে দেয়া হতো। মা বলতেন, শনি খুব ভয়ঙ্কর দেবতা। এই দেবতাকে নিয়ে কখনও ফাজলামো করবি না। আমি ফাজলামো করতাম না বটে, কিন্তু ঐ ক্রুদ্ধ দেবতাকে ঘিরে আমার মনে খুব কৌতূহলের সৃষ্টি হয়েছিল।

একদিন স্কুল থেকে দল বেঁধে বাড়ি ফেরা পথে শুনি গরমা এবং বারঘর গ্রামের মধ্যবর্তী পথে পুলের কাছে, বড়ইগাছের তলায় কে বা কারা শনি ঠাকুরকে বসিয়ে রেখে গেছে। ঘটনাটি জানাজানি হয়ে যাবার পর শনির কোপদৃষ্টি থেকে আত্মরক্ষার জন্য সবাই মূলপথ ছেড়ে ঘুরপথে যাতায়াত করছে। ওটাই নিয়ম। যে তাঁকে প্রথম দর্শন করবে, শনি তার কাঁধেই চড়বেন। পুজো ছাড়া নামবেন না। শনির কথা শুনে পুলের কাছে এসে সবাই যখন ঘুরপথ ধরেছে, তখন আমার হঠাৎ কী কারণে জানি মনে হলো, না আমি ঘুরপথে যাব না। আমি বললাম, আমি এ-পথেই যাব।

সবাই চিৎকার করে আমাকে বারণ করল।

আমি বললাম : 'দেখাই যাক না কী হয়।'

আমি এগিয়ে গেলাম বড় গাছের তলায় বসে থাকা শনি ঠাকুরের দিকে। আমার সঙ্গীরা তখন ভয়ে যে যেদিকে পারে ছুটে পালাচ্ছে। চারপাশে তাকিয়ে দেখি কেউ নেই। আমি একা। আমার সামনে মাটির পুতুলের মতো শনির বিগ্রহ। কালো কুচকুচে তাঁর শরীর। কপালে সিঁদুরের লাল টিপ। তার পায়ের কাছে ছড়ানো-ছিটানো গাঁদাফুলের কিছু পাপড়ি। বেচারা শনি ঠাকুরের জন্য আমার খুব মায়া হলো, সমগ্র দেবকুলে এমন নিঃসঙ্গ দেবতা আর একজনও নেই। তাঁকে পথের পাশে একা রেখে যেতে আমার মন চাইল না। আমি তাঁকে আদর করে প্যান্টের পকেটে পুরে নিলাম।

মজার কাণ্ডটা হলো এরপর। আমি বাড়ির দিকে এগুচ্ছি, আমার সঙ্গে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে আমার সঙ্গীরা আগে আগে দৌড়াচ্ছে। আমি বাড়ি পৌঁছার আগেই খবর পৌঁছে গেল, আমি পকেটে করে শনি ঠাকুরকে নিয়ে এসেছি। খবর শুনে আমাকে বাধা দেবার জন্য তখন আমার মা-কাকিমাসহ বাড়ির সবাই বাড়ি ছেড়ে স্কুলঘরের কাছে ছুটে এলো। উদ্দেশ্য, আমাকে বাড়িতে প্রবেশে বাধা দেয়া, যাতে শনি ঠাকুরকে নিয়ে আমি বাড়ির সীমানার মধ্যে প্রবেশ করতে না পারি।

আমি মজা করার জন্যই কাজটা করেছিলাম, তার ফল যে এমন ভয়াবহ হতে

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পারে তা আমার ধারণায় আসেনি। শনি ঠাকুরকে বাড়ির ভিতরে নিয়ে যাবার ইচ্ছেও আমার ছিল না। আমি উনাকে বাড়ির সামনের পুকুরে বিসর্জন দেবার কথাই মনে মনে ভেবেছিলাম। ঐ পুকুরে কলার ভেলায় তুলে আমরা মনসা দেবীকে বিসর্জন দিতাম। ভেবেছিলাম ঐ পুকুরে বিসর্জন দিলে মনসা দেবীর সঙ্গে শনি ঠাকুরের দেখা হবে। তাদের মধ্যে ভাব হবে। তাতে শনি ঠাকুরের নিঃসঙ্গতা দূর হবে। কিন্তু হলো না। স্কুলের সামনেই আমি প্রবল বাধার সম্মুখীন হলাম। মা দূর থেকে মিনতি করে বললেন : 'যা বাবা, ওনাকে যেখান থেকে এনেছিস ওখানেই রেখে দিয়ে আয়। আমাদের বিপদে ফেলিস না।'

শনি ঠাকুর তখন আমার পকেটে। ভয় দেখাবার জন্য আমি পকেটে হাত দিয়ে বললাম : 'তোমরা ঠাকুরকে দেখবে না?'

সঙ্গে সঙ্গে সবাই চোখ বন্ধ করে ফেলল। সমস্বরে মা-কাকিমা বলে উঠলেন : 'নারে বাপু, না। আমাদের অমঙ্গল হবে। তুই আমাদের রক্ষা কর। শনি বড় তেজের ঠাকুর।'

তাদের কথা শুনে মনে হলো তারা যেন সাক্ষাৎ শনি ঠাকুরের সঙ্গেই কথা বলছেন। কিন্তু আমি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছিলাম না, যাকে আমি এত আদর করে পকেটে পুরে নিয়ে এসেছি, তিনি কেন আমার বা আমাদের প্রতি ক্ষুব্ধ হবেন? তিনি তো বরং খুশি হবেন। কিন্তু কে শোনে কার কথা। আমার গুরুজনেরা আমার পায়ে ধরাটাই শুধু বাকি রাখলেন। আমি তখন আমার মত পাল্টাতে রাজি হয়ে বললাম, 'ঠিক আছে, আমি তাঁকে বারঘরের খালে বিসর্জন দিয়ে আসছি।'

আমার সুমতি হয়েছে বুঝে সবাই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলেন। আমি বারঘরে পুলের ওপরে গিয়ে শনি ঠাকুরের ওপর শেষবারের মতো চোখ বুলিয়ে নিয়ে, তাকে আদর করে খালের জলে ডুবিয়ে দিলাম।

বাবার মুখে রবীন্দ্রনাথের 'দেবতার গ্রাস' কবিতা শোনার পর রাখালের জন্য আমার যেমন মায়া হয়েছিল, শনি ঠাকুরের জন্যও আমার তেমনি মায়া হলো। বিসর্জন দেবার সময় আমার চোখভরে জল এসে গেল।

বাড়ি ফেরার পর কলের জলে স্নান করিয়ে আমাকে ঘরে তোলা হয়। আমার এবং আমার পরিবারের কাঁধে যাতে শনি ভর করতে না পারে, সেজন্য পাঁঠা বলি দিয়ে পরের শনিবারেই শনিপূজার আয়োজন করা হয়।

ঐ ঘটনার পর থেকে সবাই আমাকে বেশ সমীহ করে চলত। ভয় পেত। সবাই আশংকা করত অচিরেই আমার খুব খারাপ কিছু একটা হয়ে যাবে। কিন্তু খারাপ কিছুই হলো না। পরীক্ষায় ভালো নম্বর পেয়ে ক্লাসে দ্বিতীয় স্থান লাভ করে আমি নবম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হলাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমাদের বাড়িতে দুর্গাপূজা হতো না। অনেক আগে হতো। পরে সেই পূজা বন্ধ হয়ে যায়। বন্ধ হয়ে যাওয়ার পেছনে একটা গল্প চালু আছে। আমাদের পূর্বপুরুষদের একজনকে দুর্গাপূজা চলতে থাকা অবস্থায় নাকি বাঘে খেয়েছিল, ঐ ঘটনার পর সবাই দুর্গার প্রতি ক্ষেপে যায়। তাঁর পূজা বন্ধ করে দেয়া হয়। যে দুর্গা তার পূজারীর বিরুদ্ধে ব্যাঘ্র লেলিয়ে দেয়, সেই দেবীর পূজা করে লাভ কী?

আমাদের আশপাশের গ্রামে যে-সব বাড়িতে দুর্গাপূজা হতো, তাদের বক্তব্য অবশ্য ছিল ভিন্ন, তারা ঐ বাঘে-খাওয়ার গল্পটিকে আমল দিতেন না। তারা বলতেন, গুণরা হচ্ছে কিরপিন অর্থাৎ কৃপণ। দুর্গাপূজার প্রচুর খরচ এড়ানোর জন্যই এই গল্পের অবতারণা। আমিও পরেরটাই বিশ্বাস করতাম। আমার বাবা-কাকা দুর্গাপূজার ব্যাপারে খুব উৎসাহী ছিলেন না। বাবার কাছে শুনেছি, আমার ঠাকুরদাদা ময়মনসিংহে ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করতে আসা শ্রীকেশব সেনের পাল্লায় পড়ে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণের ব্যাপারটিও আমার ঠাকুরদাকে উৎসাহিত করেছিল। পরে বারঘর এবং আন্দাদিয়ার প্রতাপশালী ব্রাহ্মণদের চাপে পড়ে আমার ঠাকুরদা প্রায়শ্চিত্ত করে পুনরায় হিন্দু হয়েছিলেন। আমার বাবা-কাকাদের মধ্যে ঐ ঘটনার রেশ থেকে গিয়েছিল। তাতে খরচও কমত, কিন্তু আমরা ছোটরা যে কোনো পূজা নিয়ে মেতে থাকতেই পছন্দ করতাম। আমাদের বাড়িতে শুধু একটা পূজাই একটু জাঁকজমকের সঙ্গে হতো, সেটি হচ্ছে সরস্বতী পূজা। আমার নিজের মায়ের নাম ছিল বীণাপাণি। সরস্বতীর এক নাম বীণাপাণি, অর্থাৎ যাঁর হাতে বীণা থাকে। এই পূজার প্রতি বাবারও আগ্রহ ছিল। যারা মূর্তি গড়ে তাদের বলা হয় আচার্য ব্রাহ্মণ। আমরা তাঁদের বাড়ি থেকে মূর্তি কিনে নিয়ে আসতাম। কখনো কখনো একটু বেশি পয়সা সংগ্রহ করে নেত্রকোনায় ছুটে যেতাম আধুনিকা-দেবীর সন্ধানে।

সরস্বতী পূজার পূর্বে আমাদের কুল খাওয়া ছিল নিষিদ্ধ। কেউ যদি লোভ সামলাতে না পেরে কুল খেত, তাহলে তার ভবিষ্যত ছিল একেবারে ঝরঝরে। পরীক্ষায় নির্ঘাত ফেল। আমরা এটা বিশ্বাস করতাম। এই সরস্বতী দেবীকে আমাদের মুসলমান বন্ধুরাও রীতিমতো সমীহ করে চলত। আমরা খাগের কলম দুধজল মেশানো কালিতে চুবিয়ে নিয়ে, তা দিয়ে বেলপাতায় সরস্বতীর নাম লিখতাম— তারপর সেই বেলপাতাগুলো বিভিন্ন পাঠ্যবইয়ের মধ্যে ভরে রাখতাম, যাতে সংশ্লিষ্ট গ্রন্থটি সহজেই আমাদের আয়ত্তে আসে। অঞ্জলি দেবার সময় দেবীর উদ্দেশ্যে আমাদের একটি মন্ত্র বলতে হতো। সেই মন্ত্রটি ছিল চমৎকার অনুপ্রাসাদধ্বনিপূর্ণ, অন্তমিলসমৃদ্ধ। আমার মন্ত্রটি বেশ ভালো লাগত। মন্ত্রটি হচ্ছে :

'জয় জয় দেবী, চরাচর সারে
কুচযুগ শোভিত মুক্তাহারে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বীণারঞ্জিত পুস্তক হস্তে,
ভগবতী দেবী ওঁ নমস্তে।'

লক্ষ্মী এবং সরস্বতী—এঁরা দুর্গার দুই মেয়ে। লক্ষ্মী ধনের দেবী এবং সরস্বতী হচ্ছে লেখাপড়া, শিল্প-সাহিত্য ইত্যাদির। এ-দুয়ের মধ্যে বীণাপাণির প্রতিই ছিল আমার পক্ষপাত। আর আমার মায়ের সঙ্গে নামের মিল থাকার কারণে সরস্বতী পূজাটা আমার জীবনে এক ভিন্ন স্বাদ নিয়ে আসত।

একবার সরস্বতী পূজার সময় আমাদের বন্ধুদের মধ্যে কাদের প্রতিমা কত সুন্দর, এই নিয়ে প্রতিযোগিতা হয়। আমরা বিভিন্ন বাড়িতে ঘুরে ঘুরে চাঁদা তুলতাম। এটাকে বলা হয় পূজার মাগন। ব্যাপারটা ভিক্ষা মাগার মতোই। তাতে বেশ চাল পাওয়া গেল। বিক্রি করে অনেক টাকা হলো। ঐ টাকা দিয়ে আমরা চলে গেলাম ময়মনসিংহ শহরে। ওখানে একজন মুসলমান আচার্য ছিলেন, নাম রশীদ। মহারাজা রোডে ছিল তার ওয়ার্কশপ। দুর্গামূর্তি বানিয়ে তিনি তখন খুব নাম করেছিলেন। হিন্দুরা তাঁর মূর্তি তৈরি করা নিয়ে প্রশ্ন তোলেনি—মুসলমানরাও আপত্তি তোলেনি। রশীদ সাহেবের সঙ্গে আলাপ করে আমার খুব ভালো লাগল। তিনি আমাকে কম খরচায় চমৎকার একটি সরস্বতী বানিয়ে দেবার প্রতিশ্রুতি দিলেন, যাতে প্রতিযোগিতায় আমরা জয়ী হতে পারি।

AMARBOI.COM

পূজার আগের দিন রাতের ট্রেনে আমরা যখন রশীদের বানানো সরস্বতী নিয়ে বারহাট্টা স্টেশনে নামলাম, হ্যাজাক লাইটের আলোতে বারহাট্টা স্টেশনের পুরো চেহারাটাই পাল্টে গেল। সবাই বলল, এমন চমৎকার সরস্বতী তারা পূর্বে কখনো দেখেনি। রশীদের নাম এবং দাম দুই-ই গেল বেড়ে। এই চমৎকার মূর্তিটি একজন মুসলমানের তৈরি জেনে স্থানীয় মুসলমানদের আগ্রহও যুক্ত হলো। হিন্দু-মুসলমান মিলে বহু লোক দূর থেকে আমাদের ঐ প্রতিমা দর্শন করতে এলেন। ফলে উদ্বৃত্ত প্রসাদের চাহিদা মেটাতে আমরা আবারও চাল-ডাল চাঁদা তুলে খিচুড়ি বানাতে বাধ্য হলাম।

হিন্দুদের ছুঁৎমার্গের যেমন শেষ নেই, তাদের গ্রহণক্ষমতাও তেমনি অসীম। পূজামণ্ডপে মুসলমানদের পদস্পর্শে যে পূজা নষ্ট হয়, সেই দেবীই যদি হন কোনো মুসলমানের তৈরি, তাতে ধর্মে বাধে না।

রশীদ ছিলেন জাতপাতের ঊর্ধ্বে একজন সত্যিকারের শিল্পী। ইউরোপে জন্ম হলে তিনি হতেন মাইকেল এঞ্জেলো বা রঁদার মতো। এখানে সেই পরিবেশ ছিল না। অকৃতদার চির-নিঃসঙ্গ রশীদ ছিলেন এক মূর্তিমান বিদ্রোহ।

পরে সেই বিদ্রোহের শাস্তিও তিনি পেয়েছিলেন, পুরস্কারের পরিবর্তে। ১৯৭১-এ পাকবাহিনী তাঁকে মহারাজ রোডের ঐ বাড়িতেই গুলি করে হত্যা করে। তাঁর নির্মিত শিল্পকর্মসমূহের ভিতরেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৯৬২-এর গোড়ার দিকে আমাদের স্কুলে একজন নতুন শিক্ষক আসেন, তাঁর নাম শ্রীযতীন্দ্র চন্দ্র সরকার। আমরা তখন নবম শ্রেণীর ছাত্র। মুখলেসুর রহমান স্যার চলে যাবার পর আমাদের বাংলা সাহিত্যের ক্লাসগুলো কিছুটা প্রাণহীন হয়ে পড়েছিল। যতীন স্যার আমাদের সাহিত্যের ভাঙা-হাটে নতুন প্রাণের জোয়ার নিয়ে আসেন। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি আমাদের প্রিয় শিক্ষকে পরিণত হন। সমাজজীবনে কাব্য ও সাহিত্যের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আমার মনের মধ্যে যে সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছিল—তিনি তা দূর করেন। বিভিন্ন যুগে শিল্প-সাহিত্য কীভাবে সমাজ পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে, অকাট্য যুক্তিতে তিনি তা আমাদের কাছে তুলে ধরতেন। তাঁর কণ্ঠস্বর ছিল মাইকের মতো চড়া। বিষয়-ব্যাখ্যার ক্ষমতা ছিল অসাধারণ। আবেগ এবং ভাবের চাইতে তিনি যুক্তি এবং তথ্যভিত্তিক সাহিত্য পর্যালোচনায় অধিকতর আস্থাশীল ছিলেন। সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস, দর্শন, অর্থনীতি, সমাজনীতি থেকে শুরু করে ধর্মতত্ত্ব পর্যন্ত প্রতিটি বিষয়কেই তিনি তাঁর আলোচনায় নিয়ে আসতেন। তিনি বলতেন যে, এগুলোর মধ্যে একটি নিবিড় যোগসূত্র রয়েছে। পল্লী-সাহিত্যের প্রতি তাঁর বিশেষ আগ্রহ এবং পক্ষপাত ছিল। তাঁর স্মৃতিশক্তি ছিল অবিশ্বাস্য। স্মৃতি স্মৃতি থেকে তিনি প্রায়ই দীর্ঘ নির্ভুল উদ্ধৃতি ব্যবহার করতেন। তাঁর বাড়ি ছিল কেন্দুয়ায়। থাকতেন স্কুলের লাগোয়া শচীন্দ্র দে মহাশয়ের বাড়িতে, তাঁদের মধ্যে কী একটা আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল। বাবার সঙ্গেও পরে তাঁর ভালো সম্পর্ক হয়।

বারহাট্টা ক্লাবের প্রাণপুরুষ ছিলেন কবিরাজ শ্রীনারায়ণ চক্রবর্তী মহাশয়। তাঁর একটি আয়ুর্বেদীয় ফার্মেসি ছিল গৌরীপুর বাজারে। এলাকার বিশিষ্ট সংস্কৃতিবান ব্যক্তিরা ঐ ফার্মেসিতে আড্ডা দিতেন। নারায়ণবাবু নিজে ছিলেন ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির একজন কর্মী। বাবার বিশিষ্ট বন্ধু। বাজারে গেলে তো কথাই নেই, আড্ডা দেবার জন্যও বাবা নারায়ণবাবুর ফার্মেসিতে যেতেন। অচিরেই যতীন্দ্র স্যার ঐ আড্ডার প্রাণপুরুষে পরিণত হন। বারহাট্টার বিশিষ্ট পণ্ডিত, কবিরাজ শ্রীহরেন্দ্র গোস্বামীর সঙ্গেও বাবার বিশেষ সম্পর্ক ছিল। কিছুদিন আমি তাঁর টোলে সংস্কৃত পড়েছি। যতীন্দ্র স্যার গোস্বামীবাবুর টোলেও বসতেন। ধর্মতত্ত্ব এবং সাহিত্য নিয়ে আলাপ-আলোচনা হতো। আমিও সেই সব চমৎকার পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা কখনো কখনো শুনতাম। তিনি বছর দুয়েক আমাদের স্কুলে ছিলেন। তারপর ১৯৬১ সালে স্কুলের শিক্ষকতা ছেড়ে দিয়ে মাস্টার্স ডিগ্রি নেয়ার জন্য তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। আমরা হঠাৎ পাওয়া আমাদের প্রিয় শিক্ষককে হারিয়ে আবার সেই দুঃখকে অনুভব করি, মুখলেসুর রহমান স্যার চলে যাবার সময় যেমনটি আমাদের হয়েছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গৌরীপুর বাজারে মতিদের গুদামঘরের সামনের বারান্দায় একটা পুরনো সিঙ্গার সেলাই কল নিয়ে একজন ঢাকাইয়া খলিফা বসতেন, তাঁর নাম নয়া মিয়া। শীর্ণ-দীর্ঘ দেহ লম্বাটে মুখ। গায়ের রং কালো। যত্নে পাট করা তাঁর মাথার কালো চুলগুলো ছিল কিছুটা কোঁকড়ানো। নয়া মিয়ার প্রিয় পোশাক ছিল দামি লুঙ্গির ওপর সাদা হাফ শার্ট। বয়স ত্রিশের কাছাকাছি, কিন্তু বিয়ে থা করেননি। যা উপার্জন করতেন, চায়ের স্টলে আড্ডা মেরে, বন্ধু-বান্ধবদের খাইয়ে, যাত্রা-সিনেমা দেখে উড়িয়ে দিতেন। তিনি ছিলেন অন্য সকলের চেয়ে আলাদা। কাজে তার মন ছিল না, জমানোর জন্য অর্থ উপার্জনের দিকেও তার খুব একটা লক্ষ্য ছিল না। মনে হতো, তিনি টাকা উপার্জন করেন শুধু ওড়ানোর জন্য। সংসারে এমন লোকের কখনো বন্ধু-বান্ধবের অভাব হয় না, কিন্তু প্রকৃত বন্ধু এরা কখনো পায় না। বিভিন্ন বয়সের মানুষের সঙ্গে অনায়াসে তিনি মিশতে পারতেন। মানুষকে কাছে টানার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল তাঁর। তাঁর ছিল প্রাণখোলা হাসিমুখ এবং গল্প বলার সহজাত শক্তি। মুখে কথার খই ফুটত, গল্পুটে হিসেবে তাঁর খ্যাতি ছিল বাজার জুড়ে।

আমার বন্ধু মতির সাথে তাঁর খুব ভাব হয়। মতিই একদিন নয়া মিয়ার সাথে আমাকে পরিচয় করিয়ে দেয়। মতি যে অবজারভার পত্রিকাটি রাখত, নয়া মিয়া মতির ঘরে বসে ঐ পত্রিকায় চোখ বুলাতেন। ইংরেজি জানতেন না, কিন্তু এমনভাবে তিনি পত্রিকায় চোখ বুলাতেন, যারা তাঁর ইংরেজিবিদ্যার দৌড় জানত না, তারা ভাবতেন নয়া মিয়ার মতো লোকদের জন্যই ইংরেজি ভাষাটি এখনো দেশে চালু আছে—তা না হলে কবেই তা বিদায় নিত। আসলে তাঁর চোখ ঘুরে বেড়াত ছবিতে। ছবি দেখে এবং মতির কাছ থেকে মূল সংবাদটা জেনে নিয়ে নয়া মিয়া বেরুতেন লেটেস্ট সংবাদে বাজার মাত করতে।

মতির মাধ্যমে ঢাকার প্রতি আমার যে আকর্ষণ সৃষ্টি হয়েছিল—নয়া মিয়ার সঙ্গে পরিচিত হবার পর, তাঁর কাছে ঢাকা শহরের গল্প শুনে শুনে ঢাকার প্রতি আমার আকর্ষণ বহু গুণে বৃদ্ধি পায়। মতি বা আমি কেউই কখনো ঢাকায় যাইনি, আর নয়া মিয়া নাকি সেই স্বপ্ননগরী ছেড়ে চলে এসেছেন এই গণ্ডগ্রামে। নয়া মিয়া বলতেন, তিনি ঢাকা ছেড়েছেন অর্থ উপার্জনের জন্য নয়, বাজারের অন্য পাঁচজন ঢাকাইয়া ব্যবসায়ী যেমন নয়া মিয়াকে দেখে, তাঁর জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার গল্প শুনে মনে হতো জীবনের পথে তিনি এক দুঃসাহসিক অভিযাত্রী। আপাতত যদিও তাঁর নৌকো ভিড়েছে, কিন্তু তাঁর গন্তব্য অন্য কোথাও, অন্য কোনখানে।

নয়া মিয়া আমাদের কাছে ঢাকা স্টেডিয়ামের গল্প বলতেন। আমরা পত্রিকায় যে সব সিনেমা হলের বিজ্ঞাপন দেখতাম, যেসব হলে সিনেমা দেখে একদিন জীবন ধন্য করার স্বপ্ন দেখতাম—নয়া মিয়া ঐ সব সিনেমা হলের কোনটাতে কখন কোন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছবি দেখেছেন, তা মুখস্থ বলে যেতেন। তাঁর মুখস্থ বিদ্যাটা তিনি যে কেন লেখাপড়ার কাজে প্রয়োগ করেননি, তা ভেবে পেতাম না।

মতি তখন সারা ময়মনসিংহ জেলার সেরা ছাত্র। আমিও একেবারে মন্দ নই, তা ছাড়া আমার কবিতা লেখার খবরটাও একেবারে লুকানো নেই। রঙধনু পত্রিকায় আমার নাম ছাপা হওয়ার সংবাদটিও তখন অনেকেরই জানা হয়ে গেছে। তাই আমাদের মতো দু'জন গুরুত্বপূর্ণ ছাত্রের সঙ্গে নয়া মিয়ার গড়ে ওঠা নতুন সম্পর্কটা সবার চোখে পড়ল। বাজারের সবাই নয়া মিয়াকে সমীহ করতে শুরু করল। আমি, মতি আর নয়া মিয়া মিলে তখন ঘণ্টার পর ঘণ্টা গল্প করে কাটাই। সেই গল্পের বিষয়— ঢাকা। আমরা টেস্ট পরীক্ষার পরপরই নয়া মিয়ার নেতৃত্বে ঢাকা অভিযানে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিই। নয়া মিয়া সানন্দে আমাদের ঢাকা ভ্রমণে নেতৃত্ব দিতে সম্মত হন।

টেস্ট পরীক্ষার আগে বাবার সঙ্গে আমার একটা চুক্তি হয়। চুক্তি অনুযায়ী স্থির হয়, আমি যদি টেস্ট পরীক্ষায় শতকরা ষাট ভাগের বেশি নম্বর পাই, তাহলে তিনি আমাকে মতির সঙ্গে ঢাকা অভিযানে যাবার অনুমতি দেবেন এবং ম্যাট্রিক পরীক্ষার আগেই আমাকে একটি রিস্টওয়াচ কিনে দেবেন। আমি পরের ঘড়িতে সময় দেখে পরীক্ষা দেয়ার ব্যাপারটাকে অপমানজনক বলে ভাবতাম। অগত্যা বাবা রাজি হলেন। ফলে টেস্ট পরীক্ষায় ভালো ফল করার প্রতি আমারও আগ্রহ সৃষ্টি হলো। টেস্ট পরীক্ষার ফল বেরুনোর পরপরই আমরা ঢাকা যাবার দিন স্থির করে ফেললাম। চুক্তি অনুযায়ী আমার ঢাকা ভ্রমণের জন্য বাবা আমার নামে একশত টাকা বরাদ্দ করলেন।

আমাদের বাড়িতে তখন ইস্ত্রি ছিল না। পিতলের ঘটির ভিতরে চুলার আগুন রেখে ঘটিটি গরম করে কাপড় ইস্ত্রি করার একটি সহজ পদ্ধতি আমরা আবিষ্কার করেছিলাম। আমার পায়জামা ও শার্টগুলো সেভাবেই ধুয়ে ইস্ত্রি করে আমি ঢাকার জন্য তৈরি হয়ে গেলাম। তখন পায়জামার সঙ্গে পাঞ্জাবি নয়, শার্ট পরারই নিয়ম ছিল। উত্তম কুমার তাই-ই পরতেন।

আমাদের পরিবারের কেউ তখনো ঢাকায় যায়নি। দু'একজন যাও বা গেছে, তারা গেছে ইন্ডিয়ান হাইকমিশন অফিসে মাইগ্রেশনের জন্য। লেখাপড়া করার জন্য বা ঢাকা দেখার জন্য কেউ কখনো যায়নি। নেহায়েত বিপদে না পড়লে ঢাকা যাবার কথা কেউ ভাবত না। ঢাকা যাওয়াটাকে তখন বিপদে ঝুঁকি নেয়ার সামিল বলেই গণ্য করা হতো। কোথায় থাকব, কী খাব, এসব ভাবনা নিয়ে বাড়িতে দুশ্চিন্তার অন্ত নেই। কিন্তু যাকে নিয়ে এত চিন্তা, এত দুর্ভাবনা, সেই আমি কিন্তু এসব ব্যাপার নিয়ে আদৌ ভাবছিলাম না। আমার খাওয়া নিয়ে কোনো দুর্ভাবনা ছিল না।

আমাদের স্কুলে একবার পিকনিক হয়। স্কুলের মাঠের উত্তরপ্রান্তে মুসলমান এবং দক্ষিণপ্রান্তে হিন্দুরা তাদের পিকনিকের তাঁবু গাড়ে। হিন্দু ও মুসলমানের এই পৃথক

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আয়োজনটা আমার পছন্দ হয়নি। আমি অনেক ভেবেচিন্তে শেষ পর্যন্ত আমার বন্ধু মতির পাশেই বসে যাই। এই নিয়ে স্কুলে হইচই পড়ে যায়। মুসলমানরা হিন্দুদের ক্ষেপাবার জন্য আমার নাম ধরে বলতে থাকে যে, আমি মুসলমান হয়ে গেছি। আমি হাসি। এই ঘটনাটি নিয়ে হিন্দুদের অনেকে আমার নিন্দা করেছিল। বাবার কাছে বিচারও দেয়া হয়েছিল—কিন্তু বাবা এ নিয়ে আমাকে একটুও গালমন্দ করেননি।

এই ঘটনাটি ঘটে যাওয়ার পর মুসলমানদের হোটেলে না খাওয়ার যে রীতি আমাদের পরিবারে প্রচলিত ছিল, আমি তার বাধ্যবাধকতা থেকে মুক্তি লাভ করি। আমার খাদ্য গ্রহণের স্থান প্রসারিত হয়। ফলে ঢাকায় গিয়ে আমি যে হিন্দুত্ব বজায় রাখার জন্য হিন্দু হোটেল খুঁজব না, তা আমার বাবা-মা, ভাই-বোন সবাই নিশ্চিত বলে জানতেন। গরুটা বাদ ছিল, এবার ওটাও যাবে—এই নিয়ে বিশেষ করে আমার মায়ের মনে খুবই দুশ্চিন্তার উদয় হয়। তিনি আমার কাছে সেই দুশ্চিন্তার কথা ব্যক্ত করেন। তখন আমি তাকে বুঝিয়ে বলি যে, গরু খাওয়ার জন্য আমি এত টাকা খরচ করে ঢাকায় যাচ্ছি না। আমার ঢাকা যাবার কারণ ভিন্ন।

ইতিপূর্বে ময়মনসিংহ পর্যন্তই ছিল আমার দৌড়। এবার চললাম ঢাকা। নয়া মিয়ার নেতৃত্বে শুভদিনে আমাদের যাত্রা শুরু হলো।

AMARBOI.COM

ভাওয়ালের শাল-গজারির ভিতর দিয়ে, চলন্ত ট্রেন থেকে জয়দেবপুরের ঐতিহাসিক রাজবাড়িটিকে একঝলক দেখে, বিশ্ববিখ্যাত টঙ্গী-জংশন এবং তেজগাঁর শিল্পাঞ্চল পিছনে ফেলে আমরা যখন ঢাকা শহরের মধ্যে প্রবেশ করি, তখন সন্ধ্যা হয় হয়। ঢাকা নগরীর বিভিন্ন মসজিদ থেকে মাগরিবের আযানের ধ্বনি ভেসে আসছে। ঢাকার রেলস্টেশনটি ছিল ফুলবাড়িয়ায়। তেজগাঁও পেরিয়ে কাওরানবাজার দিয়ে ঢুকে হাতিরপুল, বাবুপুরা, নীলক্ষেত, পলাশী, বকশিবাজার, চাঁনখারপুল হয়ে ফুলবাড়িয়া স্টেশনে পৌঁছত ট্রেনগুলো। আমাদের স্বপ্নের নগরীকে দ্বিখণ্ডিত করে শ্লথগতিতে ছুটে চলা ট্রেনের কামরায় বসে থেকে সমস্ত সাধ্য দিয়ে পথের দু'পাশের দৃশ্য দেখতে দেখতে আমরা চলছি। একটু পরেই লেভেল ক্রসিং পড়ছে। লেভেল ক্রসিং-এর দু'পাশে লাইন দিয়ে ট্রাক-ট্যাক্সি-রিকশা দাঁড়িয়ে রয়েছে। লেভেল ক্রসিং-এ আটকা পড়া নগরীর পথচারীদের ঐ বিশেষ ট্রেন ও তার যাত্রীদের কেমন লেগেছিল তা জানি না; কিন্তু চলন্ত ট্রেনে বসে থেকে সেদিন সন্ধ্যায় আমি তাদের সবাইকে ভালবেসে ফেলেছিলাম। মনে হচ্ছিল, আমাদের বরণ করার জন্যই লেভেল ক্রসিংগুলোতে এসে নগরবাসীরা এভাবে অপেক্ষা করছে।

চোখে পড়ার মতো গগনচুম্বী উঁচু ভবন বা অট্টালিকার সারি তখন ঢাকায় একেবারেই ছিল না। লেভেল ক্রসিংগুলোতেও মোটরযানের চাইতে হতশ্রী রিকশারই ছিল আধিক্য—পথগুলোও ছিল খুবই অপ্রশস্ত। আধুনিক নগরজীবনের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রাচুর্য এবং সচ্ছলতা প্রকাশ করে এমন দৃশ্য আমি খুঁজছিলাম—কিন্তু আমাদের চোখে পড়ছিল শুধুই এই নগরীর দৈন্যদশার ছবি। রেল লাইনের দু'পাশের বস্তি গুলোর দিকে তাকিয়ে আমার খুব খারাপ লাগল। মানুষ এত কষ্ট করেও থাকতে পারে, আমি জানতাম না। আমার ধারণা ছিল, রাজধানী ঢাকার মানুষজন সুখী, স্বাস্থ্যবান এবং হাসিখুশি হবে; কিন্তু তেজগাঁও থেকে ফুলবাড়িয়া পর্যন্ত প্রসারিত দীর্ঘ পথের দু'পাশে বসবাসকারী নাগরিকদের অবস্থা দেখে আমার ধারণাটা সম্পূর্ণ পাল্টে গেল। স্টেশনে কুলির হাঁকাহাঁকি, যাত্রীদের মোট নিয়ে কাড়াকাড়ি, প্লাটফরমে খোঁজা-খঞ্জ ভিখিরির ভিড়, স্টেশনের বাইরে অপেক্ষমাণ টমটম গাড়ির গাড়োয়ান এবং রিক্সাওলাদের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারলাম—ঢাকা প্রধানত গরিবের শহর।

নীলক্ষেত-নিউমার্কেট লেভেলক্রসিং ও ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের নির্মাণ সম্পন্ন প্রায় আধুনিক স্থাপত্যের ছাত্রাবাসগুলোই আমার ভালো লেগেছিল। নিউমার্কেট তখন ঢাকার একমাত্র আধুনিক সরকারি বিপণিকেন্দ্র। নগরীর বিভিন্ন এলাকার বিত্তশালীরা তাদের প্রয়োজনীয় কেনাকাটা এবং চিত্তবিনোদনের জন্য ছুটে আসেন নিউমার্কেটে। ফলে এই এলাকায় একটু সচ্ছলতার ছাপ আছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ইডেন কলেজ, হোম ইকোনোমিক্স কলেজ এবং আজিমপুর কলোনি পাশাপাশি থাকায় এই এলাকাটি ছিল খুবই প্রাণচঞ্চল। এলাকাটা আমার মনে বিশেষভাবে দাগ কাটে। আমার খুব ভালো লাগে।

AMARBOI.COM

আমার চোখ জুড়ায় ফুলবাড়িয়া ছেড়ে ট্রেনটি যখন নবাবপুর গুলিস্তানের রেলক্রসিং অতিক্রম করে, তখন। নন্টু মিয়ার নির্দেশে আমরা গুলিস্তানের দিকে মুখ করে আগে থেকেই প্রস্তুত হয়ে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ছিলাম। বাঁ থেকে জিন্নাহ এভিনিউ বা গুলিস্তান, ডানদিকে নবাবপুর। জিন্নাহ এভিনিউয়ের প্রশস্ত সড়কে লাইন দিয়ে দাঁড়ানো তকতকে ঝকঝকে মোটরগাড়ির সারি এবং পথের একপাশে সারিবদ্ধ উঁচু-উঁচু অট্টালিকা। কোন কোন অট্টালিকার গায়ে এবং বিভিন্ন ভবনশীর্ষে নানা রকমের নিয়নবাতি জ্বলছে, নিভছে। এতক্ষণ পর মনে হলো আমরা একটা বড় নগরীতে প্রবেশ করেছি। ঢাকায় তখন সাত-আট তলার বেশি উঁচু কোন ভবন ছিল না বলেই মনে পড়ে। তবে আমার মতো গ্রামের মানুষের দৃষ্টি ঘুরিয়ে দেবার জন্য ঐ উচ্চতাই যথেষ্ট ছিল। আমাদের গ্রামের হরিকাকা একবার ঢাকায় এসেছিলেন। ফিরে গিয়ে ঢাকা সম্পর্কে গল্প বলতেন—ঐ ব্যাপারটা কিছুতেই বোধগম্য হতো না। ব্যাপারটা হচ্ছে : 'ঐ যে অত উঁচা উঁচা বিল্ডিং বানাইল, অত লম্বা বাঁশ পাইল কই?' আমর হরিকাকার বিস্ময় প্রকাশের ভঙ্গি দেখে হাসতাম। কিন্তু পরে ঢাকার মতিঝিলে উঁচু উঁচু ভবনের নিচে দাঁড়িয়ে বুঝেছি, হরিকাকার প্রশ্নটা একেবারে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাস্যকর ছিল না। এটা আমারও প্রশ্ন। বড় কিছুর সামনে দাঁড়ালে বড় মানুষরাও বোধহয় কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে মাঝে মাঝে শিশুদের মতোই কৌতূহলী হয়ে ওঠে।

জিন্নাহ এভিনিউতে বিজলি বাতির খেলা দেখে আমার চোখ ঝলসে গেল। অনেক ঘরেই যেখানে বাতি জ্বলে না, সেখানে ঢাকার পথে পথে কী চমৎকার আলোর নাচন। এখানে বিজলি বাতির কী চমৎকার আলোকসজ্জা। বুঝতে পারলাম, এ এলাকাটাই হচ্ছে ঢাকার প্রাণকেন্দ্র। পাকিস্তানের জনক জিন্নাহ সাহেবের নামে এই জায়গাটির নাম রাখাটা খুবই যুক্তিসঙ্গত হয়েছে। তাতে উভয়েরই মান রক্ষা পেয়েছে। হাতিরপুলের বস্তি এলাকার নাম যদি জিন্নাহ সাহেবের নামে রাখা হতো, তাহলে কি তা মানাত? না, মানাত না।

আমরা ঢাকার বক্ষ চিরে ছুটে যাওয়া ট্রেনের কামরায় বসে, নিজেদের মধ্যে এইরূপ আলাপ-আলোচনা করতে করতে ফুলবাড়িয়া-গেণ্ডারিয়া-ফতুল্লা-চাষাঢ়া হয়ে এগিয়ে যাচ্ছিলাম এশিয়ার বৃহত্তম পাটকলসমৃদ্ধ, প্রাচ্যের ড্যান্ডি, শীতলক্ষ্যা তীরবর্তী নদীবন্দর-নগরী নারায়ণগঞ্জের দিকে। নারায়ণগঞ্জ সম্পর্কে যে বিশাল ধারণাটি ছিল, স্টেশনে নেমে তা আর থাকল না। দেখলাম, নারায়ণগঞ্জ রেলস্টেশনটি খুব বড় নয়। অনেকটা আমাদের মোহনগঞ্জের মতোই প্রায়। তবু নারায়ণগঞ্জ বলে কথা। এখানে পথেঘাটে বেশ আলো। বড় বড় দোকানপাটও আছে বেশ।

নয়া মিয়া আমাদের আগেই জানিয়ে রেখেছিলেন যে, আমাদের গন্তব্যস্থলটি স্টেশন থেকে বেশি দূরে নয়, পায়ে হেঁটেই যাওয়া যাবে। স্টেশনে নেমে আমাদের তাই কোনো ভাড়াই ছিল না। আমরা আস্তে-সুস্থে গাড়ি থেকে নেমে, গেটে টিকিট কালেক্টারের হাতে গর্বের সঙ্গে টিকিটগুলো গুঁজে দিয়ে স্টেশনের বাইরে বেরিয়ে এলাম। পথে পড়ল একটি আয়ুর্বেদীয় ফার্মেসি। ঐ আয়ুর্বেদীয় ফার্মেসিটি দেখে মনে হলো, বারহাট্টার নারায়ণবাবুর সঙ্গে নারায়ণগঞ্জের কোথায় যেন একটা মিল আছে।

মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই আমরা ভিক্টোরিয়া রোডের সেই বহু প্রত্যাশিত দোকানটিতে পৌঁছে গেলাম। দোকানটির নাম 'মসলিন হোসিয়ারি'। নয়া মিয়ার দাবি অনুযায়ী, এটিই হচ্ছে তার মামার দোকান। দোকানের নাম দেখেই বোঝা যায়, এই দোকানের মালিক দুর্লভ ধনে ধনী। জগদ্বিখ্যাত মসলিনের কথা বইয়ে পড়েছি। নয়া মিয়ার মামার কাছে কি এখনো সেই মসলিনের কিছু অবশিষ্ট আছে? হয়তো থাকতেও পারে। এত বড় একজন ধনী মানুষের সাথে কী ভাবে কথা বলব, কেমন আচরণ করব, এইসব ভেবে আমি ভিতরে ভিতরে খুবই বিব্রতবোধ করছিলাম। তাঁর করুণা এবং স্নেহ আকর্ষণে সফল হলে আমাদের ঢাকা ভ্রমণ অনেক সুখের হবে, অন্যথায় বিপদ। পাছে আমাদের পকেটের দৈন্যদশা এবং আমাদের অপরিমার্জিত গ্রাম্যতার ত্রুটি প্রকাশ পায়, সেই ভয়ে আমরা খুবই সতর্ক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছিলাম। আমরা মানে—আমি, মতি ও ছন্দু মিয়া। আমাদের ঢাকা-অভিযানের প্রস্তুতিপর্বের প্রথমদিকে ছন্দু মিয়ার নাম ছিল না, শেষ মুহূর্তে ছন্দু মিয়া আমাদের দলে এসে ভেড়ে। তার প্রধান উদ্দেশ্য অবশ্য ঢাকা-ভ্রমণ নয়, ঢাকা থেকে একটি ভাল সাইকেল কেনা। ছন্দু আমাদের এক দুই ক্লাস নিচে পড়ত। গৌরীপুর বাজারে ওদের একটি মনোহরী দোকান ছিল। পড়াশোনায় সে ছিল প্রায় রফিজের মতোই। পার্থক্য ছিল স্বাস্থ্য এবং ধনের প্রাচুর্যে। মসলিন হোসিয়ারিতে তখন পাইকারী খদ্দেরদের ভিড় ছিল না। রাত দশটার মতো বাজে। দোকানের কর্মচারীরা সারাদিনের বিক্রির হিসাব নিয়ে ব্যস্ত। ক্যাশবাক্সের সামনে বসে থাকা সুদর্শন ভদ্রলোকই যে দোকানের মালিক, নয়া মিয়ার বহু কথিত সেই মামা, তা দেখেই বুঝতে পারলাম।

আমাদের দোকানের সামনে দাঁড় করিয়ে রেখে নয়া মিয়া দোকানের ভিতরে ঢুকলেন। আমরা বাইরে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে থাকলাম। কিন্তু নয়া মিয়াকে দেখে তাঁর মামার মধ্যে তেমন কোনো ভাবান্তর ঘটল বলে মনে হলো না। নয়া মিয়া তার বিখ্যাত হাসিটি দিয়েও পরিস্থিতি নিজের আয়ত্তে আনতে ব্যর্থ হলেন। লক্ষ্য করলাম, মামা থেকে নিরাপদ দূরত্বে তক্তপোষের এককোণায় নয়া মিয়া বসে আছেন। চার সদস্যবিশিষ্ট ঢাকা ভ্রমণকারী একটি দলের নেতার মতো গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হয়ে অনেকদিন পরে তিনি মামার সান্নিধ্যে ফিরে এসেছেন, অন্য যে কেউ হলে ভাগ্নের এই দুর্লভ কৃতিত্বে গর্বিত হতেন। অথচ নয়া মিয়ার মামা ভাগ্নেকে দেখে নিশ্চিত বিরক্ত হলেন। দিনের বিক্রির টাকাটা পকেটে পুরে তিনি বাইরে অপেক্ষমাণ একটি ট্যাক্সিতে চড়লেন। চলে যাবার আগে দোকানের কর্মচারীদের দু'একটা প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিলেন, কিন্তু নয়া মিয়াকে কিছুই বললেন না। শুধু গাড়িতে ওঠার সময় আমাদের দিকে একটি বক্র দৃষ্টি ছুঁড়ে দিয়ে গেলেন।

মামা চলে যাবার পর দোকানের মধ্যে একটা স্বতঃস্ফূর্ত ভাব ফিরে এলো। এতক্ষণ দোকানের মধ্যে যে পাথরচাপা গুমোট ভাবটা ছিল, মামার অন্তর্ধানে তা দূর হলো। নয়া মিয়া আমাদের দোকানের ভিতরে নিয়ে গিয়ে কর্মচারীদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর আমরা বসতে পারলাম। কর্মচারীদের সাথে আলাপ করে স্থির হলো, আমাদের দু'জন দোকানের ভিতরে থাকতে পারবে, দু'জন থাকতে পারবে দোকানের সামনে যে ট্যাক্সিটি দাঁড়িয়ে থাকে, তার মধ্যে।

মামাকে বাসায় পৌঁছে দিয়ে একটু পরেই ট্যাক্সিটি ফিরে আসে। ড্রাইভার ভদ্রলোক দিলখোলা মানুষ। নয়া মিয়ার তথাকথিত মামার মতো নয় সে। নয়া মিয়ার সাথে তার পূর্ব পরিচয় ছিল। এই দোকানেরই সে কর্মচারী ছিল একসময়। তাদের আলাপ থেকে বুঝতে পারলাম নয়া মিয়াও এই দোকানের কর্মচারী ছিলেন,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এর বেশি কিছু নয়। মালিককে মামা বলে ডাকাটা ছিল অনেকটা একতরফা প্রেমের মতো। তাতে মালিকের কোন সম্মতি ছিল না। আসল মামারাই যখন ভাগ্নেদের খবর রাখে না, তখন নকল মামাদের আর দোষ দিয়ে লাভ কি?

ক্ষিদেয় আমাদের পেট চোঁ চোঁ করছিল। আমরা আমাদের পোঁটলা-পুঁটলিগুলো মসলিন হোসিয়ারিতে রেখে কাছেই একটা হোটেলে খেতে গেলাম। প্রচণ্ড ক্ষিদের মধ্যে খাওয়াটা ভালো লাগল, যদিও হোটেলের ভাত-তরকারি সবই ছিল ঠাণ্ডা। ট্যাক্সির ড্রাইভার সাহেবও আমাদের সঙ্গে খেলেন। হোসিয়ারিতে ফিরে এসে আমরা দুই দলে ভাগ হয়ে গেলাম। ঠিক হলো আমি আর মতি বাইরে ট্যাক্সিতে থাকব, ছন্দু মিয়া আর নয়া মিয়া এই দুই মিয়া থাকবেন ভিতরে।

পরিস্থিতিটা মোটেই নয়া মিয়ার বর্ণনার অনুকূলে ছিল না। এই নিয়ে তিনি খুবই লজ্জিত ছিলেন। ভেবেছিলাম হোটেলেই উঠব কিন্তু নয়া মিয়া বললেন, এত রাতে হোটেলে স্থান পাওয়া কঠিন হবে, সুতরাং আজকের রাতটা কোনমতে কষ্ট করে এখানে কাটিয়ে দিতে পারলেই ভালো। কাল থেকে হোটেল। তখন গরমের দিন ছিল। ট্যাক্সির পিছনের নরম ফোমের সিটে মাথা এলিয়ে দিয়ে আমরা বসলাম। ড্রাইভার সাহেব বসলেন তার নিজের সিটে। ইতিপূর্বে ট্যাক্সিতে চড়িনি। বেশ মজাই লাগল। শুধু একটাই ভয় হলো, ঘুমের মধ্যে আবার ড্রাইভার সাহেব আমাদের নিয়ে দূরে কোথাও হাওয়া হয়ে যাবে না তো? আমাদের দু'জনকে গাড়ির ভিতর বসিয়ে দিয়ে কীভাবে ট্যাক্সির দরজা খুলতে হবে ও বন্ধ করতে হবে তা বুঝিয়ে দিয়ে ড্রাইভার সাহেব কোথায় যেন হাওয়া হয়ে গেলেন।

আমরা জানতাম ড্রাইভাররা মদ খায়। তিনিও কি মদ খেতে গেলেন? সারাদিনের ভ্রমণের ক্লান্তিতে গভীর নিদ্রায় আমাদের দ্রুতই আচ্ছন্ন হওয়ার কথা, কিন্তু ভয়ে আমাদের কারো চোখে ঘুম এলো না। যতবার ঘুমের ভাব আসে ততবারই মনে হয় ট্যাক্সিটি চলতে শুরু করেছে।

অনেক রাত করে ড্রাইভার সাহেব ফিরলেন। তার মুখে হিন্দি গানের কলি,...'আয়ে গা...আয়ে গা'। তার এলোমেলো পা ফেলা দেখে আমরা বুঝে গেলাম তিনি ঐ কর্মটি সম্পন্ন করে এসেছেন। ভয়ে বুক টিপ টিপ করতে লাগল। ট্যাক্সির কাছে এসেই তিনি আমাদের ভাগ্নে বলে ডাকলেন। ইচ্ছে করেই আমরা একযোগে তার ডাকে সাড়া না দিয়ে চুপ করে পড়ে থাকলাম। অগত্যা একাই তিনি কিছুক্ষণ গুনগুন করে হিন্দি গানের কলি ভাজলেন। তারপর এক সময় রূপকথার দৈত্যের মতো নাক ডেকে ঘুমিয়ে পড়লেন। জনমানবশূন্য এভিনিউয়ের পাশে সম্পূর্ণ অজানা-অচেনা একটি প্রাইভেট ট্যাক্সির ভিতরে বসে আকাশের তারা গুনতে গুনতে, শীতলক্ষ্যার হাওয়া খেতে খেতে, কখন ট্যাক্সিটি আমাদের নিয়ে অজানার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পথে চলতে শুরু করবে ঐ পরিস্থিতি মোকাবেলা করবার জন্য বুদ্ধি আঁটতে আঁটতে এবং ফেলে আসা গ্রামের কথা ভাবতে ভাবতে আমাদের রাত্রি ভোর হলো।

ঢাকা অভিযানের শুরুটাই এমন তালকাটা হয়ে যাবে তা নয়া মিয়া ভাবতে পারেনি, তিনি পুরো ব্যাপারটা নিয়ে বিব্রত ও লজ্জিতবোধ করছিলেন। আমি তখন আমার আপন মামাদের সঙ্গে আমার সম্পর্কের প্রসঙ্গ তুলে তাকে কিছুটা সান্ত্বনা দিলাম। বললাম, মামারা এমনই হয়। নয়া মিয়া যেন এ রকমই একটু সংলাপের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। মামা সম্পর্কে নীরবতার অবসান ঘটিয়ে নয়া মিয়া এবার মুখ খুললেন। ঢাকাইয়া ভাষায় বললেন, হালায় আমাগো পাত্তাই দিলো না। মামা যে নিজের শালা নয়, উত্তেজনার মধ্যে ঐ বোধ তার তখন ছিল না। দোকানের একজন কর্মচারীও ঐ সুযোগে তার মনের ঝাল ঝাড়ল, 'হালায় চামার, কিরপিনের বাচ্চা।' মামার অবর্তমানে মামা-ধোলাই পর্বটি নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করে নয়া মিয়ার নেতৃত্বে আমরা চললাম শীতলক্ষ্যার জলে সকাল-সকাল স্নান সেরে নিতে।

ভোরবেলা শীতলক্ষ্যার স্ফটিকস্বচ্ছ জলে দু'একটা ডুব দিতেই দেহমনের সকল ক্লান্তি মুহূর্তে দূর হয়ে গেল। আমি তখন সাহস করে সাঁতার কাটতে শুরু করলাম। মনের ভিতরে নয়, আমার সন্তরণের সাহসের উৎস ছিল অন্যত্র। আমাদের সঙ্গে নদীতে তখন বেশ কিছু সুন্দরী মেয়ে স্নান করছিল। তারা সাঁতার কাটতে-কাটতে ঘাট থেকে বেশ দূরে চলে যাচ্ছিল। তাদেরই একজনের চোখে আমার হঠাৎ চোখ পড়ে গেলে ঐ মেয়েটি আমাকে চোখের ইশারায় ডাকে। আমার মনে হয়, ঐ মেয়েটি আমাকে তার সঙ্গে সন্তরন-প্রতিযোগিতায় আহ্বান জানাচ্ছে। আমি আন্তঃস্কুল সন্তরণ-প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়া লোক। তখন আমার পৌরুষ জাগ্রত হয়। মেয়ে হয়ে ওরা যদি নদীতে সাঁতার কাটতে পারে—ছেলে হয়ে আমি পারব না কেন? আমি তখন সাঁতার কাটতে কাটতে ঐ মেয়েটিকে অনুসরণ করে নদীর গভীরে চলে যেতে থাকি। ভয় পেয়ে নয়া মিয়া আমাকে নাম ধরে ডাকতে শুরু করে। নয়া মিয়ার পাশাপাশি মতি ও ছন্দুর ডাকও আমার কানে আসে।

তখন ভয় পেয়ে, নারায়ণগঞ্জের সন্তরণপটীয়সী ঐ মেয়েটির কাছে মনে মনে পরাভব স্বীকার করে, আমি দ্রুত ঘাটের দিকে ফিরে আসি। নয়া মিয়া তখন আমাকে প্রচণ্ড ধমক লাগান। বলেন, 'এই মেয়েরা ভালো মেয়ে নয়, টানবাজারের মেয়ে এরা।' টানবাজারের ঐ সন্তরণপটীয়সী মেয়েরা কেন যে খারাপ মেয়ে, মতি পরে আমাকে তা বুঝিয়ে বলেছিল।

শীতলক্ষ্যায় স্নান করে ফিরে আসার পর নাস্তা করার জন্য নয়া মিয়া আমাদের নারায়ণগঞ্জের একটি বিখ্যাত রেস্টুরেন্টে নিয়ে যান। খদ্দেরের ভিড়ে ঐ রেস্টুরেন্ট ছিল জমজমাট। অনেক কষ্টে সেখানে জায়গা পাওয়া গেল। ঐ রেস্টুরেন্টের কর্মচারীদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সঙ্গে নয়া মিয়ার জানাশোনা ছিল। অনেকদিন পর নয়া মিয়াকে দেখে তারা খুশি হলো। রেস্টুরেন্টের নাম 'বোস কেবিন'। বোস কেবিন? মানে হিন্দুর দোকান? নয়া মিয়া বললেন, ঠিক তাই। নারায়ণগঞ্জের মতো শহরে হিন্দুর এমন জমজমাট দোকান আছে, আমি ভাবতে পারিনি। নয়া মিয়া আমাদের ধারণা পাল্টে দিলেন। বললেন, নারায়ণগঞ্জে এখনও প্রচুর হিন্দু আছে। তাদের মধ্যে খুব বড় বড় ব্যবসায়ীরাও আছে। এখানে এমন বেশ কয়েকটি এলাকা আছে যেখানে মুসলমান একেবারেই নেই। শুধুই হিন্দু। শুনে ভালো লাগল। মনে বল পেলাম। বুঝলাম, হিন্দুদের মধ্যে ভারতে চলে যাবার হিড়িক থাকলেও দেশটা সহসা ও সহজে হিন্দুশূন্য হয়ে যাবে না।

হিন্দুর হাতে, হিন্দুমতে তৈরি মুখরোচক লুচি-মোহনভোগ সহযোগে সকালের টিফিন সারলাম। বোস কেবিন থেকে বেরিয়ে মসলিন হোসিয়ারিতে ফেরার পথে ধুতিপরা বেশ কিছু হিন্দু পুরুষ এবং বেশ কয়েকজন শাখা-সিঁদুর পরিহিতা হিন্দু রমণীরও দেখা পাওয়া গেল। মনে হলো তাঁরা বেশ স্বতঃস্ফূর্তভাবেই শহরের পথে চলাফেরা করছে। গ্রামে ফিরে গিয়ে বাবাকে এই গল্পটি বলতে পারব ভেবে আমার মনে খুব আনন্দ হলো। আমরা একটি ট্রেনে চড়ে নারায়ণগঞ্জ থেকে ফুলবাড়িয়ায় এলাম।

মতির কাছে ঢাকার দর্শনীয় স্থানসমূহের একটি তালিকা অনেক আগে থেকেই তৈরি করা ছিল। বেলা বৃদ্ধির সঙ্গে তাল মিলিয়ে ঐ তালিকার ক্রমিক নম্বরে দ্রুত টিকচিহ্ন পড়তে শুরু করল। তখন আমাদের মুগ্ধ হওয়ার ক্ষমতা ছিল অসীম। যা দেখি তাতেই আমাদের চোখ মুগ্ধ হয়। গুলিস্তানের সামনেই ছিল মীরজুমলার ঐতিহাসিক কামান, মতি তার কোমরের বেল্ট খুলে ঐ কামানের দৈর্ঘ্য মেপে নিল। কামানের গায়ে হেলান দিয়ে আমার মনে হলো, বারহাট্টার কালীবাড়িতে দেখা শিবলিঙ্গের সঙ্গে মীরজুমলার কামানটির কোথায় যেন মিল আছে। হিন্দু রমণীদের সামনে পড়লে নির্ঘাত এই কামানের লোহার কপালে সিঁদুরের ফোঁটা পড়ত। মীরজুমলার কপাল ভালো, রমনা কালীবাড়ির পরিবর্তে তার স্থান হয়েছে গুলিস্তানের সামনে।

কামানটি গভর্নর হাউসের দিকে তাক করা ছিল। ঐ গভর্নর হাউসে তখন ময়মনসিংহের গর্ব জনাব আবদুল মোনায়েম খান থাকেন। তিনিই গভর্নর। মোনায়েম খান সাহেব আমার জ্যাঠামশাইয়ের বন্ধুস্থানীয় ছিলেন বলে তাঁকে আমরা আগে থেকেই জানতাম। ঐ বাড়ির দিকে তাকিয়ে গর্বে আমার বুক ভরে গেল। ছাত্রদের আন্দোলনের কারণে এ বছরটা যে তাঁর খুব সুখের ছিল না, তা আমার জানা ছিল না।

গুলিস্তানের কাছেই একতলা বিশাল স্টেডিয়াম। এখানে খেলা হয়। ফুটবল আর ক্রিকেট। সামনেই মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা। বড় বড় বিল্ডিং। সারি-সারি। এলাকার সবচেয়ে উঁচু পূর্বাণী হোটেল ভবনটি তখন তৈরি হচ্ছে। সামনেই বিরাট বিআইডিসি বিল্ডিং। ডিআইটি, ঢাকা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট। ঐ বিরাট ভবনটির কপালে সাঁটানো বিরাটাকার একটি দালানঘড়ি। ঐ ঘড়ির কাঁটাগুলো কী বিরাট লম্বা-লম্বা!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শহরের মানুষ ঐ ঘড়ির সঙ্গে তাঁদের ঘড়ির সময় মিলিয়ে নেয়। নয়া মিয়া জানালেন, এই ডিআইটি ভবনটি একসময় ঢাকার নবাবদের কাছারিবাড়ি ছিল।

স্থির হলো সন্ধ্যার পর আমরা নারায়ণগঞ্জে ফিরে যাব। সারাদিন যতটা সম্ভব ঢাকা দেখব। আমরা গুলিস্তানের কাছাকাছি এলাকাটাই বেছে নিলাম। ঢাকার দর্শনীয় স্থান বলতে তখন ছিল ঐ এলাকাটারই পাল্লা ভারী। আমরা পায়ে হেঁটেই চলে গেলাম বলধা গার্ডেন দেখতে। বিরাট একটা দেয়ালঘেরা বাড়ি। নামী-দামী গাছগাছালিতে বাড়িটা পূর্ণ। বাড়ির ভিতরে চমৎকার পুকুর আছে। ওটা নাকি বলধার এক হিন্দু জমিদারের কীর্তি। আমরা দেখলাম বেশকিছু মূল্যবান বৃক্ষের কাণ্ডে ছাল কেটে তার গায়ে দর্শনার্থীরা তাদের নাম লিখে রেখে গেছে। আমরাও ঐ অজানা-অচেনা নামের পাশে আমাদের নাম লিখলাম।

ওখান থেকে বেরিয়ে রিকশায় চড়ে গেলাম চিড়িয়াখানায়। চিড়িয়াখানাটি তখন ছিল হাইকোর্ট প্রাঙ্গণে। হাইকোর্টের ভিতরের মাজারটি তখন এত জমজমাট ছিল না। হাইকোর্টটি তখন চিড়িয়াখানা হিসেবেই পরিচিত ছিল। হাইকোর্টের ভিতরে ছিল একটি বড় লেক। চিড়িয়াখানাটি ছিল লেকের পূর্ব পাড় ঘেঁষে। এখন মনে হয়, খুব অল্প জায়গা নিয়েই ছিল চিড়িয়াখানাটি। কিন্তু তখন বেশ বড় বলেই মনে হয়েছিল। ঐ চিড়িয়াখানায় তখন দুটো রয়েল বেঙ্গল, গোটা দুয়েক ভালুক, একটি বৃদ্ধ সিংহ (ভুলও হতে পারে), কিছু সংখ্যক প্রাণচঞ্চল বানর এবং পাঁচ-ছয়টা বিভিন্ন জাতের হরিণ ছাড়া আর কোনো উল্লেখযোগ্য প্রাণী ছিল না বলেই মনে পড়ে। সাপ ছিল, পাখি ছিল। আর হ্যাঁ, মনে পড়েছে, একটা শেয়ালও ছিল। পরে লেকটি ভরাট করে বর্তমান ঈদগাহর মাঠ তৈরি করা হয় এবং চিড়িয়াখানাটিকে স্থানান্তরিত করা হয় মিরপুরে।

একই কমপ্লেক্সের ভিতরে হাইকোর্ট, পীরের মাজার ও চিড়িয়াখানার এমন অপূর্ব সমাবেশ পৃথিবীর অন্য কোথাও কখনও ঘটেছিল বলে মনে হয় না।

প্রেস ক্লাবের সামনে, এখন যে ভবনটি পাট রপ্তানী কর্পোরেশনের বিল্ডিং ঐটি তখন ছিল ইউসিস ভবন। মার্কিন তথ্যকেন্দ্র। ঐ ভবনটির নিচতলায় ছিল একটি চমৎকার লাইব্রেরী। উপরে অফিস। আমরা বাইরে থেকে কাঁচের ভিতর দিয়ে দেখলাম লাইব্রেরীতে অনেক লোক বই ও পত্র-পত্রিকা পড়ছে। আমরাও ভিতরে প্রবেশ করি। ঘুরে ঘুরে দেখি। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ছিল পুরো ভবনটি। গরমের দিনে ভিতরে কি আরাম! ভিতরে প্রবেশ করামাত্র শীতল হাওয়ায় আমাদের গা জুড়িয়ে যায়। পরে মার্কিন-বিরোধী ছাত্র বিক্ষোভে বিভিন্ন সময় আক্রান্ত হওয়ার কারণে, ইউসিস ধানমণ্ডি আবাসিক এলাকায় স্থানান্তরিত হয়।

বিকেলে আমরা স্টেডিয়ামে খেলা দেখি। কাদের সংগে খেলাটি ছিল মনে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নেই—তবে মনে আছে, আমার ও মতির প্রিয় দল ভিক্টোরিয়া সেদিন প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে দুই গোলে জয় লাভ করে।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসে। গুলিস্তানসহ জিন্নাহ এভিনিউর নিয়ন বাতিগুলো একে একে জ্বলে উঠতে শুরু করে। গুলিস্তানে ছবি দেখার ইচ্ছে থাকলেও সে আশা পূরণ হলো না, ঐ হলে তখন একটা ইংরেজি ছবি চলছিল। পক্ষান্তরে নারায়ণগঞ্জের আশা সিনেমা হলে অশোককুমার ও মধুবালা অভিনীত ভারতীয় হিন্দি ছবি 'মহল' চলছিল। স্থির হলো আমরা ঐ ছবিটি দেখব। গুলিস্তানের চারপাশে ঘুরঘুর করে ফুলবাড়িয়া স্টেশনে গিয়ে আমরা নারায়ণগঞ্জের ট্রেনে উঠলাম।

আমার সিনেমা দেখা শুরু হলো মহল ছবি দিয়ে। আমরা নারায়ণগঞ্জের ডায়মন্ড সিনেমা হলে নয়টা-বারটা শো দেখি। সিনেমার মতো এমন চমৎকার জিনিস যে আর কিছু হতে পারে না, অল্পক্ষণের মধ্যে আমি তা বুঝতে পারলাম। আমাকে চোখের জলে ভিজিয়ে দিয়ে সিনেমাটি শেষ হলো। বাবা কেন যে আমাকে সিনেমা দেখতে দেননি, বুঝলাম রাতে ঘুমুতে যাবার পর। গত রাতে ট্যাক্সিতে ঘুমুতে পারিনি। ভেবেছিলাম আজ হোটেলের বিছানায় চমৎকার ঘুম হবে। কিন্তু কোথায় চমৎকার, আর কোথায় ঘুম? মধুবালা চমৎকার এবং ঘুমকে আলাদা করে দিলো। চোখ বুজতেই চোখের সামনে মধুবালা। চোখ থেকে মধুবালার ছবি কিছুতেই তাড়াতে পারি না। মহল দেখতে গিয়ে কখন যে নিজেই অশোককুমারে পরিণত হয়ে গেছি, বুঝতে পারিনি। স্বপ্নের ঘোরে অশোককুমার যেমন মধুবালার গান শুনতে পান, গান শুনে যেমন তার ঘুম ভেঙে যায়—, আমারও ঠিক সেই অবস্থা হলো। চোখে ঘুম এলেই মধুবালাও আসেন, হোটেলের জানালার পাশে দাঁড়িয়ে গাইতে শুরু করেন : আয়েগা, আয়েগা... । তখন কি আর জানতাম যে ঐ গানটি মধুবালার গাওয়া নয়, গানটি লতার। ভাবতাম মধুবালাই বুঝি গাইছেন। কী হৃদয় পাগল-করা সেই সুর! কী আশ্চর্য সম্মোহন সেই গানে! কী আশ্চর্য যাদু মধুবালার চোখের তারায়! সারারাত মধুবালা আমাকে ঘুমাতে দিলেন না। যাত্রাদলের রাধিকাও আমাকে এমন পাগল করতে পারেনি।

অন্যরা দিব্যি ঘুমাল। আমি মধুবালার নাম জপতে জপতে, তার গান শুনতে-শুনতে রাত কাটিয়ে দিলাম।

সঙ্গত কারণেই পরদিন আমার পেটের অসুখ দেখা দিল। কী বিপদ! এই অদমনীয় অন্ত্রপীড়া পেটে ধরে নিয়েই পরদিন আমরা আবার গেলাম ঢাকায়। এবার দেখলাম যথাক্রমে রমনা পার্ক, নওয়াব বাড়ি, লালবাগের কেল্লা, নিউ মার্কেট এবং নিমতলিস্থ ঢাকা যাদুঘর।

ইতোমধ্যে ছন্দু মিয়ার জন্য নবাবপুর থেকে একটি র‍্যালি সাইকেলও কেনা

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হলো। সাইকেলটি কেমন হয়েছে, তা পরীক্ষা করে দেখার জন্য মতি, ছন্দু বা নয়া মিয়া কেউই যখন রাজি হলো না, তখন নবাবপুরের ব্যস্ত সড়কে সাইকেল চালাতে গিয়ে আমি ভাগ্যক্রমে দুর্ঘটনার হাত থেকে বেঁচে যাই। আমি ভেবেছিলাম বংশাল পর্যন্ত গিয়ে দ্রুতই দোকানে ফিরে আসব। কিন্তু সাইকেল থেকে নিরাপদে ভূপৃষ্ঠে অবতরণ করার জন্য আমাকে শেষ পর্যন্ত অপেক্ষাকৃত কম যানবাহনপূর্ণ ভিক্টোরিয়া পার্ক পর্যন্ত সাইলেকটিকে চালিয়ে নিয়ে যেতে হয়েছিল। ওখান থেকে ফেরার সময় আমি আর সাইকেলে চড়িনি, সাইকেলটিকে ঠেলে ঠেলে নবাবপুরের দোকানে ফিরে আসি। ঠেলতে ঠেলতে ফিরে এলেও চালক ও সাইকেল উভয়কে অক্ষত ফিরতে দেখে দোকানে অপেক্ষমাণ সবাই তখন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেন। এখনও যখন ঐ ঘটনাটির কথা মনে করি, ভয়ে আমার বুক কাঁপে। নবাবপুরের মতো ব্যস্ত সড়কে অনভিজ্ঞ হাতে, পায়ে ও কোমরে সাইকেলটি চালাতে শুরু ক'রে আমি কী বিপদের মধ্যেই না সেদিন পড়েছিলাম।

সবশেষে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে এশিয়ার বৃহত্তম পাটকল, আদমজী জুট মিল পরিদর্শন করে আমরা বারহাট্টায় ফিরে আসি। মতি আমাকে রঙধনু পত্রিকার অফিসে নিয়ে যেতে চেয়েছিল, আমি উৎসাহ দেখাইনি। মতি না জানলেও পাঠক নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, সেদিন আমি রঙধনু পত্রিকার অফিসে কেন যেতে চাইনি।

আমরা যখন বারহাট্টায় ফিরে এলাম, মনে হলো, আমরা একটা বড় রকমের যুদ্ধ করে ফিরছি। যেখানেই যাই আমাদের চারপাশে ভিড় জমে ওঠে। কল্পনার রঙ চড়িয়ে, দেখা অদেখার পার্থক্য মুছিয়ে দিয়ে আমরা এমনভাবে ঢাকার গল্প বলি, বন্ধুরা ঈর্ষায় মরে যায়। শ্রোতাদের মনে ঈর্ষা জাগানোর মধ্যেই তো ভ্রমণকাহিনীর সাফল্য। আমি নিজেকে ঢাকাফেরত বলে দাবি করতে থাকি।

AMARBOI.COM

মধুবালার পাশাপাশি, ঢাকার কথাও আমার খুব মনে পড়তে থাকে।

ঢাকা থেকে ফিরে নবউদ্যমে ম্যাট্রিক দেয়ার জন্য তৈরি হচ্ছিলাম। বাবা আমাকে প্রথমে আমতলায় অরুণমামার কাছে পাঠালেন। সদ্য বিএ পাস করে তিনি তখন সন্দিকোনা স্কুলে মাস্টারিতে ঢুকেছেন। আমি কিছুদিন অরুণমামাদের বাড়িতে থেকে তার কাছ থেকে পরীক্ষার প্রস্তুতি নিলাম। ওখান থেকে ফিরে এলে বাবা আমাকে পাঠালেন মোহনগঞ্জের অতুলবাবুর কাছে। আমি প্রতিদিন সকালের ট্রেনে চড়ে মোহনগঞ্জে চলে যেতাম। মোহনগঞ্জ স্কুলের নামকরা শিক্ষক অতুলবাবু ছিলেন বারহাট্টার মানুষ, মোহনগঞ্জে বাড়ি তৈরি করে ওখানেই থাকতেন। বাবার সঙ্গে তাঁর খুব ভাল সম্পর্ক ছিল। আমার বাবা ভাল শিক্ষকের সন্ধান পেলেই তাঁর কাছে আমাকে পাঠাতেন জ্ঞান অর্জন করার জন্য। ভয় দেখিয়ে নয়, আদর করে মাথায় হাত বুলিয়ে তিনি আমাকে বোঝাতেন। ফলে তাঁকে অমান্য করার সুযোগ থাকত না। আমি সকালের ট্রেনে মোহনগঞ্জ যেতাম, দুপুরে ঝুমুরলাল কাইয়ার ঘরে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার দ্বিপ্রাহরিক আহারের ব্যবস্থা ছিল। ঝুমুরলাল কাইয়া ছিলেন একজন ভারতীয় মাড়োয়ারী। বারহাট্টা এবং মোহনগঞ্জ তার বেশ কটি পাটের গুদাম ছিল। বাবা তাঁর কাছেই পাট বিক্রি করতেন। একজন পশ্চিমা পাচক ঝুমুরলাল কাইয়ার ঘরে রান্না করত। আতপ চালের গরম ভাত, টাটকা ঘি ও নিয়মিত তরকারি সহযোগে বেশ মজা করে খেতাম। প্রৌঢ় বয়সী ঝুমুরলালবাবু আমাকে পুত্রবৎ স্নেহ করতেন এবং আমার খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে খোঁজ-খবর নিতেন। অতুলবাবুও বেশ যত্নসহকারে আমাকে পড়াতেন। প্রায় মাসখানেক এই ব্যবস্থাটি চালু ছিল।

পরীক্ষা কাছে চলে আসছিল, সেই সঙ্গে আমার পড়াশুনার চাপও বাড়ছিল। কবিতার কথা ভাববার মতো অবকাশই ছিল না। কিন্তু আমার ভবিতব্য ছিল অন্যরকম। সে আমাকে নানা ছলে কবিতার দিকে ঠেলে দিচ্ছিল। একদিন মোহনগঞ্জ থেকে ফিরছিলাম, ট্রেনে জনৈক হকার একটি পত্রিকা বিক্রি করছিল। পত্রিকাটি নেত্রকোনা থেকে প্রকাশিত—এই কথা শুনে আমি এক কপি পত্রিকা কিনে ফেলি। পত্রিকার নাম 'উত্তর আকাশ'। সম্পাদক প্রবীণ সাহিত্যিক খালেকদাদ চৌধুরী। পত্রিকার প্রধান পৃষ্ঠপোষক নেত্রকোনার নতুন এসডিও জনাব নুরুল ইসলাম খান। পত্রিকাটির নাম আমার খুব পছন্দ হয়। পত্রিকাটিতে কবিতার প্রাধান্য। ঐ সংখ্যায় কবি রফিক আজাদের একটি কবিতা ছাপা হয়েছিল— তা ছাড়া আল আজাদ, শান্তি ময় বিশ্বাস, দিলীপ দত্ত, খালেদ বিন আজহার, সুকোমল বল এদের কবিতাও ছিল। বিশেষ করে রফিক আজাদের কবিতাটি আমার বেশ পছন্দ হয়। কবিতাটি ছিল গদ্যছন্দে লেখা এবং মিলবর্জিত। পত্রিকার পক্ষ থেকে নবীন লেখকদের লেখা আহ্বান করা হয়েছিল। আমি সেই আহ্বানে প্ররোচিত হয়ে বাড়ি ফিরেই নেত্রকোনার এসডিও-কে উদ্দেশ্য করে একটি কবিতা রচনা করে ফেলি। রফিক আজাদের মতোই আমার কবিতাটিও ছিল অন্তমিলবর্জিত একটি আধুনিক কবিতা। কবিতার নাম রাখি 'নতুন কাণ্ডারী'। 'কাণ্ডারী' শব্দটি নিলাম নজরুলের কবিতা থেকে। পরদিন মোহনগঞ্জ থেকে ফেরার পথে বারহাট্টায় না নেমে সোজা চলে গেলাম নেত্রকোনায়। একেবারে উত্তর আকাশ কার্যালয়ে, সিদ্দিক প্রেসে। সম্পাদক সাহেবের দেখা পেলাম না, পত্রিকার মুদ্রক জনাব আলী ওসমান সিদ্দিকী সাহেব আমার পদবী দেখেই আমাকে চিনলেন। তাঁর বাড়ি আমাদেরই পার্শ্ববর্তী ডেমুরা গ্রামে, তিনি বাবার বন্ধু। পিতৃপরিচয় পেয়ে সিদ্দিকী সাহেব আমাকে কবিতা লেখায় উৎসাহ দিলেন। বুঝলাম পরের সংখ্যাটিতে আমার কবিতাটি ছাপা হবে। পত্রিকাটি ছিল পাক্ষিক—সুতরাং বেশ কিছুদিন আমাকে ধৈর্য ধরে থাকতে হলো উত্তর আকাশের পরবর্তী সংখ্যার জন্য।

উত্তর আকাশের পরবর্তী সংখ্যায় আমার কবিতাটি যথারীতি ছাপা হয়ে গেল। পত্রিকায় ছাপার হরফে প্রকাশিত ওটাই ছিল আমার প্রথম কবিতা। ভেবেছিলাম নবীনদের আসরে ছাপা হবে, কিন্তু না, কবিতাটি ছাপা হলো বড়দের আসরে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আধুনিক কবিতা তো, তাই। নীল রঙের মলাট ছিল সেই সংখ্যার। উত্তর আকাশ এবং নীল রঙ দুটোই আমার খুব প্রিয় হয়ে উঠল। আমি একসঙ্গে পাঁচ কপি উত্তর আকাশ কিনে ফেললাম এবং বিভিন্ন বন্ধুকে উপহার দিলাম।

মেট্রিক পরীক্ষাটা কাছাকাছি থাকায় আমার প্রথম কবিতা প্রকাশিত হওয়ার ঘটনাটিতে যতটা উন্মত্ততা প্রকাশ করা উচিত ছিল, তা আর করা সম্ভব হলো না। বাবা আমার কবিতাটি পড়লেন এবং কাউকে কাউকে ডেকে দেখালেন এবং পড়ে শোনালেন। তিনি খুশি হলেন বটে কিন্তু খুশির চোটে পরীক্ষার প্রস্তুতিপর্বটা যাতে বিঘ্নিত না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রেখেই আমাকে নতুন করে তার প্রিয় ইংরেজি প্রবাদটি আবারও শুনিয়ে দিলেন। Life is Mathmathics, not Poetry. পরীক্ষায় ভালো ফল করতে হলে কবিতা নয়, অংকে ভাল করতে হবে। আপাতত আমিও বাবার উপদেশ শিরোধার্য করে, আমার দিকে ছুটে আসা কবিতাগুলোকে পরে আসতে বলে, অঙ্কশাস্ত্রে মন দিলাম।

আমাকে ঢাকায় যেতে দিয়ে বাবা তাঁর সঙ্গে আমার সম্পাদিত চুক্তির একটি শর্ত পালন করেছিলেন। দ্বিতীয় শর্তটি ছিল একটি হাতঘড়ি। বাবা তা আমাকে কিছুতেই কিনে দিচ্ছিলেন না। ঐ শর্তটির কথা যে বাবার মনে ছিল না তা নয়, অর্থাভাবের কারণেই বাবা ভুলে যাবার ভান করছিলেন। বাবার ওপর চাপ সৃষ্টি করার জন্য আমিও তখন পড়াশুনা বন্ধ করে দিয়ে কবিতা লেখার ভান করতে লাগলাম। বাবাকে কবি হয়ে যাওয়ার ভয় দেখাতে লাগলাম। চুলে তেল না দিয়ে চেহারার মধ্যে একটা উদাসী-উদাসী কবির ভাব সৃষ্টি করে ফেললাম। তাতে খুব কাজ হলো।

AMARBOI.COM

বাবা বললেন : 'কী ব্যাপার, পরীক্ষা দিবি না।'

আমি বললাম : 'না, ঘড়ি কিনে না দিলে আমি পরীক্ষা দিব না। আমি কবি হয়ে যাব।'

ছোটবেলায় আমার খুব জেদ ছিল। বাবা জানতেন সে কথা। তিনি দেখলেন বিপদ। তিনি মায়ের সঙ্গে পরামর্শ করলেন। বাবার হাতে তখন ঘড়ি কেনার মতো টাকা ছিল না। আমার ঘড়ির টাকা সংগ্রহ করার জন্য তিনি আমাদের একটা ধানী জমি রুস্তম আলীর কাছে বন্ধক দিয়ে টাকা সংগ্রহ করলেন এবং পরদিনই সকালের ট্রেনে ময়মনসিংহ গেলেন আমাকে সঙ্গে নিয়ে। গাঙ্গিনার পাড়ের ঘড়ির দোকান থেকে আমার পছন্দমতো এক শ' পঁচিশ টাকা দিয়ে একটি ফ্লাট সাইজের ক্যাভারিল ঘড়ি কেনা হলো আমার জন্য। ঘড়ি পেয়ে আমার খুশির অন্ত নেই। আমার খুশি দেখে বাবা তাঁর অর্থ সংগ্রহের যাবতীয় যাতনা ভুলে গেলেন। আমার বাঁ হাতের শীর্ণ কব্জিতে ঘড়িটা খুব যে একটা মানাচ্ছিল না, তা আমি বুঝতে পারছিলাম। বাবা আমার মনের সেই খুঁতখুঁতে ভাবটা লক্ষ্য করছিলেন। বললেন, তোকে কিন্তু বেশ মানিয়েছে ঘড়িটায়। রাতের ট্রেনেই আমরা বাড়ি ফিরে আসি। প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে সময় জানতে চেয়ে সারা পথ বাবা আমার ঘড়ির

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গুরুত্বটাকে চাঙ্গা করে রাখলেন। ঘড়ির দাম উসুল করার এটাও একটা উপায় বৈকি। আমার বাবা ছিলেন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বাবাদের একজন।

আমাদের সময় নেত্রকোনার অন্তর্গত সকল স্কুলের কেন্দ্র ছিল নেত্রকোনা। পরীক্ষার সময় নেত্রকোনায় থাকা নিয়ে একটা সমস্যা দেখা দিলো। শেষ পর্যন্ত শ্রীশ মোক্তার মহাশয়ের বাসায় আমার থাকার বন্দোবস্ত হলো। নেত্রকোনার খুব নামী মোক্তার ছিলেন শ্রীশ সরকার। তিনি বারহাট্টার লোক ছিলেন। বাবার বয়সী, চমৎকার হৃদয়বান মানুষ। প্রচুর উপার্জন করতেন, প্রচুর খরচও করতেন। দূর-দূরান্ত থেকে আসা মক্কেলদের রাত্রিবাসের সুবিধার কথা বিবেচনা করে তিনি তাঁর বাইরের ঘরে বেশ কয়েকটি চকির ব্যবস্থা রেখেছিলেন। ঐসব চকিতে তাঁর মক্কেলরা রাত্রিবাস করত। তল্লাবাঁশের বেড়া দিয়ে ঘরটা দু'ভাগে ভাগ করা ছিল। এর একটা অংশ ছিল মক্কেলদের জন্য, বাকি ছোট অংশটা ছিল প্রাইভেট ধরনে। জানালা ছিল না বলে সেখনে দিনের বেলায়ও আলো জ্বালিয়ে রাখতে হতো। ঐ কোঠাটাই আমার থাকবার জন্য বরাদ্দ করা হয়। শ্রীশবাবুর ছেলে ও শ্যালকও আমাদের সাথে পরীক্ষা দিচ্ছিল। ফলে একই বাসায় তিনজন পরীক্ষার্থী। শ্রীশবাবুকে আমি মেসোমশাই এবং উনার স্ত্রীকে মাসিমা বলে ডাকতাম। ওদের এক মেয়ে দেবী, তখন ফাইভ-সিক্সে পড়ে। আমরা একসঙ্গে খেতে বসি। মাসিমা বসে আমাদের খাওয়ার তদারকি করেন। পাশের রান্নাঘরে পাচক সুনীল রান্না করে। সুনীল ছিল খুব রসিক মানুষ। ছোট মুখের সঙ্গে বেমানান দুটো ভাসা ভাসা চোখের জন্য মনে মতো সব সময় সে কি যেন বলতে চায়। চোখের জন্য সে কোন সময় তার চেহারায় গম্ভীর ভাবটা আনিতে পারত না। তার সাথে বাসার সবারই ছিল হাসি-ঠাট্টার সম্পর্ক। সেও নানারকমের হাসির কথা বলে আমাদের খুব হাসাত। প্রথম দিনেই আমার সঙ্গে তার খুব ভাব হয়ে যায়। তার হাতের রান্না মসুরের ডাল ছিল বিখ্যাত। সে অবশ্য ডাল বলত না, বলত মগরা নদীর জল। বলত, ডাইল খাইলে পরীক্ষায় একেবারে লাস্ট ডিভিশনে ফাস্ট। ডালের বালতি থেকে পিতলের হাতাভর্তি ডাল ঢেলে দিয়ে আমাদের পাতের সব ভাত দিত ভিজিয়ে। ডাল দিয়েই সে আমাদের অনেক ভাত খেতে বাধ্য করত, তাতে অন্যান্য তরকারির ওপর চাপ কমত। সে আমার নাম দিয়েছিল বারহাট্টার বাবু। আমি তাকে সুনীলদা বলে ডাকতাম।

বাইরের ঘরে মক্কেলদের ভিড় কমতে রাত প্রতিদিনই দশটা বেজে যেত। মক্কেলদের বিদায় করে মেসোমশাই খেতেন সবার পরে। মাঝখানে হঠাৎ ভিতরের বাড়িতে এসে আমাদের খাওয়ার তদারকি করে যেতেন। আমাকে পরিবারের সদস্যদের সাথে সহজ হওয়ার জন্য তিনি নানাভাবে সাহায্য করতেন। শুরুতে ঐ পরিবারের গলগ্রহ ভেবে ভিতরে-ভিতরে একটু সংকুচিত ছিলাম; কিন্তু বাসার সকলের আন্তরিকতায় সেই অবস্থার দ্রুত অবসান হয়। অল্প সময়ের মধ্যেই আমি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শ্রীশবাবুর পরিবারের একজন হয়ে যাই। আপন করে নেবার এই কৃতিত্ব আমার চাইতে ওদেরই ছিল বেশি। অপরের মধ্যে এমন আপনতা আমি পরবর্তী জীবনেও খুব পাইনি। কয়েক দিনের মধ্যে দেবী আমার বিশেষ ভক্ত হয়ে যায়। পরীক্ষা দিয়ে যখন আমরা পরীক্ষা নিয়ে আলোচনা করি, দেবী তখন আমাদের পাশে চুপ করে বসে আমাদের অগ্নিপরীক্ষার গল্প শুনত।

অংক পরীক্ষার আগের রাতে হঠাৎ খবর বেরুল, অংকের প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে গেছে। ফাঁস প্রশ্নপত্র টাকার বিনিময়ে শহরের কোথাও কোথাও বিক্রি হচ্ছিল। দেবী ছুটে এসে আমাকে সে খবর জানাল। আমি ব্যাপারটাকে সত্য বলে ভাবতে পারলাম না। কেননা এমন গুজব আগেও শোনা গেছে, কিন্তু পরে মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয়েছে। আর দরকারই বা কী? অংকটা মোটামুটি আমার জানাই আছে। পরে অবশ্য রেডিওর রাতের সংবাদে অংকপ্রশ্ন ফাঁস হয়ে যাওয়ার ঘটনা সত্য বলেই জানা যায় এবং পরের দিন অংক পরীক্ষাটি স্থগিত রাখার কথা ঘোষণা করা হয়। স্থির হয় সব পরীক্ষা শেষে অংক পরীক্ষা হবে। ইতোমধ্যে যারা টাকা দিয়ে প্রশ্নপত্র কিনেছিল তাদের মাথায় হাত।

পরীক্ষা শেষ করে শ্রীশবাবুর স্নেহকুঞ্জ ছেড়ে আমি বাড়ি ফিরে এলাম। নিজের ঘড়ি দেখে পরীক্ষা দেয়ার ফলে পরীক্ষার হলে আমার স্মৃতিশক্তি আমার সঙ্গে খুবই সহযোগিতা করল। হিসেবে করে দেখলাম, তিনটি লেটারসহ প্রথম বিভাগে পাস করা যাবে। মনটা খুশিতে ভরে উঠল।

পরীক্ষা শেষ। সামনে অখণ্ড অবসর। প্রাণভরে খেলায় মেতে থাকি। কী আনন্দ! মনে হয়, কৈশোরের শেষ-সিঁড়িটি আমার পায়ের তলা থেকে সরে গেছে। আমার চারপাশে রঙ-বেরঙের প্রজাপতি উড়ে বেড়াচ্ছে, তাদের তুলতুলে আদুরে ডানার রেণুস্পর্শে চঞ্চল হয়ে উঠছে আমার চিত্তলোক। আমার হৃৎপিণ্ড থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরুচ্ছে...। যৌবনের প্রথম সিঁড়িটিতে পা রাখার উত্তেজনায় আমার দেহের ভিতর থেকে শিমুল তুলোর মতো আমার মন আকাশে ফেটে পড়ার প্রহর গুনছে।

আকাশের নীল, নদীর জল, ফুলের গন্ধ, পাখির গান—সবকিছুর মধ্যেই আমি আবিষ্কার করছি এমন এক আবেগ, যার সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল না।

আমি অতিমাত্রায় পোশাকসচেতন ও ফ্যাশনদুরস্ত হয়ে উঠলাম। ক্যারলিনের শার্ট সবেমাত্র বাজারে এসেছে। হাইহিলের টেডি জুতো ও চোঙ্গা প্যান্টের সঙ্গে ক্যারলিনের শার্ট ছিল তখন লেটেস্ট ফ্যাশন। উত্তম কুমারের মতো প্রশস্ত ললাট না থাকায় চুলে উত্তমছাঁট দেয়ার সুযোগ ছিল না, আমাকে মানাত স্কয়ার কাট্। মানাত কিনা জানি না, তবে ওটাই ছিল আমার পছন্দ। ভগীরথদা মাথার আকৃতি এবং চুলের প্রকৃতি নিয়ে কিছুক্ষণ চিন্তা-ভাবনা করার পরই কাকে কোন ছাঁট্

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানাবে, তা স্থির করতেন। তার দোকানে সর্বদা ফ্যাশনদুরস্ত যুবকদের ভিড় লেগে থাকত। ভগীরথদা ছিলেন খেলাঘরের কর্মী ও পৃষ্ঠপোষক। কবি আল আজাদ খেলাঘরের নেতা, তাঁর মাধ্যমেই ভগীরথদার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। উত্তর আকাশে কবিতা ছাপা হওয়াতে তিনি আমাকে বেশ গুরুত্ব দেন। ফলে আমার মস্তিষ্কটিও তাঁর কাছে বেশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। আমার মাথা ও চুলে ভালো করে হাত বুলিয়ে তিনি বলেন : 'ঝাঁকড়া চুলেই আপনাকে মানবে।'

কিন্তু তার সিদ্ধান্ত যে আমার পছন্দ হয়নি তা বুঝতে পেরে বললেন, 'তবে আপাতত স্কয়ার কাট চালিয়ে যেতে পারেন।'

সেই থেকে আমার স্কয়ার। আমাকে যাতে খুব স্মার্ট দেখায়, সেদিকেই আমার লক্ষ্য। মানানো বা না-মানানো ব্যাপারটাকে আমি তেমন গুরুত্ব দিতাম না। আমি ছিলাম আমাদের পূর্ব-নেত্রকোনার ক্যারলিনের শার্ট, চোঙ্গাপ্যান্ট এবং হাইহিল টেডি জুতো পরা হাতেগোনা জনাকয়েক স্মার্ট ইয়ংকীর একজন।

পোশাক এবং স্টাইলের পিছনে এত অর্থ, এত উদ্যম ব্যয় করেও আমার উদ্দেশ্য শেষ পর্যন্ত হাসিল হয়নি। বাড়িতে 'বেগম' পত্রিকাটি আমিই কিনে দিয়ে যেতাম আমার বোনদের জন্য। একদিন দুপুরে বাড়ি ফিরে দেখি আমার বোনেরা হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে বেগম পত্রিকার পাতায়। আমাকে দেখে ওরা হেসে কুটিকুটি। কী ব্যাপার, আমাকে দেখে এত হাসির কী হলো? কাছে গিয়ে দেখি, বেগম পত্রিকার এক জায়গায় জনৈক টেডি যুবকের ব্যঙ্গচিত্র ছাপা হয়েছে। আমার পিঠাপিঠি খুড়তুতো বোন শীলার নেতৃত্বে সকল ভাই-বোন আমাকে জব্দ করার জন্য বেগমের ঐ ব্যঙ্গচিত্রটি সামনে নিয়ে আমার জন্য অপেক্ষা করছিল। ওরা যখন আমার আগমনের প্রত্যাশা করছিল, তখনই আমি ফিরেছি। আমার আগমনে ব্যঙ্গচিত্রে প্রাণসঞ্চার হয়। প্রথমে আমি খুবই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিলাম, কিন্তু ব্যঙ্গচিত্রটি দেখামাত্র দমে যাই। নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখলাম, ব্যঙ্গচিত্রটির সঙ্গে আমার কিছু নয়, বেশ মিল আছে। বুঝলাম, এ পোশাক আমার নয়, এ পোশাক ছাড়তে হবে।

সুধীর ডাক্তারের একটা ছোট্ট আগফা বাক্স-ক্যামেরা ছিল। মনে হয় ওটাই ছিল পৃথিবীর সবচেয়ে স্বল্পমূল্যের ক্যামেরা, কিন্তু ছবি উঠতং চমৎকার। সুধীর ডাক্তারকে আমরা সুধীরদা বলে ডাকতাম। গরমা গ্রামে তাঁর বাড়ি ছিল। আমার বড় বোন রূপুদির চিকিৎসা উপলক্ষে আমাদের পরিবারে তাঁর আগমন, পরে তাঁর সঙ্গে আমাদের খুব অন্তরঙ্গ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। তিনি প্রায়ই আমাদের ছবি তুলতেন। ছবি তোলার প্রতি আমারও খুব আগ্রহ দেখে সুধীরদা তাঁর ক্যামেরাটা আমাকে কিছুদিনের জন্য ধার দেন। তখন একটা ফিল্মের দাম ছিল, যতদূর মনে পড়ে তিন/চার টাকার মতো। প্রতিটি ফিল্ম থেকে প্রায় পঁয়ত্রিশটির মতো ছবি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তোলা যেত। ক্যামেরা হাতে পেয়ে মনে হলো আলোকচিত্রশিল্পী হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারলে মন্দ হয় না। আমি এলোপাতাড়ি ছবি তুলতে শুরু করলাম। শুধু সাদামাটা ছবি নয়, ছবি নিয়ে নানা রকমের এক্সপেরিমেন্টও করতাম। তাতে বেশকিছু কিম্ভূতকিমাকার ছবিও উঠত।

ক্যামেরা নিয়ে শিকারীর মতো আমি ঘুরে বেড়াতাম আশপাশের গ্রামগুলোতে। ফুলেফুলে হাওয়া শিমুলগাছের তলায় দাঁড়ানো এক চঞ্চলা কিশোরীর ছবি তুলে আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম। ঐ চঞ্চলা কিশোরীর নাম ছিল স্বপ্না। আমাদের বাড়ির সামনের স্কুলটিতে পঞ্চম শ্রেণীতে সে পড়ত। প্রিন্ট করার পর ঐ ছবির এক কপি আমি উপহার দিই ঐ কিশোরীকে। আলোকচিত্রশিল্পীর কম্পিত হাতের দেয়া উপহার গ্রহণ করার লজ্জায় লাল হয়ে যাওয়া কিশোরীর আনত মুখশ্রী সেদিন আগফা ক্যামেরায় বন্দী হয়নি; সে বন্দী হয়েছিল আমার মনের ক্যামেরায়।

কিছুদিন পর হঠাৎই মেয়েটি তার পরিবারের সঙ্গে ভারতে চলে যায়। তার আকস্মিক অন্তর্ধানের বেদনায় পত্রপুষ্পপল্লবিত শিমুলবৃক্ষটি একটি ন্যাড়া অনাথ বৃক্ষে পরিণত হয়। আমি পত্রপুষ্পরিক্ত শিমুলগাছের ছবি তুলে তখন আগের পত্রপুষ্পপল্লবিত গাছের ছবিটির পাশে সাজিয়ে রাখি। ঐ মেয়েটির কথা ভেবে আমার বুকের ভিতরে খুব কষ্ট হতে থাকে।

মাধ্যমটি নিতান্ত ব্যয়বহুল না হলে হয়তো ঐ লাইনে বিখ্যাত হওয়ার চেষ্টা করতাম। ব্যয়বহুল মাধ্যম বলেই আমার শিল্পী হওয়ার স্বপ্ন সফল হয়নি। কবি হওয়া যায় বিনা খরচে। এত কম খরচে পৃথিবীতে আর কিছুই হওয়া যায় না। সুধীর ডাক্তার গোলপাড়ায় বাড়ি-জমি বিনিময় করে ভারতে চলে যাবার সময় তাঁর ক্যামেরাটি নিয়ে যান। ক্যামেরাটি হারিয়ে আমি খুব একা হয়ে যাই। সুধীরদার চাইতে তাঁর ক্যামেরাটির কথাই আমার বেশি মনে পড়ে।

AMARBOI.COM

আমার পরীক্ষার ফল নিয়ে আমার চাইতে বাবারই উদ্বেগ ছিল বেশি। পরীক্ষার ফল সংগ্রহের দায়িত্বটা বাবার ওপর ছেড়ে দিয়ে আমি নিশ্চিন্তে দিন কাটাচ্ছিলাম। একদিন আমাদের বহু প্রত্যাশিত ফল বেরুল। ডাকযোগে বোর্ড থেকে ফল পাঠানো হয়েছে। রেক্টর সাহেবের বাসায়, বাবা নিজের চোখে সেই ফল দেখে এসেছেন। আমি ফার্স্ট ডিভিশন উইথ টু লেটারস। আমাদের স্কুল থেকে মতি, হেলাল এবং আমি মোট তিনজন প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছি। আর আগে আমাদের স্কুল থেকে একসঙ্গে তিনজন প্রথম বিভাগ আর কখনো পায়নি। আনন্দের বন্যায় আমাদের স্কুল ছুটি হয়ে গেল। অনাস্বাদিত আনন্দের উৎসবিন্দুতে বসে থাকতে আমার বেশ লজ্জা লাগছিল। দাবানলের মতো আমার কৃতিত্বের সংবাদ ছড়িয়ে পড়ল। ভাই-বোন এবং গ্রামের কৌতূহলী প্রিয়জনের রচিত বৃত্তের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেন্দ্রে নিজেকে আবিষ্কার করে অনুভব করলাম, ব্যর্থতার বেদনার মতো কৃতিত্বের বিড়ম্বনাও কম যন্ত্রণার নয়।

মা এসে আমার মাথায় হাত রাখলেন। বললেন, 'যা তোর বাবাকে প্রণাম কর। তোর পড়াশোনার জন্য তোর বাবা কি কষ্টই না করেছেন।'

আমি প্রথমে আমার মাকে প্রণাম করলাম, তাঁর হাতেই তো আমার হাতেখড়ি। তারপর বাবাকে। বাবা হঠাৎ খুব গম্ভীর হয়ে গেলেন। আমার মাথায় হাত রেখে সাদামাটা ভাষায় বললেন : 'তোর ওপর কৃষ্ণের কৃপা হোক। কৃষ্ণ কৃপাহি কেবলম্।'

আনন্দের মুহূর্তে মানুষ হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনদের স্মরণ করে। মনে হলো, বাবা কী যেন ভাবছেন। যা ভাবছেন তা বলছেন না। যা বলছেন তা ভাবছেন না। তাঁর চোখের দৃষ্টি অনেকদূর ছড়িয়ে পড়েছে। সেই দিগন্তগামী দৃষ্টিকে সঙ্গ দিচ্ছে অশ্রু। ছিন্নকুটিরে ওটাই ছিল আমাদের সবচেয়ে আনন্দের দিন।

ভোরের দিকে আমি একটা স্বপ্ন দেখলাম : মা বিছানায় শুয়ে আছেন, পশ্চিম দিকে শিয়র দিয়ে। তাঁর শীর্ণ দীর্ঘ শরীর একটা নকশীকাঁথা দিয়ে জড়ানো। আমি তাঁর বুকে মাথা রেখে কাঁদছি...সেই কান্নার কোন শব্দ নেই।

রচনাকাল ১৯৮৬

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরিশিষ্ট

রবীন্দ্রনাথ প্রেরিত জন্মোৎসবের বাণী—

'অস্তাচলের প্রান্ত থেকে তরুণ দলকে গেলাম ডেকে
উদয়পথের পানে
ক্লান্ত প্রাণের প্রদীপশিখা পরিয়ে দেবে জয়ের টীকা
নূতন জাগা প্রাণে।'

কল্যাণীয়েষু,

তোমাদের নেত্রকোনায় আমার জন্মদিনের উৎসব যেমন পরিপূর্ণ মাত্রায় সম্পন্ন হয়েছে এমন আর কোথাও হয়নি। পুরীতে আমাকে প্রত্যক্ষ সামনে নিয়ে সম্মান করা হয়েছিল। কিন্তু নেত্রকোনায় আমার সৃষ্টির মধ্যে অপ্রত্যক্ষ আমাকে রূপ দিয়ে আমার স্মৃতির যে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, কবির পক্ষে সেই অভিনন্দন আরো অনেক বেশি সত্য। তুমি না থাকলে এত উপকরণ সংগ্রহ করতো কে? এই উপলক্ষে বৎসরে বৎসরে তুমি আমার গানের অর্ঘ্য পৌঁছে দিচ্ছ তোমাদের পল্লীমন্দিরে। ভোগমণ্ডপে এও কম কাজ হচ্ছে না। আমার জন্মদিন প্রতিবৎসর তোমাদের কাছে নিয়ে যাচ্ছে উৎসব—, আমাকে এনে দিচ্ছে ক্লান্তির ডালিতে নূতন বোঝা। এবার পাহাড়ে এখনো দেহমনে অবসাদ আসক্ত হয়ে আছে। পৃথিবী জুড়ে যে শনির সম্মার্জনী চলছে—বোধ হচ্ছে তার আঘাত এসে পড়ছে আমার ভাগ্যে।

দেখা হলে নৃত্যকলা সম্বন্ধে মোকাবিলায় তোমার সঙ্গে আলাপ করব।

ইতি
তোমাদের
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
২৫.৫.৩৯

শৈলজারঞ্জন মজুমদারকে লেখা রবীন্দ্রনাথের পত্র

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মেট্রিক পাস করার পর আমি ভর্তি হই ময়মনসিংহের আনন্দমোহন কলেজে। আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের মধ্যে মতিউর রহমান খান ঢাকা কলেজে ভর্তি হয়, হেলালউদ্দিন খান ভর্তি হয় নেত্রকোণা কলেজে। ১৯৬২ সালের এই দুই খানসহ বারহাট্টা করোনেশন কৃষ্ণপ্রসাদ ইনস্টিটিউশন থেকে আমরা তিনজন প্রথম বিভাগে মেট্রিক পাস করি। দীর্ঘদিন পর আমাদের স্কুল থেকে একসঙ্গে তিনজন ছাত্র প্রথম বিভাগ পায়। সেই আনন্দে আমাদের স্কুল ছুটি হয়ে যায়। আমাদের সময় পর্যন্ত স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষার মেট্রিক নামই ছিল। এর পরের বছর, ১৯৬৩ সাল থেকে এস এস সি নামটি চালু হয় এবং ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডকে ভেঙ্গে কুমিল্লা, রাজশাহী, যশোর ও ঢাকা—এই চারটি বোর্ড গঠিত হয়।

আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু মতির মতোই আমারও ঢাকায় পড়ারই ইচ্ছে ছিল, কিন্তু আমার বাবা রাজি হননি। আমার চেয়ে ভালো ফল করা আমার জেঠতুতো ভাই অতুল্য যদি ময়মনসিংহের আনন্দমোহনে পড়তে পারে, তবে আমি পারব না কেন? এই ছিল বাবার যুক্তি। আসলে আমাকে ঢাকায় পড়াতে পাঠাতে আমার বাবা ভয় পাচ্ছিলেন। তাই বলা যায় আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই আমাকে ময়মনসিংহের আনন্দমোহন কলেজে ভর্তি হতে হয়।

AMARBOI.COM

আমি ঐ কলেজের হিন্দু হোস্টেলে থাকতাম। একতলা একটি লম্বা প্যাটার্নের পুরনো ভবন। মেঝে এবং দেয়াল পাকা। চাল টিনের। ভবনের দক্ষিণ প্রান্তে পার্টিশন দিয়ে পৃথক করে হোস্টেলের সুপারের জন্য দুটো অপেক্ষাকৃত বড় রুম বরাদ্দ রাখা হয়েছে। সেখানে থাকেন হোস্টেলের সুপার শ্রী চিত্তরঞ্জন গুহ। তাঁর ঘরের সামনে বেশকিছু করবী ফুলের গাছ ছিল। সেগুলো হলুদ করবীতে ভরা। স্যার একটি বেতের চেয়ার নিয়ে বারান্দায় বসে কাগজ পড়তেন। মনে হতো তিনি করবী ফুলের ছায়ার মধ্যে বসে আছেন। আমার খুব ইচ্ছে হতো ঐ রুমটিতে থাকি। স্যারের একটি ছোট ভাই ছিল, নামটি ভুলে গেছি। সে ছিল আমাদের সহপাঠী। স্যারের সঙ্গে ঐ রুমটিতে থাকত। ওকে আমার খুব ঈর্ষা হতো। আহা, আমি যদি স্যারের ভাই হতে পারতাম!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার হোস্টেল ভবনটির ঠিক উল্টোদিকেই ছিল একটি ঢাউস ডাইনিং রুম। সেখানে ত্রিশ-চল্লিশজন ছাত্র একসঙ্গে বসে তাদের খাদ্য গ্রহণ করতে পারে। গণ-খাবারের সঙ্গে সেই আমার প্রথম পরিচয়। আমার মায়ের হাতের মজার মজার রান্না সেখানে না থাকলেও, স্বাধীন জীবনযাপনের প্রথম সুযোগ হাতে পেয়েই আমি হোস্টেল জীবনের প্রেমে পড়ি। আমার কাছে হোস্টেল জীবনটা খুব ভালো লেগে যায়।

কিন্তু আমার ভালো লাগলে কী হবে, আমাকে অনেকেরই ভালো লাগেনি। শুধুমাত্র পাঠ্যসূচি নিয়ে মগ্ন তথাকথিত ভালো ছাত্রদের সঙ্গে নয়, আমার বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে অপেক্ষাকৃত খারাপ ছাত্রদের সঙ্গে। ঐ হোস্টেলে খারাপ ছাত্র খুবই দুর্লভ ছিল। ফলে সংলগ্ন মুসলিম হোস্টেল থেকেও আমাকে বন্ধু সংগ্রহ করতে হয়। তারা আমার রুমে এসে আড্ডা মারে। আমরা তাস খেলি, জোর ভ্যলুমে ক্রিকেটের ধারাভাষ্য শুনি। আমার পড়ুয়া রুমমেটেরা বিরক্ত হয় এবং গোপনে সুপারের কাছে রিপোর্ট করে। আমি নাকি তাদের পড়ায় বিঘ্ন ঘটাচ্ছি। তাই আবাসিক বৃত্তি পাওয়া, মাধ্যমিক বোর্ড স্বীকৃত ভালো ছাত্র হওয়া সত্ত্বেও কিছুদিনের মধ্যে হোস্টেলের সুপার আমাকে হোস্টেলের most disturbing boy হিসেবে শনাক্ত করেন।

আমাদের সুপার অধ্যাপক চিত্তরঞ্জন গুহ ছিলেন একইসঙ্গে হোস্টেল সুপার এবং কলেজের পদার্থবিদ্যা বিভাগের প্রধান। হোস্টেল নয় শুধু, কলেজের সব ছাত্রই তাঁকে খুব ভয় করত। তিনি খুব রাশভারি প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। কোনোদিন কেউ তাঁকে হাসতে দেখেনি। আমি ঠিক ঐ রকমই একজন শিক্ষকের অত্যাচার ভাগ করেছি আমার স্কুল জীবনভর। তাঁর নাম শ্রী মণীন্দ্র গুণ মহাশয়। তিনি যে সম্পর্কে আমার জ্ঞাতি ভ্রাতা ছিলেন, তা আমার স্কুল জীবনেও মনে হয়নি; এখনও যখন তাঁর কথা ভাবি, যখন স্মৃতির মাটি খুঁড়ে তাঁকে স্মরণে আনার চেষ্টা করি— তখনও মনে হয় না। তিনি শিক্ষক পরিচয়ের ডাস্টার দিয়ে আমার মানসপট থেকে জ্ঞাতি-সম্পর্কের তুচ্ছতাকে মুছে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর নির্দেশেই আমি একদিন ক্লাসে বসে আমার প্রথম কবিতাটি লিখেছিলাম। আমি তখন ক্লাস সেভেনে পড়ি। সে-কথা আমি 'আমার ছেলেবেলা' এবং 'নির্বাচিতা'র ভূমিকায় উল্লেখ করেছি।

মণীন্দ্র স্যারের অত্যাচারের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যই আমি দ্রুত মেট্রিক পাস করি। অন্যথায় কী হতো বলা যায় না। একই ক্লাসে বছরের পর বছর ফেল করা রফিজ ছিল আমার কাছে নায়কের মতো। তাকে আমার আদর্শ মানব বলে মনে হতো। আমরা যখন কম নম্বর পাওয়া বা ফেল করে যাওয়ার ভয়ে সর্বদা তটস্থ থাকতাম, তখন রফিজ আমাদের এমন ধারণা দিয়েছিল যে, ফেল-করাটা এমন ভয়ের কিছু নয়। বছরের পর বছর ফেল করার পরও সে খুব নির্বিকার থাকতে পারত। ফেল তো দূরের কথা, শতকরা ষাট ভাগের নিচে নম্বর পাওয়ার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্বাধীনতাই আমাদের ছিল না। আমাদের ব্যাপারটার মধ্যে যে একটা পরাধীনতার ব্যাপার ছিল, পুরোপুরি ধরতে না পারলেও কিছুটা আমি তখনই বুঝতে পারতাম। তবে রফিজের সুবিধে ছিল এই যে, তার কোনো গার্জিয়ান ছিল না। রফিজ ছিল আমার দেখা প্রথম স্বাধীন-মানব। আমি গোপনে গোপনে রফিজের মতো স্বাধীন হবার স্বপ্ন দেখতাম।

ভেবেছিলাম রফিজের মতো স্বাধীন না হই, মেট্রিক পাস করার পর অন্তত মণীন্দ্র স্যারের অত্যাচারের হাত থেকে তো মুক্তি পাব। কিন্তু হা হতোস্মি! কলেজে এসে দেখলাম, কোথায় মুক্তি? মণীন্দ্র স্যারই এখানে গুহ স্যাররূপে আবির্ভূত হয়েছেন। মণীন্দ্র স্যার তো তবু বয়োবৃদ্ধ ছিলেন, তার স্বাস্থ্যও ভালো ছিল না। ফলে তাঁর শারীরিক শক্তিটা আমাদের মনে খুব একটা ভয় ধরাতে পারত না। কিন্তু গুহ স্যারের ছিল একেবারে নিখুঁত বডি-বিল্ডারের মতো স্বাস্থ্য। মনে হয় নিয়মিত ব্যায়াম-টেয়াম করতেন। তাঁকে দেখে আমার স্বামী বিবেকানন্দের কথা মনে পড়ত। কখনও সিনেমার নায়ক বলে ভ্রম হতো। সুন্দর চেহারা, চমৎকার স্বাস্থ্য এবং ভালো চাকরি থাকার পরও তিনি তখনও পর্যন্ত ছিলেন অবিবাহিত। তিনি অবিবাহিত কেন? ঘটনাটি আমার কৌতূহলের বিষয়ে পরিণত হয়। আমি আমার রহস্য-উপন্যাস পাঠের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে গুহ স্যারের পেছনে গোয়েন্দাগিরি শুরু করি।

শুরুতেই জানতে পারি, শহরের একজন খুব নাম করা উকিলের মেয়ে ইলাদির সঙ্গে তাঁর প্রণয়ের সম্পর্ক রয়েছে। ইলাদি আমাদের উপরের শ্রেণীতে পড়তেন। দেখতে খুবই সুন্দরী ছিলেন। অপ্সরী, ফর্সা এবং দীর্ঘাঙ্গী। আমি স্যারের পছন্দকে মনে মনে খুবই তারিফ করি। হয়তো মনের ভিতরে একটু ঈর্ষাও স্থান করে নিয়ে থাকবে। এতদিন আমার মন উত্তর কুমার আর সুচিত্রা সেনকে নিয়ে আচ্ছন্ন ছিল, এবার রুপালি পর্দার অন্তরালের এই চিত্তরঞ্জন-ইলা জুটিকে চর্মচক্ষে মুখোমুখি অবস্থানে প্রত্যক্ষ করার জন্য আমি বেপরোয়া হয়ে উঠি।

একদিন সুযোগ পেয়ে যাই। দেখতে পাই এক পড়ন্ত বিকেলের দিকে স্যার ইলাদিকে নিয়ে শহরের একটি নির্জন মিষ্টির দোকানে প্রবেশ করছেন। নিয়ম ছিল—এ রকম পরিস্থিতিতে, আনন্দমোহন কলেজের ছাত্র হলে, তাকে দ্রুত ঘটনাস্থল থেকে সটকে পড়তে হবে। কিন্তু আমি আগেই বলেছি, একটু অন্যরকম ছিলাম। আমার গোয়েন্দাবৃত্তি যে সফল হয়েছে, তা প্রমাণ করার জন্য আমি ঐ মিষ্টির দোকানে ঢুকি। মিষ্টির অর্ডার দিই এবং খাওয়া হয়ে যাবার পরও একা একা বসে থাকি। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পরও স্যার যখন দেখলেন যে, ঐ নবীন গোয়েন্দাটির উঠবার কোনোই লক্ষণ নেই, তখন একপর্যায়ে আমার চোখের সামনে দিয়ে স্যার ইলাদিকে নিয়ে দোকান থেকে নিষ্ক্রান্ত হতে বাধ্য হন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যাবার সময় স্যার আমার দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন। আমি তাঁদের সম্মান দেখাবার জন্য মাথা নিচু করে উঠে দাঁড়াই। ইলাদির টানা আয়ত দৃষ্টি তখন লজ্জায় মাটির দিকে নত। আমি ভাব করি, যেন আমি তাঁদের উপস্থিতি সম্পর্কে আগে থেকে কিছুই জানতাম না।

আমার অভিনয় বোধ হয় ঠিক হয়নি, তাই স্যার আমার প্রতি ক্রূর দৃষ্টি হেনে দোকান থেকে বেরিয়ে যান।

তাঁদের দু'জনের গমনপথের দিকে তাকিয়ে আবারও আমি উত্তম-সুচিত্রার কথা ভাবি।

আমার ঐ গোয়েন্দাগিরির ফল কী হতে পারে, সে-সম্পর্কে আমার কোনো স্পষ্ট ধারণা ছিল না। আমার ধারণা ছিল, অতঃপর স্যার আমাকে অন্যদের চাইতে একটু আলাদা খাতির করবেন। কেননা, আমি তাঁর এক দুর্বল-মুহূর্তের সাক্ষী। তিনিও যে অন্য পাঁচজন সাধারণ মানুষের মতোই, সেটি অন্য কেউ না জানলেও আমি তো জানি।

কিন্তু ঐ ঘটনার পর স্যার আমার দিকে খুব ক্ষেপে যান। তাঁর ক্ষেপে যাওয়াটা লুকানো থাকে না। বিলম্বে হোস্টেলে ফেরার জন্য আমার নামে ক্রমাগত সতর্কীকরণ নোটিস জারি হতে থাকে। ক্লাসে কঠিন কঠিন প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে সুন্দরী সহপাঠিনীদের সামনে তিনি আমাকে নাজেহাল ও অপমান করতে থাকেন। আমি মুখ বুজে সব অপমান হজম করি।

দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পণ করে আমি হোস্টেলের ছাত্রদের ম্যানেজার নির্বাচিত হই। ম্যানেজার মানে, এক মাস আমি বাজার করব। বাজারের টাকা পয়সা সব আমার কাছে থাকবে। তখন ঐ পদটির একটি সম্মানজনক ইংরেজী নাম ছিল— প্রিফেক্ট। নিয়ম ছিল, যারা ম্যানেজার বা প্রিফেক্ট নির্বাচিত হতো, তারা বাজার করার টাকা থেকে কিছু টাকা মেরে দিত। এই উপরি আয়ের ফলে অন্য ছাত্রদের তুলনায় তারা সচ্ছলতার মধ্যে দিন কাটাতে পারত। পরের মাসেই দেখা যেত, তাদের পোশাক পাল্টে গেছে। পুরনো জুতোর বদলে তাদের পায়ে এসেছে নতুন জুতো। গায়ে উঠছে নতুন কেরলিনের শার্ট। কেরলিন নামক সিনথেটিক কাপড় তখন সবেমাত্র বাজারে এসেছে। খুবই দাম। তাদের গা থেকে ভুরভুর করে সুগন্ধ বেরোয়। আমি তাদের তাকিয়ে তাকিয়ে দেখি। আর দূর থেকে গন্ধ শুঁকি। ঈর্ষায় আমার বুক জ্বলে যায়। কিন্তু কিছুই করার নেই।

দীর্ঘ অপেক্ষার পর, ম্যানেজার হয়েই আমি শুরু করি টাকা মারা। পঞ্চাশ টাকার মাছ কিনে বলি, ষাট টাকা। এক শ টাকার মাংস কিনে বলি, এক শ' বিশ। এইভাবে মহানন্দে দিন চলতে থাকে। ইতোমধ্যে টেডি জুতো আর আকাশী নীল কেরলিন শার্ট কেনা সম্পন্ন। দিনে আয় করি, রাতে ঐ টাকা নিয়ে বসি জুয়া খেলতে। দিনের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উপার্জন রাতে হারাই। ফলে পরের দিন বাজারের টাকা থেকে টাকা চুরি করাটা আমার জন্য অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায়। আমার জীবনধারণের মান যত ঊর্ধ্বমুখী হয় ছাত্রদের খাদ্যের মান খুব স্বাভাবিক নিয়মেই তত নিম্নমুখী হতে থাকে।

একদিন ধরা পড়ে যাই। আমার প্রতিপক্ষ, যারা আমার কাছে তাদের শাসন-ক্ষমতা হারিয়েছিল, তারা ছিল আমার চেয়ে ঢের বেশি ধুরন্ধর। একদিন তারা বাজার থেকে মাংসওয়ালা এবং মাছওয়ালাকে ডেকে এনে গুহ স্যারের অফিসকক্ষে হাজির করে।

এক সকালে হোস্টেলের পিয়ন যদুর ডাকে ঘুম থেকে উঠেছি। উঠেই শুনি স্যার আমাকে তলব করেছেন। শুনে ভালো লাগল। ভাবলাম এবার স্যার বোধ হয় আমার সঙ্গে সম্পর্কটা ভালো করতে চাচ্ছেন। হাজার হলেও আমি হলাম গিয়ে ম্যানেজার। ম্যানেজার ও সুপারের মধ্যে সম্পর্ক ভালো না হলে হোস্টেল ভালো চলবে কেন?

খুব আনন্দের সঙ্গেই আমি স্যারের রুমে যাই। কিন্তু এ কী! গিয়ে দেখি চৌর্যবৃত্তির অভিযোগে স্যারের কক্ষে আমার বিচার শুরু হয়েছে। সেখানে মাছওয়ালা এবং মাংসওয়ালা হাজির। বিচারসভায় আমার গোপন আয়ের উৎস, ঐ দুজনকে উপস্থিত দেখেই আমি বুঝতে পারি— আজকের দিনটি খুব সুবিধের হবে না। ঐ হারামজাদারা আজ আমাকে নির্ঘাত পথে বসাবে।

স্যার গম্ভীর মুখে কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে থাকেন। তারপর রাগত স্বরে বলেন, You are a theif. তুমি কি অস্বীকার করতে চাও।

রেগে গেলে গুহ স্যার ইংরেজী-বাংলা মিশিয়ে কথা বলতেন। আমি গুহ স্যারের কাছ থেকেই রেগে গেলে ইংরেজী-বাংলা মিশিয়ে কথা বলার অভ্যাসটি রপ্ত করেছিলাম। এ জন্য আমি স্যারের কাছে কৃতজ্ঞ।

স্যারের কক্ষে ভিড় উপচে পড়ছে। ছাত্ররা তো আছেই, তাদের পাশাপাশি রয়েছে হোস্টেলের পাচক দল এবং পিয়ন যদু— সারা শহরময় ঘটনাটি রাষ্ট্র করবার জন্য যে একাই যথেষ্ট। যত না লজ্জা পাই, তার চেয়ে বেশি রাগ হয় আমার। খুব ছোটবেলা থেকেই এ রকম পরিস্থিতি মোকাবিলা করার অভিজ্ঞতা থাকায় আমি খুব দ্রুতই বুঝে নিই যে, অপরাধ অস্বীকার করে কোনো লাভ হবে না। সাক্ষীরা হাজির এবং অধিকাংশ ছাত্রই আমার বিপক্ষে।

তখন আমি বলি—Yes Sir, I am a theif. কিন্তু স্যার, আমার একটা কথা আছে। I'm not the only theif. আজকে যারা বাজার থেকে মাংসওয়ালা আর মাছওয়ালাদের এখানে ডেকে এনেছে, তারাও theif, Sir. পার্থক্য এই যে, তারা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যখন ম্যানেজার ছিল তারা যে চুরি করে, তা প্রমাণ করার জন্য আমি বাজার থেকে ওদের ডেকে আনিনি। আপনিই বলেন স্যার, লাভ না থাকলে এই ম্যানেজারি পাবার জন্য ছাত্রদের মধ্যে এত মারামারি কাটাকাটি কেন?

চৌর্যবৃত্তির পক্ষে আমার যে কিছু যুক্তি ও জবাব থাকতে পারে— তা কেউই আশা করেনি। স্যারও না। আমি অস্বীকার করলে যে নাটকটি খুবই জমতে পারত, স্বীকার করার ফলে সেই নাটকটি তেমন একটা জমল না। তখন আমি নিজ থেকেই ঐ কাজে ইস্তফা দিলাম। বললাম, আমার আর ম্যানেজারি করার কোনো ইচ্ছে নেই। স্যার বলার আগেই আমি সকলের কাছে ক্ষমা চাইলাম। সবার উদ্দেশ্যে হাত জোড় করে বললাম, আমাকে আপনারা মাফ করবেন। আপনারা হোস্টেল চালান। আমি আর এসবে নেই।

স্যার একটু ভাবনার মধ্যে পড়েন। তিনি সবাইকে চলে যেতে বলেন। আমাকেও। পরে তিনি স্থির করেন, একজন নয়, কয়েকজন ছাত্র মিলে একটি টিম গঠন করে বাজার করবে। তাতে চুরি কমবে।

ঘটনাটি কলেজে যথারীতি রাষ্ট্র হয়ে গিয়েছিল। হোস্টেলে তো বটেই, ক্লাসেও কারো কিছু হারানো গেলে তারা আমার দিকে সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকাত।

কথায় বলে বিপদ কখনও একা আসে না। ঐ ধাক্কাটি কোনোমতে সামলে উঠেছি। গুহ স্যারকে অন্যদের মতোই আমিও ভয় করে চলি। তাড়াতাড়ি হোস্টেলে ফিরে আসি। কিন্তু ঐ যে অভ্যেস হয়ে গিয়েছিল পয়সা দিয়ে তাস খেলার, যার নাম জুয়া— তা ছাড়তে পারি না। মাঝে মাঝে গভীর রাতে রুমে জুয়ার আসর বসাই।

একদিন আমি স্যারের বিরুদ্ধে গোয়েন্দাগিরি করেছিলাম—তখন ভাবতেও পারিনি, তিনিও আমার পেছনে গোয়েন্দা লাগিয়েছেন। স্যারের গোয়েন্দাটির নাম আগেই বলেছি—যদু। যদু হারামজাদা যে আমার পেছনে ছায়ার মতো লেগে আছে, তা আমি বুঝতে পারিনি। এক গভীর রাতে যদুর প্রদত্ত খবরের ভিত্তিতে স্যার এসে আমার রুমের কড়া নাড়েন। আমার রুমটি তখন ধাতব-মুদ্রার টুংটাং আওয়াজে মুখর। তিন তাসের খেলা চলছে। হঠাৎ কড়া নাড়ায় আমি আমার আরেক জুয়াড়ী বন্ধুর কথা ভাবি। মুসলিম হোস্টেল থেকে এত রাতে তারই আসার কথা। গিয়ে খুবই সাগ্রহে দরোজা খুলে দিই। আর তখনই দেখি, দরোজায় সাক্ষাৎ যমের মতো স্যার দাঁড়ানো।

অন্যরা ততক্ষণে যতটা পারে তাস এবং টাকা-পয়সা লুকানোর ব্যর্থ চেষ্টা করে। স্যার দ্রুত কক্ষের ভিতরে প্রবেশ করেন। জুয়াড়ীরা তখন দ্রুত লাফিয়ে আমার কক্ষ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়। গুহ স্যার আমার বালিশের নিচ থেকে উদ্ধারকৃত সদ্যকেনা এক পেটি তাস এবং কিছু খুচরা-পয়সা আমার বিছানার চাদর দিয়ে

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জড়িয়ে বেঁধে যদুর হাতে তুলে দেন। তা নিয়ে যদু স্যারের পেছনে পেছনে যায়। যেতে যেতে আড়চোখে আমার দিকে তাকায়। গোয়েন্দাগিরির সফল পরিসমাপ্তির খুশি-ভাবটাকে সে তার মুখ থেকে লুকাতে চেষ্টা করে। কিন্তু পারে না। আমি অন্ধকারে আমার রুমের সামনে একা দাঁড়িয়ে থাকি।

ওটাই ছিল ঐ হিন্দু হোস্টেলে আমার শেষ রজনী। পরদিন বারো ঘন্টার মধ্যে আমাকে হোস্টেল ত্যাগ করার নোটিস দেয়া হয়। ঐ নোটিসের এক কপি আমি পাই; এক কপি যায় আমার লোকাল গার্জিয়ান, জেঠামশাইর কাছে, এক কপি আমার বাবার কাছে গ্রামের বাড়িতে এবং এক কপি ছুটে যায় কলেজের অধ্যক্ষ সৈয়দ বদরুদ্দিন হোসেইন বরাবর। আর খুব সম্ভবত যদুর বিশেষ আগ্রহেই এক কপি হোস্টেলের নোটিস বোর্ডে টানিয়ে দেওয়া হয়। ঐ নোটিস বোর্ডের সামনে সঙ্গতকারণেই ভালো ছাত্রদের ভিড় জমে ওঠে।

আমি আমার স্কুলজীবনের বন্ধু রণজিৎ মজুমদারের আশ্রয়স্থল, বড়বাজারের কাছে একটি গুদামঘরে গিয়ে উঠি। সেখানেই থাকতে থাকি। কয়েকদিনের মধ্যেই নোটিস পেয়ে গ্রাম থেকে আমার বাবা-মা এসে হাজির হন। তাঁরা হিন্দু হোস্টেল ঘুরে আমার ঠিকানা সংগ্রহ করে আমাকে ঐ গুদামের মধ্যে আবিষ্কার করেন। মায়ের চোখে জল। বাবা চিন্তিত। তাঁর মুখ গম্ভীর। তাঁর খুব আশা ছিল আমাকে নিয়ে। আমি ভালো ছাত্র। ভালোয় ভালোয় পড়া শেষ করে একদিন খুব ভালো একটা চাকরি পাব। আমাদের সংসারে সচ্ছলতা ফিরে আসবে। আমার ছোট ভাইবোনগুলোও আমার মধ্যে গর্ব করবার মতো একজন বড় ভাই খুঁজে পাবে। কিন্তু কি থেকে যে কী হয়ে গেল!

তখন নিজের জন্য নয়, আমার খারাপ লাগে, আমার দিকে তাকিয়ে থাকা সংশ্লিষ্ট সকলের কথা ভেবে। অনেক আলাপ আলোচনা করার পর স্থির হয়, আমি আর এই আনন্দমোহন কলেজে পড়ব না; টিসি নিয়ে নেত্রকোনা কলেজে চলে যাব। তখন আইএসসি ফাইন্যাল পরীক্ষার খুব বেশি বাকি নেই।

আমি বাবার প্রস্তাবে রাজি হয়ে যাই।

আমার মেট্রিকের রেজাল্ট ভালো থাকায় এবং রেসিডেনশিয়াল স্কলারশিপ পাওয়ার কারণে নেত্রকোনা কলেজ তার অপমান-লাঞ্ছিত পুত্রটিকে অত্যন্ত সাদরেই গ্রহণ করে। আমি আনন্দমোহন কলেজ ত্যাগ করে নেত্রকোনা কলেজে কেন চলে এসেছি— সে কথা সম্পূর্ণভাবে এবং খুব সতর্কতার সঙ্গেই গোপন রাখা হয়। আমার স্থান হয় সবুজ ঘাসে আচ্ছাদিত কলেজের খেলার মাঠ-সংলগ্ন নতুন হোস্টেলে।

আনন্দমোহন কলেজে আমার এক বছরের বেশি সময় কেটেছে। ঐ সময়ের মধ্যে আমি যেমন বেশকিছু শত্রু তৈরি করেছিলাম, তেমনি কিছু ভালো বন্ধুও আমার জুটেছিল। আমি বন্ধু বা শত্রু কারো নামই এখানে উল্লেখ করছি না। আর সত্যি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলতে কি, আমি তাদের অনেকের নামই ভুলে গেছি। আমার ঐ সময়টা ভালো-মন্দ দু'রকমের স্মৃতি দিয়ে নির্মিত। তবে ভালোর চেয়ে মন্দের পরিমাণ বেশি ছিল বলে নেত্রকোনায় আসার পর ময়মনসিংহের কথা ভেবে আমি খুব একটা বেদনা বোধ করতাম না, বরং একটি অপয়া স্থান থেকে নিজেকে সরিয়ে আনতে পারার আনন্দটাই আমার মনে বেশি ছিল। তবে মাঝে মাঝে কোনো কোনো বন্ধুর জন্য আমার মন খারাপ লাগত। কলেজ ছেড়ে চলে আসার কথা আমি আমার নিকটবন্ধুদেরও বলিনি। আমি আমার অনেক হিন্দু-বন্ধুকে কাউকে কিচ্ছুটি না জানিয়ে দেশ ছেড়ে ভারতে চলে যেতে দেখেছি; আর আমি তো কলেজ বদল করছি মাত্র। তবু বন্ধুদের কথা ভেবে মাঝে মাঝে আমার কষ্ট হতো।

ময়মনসিংহ ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে আমার বাবা একবার কলেজের অধ্যক্ষ সৈয়দ বদরুদ্দিন হোসেইন সাহেবের সঙ্গে দেখা করার কথা ভেবেছিলেন। সৈয়দ বদরুদ্দিন হোসেইনের বড় ভাই জনাব নাজিমুদ্দিন হোসেইন এক সময় বারহাট্টার সাব-রেজিস্ট্রার ছিলেন। সেই সূত্রে তিনি বাবার পূর্ব-পরিচিত। কলেজের ভাইস প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন জনাব ওসমান গনি। তাঁকে দেখে আমরা শেরে বাংলার কথা ভাবতাম। তিনি শেরে বাংলার মতোই পোশাক পরতেন। নজরুলের টানা টানা বড় চোখের ছবি দেখেছি। নজরুল ছাড়া এমন মানুষের চোখও এ রকম হয়, তা জানতাম না। তিনি ছিলেন একেবারে যথার্থ অর্থেই পদ্মলোচনের অধিকারী। তাঁর বাড়ি ছিল বারহাট্টায়। আমার জন্য বাবা তাঁর কাছেও একবার যেতে চেয়েছিলেন। আমি রাজি হইনি। আসলে ময়মনসিংহ থেকে আমার মনটা একেবারেই উঠে গিয়েছিল। ঐ শহরটিকে আমি আর সহ্য করতে পারছিলাম না। কিছু অপ্রিয় মানুষের দৃষ্টিসীমার বাইরে নিজেকে সরিয়ে নিতে আমার মন খুবই অস্থির হয়ে উঠেছিল। আমার সঙ্গ থেকে কিছু-সংখ্যক অপ্রিয়জনকে বঞ্চিত করতে গিয়ে আমি বহুসংখ্যক প্রিয়জনকেও শাস্তি দিচ্ছি কি না— তা ভেবে দেখার মতো সুস্থ মন তখন আমার ছিল না।

নেত্রকোনায় আসার পর আনন্দমোহন কলেজের কোনো কোনো শিক্ষকের কথাও আমার খুব মনে পড়ত। আমাদের বাংলার অধ্যাপক ছিলেন জনাব মাহবুবুল আলম। তিনি খুব ভালো পড়াতেন। বাংলা ছন্দ ও বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের ওপর তাঁর জনপ্রিয় মূল্যবান গ্রন্থ রয়েছে। এগুলো তিনি অবশ্য অনেক পরে লিখেছেন। ইংরেজীর অধ্যাপক ছিলেন জনাব আবু তাহের মজুমদার। তিনি এখন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে আছেন। মজুমদার স্যার যখন আমাদের 'Let me no to the marriage of true life' শেক্সপীয়ারের এই কবিতাটি পড়াতেন— তখন আমরা খুব রোমাঞ্চ বোধ করতাম। সদ্য এমএ পাস করা সুদর্শন মজুমদার স্যার ছিলেন অবিবাহিত। ঐ কবিতা পড়ানোর সময় আমি ক্লাসের মেয়েদের প্রতিক্রিয়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লক্ষ করতাম। স্যার যখন খুব আদর করে, 'ম্যারেজ' শব্দটি উচ্চারণ করতেন, ক্লাসের মেয়েরা মজুমদার স্যারের দিকে লজ্জায় তাকাতে পারত না। আমার খুব মজা লাগত। আমি মেয়েদের লজ্জা নামক ঐ দুর্বল ভূষণটিকে আরও একটু উসকে দেবার জন্য স্যারকে কোনো কোনো পঙক্তির অর্থ পুনরায় বুঝিয়ে বলার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করতাম। স্যার বুঝতে পারতেন, তিনি হাসতেন। সবার দৃষ্টি তখন আমার দিকে নিবদ্ধ হতো। আমি গ্যালারির মজবুত অবস্থানে বসে স্যারের হাসির প্রতিক্রিয়া লক্ষ করতাম আমার প্রিয় লাজুক কোমল মুখগুলোতে।

আনন্দমোহন কলেজে একটি ক্লাসরুম ছিল একেবারে স্টেডিয়ামের মতো, খুব বড় রুমটি। সেখানে সাধারণত ইন্টারমিডিয়েটের ক্লাসই হতো। একসঙ্গে শ'দুয়েক ছাত্র আরামে বসতে পারত। আমি সবার পেছনের সারিতে, উঁচুতে বসতাম। সেখানে বসলে মনে হতো ঢাকা স্টেডিয়ামে বসে ফুটবল খেলা দেখছি।

মনে পড়ত পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক কালাম স্যারের কথা। তাঁর ছোট ভাই আনোয়ার ছিল আমাদের সহপাঠী বন্ধু। কলেজের খেলার মাঠের উত্তর-পূর্ব কোণে স্যারের বাড়ি ছিল। আমরা ফিজিক্স প্র্যাকটিক্যাল খাতা সাইন করানোর জন্য স্যারের ঐ বাড়ি পর্যন্ত হানা দিতাম। গুরুগম্ভীর গুরু স্যারের বিপরীতে কালাম স্যার ছিলেন আমাদের মতো ক্লাস-পালানো অনিয়মিত ছাত্রদের গোপন আশ্রয়।

মনে পড়ত ফিনফিনে ধুতি-পাঞ্জাবি পরা বয়োবৃদ্ধ অধ্যাপক ফনী মজুমদারের কথা। তিনি আমাদের কেমেস্ট্রি পড়াতেন। স্যারের খুব সুন্দরী একটি কন্যা ছিল। সে অন্য শ্রেণীতে পড়ত। বাবার সঙ্গে একই রিকশায় চেপে কলেজে আসত। আমার খুব ভালো লাগত ঐ মেয়েটি দেখতে। অনেকের মতো আমিও মনে মনে ঐ মেয়েটির নাম জপ করেছি। ওর নাম ছিল স্মৃতিকণা মজুমদার।

অধ্যাপক এ.জেড. সিকদার, অধ্যাপক লুৎফুজ্জামান এবং অধ্যাপক সেকান্দর আলী স্যার আমাদের অংক পড়াতেন।

কলেজের কেরানি রশিদ সাহেবের কথাও আমার মনে পড়ত। তাঁর হাত থেকেই আমরা বৃত্তির টাকা তুলতাম। আর কার কার কথা আমার তখন মনে পড়ত, তা আজ আর মনে করতে পারছি না। নিশ্চয়ই আরো অনেকের কথাই আমার মনে পড়ত। নিশ্চয়ই তখন আরো অনেকের জন্যই আমি কষ্ট পেয়েছি। এখন যখন আমি এই রচনা লিখছি, তখন আমাকে আমার লেটেস্ট স্মৃতির ওপরই নির্ভর করতে হচ্ছে— জানি, রাতের সব তারাই আছে দিনের আলোর গভীরে।

নেত্রকোনায় আমার কিছু সাহিত্যিক বন্ধু আগে থেকেই ছিল। আমি 'উত্তর আকাশ' পত্রিকায় কবিতা লিখতাম। ময়মনসিংহে চলে যাবার ফলে ঐ পত্রিকার সঙ্গে আমার আর সম্পর্ক ছিল না। বিজ্ঞান চর্চার চাপে আমার সাহিত্য চর্চা কমে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গিয়েছিল। তবে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেছিল আনন্দমোহন কলেজে। তখন কলেজ ম্যাগাজিনের সম্পাদক কে ছিলেন, ঠিক মনে পড়ছে না, সম্ভবত শেখ আতাউর রহমান হতে পারেন। তিনি এখন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক।

একদিন আমি একটি কবিতা নিয়ে সাহিত্য সম্পাদকের কাছে জমা দিতে গেলাম। বললাম, আমি একজন কবি, উত্তর আকাশ পত্রিকায় নিয়মিত লিখি। কলেজের ছাত্র সংসদের ভিপি হেকমত-ই-সুলেমান, যিনি বিবেক নামেই বেশি পরিচিত ছিলেন, তাঁর সঙ্গে আমি পরিচিত, সে-কথাও সম্পাদককে জানাতে ভুললাম না। বললাম, প্রয়োজনবোধে তিনি আমাকে সার্টিফাই করবেন। তিনি ছিলেন নেত্রকোনার লোক। বিবেক ভাইয়ের বাবা খুশু ডাক্তার ছিলেন একজন দক্ষ অভিনেতা। বাংলাদেশের প্রথম ছায়াছবি 'মুখ ও মুখোশ'-এ তিনি অভিনয় করেছিলেন। বিবেক ভাইও অভিনয় করতেন। বিবেক ভাইয়ের কথা বলাতে কাজ হলো। সম্পাদক আর জায়গা নেই বলে আমাকে বিদায় করে দিচ্ছিলেন, ভিপির কথা বলাতে আমাকে বসতে বললেন। তারপর সংসদ কক্ষে উপস্থিত অন্য দু'একজনের সঙ্গে পরামর্শক্রমে আমার দিকে ফিরে বললেন, ভাই, বাংলা কবিতা বিভাগে কোনো কবিতা ছাপা আর সম্ভব নয়, তবে আপনি যদি ইংরেজী কবিতা লিখতে পারেন, তবে আমরা তা ছাপতে পারি। ঐ বিভাগে এখনও জায়গা ফাঁকা আছে। আপনি ভেবে দেখেন। এই বলে তিনি আমার বাংলা কবিতাটি ফেরত দিলেন।

আমি ভাবলাম, তা এমন কঠিন কাজ আর কি? মাইকেল তো ইংরেজীতেও লিখতেন। অগত্যা আমি কাল দিব বলে চলে এলাম। সম্পাদক কী ভেবেছিলেন জানি না। হয়তো আমাকে এড়ানোর জন্যই এই প্রস্তাব দিয়ে থাকবেন। কিন্তু আমি ঐ রাতেই জুয়া খেলা বন্ধ রেখে, গভীর রাত পর্যন্ত জেগে থেকে একটি ইংরেজী কবিতা লিখে ফেললাম। অন্তমিলযুক্ত কবিতাটি পরদিনই সম্পাদকের দপ্তরে জমা দিয়ে দিলাম। তিনি ইংরেজী বিভাগের অধ্যাপকদের দেখিয়ে আমার কবিতাটি সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন বলে জানালেন।

কিছুদিন পর কলেজ ম্যাগাজিন বেরুলে দেখি, আমার ঐ কবিতাটি দিয়েই কলেজ ম্যাগাজিনের ইংরেজী বিভাগটি শুরু হয়েছে। পুরো কবিতাটি আমার মনে নেই। স্মৃতি থেকে কবিতার শেষ-স্তবকটি উদ্ধৃত করছি।

কবিতার নাম : Future. এবং আমার নামটি ছিল তখন এ রকম : Nirmalendu Prokash Goon, 1st Yr. I.Sc

What will our future be?
Arise the question in my head.
The answer is to work for the country.
And to feed the unfed.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নেত্রকোনায় ফিরে আসার ফলে পুনরায় জনাব খালেকদাদ চৌধুরী, উত্তর আকাশ পত্রিকা এবং আমার হারিয়ে যাওয়া কবি-বন্ধুদের সান্নিধ্যে আসার সুযোগ আসে। নেত্রকোনায় একটি চমৎকার সাহিত্য পরিমণ্ডল গড়ে ওঠে। তবে কবিতার পেছনে বেশি সময় নষ্ট না করে পরীক্ষায় ভালো ফল করার বিষয়টিকেই আমি বেশি গুরুত্ব দিই। আমার ভেতরে একটা জেদ চাপে, আমাকে ভালো রেজাল্ট করে দেখিয়ে দিতে হবে যে, আমি নষ্ট হয়ে যাইনি। কলেজের স্যাররাও আমার খোঁজখবর করেন। আমি যে হোস্টেলে থাকি তার সুপার ছিলেন অংকের অধ্যাপক জনাব গোলাম রহমান। তিনি আমাকে খুব সাহায্য করতেন যেন আমি পরীক্ষায় ভালো ফল করতে পারি।

কলেজ যখন চালু থাকত তখন আমরা হিন্দু-মুসলমান ছাত্ররা একই ডাইনিংয়ের রান্না খেতাম। ছুটির সময় যখন ডাইনিং রুম বন্ধ হয়ে যেত তখন আমরা খেতাম হোস্টেলসংলগ্ন একটি হিন্দু-বাড়িতে। ঐ বাড়িটি ছিল রেল লাইনের উত্তর পাড়ে। গৃহকর্তার নাম ছিল কার্তিক। শ্রীমান কার্তিকচন্দ্র ছিল এক অলস ঘরজামাই। এক বিধবা রমণীর একমাত্র কন্যাকে সে বিবাহ করেছিল। কার্তিকের বউ কালো কিন্তু রূপবতী, স্বাস্থ্যবতী এবং রসিকা। সে শুধু আমাদের পাকস্থলির খাদ্যেরই জোগান দিত না, আমাদের মনের খাদ্যেরও জোগান দিত। ঐ সুযোগটা নিত কার্তিক। সে প্রায়ই আমাদের বাজার করার জন্য দেয়া আগাম টাকা খরচ করে ফেলত। এই নিয়ে কার্তিকের বউ এবং তার শাশুড়িকে মাঝে মাঝেই বিব্রত হতে হতো। আমরা পেটে প্রচণ্ড ক্ষুধা নিয়ে দুপুরের খাবার খেতে গিয়ে শুনতাম কার্তিক এখনও বাজার করে ফেরেনি। একবার কার্তিককে আমরা মার দেয়ার চিন্তা করেছিলাম। কিন্তু কার্তিক যখন তার অপরাধকে আড়াল করবার জন্য বানিয়ে বানিয়ে এক একটি গল্প ফাঁদত, তখন আমি মনে মনে কার্তিকের সৃজনশীলতার প্রশংসা না করে পারতাম না। উল্টো তাকে দু'এক টাকা দিতে ইচ্ছে করত।

পরে বাধ্য হয়ে কার্তিক বিসর্জন দিয়ে তার পরিবর্তে কলেজের পিয়ন দেবেন্দ্রদার সঙ্গে আমরা চুক্তিবদ্ধ হই। তাঁর কিছুটা কাণ্ডজ্ঞান ছিল। পুরোটা ছিল বলা যায় না—কেননা সেখানেও আমাদের যে একেবারেই ভোগান্তি পোহাতে হয়নি তা নয়। দেবেন্দ্রদার অনেক ছেলেমেয়ে ছিল। তারা আমাদের জন্য তৈরি খাদ্যে মাঝে মাঝে হামলা চালাত। তবে কার্তিকের গৃহের তুলনায় সেখানে আমাদের ভোগান্তির পরিমাণ ছিল কম। আমি যখন আমার নেত্রকোনা কলেজের দিনগুলোর কথা ভাবি, তখন কার্তিক এবং দেবেন্দ্রদার কথা আমার খুব মনে পড়ে। মনে হয়, যা কিছু খেয়ে হজম করবার আসুরিক শক্তি আমি এভাবেই ক্রমশ অর্জন করেছিলাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার রুমমেট ছিল বাচ্চু। দেলোয়ার হোসেন বাচ্চু। বাড়ি শ্যামগঞ্জে। আমরা উভয়েই ছিলাম আইএসসি পরীক্ষার্থী। অল্পদিনের মধ্যেই ওর সঙ্গে আমার খুব ভালো নিবিড়-গভীর বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। আমাদের আলাদা বিছানা থাকলেও আমরা প্রায়ই এক বিছানায় থাকতাম এবং বুকে বুকে জড়াজড়ি করে ঘুমাতাম। আমার এই বিশেষ বন্ধুটির কথা পরে আরও অনেকবার আসবে।

আমাদের হোস্টেল থেকে নেত্রকোনা রেলস্টেশনটিকে স্পষ্ট দেখা যেত। সেখানে যখন ময়মনসিংহগামী বা ময়মনসিংহ থেকে আসা মোহনগঞ্জগামী ট্রেনগুলো এসে থামত, তখন দীর্ঘ সময়ের নির্জনতা ভেঙ্গে সহসা সচকিত হয়ে উঠত ছোট্ট স্টেশনটি। আমি ঐ স্টেশনটির দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে 'এডেলস্টপ' কবিতাটির কথা ভাবতাম। কিন্তু ওখানে কখনও বরফ পড়ত না।

নেত্রকোনা কলেজ বার্ষিকীটির একটি চমৎকার নাম ছিল—ময়ূখ। ময়ূখ শব্দের মানে কিরণ, রশ্মি, জ্যোতি—সূর্য। অভিধান ঘেঁটে আমাকে ময়ূখ শব্দের অর্থ খুঁজে বের করতে হয়েছিল। মফস্বল শহরগুলোতে কত লেখকই না থাকে। ছাত্র সংসদ নির্বাচনে সাহিত্য সম্পাদক নামে যে-পদটি রয়েছে সেখানে সংশ্লিষ্ট কলেজের উদীয়মান লিখিয়েদেরই অগ্রাধিকার দেওয়া হয়ে থাকে। ঐ পদে যিনি নির্বাচিত হন তিনি পদাধিকার বলে একজন লেখকের সম্মান পান। সাহিত্যিক হিসেবে তার দাপট শুধুমাত্র কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না। কলেজের গণ্ডির বাইরেও তার সাহিত্যিক-খ্যাতি এবং প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে। আমি নেত্রকোনা কলেজে আমার স্বল্পকাল অবস্থানের সময় যাকে উত্তরাধিকার সূত্রে সাহিত্য সম্পাদকরূপে লাভ করি, তার নাম ছিল শাহনেওয়াজ। তার ছিল দীর্ঘ দেহ, চওড়া পেশল বুক। একেবারে ডাকাতের মতো দেখতে। মনে হয় ওর ভয়েই ছাত্র-ছাত্রীরা ওকে ভোট দিয়ে থাকবে। শাহনেওয়াজ আমারই সহপাঠী ছিল। উত্তর আকাশ পত্রিকার একজন নিয়মিত কবিতা-লেখক হিসেবে আমার নাম সে আগে থেকেই জানত। কিছুদিনের মধ্যে আমার সঙ্গে তার বেশ বন্ধুত্ব হয়ে যায়। ফলে 'ইংরেজী কবিতা' লেখার বিড়ম্বনা থেকে আমার অব্যাহতি জোটে। বিড়ম্বনা বলাটা বোধ হয় ঠিক হলো না। মনে পড়ে ইংরেজী ভাষায় কবিতা লিখে আমি আনন্দই পেয়েছিলাম। আনন্দমোহন কলেজে থাকলে আমি হয়তো ইংরেজী ভাষার কবি হলে হতেও পারতাম। নেত্রকোনা কলেজ আমাকে বাংলা ভাষার কবিতে রূপান্তরিত করে। আমাকে আর কবিতা নিয়ে সাহিত্য সম্পাদকের কাছে ছুটতে হয় না। সম্পাদকই আমার কাছে 'বাংলা কবিতা' চায়। শুধু কবিতা নয়, পত্রিকাটিকে ভালো করার ব্যাপারেও শাহনেওয়াজ আমার কাছে পরামর্শ চায়। আমি নিজেকে একজন গুরুত্বপূর্ণ কবি বলে ভাবতে শুরু করি। শাহনেওয়াজ সম্পাদিত ময়ূখ-এ আমি যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কবিতাটি দিই তার নাম ছিল 'নজরুল স্মরণে'। কবিতার পাশাপাশি আমার একটি পাসপোর্ট সাইজ ছবিও ব্লক করে ছাপানো হয়েছিল। আমার ছবিটি ছিল কেরলিন শার্টের ওপর চিকন টাই পরিহিত। পোশাকের ব্যাপারে তখন আমি একেবারে পূর্ণমাত্রায় ইংরেজ ছিলাম। আমার বড় ভাইকে আমি কলকাতা থেকে আমার জন্য হাল ফ্যাশনের প্যান্ট ও শার্ট নিয়ে আসার জন্য নিয়মিত চিঠি লিখতাম। টেডি জুতা ও চোঙ্গা প্যান্ট আমার পছন্দ ছিল। মাথার চুল ছাঁটতাম উত্তম কুমারের মতো করে। আমার চুলের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন নেত্রকোনার নামকরা বিউটিশিয়ান ভগীরথদা। আমার চুলের পেছনে তিনি অনেক সময় ব্যয় করেছেন। ভগীরথদার স্টেশন রোডস্থিত ক্ষুদ্র কিন্তু আধুনিক সেলুনটির কথা আমার খুব মনে পড়ে। সেখানে নেত্রকোনার কবি-সাহিত্যিক ও সাংবাদিকদের আড্ডা হতো।

ময়ূখের সম্পাদনা পরিষদের সঙ্গে জড়িত বাংলার অধ্যাপক শামসুদ্দিন আহমদ, ইংরেজী বিভাগের জলিল স্যার এবং প্রাণেশ চৌধুরীর স্যারও আমাকে একজন উঠতি তরুণ কবি হিসেবে নানাভাবে তালিম দিতেন। কলেজের অধ্যক্ষ তসাদ্দক হোসেন সাহেবও আমাকে খুব স্নেহ করতেন। তাঁদের সকলেরই বিশ্বাস ছিল আমি পরীক্ষায় ভালো ফল করে কলেজের মুখ উজ্জ্বল করব।

AMARBOI.COM

ক্লাসমেটদের মধ্যে আমার একজন বান্ধবী ছিল। তার নাম আছিয়া। সে ছিল খুব ভালো ছাত্রী। অপূর্ব সুন্দরী। যেমন তার গায়ের রঙ, তেমনি ছিল তার চমৎকার স্বাস্থ্য। মাঝে মাঝে সে বোরখা পরে ক্লাসে আসত। মাঝে মাঝে বোরখা ছাড়া। যেদিন বোরখা পরে আসত, সেদিন আমি তাকে শুনিয়ে শুনিয়ে আবৃত্তি করতাম :

'পাষাণ কবর বোরখা খোলো, দেখব তোমায় সুন্দরী—
দাঁড়াও শোভার বৈজয়ন্তী ভুবন বিজয় রূপ ধরি।'

আছিয়া প্রথম প্রথম আমাকে নবাগত বখাটে ছেলে ভেবে খুব রাগ করত, পরে যখন জানল আমিও তার মতোই ভালো ছাত্র, উপরন্তু একজন কবি, তখন সে আমাকে অলক্ষ্যে প্রশংসা করতে শুরু করে। একপর্যায়ে সে আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুতে পরিণত হয়। তখন আমি আছিয়ার বাসায় যেতে শুরু করি। সাতপাইয়ে আছিয়াদের বাসা ছিল। সে ছিল বাবা-মায়ের একমাত্র সন্তান। তার বাবা ছিল না। শুধু মা এবং মেয়ে। আছিয়ার মা আমাকে বেশ স্নেহ করতেন। প্রায়ই ওদের বাসায় খেতে পেতাম। আমি আছিয়ার সঙ্গে পরীক্ষার পড়া নিয়ে দীর্ঘ সময় ধরে আলাপ করতে পারতাম। তাতে খালাম্মা কিছু মনে করতেন না। বরং আমাকে পেয়ে খুশি হতেন। বলতেন, 'বাজান, আছিয়া তোমার খুব প্রশংসা করে। তুমি সময় পাইলেই আমার বাসায় চইল্যা আসবা।'

আমি সময় না পেলেও আছিয়াদের বাসায় চলে যেতাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আছিয়া এখন খুব নামকরা ডাক্তার হয়েছে। তার বড় ডাক্তার হওয়াটা খুব সহজ হতো না, যদি না বায়োলজি প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষার দিন আমি ওকে আমার গোপন সংগ্রহ থেকে উদ্বৃত্ত তেলাপোকা সরবরাহ করতাম। তেলাপোকার হজম-প্রক্রিয়া দেখাতে গিয়ে আছিয়া তার জন্য নির্ধারিত তেলাপোকার ক্ষুদ্র-কোমল-অন্ত্রনালীটি অসতর্কতার কারণে কেটে ফেলেছিল। ঐ চরম বিপদের মুহূর্তে আমি আছিয়ার সাহায্যে এগিয়ে যাই এবং কলেজের পিয়ন, আমরা যার গৃহে অন্ন গ্রহণ করতাম—সেই দেবেন্দ্রদার মাধ্যমে তাকে নতুন তেলাপোকা সরবরাহ করি। দেবেন্দ্রদার ঘরে তেলের অভাব থাকলেও তেলাপোকার অভাব ছিল না। ভবিষ্যতে বড় ডাক্তার হবে, এমন কোনো বিদুষী সুন্দরী রমণীর সঙ্গে আমার পরিচয় ও প্রণয় লাভের ওটাই ছিল প্রথম ঘটনা।

ভালোয় ভালোয় আমাদের পরীক্ষা সম্পন্ন হয়। কিছুদিন পর ১৯৬৪ সালের জুন মাসের শেষদিকে আমাদের পরীক্ষার ফল বেরোয়। আমি প্রথম বিভাগে আইএসসি পাস করি। ঐ বছর আমাদের কলেজ থেকে আমি ছাড়া আর কেউ-ই প্রথম বিভাগ পায়নি। ঢাকা বোর্ডে ঐ বছর মাত্র ১১৯ জন প্রথম বিভাগ পায়। ভালো ফল করায় আমাদের অধ্যক্ষ তসাদ্দক হোসেন স্যার আমাকে কলেজে আসার পথে রিকশা থেকে নেমে পরম আদরে বুকে জড়িয়ে ধরেন। আমি তাঁকে পা ছুঁয়ে প্রণাম করি। তিনি খুব খুশি। অন্য স্যাররাও খুব খুশি। আমার বাবা-মা, ভাইবোনরাও খুব খুশি। সকলের খুশি দেখে আমিও খুশি হই।

AMARBOI.COM

আজকাল যেমন প্রথম বিভাগ আর স্টারের ছড়াছড়ি, তখন তেমন ছিল না। ইঞ্জিনিয়ারিং বা মেডিক্যাল কলেজেও তখন আজকের মতো ভিড় ছিল না। তখনকার ভালো ফল-করা ছাত্ররা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়ন, বায়ো-রসায়ন, পদার্থবিদ্যা, ইংরেজি বা অর্থনীতি নিয়ে পড়তে চাইত। আমি যেহেতু ভালো ছাত্রদের দলেই ছিলাম, আমার বাবা চাইলেন, আমি ডাক্তারি পড়ি। আমাদের পরিবারে কোনো ডাক্তার নেই। তিনি ময়মনসিংহ মেডিক্যাল কলেজের প্রিন্সিপালের সঙ্গে কথা বলে আমার ভর্তির ব্যাপারটা পাকাপাকি করে ফেলেন এবং ফর্ম নিয়ে আসেন। তখন দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ ছাত্ররাই সাধারণত ডাক্তারি পড়ত। কিন্তু বাবা চাইলেও আমি ডাক্তারি পড়তে রাজি হইনি। ডাক্তার হওয়ার ব্যাপারে আমার অনীহার একটি খুব ব্যক্তিগত গোপন কারণ ছিল। আমার এক জেঠতুতো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বোন ছিল। আমার চেয়ে বয়সে বড়। আমি তাকে টুকুদি বলে ডাকতাম। আমার ছিল রোগা-পটকা চেহারা। আমি চিত্রনায়ক উত্তম কুমারের মতো সুন্দর নই কেন? এই নিয়ে আমার মনে একটা ক্ষোভ ছিল। আমার ঐ বোন, আমি ডাক্তারি পড়তে যাচ্ছি শুনে মুচকি হেসে বলল, তোকে ডাক্তার হিসেবে যা মানাবে!

টুকুদির কথাটার মধ্যে বিদ্রূপ ছিল। আমি তাতে খুবই আহত হই এবং তৎক্ষণাৎ ডাক্তারি না পড়ার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ফেলি। রোগা পটকা ডাক্তার আমার নিজেরও পছন্দ নয়। তাই আমার বাবার পক্ষে অনেক চেষ্টা করেও আমার সিদ্ধান্ত পাল্টানো সম্ভব হয়নি। আমি ময়মনসিংহের নামই শুনতে পারতাম না। আর আমার বাবার কথা ছিল, বাড়ির কাছে থেকেই যখন ডাক্তার হওয়া সম্ভব, তখন ঢাকায় যাবার দরকার কি? ঢাকায় কখন কী হবে কে জানে?

আমাদের পরিবারের সঙ্গে ঢাকার কোনো সম্পর্ক ছিল না। আমাদের সম্পর্ক ছিল কলকাতার সঙ্গে। আমার বাবা ছিলেন কলকাতা আর্ট স্কুলের ছাত্র। তবে তিনি তাঁর কোর্স সমাপ্ত করতে পারেননি। তার আগেই আমার ঠাকুরদার মৃত্যু হয় এবং তিনি গ্রামে ফিরে এসে সংসারের দায়িত্ব গ্রহণ করতে বাধ্য হন।

আমার দুই মামা এবং একমাত্র মাসিমা দেশভাগের সঙ্গে সঙ্গেই ভারতে চলে গিয়েছিলেন। খুব নিকট-জ্ঞাতিদের মধ্যেও অনেকে ভারতে চলে গিয়েছিলেন, চলে যাচ্ছিলেন এবং বাকিরা ভারতে চলে যাবার সুযোগ খুঁজছিলেন। এমতাবস্থায় বাবার ঢাকা-ভীতিকে ঢাকা-প্রীতিতে পরিণত করার কাজটা আমার পক্ষে বেশ দুরূহই ছিল।

AMARBOI.COM

বাবা ও মায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে, মতি ও হেলালের পদাংক অনুসরণ করে আমাদের পরিবারের মধ্যে আমিই প্রথম ঢাকা-অভিযানে আসি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সে-বছরই ফার্মেসি বিভাগ বলে একটি নতুন বিভাগ চালু হয়। প্রফেসর জব্বার ছিলেন ডিপার্টমেন্টের হেড। তাঁর সঙ্গে আমার কথা হয়। তিনি একটু খোঁড়া ছিলেন। আমি তাঁকে শিক্ষক বলে ভাবতে পারিনি। ভেবেছিলাম তিনি এই বিভাগের কেরানি-টেরানি হবেন। তাই আমি তাঁর কাছে জিজ্ঞেস করেছিলাম, আচ্ছা ভাইসাব, ফার্মেসি ডিপার্টমেন্টের কোনো শিক্ষককে দিয়ে আমার মার্কশীট কি এটেস্ট করানো সম্ভব? তিনি আমাকে ডেকে তাঁর রুমে নিয়ে যান এবং নিজ হাতে আমার মার্কশীট এটেস্ট করে দেন। তখন আমি খুব লজ্জা পাই। আমি তাঁর কাছে আমার কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা চাই। তিনি সহাস্যবদনে আমাকে ক্ষমা করেন। তার পরদিন ডিপার্টমেন্টের ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নিই (৮ আগস্ট ১৯৬৪) এবং পরীক্ষায় পাস করি। মনোনীত ছাত্রদের তালিকায় আমার ক্রমিক নম্বর হয় ১১।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাড়িতে গিয়ে ভর্তির জন্য টাকা আনব এবং ফার্মেসি বিভাগেই ভর্তি হব, এমন স্থির করি। আমার মনে আনন্দ। আমার এক পিসতুতো ভাই তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়ন বিভাগে অনার্স নিয়ে পড়ত। তার নাম পরিমল কান্তি বল। সে খুব ভালো ছাত্র ছিল। আমি জগন্নাথ হলে তার রুমেই থাকতাম। বিকেলের দিকে হলে ফিরে দেখি ছাত্রদের মধ্যে একটা আতংকভাব বিরাজ করছে। অনেকেই বিছানাপত্র বেঁধে হল ত্যাগ করার প্রস্তুতি নিচ্ছে। পরিমলও তাদের দলে। পরিমল জানায় যে, পুরনো ঢাকায় রায়ট শুরু হয়েছে। রাত্রে জগন্নাথ হল অ্যাটাক হতে পারে। সুতরাং সন্ধ্যার মধ্যেই হল ত্যাগ করতে হবে।

অগত্যা ঐ ভয়ের কাছে আমাকেও নতিস্বীকার করে পরিমলের সঙ্গী হতে হয়। পরিমলদের বাড়ি ছিল গফরগাঁও থানার মশাখালী স্টেশনের কাছে, লঙ্গাইল গ্রামে। আমরা রাতের ট্রেনেই ওদের গ্রামের বাড়িতে চলে যাই। কিছুদিন সেখানে থাকি। পরে লোকমুখে অবস্থার অবনতি ঘটার সংবাদ পেয়ে আমার গ্রামের বাড়িতে ফিরে যাই।

'কখন কী হবে বলা যায় না'— ঢাকা সম্পর্কিত বাবার আশংকা যখন সত্য পরিণত হলো, তখন বাবা আমাকে ভারতে চলে যাবার পরামর্শ দেন। আমার বড় ভাই অনেক আগেই ভারতে চলে গিয়েছিলেন। তিনিও পত্রযোগে আমাকে ভারতে চলে যাবার নির্দেশ পাঠাচ্ছিলেন। আমার মনটা খুবই খারাপ হয়ে যায়। আমি টালবাহানা করতে থাকি। যাব কি যাব না— এ রকম দ্বিধার ভিতরে আমার দিন কাটতে থাকে। চিরদিনের জন্য ভারতে চলে যেতে আমার মন চাইছিল না। আবার অল্পদিনের জন্য সেখানে যাবার কোনো উপায়ও নেই। ভারত হচ্ছে এমন একটি দেশ যেখানে চলে গেলে হিন্দুদের পক্ষে আর ফেরা হয় না। ১৯৭১-এ পাকিস্তান ভেঙ্গে বাংলাদেশ তৈরি হওয়ার পরও, এই অবস্থা এখনও পর্যন্ত বিরাজমান। তবে পড়াশোনার জন্য এখন ভারতে যাবার রেওয়াজ চালু হয়েছে। হিন্দুরাও ভারতে উচ্চশিক্ষা লাভ করে এখন বাংলাদেশে ফিরতে পারে।

কিছুদিন পর লোকমুখে আমি ঢাকার অবস্থা শান্ত হয়ে আসার সংবাদ পাই এবং বাবার কাছ থেকে টাকা নিয়ে ঢাকায় আসি ফার্মেসি বিভাগে ভর্তি হবার জন্য। পরিমল আর ঢাকায় ফিরেনি। সে আনন্দমোহন কলেজেই এক বছর লস দিয়ে বিএসসি পাস কোর্স নিয়ে ভর্তি হয়ে যায়। ঢাকায় আমি একা। কোথায় উঠেছিলাম আমার ঠিক মনে নেই। জগন্নাথ হলে অকালপ্রয়াত মলয় ভৌমিকের রুমে হতে পারে বা ঢাকা হলে কবি হেলাল হাফিজের বড় ভাই দুলাল হাফিজের রুমেও হতে পারে। দুলাল হাফিজ ঢাকা হলে (বর্তমানে শহিদুল্লাহ হল) থাকতেন। পরদিন কার্জন হলে যাই এবং গিয়ে দেখতে পাই যে, নোটিস বোর্ডে আমার নামটি লাল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কালি দিয়ে একটানে কেটে দেওয়া হয়েছে। অফিসে খবর নিয়ে জানি, ভর্তির সময় উত্তীর্ণ হয়ে যাওয়ায় আমার পরিবর্তে ওয়েটিং লিস্ট থেকে অন্য একজন অপেক্ষমাণ ছাত্রকে ইতোমধ্যেই ভর্তি করা হয়ে গেছে। ক্লাসও শুরু হয়ে গেছে। এখন আর কোনো অবস্থাতেই আমাকে ভর্তি করা যাবে না।

মাঝখানের সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতিটা আমার জন্য ভীতিকর হলেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চোখে তা গুরুত্বপূর্ণ কিছু বলে মনে হয়নি। তাই ঐ কথা বলে কোন লাভ হলো না। আমি চোখে সর্ষে ফুল দেখতে পাই। মনটা একেবারে ভেঙে যায়। আমি ফার্মেসিকে ডাক্তারির বিকল্প হিসেবে নিতে চেয়েছিলাম। ভেবেছিলাম এটি আমার চেহারা ও চরিত্রের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হবে। কিন্তু বিধি বাম। প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশোনার মাধ্যমে আমার যে আর বিশেষ কিছুই হওয়া হবে না, তা আমি দিব্যদৃষ্টিতে অনুভব করলাম।

এদিকে ডাক্তারিতে ভর্তির সময়ও চলে গেছে। আমি আমার রেজাল্টের সুবাদে ফার্স্ট গ্রেড স্কলারশিপ পাব। মাসে ৪৫.০০ টাকা এবং বছর শেষে ২৫০.০০ টাকা লামসাম। বইপত্র কেনার জন্য ঐ টাকাটা দেয়া হতো। তখনকার দিনে অনেক টাকাই বলতে হয়। কেননা তখন এক ভরি সোনার দাম ছিল ১০০-১২০ টাকা। মনে আছে আমার বৃত্তির টাকা থেকে বাঁচিয়ে আমি আমার বোনদের ছোটখাটো সোনার গহনা গড়িয়ে দিয়েছি। আজকাল কোনো ছাত্রের পক্ষেই এমনটি সম্ভব নয়। একবার ভাবলাম লেখাপড়ার ইতি টানি। যদিও জানি যে, আমার বাবা তাতে রাজি হবেন না। তবু আমি ভেবেছিলাম। পরে ভাবলাম, লেখাপড়া চুলোয় যাক, বৃত্তিটা কোনো অবস্থাতেই নষ্ট হতে দেয়া যাবে না।

তাই যে-কলেজ আমি একদিন অভিমান ও ঘৃণার সঙ্গে ত্যাগ করেছিলাম, পরিস্থিতির চাপে পড়ে আমাকে আবার সেই কলেজেই ফিরতে হলো। অত্যন্ত অবমাননাকর পরিস্থিতির মধ্যে আমি আনন্দমোহন কলেজে পাস কোর্সে বিএসসি ভর্তি হলাম। আমি আর পরিমল ছাড়া আইএসসিতে প্রথম বিভাগ পাওয়া আর একজন ছাত্রই ছিল— সে আমারই জেঠতুতো ভাই অতুল্য। অতুল্য ঢাকায় ভর্তি হওয়ার কোনো চেষ্টাই করেনি। ময়মনসিংহের বাড়ি বিক্রি করে অতুল্যরা তখন ভারতে চলে যাবার জন্য তৈরি হচ্ছিল।

গুহ স্যার তখনও আনন্দমোহন কলেজে আছেন। যথারীতি তিনি তখনও হিন্দু হোস্টেলের সুপার। আমি ঘুরেফিরে আবার আনন্দমোহনেই ফিরে আসব তা তিনিও ভাবতে পারেননি। আমার দুর্ভাগ্য আমাকে আবার তাঁর কাছেই টেনে আনে। আমি হিন্দু হোস্টেলে স্থান নেবার চেষ্টা না করে ডিগ্রি হোস্টেলে নাম লেখাই। সেখানে হিন্দু এবং মুসলমান ছাত্ররা একসঙ্গে থাকত। পুকুর পাড়ের ঐ হোস্টেলটিতে হিন্দুদের জন্য একটি রুম বরাদ্দ ছিল।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাস কোর্স নিয়ে বিএসসি ভর্তি হই বটে, কিন্তু ভবিষ্যতেও ভালো ছাত্র থাকার বাসনা আমার উবে যায়। শুধু বৃত্তির টাকা পাওয়া আর ইচ্ছেমতো সেই টাকা ওড়ানোর আনন্দেই আমি আনন্দমোহন কলেজে বিএসসি পড়তে থাকি। বই কেনার জন্য বৃত্তির টাকা পাওয়ার পরও আমি অনেক বই-ই কিনি না। মাঝে মধ্যে ক্লাসে হাজিরা দিই। অনেক সময় ক্লাসে যাই না। গেলেও পেছনের বেঞ্চে বসে বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করি। নিজে তো পড়িই না, অন্যকেও পড়ায় বাধা দিই।

পরের বছর ১৯৬৫ সাল। কাশ্মীর নিয়ে পাক-ভারত যুদ্ধের বছর। পরিমলের ছোট ভাই সুকোমল বল। সে নেত্রকোনায় তার পিসির বাড়িতে থেকে দত্ত হাইস্কুলে পড়ত। সুকোমল খুব ভালো ছাত্র ছিল এবং উত্তর আকাশ পত্রিকায় নিয়মিত কবিতা লিখত। এসএসসি পাস করে সে আনন্দমোহনে ভর্তি হয়েছিল। ভালো মার্ক ও দু'তিনটে লেটার নিয়ে আনন্দমোহন কলেজ থেকে ঐ বছরই সে এইচএসসি পাস করে। স্থির হয়, ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার জন্য সে ঢাকায় যাবে। আমি এবার সুকোমলের সঙ্গী হই। লক্ষ্য ইঞ্জিনিয়ার হওয়া। আমি অংকে কাঁচা। সুকোমল অংকে পাকা। ওর কাছে আমি অংকের তালিম নিই। সেবার ঢাকায় গিয়ে কোথায় উঠেছিলাম মনে নেই। রবীন্দ্র চক্রবর্তীর রুমে কিন্তু আইএসসি পড়ার সময় রবীন্দ্র ছিল আনন্দমোহন কলেজে আমার সহপাঠী। মেধাবী এবং পড়ুয়া। আইএসসিতে রবীন্দ্র প্রথম কুড়ি জনের মধ্যে স্থান পেয়েছিল। সে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ত, আহসানউল্লাহ হলের হিন্দু-অংশে থাকত। আমার মনে হয় ওর রুমেই আমরা উঠেছিলাম এবং রবীন্দ্র আমাদের কিছুটা গাইডও করেছিল।

AMARBOI.COM

যথাসময়ে একদিন ভর্তি পরীক্ষা দিই। ২৮০টি আসনের জন্য ১৩০০ ছাত্র ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নেয়। লিখিত পরীক্ষায় পাস করি। তখন ডাক পড়ে Viva বোর্ডে। ভারত এনিমি স্পেট বলে বিবেচিত। পূর্ব পাকিস্তানের হিন্দুরাও কিয়দংশে সেই এনিমিটির দায়ভাগ বহন করে। তারা পাকিস্তানের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হিসেবে বিবেচিত হয়। ঐ রকম পরিস্থিতিতে আমি আর সুকোমল ভীত এবং বিব্রত বোধ করি। ভাইভা বোর্ডে আমাকে প্রশ্ন করা হয়, ভালো রেজাল্ট থাকার পরও আমার ব্রেক অব স্টাডি হলো কেন? আমি গত বছরের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাজনিত পরিস্থিতিটা বোর্ডকে বুঝিয়ে বলি। বোর্ডের একজন তখন জানতে চান, আমার পরিবারের কেউ ভারতে আছেন কি না? আমি বলি যে, আমার বড় ভাই ভারতে আছেন, কিন্তু আমি ইঞ্জিনিয়ার হলে এ দেশেই থাকব। ভারতে চলে যাব না। ঐ সময় বেশকিছু হিন্দু ডাক্তার ও ইঞ্জিনিয়ার চাকরি ছেড়ে ভারতে চলে গিয়েছিল। ফলে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের শিক্ষকরা ভর্তি-ইচ্ছুক হিন্দু ছাত্রদের পারিবারিক পরিস্থিতিটা কৌশলে জেনে নেবার চেষ্টা করতেন। ঐ দিন বোর্ডে আমাকে পাঠ্যসূচি থেকে কোনো প্রশ্ন করা হয়নি। আমি ভাবলাম আমার হবে। কিন্তু যখন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফল বেরুল, দেখলাম হয়নি। সুকোমলের বড় দুই ভাই ভারতে ছিল, কিন্তু সে ঐ তথ্যটি বেমালুম চেপে যায়। ফলে সুকোমলের হয়। সে এখন খুব বড় ইঞ্জিনিয়ার। চট্টগ্রাম ড্রাই ডকের ম্যানেজার।

ডাক্তারিতে গেলাম না, ফার্মেসিতে হয়েও হলো না, শেষে এক বছর গ্যাপ দিয়ে হতে চাইলাম ইঞ্জিনিয়ার—সেটাও যখন হলো না, তখন বুঝলাম, একাডেমিক উচ্চশিক্ষা লাভ আমার ভাগ্যে নেই। আমি খুব লজ্জিত এবং অপমানিত বোধ করলাম। ইঞ্জিনিয়ারিং-এ ভর্তি হয়ে সুকোমল ঢাকায় থেকে গেল, আর ভর্তি হতে না পেরে, এক বুক ভর্তি কষ্ট নিয়ে আমি ফিরে এলাম আনন্দমোহনে।

এদিকে বৃত্তির টাকা, অন্যদিকে হতাশা— এ রকম পরিস্থিতিতে আমার রক্তের ভিতরে ঘুমিয়ে থাকা আত্মপ্রকাশ— উন্মুখ নেশাগুলো গুটিবসন্তের মতো ফুটে বেরুতে শুরু করে। অফুরন্ত আনন্দের তৃষ্ণা বাঁধ-ভাঙা প্লাবনের জলে খড়কুটোর মতো আমাকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। অগ্নিতে পেট্রোল ঢালার মতো আমি নিজেকে আনন্দের অগ্নিতে নিক্ষেপ করি। মাঝে মাঝে খুব রাতে, যখন ঘুমিয়ে পড়ে সবাই এবং আমার যখন ঘুম আসে না, তখন বসি কবিতা লিখতে। ওটাও আমার কাছে এক-ধরনের খেলার বিষয়ই হয়ে ওঠে। খেলা শব্দের বর্ণ দুটোকে উল্টে দিয়েই যে লেখা হয়—তা আমি অত্যন্ত কৌতুকের সঙ্গে লক্ষ করি। ভাবি আহা, খেলা আর লেখার আনন্দের ভিতর দিয়েই যদি এই কঠিন জীবনটা কাটিয়ে দেয়া যায়, তাহলে কেমন হয়? আনন্দের চেয়ে বড় আরাধ্য জীবনের আর কী হতে পারে? আনন্দসমুদ্রে অবগাহন করা ছাড়া এমন কি মহৎ অর্থ আছে তার? মৃত্যুর মতো ভয়ংকর এক নিশ্চিত অন্ধকারে নিঃশেষিত হওয়ার জন্য আমার মধ্যে মূর্ত হয়েছে যে-জীবন, বিমূর্ত আনন্দের আশায় কেন কষ্ট দেব তাকে;— ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আনন্দের অজস্র উপাদান যেখানে ছড়িয়ে রয়েছে জীবনের চারপাশে।

এই ভেবে, আমি আমার আনন্দসন্ধানী ইন্দ্রিয়কে দমন করার পরিবর্তে, জগতের আনন্দযজ্ঞের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করি। আমি নবজাগ্রত যৌবনের ডাকে সাড়া দিই—খরতপ্ত গ্রীষ্মের প্রথম বর্ষণের ডাকে ডিমওয়ালা কৈ মাছ যে রকম সাড়া দেয়। আমি সাড়া দিই—উষ্ণ গাভীর ডাকে বীর্যবান ষাঁড় যে রকম সাড়া দেয়। আমি সাড়া দিই—মিষ্টদ্রব্যের গন্ধে পিঁপড়ের দল যে রকম সাড়া দেয়। আমি সাড়া দিই— টারজানের ডাকে অরণ্যের হিংস্রপশুরা যে রকম সাড়া দেয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তখন আনন্দমোহন নামটির অন্তর্নিহিত অর্থের প্রতি আমার দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়। কলেজের লাল ইটের প্রাচীন ভবনগুলোর গায়ে ছায়াদানকারী দীর্ঘ-পুষ্ট পামগাছগুলো আমাকে কানে কানে বলে, হে বৎস, মন খারাপ করো না; আমার দিকে তাকাও, আমি তোমাকে একটি চমৎকার জীবন-দর্শন উপহার দিচ্ছি। আজ থেকে আনন্দই হবে তোমার আরাধ্য। দুঃখ করো না, বাঁচো। আনন্দ করো। আনন্দের জন্য বাঁচো। আনন্দের হাত ধরে নাচো, গাও, স্ফূর্তি করো। এ জীবন হচ্ছে নিশার স্বপন। একে ব্যর্থ হতে দিও না।

আমি রবীন্দ্রনাথের মতো নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ শেষে নবীন উল্লাসে জেগে উঠি।

মদ্য-পদ্য-সিদ্ধি-গণিকা-জুয়া— এই পঞ্চভূতের পাদপদ্মে আমি উৎসর্গ করি আমাকে।

দিন যায়। রাত পোহায়। কিন্তু আমার সময় কাটে না। সময় নিয়ে আমি এক মহাসংকটে পড়ি। কিছুদিন ময়মনসিংহ থাকি। কিছুদিন নেত্রকোনায়। ছুটিছাটায় বারহাট্টায় গ্রামের বাড়িতে যাই। বিকেলে বন্ধুদের সঙ্গে কখনও ফুটবল, কখনও ভলিবল, কখনও বা ব্যাডমিন্টন খেলি। সন্ধ্যার পর 'মৃতসঞ্জীবনী' বা 'কালোমেঘের' বোতল খুলে বসি। তখন ওটাকে মদের বিকল্প বলে ভাবা হতো। আমি মোটামুটিভাবে বখে-যাওয়া তরুণ হিসেবেই পরিচিত হতে থাকি। তখন আমাদের পরিবারের শুভানুধ্যায়ীদের কেউ কেউ আমার বাবার কাছে এসে নালিশ করতেন যে, আমি খারাপ ছেলেদের সঙ্গে মিশে নষ্ট হয়ে যাচ্ছি। আমার বাবা আমাকে চিনতেন। তিনি আমার শুভানুধ্যায়ীদের কথা শুনে হাসতেন। বলতেন, 'এটা আমি বিশ্বাস করি না। নির্মলেন্দু অন্যদের সঙ্গে মিশে নষ্ট হচ্ছে, বরং উল্টো, ওর সঙ্গে মিশেই অন্যরা নষ্ট হচ্ছে।'

AMARBOI.COM

নষ্ট হওয়ার ক্ষেত্রে আমার অন্তহীন উদ্ভাবনী ক্ষমতার স্বীকৃতি আমি আমার বাবার কাছ থেকেই পেয়েছিলাম। তাঁর সঙ্গে আমার একটা গোপন বোঝাপড়া ছিল। আমি তাঁকে ভালো বুঝতাম এবং তিনিও আমাকে ভালো বুঝতে পারতেন। তিনি ছিলেন আমার এক অঘোষিত বান্ধব। বাইরে থেকে বোঝা যেত না, আমরা পরস্পরকে কতটা ভালোবাসি। তিনি আমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলতেন : Life is Mathematics not Poetry. কিন্তু এই জীবনদর্শনের প্রতি তাঁর নিজেরই যে খুব একটা আস্থা ছিল, এমন নয়। আমার জীবনের ওপর ঐ দর্শনকে চাপিয়ে দেবার ক্ষেত্রেও তাই তিনি খুব জোর খাটাতেন না। বাক্যটি তাঁর মুখে স্বগতোক্তির মতোই উচ্চারিত হতো। আমার ভবিষ্যত চিন্তায় আমি আমার নতুন মাকে বিচলিত হতে দেখতাম। আমার মায়ের ধারণা ছিল, আমাকে দিয়ে তাঁর দৈন্যদশাপ্রাপ্ত সংসারের উন্নতি হবে— বড় চাকরি পেয়ে আমি সংসারের হাল ধরব। আমার বাবা তা বিশ্বাস

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করতেন না। তাই আমার অনেক অপরাধকেই তিনি আমার নতুন মায়ের কাছ থেকে আড়াল করে রাখতেন।

খুব গভীর রাতে আমার মনে ভাব আসত। উত্তর আকাশের পাশাপাশি ঢাকার পত্র-পত্রিকায়ও আমি কবিতা পাঠাতাম। কিন্তু সেগুলো কখনও ছাপা হতো না। উত্তম-সুচিত্রার কোনো একটি ছবি দেখে আমি খুব অনুপ্রাণিত হয়ে তখন একটি উপন্যাস লিখে ফেলেছিলাম। পেপার ল্যান্ড নামক একটি কাগজের দোকান থেকে কেনা প্রায় শতাধিক পৃষ্ঠার বাঁধাই করা বইয়ে আমি ঐ উপন্যাসটি লিখেছিলাম। উপনাসের নায়ক ছিল একজন মেধাবী ছাত্র, নায়িকা দরিদ্র স্কুল শিক্ষকের কন্যা। রুপালি পর্দাকে সামনে রেখেই উপন্যাসটি লেখা হয়েছিল। প্রকাশক ও সমঝদারের অভাবে একসময় উপন্যাসটি কালের অতলগর্ভে হারিয়ে যায়।

ঢাকার পত্রিকায় আমার প্রথম কবিতা ছাপা হয় ১৯৬৫ সালের একুশে ফেব্রুয়ারিতে। কবিতার নাম 'কোনো এক সংগ্রামীর দৃষ্টিতে'। পত্রিকার নাম সাপ্তাহিক জনতা। গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সাপ্তাহিক মুখপত্র হিসেবে ঐ পত্রিকাটি তখন বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল।

সম্পাদক ছিলেন শওকত আলী খান। আরফান প্রেস, ১৬/২০ নবরায় লেন, ঢাকা-১ থেকে পত্রিকাটি প্রকাশিত হতো। ঐ সাপ্তাহিক কাগজটি বেশ চালু ছিল। ময়মনসিংহ রেলস্টেশনের বুক স্টলে ঐ পত্রিকাটি আসত এবং ভালো চলত। ঐ রকম একটি চালু পত্রিকার প্রথম পাতায় আমার কবিতা প্রকাশ করায় আমি খুব উৎসাহিত বোধ করি। কাগজটি বগলের নিচে নিয়ে ঘুরি ও সুযোগমতো খুলে বন্ধুদের পড়তে বাধ্য করি। পত্রিকায় ছাপা নিজের নামের ওপর চোখ বুলিয়ে আমার খুব আনন্দ হয়। কিন্তু আমার নিজের নাম নিয়ে আমি সন্তুষ্ট বোধ করতে পারি না। কী করা যায় ভাবছিলাম। তখন ভগীরথদা'র কথা মনে পড়ে। ভগীরথদা ধারালো কাঁচি দিয়ে মাথার লম্বা চুল ঘ্যাচ করে ছেঁটে ফেলতেন। সেই কথা ভেবে, আমিও কিঞ্চিৎ ক্ষৌরকর্ম করে একদিন আমার নামের মধ্যের অংশটা ছেঁটে ফেলি। ঐ শব্দটি ছিল প্রকাশ। নামের শেষ থেকে চৌধুরী ছেঁটে বাদ দিয়েছিলাম আরও আগেই। এভাবেই আমার নামের বর্তমান চেহারাটি আমি পেয়ে যাই। নতুন নামটি আমার খুবই পছন্দ হয়। আমি আমার নতুন নামের মধ্যে একজন নতুন মানুষকেই অনুভব করতে শুরু করি। আমার নতুন নামটি আমার মনের মধ্যে একটা আস্থার ভাব সৃষ্টি করে।

কিছুদিন পর নতুন লেখা কিছু কবিতা নিয়ে আমি ঢাকায় যাই। আজাদ পত্রিকায় তখন কবি হাবীবুর রহমান ছিলেন সাহিত্য সম্পাদক। কবি-গীতিকার এবং শিশু-সাহিত্যিক হিসেবে তিনি তখন ছিলেন খুবই খ্যাতিমান। আত্মভোলা, প্রাণভোলা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এবং প্রাণখোলা মানুষ ছিলেন তিনি। মলয় ভৌমিকের সঙ্গে তাঁর অত্যন্ত স্নেহের সম্পর্ক ছিল। মলয়ের মাধ্যমেই কবি হাবীবুর রহমানের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। মলয় ভৌমিক বগুড়ার হলেও ওর বাবা শ্রী জয়গোবিন্দ ভৌমিক মহাশয় ছিলেন নেত্রকোনার মুন্সেফ। সেই সূত্রে মলয় নেত্রকোনা কলেজে পড়ত। একজন স্কাউট হিসেবে মলয় লাহোর জাম্বুরিতে যায়। সেখান থেকে ফিরে সে একটি ধারাবাহিক ভ্রমণ-কাহিনী লেখে ইত্তেফাক পত্রিকায়। কচিকাঁচার আসরের সদস্য ছিল বলে রোকনুজ্জামান খান (দাদাভাই) মলয়কে খুব স্নেহ করতেন। মলয়ের ঐ লেখাটি খুব যত্নের সঙ্গে ইত্তেফাক পত্রিকায় ছাপা হয়। পরে ঐ লেখার জন্যই মলয় আইয়ুব খানের প্রেসিডেন্ট স্বর্ণপদক লাভ করে। ঐ লেখা এবং স্বর্ণপদকের জন্য তখন মলয় ছিল আমাদের মধ্যে সবচেয়ে খ্যাতিমান লেখক। আমরা সবাই তাঁকে গোপনে ঈর্ষা করতাম। নেত্রকোনা কলেজ থেকে আইএ পাস করার পর সে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজীতে অনার্স নিয়ে ভর্তি হয়েছিল। থাকত জগন্নাথ হলে। ঐ মেধাবী তরুণ-লেখক মলয় ভৌমিক ক্যান্সার রোগে ভুগে ১৯৭৫ সালে অকাল মৃত্যু বরণ করে।

মলয়ের কারণেই কবি হাবীবুর রহমান আমার কবিতা আজাদ-এর সাহিত্য বিভাগে ছাপেন। পাশাপাশি 'মাসিক মোহাম্মদী' পত্রিকাতেও আমার কবিতা ছাপা হয়। আজাদ তখন খুবই বিখ্যাত কাগজ ছিল। সেখানে শ্রী সন্তোষ গুপ্ত, জনাব আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী, জনাব ফয়েজ আহমদ, জনাব আজিজ মিসির প্রমুখ প্রখ্যাত সাংবাদিক-সাহিত্যিক কাজ করতেন। আমি তাদের দূর থেকে দেখার সুযোগ পাই।

সংবাদ পত্রিকার সঙ্গেও আমার একটা নিবিড় সম্পর্ক গড়ে ওঠে। শ্রী রণেশ দাশগুপ্ত ঐ পত্রিকার সাহিত্য বিভাগ দেখতেন। আজাদের পর সংবাদেই আমার লেখা বেশি ছাপা হতো। রণেশদা জেলে চলে গেলে সংবাদের সাহিত্য পাতা দেখতেন প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক—সাংবাদিক শহীদুল্লাহ কায়সার। একসময় ছাত্র-নেতা বেগম মতিয়া চৌধুরীর স্বামী জনাব বজলুর রহমানও সংবাদের সাহিত্য বিভাগের দায়িত্বে ছিলেন। কথাটা মনে আছে এ জন্য যে, ছাত্র ইউনিয়ন যখন মতিয়া গ্রুপ (মস্কোপন্থী) এবং মেনন গ্রুপ (পিকিংপন্থী)— এই দুই ভাগে ভাগ হয়ে যায়, তখন ১৯৬৫ সালের ৩ এপ্রিল, আমি মেনন গ্রুপের সম্মেলনে ঢাকায় এসেছিলাম এবং একদিন দুপুরের দিকে সংবাদে গিয়েছিলাম কবিতা দিতে। তখনই বজলুর রহমান সাহেবের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। আমি মেনন গ্রুপের সম্মেলনে ঢাকায় এসেছি— এটি মতিয়া চৌধুরীর স্বামীর জন্য খুব সুখের সংবাদ ছিল না। আমি বজলুর রহমানের সঙ্গে মতিয়া চৌধুরীর সম্পর্কটা তখন জানতাম না। জানলে হয় যেতাম না, না হয় ঐ তথ্যটি গোপন করতাম। তিনি অবশ্য আমার কবিতা রেখেছিলেন এবং পরে সংবাদে ঐ লেখা ছাপাও হয়েছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি কবি-খ্যাতি অর্জনের দুর্মর বাসনায় ক্ষত-বিক্ষত হচ্ছিলাম। কিন্তু কী করা দরকার, ভেবে পাচ্ছিলাম না। উত্তর আকাশ পত্রিকার সম্পাদক, আমার অভিভাবকতুল্য সাহিত্যিক খালেকদাদ চৌধুরী তখন আমাকে সমকাল পত্রিকায় কবিতা পাঠানোর পরামর্শ দেন। কিছুদিন আগে সমকাল কবিতা সংখ্যার একটি সচিত্র আলোচনা ইত্তেফাকের পুরো পাতাজুড়ে প্রকাশিত হয়েছিল। তখন থেকেই ঐ পত্রিকার কথা আমি জানতাম। কিন্তু ঐ নামীদামী পত্রিকায় আমার লেখা ছাপা হতে পারে, তা ভাবতে পারতাম না। খালেকদাদ চৌধুরী সাহেবই আমাকে সাহস দেন। তখন কয়েকটি কবিতা লিখে আমি সমকাল সম্পাদক কবি সিকানদার আবু জাফরের নামে পাঠিয়ে দিই ও উত্তরের অপেক্ষা করতে থাকি।

একদিন ফুটবল খেলে সন্ধ্যার পর বাড়ি ফিরলে আমার বাবা আমাকে একটি চিঠি দেন। ঐ চিঠিটি ছিল কবি সিকানদার আবু জাফরের নিজের হাতে লেখা চিঠি। তিনি আমাকে উৎসাহ দিয়ে চিঠি লেখেন এবং আমার একটি কবিতা সমকালের আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হবে বলে জানান। আমার আনন্দ দেখে কে? আমার বাবাও চিঠি পড়ে খুশি হন। আমার বাবা ছিলেন পিকাসোর বাবার মতোই একজন ব্যর্থ শিল্পী। তিনি তাঁর দ্বিতীয় পুত্রের নাম রেখেছিলেন কালিদাস। কালিদাস আমার জন্মের পূর্বেই তিন বছর বয়সে লোকান্তরিত হয়। মনে হয় তাঁর কোনো একটি পুত্র কবি হোক, তা আমার বাবা চাইতেন। তা না হলে তিনি তাঁর পুত্রের নাম কালিদাস রাখবেন কেন?

AMARBOI.COM

বিএসসি পড়ার সময় আনন্দমোহনে আমার রুমমেট ছিল চিত্রনায়ক-পরিচালক সোহেল রানা। তার আসল নাম মাসুদ পারভেজ। সে ছিল ছাত্রলীগের নেতা। সৈয়দ নজরুলের ভাগনে আনোয়ারও ছিল আমার সহপাঠী বন্ধু। ছাত্রলীগ নেতা মুজিবুর রহমান মিলকিও আমার সহপাঠী বন্ধু। এদের সংস্পর্শে এসে মেননপন্থী ছাত্র ইউনিয়নের প্রতি আমার দুর্বলতা কাটতে থাকে। যদিও Chinese Literature এবং Peking Review আমি নিয়মিতই পড়তাম। শহরের স্বদেশী বাজারে একটি ভালো পত্রিকার স্টল ছিল। স্টলের মালিক ছিলেন হিন্দু। ওখানে কলকাতার আনন্দবাজার, যুগান্তর এবং Statesman পত্রিকা পাওয়া যেত। আমি চীনের সংগ্রামী ইতিহাসের প্রতি অনুরক্ত বোধ করতাম। চীনের রাষ্ট্রপতি লিউ শাও চি-র ঢাকা আগমন উপলক্ষে আমি একটি কবিতা লিখেছিলাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সশস্ত্র বিদ্রোহের মাধ্যমে পাকিস্তান নামক এই সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রটিকে ভেঙ্গেচুরে তছনছ করে দেবার বাসনা আমার মনে তখন দানা বাঁধছিল। একদিন ছাত্রনেতা রাশেদ খান মেনন এবং কাজী জাফর আহমদ ঢাকা থেকে ময়মনসিংহে গিয়ে আমাদের রাজনীতি বুঝিয়েছিলেন। ঐ আলোচনা অনুষ্ঠানটি হয়েছিল শাহজাহানের আকুয়ার বাসায়। শাহজাহানদের একটি কাগজের দোকান ছিল বড়বাজারে। তখন শাহজাহান ছিল কমিউনিস্ট, ছাত্র ইউনিয়নের নেতা। কিন্তু তাদের রাজনীতির প্রভাব আমার জীবনে দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। আমার মনে হয়েছিল, তারা যতটা না চীনাপন্থী তার চেয়ে বেশি ছিলেন ভারতবিরোধী। ঐ রাজনীতিতে আমার অন্তরের ক্ষতের উপশম ছিল না। আমি লক্ষ্য করতাম, মাওলানা ভাসানী যখন আইয়ুবকে বিরক্ত না করার নীতি নিয়ে [সূত্র—সমর্থন : তারিক আলী রচিত গ্রন্থ থেকে ড. মোহাম্মদ হাননান রচিত ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস, তৃতীয় খণ্ড] সভা-সমিতিতে ভারতবিরোধী বক্তব্য রাখতেন, তখন তা সাম্প্রদায়িকতাকে উস্কে দিত। মাও সে-তুং বা লিউ শাও-চি-র সংগ্রামী জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করার পরও পাকিস্তানী অপশাসন ও সাম্প্রদায়িতা দ্বারা পিষ্ট আমার চিত্ত যে মাওলানা ভাসানীর মধ্যে প্রয়োজনীয় অভয় খুঁজে পায়নি—সেটা কি শুধুই আমার অপরাধ? ভারতের প্রতি সঙ্গত কারণনির্ভর দুর্বলতা থাকার পরও, আমার তা মনে হয় না।

আমি শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি আকর্ষণ বোধ করতে থাকি। এই প্রথম আমি এমন একজন নেতাকে দেখতে পাই, যিনি রবীন্দ্রনাথকে শ্রেষ্ঠজ্ঞানে শ্রদ্ধা করেন। তাঁর পোশাক, তাঁর ভাষা, তাঁর উচ্চারণ— খাঁটি বাঙ্গালীর। তাঁর দিকে তাকিয়ে তাঁকে শুধুই মুসলমানদের নেতা বলে আমার মনে হয় না। মনে হয় তিনি হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকল বাঙ্গালীর নেতা। '৬৪-র সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় তিনি বজ্র নিনাদে ঢাকার রাজপথে নেমে আসেন। ভারতের বিরুদ্ধে বক্তৃতা দিয়ে সস্তায় মাঠ গরম করার রাজনীতি তিনি করেন না।' ৬৫-এর যুদ্ধে পূর্ব বাংলা যে অরক্ষিত ছিল এবং তা যে খুব সহজেই ভারত দখল করে নিতে পারত—এ অঞ্চলের মানুষের মনের সেই ভয়টাকে অত্যন্ত সুকৌশলে কাজে লাগিয়ে তিনি অটোনমির দাবি তোলেন এবং ঐতিহাসিক ৬-দফা কর্মসূচী ঘোষণা করেন। ঐ ৬-দফা কর্মসূচী ঘোষণার অপরাধে ১৯৬৬ সালের ৮ মে ডিফেন্স অব পাকিস্তান রুলের ৩২ ধারাবলে গভীর রাতে তাঁকে তাঁর ধানমণ্ডির বাসভবন থেকে গ্রেফতার করা হয়। সেই থেকে তিনি কারাগারেই আছেন। তিনি সাহসী, অসাম্প্রদায়িক, বুদ্ধিমান ও সুদর্শন। আমি ক্রমশ শেখ মুজিবের ভক্ত হতে শুরু করি।

শেখ মুজিবের সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাতের স্মৃতিও আমাকে তাড়িত করে। সময় ১৯৬৪ সাল। ময়মনসিংহ থেকে দুপুরের ট্রেনে শেখ মুজিব নেত্রকোনা হয়ে যাচ্ছেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মোহনগঞ্জে। সেখানে আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে পাকিস্তান রাষ্ট্রের জনক মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্‌র ভগ্নি ফাতেমা জিন্নাহকে ভোট দেবার জন্য তিনি জনগণকে বলবেন। আমি নেত্রকোনা থেকে বারহাট্টায় ফিরছি। আমার হাতে সদ্য কেনা একটি চড়কা বড়শির ছিপ। ঐ ছিপ হাতে আমি শেখ মুজিব যে কামরাটিতে যাচ্ছিলেন, তার হাতল ধরে ঝুলছি, তাঁকে এক নজর দেখব বলে। ব্যাপারটার মধ্যে কিঞ্চিৎ ঝুঁকি ছিল, যদিও আমি এ ব্যাপারে ছিলাম খুবই অভ্যস্ত। আমার সঙ্গে আরও কয়েকজন ঝুলছিল। শেখ মুজিবের চোখ পড়ল আমাদের প্রতি। তিনি ভেতরের একজনকে বললেন দরোজাটি খুলে দিতে। যে-ভদ্রলোক এতক্ষণ আমাদের কামরার ভিতরে ঢুকতে দিচ্ছিলেন না, শেখ মুজিবের নির্দেশে তিনি দরোজা খুলে দিতে বাধ্য হলেন। আমরা ভিতরে ঢুকলাম। তিনি, শেখ মুজিব তখন আমাদের খুব ধমক লাগালেন। বললেন, সাবধান, এভাবে আর কক্ষনো গাড়িতে ঝুলবে না।

আমার প্রতি নয়, আমার হাতের ছিপটির প্রতি নজর পড়ল তাঁর। তিনি আমাকে ইঙ্গিতে কাছে ডাকলেন। আমি ছিপ হাতে ভীরু পায়ে তাঁর দিকে এগিয়ে গেলাম। তিনি আমার হাত থেকে ছিপটি নিজের হাতে নিয়ে কামরার মধ্যেই একটু কোণাকুণি করে ফেললেন, যেন লেকের জলে মাছ ধরতে বসেছেন, এ রকম ভাব। তাঁর সফরসঙ্গী অন্য নেতাদের কথা আমার মনে নেই। শেখ মুজিবকে রেলের কামরায় মাছ ধরতে দেখে তাঁরা সবাই খুব মজা পাচ্ছিলেন। তিনিও হো হো করে হাসলেন। বললেন, এটা আমার খুব প্রিয় নেশা ছিল এক সময়। এখন সময় পাই না, তা ছাড়া আমার ধৈর্যের অভাব আছে— আমি বেশিক্ষণ একনাগাড়ে এক জায়গায় বসে থাকতে পারি না।

একসময় তিনি আমার হাতে ছিপটি ফেরত দিলেন। আমি তখন ভাবছিলাম, শেখ মুজিবের উচিত আমার নাম জিজ্ঞেস করা। আমি যেমন তাঁকে চিনি, তিনি তো আর আমাকে চেনেন না।

আমি যখন এ রকম ভাবছি, ঠিক তখনই তিনি আমার নাম জিজ্ঞেস করলেন।

আমি আমার নাম বললাম।

এবার দ্বিতীয় প্রশ্ন, বাড়ি কোথায় তোমার?

আমি বললাম, বারহাট্টা।

বারহাট্টার নাম শোনামাত্র চোখ বন্ধ করে তিনি এক মুহূর্ত কী যেন ভাবলেন, তারপর বললেন, তুমি জগদীশ চক্রবর্তীকে চেন? তাঁর বাড়ি ছিল বারহাট্টায়। কলকাতায় তিনি আমার ক্লাসমেট ছিলেন।

আমি বললাম, হ্যাঁ, চিনি। আমি তাঁকে দেখিনি, তবে তাঁর নাম শুনেছি। তিনি আমাদের পাশের গ্রামের লোক। এখন তিনি হাওড়ার জেলা জজ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তিনি সহকর্মীদের সঙ্গে কলকাতার হারানো দিন নিয়ে গল্পে মেতে উঠলেন। আমি তাঁর সামনে থেকে সরে এসে দূর থেকে তাঁকে দেখতে থাকলাম। বাংলা-ঠাকুরাকোনা হয়ে বারহাট্টায় এসে আমাদের ট্রেন থামল। শেখ মুজিবের সান্নিধ্য লাভের আনন্দ নিয়ে আমি নেমে গেলাম। তাঁকে নিয়ে ট্রেন ছুটল মোহনগঞ্জের উদ্দেশ্যে।

১৯৬৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে লাহোরে বিরোধী দলের নেতাদের একটি জাতীয় সম্মেলন হয়। সেখানে শেখ মুজিব তাঁর ৬ দফা কর্মসূচী উপস্থাপনের চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। ঢাকায় ফিরে এসে তিনি উক্ত ৬ দফার সারসংক্ষেপ পত্রিকায় প্রকাশ করেন। এর পর 'আমাদের বাঁচার দাবি ৬ দফা' কর্মসূচী শেখ মুজিবুর রহমানের নামে পুস্তিকাকারে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। ৬ দফা বাঙালির অবচেতনায় আঘাত হানে। বাংলার মানুষ তাদের ভবিষ্যত নিয়ে নতুন করে ভাবতে শুরু করে। শেখ মুজিব দেশব্যাপী গণজাগরণ সৃষ্টির লক্ষ্যে জনসভার পর জনসভা করে বেড়াতে থাকেন। তারই একপর্যায়ে নারায়ণগঞ্জের জনসভা শেষ করে বাসায় ফিরলে পর, ৮ মে তারিখের গভীর রাতে তাঁকে ধানমণ্ডির বাসা থেকে পাকিস্তানের নিরাপত্তা আইনে গ্রেফতার করা হয়। একই রাতে গ্রেফতার হন তাজউদ্দীন আহমদসহ আরও বেশ কয়েকজন প্রথম সারির নেতা।

১৯৬৬ সালের ৭ জুন শেখ মুজিব ও তাজউদ্দীন আহমদসহ আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের গ্রেফতারের প্রতিবাদে এবং ছয় দফার সমর্থনে আওয়ামী লীগের ডাকে ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জে হরতাল পালিত হয়। ঐদিন তেজগাঁও রেল ক্রসিংয়ের কাছে পুলিশের গুলিতে মনু মিয়া নামে একজন শ্রমিকের মৃত্যু হয়। নারায়ণগঞ্জে নিহত হয় ১০ জন শ্রমিক। তা ছাড়া দেশব্যাপী প্রচুর আহত হওয়ার ঘটনা ঘটে।

আমি ময়মনসিংহে। সৈয়দ নজরুল ইসলাম গ্রেফতার না হওয়ার কারণে তিনিও তখন ময়মনসিংহে থাকেন। তাঁর বাসার সামনে সর্বদা একটি পুলিশের গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকে। আমি আনোয়ারের সঙ্গে ঐ বাসায় নিত্যদিন যাতায়াত করি। পুলিশ সন্দেহের দৃষ্টিতে আমাকে দেখে। আমার বেশ মজাই লাগে। নিজেকে নেতা নেতা বলে মনে হয়। ঢাকার হরতালের খবর জানবার জন্য সন্ধ্যার দিকে রেলস্টেশনে যাই। ৭ জুন সন্ধ্যায় ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা একটি যাত্রীশূন্য ট্রেন ময়মনসিংহ স্টেশনের প্ল্যাটফরমে প্রবেশ করে। ঐ যাত্রীশূন্য ট্রেনটি দেখে আমার মনে নতুন আশার সঞ্চার হয়। ঐ যাত্রীশূন্য ট্রেনের মধ্যে আমি যেন আমার স্বপ্নের দেশটিকেই দেখতে পাই। আমার খুব ভালো লাগে।

হোস্টেলে ফিরে গিয়ে রাত জেগে কবিতা রচনা করি। ছাত্রলীগের নেতারা বিভিন্ন সভায় আমার কবিতা উদ্ধৃত করে বক্তৃতা দিতে থাকে। তখন ছাত্রলীগ-নেতা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আনোয়ার আমার একটি কবিতাকে বিখ্যাত করে ফেলেছিল। কবিতাটির নাম 'হলুদ চোখ'। কবিতার শেষ ক'টি লাইন ছিল এ রকম :

'কোনোদিন চাইনি কিছুই, প্রেয়সী গো,
আজ কিছু রক্ত চাই; চেয়ে দেখ,
বাঙ্গালীর চোখগুলো রক্তহীন ভীষণ হলুদ।'

[দ্র : হলুদ চোখ : প্রথম দিনের সূর্য]

জনতার প্রতি এ রকম রক্তের প্রার্থনা জানিয়ে আনোয়ার যখন তার জ্বালাময়ী ভাষণ শেষ করত, আমার মনে পড়ত নেতাজী সুভাষচন্দ্রের কথা। তিনি বলতেন, 'তোমরা আমাকে রক্ত দাও— আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব।' আমার কবিতা জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার ক্ষেত্রে কিছুটা হলেও কাজে লাগছে ভেবে আমার খুব ভালো লাগত!

দেখতে দেখতে কখন যেন বিএসসি ফাইন্যাল পরীক্ষাটি এসে যায়। আমি ক্লাস করতাম না। ইতোমধ্যে কবীর চৌধুরী আনন্দমোহন কলেজের অধ্যক্ষ হয়ে আসেন। কলেজটিকে সরকারী কলেজে রূপান্তরিত করা হয়। আমরা জানি, এর ফলে ঐ কলেজকে কেন্দ্র করে যে ছাত্র আন্দোলন হচ্ছে তা বন্ধ হয়ে যাবে। আমরা সরকারীকরণের প্রতিবাদে তখন কলেজে ছাত্র ধর্মঘট করি। সরকার-নিয়োজিত অধ্যক্ষ কবীর চৌধুরীকে আমরা তখন ভালো চিনতাম না। শুনেছিলাম যে, তিনি প্রখ্যাত নাট্যকার অধ্যাপক মুনীর চৌধুরীর অগ্রজ। ঐটুকু পরিচয় তখন তাঁকে ছেড়ে কথা বলবার জন্য যথেষ্ট ছিল না। সুতরাং আমার মনে পড়ে স্যারের বাসায় ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে স্যারকে কলেজ-ছাড়া করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু পারিনি। তিনি বেশ কড়া মেজাজের এবং সাহসী লোক ছিলেন। তিনি তো টিকে গেলেনই, উল্টো তিনি আমাদের ১১ জন ছাত্রকে ডিসকলেজিয়েট বলে ঘোষণা করলেন। তার মানে, ক্লাসে উপস্থিতির হার প্রয়োজনের তুলনায় আমাদের কম। সুতরাং আমাদের ১১ জনকে বিএসসি ফাইন্যাল পরীক্ষা দিতে দেয়া হবে না।

শোন কথা! আমাদের ১১ জনকে মাথায় হাত বুলিয়ে, বই দেখে পরীক্ষার সুযোগ দেয়ার কথা। আর ব্যাটা কবীর চৌধুরী বলে কি না আমাদের পরীক্ষা দিতে দেবে না? এটা কোনো কাজের কথা হলো? আমরা ঘোষণা করলাম, কলেজ মাঠে সভা ডেকে, এই আইয়ুবী-মোনায়েমী ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে আমাদের মরণপণ লড়াই চলবে। আমরা পরীক্ষা দিতে না পারলে আনন্দমোহনের কোনো শ্যালকই পরীক্ষা দিতে পারবে না। আমিও ঐ প্রতিবাদ সভায় একটি জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিয়েছিলাম। শেষে আমাদের হুমকিতে কাজ হলো। অবশ্য সৈয়দ নজরুল ইসলাম সাহেব মধ্যস্থতা করে কবীর স্যারকে রাজি করিয়েছিলেন আমাদের ওপর থেকে নন-কলেজিয়েটের খড়গ উঠিয়ে নিতে। তবে আমাদের নামকাওয়াস্তে একটি টেস্ট পরীক্ষা দিতে হয়েছিল। ঐ টেস্ট পরীক্ষাটি কেমন হয়েছিল, তা বোঝা যাবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমাদের ফল থেকে। আমরা ১১ জনই সমান নম্বর পেয়ে ঐ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলাম। অতঃপর আমরা ফাইন্যাল পরীক্ষায় অংশ নেবার সুযোগ পাই।

কিন্তু সুযোগ পেলে কী হবে? যে সুযোগ লাভের জন্য আমাদের এত আন্দোলন, সেই সুযোগকে কাজে লাগাতে গেলে যে ন্যূনতম পড়াশোনার দরকার—তা কি আমার ছিল? না, ছিল না। পড়াশোনা একেবারেই হয়নি। নকল করা যাবে বলে একটা ক্ষীণ প্রত্যাশা ছিল—সরকারী কলেজে পরিণত হওয়ার কারণে কবীর চৌধুরী স্যার সেই সুযোগ সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করে দিলেন। তিনি এক হাতে দিয়ে অন্য হাতে কেড়ে নিলেন। ফলে দিনদুপুরে চোখে অন্ধকার দেখাটা আমাদের কয়েকজনের জন্য বাধ্যতামূলক হয়ে দাঁড়াল।

শুরুতেই ছিল পদার্থবিদ্যা প্রথম পত্র। পরীক্ষার হলে গিয়ে দেখলাম প্রশ্ন একেবারেই কমন পড়েনি। টেনেটুনে পাস করা গেলেও ভালো ছাত্রের পূর্ব সুনাম রক্ষা করা একেবারেই অসম্ভব হবে। তখন আমি খুব দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললাম। অনেক হয়েছে, আর নয়। 'হেথা নয় হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোনোখানে।' ভাবলাম, পরীক্ষা না দিয়ে যদি রুম থেকে বেরিয়ে যাই, তা হলে ঘটনাটি জানাজানি হয়ে যাবে। সুতরাং বেরুলাম না। পরীক্ষার হলে বসেই শুরু করে দিলাম ঐ কর্ম। ঐ কর্ম মানে কবিতা লেখা। দীর্ঘ সময় ধরে কবিতাটি লিখলাম। কাটলাম। লিখলাম। এইভাবে লেখাটি শেষ করার পর নবজাতকের নাম দিলাম 'কালাক্রান্ত কাশবন'।

স্যারদের কারো কারো ধারণা ছিল, আমি পরীক্ষায় ভালো ফল করব। কিন্তু আমি যে ঐদিন 'অপদার্থবিদ্যা'র চর্চায় নিয়োজিত ছিলাম, তা তারা বুঝতেই পারেননি। আমার বাবা-মা, ভাই-বোন এবং আমার শুভার্থীরা সবাই একটা ভালো ফলের প্রত্যাশা নিয়ে বসেছিলেন। শুধু আমিই জানতাম, আমার ফল কী হতে যাচ্ছে।

সব ফলই একদিন না একদিন বেরোয়। আমার বিএসসি পরীক্ষার ফলও একদিন বেরুল। ফল শুনে অন্যদের দেখাদেখি আমিও আকাশ থেকে পড়লাম। অবস্থা জটিল আকার ধারণ করার আগেই আমি ঘোষণা দিলাম যে, আমার খাতাপত্রগুলো রিএকজমিন করানোর জন্য আমি কালকেই ঢাকা যাব। এই ফল আমার কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। নিশ্চয়ই কোথাও একটা ষড়যন্ত্র হয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার ঢাকা যাবার একটা ভিন্ন উদ্দেশ্য ছিল। আমি আগেই স্থির করে রেখেছিলাম, নেত্রকোনা থেকে শুধুমাত্র নেত্রকোনার কবিদের লেখা কবিতা নিয়ে একটি কবিতা-সংকলন প্রকাশ করব। আমি হব সেই সংকলনের সম্পাদক। নিজেকে সম্পাদক উন্নীত করার এই সহজ সুযোগটা হাতছাড়া করতে আমার মন চাইছিল না। নিজেকে সম্পাদক ভেবে আমার খুব আনন্দ লাগছিল। সংকলনটির নামও স্থির করে ফেলেছিলাম— 'সূর্যফসল'। আজাদ পত্রিকায় তখন স্টাফ আর্টিস্ট ছিলেন শেরপুরের কমিউনিস্ট নেতা শ্রীরবি নিয়োগীর পুত্র রণজিৎ নিয়োগী। আজাদে লেখার সূত্রে তাঁর সঙ্গে আমার খুব বন্ধুত্ব হয়ে যায়। রণজিৎ আমার সংকলনের জন্য একটি প্রচ্ছদ এঁকে দিতে রাজি হয়। কবি সিকানদার আবু জাফর রাজি হন আমার কবিতা সংকলনের জন্য একটি আশীর্বাণী লিখে দিতে। এদিকে নেত্রকোনার কবি-বন্ধুরাও এ রকমের একটি সংকলনের ব্যাপারে খুবই আগ্রহী এবং উন্মুখ ছিলেন। বিএসসি পরীক্ষার খাতা রিএকজামিন করার কথা বলে আমি ঢাকায় যাই ঐ দুটো জিনিস সংগ্রহ করতে— ১. শিল্পী রণজিৎ নিয়োগীর আঁকা প্রচ্ছদ ২. আমার পত্রিকার জন্য কবি সিকানদার আবু জাফরের দেয়া আশীর্বাণী। যথারীতি রণজিৎ নিয়োগী আমাদের সংকলনের জন্য একটি লাল সূর্যখচিত প্রচ্ছদ এঁকে দেয় এবং কবি সিকানদার আবু জাফর আমাকে 'জনতার সংগ্রাম চলবেই'—এই বিখ্যাত কবিতাটির কয়েকটি পঙক্তি কাগজে লিখে দিয়ে আমাদের মফস্বলীয় উদ্যোগের প্রতি আশীর্বাদ জানান। ঢাকা থেকেই আমি প্রচ্ছদের ব্লক করিয়ে নিয়ে আসি।

নেত্রকোনার স্টেশন রোডস্থ নূর প্রেস থেকে ঐ সংকলনটি মুদ্রিত হয়। ঐ প্রেসের মালিকের নাম ছিল আলহাজ্ব আবদুল লতিফ খান। তাঁর চেহারাটা আমার বেশ মনে আছে। তিনি ছিলেন একজন কৃষ্ণ-শ্মশ্রুধারী, টুপি পরা পরহেজগার মুসলমান। তিনি কাব্যামোদী ছিলেন। নেত্রকোনার অন্যসকল কবির চাইতে আমাকে বড়-কবি হিসেবে তিনি স্বীকার করতেন। ট্রেডেল মেশিনে ঐ পত্রিকাটি ছাপা হয়েছিল এবং স্ট্রেপলারে স্টিচ করে বাঁধাই করা হয়েছিল।

সূর্যফসল প্রকাশের পরপরই নেত্রকোনার গোয়েন্দা বিভাগের লোকজন নূর প্রেসের মালিককে খুব হেনস্থা করে। কারণ ছিল সংকলনের সম্পাদকীয় এবং সংকলনভুক্ত কিছুসংখ্যক কবিতা। সম্পাদকীয়তে কৃষক-শ্রমিক-মেহনতি জনতাকে মুক্তির জন্য শোষকশ্রেণীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ডাক দেয়া হয়েছিল। কবিতাগুলোও ছিল খুবই কড়া মেজাজের। ঐ সংকলন প্রকাশের ব্যাপারে নেত্রকোনার ডাক্তার আবদুল হামিদ খান সাহেব আমাকে বেশ সাহায্য করেছিলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার পিসতুতো ভাই সুকোমল বলকে ঐ সংকলনের সঙ্গে যুক্ত রাখার উপায় ছিল না, কেননা সে ছিল ময়মনসিংহ সদর মহকুমার অন্তর্গত গফরগাঁয়ের লোক। যদিও নেত্রকোনায় থেকেই সে স্কুলে পড়াশোনা করেছে এবং ওর কবিতা তখন উত্তর আকাশ পত্রিকায় নিয়মিত প্রকাশিত হতো। সূর্যফসল ছিল একেবারেই নেত্রকোনার কবিদের কবিতা নিয়ে। সুতরাং 'সূর্যফসল'-এর প্রকাশক হিসেবে আমি সুকোমলের নাম (২৫৬ আহসানউল্লাহ হল, ঢাকা) সংকলনে যুক্ত করি। এটা যে হিতে বিপরীত হতে পারে, তখন তা আমার ভাবনায় একেবারেই আসেনি। ঐ সংকলন প্রকাশের কিছুদিনের মধ্যে নেত্রকোনায় গোয়েন্দা বিভাগের লোকজন ঢাকায় এসে সুকোমলের হল পর্যন্ত ধাওয়া করে। তারা আমার সন্ধান লাভের চেষ্টা চালায়। সুকোমল তার নাম সংকলনের প্রকাশক হিসেবে যুক্ত হওয়াতে প্রথমে খুব খুশি হলেও, পরে সে খুবই ঘাবড়ে যায়। শেষ পর্যন্ত অবশ্য এর জন্য তাকে কোনো শাস্তি ভোগ করতে হয়নি। সে জানায় যে, শত্রুতাবশতই ওরকম একটি রাষ্ট্রদ্রোহী সংকলনে তার নাম যুক্ত করা হয়ে থাকবে—সে নিজে ঐ সংকলনের বিন্দুবিসর্গও জানে না এবং ঐ কর্মের সঙ্গে সে কোনোভাবেই যুক্ত নয়। সুকোমল কোনোক্রমে বেঁচে যায়। তবে সংকলনের মুদ্রক হিসেবে ঐ প্রেসের মালিককে বেশ ভোগান্তি পোহাতে হয়েছিল এবং গোয়েন্দা বিভাগের লোকদের কিছু টাকা ঘুষ দিয়ে শেষে তাঁকে নিষ্কৃতি পেতে হয়।

গোয়েন্দা বিভাগের কুনজরে পড়ার কারণে ঐ সংকলনটি সবাই লুকিয়ে ফেলে। প্রেসে অবশিষ্ট কপি যা ছিল সবই গোয়েন্দা বিভাগের লোকজন এসে তুলে নিয়ে যায়। ঐ সংকলনটিই নেত্রকোনা থেকে প্রকাশিত নেত্রকোনার কবিদের লেখা কবিতার প্রথম এবং শেষ সংকলন।

সূর্যফসল নিয়ে আমার নামে মামলা রুজু করা হয় এবং আমাকে এ্যারেস্ট করার জন্য গ্রেফতারি পরোয়ানাও জারি করা হয়। জীবন চৌধুরী তখন নেত্রকোনায়। মফস্বল সাংবাদিক হিসেবে সে ছিল অবজারভার ও পূর্বদেশ পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত। সাংবাদিকতার কারণে নেত্রকোনার আমলা মহলে জীবনের ভালো প্রভাব ছিল। গোয়েন্দা পুলিশ আমাকে ধরিয়ে দেবার জন্য জীবনকে ৫০ টাকা এ্যাডভান্স করে। কথা ছিল, আমাকে ধরিয়ে দিতে পারলে বাকি ৪৫০ (চারশত পঞ্চাশ) টাকা তাকে দেওয়া হবে। জীবন পুলিশকে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দেয়। পঞ্চাশ টাকা গ্রহণ না করলেও সে-ও পুলিশের সন্দেহের শিকার হতে পারে, ভেবেই ঐ টাকাটা সে গ্রহণ করেছিল।

ঐ মামলা থেকে আমাকে মুক্ত করার জন্য খালেকদাদ চৌধুরীর ছোট ভাই তখনকার প্রভাবশালী মুসলিম লীগ নেতা মরহুম খুরশেদ চৌধুরী এবং মৌলানা ফজলুর রহমান সাহেব আমার পক্ষ সমর্থন করে তৎকালীন পাঞ্জাবী মহকুমা প্রশাসককে বুঝিয়েছিলেন যে, খারাপ কবিতা লিখলেও লোক হিসেবে আমি খারাপ নই। তাতে খুবই কাজ হয়েছিল। মামলাটি প্রত্যাহার করা হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনেক খোঁজাখুঁজির পর 'সূর্যফসল' সংকলনটি পাওয়া গেছে। সুকোমল বলকে ঐ সংকলনের প্রকাশক নির্বাচন করে আমি যে সঠিক কাজটিই করেছিলাম, আটাশ বছর পর তার প্রমাণ পাওয়া গেল। একাত্তরের ধকল যাদের জীবনের ওপর দিয়ে গেছে তাদের সঞ্চয়ে সূর্যফসলের মতো অতি সাধারণ একটি কবিতা সংকলন রয়ে যেতে পারে, ভাবা যায় না। প্রকাশক হিসেবে সুকোমলের নাম তার অজ্ঞাতসারেই আমি ছেপে দিয়েছিলাম। তখন সে শুধুই নামের প্রকাশক ছিল, কামের প্রকাশক ছিল না। আটাশ বছর পর সে প্রমাণ করল, শুধু নামের নয়, কামের প্রকাশকও সে। সূর্যফসল সংকলনটি হাতে না পাওয়া গেলে ঐ সংকলন সম্পর্কিত কিছু কিছু তথ্য চিরদিনের মতো আমাদের অজানাই থেকে যেত। তাতে বাংলা সাহিত্যে খুব একটা ক্ষতি না হলেও ঐ সংকলনের সম্পাদকের খুবই ক্ষতি হতো। সংকলনটি পাওয়াতে সংকলনভুক্ত কবিদের নামের তালিকাটি যথাযথভাবে দেয়া সম্ভব হলো। আল আজাদের বাড়ি ঢাকায়। এ কারণে তাঁর কবিতা ঐ সংকলনে নেয়া হয়নি। সূর্যফসলের কবিক্রম ছিল এ রকম :

তাহেরউদ্দিন খান
দীলিপ দত্ত
শান্তিময় বিশ্বাস
খান মোহম্মদ আবদুল হাকিম
হাবিবুর রহমান আকন্দ
প্রণব চৌধুরী
জীবন চৌধুরী
নূরুল হুদা
নির্মলেন্দু গুণ
খালেদ-বিন-আস্কার
আবদুল হান্নান ঠাকুর
মৃণালকান্তি গুণ
নূরুল হক
মতীন্দ্রচন্দ্র সরকার
এবং রমেণ দত্ত।

সংকলনে আমি আমার তিনটি কবিতা প্রকাশ করি। শান্তিময় বিশ্বাস ও খালেদ বিন আস্কারের ছিল দুটো করে কবিতা। ছড়াকার দীলিপ দত্ত ও প্রণব চৌধুরীর ছিল দুটো করে ছড়া। আর সবারই ছিল একটি করে কবিতা। নিজের তিনটি কবিতা সংকলনে গ্রহণ করে আমি প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছিলাম যে, নেত্রকোনার কবিদের মধ্যে আমিই প্রধান কবি। সংকলনটি পাওয়ার ফলে আমার রচিত-সংগৃহীত কবিতার সংখ্যা অতঃপর আরো তিনটিতে বৃদ্ধি পেল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দৃশ্যগত সৌন্দর্যের জন্য একটি পুরো কবিতা এবং অন্য দুটো কবিতার অংশবিশেষ এখানে মুদ্রিত করছি।

মাছিকে সন্তানের মতো

কে
কাকে
ভরসা
দেবে বলো
——নিঃশংসয়
তৃষ্ণার সম্মুখে
মৃত্যুমুখী হলেও
সন্তানের মতো কেউ
রক্তক্ষরা জিহ্বার নিচে
একমুঠো জলও দিলো না।
তবুওতো কোনো এক নারীর
আদরে আমার বিকৃত মুখেই
একদল গন্ধলোভী মাছি ঢুকে গেল
আর ডুবুরীর মতো তারা খুঁজে ফিরলো
——আমার হৃৎপিণ্ড; কলজে ও হৃদয়; এবং
রক্তহীন আমি যখন ক্লান্ত হলাম
যকৃতের বমনে বমনে, তখন
প্রগতির নেতা হয়েও তুমিও
আসোনি। তাই অপ্রত্যাশিত
মাছিরাই আমার সন্তানের
অধিকার পাবে; কেননা
তোমাদের কেউ নয়
আমার রক্তে শুধু
মাছিটিই ঋণী,
পুঁজ-নির্ঝর
জীবনের
আশ্রয়ও
জানি
সে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিপ্লব

হে মহামানব আর একবার
মহাবিপ্লব আনো
আর একবার হাতুরী-কাস্তে
মরণ আঘাত হানো।

....

কংকাল হাতে আগুন ছড়াও
একবার শুধু আর
পুড়ে দাও সব মুনাফাখোরের
বঞ্চনা বারবার।

আর একবার নিরক্ত দেহে
রণহুংকার ছাড়ো
তাহাদের গড়া শোষণের কলে
তাহাদেরই ছুঁড়ে মারো।

আর একবার বিপ্লবী হয়ে
প্রাসাদের দিকে যাও
'ঐক্য-শিক্ষা-শান্তি-প্রগতি'র
কঠিন দীক্ষা নাও।

....

তারপর সব শ্রমিকের মাঝে
একবার যেন আসি
সর্বহারার মুক্তির দিনে
একবার যেন হাসি।

সম্রাটকে

তুমিই
নাটকের অদৃশ্য প্রম্পটার।
আমি এবং আমরা যদিও
সর্বদাই নিরাপদ দূরত্বে থেকেছি
তবুও

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তোমার নায়কেরা
আমার কন্যার কোমল যৌবনকে
ঊনিশবার ধর্ষণ করেছে; আর
পটভূমি থেকে আমরা
        বীভৎস
                উলঙ্গ
খয়েরী দশটি দাঁতকে তখন হাসতে দেখেছি।

এখানে ঊনিশবার বলতে ১৯৪৭ থেকে ১৯৬৬ পর্যন্ত ঊনিশ বছর সময়কালকে বোঝানো হয়েছে; এবং 'দশটি খয়েরী দাঁত' বলতে বোঝানো হয়েছে সামরিক একনায়ক ফিল্ড মার্শাল মুহম্মদ আইয়ুব খানের স্বৈরাচারী শাসনের এক দশককে।

কবি সিকানদার আবু জাফর সাত-পঙক্তির যে কবিতাটি সূর্যফসল-এর জন্য আশীর্বাণী হিসেবে দিয়েছিলেন, তা ছিল এ রকম :

'এই কালো রাত্রির সুকঠিন অর্গল
কোনোদিন আমরা যে ভাঙবেই
মুক্ত প্রাণের সাড়া জানবেই
আমাদের শপথের প্রদীপ্ত স্বাক্ষরে
নূতন সূর্য শিখা জ্বলবেই
সংগ্রাম চলবেই
আমাদের সংগ্রাম চলবেই।...'

সিকানদার আবু জাফর
৯।৮।৭৩

সূর্যফসলের প্রিন্টার্স লাইন ছিল এ রকম : সুকোমল বল কর্তৃক ২৫৬, আহসানউল্লাহ হল, ঢাকা-২ থেকে প্রকাশিত ও আলহাজ্ব আবদুল লতিফ খান কর্তৃক নূর প্রেস, নেত্রকোনা থেকে মুদ্রিত। সম্পাদক : নির্মলেন্দু গুণ। প্রচ্ছদ : রণজিৎ নিয়োগী। প্রচ্ছদ মুদ্রণে : পাক আর্ট প্রেস, নেত্রকোনা। মূল্য : তিন সিঁকি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ময়মনসিংহ শহরকেন্দ্রিক সাহিত্য-আন্দোলনের সঙ্গেও আমার একটা সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। যদিও তাকে ঠিক আন্দোলন বলা যায় না। যা বলা যায় তা হচ্ছে এই যে, আমি ময়মনসিংহ শহর থেকে প্রকাশিত পত্রিকায় এবং একুশে ফেব্রুয়ারির সংকলনে কবিতা ছাপাতাম। ময়মনসিংহ শহর থেকে তখন অন্তত দু'টি সাপ্তাহিক কাগজ বেরুত। একটির নাম সাপ্তাহিক তকবীর। এটি খুব পুরনো পত্রিকা। ১৯৪৮ সাল থেকে প্রকাশিত হয়ে আসছে। এটি আকলিমা রহমান কর্তৃক রুবী প্রেস থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হতো। আরেকটি সাপ্তাহিক পত্রিকার নাম ছিল চাষী। কিতাব আলী তালুকদার সাহেব ছিলেন ঐ পত্রিকার সম্পাদক। বেরুত রামবাবু রোড থেকে। দুটো পত্রিকার মালিকই ছিলেন মুসলিম লীগের লোক এবং জনাব মোনায়েম খান সাহেবের নিকটজন। মোনায়েম খান সাহেব পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর নিযুক্ত হওয়ার আগে ময়মনসিংহ বারে ওকালতি করতেন। আমার জেঠামশাই ছিলেন ময়মনসিংহ কোর্টের পেশকার। তাঁদের দুজনের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। উকিল থাকাকালে মোনায়েম খান সাহেব আমাদের বাসায় আসতেন। কিন্তু গভর্নর হওয়ার পর আর আসেননি।

মুসলিম লীগারের কাগজ, এ কথা জানার পরও ঐ দুটো কাগজেই আমি কবিতা লিখতাম। তখন আমার আত্মপ্রকাশের সময়— পত্রিকা বাছ-বিচার করার সময় তখনও আসেনি। কী লিখতাম, মনে নেই। আবৃত্তিকার তারিক সালাউদ্দিন মাহমুদ সম্পাদিত আনন্দমোহন কলেজের বার্ষিকীতে আমার একগুচ্ছ কবিতা ছাপা হয়। ছাত্র লীগ ও ছাত্র ইউনিয়নের একুশের সংকলনেও আমি কবিতা লিখেছি। তখন ময়মনসিংহে বিখ্যাত লেখক বলতে আশীষ কুমার লোহ, গল্পকার নীলু দাস, গোলাম সামদানী কোরায়শী, অধ্যাপক যতীন সরকার, হেলেনা খান, রাহাত খান—এঁদের কথাই মনে আছে। রাহাত খান কিছুদিন ময়মনসিংহে নাসিরাবাদ কলেজে অধ্যাপনা করার পর ঢাকায় জগন্নাথ কলেজে চাকরি পেয়ে চলে যান।

সুনন্দা দেব নামে এক সুন্দরী মহিলা কবি ছিলেন আমাদের কলেজে। তিনি বিএ ক্লাসে পড়তেন এবং ছাত্রলীগ করতেন। তিনি ছিলেন আমার দূর-সম্পর্কের আত্মীয় শ্রী সুশীতল দেবের ছোট বোন। সুশীতল বাবুর চেহারা ছিল অভিনেতা বসন্ত চৌধুরীর মতো। কিন্তু সুশীতল বাবু অভিনয় করতেন না। কালেক্টরিতে চাকরি করতেন। তার ছোট বোন সুনন্দা। মেধাবী এবং সুন্দরী। আত্মীয়তার সূত্রে আমি তাঁর ঘনিষ্ঠতা লাভের চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু কাজ হয়নি। আমি মাঝে মাঝে তাদের বাসায় যেতাম, কিন্তু কবি হিসেবে সুনন্দা আমাকে পাত্তা দিতেন না। মনে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয় উনি খুব সচেতনভাবেই আমাকে এড়িয়ে চলতেন। আমার সঙ্গে অপ্রয়োজনীয় কথা বলে সময় নষ্ট করবার মতো সময় যে তার নেই, নানাভাবে তিনি তা আমাকে বুঝিয়ে দিতেন। তাই সুনন্দার পেছনে আমি আর বেশি সময় ব্যয় করিনি। পরে সুনন্দা তার সহপাঠী, আমাদেরই হোস্টেলমেট বন্ধু বিমল দে-র সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। বিমল কবিতা-প্রবন্ধ ইত্যাদি লিখত। সে বাংলা বিভাগের ভালো ছাত্রদের একজন ছিল।

'অসমাপ্ত কবিতা'য় আমি সুনন্দার নামটি ব্যবহার করি।

'ভাইসব, চেয়ে দেখুন, বাংলার ভাগ্যাকাশে
আজ দুর্যোগের ঘনঘটা/ সুনন্দার চোখে জল/
একজন প্রেমিকার খোঁজে আবুল হাসান
কী নিঃসঙ্গ ব্যথায় কাঁপে রাত্রে, ভাঙ্গে সূর্য... ।'

[দ্রষ্টব্য : অসমাপ্ত কবিতা : প্রেমাংশুর রক্ত চাই।]

শোকমূহ্যমান মাতৃভূমির প্রতীক হিসেবেই ঐ কবিতায় আমি সুনন্দা দেবীর নাম ব্যবহার করেছিলাম।

AMARBOI.COM

মেট্রিক পরীক্ষার সময় আমি আমার বাবাকে বাধ্য করেছিলাম আমাকে একটি ঘড়ি কিনে দিতে। ঘড়ির কাজ হচ্ছে এর বাহককে সময় সম্পর্কে সঠিক জ্ঞানদান করা। মেট্রিক এবং আইএসসি পরীক্ষা পর্যন্ত ঐ সুইসমেড ক্যাভেলরি ঘড়িটি সে দায়িত্ব ভালোভাবেই পালন করেছিল চলে বলা চলে। কিন্তু তারপর কখন কীভাবে যে time went out of my joint,— তা আমি বুঝতেই পারিনি। এক সময় লক্ষ করি যে, ঐ ঘড়িটি আমার বাম হাতের কব্জির শোভা বর্ধন করা ছাড়া আর কোনো কাজে আসছে না। আমার সময় কাটতে থাকে একটা প্রচণ্ড ঘোরের মধ্যে। এক অন্তহীন অতৃপ্তির বোধ আমাকে তাড়া করে ফিরতে থাকে। সময়ের চাপ থেকে আমার পেষিত আত্মাকে অব্যাহতি দেয়ার জন্য আমি এমন আনন্দ-সন্ধানী হয়ে উঠি যে, সময় সংক্রান্ত জ্ঞান সেখানে লুপ্ত হয়। 'সুস্থ-স্বাভাবিক জীবনের মুখে থুথু' দেয়ার যে-কথা আমি আমার কবিতায় বলেছি, তার সঙ্গে আমার বাস্তব জীবনের কোন ফাঁক ছিল না। নিজের অজান্তেই সময়ের সঙ্গে আমি এক অঘোষিত যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ি। একনাগাড়ে কয়েক দিন, কয়েক রাত শুধু জুয়া খেলে কাটিয়ে দিই। কখনও যদি ঘড়ির দিকে চোখ যায়—আমার হাসি পায়। আমি বুঝতে পারতাম না, কী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলতে চায় এই ঘড়ি। বুঝতে পারতাম না যে, সময়ের সঙ্গে লিপ্ত এই যুদ্ধে শেষ পর্যন্ত কে কার পিঠে চড়বে? আমার পিঠে সময়, না সময়ের পিঠে আমি? শুধু অনুভব করতে পারতাম যে, সময় এবং আমার মধ্যে একটা যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা চলছে। রামায়ণের বীর হনুমানের মতো সময়কে বগল দাবা করে গন্ধমাদন পর্বত মাথায় তুলে নিয়ে আমি অনন্ত আকাশপথে উড়ে চলেছি। কখনও-বা সময়ের নিষ্ঠুর ঘূর্ণিপাকের মধ্যে এক তুচ্ছাতিতুচ্ছ তৃণখণ্ডের মতো মনে হতো নিজেকে। আমি, আমারই অজ্ঞাতে দ্রুত ধাবিত হচ্ছিলাম আমার জন্য নির্ধারিত রয়েছে যে নিয়তি, তার দিকে। আমি জানতাম না, আমি কোথায় যাচ্ছি— কোথায় আমার গন্তব্য! তবে যেখানেই যাই না কেন— বুঝতাম, শেষ পর্যন্ত কবিতাই হবে আমার আরাধ্য; আমার গন্তব্য। জীবনের ক্ষতিকে পুষিয়ে নেবার জন্য কবিতার চেয়ে উপযোগী মাধ্যম আর কী হতে পারে?

আমি একেবারে সঠিকভাবে ঘটনা-পরম্পরার বর্ণনা দিতে পারছি বলে মনে হয় না। কোনো কোনো ক্ষেত্রে হয়তো পরের ঘটনা আগে এবং আগের ঘটনা পরে চলে যাচ্ছে। তাতে অবশ্য খুব একটা ক্ষতি নেই। দুরন্ত-অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করা যৌবন নামক একটা মাতাল সময়ের কিছু খণ্ডচিত্রকে আমি আত্মজৈবনিক ভাষার আদলে বন্দি করার চেষ্টা করছি মাত্র। যেখানে আমি শুধু আমি নই, আমার মধ্যে আমার বন্ধুরাই জিনের মতো আছড় করে রয়েছে। সময়কে গবেষক-পণ্ডিতের মতো অনুসরণ করাটা শুধু যে আমার চরিত্রের পরিপন্থী তাই নয়, রসের সঙ্গেও এর একটা বিরোধ রয়েছে।

আইএসসি পরীক্ষা দেবার পর আমি কয়েক মাস বারহাট্টা স্কুলে মাস্টারি করেছিলাম। আমার বেতন ছিল মাসে ১৩০ টাকা। দ্রুত কিছু একটা আবিষ্কার করার নেশায় আমাদের স্কুলের ল্যাবরেটরিটিকে পাগলের মতো আমি রাতদিন ব্যবহার করতাম। আবার ল্যাবরেটরি এ্যাসিট্যান্ট ছিল আমারই একদা-সহপাঠী বেচু। স্কুলের ছাত্ররা শ্রদ্ধা করে বেচুকে বেচুদা বলে ডাকত। তাতে সঙ্গতকারণেই বেচু খুব রাগ করত। বলত, আমারে তোমরা বেচুদা বলবা না, বলবা বেচু ভাই। ঐ বেচু ছিল আমার গবেষণা-সহযোগী। আমাদের গবেষণার একপর্যায়ে একদিন বিকেলের দিকে ঐ ল্যাবরেটরিতে একটি ক্ষুদ্র আকারের বিস্ফোরণ ও অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয়। আমি ও বেচু অল্পের জন্য রক্ষা পাই। ঘটনাটি জানাজানি হয়ে গেলে আমি তাৎক্ষণিকভাবে আমার temporary appointment থেকে অব্যাহতি লাভ করি।

স্কুলের মাস্টার হওয়ার বদৌলতে বারহাট্টা স্কুলের সবাই আমার ছাত্রে পরিণত হয়েছিল। আমার একসময়ের সহপাঠীদেরও আমি পড়াবার সুযোগ পেয়েছিলাম।

আমার যাবতীয় অপকর্মের সঙ্গী সুভাষ চৌধুরী ছিল আমার সে রকমই একজন ছাত্র এবং একইসঙ্গে বন্ধু। সুভাষ একবার ঢাকায় যায়। ঢাকা যাচ্ছে শুনে আমি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুভাষের হাতে কিছু সূর্যফসল দিয়ে দিই নলেজ হোম-এ দেবার জন্য এবং ঢাকা থেকে প্রকাশিত কিছু লিটল ম্যাগাজিন তাকে নিয়ে আসতে বলি। ঢাকার নিউমার্কেটে নলেজ হোম ছিল তখন লিটল ম্যাগাজিনের সংগ্রহশালা। এই তথ্য আমি তাকে জানিয়ে দিই।

সুভাষ আমাকে ঢাকার একটি চমৎকার লিটল ম্যাগাজিন এনে দেয়। ঐ পত্রিকাটির নাম 'কণ্ঠস্বর' [দ্বিতীয় বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা, জানুয়ারি ১৯৬৭]। হলুদ মলাটের ঐ ক্রাউন সাইজ পত্রিকাটি হাতে পেয়ে আমি খুবই উত্তেজিত বোধ করি। 'সমকাল' পত্রিকাটি আমি দেখেছি। ঐ পত্রিকায় প্রকাশিত লেখার মান এবং প্রকাশনা সৌষ্ঠব ছিল খুবই উঁচু দরের। কিন্তু সেটি ছিল দেশের প্রতিষ্ঠিত নামী-দামী লেখকদের কাগজ। কণ্ঠস্বর দেখে এবং পড়ে আমার মনে হয়, এটিই হচ্ছে ঢাকার উঠতি নবীন লেখকদের পত্রিকা। মোটা আর্টবোর্ডের পিচ্ছিল দিকটাকে ভেতরের দিকে দিয়ে, এর কর্কশ দিকটাকে দৃশ্যমানরূপে প্রচ্ছদে ব্যবহার করা হয়েছে। আর্টবোর্ডের কর্কশ সারফেসে শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরীর চমৎকার বর্ণবিন্যাসে সাজানো 'কণ্ঠস্বর' শব্দটিকে কী নয়নমনোহরই না মনে হয় আমার। এখনও শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরীর হাতের 'কণ্ঠস্বর' লেখাটা আমার ভালো লাগে। এর লেখকরা সবাই ছিল তরুণ এবং শক্তিমান। প্রচ্ছদের বাম দিকের সূচীপত্রে লেখক ও লেখার নাম ছাপা হয়েছে। সূচীপত্র থেকে সম্পাদক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদের নামটিকে পৃথক করার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে একটি চিকন লাইন। আর পত্রিকার নাম থেকে সূচীপত্রকে পৃথক করার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে একটি মোটা লাইন। লেখকসূচীটি ছিল এ রকম :

প্রবন্ধ :

বাংলা সমালোচনা প্রসঙ্গে : আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ

কবিতা :

'স্বগত মৃত্যুর পটভূমি' : রফিক আজাদ
বনময়ূরী : আলতাফ হোসেন
অনিবার ভয়ে : আসাদ চৌধুরী
পরাভব : আবুল হাসান

গল্প :

মাংস : আবদুল মান্নান সৈয়দ
স্বোপার্জিত নিষাদ : ফারুক আলমগীর

আলোচনা :

প্রতিষ্ঠার প্রতিভূ : কাজী সাহিদ হাসান
চলচ্চিত্রের সীমাবদ্ধতা : জ. জ. (আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভেতরে বাংলা একাডেমী, চান্দা ব্যাটারী ও ইস্টার্ন ফেডারেল ইউনিয়ন ইনসিওরেন্স কোং লিঃ-এর পূর্ণ পৃষ্ঠা এবং সাজ জুয়েলার্স-এর একটি সিকি-পাতা বিজ্ঞাপন ছিল। আর পূর্ব পাকিস্তানের তরুণতম লেখকদের কয়েকটি প্রকাশিতব্য বইয়ের বিজ্ঞাপনও ছিল তাতে। লেখকরা ছিলেন আবদুল মান্নান সৈয়দ, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, রফিক আজাদ, শহীদুর রহমান এবং প্রশান্ত ঘোষাল। সম্পাদকের পক্ষ থেকে *'কেবল প্রতিশ্রুতিশীল তরুণদের'* কাছ থেকেই লেখা আহ্বান করা হয়। বলা হয় যে, *'তাদের মধ্যে কোন নতুন দৃষ্টি বা বিন্দুমাত্র প্রতিশ্রুতি লক্ষ্যযোগ্য হলেই তাঁদের সে সব রচনাকে প্রকাশিতব্য মনে করা হবে।'* আমি ঐ পত্রিকাটি উল্টে-পাল্টে দেখে এবং বারবার পড়ে উত্তেজিত বোধ করি।

আবদুল মান্নান সৈয়দের 'মাংস' গল্পটি পড়ে আমি খুবই মুগ্ধ হয়েছিলাম। এর গল্প, কবিতা বা প্রবন্ধ-আলোচনা— সবই ছিল একটু অন্যরকম। সম্পাদকের নামটিও আমার বেশ ভালো লাগে। তিনি যে আধুনিক ও রুচিশীল মনের মানুষ তা আমার মনে হয়। এ রকম একটি পত্রিকায় লেখা ছাপানোর গোপন বাসনা আমার মনে জন্মে। পত্রিকার প্রকাশিকা ছিলেন খালেদা হাবীব। ধানমণ্ডি আবাসিক এলাকা থেকে পত্রিকাটি প্রকাশিত হতো। আমি জানতাম ধানমণ্ডি হচ্ছে ঢাকার বনেদী-ধনীদের আবাসস্থল। পত্রিকাটি যেহেতু ধানমণ্ডি থেকে প্রকাশিত হয়, সেহেতু ঐ পত্রিকার সঙ্গে ঢাকার ধনী-তরুণরা জড়িত বলেও আমার ভ্রম হয়েছিল। ঐ পত্রিকাসূত্রে আমি একজন না-দেখা সুন্দরী মহিলার (খালেদা হাবীব) অস্তিত্ব কল্পনা করে এক ধরনের পুলক অনুভব করেছিলাম।

পরে কণ্ঠস্বরের প্রথম সংখ্যাটিও আমি সংগ্রহ করি। কণ্ঠস্বর কাদের পত্রিকা এবং এই পত্রিকার দর্শন কী? এই প্রশ্নের উত্তর ছিল ব্যাক-কভারে মুদ্রিত একটি ছোট্ট বিজ্ঞাপনে।

যারা সাহিত্যের সনিষ্ঠ প্রেমিক, যারা শিল্পে উন্মোচিত, সৎ, অকপট, রক্তাক্ত, শব্দতাড়িত, যন্ত্রণাকাতর; যারা উন্মাদ, অপচয়ী, বিকারগ্রস্ত, অসন্তুষ্ট, বিবরবাসী; যারা তরুণ, প্রতিভাবান, অপ্রতিষ্ঠিত, শ্রদ্ধাশীল, অনুপ্রাণিত; যারা পঙ্গু, অহংকারী, যৌনতাস্পৃষ্ট

কণ্ঠস্বর

তাদেরই পত্রিকা।

প্রবীণ মোড়ল, নবীন অধ্যাপক, পেশাদার লেখক, মূর্খ সাংবাদিক, 'পবিত্র' সাহিত্যিক, এবং গৃহপালিত সমালোচক এই পত্রিকায় অনাহুত।

সুনির্বাচিত ৪৬টি শব্দবিশিষ্ট কণ্ঠস্বরের এই ইশতেহারটি পাঠ করার পর আমি মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় এই পত্রিকার মধ্যে নিজের আত্মাকে অবলোকন করি। আমার কেবলই মনে হতে থাকে যে, এটি আমার পত্রিকা। আমারই কণ্ঠস্বর।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বারহাট্টা থানায় একজন নতুন দারোগা আসেন। তাঁর নাম মনে নেই, তবে সবাই উপাধি অনুসারে তাঁকে চৌধুরী দারোগা বলে জানত। আমি তাঁকে চৌধুরী সাহেব বলে ডাকতাম। তাঁর সঙ্গে আমাদের কয়েকজনের খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। তিনি সাহিত্যানুরাগী এবং রাজনীতিসচেতন ব্যক্তি ছিলেন। আমরা তাঁর সঙ্গে আড্ডা দিতে পারতাম। পাকিস্তানের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে তাঁর সঙ্গে আমাদের উগ্র চিন্তার বিনিময় হতো। আমাদের কোনো কোনো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে তিনি আমন্ত্রিত হয়ে আসতেন এবং বক্তব্য রাখতেন। থানার দারোগার সঙ্গে আমাদের দহরম মহরম থাকায় সবাই আমাদের সমীহ করত। এটা আমি খুব এনজয় করতাম।

একদিন খুব রাত করে বাড়ি ফিরে ঘুমিয়েছি। সকালে ঘুম ভাঙলো বাবার ডাকে। তিনি আমাকে ঘুম থেকে জাগিয়েই একটি সংবাদ পরিবেশন করলেন। ভোর-রাতের দিকে বারহাট্টা স্টেশনে ডাকাতি করতে গিয়ে এক ডাকাত ধরা পড়েছে। ধরা পড়ার পর ঐ ডাকাত নাকি তার অন্য সঙ্গীদের নাম বলেছে। সেখানে আমার নামও রয়েছে। বাতাসের চেয়ে দ্রুত ঐ কথা সকাল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এলাকায় ছড়িয়ে পড়েছে। লোকমুখে ঐ সংবাদ শ্রবণ করার পরই আমার বাবা এসে আমাকে ঘুম থেকে জাগিয়েছেন।

একটা সাংঘাতিক খবর শুনেও আমি খুবই নির্লিপ্ত ভাব দেখাই। কিন্তু আমি নির্লিপ্ত ভাব দেখালে কী হবে, বাবার আচরণ থেকে মনে হয় তিনি নিজেই আমাকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখছেন। অন্য যাদের কথা শোনা যাচ্ছিল, তাদের সঙ্গে আমার নিবিড় সম্পর্কের কথা সবাই জানত। বাবাও জানতেন, সুতরাং তার সন্দেহ হওয়াটা অস্বাভাবিক কিছু নয়।

আমি ধীরেসুস্থে শয্যা ত্যাগ করে, মাকে খাবার দিতে বলি। মার চোখে জল। তিনি তখন কপাল চাপড়ে তাঁর ভাগ্যকে দুষছেন, আর আমার জন্য ভাত বাড়তে বাড়তে স্বগতোক্তির মতো করে বলে চলেছেন, 'সৎ সঙ্গে স্বর্গবাস অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ। তোরে কত কইছি এদের সঙ্গ ছাড়, আমার কথা শুনস নাই। অহন ঠ্যালা সামলা। আমি ডাকাতের মা হইলাম, এই আমার কপালে ছিল? তুই যে বংশের মুখে কালি দিবি, তা আমি জানতাম।'

আমার মা শ্রোতাহীন দীর্ঘ বক্তৃতা চালিয়ে যেতে থাকলেন।

আমার ছোট ভাইবোনরা আমাকে নিরাপদ দূরত্বে থেকে ভয়ে ভয়ে লক্ষ্য করছিল। পাশের বাড়ি থেকেও নানা ছুতোয় লোকজন আমাদের বাড়িতে আসছিল আমাকে এক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নজর দেখতে। আসলে ডাকাত দেখার একটা আনন্দ আছে। পরিস্থিতি দেখে নিজেকে আমার খুবই একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি বলে মনে হতে লাগল। আমি যখন ভালো ফল করে পাস করেছি, তখনও আমাকে ঘিরে মানুষের এমন কৌতূহল ছিল না। কিন্তু সদ্য-সংঘটিত ডাকাতিটির সঙ্গে আমার সম্পর্ক রয়েছে, এ-কথা রাষ্ট্র হওয়ার পর আমি যেন মুহূর্তের মধ্যে সকলের কৌতূহলের বস্তুতে পরিণত হলাম।

আমি যত বলি— আমি এর সঙ্গে সম্পর্কিত নই, আমার কথা কেউ বিশ্বাস করে না। সবারই এক কথা— যাও, তুমি যে ডাকাতির সঙ্গে জড়িত নও তা পুলিশের কাছে গিয়ে প্রমাণ করো, আমাদের বুঝিয়ে লাভ কি? নজরুল বলেছিলেন 'আমি জাহান্নামের আগুনে বসিয়া হাসি পুষ্পের হাসি'। আমারও মতিগতি ছিল অনেকটা সে রকমের। খুব ছোটবেলা থেকেই আমি কোনো অবস্থাতেই বিচলিত বোধ করতাম না। ঐ পরিস্থিতিতেও আমার বেশ মজাই লাগছিল।

ইতোমধ্যে আমার ছোট ভাই নীহারেন্দু রাস্তা থেকে দৌড়ে এসে বলল, কীভাবে ডাকাত ধরা পড়েছে— ঐ গল্পটা সে এইমাত্র লোকমুখে শুনে এসেছে। গল্পটা এ রকম :

ডাকাতের বাড়ি কেন্দুয়ায়। বারহাট্টা থেকে কেউ যেন তাকে ভাড়া করে নিয়ে এসেছে। সকালের ট্রেনে বারহাট্টার ব্যবসায়ীরা বাবুরহাট, ঢাকা ও ময়মনসিংহ যায় মাল আনতে। তখন তাদের সঙ্গে অনেক টাকা থাকে। ব্যবসায়ীদের টাকা ছিনিয়ে নেয়াটাই ছিল ঐ ডাকাতির লক্ষ্য। ডাকাতেরা সংখ্যায় কত ছিল তা জানা যায় না। ডাকাতদের একজন কাটা বন্দুক থেকে একটি গুলি ছোড়ে, একজন বারহাট্টার বিখ্যাত ব্যবসায়ী সুধীর পালের ওপর ঝাপিয়ে পড়ে। সাবধানী সুধীর পালের কোমরে টাকার খতিটি খুব শক্ত করে বাঁধা ছিল। ডাকাত যখন সেটি ছিনিয়ে নেবার জন্য টানাটানি শুরু করে তখন তাতে একটি শক্ত আন্ধা গেড়ো লেগে যায়। ফলে ওটা ছিনিয়ে নিতে বেশ একটু দেরি হয়। ইত্যবসরে সুধীর পালের সহায়তায় অন্য ব্যবসায়ীরা এগিয়ে আসে। তখন ডাকাত বেচারা রণে ভঙ্গ দিয়ে পালাতে চেষ্টা করে। সে রেললাইন পেরিয়ে দক্ষিণ দিকে দৌড়াতে থাকে। ওদিকে গুহিয়ালা গ্রামের একটি বড় জঙ্গল ছিল। ডাকাতের লক্ষ্য ঐ জঙ্গলে প্রবেশ করে গা ঢাকা দেওয়া। ট্রেনের যাত্রীরা এককাট্টা হয়ে তখন রণে ভঙ্গ দেওয়া পলায়নপর ডাকাতের পিছু নেয়। তাদের নেতৃত্ব দেয় ফুটকা। ফুটকা ছিল স্টেশনের পাহারাদার। বয়সে কিশোর হলেও সে ছিল খুবই দুঃসাহসী। ফুটকার ছোড়া বল্লমের আঘাত থেকে বাঁচবার জন্য ডাকাত সর্পিল গতিতে জঙ্গলের উদ্দেশ্যে দৌড়াতে থাকে। ঘুটঘুটে অন্ধকারের মধ্যেও লোকজন তার গতিপথ কী ভাবে হদিস করতে পারছে, তা সে কিছুতেই ভেবে পায় না। সে প্রাণপণ দৌড়াতে দৌড়াতে যখন গুহিয়ালার জঙ্গলে প্রবেশ করে আপাতত বাঁচা গেছে বলে ভাবে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তখনই জঙ্গলের চারপাশ থেকে ভেসে আসা লোকজনের উল্লাসভরা চিৎকার শুনে সে বুঝতে পারে যে, সে জঙ্গলের ভিতরে কার্যত বন্দি হয়ে পড়েছে। এখন শুধু ধরা পড়ার অপেক্ষা। তখন চোখ পড়ে তার বগলের নিচে চেপে রাখা টর্চ লাইটটির ওপর। সে বুঝতে পারে, ঐ টর্চ লাইটটিই সর্বনাশের মূল। সে যখন দৌড়াচ্ছিল হাতের চাপ লেগে বগলের নিচের টর্চ লাইটটি তখন দৌড়ের তালে তালে জ্বলছিল আর নিভছিল। ফলে তার গতিবিধি সনাক্তকরণের কাজটি নিজের অজান্তে সে নিজেই খুব সহজ করে দিয়েছে। ক্ষতি যা হবার তা তো হয়েই গেছে—এখন তা নিয়ে ভেবে লাভ নেই। এখন আত্মসমর্পণ করাই শ্রেয়। এই বিবেচনা করে জঙ্গল ঘেরাও করা জনতার নেতৃত্বদানকারী ফুটকার কাছে ঐ ডাকাত আত্মসমর্পণ করে।

গল্পটি শোনার পর আমার খুব হাসি পায়। ডাকাতের জন্য আমার খুব দুঃখ হয়। আহা বেচারা! ক্রেতার স্বার্থের বিরুদ্ধে টর্চ লাইটের এমন বৈরী আচরণের দ্বিতীয় নজির পৃথিবীতে আছে বলে আমার জানা নেই। ডাকাতের নির্বুদ্ধিতার কারণে ডাকাতের দিকে আমার খুব রাগও হয়। হারামজাদা ডাকাতিও করতে পারল না, ধরাও পড়ল বোকার মতো। আর এখন তার ঠ্যালা সামলাতে হবে আমাকে।

বাবার নিষেধ সত্ত্বেও আমি শার্টপ্যান্ট পরে বারহাট্টায় যাবার জন্য রওয়ানা হই। পথের লোকজন আমাকে বিস্ময়ভরা চোখে দেখে। আমি তাদের যথারীতি কুশল জিজ্ঞেস করি। তারা কী বলবে, ভেবে পায় না। তাদের কেউ কেউ আমাকে বারহাট্টায় যেতে বারণ করে। কিন্তু আমি কারও কথা কানে তুলি না। আমি যাই। লোকারণ্য স্টেশনে তখন কোমরে দড়ি বাঁধা ডাকাতকে নিয়ে চৌধুরী দারোগা ও একদল পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করছিল। আমি ভিড় ঠেলে ভিতরে প্রবেশ করি এবং ডাকাতটিকে দেখি। খুবই নিরীহ ধরনের গোবেচারা মানুষ। স্বাস্থ্য মোটেও ভালো নয়। ডাকাত বলে মনেই হয় না। এমন ভগ্ন স্বাস্থ্য নিয়ে সে ডাকাতিকে পেশা হিসেবে নিতে কেন রাজি হয়েছিল, তা কিছুতেই আমার বুদ্ধিতে আসে না।

আমি আশা করেছিলাম চৌধুরী দারোগা আমাকে সহজভাবে সসম্মানে গ্রহণ করবেন। বিশেষ করে ডাকাত যখন আমাকে কাছে পেয়েও এই যে উনি, এই যে উনি বলে চিৎকার করে উঠেনি, তখন নিশ্চয়ই ঐ ডাকাতির সঙ্গে আমি যুক্ত বলে তাঁর মনে যে সন্দেহ দানা বেঁধেছিল, সেটি দূর হবে। কিন্তু না, তিনি আমাকে দেখেও না দেখার ভান করলেন। বুঝলাম কপালে ভোগান্তি আছে। আমাকে এই ডাকাতির সঙ্গে জড়ানো হতে পারে। অন্য যাদের সন্দেহ করা হচ্ছিল, তাদের বারহাট্টায় খুঁজে পাওয়া গেল না। শুনলাম তারা নাকি বাড়ি থেকে পালিয়ে সীমান্ত-অভিমুখে রওয়ানা হয়ে গেছে। পুলিশ তাদের বাড়ি হানা দিয়েছিল, পায়নি। অগত্যা চোখে সর্ষে ফুল দেখতে দেখতে বাড়ি ফিরলাম। যদিও তখন সর্ষে ফুলের মওসুম ছিল না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি যে বারহাট্টা থেকে আবার ফিরতে পারব তা আমার বাবাও আশা করেননি। কেউ কেউ চেয়েছিলেন, আমি যেন না আর ফিরতে পারি। আমাকে ফিরে আসতে দেখে সবাই অবাক হয়। বাড়িতে কিছুটা স্বস্তির ভাব ফিরে আসে। কিন্তু মার ভয় কাটল না। মা বললেন, যা টাকা নিয়ে গিয়ে পুলিশের খাতা থেকে নাম কাটিয়ে আয়। তা না হলে পরে বিপদ হবে। আমি জানি, পুলিশ কি জিনিস!

আমার মায়ের মেশোমশাই অতুলচন্দ্র রাহা মহাশয় ছিলেন একজন নামকরা দারোগা। ঐ দারোগাবাবুর স্ত্রীকে আমি দারোগা দিদিমা বলে ডাকতাম। আমার দারোগা দাদু যখন অবসরপ্রাপ্ত জীবনযাপন শুরু করেন, তখন থেকেই দাদুর হারানো দাপট সওয়ার হয় আমার দিদিমার স্কন্ধে। আমার মা আমাকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ গ্রহণ এবং আত্মগোপন করে থাকার জন্য ঐ দারোগা দাদুর বাড়িতে চলে যাবার পরামর্শ দেন। তাঁর বক্তব্য, একবার যখন তোর ওপর পুলিশের চোখ পড়েছে তখন আজ না হোক কাল তুই ধরা পড়বিই। চৌধুরী দারোগা তো তোর সঙ্গে কথা না বলে তোর সম্পর্কে তার ধারণাটা বুঝিয়েই দিয়েছে। সুতরাং পালাও।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসার পর, রাতের অন্ধকারে আমি বাড়ি ছেড়ে পালাতে রাজি হই। রাত দশটার দিকে ট্রেন। বারহাট্টার ট্রেনে ওঠা যাবে না। সেখানে পুলিশ আমার অপেক্ষায় থাকতে পারে, তাই আমি বাড়ির পেছন দিয়ে তিন মাইল দুর্গম অন্ধকার পথ হেঁটে পরের স্টেশন ঠাকুরাকোনায় গিয়ে ময়মনসিংহের ট্রেন ধরলাম। উদ্দেশ্য, আঠারবাড়ি স্টেশনে নেমে চার-পাঁচ মাইল পথ পাড়ি দিয়ে আমতলায় দারোগা দাদুর বাড়িতে গিয়ে আত্মগোপন করা।

শুরু হলো আমার এক নতুন জীবন। পলাতক জীবন। নিজেকে একজন খুব গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক নেতার মতো মনে হতে থাকল। দারোগা দাদু আমাকে খুব ভালোবাসতেন। তিনি আমাকে খুব সরল মনে গ্রহণ করলেন—কিন্তু আমার দারোগা দিদিমা আমাকে সন্দেহ করতেন। মাঝে-মাঝে আমাকে ভয় দেখাতেন। বলতেন, দাঁড়া আমিই তোকে ধরিয়ে দেব। ডাকাতি করে এসে দারোগার বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিস, তোর সাহস তো কম নয়? বলতেন বটে, কিন্তু ভেতরে ভেতরে তিনিও আমাকে খুব স্নেহ করতেন। আমি বাড়ির ভিতরেই থাকতাম, বেশি বাইরে বেরুতাম না। বই পড়তাম আর গ্রামোফোনে গান শুনতাম। ভালোই কাটছিল সময়টা। কিন্তু বিধি বাম। একদিন অরুণ মামা স্কুল থেকে ফিরে এসে বললেন, কেন্দুয়া থানায় আমার সন্ধান নেবার জন্য বারহাট্টা থেকে খবর এসেছে। তিনি গোপন সূত্রে তা জেনেছেন। ধরা পড়া ঐ ডাকাতের বাড়ি যে কেন্দুয়া, তা আমি ভুলে বসেছিলাম। ফলে আমাকে আমতলা থেকে ঐ রাতেই পাততাড়ি গুটাতে হলো। দারোগা দিদিমার পরামর্শক্রমে রাতের ট্রেনেই আমি চলে গেলাম গৌরীপুর।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গৌরীপুর থেকে মাইলখানেক দূরে মিসিডিঙ্গি গ্রাম। সেখানে আমার মায়ের পিসতুতো বোন কেনু মাসির বিরাট বাড়ি। কেনু মাসি ছিলেন নিঃসন্তান— বাল্য বিধবা। তাঁর কোনো ভাই না থাকায় স্বামীর সম্পত্তির পাশাপাশি বাবার সম্পত্তিও তিনি উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়ে যান। ছোটবেলায় আমাকে তিনি পুত্র হিসেবে দত্তক নিতে চেয়েছিলেন। আমিও যেতে রাজি ছিলাম, কিন্তু বাবা রাজি হননি। বাবা রাজি হলে আমাকে আজ এমন বিপদে পড়তে হতো না। এই মনে করে বাবার দিকেও আমার রাগ হয়।

দীর্ঘদিন পর আমাকে কাছে পেয়ে কেনু মাসি আকাশের চাঁদ হাতে পেলেন। অতৃপ্ত অপত্য স্নেহের জোয়ারে ভেসে গেলেন তিনি। বললেন, এতদিন পরে মাসির কথা মনে পড়ল তোর?

আমি আসল কথা বললাম না। হাজার হলেও মেয়ে মানুষ তো—শুনেছি তাদের পেটে নাকি কথা হজম হয় না। কখন খুশিতে নিজেই বলে দেবে, কে জানে? আমি এখন খুব হুঁশিয়ার।

তাই বললাম, বাবা রাজি না হলে কী হবে, আমি চলে এসেছি তোমার কাছে, এখন থেকে আমি তোমার কাছেই থাকব।

আমার সরলপ্রাণ মাসিটি তা বিশ্বাস করলেন। কিছুদিন এভাবে কাটল। খাইদাই, ঘুরে বেড়াই। পাড়ার মহিলাদের সঙ্গে গল্প করি। রেডিওতে গান শুনি। বই পড়ি। আর মাঝে মাঝে কবিতা লিখি। সবাই আমাকে কেনু মাসির দত্তকপুত্র জ্ঞানে ভালোবাসে।

হঠাৎ একদিন গ্রামের বাড়ি থেকে আমার মা এসে হাজির হন। গৌরীপুর থেকে রাতে ফিরে দীর্ঘদিন পর মাকে দেখতে পেয়ে আমি খুব খুশি হই।

ইতোমধ্যে মা কেনু মাসিকে আমার গোপন-করা সকল কথাই বলে দিয়েছেন। সঙ্গতকারণেই কেনু মাসির মুখ ভারী। তিনি চিন্তিত।

আমি ভেবেছিলাম, আস্তে আস্তে অবস্থা নরমাল হয়ে আসবে। আমি আবার নিজ বাড়িতে ফিরে যেতে পারব। কিন্তু মা জানালেন, তার সম্ভাবনা খুবই কম। আমি ঐদিন চলে না এলে পুলিশের হাতে ধরা পড়তাম। ঐ রাতেই পুলিশ আমাদের বাড়ি গিয়েছিল আমাকে ধরতে। শুধু তাই নয়, মা জানালেন, কেন্দুয়া থানা থেকে পুলিশ আমতলায় দারোগা দাদুর বাড়িতেও আমার খোঁজে গিয়েছিল। এখানে আসার আগে আমি যে কিছুদিন আমতলায় কাটিয়ে এসেছি, সে কথাও কেনু মাসি জেনে যান।

আমি যে বড় একটা বিপদের মধ্যে আছি, তা নিয়ে কেনু মাসির কোনো চিন্তা নেই। আমি কেন তাঁর কাছে সব কথা খুলে বলিনি—এই অভিমানে তিনি আমার সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করে দেন। আমি বুঝলাম, তাঁর বেদনা কোথায়? কিন্তু আমি সেখানে ছিলাম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খুবই অসহায়। আমি কেনু মাসির চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে বললাম, তোমার সঙ্গে মিথ্যা বলাটা আমার ভীষণ অন্যায় হয়েছে। মাসি, আমাকে মাফ করে দাও।

ঐ মুহূর্তে কেনু মাসিকে মা বলে ডাকতে আমার খুব ইচ্ছে করেছিল। কিন্তু পারিনি। তবে প্রকাশ্যে না পারলেও ঐ সন্তানবুভুক্ষু মমতাময়ী মাতৃমূর্তিকে সেদিন আমি মনে মনে মা বলেই সম্বোধন করেছিলাম। আজও ভেবে স্বস্তি বোধ করি যে, আমার ডাক সেদিন তাঁর অন্তরে পৌঁছেছিল। তাই কান্নায় আমার বুক ভারী হয়ে আসছে ঐ রাতের কথা মনে করে।

আমি চার বছর বয়সে আমার নিজের মাকে হারিয়েছিলাম। কিন্তু তাঁর অভাব আমি বুঝতে পারিনি। আমার মা যেন নিজেকে সরিয়ে নিয়ে আমাকে একাধিক মায়ের সন্ধান দিয়ে গিয়েছিলেন। আমার মা হতে পারার আনন্দ এবং যন্ত্রণা দুটোই ছিল খুব তীব্র। আমার নিজের মা সেই আনন্দ এবং যন্ত্রণা থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন তাঁর অকাল মৃত্যুর কারণে।

সেই রাতটি আমার বড় আনন্দে কাটে। আমি ঘুমাচ্ছিলাম অঘোরে এবং পরম নিশ্চিন্তে, কিন্তু কেনু মাসি আর আমার মা সারা রাত জেগেছিলেন আমাকে পাহারা দেবার জন্য। তাদের ভয়, পুলিশ যদি আমার খোঁজে এখানেও আসে? আমি নির্ভয়ে ঘুমাচ্ছিলাম, আর আমাকে কেন্দ্র করে স্রোতভর প্রবাহিত হচ্ছিল দুই রমণীর মাতৃ-হৃদয়ের উদ্বেগ। আজকের মতো সেদিন আমি ঐ উদ্বেগের গভীরতাকে আমি উপলব্ধি করিনি। এই লেখার ভিতর দিয়ে আমি কি তাঁদের উদ্বেগ, ভালোবাসা ও স্নেহের ঋণ একটুখানি হলেও শোধ করতে পারছি? মনে হয় না।

আমাকে আপাতত অন্য কোথাও লুকিয়ে থাকার পরামর্শ দিয়ে মা পরদিনই বাড়ি চলে গেলেন এবং বলে গেলেন যে, ইন্ডিয়ায় চলে যাবার জন্য যেন মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকি—এটাই বাবার নির্দেশ।

শ্যামগঞ্জ হাই স্কুলে আমার স্কুল ও কলেজ জীবনের সহপাঠী বন্ধু হাশিম মাস্টারি করত। আনন্দমোহন কলেজ থেকে বিএসসি পাস করার পর সে ঐ স্কুলে চাকরি নেয়। স্কুলসংলগ্ন একটি ছোট্ট রুমে হাশিম থাকত। আমি ওর সঙ্গে আগেও থেকেছি। শ্যামগঞ্জে আমার আরও অনেক সহপাঠী বন্ধু রয়েছে। বাবুল (প্রশান্ত রায়) আছে, আছে দেলোয়ার হোসেন বাচ্চু। মনে মনে স্থির করি শ্যামগঞ্জই হবে আমার পরবর্তী গন্তব্য। কোথায় থাকি না থাকি, সে সম্পর্কিত তথ্য হাশিমের কাছে জানা যাবে—বাবাকে বলো হাশিমের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে,—এই বলে আমি মাকে মোহনগঞ্জের ট্রেনে তুলে দিই। মা চলে যায়। ট্রেন ছাড়ার সময় যথারীতি ছলছল চোখে আমার দিকে তাকায়। আমিও আমার চোখ দুটোকে জল-ছলছল করার চেষ্টা করি। কিছুটা হয়ও।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাকে বিদায় দিয়ে আমি যাই গৌরীপুর রেলস্টেশনের বুক স্টলে পত্রিকা দেখতে। ওখানে ঢাকার সব পত্রিকা আসে। তবে একদিন পরে আসে। পাতা উল্টাতে গিয়ে দেখি আজাদ পত্রিকার সাহিত্য পাতায় আমার একটি কবিতা ছাপা হয়েছে। কবিতার নাম 'দীপালীর মুখ'। পত্রিকাটিকে বগলদাবা করে ভরদুপুরে কেনু মাসির কাছে ফিরে আসি। বারবার কবিতাটি পড়ি। সারাদিন কাটে। সন্ধ্যার দিকে মাসিকে শ্যামগঞ্জে চলে যাবার কথা বলি। আমি যে এখানে আর থাকব না তা একরকম স্থির হয়েই ছিল। কিন্তু ঐ স্থির হয়ে থাকা কথাটিই আমার মুখ থেকে উচ্চারিত হওয়ার পর কেনু মাসির মধ্যে এক ধরনের অস্থিরতা লক্ষ্য করি। বুঝি, অনিচ্ছা সত্ত্বেও তিনি আমাকে বিদায় দিতে রাজি হয়েছেন।

গৌরীপুর থেকে শ্যামগঞ্জের দূরত্ব রেলপথে মাইল সাতেকের মতো। সড়কপথে মাইল পাঁচেক। শ্যামগঞ্জে আড্ডা দেবার জন্য ঐ পথে আমি অনেকবার যাতায়াত করতাম। জেলা বোর্ডের ঐ কাঁচা সড়কপথটি আমার খুবই প্রিয় হয়ে উঠেছিল। ওটা ছিল রবীন্দ্রনাথের পায়ে চলার পথ। মিসিডিঙ্গি গ্রাম থেকে একটি ছোট্ট মেঠোপথ এসে এই বড়পথের সঙ্গে মিশেছে। যেখানে মিশেছে ঠিক সেই জায়গাটিতেই ছিল একটি লোহার পুল। তার নিচ দিয়ে বয়ে গেছে একটি ছোট্ট সরু খাল। পুলের পুব পাড়ে একটা বিরাট শিমুল গাছ। সেখানে টকটকে-লাল শিমুল ফুলের মেলা। ডালে পাখ-পাখালির ভিড়। গাছের ফুলগুলো জলের দিকে তাকিয়ে হাসত। কাঁপত। কাঁদত। সূর্যডোবা সন্ধ্যায় পশ্চিমের আকাশ যখন সূর্যের শেষ অস্তরাগে রাঙা হয়ে উঠত, তখন তরুণ কবির মতো মুগ্ধ দৃষ্টিতে ঐ পুলের উপরে বসে আমি শিমুলের শোভা দেখতাম। দুটো সুন্দর দৃশ্যকে মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়ে আমি বুঝতে চেষ্টা করতাম, কোন দৃশ্যটি বেশি সুন্দর।

মিসিডিঙ্গি ছেড়ে যেতে আমার খুব কষ্ট লাগছিল। কিন্তু ইচ্ছেমতো কোথাও থাকার উপায় বা অধিকার কোনোটাই আমার তখন ছিল না। গ্রেফতারি পরোয়ানা হাতে পুলিশ আমাকে তখন তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে। কবে, কীভাবে এই তাড়া শেষ হবে কে জানে?

আমি কেনু মাসিকে কথা দিই, আমি এসে মাঝে মাঝে তোমার হাতের রান্না খেয়ে যাব। আমাকে হাসিমুখে বিদায় দাও। আমার জন্য ভেবো না। পুলিশের বাপও আমাকে ধরতে পারবে না। আমার নতুন গজানো দাড়িতে হাত বুলাতে বুলাতে বলি, এই যে দেখো আমি দাড়ি রাখতে শুরু করেছি, পুলিশ আমাকে চিনবে কি করে?

এবার কেনু মাসির মুখে একটা ক্ষণস্থায়ী হাসির ঝিলিক খেলা করে। আমার বিদায়-সম্ভাবনা আঁচ করে দীপালী এসে কেনু মাসির পেছনে দাঁড়ায়। ওর মুখটিকে ব্যাগের ভিতরে বন্দি করে নিয়ে, সত্যিকারের ডাকাতের মতোই আমি আমার পরবর্তী গন্তব্যের দিকে পা বাড়াই। আমার মাথার পেছনের দিকে দুটো চোখ আছে; তাই আমার আর পিছন ফিরে তাকানোর প্রয়োজন হয় না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শ্যামগঞ্জ জংশন। এখান থেকে একটি লাইন গেছে মোহনগঞ্জের দিকে। একটি গেছে জারিয়া-ঝাঞ্জাইলের দিকে। শ্যামগঞ্জের পরের স্টেশনের নাম জালসুকা, পরে পূর্বধলা এবং সবশেষে জারিয়া-ঝাঞ্জাইল। জারিয়া এবং ঝাঞ্জাইল দুটো পৃথক গ্রাম— কংশের এপারে জারিয়া ওপারে ঝাঞ্জাইল। জারিয়া পূর্বধলা থানার অন্তর্ভুক্ত এবং ঝাঞ্জাইল দুর্গাপুর থানার। ঐ স্টেশনটি স্থাপিত হওয়ার সময় কংশপারের ঐ দুই গ্রামে মানুষদের মধ্যে বড় ধরনের কলহ হয়েছিল, শেষ পর্যন্ত দুই গ্রামের নামেই ঐ স্টেশনটির নাম রাখা হয়।

আমার জ্ঞাতি বোন লীলাদির বিয়ে হয়েছিল বাঘরা গ্রামে! গারো পাহাড়ের পাদদেশে ঐ গ্রামটি অবস্থিত। আমার জামাইবাবু সতীশ সরকার মহাশয় ঐ এলাকার একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন। আমার বড় ভাই লীলাদির বাড়িতে আশ্রয় নিয়ে, পরে আমার জামাইবাবুর সাহায্যে চোরাপথে আসামের ভিতর দিয়ে পশ্চিমবঙ্গে যাতায়াত করতেন। পশ্চিমবঙ্গে যাবার জন্য ঐ পথটা খুব দীর্ঘ হলেও ঐ সীমান্তপথে আমাদের একজন প্রভাবশালী ও বিশিষ্ট নিকট-জামাইবাবু থাকায় ঐ পথটা ছিল নিরাপদ। আমাদের ভারতগমনেচ্ছু পরিচিত জ্ঞাতিজনদের অনেকেই ঐ সীমান্তপথ ব্যবহার করতেন। আমি খুব ছোটবেলায় একবার লীলাদির বাড়িতে গিয়েছিলাম। সীমান্ত পাড়ি দেবার জন্য নয়, দেখার জন্য এবং ছুটি কাটাবার জন্য।

লীলাদির সতীনপুত্র সন্তোষ আমার বাড়িতে থেকে আমাদের সঙ্গে বারহাট্টা স্কুলে পড়াশোনা করত। ঐ সীমান্তবর্তী বাঘরা গ্রামের আশেপাশে কোনো ভালো স্কুল ছিল না। সন্তোষ ছিল আমারই সমবয়সী এবং বন্ধুস্থানীয়। তখন আমি স্কুলের ছাত্র। বাঘরা গ্রাম থেকে গারো পাহাড়টিকে বেশ সুন্দর লাগত। ঐ আমার প্রথম কাছে থেকে পাহাড় দেখা। ঐ দৃশ্য আমার চোখে গেঁথে গিয়েছিল। ভবিষ্যতে ডাকাতি-মামলায় জড়িয়ে পুলিশের তাড়া খেয়ে আমাকেও একদিন ঐ পথের সন্ধান করতে হবে, ভাবিনি। কিন্তু গৌরীপুর থেকে শ্যামগঞ্জে যাবার পর আমাকে ওরকমই ভাবতে হলো। আমি মনে মনে স্থির করলাম, আরও কিছুদিন দেখব— তারপর যদি দেখা যায় যে, অবস্থার উন্নতির কোনো লক্ষণ নেই, তাহলে অগত্যা মধুসূদন, আমাদের প্রিয় জামাইবাবুর শরণাপন্ন হব, বলব দশ বছর আগে আমার দাদামণিকে যেভাবে সীমান্ত পাড় করিয়ে দিয়েছিলেন, সেভাবে আমাকেও পার করে দিন। আমি চলে যাব। অনেক হয়েছে, এ দেশে আর নয়।

মোটামুটিভাবে এ রকম একটা স্ট্রেটেজি চোখের সামনে রেখেই আমি শ্যামগঞ্জে থাকতে থাকি। বেশিদিন থাকার বাসনা নিয়ে আমি যদিও সেখানে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যাইনি, তবুও আমাকে ঘিরে শ্যামগঞ্জে বেশ একটা চমৎকার আড্ডার পরিবেশ তৈরি হয়ে যায়। আমি কখনও হাশিমের সঙ্গে স্কুলে, কখনও বাবুলদের বাসায় রাত কাটাই। বাবুলদের বাড়িটি ছিল শ্যামগঞ্জের সকল সাংস্কৃতিক তৎপরতার প্রাণকেন্দ্র। বাবুলের ঠাকুরদাদা নবদ্বীপ বাবু ছিলেন ঐ এলাকার খুব প্রভাবশালী ব্যক্তি। তিনি ব্রিটিশ আর্মির ডাক্তার ছিলেন। তাঁর কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ ইংরেজ সরকার তাঁকে 'কাইজার-ই-হিন্দ' উপাধি দিয়েছিল। তিনি তখন আশি বছরের বৃদ্ধ। কিন্তু বেশ প্রাণবন্ত মানুষ। তিনি সাহিত্যামোদী ছিলেন এবং গান-বাজনা নিয়ে মেতে থাকতে পছন্দ করতেন। বাড়িতে নানা ধরনের অনুষ্ঠান সর্বদা লেগেই থাকত। বাবুলের ইমিডিয়েট ছোট বোন শিবানী ভালো গাইতে পারত। সে ছিল স্কুলের ছাত্রী। বাবুলের অন্য ছোট ভাইবোনরাও গান গাইত।

আমি নবদ্বীপ বাবুকে আমার গোপন সমস্যার কথা বলি। ফলে তাঁর বাড়িতে থাকা-খাওয়া নিয়ে তিনি বাইরের কাউকে কোনো প্রশ্ন করতে দিতেন না। তিনি আমাকে সতর্কতার সঙ্গে আগলে রাখতেন। আমরা বাজারে পচার স্টলে আড্ডা দিতাম। সেই আড্ডায় সামিল হতো শ্যামগঞ্জের অনেকেই। আমি যেখানে যাদের বন্ধু হিসেবে পেয়েছিলাম তাদের সকলের নাম আমার মনে নেই— মনে আছে তোতার কথা। সে ছিল একজন সমকামী। ওর একটি সুদর্শন বালক-বন্ধু ছিল। আমি তোতার ঐ বালক-বন্ধুটিকে পরীক্ষা পাসে সাহায্য করেছিলাম বলে তোতা আমার প্রতি ছিল খুবই কৃতজ্ঞ। সে আমাকে জোর করে এটা-ওটা খাওয়াত। ১৯৭১-এ, মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে তোতা পাক-বাহিনীর হাতে নিহত হয়। শ্যামগঞ্জ স্টেশনের নিকটবর্তী একটি বাংকারে নিয়ে গিয়ে, নির্মমভাবে অত্যাচার করার পর পাক-সেনারা তোতাকে হত্যা করে। আমি জানি শ্যামগঞ্জ স্টেশনটি কী প্রিয়ই না ছিল তোতার। ওর জীবনের অনেকটা সময়ই সে কাটিয়ে দিয়েছিল ট্রেনের কামরায় এবং শ্যামগঞ্জ স্টেশনের চায়ের স্টলে আড্ডা দিয়ে। শেষ পর্যন্ত ঐ স্টেশনেই ওর মৃত্যু হয়।

মনে পড়ে বাদশার কথা। পাক সেনাদের হাতে তোতার মৃত্যুর পর, মনে হয় প্রাণের ভয়েই বাদশা মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে নিজেকে যুক্ত করে। ফলে যুদ্ধ চলাকালে সে মুক্তিবাহিনীর হাতে নিহত হয়। দীর্ঘদেহী, সুদর্শন বাদশা সিনেমার নায়ক হওয়ার গোপন স্বপ্ন দেখত। আমি তাকে সাহায্য করব বলেছিলাম। কিন্তু সে সুযোগ পাইনি। তার আগেই সে নিহত হয়। একই মুক্তিযুদ্ধে আমি আমার শ্যামগঞ্জের দুই বন্ধু তোতা এবং বাদশাকে হারিয়েছি। আমার খুব কষ্ট হয় শ্যামগঞ্জের ঐ দিনগুলোর কথা ভাবতে।

মনে আছে নজরুলের মতো ঝাঁকড়া চুলের কবি-কবি ভাব মজিদ মাস্টারের কথা। সে কবিতাও লিখত। মনে পড়ে গিয়াসউদ্দিনের কথা, মনে পড়ে যমুনার কথা। মনে পড়ে হালদার বাচ্চুর কথা, ঐ বাচ্চু ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিভাগের ছাত্র। ছুটিছাটায় শ্যামগঞ্জে যেত। পরে এমএসসি পাস করে নেত্রকোনা কলেজের অধ্যাপক হয়েছিল। মনে পড়ে কুদ্দুসের কথা। সে ছাত্র ইউনিয়নের একজন নেতা ছিল। পরে বঙ্গবন্ধুর ডাকে আওয়ামী লীগে যোগ দেয়। মনে পড়ে তাতরাকান্দার রজব আলীর কথা। সে ছিল একেবারে নিগ্রো—ব্ল্যাক। খুব দীর্ঘদেহী। ১৯৭১-এ রজব আলী মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেয়। পরে ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধু নিহত হওয়ার পর সে কাদের বাহিনীতেও যায় এবং সীমান্তে যুদ্ধরত অবস্থায় বিডিআরের হাতে নিহত হয়।

দেলোয়ার হোসেন বাচ্চু পড়ত তেজগাঁও পলিটেকনিক কলেজে। সে ছিল তখন ঐ কলেজের ছাত্র সংসদের নির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক। আমার শ্যামগঞ্জে থাকার খবর সে বাবুলের চিঠিতে জানতে পারে এবং আমাকে বাবুলদের বাসায় অথবা প্রয়োজনে ওদের মইলাকান্দার বাড়িতে থাকার পরামর্শ দিয়ে চিঠি লেখে। ওদের বাড়িটি ছিল স্টেশনের একেবারে লাগোয়া দক্ষিণে। পরে ওদের বাড়িতেও আমি থাকতাম।

বাচ্চুর পরামর্শে শ্যামগঞ্জে একটি সাংস্কৃতিক জলসার আয়োজন করা হয়। বাচ্চু জানায়, ঢাকা থেকে পল্লীগীতিসম্রাট আবদুল আলীম, নীনা হামিদ, ফেরদৌসী রহমান, রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী অজিত রায়, আধুনিক গানের তৎকালের সেরা শিল্পী বশির আহমদ এবং খন্দকার ফারুক আহমদ ঐ জলসায় আসবেন। পাঁচ টাকা দশ টাকার টিকিট বিক্রি করে সেই অনুষ্ঠানের ব্যয় নির্বাহ করা হবে। শিল্পীদের পারিশ্রমিক দিয়ে এবং যাবতীয় ব্যয় নির্বাহ করার পর যা বাঁচবে তা উদ্যোক্তাদের মধ্যে বণ্টন করা হবে। অনুষ্ঠানটি হবে একটি গুদাম ঘরে। আমি সেই অনুষ্ঠানের প্রস্তুতিপর্বের কাজে লেগে যাই। রিকশায় বসে বসে অনুষ্ঠানের কথা মাইকে প্রচার করি। বলি... বিরাট জলসা, আসছেন ঢাকা থেকে ইত্যাদি...। আমার খুব মজা লাগে। যা হোক একটা কাজ তো পাওয়া গেল। একেবারে কাজ ছাড়া ভালো লাগে না। লুকিয়ে থাকা বা পালিয়ে বেড়ানোটা কঠিন কাজ হলেও তাকে ঠিক কাজ বলা যায় না। মাইকে আসন্ন নৃত্য-গীত ভরপুর জলসার ক্যানভাসিংয়ের কাজটা আমার বেশ লাগছিল। শিবানী এবং শিবানীর প্রায় সমবয়সী ভাইঝি অনজুর মুখে আমার মাইকিংয়ের প্রশংসা শোনার পর যেন অগ্নিতে ঘৃতাহুতি হয়। আমি যারপরনাই অনুপ্রাণিত বোধ করি। আমি যে কবি, তা আমি ভুলে যাই।

শিবানীর সঙ্গে বাচ্চুর যে দীর্ঘদিন ধরে প্রেম চলছে, তা আমি শুনেছিলাম। শিবানীর সঙ্গে কথা বলে আমি সেই প্রেমের গভীরতাকে অনুভব করলাম।

শিবানী হিন্দু। সুন্দরী এবং সুকণ্ঠী। বিশেষ করে শিবানীর চুল ছিল খুবই আকর্ষণীয়। দীর্ঘ, কালো এবং ওর চুলের গোছা ছিল বর্ষার জলের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেড়ে ওঠার লকলকে আমন ধানের পুষ্ট গোছার মতো। সে আমার বন্ধু প্রশান্তর বোন। হিন্দু। বাচ্চু মুসলমান। বন্ধু হলেই বা, মুসলমান তো। অনেক হিন্দুর চেয়ে সে ভালো হলেও হিন্দু তো সে নয়। দীর্ঘদিনের সংস্কারবশত প্রথমে আমার মনে বেশ একটু খটকাই লেগেছিল। পরে যখন দেখলাম যে, এই ব্যাপারটিকে শিবানীদের পরিবার সহজভাবেই মেনে নিয়েছে এবং সারা শ্যামগঞ্জের মানুষই শিবানী ও বাচ্চুর প্রেমের কথা জানে, তখন আমার উল্টো রাগ হলো গিয়ে ঐ হিন্দুদের ওপর। ঐ ব্যাটারাই বোকা। মুসলমান ছেলেরা কী সুন্দর হিন্দু মেয়েদের ভালোবাসতে পারে, কিন্তু হিন্দু ছেলেরা তা পারে না। মুসলমান ছেলেমেয়েদের ভালোবাসার স্কোপ হিন্দু ছেলেমেয়েদের তুলনায় অনেক বেশি। হিন্দুরা মুসলমান ছেলেমেয়েদের ভালোবাসতে ভয় পায়। এটা হবে কেন? এমনটি হওয়া তো উচিত নয়। নয়, কিন্তু হচ্ছে। দীর্ঘদিন ধরে এমনটিই হয়ে আসছে।

ধর্মচ্যুত হবার ভয়টাই হিন্দু এবং মুসলমানের মধ্যে একট বড় রকমের প্রাচীর তুলে রেখেছে। একই মাটিতে জন্মগ্রহণ করে, একই আলো হাওয়ায় পাশাপাশি বেড়ে ওঠার পরও শুধু ধর্মে পৃথক হওয়ার কারণে তারা সারাজীবন মর্মেও পৃথক থাকবে— এ কেমন কথা? এটাকে ভাঙতে হবে। এই অবস্থাটা সমাজের জন্য অকল্যাণকর, মানবস্বভাবের ক্ষেত্রে অস্বাভাবিক এবং স্বতঃস্ফূর্ত আবেগের পরিপন্থী বিধায়, অস্বাস্থ্যকরও। আমি ভেবে পাই না, মুসলমান হওয়া যাবে, আর হিন্দু হওয়া যাবে না— এ কেমন কথা? হিন্দু ছেলে যদি কোনো মুসলমান মেয়েকে বিয়ে করে, তা হলেও তাকে মুসলমান হতে হবে—আবার কোনো হিন্দু মেয়ে যদি কোনো মুসলমান ছেলেকে বিয়ে করে, সেক্ষেত্রেও মেয়েটিকে মুসলমান হতে হবে। এটাই বিধান। তার মানে হচ্ছে এই যে, হিন্দুত্ব বিসর্জন না দিয়ে মুসলমানের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার কোনো উপায়ই হিন্দুর সামনে খোলা নেই। মুসলমান যদি পাথর, তবে হিন্দু হচ্ছে ডিমের মতো। সে পাথরের উপরে পড়লেও ভাঙবে, নিচে পড়লেও ভাঙবে। এটা অন্যায়। এর পেছনে একটা অন্যায় রয়ে গেছে—আমাদের কাজ হবে সেই অন্যায়টাকে খুঁজে বের করা।

অন্যায়ের শুরুটা হিন্দুর দিক থেকে। তার গোঁড়ামি তার বোকামির নামান্তর। এর ফলে সে হারাচ্ছে তার ছেলে এবং মেয়েকে। লাভবান হচ্ছে মুসলমান। সে বলীয়ান হচ্ছে সংখ্যায় এবং শক্তিতে। হিন্দু যদি মুসলমান বিয়ে করার জন্য কাউকে সমাজচ্যুত বা ধর্মচ্যুত না করত, তা হলে মুসলমানরাও বিধর্মীকে ইসলাম কবুল করানোর বিধানটিকে বিবাহক্ষেত্রে বাধ্যতামূলকভাবে আমাদের সমাজে চালু করতে পারত না। হিন্দুদের ভাবা উচিত, বলা উচিত যে, হিন্দুও হওয়া যায়। তাদের মানা দরকার যে, হিন্দুধর্মটা স্বপ্নে-পাওয়া এমন কোনো ধর্ম নয় যে, একমাত্র জন্মসূত্রেই তাকে লাভ করতে হবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি এই দাবি মুসলমানের দিক থেকেও ওঠা সঙ্গত মনে করি যে, গ্রহণ করি বা না করি, গ্রহণযোগ্য বলে ভাবি আর না-ই ভাবি; আমার হিন্দু ধর্ম গ্রহণের অধিকার আছে। একজন হিন্দুর যেমন আছে যে কোনো ধর্ম গ্রহণের অধিকার। ধর্মান্তরিত হওয়ার এই অধিকারকে অস্বীকার করাটা মানবাধিকার লঙ্ঘনের সামিল। ধর্মান্তরিত হওয়ার অধিকারকে হয়তো প্রয়োগ করব না, বা এর প্রয়োজনও হয়তো বোধ করব না; কিন্তু এই অধিকার যে আমার রয়েছে, এই তথ্যটিই হবে আমার জন্য সুখের, আনন্দের এবং সম্মানের। মানবাত্মাকে যে অসম্মান করে, পরধর্মকে যে ছোটো করে দেখে, সেই ধর্ম কখনও বড় হতে পারে না। তার নাম যত সুন্দরই হোক না কেন? ধর্ম তার ছোটত্বকে বর্জন করে বড়ত্বকে অর্জন করুক, ধর্মের কাছে এটাই এ-যুগের চাওয়া। একবিংশ শতাব্দীর দ্বারপ্রান্তে উপনীত হওয়ার পরও ধর্মান্তরিত হওয়ার বেদনা যেন পৃথিবীর আধুনিক মানুষকে আর ভোগ করতে না হয়।

মুসলমান মেয়েদের ভালোবাসার ব্যাপারে খুব ছোটবেলা থেকেই আমি এক ধরনের 'গোপন-সতর্কতা' অবলম্বন করেছি। এই আবেগ সংকোচনের প্রতি আমার অন্তরের সায় ছিল না। মুসলমান ছেলেরা তুলনামূলকভাবে ঐ 'গোপন সতর্কতা'র প্রয়োজন থেকে মুক্ত। তাদের মধ্যে বরং এমন ধারণা প্রচলিত আছে যে, একজন বিধর্মীকে বিবাহের মাধ্যমে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করতে পারলে ছোয়াব হয়। ইসলাম প্রচারের প্রাথমিক যুগে এটা ঠিক হতো তো তাতে সন্দেহ নেই— কিন্তু এ যুগেও প্রেম-বিবাহের ব্যাপারটা যদি 'ছোয়াব চেতনা' দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়—তা আধুনিক মানুষের জন্য অবমাননার হবে। হিন্দুকে মুসলমান বানাতে পারলে যদি মুসলমানের ছোয়াব হয়, তবে মুসলমানকে হিন্দু বানাতে পারলে হিন্দুরও ছোয়াব হবারই কথা। হিন্দু তা মানুক, মুসলমানরা তা মানতে দিক। তবেই না ব্যাপারটা ঘটবে সমানে সমানে। এখন যেভাবে চলছে, তাতে আমার মনে হয় আমরা প্রতিদিন, প্রতি মুহূর্তে একে অপরকে অপমান ও উপহাস করে চলেছি। আমারটাই বড়, আমারটাই ভালো— এ রকম দাবিনামা গলায় ঝুলিয়ে নিয়ে ঘর থেকে বাইরে বেরুতে আমাদের কি কোনোদিনই রুচিতে বাধবে না?

আমি মনে করি এই ব্যাপারটি নিয়ে আমাদের আরও গভীরভাবে ভাবা দরকার। সাম্প্রদায়িক সমস্যার একটি গুরুত্বপূর্ণ সমাধানসূত্র এখানে পাওয়া যেতে পারে।

পুরুষ যদি নারীকে দুর্বল ভেবে নারীর ওপর পুরুষের ধর্ম চাপিয়ে দেয়—সেটা নারী মানবে কেন? আবার পুরুষকে দুর্বল ভেবে নারী যদি তার ধর্ম পুরুষের ওপর চাপাতে চান, তবে পুরুষই বা তা মানবে কেন? তাই চাপানোর প্রশ্নটাকে চিন্তা থেকে বাদ দিয়েই আমাদের ভাবতে হবে। তার মানে, যে যার ধর্ম নিয়ে থাকবে। অথবা না নিয়ে থাকবে। এ নিয়ে কেউ কোনো প্রশ্ন করতে পারবে না। মানতে হবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যে, ধর্ম যার যার, কিন্তু সংসার দুজনের। তাদের সন্তানের নাম পিতা-মাতার যৌথ সিদ্ধান্তে রাখা যেতে পারে। সেখানে নামের মধ্যে সংস্কৃত, বাংলা এবং আরবি শব্দ পাশাপাশি থাকতে পারে! নাও থাকতে পারে। কারো নাম হতে পারে রুশ বা জর্মন শব্দে। অভিভাবক হিসেবে পিতা-মাতা দুজনেরই নাম ব্যবহৃত হবে। প্রাপ্ত বয়স্ক না-হওয়া পর্যন্ত সন্তান 'মানবিক' ধর্মের অন্তর্ভুক্ত বলে ভাবা হবে। তবে যে কোনো ধর্মের আনন্দানুষ্ঠানেই তাকে অংশগ্রহণ করতে দেয়া হবে। পরে বড় হয়ে সন্তান তার পছন্দমতো পিতা অথবা মাতার ধর্ম গ্রহণ করতে পারবে। অথবা নাও করতে পারে। সে তৃতীয় কোনো ধর্মও গ্রহণ করতে পারে।

এ ব্যাপারে রাষ্ট্রের দায়িত্ব হবে অসমধর্মে বিবাহিত এইসব দম্পতিকে প্রয়োজনীয় আইনগত সহায়তা প্রদান করা, যাতে সমাজের ধর্মান্ধ গোষ্ঠী তাদের কখনও বিরক্ত ও বিব্রত করতে না পারে।

দেখতে দেখতে দিকে দিকে আলোড়ন সৃষ্টি করে শ্যামগঞ্জের বহু প্রত্যাশিত নৃত্য-গীত ভরপুর জলসার দিনটি এসে যায়। আমি দিনরাত খেটে একটি পাটের গুদামঘরকে অনুষ্ঠানমঞ্চে পরিণত করার কাজে ব্যস্ত থেকে বেশ গভীর রাতে গিয়ে শিবানীদের বাড়িতে ঘুমাই। পরদিন ঢাকার নামী শিল্পীরা শ্যামগঞ্জে আসবেন। তাদের থাকা খাওয়ার ভালো ব্যবস্থা একরকম নিশ্চিত করা হয়েছে। এদের মধ্যে শিল্পী আবদুল আলীম সম্পর্কে বাচ্চু আগেই চিঠিতে জানিয়েছে, মদ না হলে তাঁর চলে না। তাঁর জন্য যেন ভালো বাংলা মদের ব্যবস্থা করা হয়।

ইতিপূর্বে শিল্পীরা মদ খান বলে বইয়ে-পুস্তকে পড়েছি এবং সিনেমায় দেখেছি। একেবারে সামনাসামনি বসে নিজের চোখে দেখিনি। এবার নিজ চোখে ঐরকমের একটা দৃশ্য দেখতে পাব। আমার মনে খুব আনন্দ। আমি এমনিতেই মদ খাই। কবি হলে মদ-সিদ্ধি এসব খেতে হয়, বা কবি-শিল্পী হলে এসব খাওয়া যায়—এমন একটা ধারণা আমার হয়ে গিয়েছিল। নেশা করা সম্পর্কে এরূপ সমর্থন আমি পেয়েছিলাম মাইকেল এবং নজরুলের জীবন থেকে। কবিগুরু যে ঐরূপ নেশা করতেন না—এই বিষয়টাকে আমি শ্রেয় বলে আজও মানতে পারিনি। আমার এখনও মনে হয়, ঐ জায়গাটাতে একটা অনাধুনিক-রবীন্দ্রনাথের পরিচয় রয়ে গেছে। তবে বিদেশে গিয়েও রবীন্দ্রনাথ কোনোদিন মদ স্পর্শ করেননি, তা অবশ্য আমার মনে হয় না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অন্য অনেকের মতো আমিও অধীর অপেক্ষায় থাকি, কখন আবদুল আলীম শ্যামগঞ্জে আসবেন, আর আমরা তাঁর সঙ্গে বসে মদ খাবার দুর্লভ সুযোগ লাভ করে ধন্য হব। রাতে স্বপ্ন দেখি, আবদুল আলীমের সঙ্গে বসে মদ খাচ্ছি। তিনি মদের গেলাসে চুমুক দিয়ে গান ধরেছেন... 'হলুদিয়া পাখি সোনার বরণ পাখিটি ছাড়িল কে?'

ভোরের দিকে আমার ঘুম ভেঙে যায়। বিছানায় একা শুয়েছিলাম। হঠাৎ উপলব্ধি করি, আমার পাশে আরেকজন ভদ্রলোক শুয়ে আছেন। কে এই ভদ্রলোক? বাবুল? বাচ্চু এসেছে? না। শায়িত ব্যক্তির দেহাবয়ব আমার অচেনা এবং অন্যরকম। যিনি আমার সঙ্গে শুয়েছিলেন তিনিও টের পান যে, আমার ঘুম ভেঙে গেছে। তিনি তখন পাশ ফিরে আমার দিকে তাকান। আধো ঘুম আর আধো নিদ্রার মধ্যেই আমাদের মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় হয়। ভদ্রলোক আমার বয়সী। সদ্য গোঁফ-গজানো হাসি হাসি মুখ। তিনি আমার উদ্দেশ্যে হাত বাড়িয়ে দেন করমর্দনের জন্য। বলেন, আপনার পরিচয় আমি জানি, বাচ্চুর কাছে আপনার অনেক গল্প শুনেছি। আমাকে আপনি চিনবেন না, আমি বাচ্চুর বন্ধু। এক সঙ্গে পলিটেকনিকে পড়ি। আমার নাম মামুন।

বাচ্চুর মুখে বা অন্য কোথাও এমন নাম কখনও আমি শুনেছি বলে আমার স্মরণে আসে না। একটু সংকোচ বোধ করি। তখন মামুন জানায় যে, সমকাল, আজাদ এবং সংবাদে আমার কবিতা সে পড়েছে। আমি তার কথা শুনে অবাক হই। মামুন জানায়, সে কবিতা খুব পছন্দ করে, তবে তার নিজের প্রিয় বিষয় হচ্ছে নাটক। নাটক শুনে আমার মনটা একটু দমে যায়। ভাবি, নাটক আবার একটা বিষয় হলো নাকি? তবু সৌজন্যবশতই বলি, খুব ভালো। তাহলে তো একসময় আপনার সঙ্গে নাটক করা যাবে।

www.amarboi.com

তখন আকাশ ফর্সা হয়ে আসছে। আর নতুন করে ঘুমাবার কোনো সম্ভাবনা নেই। একটু পরেই একে একে এ বাড়িতে আসতে শুরু করবে সবাই। আজ অনুষ্ঠান। কত কাজ বাকি পড়ে আছে। সুতরাং নবাগতের সঙ্গে আলাপ করেই বাকি সময়টা কাটানো ভালো।

আমাদের আলাপের মধ্যেই ভেতর বাড়ি থেকে বাবুল উঠে এসে আমাদের আলাপের সঙ্গী হয়। বাবুল মামুনকে আগে থেকেই জানে। আমরা শিবানীর খুশিময় কণ্ঠস্বরও শুনতে পাই। দীর্ঘদিন পর বাচ্চুর শ্যামগঞ্জ আগমন হেতু ওর রাতে ভালো ঘুম না হবারই কথা। শিবানী আমাদের জন্য চা তৈরি করে নিয়ে আসে। যাকে বলে বেড টি। তার রাত-জাগা চোখেমুখে একটা ক্লান্ত লাজুকতা ও সতেজ আনন্দের ভাব খেলা করে। এই কাক-ডাকা ভোরে শিবানীর হাতের চা খেতে আমাদের খুব ভালো লাগে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিলখোলা আমুদে মানুষ মামুনকেও আমার ভালো লেগে যায়। কথা প্রসঙ্গে মামুন আমাকে জানায় যে, কণ্ঠস্বর পত্রিকার সম্পাদক আবদুল্লাহ্ আবু সায়ীদের সঙ্গে তার ভালো পরিচয় আছে। তিনি তেজগাঁও টেকনিক্যাল কলেজে অধ্যাপনা করেন। ঐ কলেজটি পলিটেকনিক কলেজের খুব কাছেই। আমি যদি এখানে না থেকে ঢাকায় যেতে চাই, তবে মামুন আমাকে সাহায্য করবে বলে কথা দেয়। আমরা একসঙ্গে পলিটেকনিক হোস্টেলে থাকব। সেখানে কোনোই অসুবিধে হবে না। বাচ্চু হলো আমাদের নেতা। বন্ধু। হোস্টেল-কলেজ সব আমাদেরই দখলে।

আমি মামুনকে জানাই যে, কণ্ঠস্বর সম্পাদক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ সাহেব আমার একটি চিঠির উত্তরে আমাকে একটি ছোট্ট চিঠি লিখেছিলেন। তাতে ঢাকায় গিয়ে তাঁর সঙ্গে আমাকে দেখা করতে বলেছিলেন। এ কথা শুনে মামুন বিছানায় উঠে বসে।

তা হলে তো আর কথাই নেই। সায়ীদ ভাই যখন আপনাকে যেতে বলেছেন, তখন নিশ্চিত ধরে নিতে পারেন ঢাকায় গেলে সেখানে আপনার একটা ব্যবস্থা হবেই। কণ্ঠস্বর পত্রিকার সঙ্গে আপনার সম্পর্ক গড়ে উঠলে আপনি ঢাকার অন্য পত্রিকাগুলোতেও লেখার সুযোগ পাবেন।

আমি মামুনের মধ্যে একজন নতুন বন্ধুকে খুঁজে পাই। বিছানায় পাশ ফিরে, প্রায় স্বপ্নের মধ্যে পেয়ে-যাওয়া ঐ বন্ধুটি যে আমার পরবর্তীজীবনের সঙ্গে ছায়ার মতো জড়িয়ে থাকবে, তা সেদিন আমাদের দুজনের কেউ-ই ভাবতে পারিনি। অনেক সময় মনে হয়, মামুনকে আমি স্বপ্নে পেয়েছিলাম। সে আমার স্বপ্নে-পাওয়া বন্ধু।

ফেরদৌসী বেগম, নীনা হামিদ এবং বশীর আহমদ আসেননি। তবে আবদুল আলীম, অজিত রায় এবং খন্দকার ফারুক আহমদ এসেছেন। এঁরা তিনজনই তখন প্রবল খ্যাতিমান। খন্দকার ফারুকের গাওয়া 'সেদিন তুমি কী যেন কী ভাবছিলে/ একলা বসে দ্বারে—' গানটি তখন আমাদের মুখে মুখে। অজিত রায় বিখ্যাত তাঁর উদাত্তকণ্ঠের গণসঙ্গীতের জন্য; আর আবদুল আলীমের খ্যাতির তো কথাই নেই—তিনি যা গান, তাই সুন্দর। গ্রামের মানুষ যে পয়সা জমিয়ে রেডিও কিনত, সে ঐ আবদুল আলীমের গান শুনবার জন্যই।

অনুষ্ঠানটি বেশ জমে ওঠে। দূর-দূরান্ত থেকে লোকজন আসে ঐ অনুষ্ঠান শুনতে। বিশেষ করে শিল্পী আবদুল আলীমের গান শুনে সকলের মন ভরে যায়। আমাদের আপ্যায়নে আবদুল আলীম সাহেব খুব সন্তুষ্ট হয়েছিলেন বলেই তিনি দর্শকদের অনুরোধে অনেকগুলো গান সেদিন গেয়ে শোনান। তিনি ভাটিয়ালি সুরে একটি উর্দু সিনেমার গান সেদিনের অনুষ্ঠানে গেয়েছিলেন।

'তেরে ইস নদিয়ামে মজগু কিয়া কিয়া রঙ্গ দেখায়ে...।'

তাঁর গাওয়া ঐ গানটি এখনও আমার কানে বাজে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনুষ্ঠান যখন শেষ হয় তখন রাত পোহাবার আর বেশি বাকি ছিল না।

আমি আমার ডায়েরিতে ঐ তিন শিল্পীর অটোগ্রাফ গ্রহণ করেছিলাম। শিল্পীরা তাদের সম্মানীর টাকা পকেটস্থ করে পরদিন সকালের ট্রেনেই ঢাকার উদ্দেশে রওয়ানা হন। তাদের সঙ্গে মামুনও চলে যায়। শিবানীর সঙ্গে নিভৃতে আলাপ করার লোভে পারিবারিক কাজের অজুহাতে বাচ্চু আরও দুদিন শ্যামগঞ্জে থাকে। কিন্তু আমাকে দুদিন পরেই শ্যামগঞ্জ ছেড়ে পালাতে হয়। তার কারণ নিম্নরূপ :

শ্যামগঞ্জের ঐ জলসা দেখার জন্য বারহাট্টা থেকেও লোকজন এসেছিল। তারা বারহাট্টায় ফিরে গিয়ে আমার কথা প্রচার করে। তারা আমাকে অনুষ্ঠান মঞ্চে কাজে অকাজে চলাফেরা করতে দেখে গেছে। সে-সংবাদ পুলিশের কান হয়ে আমার বাবার কানে পৌঁছায়।

ইতিমধ্যে পুলিশও একদিন আমাদের বাড়িতে যায় আনন্দমোহন কলেজ হোস্টেল থেকে চুরি করে নিয়ে যাওয়া একটি চেয়ার, কলেজ লাইব্রেরী এবং ইউসিস থেকে চুরি করা কিছু বই উদ্ধার করতে। পুলিশ এ তথ্যও সংগ্রহ করে যে, একসময় মেসের টাকা চুরি করার অপরাধে আনন্দমোহন কলেজ হোস্টেলে আমার বিচার হয়েছিল এবং জুয়া খেলার অপরাধে আমাকে হোস্টেল থেকে তাড়িয়ে দেয়া হয়েছিল। পুলিশ আমাদের বাড়ির অন্যসকল চেয়ারের সঙ্গে বৈসাদৃশ্যপূর্ণ হওয়ার অভিযোগে একটি চেয়ার এবং আনন্দমোহন কলেজ ও ইউসিসের সিল মারা কয়েকটি বই সিজ করে থানায় নিয়ে যায়। আমি যে দু'একবার লুকিয়ে রাতের অন্ধকারে গ্রামের বাড়িতে গেছি—সে সংবাদও পুলিশ পায়। খুব নিকটজনদের কাছ থেকেই যে পুলিশ এখন আমার সম্পর্কে তথ্য পাচ্ছে—এ ব্যাপারে আর সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

AMARBOI.COM

সুতরাং আর বিলম্ব না করেই আমার বাবা-মা, ভাইবোন এসে একদিন মিসিডিঙ্গি গ্রামে উপস্থিত হয়। সকলের একসঙ্গে আসার অর্থ, আমাকে ভারতের পথে বিদায় দেওয়া। আমাকে শ্যামগঞ্জে খবর পাঠানো হয়। খবর পেয়ে আমি মিসিডিঙ্গি যাই। স্থির হয় পরদিন ভোরের ট্রেনেই আমি জারিয়া-ঝাঞ্জাইলের পথে যাত্রা করব। যাত্রাপথে ব্যয় করার জন্য বাবা আমার হাতে একসঙ্গে বেশ কিছু টাকা তুলে দেন। তাঁর চোখে জল। বলেন, অনেক কষ্ট করে রুস্তম আলীর কাছে জমি গিরভি (বন্ধক) দিয়ে এই টাকা সংগ্রহ করেছি। আর নেই। এই টাকা দিয়েই তোকে ভারতে পৌঁছাতে হবে এবং সংগ্রাম করে দাঁড়াতে হবে সেখানে গিয়ে। পরে আমি আরও টাকা পাঠাতে চেষ্টা করব।

টাকার পরিমাণ কী ছিল, তা এখন মনে নেই। তবে একেবারে কমও নয়। পাঁচ শ টাকার কাছাকাছি হবে। পাঁচ ভরি স্বর্ণের মূল্যের সমান ছিল ঐ টাকা তখন।

আমার একবার মামুনের কথা মনে পড়ে। বাচ্চুর কথা মনে পড়ে। কিন্তু বাবা-মায়ের উদ্বেগবিদ্ধ মুখের সামনে আমি কোনো বিকল্প প্রস্তাব পেশ করার সাহস পাই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না। কেনু মাসির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে, ভোর রাতের দিকে আমরা রওয়ানা হই। গৌরীপুর থেকে আমরা জারিয়ার ট্রেন ধরব। আমি সোজা চলে যাব জারিয়া। অন্যরা শ্যামগঞ্জে নেমে মোহনগঞ্জের ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করবে। অর্থাৎ শ্যামগঞ্জ জংশন স্টেশনেই হবে আমার পরিবারের সঙ্গে আমার চূড়ান্ত বিচ্ছেদ।

আমার পলাতক জীবনের সবচেয়ে মর্মস্পর্শী মুহূর্তটি অভিনীত হয়েছিল ঐদিন ভোরে, শ্যামগঞ্জ রেলস্টেশনে। কয়েক জোড়া অশ্রুভরা চোখ সেদিন একযোগে তাকিয়েছিল জারিয়ার দিকে ছেড়ে যাওয়া ট্রেনটির দিকে। বারণ থাকার কারণে আমার ছোট ভাইবোনরা সেদিন মন খুলে কাঁদতেও পারছিল না। একটা বিন্দুর মধ্যে মিলিয়ে যাবার আগ পর্যন্ত আমি তাদের দিকে তাকিয়েছিলাম। তারা আমার দিকে।

স্টেশন ছাড়বার পরই একটি খেলার মাঠ। মাঠ পাড় হলেই শিবানীদের বাড়ি। ওদের বাড়ির একেবারে গা ঘেঁষেই ট্রেনটি যায়। ট্রেন থেকে ওদের বাড়ির ওঠান পর্যন্ত দেখা যায়। কিন্তু আমি ওদের বাড়ির দিকে ভালো করে তাকাই না। যদি শিবানীকে চোখে পড়ে? যদি অনজুকে বেনী দুলিয়ে হঠাৎ এ ঘর থেকে ও ঘরে ছুটে যেতে দেখে ফেলি? তৃষিতকে ঠাণ্ডা জল সরবরাহ করতে এসে, কাঁসার গ্লাসের তলায় 'না পারলে শেখায়ে নেবেন।'—কাঁচা হরফে লেখা একপঙক্তির এক চিরকুটের মাধ্যমে যে আমাকে চিরকালের করে পেতে চেয়েছিল, তাকে পেছনে ফেলে যেতে যদি আমার মন রাজি না হয়? তার জন্য ফিরে আসতে ইচ্ছে করে যদি?

ছেড়ে যখন যেতেই হবে, তখন মায়া বাড়িয়ে লাভ কী? তার চেয়ে ঢের ভালো এই ভুলে-যাওয়া। মনকে বুঝাই, মনে কর এই সবই স্বপ্ন। বাবা-মা, ভাইবোন, স্বপ্ন। এই জন্ম, স্বপ্ন। এই জন্মভূমি, স্বপ্ন। এই ভালোলাগা, স্বপ্ন। সত্য শুধু ছেড়ে যাওয়া। জীবনের ভালোলাগাগুলোকে, ভালোবাসাগুলোকে ছেড়ে নিষ্ঠুরের মতো দূরে চলে যাওয়া।

ট্রেন এসে জারিয়া-ঝাঞ্জাইল স্টেশনে থামে। এটাই এই লাইনের শেষ স্টেশন।

আগে দু'বার আমি এই পথে যাতায়াত করেছি। প্রথম ১৯৬০-এর দিকে গরমের ছুটিতে লীলাদির বাড়ি বাঘরায় বেড়াতে গিয়েছিলাম। বাঘরা ছিল ধোবাউড়া থানার অন্তর্গত একটি গ্রাম। ধনী হিসেবে ধোবাউড়ার সাহাদের খুব নামডাক ছিল। এদের মধ্যে সবচেয়ে বড় ধনী ছিলেন গৌরাঙ্গ সাহা। বাঘরার পাশের গ্রামটির নাম মনে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নেই। আমি ঐ গ্রামের এক বর্ধিষ্ণু হিন্দুর বাড়িতে বসে একরাত রামমঙ্গল গান শুনেছিলাম। আমার খুব ভালো লেগেছিল। ঐ এলাকাটিতে তখন বেশ হিন্দুর বাস ছিল। কলকাতার আনন্দবাজার পত্রিকায় কর্মরত সাহিত্যিক-সাংবাদিক শ্রীনিখিল সরকার (শ্রীপান্থ)-এর বাড়ি ছিল এই ধোবাউড়ায়।

পরে ১৯৬২ সালে, আমার আনন্দমোহন কলেজের সহপাঠী দুই বন্ধু শ্যামলেন্দু সরকার ও বাসুদেব ভট্টাচার্যের বাড়ি যাবার জন্য আমাকে জারিয়ায় নামতে হয়েছিল। ওদের বাড়ি দুর্গাপুর। জারিয়ায় নেমে কংশ পাড়ি দিয়ে ওপারে যেতে হতো। তারপর ট্রেনে আসা দুর্গাপুরের যাত্রীদের নিয়ে ওপার থেকে বাস ছাড়ত। বাস তো নয়, একেবারে মুড়ির টিন। বাসের মধ্যে মুড়ির মতোই গাদাগাদি হয়ে বসতে হতো যাত্রীদের। অতিক্রান্ত হয়ে গেছে বলে, আমার ঐ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা খুব সুখের ছিল বলেই এখন মনে পড়ে। স্মৃতি-ভ্রমণ সর্বদাই আসল ভ্রমণের চেয়ে সুখকর হয়। এখন ঐ পথের কী অবস্থা, জানি না।

আমি যখন জারিয়া-ঝাঞ্জাইল স্টেশনে নামলাম তখনও সকালের রেশ পুরোপুরি কাটেনি। মটকিলা ও নিম গাছের ডাল দিয়ে মেসওয়াক করতে করতে সদ্য নিদ্রা পরিত্যাগকারী নবীন মৌলবীরা স্টেশনে পায়চারি করছিল। রেস্টুরেন্টে ছিল নাস্তাকারীদের ভিড়। স্টেশনের পেছনের প্রভাতকালীন কাঁচাবাজারটি জমতে শুরু করেছে। ট্রেন থেকে নেমে আমি অনেকক্ষণ প্ল্যাটফরমে হাঁটাহাঁটি করছিলাম। উদ্দেশ্য ইঞ্জিন ঘুরিয়ে, ইঞ্জিনে জল ভর্তি করে ট্রেন যখন ময়মনসিংহের পথে যাত্রা শুরু করবে, তখনকার বিদায়-দৃশ্যটি দেখা।

AMARBOI.COM

স্টেশনমাত্রই আমার খুব প্রিয়। আমার জীবনের অনেকটা সময় কেটে গেছে রেলস্টেশনে আর রেলের কামরায়। কত মানুষের অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে স্টেশনে ট্রেন আসে। স্টেশন ছেড়ে চলে যায়। আমার খুব ভালো লাগে স্টেশনে বসে থেকে মানুষের ঐ আসা-যাওয়ার দৃশ্য দেখতে।

অপরিচিত মানুষের একটা আলাদা আকর্ষণ আছে। পরিচিত মানুষকে অনেক সময়ই খুব বিরক্তিকর লাগে। তার দিকে বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকা যায় না। অপরিচিত মানুষের চেহারার রহস্য ভেদ করতে করতে কাটিয়ে দেয়া যায় অনেক বেশি সময়। আমি বিভিন্ন রেলস্টেশনে বসে এ কাজ করতাম এবং তাতে প্রভূত আনন্দ পেতাম। সেখানে বসে ঝিমুতে থাকা যাত্রীদের মধ্যে একটা সুপ্ত গতিকে লক্ষ্য করতাম। আমার কেবলই মনে হতো, প্রপাতের অনন্ত জলধারার মতোই মানুষ যাচ্ছে আর যাচ্ছে। এ-যাওয়ার শেষ নেই।

কবি-দার্শনিকের মতো এইরূপ জীবনের গভীর তত্ত্বকথা ভাবতে ভাবতে, সকালের নাস্তা করবার জন্য প্রবেশ করলাম স্টেশনের রেস্তোরাঁয়। আমার পকেটে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনেক টাকা। ভাবলাম, ইচ্ছেমতো টাকা উড়াব। পরে কী হয় তা পরে দেখা যাবে। যতক্ষণ টাকা আছে উড়াব। যাদের জন্য আমার বুক ভরা মায়া ছিল, যে দেশকে আমি আমার হারানো মায়ের মতো ভালোবেসেছিলাম, তাদেরই যখন ফেলে চলেছি, তখন তুচ্ছ টাকার জন্য মায়া করা কি আমাকে মানায়? এখন তো আমি স্বাধীন। আমার বড় ভাইয়ের মতোই আমিও চলেছি মহাভারতের পথে। এই পথে আছে আমার অগ্রজের পদচিহ্ন। সবকিছু ভালোয় ভালোয় কাটলে, আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই তাঁর সঙ্গে আমার মিলিত হওয়ার কথা। দশ মাইল দূরের সুসুঙ-দুর্গাপুরে নয়, শ পাঁচেক মাইল পাড়ি দিয়ে আমি যাব পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার অন্তর্গত শিল্পনগরী দুর্গাপুর।

রেলগাড়িতে আমি পারতপক্ষে টিকিট কাটতাম না। বাবা সেটা জানতেন। এবার দেশ ছেড়ে যাচ্ছি, পুত্রের অমঙ্গলের আশংকায় বিচলিত বোধ করে তিনি কখন টিকিট কেটে আমার বুক পকেটে গুঁজে দিয়েছেন, টের পাইনি। টাকার সন্ধানে বুক পকেটে হাত দিতেই ঐ টিকিটটি পাওয়া গেল। বের করে টিকিটটি পড়লাম। একটা রেলটিকিট আর কতক্ষণ পড়া যায়? তবু সময় নিয়ে বারবার পড়লাম। খুব ভালো লাগল। মনে হলো, ঐ টিকিটের মধ্যে আমি আমার বাবার অপমানলাঞ্ছিত ব্যথিত পাণ্ডুর মুখটিকে দেখতে পাচ্ছি। জানি না, আবার কবে দেখা হবে আমাদের। রেস্তোরাঁর এককোণে বসে আমি নাস্তার অর্ডার দিলাম। ডিম-পরোটা।

হঠাৎ টের পেলাম, আমার কাঁধের উপর কে যেন হাত রেখেছে। স্বাভাবিক কারণেই আমার খুব ভয় পেয়ে চমকে ওঠার কথা। কিন্তু আমি ভয় পেলাম না। কেন যে পেলাম না! হয়তো এজন্যেই পাইনি যে, ঐ স্পর্শের মধ্যে একটা অভয় ছিল এবং ঐ অভয় বার্তা খুব দ্রুত আমার রক্তের ভিতর দিয়ে পৌঁছে গিয়েছিল আমার মস্তিষ্কের কোষে। পেছনে ফিরেই দেখি ইলিয়াস। আমার মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি। অনিদ্রায়-অনাহারে-অর্ধাহারে-অযত্নে-অবহেলায় আমার চোখ কোটরে ঢুকেছে। ইলিয়াসের একটু সন্দেহ ছিল—লোকটা আসলেই আমি কি-না। কিন্তু আমার ইলিয়াসকে সন্দেহ করার মতো কোনো কারণ ঘটেনি। সে একটুও বদলায়নি। প্রায় একইরকম আছে বরং স্বাস্থ্য ভালো হয়েছে একটু। গায়ের রঙে আরও একটু উজ্জ্বলতা লেগেছে। ইলিয়াস আমার নেত্রকোনা কলেজের বন্ধু—সহপাঠী। একইসঙ্গে সে বাচ্চুরও খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু।

আমি বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো দ্রুত উঠে দাঁড়ালাম। ইলিয়াস আমাকে তার প্রশস্ত বুকের ভিতরে জড়িয়ে ধরল।

'হারামজাদা, তুমি শালা শ্যামগঞ্জে থাইক্যা পিরিত কর। আর আমার এইহানে আস না। আমি তোমার সব খবর রাখি।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইলিয়াস মনের সুখে উপস্থিত সকলের সামনেই বকে যায় আমাকে। আমিও আনন্দ পাই ওর বকুনিতে। আমি যে শ্যামগঞ্জে পিরিতি করি—ইলিয়াসের মুখে তার স্বীকৃতির কথা শুনে আমার খুব ভালো লাগে। ইলিয়াসের উষ্ণ আলিঙ্গনের স্পর্শে আমার বুকে চেপে বসা একটা পাথর সরে যায়।

ইলিয়াস শিবানীকেও চেনে। বাচ্চুর সঙ্গে শিবানীর গভীর-গোপন সম্পর্কের কথা জানে। ডাক্তার নবদ্বীপ বাবুর সঙ্গে ওর ভালো সম্পর্ক। আমাদের একই বয়সী হলেও ইলিয়াসের আচরণের মধ্যে এমন একটা ভারিক্কি ভাব আছে; যার ফলে বয়স্করা ওকে আমাদের চেয়ে অধিক বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে করে। ইলিয়াসও বড়দের ঐ বিশ্বাসের মূল্য রাখে। যার ফলে ওকে কলেজে আমরা আমাদের গার্জেন বলে মানতাম।

ইলিয়াস বলল, তোর সব কথা আমি জানি। আমি জানতাম, একদিন না একদিন তুই এই পথে আসবি। তোকে আটকানোর জন্যই আল্লাহ্ আমাকে এখানে বসিয়ে রেখেছেন। তুই যাইতে পারবি না, আমার কাছে থাকবি। দেখি তোরে কোন শালায় ধরে।

ইলিয়াস একটু গোঁয়ার প্রকৃতির এবং নেতা টাইপের ছিল। সে ছিল শেখ মুজিবের ভক্ত। মুখে যা বলত তা সে বিশ্বাস করত এবং পালন করত।

অলঙ্ঘনীয় হিমালয়ের মতোই ইলিয়াস আমার পথ আগলে দাঁড়াল। আমি ইলিয়াসের আলিঙ্গনের মধ্যে বন্দি হয়ে গেলাম। মনে মনে বললাম, বাঁচা গেল। একটা বড় ফাঁড়া কেটেছে। আমি তো যেতে চাই না। আমি তো থাকতেই চাই। এই দেশ, এই জন্মভূমি ছেড়ে আমি কোথায় যাব? কেন যাব?

দেশত্যাগের পথে ইলিয়াসই ছিল আমার শেষ-বাধা। ঐ বাধার বিন্ধ্যাচলটিকে টপকানো গেল না। সে আমাকে নিয়ে গেল, যেখানে সে থাকে। গ্রামটির নাম মনে নেই। স্টেশনের কাছেই। চেয়ারম্যান সাহেবের বাড়ি। মুসলিম লীগের চেয়ারম্যান। ইলিয়াস ঐ বাড়িতে লজিং থেকে জারিয়া-ঝাঞ্জাইল হাইস্কুলে মাস্টারি করে। ইলিয়াসের জন্য একটা বড় চৌকারি ঘর ছেড়ে দেয়া হয়েছে। সেখানেই সে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে। ভিতর বাড়ি থেকে একটি নোলকপরা কাজের মেয়ে খাবার সময় তাকে খাবার দিয়ে যায়। প্রয়োজনে এটা ওটা ফাইফরমাশও খাটে। ইলিয়াস রাজার হালে আছে। আমি উপরি আসাতে ঐ মেয়ের কাজ কিছু বেড়ে যায়। কিন্তু তাতে সে মোটেও দুঃখিত হয় না। আমি তার প্রতি কৃতজ্ঞদৃষ্টি হানি। মুচকি হাসিতে সে আমার মুগ্ধ হাসির জবাব দেয়। দিনগুলো ভালোই কাটতে থাকে।

আমি আমার ভয়ের কথা ইলিয়াসকে বলি। ইলিয়াস বলে, কোনো ভয় নেই। মুসলিম লীগের চেয়ারম্যানের বাড়িতে থাকলে এদিকে পুলিশের দৃষ্টি পড়বে না—এটা তোর একটা উপরি লাভ। আমি বলব, তুই মাস্টারির খোঁজে এখানে আমার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাছে এসেছিস। স্কুলের হেড মাস্টার বা চেয়ারম্যান সাহেব কেউই তোকে মাস্টারি দিতে পারবে না। কেননা স্কুলে কোনো পোস্ট খালি নেই। তাতে হবে কি, তুই যদি কিছুদিন আমার কাছে পড়েও থাকিস, কেউ কিছু বলতে পারবে না। ভাববে, বেকার অভাবী লোক অন্নের লোভে বন্ধুর কাছে পড়ে আছে। যারা তোর ওপর চাপ সৃষ্টি করতে পারে, চাকরি চেয়ে তুই আগেভাগেই তাদের ওপর চাপ রাখবি—তাতে ভালো কাজ হবে। হাতের কাছে পেয়েও তোর মতো যোগ্য ব্যক্তিকে স্কুলে শিক্ষক হিসেবে নিতে না পারার কারণে চাপের মধ্যে থাকবে ওরা।

ইলিয়াসের কথা শুনে আমি ওর বুদ্ধির তারিফ করি। চমৎকার কৌশল তো।

আমি একনাগাড়ে প্রায় দিন পনের কাটিয়ে দিই ইলিয়াসের কাছে। মহা আনন্দে এবং পরম নিশ্চিন্তে। আমি কবিতা লিখতাম এবং ইলিয়াসকে পড়ে শোনাতাম। সে আমার কবিতার ভক্ত ছিল। আমার মতোই ইলিয়াসও বিশ্বাস করত মুজিবের নেতৃত্বে বাঙালিরা পাকিস্তানিদের শোষণ-বঞ্চনার হাত থেকে একদিন মুক্তি লাভ করবে। সে বিশ্বাস করত, আগামী দিনগুলোতে শেখ মুজিবকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হবে বাঙালির স্বপ্ন ও সংগ্রাম।

পাকিস্তানের সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়কে যে সুকৌশলে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিকে পরিণত করা হয়েছে, ইলিয়াস সেজন্য ঐ বিষয়টি নিয়ে আমার সঙ্গে আলোচনা করতে খুব লজ্জিত বোধ করত। ওর মধ্যে এক ধরনের অপরাধবোধ কাজ করত, যা খুব উন্নত পর্যায়ের মানুষদের মধ্যেই শুধু দেখা যায়। হিন্দুরা সরকারি অনুমতি ছাড়া তখন নিজের বাড়ি-জমি বিক্রি করতে পারত না। এনিমি প্রপার্টি এ্যাক্ট চালু করে হিন্দুদের সম্পত্তির উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছিল। তাদের শরিকদের মধ্যে কারও ভারতে চলে যাবার অজুহাত দেখিয়ে, তাদের একান্নভুক্ত জমি কেড়ে নিয়ে মুসলিম লীগের প্রভাবশালী লোকদের মধ্যে লিজ দিয়ে দেয়া হচ্ছিল। ঐ এনিমি প্রপার্টি আইনের ফাঁদে পড়ে অনেক হিন্দু তার পৈত্রিক ভিটেবাড়ি থেকে উচ্ছেদ হয়ে যাচ্ছিল। আমাদের ময়মনসিংহের বাসা নিয়েও তখন বেশ প্রবলেম হয়। আমার বড় ভাই এবং আমার এক জেঠতুতো ভাই ভারতে চলে গিয়েছিলেন, শুধু এই ভারত-জুজুর ভয় দেখিয়ে আমাদের ময়মনসিংহের বাসাটিকে এনিমি প্রপার্টি ঘোষণা করার পায়তারা চলে। ইতিমধ্যে জেঠামশাই মারা যান। জেঠিমা তখন মোনায়েম খান সাহেবের ভাগনে বা ভাতিজা জনৈক খোকা সাহেবের হাতে ঐ বাসা জলের দামে তুলে দেন শুধু এই শর্তে যে, তাঁর অংশের টাকাটা ভারতে পাচার করার ব্যাপারে তিনি ঐ প্রতাপশালী ক্রেতার সহায়তা লাভ করবেন।

আমি ইলিয়াসকে বলি, তুমি কি জানো, এই আইনের কারণে হিন্দুরা দ্রুত তাদের সম্পত্তি হারাবে এবং হিন্দুর বাড়ি-জমির দখল নিয়ে দেশের বিভিন্ন স্থানে হিন্দু-মুসলমান শুধু নয়, মুসলমান-মুসলমানের মধ্যেও দাঙ্গা-ফ্যাসাদের সৃষ্টি হচ্ছে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি তাকে জানাই যে, এ রকমের একটি ঘটনায় আমি নিজেও একবার একটি মামলায় আসামী হয়ে পড়েছিলাম। মামলার আসামী হওয়াটা আমার জন্য নতুন নয়। আমার পাশের বাড়ির এক জ্ঞাতি বড়ভাই, তাকে আমরা যাদুদা বলে ডাকতাম। যাদুদা আমার কবিতার ভক্ত ছিল, ফলে তার সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছিল খুবই মধুর। যাদুদার অনেক জমি ছিল। তার ভাইদের মধ্যে কেউ কেউ ভারতে চলে গিয়েছিল---, এই কারণে তার জমি সরকারের কাছ থেকে লিজ নিয়ে আসা একদল রিফুজি (ওরা ভারত থেকে আসা রিফুজি ছিল না, ওরা ছিল গফরগাঁও এলাকা থেকে যাওয়া একদল ভূমিহীন কৃষক, সরকারি মদদেই ওরা স্পর্শকাতর রিফুজি পরিচয় ধারণ করত) জোর করে দখল করতে আসে। আগে থেকেই খবর পাওয়াতে আমরা ছিলাম প্রস্তুত। আমরা সদলবলে তাদের বাধা দিই। এক সকালে যাদুদার জমি নিয়ে একটা খণ্ডযুদ্ধ বেঁধে যায়। আমাদের সঙ্গে গ্রামের ভালো মুসলমানরাও ছিল। আমাদের সঙ্গে যুদ্ধে না পেরে ঐ রিফুজিরা তখন তাৎক্ষণিকভাবে রণে ভঙ্গ দেয়। কিন্তু কিছুক্ষণ পর তাদের বাড়িঘরে আগুন জ্বলতে দেখা যায়। ওরা নিজেরাই নিজেদের ঘর-বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেয় এবং আমাদের প্রায় পঞ্চাশ-ষাট জনকে আসামী করে বারহাট্টা থানায় গিয়ে একটি মিথ্যা মামলা রুজু করে। আমরা তখন 'আগুনে মামলার' হাত থেকে বাঁচবার জন্য বাধ্য হয়ে রাতের অন্ধকারে নেত্রকোনায় পালিয়ে যাই এবং সারারাত জেগে কাটিয়ে পরদিন ভোরে শ্রীশ মোক্তারের নেতৃত্বে কোর্টে হাজির হই এবং জামিনের জন্য কাঠগড়ায় দাঁড়াই। আমাদের ভাগ্য ভালো, মহামান্য হাকিম আমাদের জামিন মঞ্জুর করেছিলেন। তা না হলে আমাদের নির্ঘাত জেলের ভাত খেতে হতো।

ইলিয়াসকে আমি ঐসব দুঃখের ঘটনার কথা বলি। বলি যে, হিন্দুরা এ দেশে থাকুক তা পাকিস্তান সরকার চায় না। তারা পূর্ব পাকিস্তানকে হিন্দুমুক্ত একটি সাচ্চা মুসলিম দেশ হিসেবে দেখতে চায়।

ইলিয়াস আমার কথায় সায় দেয়। বলে, জানি তুই ঠিকই বলেছিস। ওরা তাই চায়। তবে এটাও ঠিক যে, ওরাই তো আর শেষ কথা নয়। আমরাও আছি। আমরা এক সঙ্গে লড়াই করব। যেমন মুসলমানদের সঙ্গে নিয়ে তোরা লড়াই করেছিস তোদের গ্রামে। এই মাটিতে জন্ম নেয়া প্রতিটি বৃক্ষের মতো প্রতিটি মানুষই সমান। ধর্মবর্ণগোত্র নির্বিশেষে এর প্রতিটি নাগরিকের অধিকার সমান। অবস্থার পরিবর্তন হবেই, তুই দেখিস। তোর কাজ হলো ভালো কবিতা লেখা। তুই কবিতা লিখবি মানুষের ঘুম ভাঙানোর জন্য। পুলিশের ভয়ে তুই যদি দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাস, এ কাজ করবে কে?

ইলিয়াসের কথায় আমি নতুন করে উজ্জীবিত বোধ করি। সে আমার সামনে নতুন কর্তব্য এনে হাজির করে। এক ইলিয়াসের মধ্যে আমি তখন লক্ষ ইলিয়াসকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেখতে পাই। ভারতে যাবার চিন্তাটাকে মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে সিদ্ধান্ত নিই, আমি ঢাকায় যাব। গানের সুরে বলি, এবার ঢাকায় চল মন আমার।

যে ক'দিন ইলিয়াসের সঙ্গে ছিলাম আমাকে সে একটি পয়সাও খরচ করতে দেয়নি। ফলে আমার বাবা আমাকে ভারতে যাবার জন্য যে টাকাটা দিয়েছিলেন, তার পুরোটাই আমার কাছে থেকে যায়। উপরন্তু ঢাকার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হবার সময় ইলিয়াস আমাকে জিন্নাহর মাথাওয়ালা এক শ টাকার একটি নোট উপহার দেয়, যাতে ঢাকায় গিয়ে শুরুতেই আমি টাকার অভাবে কষ্ট না করি। আমি যখন ইলিয়াসের কথা লিখছি কৃতজ্ঞতার ভারে আমার মন তাঁর স্মৃতির প্রতি নত হচ্ছে।

ইলিয়াস ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেয়। সে অস্ত্র হাতে লড়াই করে। এবং মোহনগঞ্জ এলাকায় মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্ব দেয়। সে ছিল একজন সফল কোম্পানি কম্যান্ডার। স্বাধীনতার পর ইতিহাস বিকৃতির অর্থকরী রাজনীতির কাছে সে মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ ও চেতনাকে বিকিয়ে দেয়নি। তাঁর আকস্মিক অকাল-মৃত্যুর আগ পর্যন্ত (জানুয়ারি ১৯৯৩) সে ছিল নেত্রকোনা জেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদের সভাপতি এবং বহু মানুষের একান্ত শ্রদ্ধার পাত্র।

AMARBOI.COM

ইলিয়াসের সঙ্গে আমার শেষ দেখা

দীর্ঘদিনের যোগাযোগহীনতার পর আমার সঙ্গে ইলিয়াসের হঠাৎ দেখা হয় তাঁর মৃত্যুর মাত্র কয়েকদিন আগে, জানুয়ারি ১৯৯৪। পক্ষকালব্যাপী পৌষমেলার অনুষ্ঠানমালায় ঐদিন ছিল মরহুম খালেকদাদ চৌধুরীর সাহিত্যকর্ম নিয়ে আলোচনা। আমি সেই অনুষ্ঠানে গিয়েছিলাম। সন্ধ্যায় অনুষ্ঠান সেরে রাতেই ঢাকায় ফিরে আসব বলে আমার খুব তাড়া ছিল। মোক্তারপাড়া মাঠে অনুষ্ঠান শেষে শিল্পকলা একাডেমির অফিসে বসে চা খাচ্ছি। ভিড়ের মধ্যে ইলিয়াস এলো। সঙ্গে একটি ছেলে ও একটি মেয়ে। ইলিয়াস আগের মতোই আছে। তবে একটু মুটিয়ে গেছে। আমি ওঁর সঙ্গে আলিঙ্গন করলাম। ইলিয়াস বলল, 'আমার ছেলে-মেয়েদের তোকে দেখাইতে নিয়া আইছি। এদের অটোগ্রাফ দে। তোর কথা আমি সব সময় এদের কাছে বলি।'

আমি খুব আদর করে ইলিয়াসের ছেলে এবং মেয়ের অটোগ্রাফ খাতায় অটোগ্রাফ দিলাম। ঢাকায় ফেরার তাড়া ছিল বলে ইলিয়াস আমার সঙ্গে যতটা সময় আশা করেছিল, আমি তাঁকে ততটা সময় দিতে পারিনি। আমি ওঁকে আমার ঢাকার ঠিকানা দিয়ে এসেছিলাম ঢাকায় এলে আমার সঙ্গে দেখা করার জন্য। ইলিয়াস ঢাকায় এলে আমার সঙ্গে দেখা করবে বলে কথা দিয়েছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমার, ওটাই ছিল ইলিয়াসের সঙ্গে আমার শেষ দেখা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একদিন রাতে বাসায় ফিরে অভ্যাসবশত খবর শোনার জন্য টিভি অন করেছি। হঠাৎ একটি মৃত্যু-সংবাদ শুনে চমকে উঠি। 'আজ হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে নেত্রকোনা মুক্তিযোদ্ধা সংসদের সভাপতি জনাব ইলিয়াস আহমদ চৌধুরী ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহ ..... রাজেউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৪৯ বছর..... ।'

টিভির পর্দায় ইলিয়াসের কোনো ছবি দেখান হয়নি। কিন্তু আমার মনের পর্দায় ইলিয়াসের মুখখানা বারবার ভেসে ওঠে। প্রিয়-বন্ধুর অন্তর্ধানের বেদনায় আমি নিজের ভিতরে এক অসীম শূন্যতাকে অনুভব করি। আহা, মৃত্যুর এত কাছাকাছি বাস করে মানুষ! পৌষমেলার নামে ইলিয়াসের মৃত্যুই কি সেদিন আমাকে শেষবারের মতো ওঁর ক্ষণিক-সান্নিধ্যে টেনে নিয়ে গিয়েছিল?

AMARBOI.COM

বাবাকে কথা দিয়েছিলাম যত দ্রুত সম্ভব ভারতে পৌঁছেই তাঁকে চিঠি লিখে দুশ্চিন্তামুক্ত করব। কিন্তু কোথায় ভারত? ইলিয়াস আমার সমস্ত প্ল্যান উল্টেপাল্টে দিল। আমি যে ভারতে যাবার সিদ্ধান্ত আপাতত পরিবর্তন করেছি, সে-কথা জানিয়ে বাবাকে নতুন করে দুশ্চিন্তায় ফেললাম। বাবা পাক-পুলিশের আওতার বাইরে আমাকে পাঠিয়ে দিয়ে বাবা কিছুটা নিশ্চিন্ত বোধ করতে চেয়েছিলেন। তাই অনিচ্ছা সত্ত্বেও তিনি চেয়েছিলেন আমি যেন দেশ ত্যাগ করি। আমি জানি, স্বাভাবিক অবস্থায় তিনি এমনটি কখনই চাইতেন না। আমার বড় ভাই, খুব অল্প বয়সে ভারতে চলে গিয়েছিলেন, এই নিয়ে বাবাকে কম ভোগান্তির শিকার হতে হয়নি। তাঁর বড় পুত্রের জন্য বাবার দুশ্চিন্তার অবধি ছিল না। আমার বড় ভাই মাঝে-মাঝেই টাকার জন্য বাবার কাছে চিঠি লিখতেন। নানা পথে বাবা তার জন্য টাকা পাঠাবার চেষ্টা করতেন। কখনও পাঠাতেন। অনেক সময় অভাবহেতু টাকা পাঠাতে পারতেন না। এই না পারার বেদনা ছিল তার মধ্যে। আমি ভারতে গেলে সমস্যা আরও বাড়বে। কোথায় গিয়ে উঠব, কে আমার খরচ বহন করবে, আমার লেখাপড়ার কি হবে— এইসব নিয়ে বাবার দুশ্চিন্তা ছিল। তবুও ডাকাতির মামলা বলে কথা। কথায় বলে পুলিশে ছুঁলে আঠার ঘা। তাই কোনো উপায়ান্তর না দেখেই যে তিনি আমাকে ভারতে নির্বাসনে পাঠাতে রাজি হয়েছিলেন, তা বলাই বাহুল্য। কোনোমতে দেশে থেকে যেতে পারলে যে তিনি খুশি হবেন— তা আমার জানা ছিল।

তবু আমি আমার পরিবর্তিত সিদ্ধান্তের কথা বাবাকে না জানাবার সিদ্ধান্ত নিলাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি ভূপৃষ্ঠের সঙ্গে যোগাযোগ হারিয়ে-ফেলা মহাশূন্য খেয়ার মতো নিজেকে বেওয়ারিশ ঘোষণা করলাম। ভাবলাম আমার কোনো বাবা-মা নেই, আমার কোনো ভাইবোন নেই। এ জগতে কোনোকালে আমার আপনজন বলে কেউ ছিল না। আমি স্বয়ম্ভু। কেঁচোর মতো, আমি নিজের ভিতর থেকেই নিজে জন্ম গ্রহণ করেছি। আমি কবি। কবির আবার মা-বাবা কি? ভাইবোন কি? সে যে জন্মভূমির কথা এখনও আবেগসহকারে ভাবে—এটাই দেশের ভাগ্য। এমন উন্মূল ভাবনার মধ্যে যে গভীর যন্ত্রণা আছে, বেদনাবোধ আছে—এখন মনে হলেও তখন আমার তা মনে হয়নি। আমি নিজেকে জনারণ্যে হারিয়ে যাওয়া একজন মানুষ বলে ভাবতে শুরু করলাম।

এইভাবে হারিয়ে যাওয়া এবং পরিবার থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন ভাববার ক্ষেত্রে আমাকে সাহায্য করেছিল আমার মায়ের অকালমৃত্যুর স্মৃতি এবং আমাদের পরিবারের একটি ঘটনা। আমার ঠাকুরদাদা দুই বিয়ে করেছিলেন। তাঁর প্রথম পক্ষের স্ত্রীর গর্ভে দুই পুত্রের জন্ম হয়েছিল। তাঁর দ্বিতীয় পুত্র, আমার জেঠামশাই একদিন অজানা কারণে গৃহত্যাগ করে চিরদিনের জন্য হারিয়ে গিয়েছিলেন। সে আমার জন্মের অনেক অনেক আগের ঘটনা। কিন্তু আগের হলে কি হবে? ঘটনা ঘটনাই। লোকমুখে কথিত আছে, তিনি সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। আমি সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করার কথা ভাবিনি। তবে পারিবারিকভাবে গোপন রাখা ঐ রহস্যময় ঘটনাটি আমার ওপর খুবই প্রভাব ফেলেছিল। ভাবলাম, আমার হারিয়ে-যাওয়া জেঠামশাইয়ের পথই আমারও পথ হোক। ক্ষতি কি? জীবনকে নতুনভাবে, একেবারে শূন্য থেকে শুরু করার মধ্যে একটা আলাদা আনন্দ আছে। আমি সেটা প্রাণভরে উপভোগ করব। পরিবারের সঙ্গে যুক্ত থেকে আমি যখন পরিবারের জন্য বিপদ আর বদনাম ডেকে আনা ছাড়া কিছুই করতে পারছি না, তখন নিজেকে পরিবার থেকে বিযুক্ত করে দেখি, কিছু লাভ হয় কি না।

আমার তখন মনে হয়েছিল যে, একটা পারিবারিক ছককে কেন্দ্র করে আমার মধ্যে জীবন নামক যে-শিল্পবস্তুটির বিকাশ ঘটেছে, তার সত্তার ওপর আমারই একচ্ছত্র অধিকার। অন্য যারা আমার জীবনের সঙ্গে জন্মসূত্রে সংশ্লিষ্ট,—তাদের প্রতি সময় পেলে এবং সম্ভব হলে আমি আমার বিবেচনামতো কর্তব্য করব; কিন্তু তা আমার জন্য বাধ্যতামূলক হতে পারে না। নশ্বর জীবনের গায়ে কিছুটা হলেও অনশ্বরতার ছোঁয়া লাগানোর সাধনাই হবে আমার সাধনা। আমার পরিবার যদি সে-পথের অন্তরায় হয়—আমি পরিবারকে ত্যাগও করতে পারি। সে অধিকার আমার আছে।

আমার মনে হলো, পরিবার হচ্ছে একটা ছোটো জিনিস। ডিমের খোলসের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসা পক্ষীশাবকের মতো মানুষকেও এক পর্যায়ে পরিবারের খোলসের ভিতর থেকে বাইরে বেরিয়ে আসতে হয়। পরিবারের প্রতি দায়বদ্ধতার ধারণাটি খুবই আপেক্ষিক এবং প্রশ্ন-সাপেক্ষ বলেই আমার মনে হয়। ভালোবাসা,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্নেহ-মায়া-মমতার ছদ্মবেশে এটি তৃতীয় বিশ্বের মানুষদের মধ্যে চালু একটি অতিশয় দরিদ্র-ধারণা। এই ধারণা পাল্টাতে হবে। এইসব দীন-ধারণার হাত থেকে প্রাচ্যের মানুষের মনকে মুক্ত করতে হবে। পাশ্চাত্যের মানুষদের মধ্যে এই ধারণার অবসান ঘটেছে বলেই তারা বড় কিছু করতে পারছে। আমারও তেমনটিই করার চেষ্টা করা উচিত।—এইভাবে নিজেকে বুঝিয়ে, পিতৃআজ্ঞা লঙ্ঘনের পক্ষে নিজের মনের মধ্যে যুক্তি সংগ্রহ করে আমি ঢাকার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হই। পিতৃআজ্ঞা পালনের জন্য রাম বনে গিয়েছিলেন, আর আমি পিতৃআজ্ঞা লঙ্ঘন করে চললাম ঢাকার পথে। এখানেই বাল্মীকির রামের সঙ্গে আমার রামের পার্থক্য।

ঢাকা পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী। ঢাকা ক্রমশ বড় হচ্ছে। এখন ঢাকাকে কেন্দ্র করে কলকাতার বিকল্প একটি নতুন সাহিত্য-পরিমণ্ডল গড়ে উঠতে শুরু করেছে। পাকিস্তানবাদী-সাম্প্রদায়িক সাহিত্যের ধারাটি এখন আর ঢাকা-কেন্দ্রিক সাহিত্য-আন্দোলনের মূলধারা নয়। ঐ ধারাটি এখন গৌণ ধারায় পরিণত হয়েছে। ক্রমে সেক্যুলার সাহিত্যের ধারাটিই যে এখানে প্রবল হয়ে উঠবে, তার লক্ষণ স্পষ্ট হচ্ছে। সুতরাং কলকাতা নয়, ঢাকাই হোক আমার কর্মক্ষেত্র।

বিশ্ব-সাহিত্যের ইতিহাস থেকে এটাই দেখা যায় যে, সাহিত্য সর্বদা স্বভূমির রাজধানীকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়, বিকশিত হয়। সর্বদেশে, সর্বকালে তা দেখা গেছে। সাহিত্যক্ষেত্রে কিছু করতে হলে অবশ্যই আমাকে ঢাকায় যেতে হবে। সেখানে থাকতে হবে। মফস্বল শহরে রাজার হালে থেকেও কোনো লাভ নেই। এখানে পড়ে থাকলে আমি সত্যি সত্যিই একদিন ডাকাতে পরিণত হব।

মনে মনে স্থির করলাম, ঢাকায় গিয়ে আমি উঠব বাচ্চু আর মামুনের কাছে। তেজগাঁও পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট হোস্টেলে। তারপর মামুনকে সঙ্গে নিয়ে কণ্ঠস্বর পত্রিকার সম্পাদকের সঙ্গে দেখা করব। নিশ্চয়ই সেখানে আমার কিছু একটা কাজ জুটে যাবে। না জুটলে রিক্সা চালাব।

শ্যামগঞ্জ এবং গৌরীপুরে আমার অনেক প্রিয় স্মৃতি ছিল। তারা আমাকে বারবার ট্রেনের কামরা থেকে টেনে স্মৃতির কোমল মাটিতে নামিয়ে নিতে চেয়েছিল। আমি নামিনি। আমি চোখ বন্ধ করে রেখেছি। ময়মনসিংহে নেমেছিলাম দুটো কারণে। ১. এখানে ঢাকার ট্রেন বদল করতে যাত্রীদের নামতে হতো। ২. আনন্দমোহন কলেজের হোস্টেলে আমার কিছু প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ছিল, যা সঙ্গে নিয়ে যাওয়া দরকার। আর কবে ময়মনসিংহ ফেরা হবে, কে জানে? ময়মনসিংহে আমি আর ফিরতেও চাই না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্টেশন থেকে নেমে আমাদের বাসার সামনে দিয়েই আনন্দমোহন কলেজে যেতে হয়। পারতপক্ষে আমি বাসায় যেতাম না। সেদিনও যাইনি। কেন যে গেলাম না। গেলে টুকুদিকে শেষবারের মতো দেখতে পেতাম।

টুকুদি আমার জেঠতুতো বোন। আমার সঙ্গে টুকুদির একটা চমৎকার সম্পর্ক ছিল। সে ছিল আমার চেয়ে বছর তিনেকের বড়। বিএ-বিএড পাস করে টুকুদি একটি প্রাইভেট স্কুলে মাস্টারি নিয়েছিলেন। তাঁর তখনও বিয়ে হয়নি, বিয়ের কথাবার্তা চলছিল। হোস্টেলে গিয়ে আমার সহপাঠী অনিমেষের কাছে শুনি আজ দুপুরের দিকে আমার সেই প্রিয় টুকুদি মারা গেছেন। তাঁর পাকস্থলিতে টিউমার হয়েছিল—শুনেছিলাম কোনো একদিন ছোটখাটো ধরনের একটা অপারেশন হবে। ঐ সাধারণ অপারেশনটি তাঁর মৃত্যুর কারণ হতে পারে, তা আমরা কেউই ভাবিনি। খবরটা শুনে মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। ছুটলাম বাসায়। সেখানে গিয়ে শুনি টুকুদিকে শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে অনেক আগেই। আমি দৌড়ালাম কেওয়াটখালির শ্মশানের উদ্দেশ্যে। রিক্সা নেবার কথা আমার মনেই পড়েনি। আমি যখন শ্মশানে পৌঁছলাম ততক্ষণে পুরো কাচের চশমায় ঢাকা টুকুদির স্বপ্নভরা চোখ দুটো চিতার আগুনে পুড়ে ছাই হবার আর বেশি বাকি ছিল না।

ঐ টুকুদিই ডাক্তারি না পড়ে কবি হওয়ার দিকে আমাকে প্ররোচিত করেছিলেন। আমার জেঠতুতো ভাইবোনদের মধ্যে একমাত্র টুকুদিই আমাকে কবি হিসেবে একটু মর্যাদা দিত। ফলে আমিও আমার মনের মধ্যে তাঁর প্রতি এক ধরনের দুর্বলতা পোষণ করতাম। টুকুদি তাঁর বান্ধবীদের কাছে গর্ব করে বলত, আমার এই ভাইটি হচ্ছে কবি।

পরদিন ভোরে আমি ঢাকার উদ্দেশ্যে ময়মনসিংহ ত্যাগ করি।

মনের ভিতরে অনেক স্মৃতির পিছুটান কাজ করে—, তারা আমার এগিয়ে চলা থামিয়ে দিতে চায়। কিন্তু আমি পেছন ফিরে তাকাই না। আমি নতুন স্বপ্নে বুক বাঁধি। সেই স্বপ্ন হচ্ছে কবি হওয়ার স্বপ্ন। আমি বেশ বুঝতে পারি যে, এই বৈরী-রাষ্ট্রব্যবস্থায় আমার পক্ষে কবি ছাড়া আর কোনো কিছুই হওয়া সম্ভব নয়।

[ইতি সমাপ্ত ঢাকা-পূর্ব পর্ব]

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি যখন ঢাকায় পৌঁছলাম তখন দুপুর। চতুর্দিকে চিক চিক করছে রোদ। শোঁ-শোঁ করছে হাওয়া। তেজগাঁও স্টেশনে নেমে পায়ে হেঁটেই পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের হোস্টেলে চলে গেলাম। বাচ্চু আর মামুন আমাকে লালগালিচা সম্বর্ধনা দিয়ে গ্রহণ করল। শুরু হলো আমার ঢাকার জীবন। বাচ্চু আমার পুরনো বন্ধু। কিন্তু সে শুধু আমার বন্ধুই। ঢাকার শিল্প-সাহিত্যের আন্দোলনের সঙ্গে ওর কোনো সম্পর্ক ছিল না। ওর জগতজুড়ে ছিল শিবানী আর শিবানী। ও ছিল ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক। শিল্প-সাহিত্যের নতুন আন্দোলনের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল মামুন। মামুনুর রশীদ। নাটক-পাগল মামুনুর রশীদ। বাচ্চু আমাকে মামুনের হাতে সঁপে দেয়। মামুন পরম বন্ধুর মতো তার সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয় আমার দিকে। এই নতুন বন্ধুটিকে পাওয়ার ফলে আমি ঢাকার চাবিটি আমার হাতের মুঠোর মধ্যে পেয়ে যাই।

আমি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের হোস্টেলের তিন তলায় থাকি। মামুন আর বাচ্চু একই রুমে থাকত। দিনরাত সেখানে আড্ডা হয়। ওখানে ছাত্রদের মধ্যে যাদের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল তাঁদের মধ্যে ঘানা, শামীম, হাসান ফেরদৌস, মুন্সীগঞ্জের বাচ্চু—এদের কথা মনে পড়ে। আরও একজনের কথা আমার খুব মনে আছে, কিন্তু আমি তার নাম বলছি না এজন্য যে, সে ছিল খুবই সাম্প্রদায়িক। সে আমাকে একদিন 'মালাউন' বলে গাল দিয়েছিল এবং বলেছিল যে, এটা হচ্ছে মুসলমানদের দেশ—আমি যেন অবিলম্বে ভারতে চলে যাই। তা না হলে আমার বিপদ হবে। সে-কথা বাচ্চু বা মামুনকে বলিনি। আমার মনটা একেবারে ভেঙ্গে পড়েছিল ওর কথা শুনে। ঐ রাতে আমি একটুও ঘুমাতে পারিনি, খুবই অপমানিত এবং লজ্জিত বোধ করেছিলাম। নিজেকে অপরাধী বলেও মনে হচ্ছিল আমার। মনে হচ্ছিল, কী জানি মুসলমানদের জন্য একটি হিন্দুমুক্ত বঙ্গভূমি বোধহয় সত্যি সত্যি দরকার। তাদের ঐ চাহিদা পূরণের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করাটা আমার হয়তো উচিত হচ্ছে না। হাতের কাছে মহাভারত থাকতে, চটি বইয়ের মালিকানা নিয়ে মুসলমানদের সঙ্গে কামড়াকামড়ি করাটা কি ভালো? আমি কেন যে জন্মগ্রহণ করেছিলাম এই পোড়া দেশে, ভাবতে-ভাবতে বাথরুমে ঢুকে আমি সেদিন লুকিয়ে কেঁদেছিলাম। জানি না, ঐ রাত্রির অশোভন ও অমানবিক আচরণের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জন্য আমার ঐ বন্ধুটি অনুতপ্ত বোধ করেছিল কি না। ঐরূপ অমর্যাদাকর পরিস্থিতি আমি জীবনে আরও বহুবার মোকাবিলা করেছি। আমার খুব খারাপ লেগেছে। কিন্তু পরে যথারীতি ভুলে গেছি। আমার মধ্যে জন্মভূমির প্রতি খুব বাজে এক-ধরনের দুর্বলতা কাজ করত। ওই জায়গাটায় আমি ছিলাম খুবই অসহায়।

একদিন সন্ধ্যায় মামুন আমাকে নিয়ে গেল তেজগাঁও ইন্টারমিডিয়েট কলেজের হোস্টেলে। পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের খুব কাছেই সেই কলেজটি। কণ্ঠস্বর পত্রিকার সম্পাদক আব্দুল্লাহ আবু সায়ীদ ঐ কলেজের বাংলার অধ্যাপক। হোস্টেলে থাকেন। সায়ীদ ভাইয়ের সঙ্গে মামুনের পরিচয় ছিল। তা ছাড়া গ্রাম থেকে লেখা আমার পত্রের উত্তরে ঢাকায় এসে তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্য সায়ীদ ভাই আমাকে লিখেছিলেন। তাই আমার সম্পর্কেও তাঁর একটা মানসিক প্রস্তুতি আগে থেকেই ছিল। পরিচয়মাত্র সায়ীদ ভাই আমাকে তাঁর স্বভাবসুলভ কৌতুকমিশ্রিত হাসিতে আপন করে নিলেন। বললেন, কণ্ঠস্বর পত্রিকার কিছু ছোটখাটো কাজ : যেমন বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করা, সম্পাদকের চিঠি নিয়ে বিভিন্ন লেখক ও বিজ্ঞাপন-প্রতিষ্ঠানের কাছে যাওয়া, বিজ্ঞাপনের টাকা তোলা, বিভিন্ন বুক স্টলে পত্রিকা পৌঁছে দেওয়া... তাদের কাছ থেকে বিক্রি-হওয়া কাগজের টাকা সংগ্রহ করা—ইত্যাদি কাজের জন্য তাঁর একজন সাহায্যকারী দরকার। আমি চাইলে কাল থেকেই ঐ কাজে লেগে যেতে পারি।

AMARBOI.COM

আমি সায়ীদ ভাইয়ের প্রস্তাবে সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেলাম। সায়ীদ ভাই তখন সদ্য বিয়ে করেছেন, কিন্তু ভাবী সঙ্গে থাকেন না—তিনি থাকেন সায়ীদ ভাইয়ের পৈত্রিক বাড়ি উত্তর শাহজাহানপুরে। সায়ীদ ভাইয়ের বাবা ছিলেন হরগঙ্গা কলেজের প্রিন্সিপাল। উত্তর শাহজাহানপুরে একটি ছোট্ট বাড়ি করেছিলেন। আমি ঐ বাড়িতেও অনেকবার গেছি। সায়ীদ ভাইয়ের একটি পিক-আপ ভ্যান ছিল। ব্যবসায়িক কারণে তিনি সেটি ক্রয় করেছিলেন। সেটি কলেজ সংলগ্ন হোস্টেলের মাঠে থাকত। যখন জানলাম ওটি তাঁর, তখন আমি সায়ীদ ভাইকে বললাম, আমি যদি এটি চালাতে শিখে নিই, তাহলে কণ্ঠস্বরের কাজে ওটাকে ব্যবহার করা যায়—আমারও একটা নিশ্চিত আয়ের পথ হয়। আপনি কি বলেন?

সায়ীদ ভাই মুচকি হেসে বললেন, তার দরকার হবে না, আমার একটি বাই-সাইকেল আছে, আপনি ওটাই ব্যবহার করতে পারবেন। সাইকেল চালাতে পারেন তো?

আমি বললাম, হ্যাঁ, পারি। পারি না মানে?

কাল থেকে ওটা আপনার হেফাজতেই থাকবে। লক্ষ্য রাখবেন যেন হারিয়ে না যায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি বললাম, আমি হারিয়ে যেতে পারি কিন্তু আপনার সাইকেল কখনও হারাবে না।

আমি আমার কথা রেখেছিলাম। সায়ীদ ভাইয়ের সাইকেলটি আমি দীর্ঘদিন ব্যবহার করেছি। সারা ঢাকা শহর আমি চষে বেড়িয়েছি ঐ সাইকেলে চড়ে। হারাইনি।

আমি পরদিন থেকেই কণ্ঠস্বরের কাজে লেগে যাই। সায়ীদ ভাই আমার হাতে-পায়ে বাই-বাইকেলটি হস্তান্তর করেন।

অঘোষিতভাবে আমার বহু বিড়ম্বিত শিক্ষাজীবনের ইতি ঘটিয়ে, কণ্ঠস্বর পত্রিকার একজন কর্মী হিসেবে আমার কর্মজীবন শুরু হয়। বেতন অস্থির, মানে তখনও স্থির হয়নি। সায়ীদ ভাই বললেন, নির্ধারিত বেতন না থাকলেও, মাঝে মাঝে আমার কাছ থেকে খাই-খরচ বাবদ কিছু পাবেন এবং আপনি যে সব বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করবেন, তার কমিশন পাবেন ১০% হারে। তাতে আপনার কোনোক্রমে চলে যাবে। একটু কষ্ট তো করতেই হবে। হা-হা। তাঁর বিখ্যাত প্রাণখোলা হাসি।

সাইকেলটি পাওয়াতে আমার খুব লাভ হলো। এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যাবার কষ্ট এবং খরচ দুই-ই কমলো। তা ছাড়া সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আমার বিচরণ ক্ষেত্রকে প্রসারিত করার কাজে ঐ যন্ত্রটি আমাকে বেশ সাহায্য করতে থাকল। তখন প্রতিদিনই নতুন নতুন কবি-সাহিত্যিকের সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটছে।

AMARBOI.COM

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার-সংলগ্ন শরীফ মিয়ার ক্যান্টিনটি ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কেন্দ্রিক তরুণ কবি-সাহিত্যিকদের মিলনতীর্থ। সেখানে দুই আনায় চা, আট আনায় ছোট এক প্লেট খাসির বিরিয়ানি পাওয়া যেত। অতি অল্প দামে পাওয়া যেত 'মাক্ষণ-মারা' টোস্ট বিস্কিট। ফলে সেখানে ছিল আঁতেল ছাত্রদের ভিড় এবং নবীন সাহিত্যিকদের আড্ডা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়াও সংলগ্ন আর্ট কলেজ, মেডিকেল কলেজ এবং একটু দূরের ইঞ্জিনিয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয়ের আঁতেলরাও শরীফের ক্যান্টিনে আসত।

মলয় ভৌমিকের মাধ্যমে ঐ শরীফ মিয়ার ক্যান্টিনেই আমার পরিচয় হয় আবুল হাসানের সঙ্গে। হাসানের কবিতা আমি আগেই কণ্ঠস্বর পত্রিকায় পড়েছিলাম এবং পড়ে ভালো লেগেছিল। কণ্ঠস্বরে প্রকাশিত হাসানের 'বন্ধুকে : মনে রাখার কিছু' কবিতাটি আমার মনে খুব দাগ কেটেছিল।

তিন পর্বে বিভক্ত ঐ কবিতার শেষ-পর্বটি যেন অমোঘ নিয়তির নির্দেশেই আবুল হাসান রচনা করেছিল, যারা তার বন্ধু ছিল এবং ভবিষ্যতে যারা তাঁর বন্ধু হবে, তাদের কথা ভেবে—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৩

নরক শয্যায় বৃথা আমাদের শূন্য হুতাশন,
আজ মনে হয় : নিরন্তর শোকের হাতের আঙুল আমরা সব!
কিছু-নেই-দুঃখের ভেতর ধ্বংসময় ক্ষণিক পাগল।

যেখানে প্রশান্তি নেই মানুষের লোকক্ষত গাঁথা,
সেখানে মৃত্যু, শুধু মৃতের ঘুমের অন্ধকার;
গ্রীন রোডের পুষ্পিত শাড়ীর মতো
মনে হয় না পৃথিবীকে তাই আর,
ইসলামপুরের পুষ্পস্তবকের মতো
পৃথিবীর নারীর হৃদয়!

তাই বলি তোমাদের একমাত্র মৃত্যুই সুন্দর,
চাঁদের মতোন আত্মা আমার মেলে দিতে পারি
আজ অনন্ত মৃত্যুর সম্ভাষণে!

AMARBOI.COM

পরিচয়মাত্র আমি আবুল হাসানকে ঐ কবিতাটির জন্য ধন্যবাদ জানাই। হাসান ইংরেজি বিভাগের ছাত্র ছিল। হাসান জানায় যে, সে-ও আমার কবিতা পড়েছে আজাদ, সংবাদ এবং সমকালে। তবে সেই কবিতাগুলো সে হাসানের কবিতাটির মতো মনে দাগ কাটার মতো ছিল না, তা আমিই বলি। হাসান আমার মুখে ওর কবিতার প্রশংসা শুনে একটু লজ্জা পায়। আবার খুশিও হয়। আমি লক্ষ করি, করমর্দনের জন্য আমার দিকে বাড়িয়ে দেয়া আবুল হাসানের হাতটি আবেগে কাঁপছে। হাসানের স্নায়বিক দুর্বলতাকে ওর রোমান্টিক আবেগ থেকে পৃথক করাটা কঠিন ছিল। আমি দীর্ঘ সময় হাসানের আবেগ-কম্পিত হাতটিকে আমার মুঠোর মধ্যে বন্দি করে রাখি। হাসানকে আমার খুব ভালো লাগে। মনে হয় আমাকেও তার পছন্দ হয়েছে। তবে আবুল হাসানের মধ্যে যে আমার পরবর্তীকালের উদ্বাস্তু-উন্মূল যৌবনসঙ্গীটি লুকিয়ে ছিল, তা তখনও আমি বুঝতে পারিনি।

ইতিমধ্যে সায়ীদ ভাই আজিমপুর সরকারি পার্টি হাউজে বাসা বরাদ্দ পান এবং ভাবীকে নিয়ে সেখানে ওঠেন। ঐ বাসায় কণ্ঠস্বরের কর্মী-লেখকরা নিয়মিত যাতায়াত করতেন। ওখানেই কবি আসাদ চৌধুরীর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। তিনি তখন বি-বাড়িয়া কলেজে অধ্যাপনা করেন। মাঝে মাঝে ঢাকায় আসেন। 'নতুন রীতি গল্প' সম্পাদনা করবেন বলে ঘোষণা দিয়ে রেখেছেন। বাইবেলের ফর্ম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনুসরণ করে লেখা তাঁর একটি কবিতা আমার ভালো লেগেছিল। খুব আমুদে মানুষ। আড্ডাবাজ। আমি কণ্ঠস্বরের সঙ্গে যুক্ত হয়েছি জেনে খুশি হন। আমাকে উৎসাহ যোগান। বলেন, বাহ্।

ওখানেই আমার সঙ্গে পরিচয় হয় হুমায়ুন কবির এবং সাযযাদ কাদিরের সঙ্গে। সাযযাদ কাদিরের কথা জানতাম না, কিন্তু হুমায়ুন কবিরের কবিতা তখন প্রচুর ছাপা হতো। সাযযাদ পরে কণ্ঠস্বর পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হয়। সে ছিল একজন দক্ষ প্রুফ-দেখক, আধুনিক পাশ্চাত্য সাহিত্যের নিবিড়-পাঠক। মুদ্রণ সম্পর্কে তার ভালো অভিজ্ঞতা ছিল। সে থাকত মহসীন হলে। পরে ঐ দু'জনের সঙ্গেই আমার গভীর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। বিশেষ করে সাযযাদের সঙ্গে।

আমি মাঝে মাঝে ভাবীর কৃপায় পার্টি হাউজের ঐ ছোট্ট বাসাটিতে দ্বিপ্রাহরিক আহার সম্পন্ন করতে পারতাম। অবশ্য আহারটা পুরোপুরি শ্রম-বিনিময়হীন ছিল, তা বোধ হয় বলা যাবে না। কাছেই নিউ মার্কেট। আমি মাঝে মাঝে ভাবীকে বাজার করে দিতাম। দু'একদিন কি আর এঁটো বাসনকোসনও ধুইনি? ধুয়েছি—ধুয়েছি। পরে তাদের প্রথম কন্যা লুনার জন্ম হওয়ার পর একটু আধটু বাচ্চা-রাখার কাজও কি করিনি? করেছি। করেছি। তা না করলে ভাবীর কি এমন চমৎকার রান্না করতে পারবেন কী করে? কণ্ঠস্বর পত্রিকার মতোই রান্না জিনিসটা ছিল একটা যৌথ কর্ম।

তখন বিকেলের দিকে লুনা যে আমার কাঁধে চড়ে নিউ মার্কেটে ঘুরতো সে-কথা আজকের লুনা বিশ্বাস করতে চাইবে কেন? সম্প্রতি লুনা নিজেই যে মা হয়েছে। লুনা, তোমার মেয়েটি এখন যেমন, ১৯৬৭ সালে তুমি ঠিক এমন ছোট্টটি ছিলে।

আমি পলিটেকনিকের হোস্টেলেই নিশিযাপন করি। দিনে এখানে-ওখানে কণ্ঠস্বর পত্রিকার বিজ্ঞাপনের সন্ধানে বের হই। লোকজনকে কণ্ঠস্বর পত্রিকা সম্পর্কে একটা খুব উঁচু ধারণা দেবার চেষ্টা করি। পত্রিকার নাম শুনে তারা আঁতকে ওঠেন। কেউ হয়তো আমার কথা শোনেন। কেউ কেউ খুব বিরক্তির সঙ্গে আমাকে তাড়িয়ে দেন। কেউ পরে আসার জন্য বলেন। আমি বিজ্ঞাপনের জন্য ছোট বড় সকল প্রতিষ্ঠানের কাছেই ধর্ণা দিই। বলা তো যায় না, যদি লাইগা যায়! কিন্তু না, সহজে লাগে না। 'যেখানে দেখিবে ছাই উড়াইয়া দেখ তাই; পাইলেও পাইতে পারো অমূল্য রতন।'—এই নীতি বাক্যের প্রতি আমি আস্থা রাখি। ফলে আমার বিজ্ঞাপন অনুসন্ধানক্ষেত্র খুবই প্রসারিত হয়। কিন্তু কাজের কাজ হয় না। ঢাকার মানুষের মন বড় শক্ত। শিল্প-সাহিত্যের প্রতি তাদের অনুরাগেরও বড় অভাব। কোনো কোনো ব্যক্তি আমার সঙ্গে এমন দুর্ব্যবহার করেন যে, মনে হয় দেই শালার পেটে চাকু ঢুকিয়ে। কিন্তু চাকু পাব কোথায়? এটা তো আর বারহাট্টা নয়— এটা ঢাকা। চাকু না ঢুকিয়েই যে অবস্থা, চাকু ঢোকালে তো কথাই নেই। তখন মিথ্যা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মামলাটাকে সত্য-মামলায় পরিণত করার ইচ্ছা জাগে। মনে হতাশা এসে ভিড় করে। তখন ভাবি, নতুন কাজে নেমেছি, ভেঙ্গে পড়লে তো চলবে না। গুণগুণ করে কবিগুরুর গান গাই.... 'বারে বারে ঠেলতে হবে হয়তো দুয়ার খুলবে না, তাই বলে তো ভাবনা করা চলবে না।'

মনে পড়ে, কণ্ঠস্বরের বিজ্ঞাপনের জন্য আমি ইস্টার্ন ফেডারেল ইউনিয়নের (efu) বড়-কর্তা রশিদ সাহেবকে তাঁর গুলিস্তান-সংলগ্ন অফিসটিতে গিয়ে বিরক্ত তো করতামই, মাঝে মাঝে তাঁর শাহজাহানপুরের বাসায় গিয়েও হানা দিতাম। আমার সঙ্গে থাকত সায়ীদ ভাইয়ের লেখা চিঠি এবং তাঁর দেয়া বাই-সাইকেল। ভদ্রলোক আমার অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচার জন্য এক-পর্যায়ে বিরক্ত হয়ে বিজ্ঞাপন দিতেন। নয়াবাজারে যে কাগজের দোকান থেকে কণ্ঠস্বরের জন্য ৪২ পাউন্ড কার্টিজ কাগজ ও কভারের জন্য আর্ট বোর্ড কিনতাম, ঐ দোকানের ঢাকাই মালিকের (নাম সম্ভবত মালেক সাহেব) কাছ থেকেও আমি কণ্ঠস্বরের জন্য অর্ধপাতা বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করতে সক্ষম হই। কাগজের দোকানের নাম ছিল 'পাকিস্তান ট্রেডিং হাউস'। ৩১ নওয়াব ইউসুফ রোড, নয়াবাজার। আমার শাসনামলেই কণ্ঠস্বরের পাতায় জুয়েলার্স ও টেইলার্সের বিজ্ঞাপন যুক্ত হয় (নিউ মার্কেটের জেবা জুয়েলার্স এবং তেজতরী বাজারের বাসস্টপ সংলগ্ন ডিজাইন টেইলার্স)। বাংলাবাজারের একজন হিন্দু, তিনি আমার এক আত্মীয়ের আত্মীয় ছিলেন, পরোক্ষে 'ঐ জিনিসের' ভয় দেখিয়ে তার কাছ থেকেও আমি একটি সিকি-পাতার বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করি। ভদ্রলোক ব্যাটারির ব্যবসা করতেন। নওরোজ কিতাবিস্তানের বিজ্ঞাপনটি অবশ্য জনাব কাদের খান সাহেবকে ভয় না দেখিয়েও পাওয়া যেত। বাংলা একাডেমী ছাড়া, ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রকাশনা-প্রতিষ্ঠানের মধ্যে নওরোজ কিতাবিস্তানই ছিল একমাত্র প্রতিষ্ঠান, যে কণ্ঠস্বর পত্রিকাকে নিয়মিত বিজ্ঞাপন দিয়ে পৃষ্ঠপোষকতা করত।

বিজ্ঞাপন সংগ্রহের ক্ষেত্রে আমার বিশেষ-পারদর্শিতার কথা কণ্ঠস্বর-সম্পাদক এখনও স্বীকার করেন। কিন্তু ঐ কাজ আমার বেশিদিন করা হয়নি—মাস দুয়েকের অভিজ্ঞতা থেকেই আমি বুঝে গিয়েছিলাম, এটা আমার কাজ নয়। এর চেয়ে ঢাকা শহরে রিক্সা চালানো অনেক ভালো। ভালো কমলাপুরে ট্রেন-যাত্রীদের মাল ওঠানো নামানোর কাজ করা। তার চেয়েও যা ভালো বলে মনে হয়েছিল, সে-কথা ইঙ্গিতে একটু আগে বলেছি। তবু যতদিন ঐ কাজটি করেছিলাম, ভালোভাবেই করেছিলাম বলে আমি দাবি করব।

কণ্ঠস্বরের দ্বিতীয় বর্ষ, নবম সংখ্যায় [জুলাই ১৯৬৭] আমার প্রথম কবিতা 'সন্দিগ্ধ শবযাত্রী' প্রকাশিত হয়। ঐ সংখ্যায় হুমায়ুন কবির এবং সেলিম সারোয়ারের কবিতা ছিল। হুমায়ুন পড়ত বাংলা বিভাগে আর সেলিম সারোয়ার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছিল ইংরেজি বিভাগের ছাত্র। থাকত তৎকালীন জিন্নাহ হলের ৫০১ নম্বর রুমে। তরুণ কবি হলে কী হবে, সেলিমের রুমের মেঝেতে দামী কার্পেট বিছানো থাকত। ঐ সংখ্যায় গল্প ছিল মাহমুদুল হক ও মুহম্মদ সিরাজের। মাহমুদুল হকের কম্পিত সোনার কলম এবং বাস্তবের সোনার দোকান ছিল বায়তুল মোকাররমে। মুহম্মদ সিরাজ ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় পাটের ব্যবসা করতেন। ঐ দুই ব্যবসায়ীর গল্প ছাড়াও 'আত্মহত্যা ব্যবসায়ী' আবদুল মান্নান সৈয়দের একটি নাটিকা প্রকাশিত হয় ঐ সংখ্যায়। মইনুদ্দিন শাহরিয়ার নামে সম্পাদক আবদুল্লাহ্ আবু সায়ীদ আধুনিক কবিতার নামে প্রচলিত ধূর্ততার বিরুদ্ধে একটি সতর্কতামূলক প্রবন্ধ লিখেছিলেন 'ধূর্ত কবিতা' নামে। অবশ্য ঐ ধূর্ত-কবিতার ফাঁদে পরে তিনি নিজেও পা দিয়েছিলেন।

কণ্ঠস্বরের প্রতি সংখ্যায় 'অচিরেই প্রকাশিত হচ্ছে' বলে তিনটি কাব্যগ্রন্থের বিজ্ঞাপন নিয়মিত ছাপা হতো।

১. রফিক আজাদের অন্তরঙ্গ দীর্ঘশ্বাস

২. মোহাম্মদ রফিকের বৈশাখী পূর্ণিমা

৩. আবদুল মান্নান সৈয়দের জন্মান্ধ কবিতাগুচ্ছ।

আবদুল মান্নান সৈয়দের প্রথম গল্পগ্রন্থ 'সত্যের মতো বদমাশ' তখন দ্রুত মুদ্রণ চলছে। সে বিজ্ঞাপনও কণ্ঠস্বরে থাকত।

অচিরেই প্রকাশিত হচ্ছে বলে আমিও তখন কণ্ঠস্বরে একটি বিজ্ঞাপন দিয়েছিলাম। সেটি কোনো প্রকাশিতব্য কাব্যগ্রন্থের বিজ্ঞাপন ছিল না। ছিল 'সূর্যফসল' পত্রিকার বিজ্ঞাপন। বিজ্ঞাপনটি ছিল এ রকম :

AMARBOI.COM

অচিরেই বেরুচ্ছে
নির্মলেন্দু গুণ ও
হাসান ফেরদৌস সম্পাদিত
সূর্যফসল
[দ্বিতীয় সংকলন]

এই হাসান ফেরদৌস ছিল পলিটেকনিকের ছাত্র। বিজ্ঞাপন পাওয়ার কোনো নিশ্চয়তা না থাকায় 'সূর্যফসল'-এর দ্বিতীয় সংখ্যা পরে আর কখনও প্রকাশিত হয়নি।

কণ্ঠস্বরের ব্যবস্থাপক হিসেবে আমার নাম ছাপা হয় এর পরের সংখ্যায়।

[দ্বিতীয় বর্ষ, দশম সংখ্যা, আগস্ট ১৯৬৭] ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঐ সংখ্যার লেখকসূচীটি ছিল এ রকম :

প্রবন্ধ : আবদুল মান্নান সৈয়দ : বন্ধ দরোজায় ধাক্কা
কবিতা : রফিক আজাদ : খাদ্যান্বেষণ : রুগ্ন প্রেয়সীর জন্য
মোহাম্মদ রফিক : প্রতিহিংসা শেষে
রাজীব আহসান চৌধুরী : স্বপ্নের ভিতরে
নূরুল হক : শুধু দূর গাছে
গল্প : সাযযাদ কাদির : হেমাঙ্গ মৈনাক
নির্মলেন্দু গুণ : মৃত সন্তার দ্বীপে
আলোচনা : হুমায়ুন কবির : বিনয়ী শিল্পী
প্রশান্ত ঘোষাল : নতুন বিতর্কে

ঐ সংখ্যার প্রচ্ছদটিই আমার বিবেচনায় ছিল কণ্ঠস্বরের সেরা প্রচ্ছদ। ঐ প্রচ্ছদের পরিকল্পনাটি সায়ীদ ভাইয়ের মাথা থেকে বের হলেও তাতে আমার এবং সাযযাদের সায় ছিল। ঐ সংখ্যার প্রচ্ছদে একটি তাজা সবুজ রঙের ঝাউপাতার ছবি ব্যবহার করা হয়। আর্ট পেপারের উল্টোদিকের খসখসে খড়ের রঙের ওপর সবুজ রঙের ঝাউপাতাটি যখন বাই-কালার ব্লকে ছাপা হলো তখন মনে হলো ঝাউপাতাটি যেন কণ্ঠস্বরের প্রচ্ছদে নতুন করে প্রাণ ফিরে পেয়েছে। শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরীর আঁকা কণ্ঠস্বর নামটিতে কী রঙ দিলে ভালো মানাবে, তা নিয়ে অনেক গবেষণার পর আমরা মেটে-কমলা রঙটি ব্যবহার করি। ছাপা হওয়ার পর, তখন বেশ রাত ছিল, আমরা প্রচ্ছদের দিকে তাকিয়ে মুগ্ধ হই। খসখসে মোটা কাগজ থাকায় জিংক ব্লকের অত্যাচার সইবার পরও প্রচ্ছদটিকে অফসেটে ছাপা প্রচ্ছদের মতোই ঝকঝকে মনে হয়। তখন অবশ্য অফসেটের চিন্তা আমাদের মাথায় আজকের মতো আসত না। এখন, সাতাশ বছর পরও ঐ প্রচ্ছদের দিকে যখন তাকাই, আমার মন আনন্দ ও তৃপ্তিতে ভরে যায়।

ভেতরের পাতায়, সম্পাদকের নামের নিচে আমাদের নাম ছাপা হয়েছিল এভাবে :

তফাজ্জল হোসেন সরকার (কর্মাধ্যক্ষ)
নির্মলেন্দু গুণ (ব্যবস্থাপনা)
গালিব আহসান খান (প্রচার বিভাগ)
সাযযাদ কাদির (প্রকাশনা বিভাগ)

কার্যালয়ের ঠিকানা ছিল ২৪৫ উত্তর শাহজাহানপুর, ঢাকা ১৪। প্রতি সংখ্যার মূল্য ৫০ পয়সা। বার্ষিক চাঁদা ছিল ৬ টাকা মাত্র।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেগুনবাগিচায় ছিল নামকরা একটি প্রেস, ইস্টার্ন প্রিন্টিং পাবলিশিং এ্যান্ড প্যাকেজেস লিঃ। আমরা অনেক রাত পর্যন্ত ঐ প্রেসে বসে আড্ডা দিতাম। সেগুনবাগিচা নামটা আমার খুব ভালো লাগত। ঐ নামটিকে অর্থবহ করবার জন্য সেগুনবাগিচায় সেগুন বৃক্ষবীথি খুব একটা ছিল না, তবে মনে হয় একসময় নিশ্চয় ছিল। মনে পড়ে একদিন সেগুনবাগিচার পথ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে, হঠাৎ আমার মনে একটি ছোট্ট কবিতা আসে, কবিতাটি স্মরণে আছে কিন্তু কোনো গ্রন্থে নেই। কবিতাটি ছিল এ রকম :

এ গুণ সে-গুণ নয়,
এ গুণ সেগুনবাগিচা ঢাকা।

সেগুনবাগিচার ঐ প্রেস থেকে সাপ্তাহিক 'ললনা' নামে একটি পত্রিকা বেরুত। ঐতিহ্যবাহী বেগম পত্রিকার চেয়েও ললনা পত্রিকাটি তখন ক্রমশ জনপ্রিয় হয়ে উঠছিল। মুহম্মদ আখতার ছিলেন ঐ পত্রিকার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক এবং ঐ প্রেসের প্রধান কর্মকর্তা। কণ্ঠস্বর পত্রিকার মুদ্রণকে কেন্দ্র করে আখতার সাহেবের সঙ্গে আমাদের খুব নিবিড় সম্পর্ক গড়ে ওঠে। আমরা তাঁর রুমে বসে সকাল-সন্ধ্যা আড্ডা দিতাম। মাঝে মাঝে আখতার সাহেবের মন ভালো থাকলে তিনি আমাদের চা-সিগারেট খাওয়াতেন। মুহম্মদ আখতার ছিলেন একজন নারীবাদী ও সাহসী সম্পাদক। আমাদের অনেক অত্যাচার তিনি হাসিমুখে সহ্য করতেন। কণ্ঠস্বরের সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার পরও মুহম্মদ আখতারের সঙ্গে আমার ভালো সম্পর্ক ছিল। আমি সেগুনবাগিচার দিকে গেলে একবার ঐ প্রেসটিতে যেতাম। সাহসী-সম্পাদক, বন্ধুবৎসল মুহম্মদ আখতার ১৯৭১ সালে পাক-বাহিনীর হাতে নির্মমভাবে নিহত হন।

কণ্ঠস্বর পত্রিকার সঙ্গে খুব ঘটা করে যুক্ত হলেও ঐ পত্রিকার সঙ্গে আমার সম্পর্ক খুব দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। আমি শুধু জুলাই এবং আগস্ট—ঐ দুটো সংখ্যার সঙ্গেই যুক্ত ছিলাম। আমার কণ্ঠস্বরের কাজ, যদি এটাকে কাজ বলা যায়, ছাড়ার পেছনে কণ্ঠস্বর-সম্পাদকের সাহিত্যবিবেচনার সঙ্গে আমার সাহিত্যবিবেচনার বিরোধের প্রশ্নটিও পরোক্ষ কার্যকর ছিল। আবদুল মান্নান সৈয়দের লেখার প্রতি আবদুল্লাহ আবু সায়ীদের মাত্রাহীন প্রীতিরোধকে আমি একপর্যায়ে সমর্থন করতে পারিনি।

আমার কণ্ঠস্বর ত্যাগের পর কণ্ঠস্বর আবার অনিয়মিত হতে শুরু করে। পরের সংখ্যাটি দুই মাস গ্যাপ দিয়ে, সেপ্টেম্বর-নভেম্বর সংখ্যারূপে একত্রে ১৯৬৭-র নভেম্বরে প্রকাশিত হয়। ঐ সংখ্যাটিতে আবদুল মান্নান সৈয়দের কোনো লেখা ছাপা হয়নি। ১৯৬৫-১৯৬৮ পর্যন্ত প্রকাশিত কণ্ঠস্বরের ১১টি সংকলনের মধ্যে ওটিই ছিল একমাত্র ব্যতিক্রম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার খুব ইচ্ছে ছিল। মনে মনে নিজেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ভেবে খুব ছোটবেলা থেকেই আনন্দ পেয়েছি। কিন্তু ভালো ফল করার পরও সে সুযোগ আমার হয়নি। এবার স্থির করলাম, বিজ্ঞানসাধনা ত্যাগ করে সাহিত্যসাধনা করব। সুতরাং সুযোগ পেয়ে বাংলায় অনার্স নিয়ে ভর্তি হয়ে গেলাম। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে লাগল ১২৫.০০ টাকা। ঐ টাকা আমি তখন কোথায় পেয়েছিলাম, আমার মনে পড়ে না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার ফলে আমার বেশকিছু নতুন বন্ধু জোটে। তাদের কথা পরে বিস্তারিত বলব।

আবুল হাসানের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব ক্রমশ গাঢ় হচ্ছিল। আমরা মানসিকভাবে পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল হয়ে উঠছি। আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছি বটে, কিন্তু সে শুধুই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের খাতায় নাম ওঠানোর জন্য। কবির জীবনীটাকে একটু সমৃদ্ধ করা ছাড়া শিক্ষা খাতে পুনরায় অর্থলগ্নি করাটা যে আমার কোনো কাজে আসবে না,—এ ব্যাপারে আবুল হাসানের সাথে আমিও একমত হই। হাসান তখন নামে মাত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। বেতন না দেওয়ার কারণে ইংরেজি বিভাগের খাতা থেকে তার নাম অনেক দিন হলো কাটা গেছে। ব্রেক অব স্টাডি হয়ে গেছে তারও। হাসান মোটামুটিভাবে ভালো ছাত্রই ছিল। কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক লেখাপড়ায় সাফল্য লাভ করে ভালো চাকরি-বাকরি বাগানোর দিকে হাসানের মন ছিল না। হাসান বলত, কবি হওয়ার জন্য যেটুকু লেখা-পড়া দরকার তা হয়ে গেছে—এর পর উচ্চতর ডিগ্রি লাভের জন্য পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার মানে হবে, ভালো একটা চাকরি বাগানোর ধান্ধা করা। নিজেকে অর্থবিত্তে সুখী করা, পরিবারকে সাহায্য করা। এসব আমাকে দিয়ে হবে না।

আমি দেখলাম, হাসানের সঙ্গে আমার চিন্তাভাবনার খুব মিল আছে। একটি সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান হলেও হাসানের ভাবনাজগতে দারিদ্র্যের ছাপ নেই। তার মনটা কবির মন। আমি না হয় ভালো সাবজেক্টে ভর্তি হতে না পেরে উচ্চশিক্ষার প্রতি আস্থা হারিয়েছি। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সদস্য হওয়ার কারণে, পাকিস্তানের রাষ্ট্রব্যবস্থা আমার জন্য বিশেষভাবে বৈরী, কিন্তু হাসানের ক্ষেত্রে ঘটনাটা তেমন ছিল না। বৈষয়িক জীবনে সাফল্য লাভ করার ক্ষেত্রে আমার চেয়ে আবুল হাসানের সুযোগ ও সম্ভাবনা ছিল বেশি। মধ্যবিত্ত মুসলমান পরিবারের প্রতিভাধর ছেলেদের অনেকেই যখন নতুন-পাওয়া দেশের সম্পদকে লুটেপুটে খাওয়ার জন্য প্রতিভায় শান দিয়ে তাকে ডিগ্রির অস্ত্রে পরিণত করার প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হচ্ছে, তখন আবুল হাসান ঐ প্রতিযোগিতা থেকে গুটিয়ে নিয়ে কবিতা নামক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এক অনিশ্চিত অধরার ডাকে সমর্পণ করেছে নিজেকে—, এটা শুধু একজন জাতকবির পক্ষেই সম্ভব। ঢাকায় এসে আমি এমন একজন কবি-বন্ধুকেই খুঁজছিলাম। হাসানের মধ্যে আমি সেই বন্ধুটিকেই খুঁজে পাই।

আবুল হাসান আনখশির কবি। কবিতার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এমন কোনো বিষয় নেই, যা তার আরাধ্য। অর্থ নয়, বিত্ত নয়, প্রতিপত্তি নয়, এমনকি চূড়ান্ত অর্থে নারীও নয়— কবিতা, শুধু কবিতাই আরাধ্য তার।

আমরা এই সিদ্ধান্ত নিলাম যে, আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ে মাঝে মাঝে পড়ব, ক্লাস করব, ঘুরব-বেড়াব, বিশ্ববিদ্যালয়ের সুন্দরী মেয়েদের সঙ্গে প্রেম করবার চেষ্টা করব, বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা মারব, কিন্তু ডিগ্রি লাভের চেষ্টা করব না। পরীক্ষা দেব না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার সময় যা যাবার তা গেছে, তার জন্য শোক করে লাভ নেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের খাতায় নাম লেখাতে হলে কিছু গচ্চা তো দিতেই হয়। ঐ খাতে আর এক কপর্দকও নয়। বিনিয়োগকৃত টাকা উসুল করার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে আমরা ব্যবহার করব, আমাদের কবিতা রচনা, প্রকাশ ও প্রচারের ক্ষেত্র হিসেবে। সতীর্থ হিসেবে যে বন্ধু-মহলটি গড়ে উঠবে, আমাদের অন্ন-বস্ত্র এবং বাসস্থানের অভাব পূরণের জন্য তাকে কাজে লাগানো হবে। যেহেতু আমরা উপার্জনমুখী বিদ্যা আয়ত্ত করছি না, সেহেতু আমাদের জীবন হবে অনেকটাই পরনির্ভর। বন্ধু-নির্ভর। ভক্ত-নির্ভর। পৃষ্ঠপোষক-নির্ভর।

আমাদের বোহেমিয়ান কবি-জীবনের এই অলিখিত সংবিধানটি অবশ্য আমরা আমাদের অজ্ঞাতেই তৈরি করে নিয়েছিলাম। বলা যায় নিজে থেকেই তৈরি হয়ে গিয়েছিল। আলবেয়ার কাম্যুর OUTSIDER-এর নায়কের সঙ্গে আমরা যখন নিজেদের মিলাচ্ছিলাম। হাসানের নামে আমার মতো হুলিয়া ছিল না, কিন্তু হাসান নিজেই নিজের নামে এক অলিখিত হুলিয়া জারি করে দিয়েছিল। সে অনেকদিন ধরে বাড়ি যেত না কিন্তু মাঝে মাঝে বাড়ির জন্য খুব চঞ্চল বোধ করত। বলত বুড়িকে (হাসানের বোন) কতদিন দেখি না। কবির মধ্যে প্রেমের জগত নির্মাণে বোনদের যে একটা প্রচণ্ড-প্রবল-পরোক্ষ কিন্তু মুখ্য ভূমিকা থাকে, এ নিয়ে ভাবনা বিনিময় করে আমরা সুখ পেতাম। আমরা কিছুদিনের মধ্যেই এ রকম উপলব্ধি করি যে, আমরা হচ্ছি একই জীবনের ভিন্ন প্রকাশ।

শরীফের ক্যান্টিন ছাড়াও আমাদের একটা আড্ডা ছিল পল্টনের আউটার স্টেডিয়াম মাঠের এক নির্জন কোনায়। সেখানে সন্ধ্যার দিকে বাদাম খেতে খেতে আমরা আড্ডা দিতাম। ওখানে শিশু-সাহিত্যিক আখতার হোসেন, রশিদ সিনহা ও মাঝে মাঝে কবি দিলওয়ার আসতেন। আরও কারা আসতেন আমার ঠিক মনে পড়ছে না। কবি দিলওয়ারকে আমরা দিলু ভাই বলে ডাকতাম। দিলু ভাই তখন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সংবাদে কাজ করেন। তিনি আমাদের সমাজসচেতন সাহিত্য রচনায় উৎসাহ দিতেন। বলতেন, সাহিত্য হবে সমাজ বদলের হাতিয়ার। আমি তা মানতাম। কিন্তু আবুল হাসান ঐ জায়গাটায় মৃদু আপত্তি তুলত। হাসান মনে করত প্রচারধর্মিতা প্রশ্রয় পেলে তাতে ভাব ও আবেগের স্বতঃস্ফূর্ততা ক্ষুণ্ন হয়। সে মনে করত, রাজনীতির চিন্তা বা কোনো পূর্ব সিদ্ধান্তই যেন শিল্পকে গ্রাস না করে— সেদিকে আমাদের লক্ষ্য রাখা দরকার। এই নিয়ে হাসানের সঙ্গে আমার কাব্যভাবনার বিরোধ ছিল বটে, কিন্তু হাসানের চিন্তাটাকেও আমি ভুল বা অসৎ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভেবে উড়িয়ে দিতাম না। সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতার পাশাপাশি, আমার অস্তিত্বের উপলব্ধির বিচিত্রতাকে নানা-মাত্রায় প্রকাশ করার বিষয়টিকেও আমি সমভাবে গুরুত্বপূর্ণ বলেই মনে করতাম। তা ছাড়া যৌনতার প্রতি আমার এমন দুর্মর কৌতূহল ছিল, যা প্রচলিত নিয়মনীতির প্রতি আনুগত্য প্রকাশে অনিচ্ছুক। বিদ্রোহকেও আমি তাই শুধু অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ না রেখে জীবনের নানা ক্ষেত্রে নানাভাবে প্রকাশ করার কথা ভাবতাম। আমাদের দু'জনের ভাবনার পার্থক্য আমাদের দু'জনের কবিতার জন্য শুভ হয়েছিল বলেই মনে করি। আমরা পরস্পরকে প্রভাবিত করতে পেরেছিলাম, কিন্তু আমাদের কবিতা কখনই এক খাতে পথ চলেনি।

ঐ আড্ডা শেষ করে, গুলিস্তানের নিয়নবাতিগুলো যখন জ্বলে উঠত তখন আমরা যেতাম ঠাঠারিবাজারের হাকায় দোকানে। সেখানে জুয়ার আসর চলত। ওখানেই পটের জুয়া খেলাটা আমাকে পায়। আমি সামান্য যা পয়সা হাতে থাকে তা দিয়েই জুয়া খেলি। তারপর পেট পুরে চোলাই মদ পান করে কপর্দকশূন্য হয়ে, সাইকেল চালিয়ে গভীর রাতে আমি ফিরে আসি পলিটেকনিক হোস্টেলে। হাসান চলে যায় গেণ্ডারিয়ায়।

সে গেণ্ডারিয়ায় রজনী চৌধুরী লেনে হাবিব ফকিরের বাড়িতে লজিং থাকত। হাবিব ফকির ছিলেন একজন বড় মুসলিম লীগ নেতা। আইয়ুব খানের কোনো একটা তহবিলে তিনি এক লক্ষ টাকা দান করে আইয়ুব খানের প্রীতিভাজন হয়েছিলেন। তখনকার দিনের এক লক্ষ টাকা এখনকার দিনের কোটি টাকার সমান। ঐ হাবিব ফকির ছিলেন আবুল হাসানের পিতা জনাব আলতাফ হোসেন সাহেবের খুব নিকট বন্ধু। হাসানের পিতা যখন কলিকাতায় পুলিশে চাকরি করতেন তখন থেকে তাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা। হাবিব ফকির সাহেব হাসানকে তাঁর বিরাট বাড়ির একটি রুম ছেড়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু হাসান ঐ বাড়িতে থাকাটা পছন্দ করত না। এক দুইবার সে আমাকে ঐ বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিল বলে মনে পড়ে। আমরা অন্ধকারাচ্ছন্ন, ভ্যাপসা গন্ধযুক্ত ঐ রুমটিতে একসঙ্গে রাত কাটিয়েছিলাম। ঐ রুমটিতে ছিল টিকটিকি, আরশোলা আর ইঁদুরের বাস।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একবার শশাংক পাল (কমিউনিস্ট এবং ছোটগল্পের পত্রিকা 'শ্রাবস্তী'র সম্পাদক) হুলিয়া মাথায় নিয়ে সে এসে হাবিব ফকিরের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিল। হাসান ব্যাপারটা জানত না। বেশ কিছুদিন কেটে যাবার পর পুলিশ যখন হাবিব ফকিরের বাড়িতে শশাংক পালের সন্ধান পায়, তখন বিষয়টি হাবিব ফকিরের কানে যায়। যাকে বলে বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা। যথাসময়ে শশাংক লা পাত্তা হয়। তখন হাবিব ফকির হাসানকে ডেকে সাবধান করে দেন যাতে সে আর কোনো কমিউনিস্টের পাল্লায় না পড়ে এবং আর কোনো আজেবাজে লোককে ঐ বাড়িতে আশ্রয় না দেয়। ঐ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আমি আর হাবিব ফকিরের বাড়িতে না যাবার সিদ্ধান্ত নিই। তাই হাসানকে গেণ্ডারিয়ার পথে বিদায় জানিয়ে আমি মামুন আর বাচ্চুর কাছে পলিটেকনিক হোস্টেলে ফিরে যাই। ঢাকা শহরে ফাঁকা-পথে খুব গভীর রাতে সাইকেল চালানোর একটা আলাদা মজা আছে। আমি ঘাতক ট্রাকের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সাইকেল চালাতাম। আমার ভাগ্য ভালো, কোনোদিন ট্রাকের তলায় চাপা পড়িনি। তাহলে সায়ীদ ভাইয়ের সাইকেলটি যেত।

পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের সামনের রাস্তাটিতে এখন যেমন যানবাহনের ভিড় লেগে থাকে, তখন তেমন ছিল না। রাতের বেলায় ঐ এলাকাটি ছিল খুব নির্জন, প্রায় গ্রামের মতোই। আমরা গভীর রাতে ঐ নির্জন রাস্তা ধরে হাঁটতাম আর গল্প করতাম। তরুণ বয়সে কত রকমের স্বপ্নই না থাকে মানুষের।

আমরা সকালের নাস্তা করতাম আবুলের হোটেলে। ঐ হোটেলটি ছিল পলিটেকনিক ওয়ার্কশপের পেছন দিকে। বাঁশের বেড়া, টিনের চালা। ওখানে বেশ আড্ডাও হতো। আমি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের কেউ ছিলাম না। কিন্তু মামুন আর বাচ্চুর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক লক্ষ্য করে অনেকে আমাকে পলিটেকনিকের ছাত্র বলেই ভাবত। ঐ ইনস্টিটিউটের বেশ কিছু শিক্ষকের সঙ্গেও আমার স্নেহ-প্রীতিময় সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। বিশেষ করে দু'জন শিক্ষকের কথা আমার মনে পড়ে। একজন ছিলেন চিত্রাভিনেত্রী শর্মিলীর স্বামী চিত্রগ্রাহক রফিকুল বারী চৌধুরী, মামুনের সঙ্গে আমি তাঁর কাওরানবাজারের বাসায় গেছি। আমার কপাল খারাপ, শর্মিলী তখন বাসায় ছিলেন না। আরেকজন ছিলেন অধ্যাপক কাশেম। তিনি খুবই নাটক পাগল ছিলেন। অভিনয়ও করতেন। মামুনের সূত্রে অভিনেতা এবং পরে চিত্রপরিচালক মরহুম জহিরুল হক (জহর ভাই), অভিনেতা-পরিচালক দারা শিকো এবং অভিনেতা-পরিচালক ফকরুল হাসান বৈরাগীর সঙ্গেও আমার বেশ ভালো সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

মামুনদের একটা চমৎকার আড্ডা ছিল মগবাজারের তাজ হোটেলে। ঐ আড্ডাটা চলত গভীর রাত পর্যন্ত। শুরুই হতো রাত বারোটার দিকে। নিকটস্থ এফডিসির লোকজন সিনেমার কাজ সেরে তাজ হোটেলে আসতেন আড্ডা দিতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এবং রাতের আহার সারতে। ঐ হোটেলে ভালো বিরিয়ানি পাওয়া যেত। ঐ আড্ডার সদস্যদের মধ্যে হেলাল, শওকত এবং ফারুকের কথা আমার মনে পড়ে। ফারুকের ডাকনাম ছিল দুলু। পরে ঐ ফারুক চলচ্চিত্রের নায়ক হিসেবে নাম করে। হেলাল এবং শওকত মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেয়। সঙ্গীত-পরিচালক সুবল দাস, রাজা হোসেন খান, মাঝে মাঝে ওস্তাদ ফজলুল হক, খাদেম হোসেন খান, আলাউদ্দিন খান—এঁরাও ঐ হোটেলে আসতেন। সত্য সাহাকেও দু'একবার দেখেছি।

ওখানেই চরস সহযোগে সিদ্ধি সেবনের ব্যাপারটিতে আমার হাতে-খড়ি হয়। আলপিনের ডগায় একটুকরো কালো চরসকে দিয়াশলাইয়ের জ্বলন্ত কাঠির আগুনে সেঁকে নিয়ে সিদ্ধিপাতার সঙ্গে তাকে মিশিয়ে ফেলা হতো। আগুনে ঝলসানো চরস থেকে তখন একটা চমৎকার মিষ্টি গন্ধ বেরিয়ে আসত। সিদ্ধি ও চরসের যুগল সম্মিলনে তৈরি হতো এক মহাসিদ্ধি। মগবাজার থেকে পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে পড়ত তার মিষ্টি মধুর গন্ধ। ঐ কাজে হেলালই ছিল সকলের সেরা।

ঐ বছর (১৯৬৭) পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে যে বার্ষিক নাটক অভিনীত হয়, আমি ছিলাম সেই নাটকের রচয়িতা। রচনাকর্মে আমার সহযোগী ছিল শামীম। মামুন ছিল ঐ নাটকের পরিচালক। উপদেষ্টা ছিলেন অধ্যাপক কাশেম স্যার। নাটকের নাম 'এ যুগের শাজাহান'।

পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর মোনায়েম খান সাহেব জাতির উদ্দেশ্যে মাস-পয়লা ও মাসমধ্য বেতার ভাষণ দিতেন। এটা দীর্ঘদিন ধরে চলেছিল। আইয়ুবের ঐ বিশ্বস্ত গভর্নর মোনায়েম খানকে বিদ্রূপ করার জন্য শাজাহানকে দিয়ে জাতির উদ্দেশ্যে আমরা একটি অনুরূপ মাস-পয়লা বেতার ভাষণ প্রচার করিয়েছিলাম এবং সেই নাটকে বেতার-টিভি প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছিল। ঐ বেতার ভাষণটি শ্রোতারা সঙ্গে নিয়ে আসা বেতারযন্ত্রের নির্দিষ্ট কিলোহার্সে শুনতে পায়। ঐ নাটক অভিনয়ের রাতে পলিটেকনিক সংলগ্ন প্রায় দুই কিলোমিটার এলাকাজুড়ে একটি বিকল্প বেতার কেন্দ্র চালু হয়। ওটাই কি স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের সূচনা? হ্যাঁ, বলা চলে।

শুধু রেডিও নয়, একটি প্রেমের দৃশ্যকে স্টেজে রক্ষিত টিভির পর্দায় টেলিকাস্ট করার মাধ্যমে ঐ নাটকে টেলিভিশন প্রযুক্তিও ব্যবহার করা হয়। প্রেমের দৃশ্যে অভিনয় করেছিল চিত্রনায়িকা সুলতানা এবং পলিটেকনিকের ছাত্র, মুন্সীগঞ্জের সুদর্শন নায়ক বাচ্চু। ঐ নায়ক-বাচ্চু এখন আমেরিকায় থাকে।

বাংলা নাটকে ইলেকট্রনিক প্রযুক্তির এমন ব্যবহারের কোনো দ্বিতীয় নজির আছে বলে আমার জানা নেই। পলিটেকনিক বলেই সেটা সম্ভব হয়েছিল এবং এ ব্যাপারে আমার বন্ধু দেলওয়ার হোসেন বাচ্চুর ভূমিকা ছিল খুব সাহসী এবং উদ্ভাবনীমূলক। সে ছিল ইলেকট্রনিকস্ বিভাগের ছাত্র।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই নাটকের ব্যাপারে তথ্য সরবরাহ করার জন্য আমি গিরীন্দ্রর (গিরীন্দ্র সরকার) কাছে কৃতজ্ঞ। বয়সে বছর তিনেকের ছোট হলেও গিরীন্দ্র ছিল আমার বন্ধুতুল্য। একেবারে বাল্যসঙ্গী। জীবনে নানা কর্ম ও অপকর্ম আমরা একসঙ্গে সুসম্পন্ন করেছি। শ্যামগঞ্জে গোপনসূত্রে আমার সম্পর্কে খবর পেয়ে আমার সন্ধান লাভের জন্য সে যখন ঢাকায় আসে, তখনই ঐ নাটকটি অভিনীত হয়। গিরীন্দ্র ছিল ঐ নাটকের একজন সৌভাগ্যবান দর্শক। সে এখন কাশবন শিক্ষানিকেতনের প্রধান শিক্ষক হিসেবে কর্মরত। গিরীন্দ্র আসাতে আমার খুব লাভ হয়। আমি ওর মাধ্যমে বাড়ির খবর পাই এবং ডাকাতি মামলাটির সর্বশেষ পরিস্থিতি সম্পর্কে জানতে পারি। জানতে পারি যে, নেত্রকোনার সিআই অব পুলিশ জনাব খুরশিদ সাহেব আমার ব্যাপারে তদন্ত করতে গ্রামের বাড়িতে গিয়েছিলেন। আমার ছোট বোন সোনালি তখন বাড়িতে ছিল। সোনালি নেত্রকোনা গার্লস স্কুলে পড়ত। খুরশিদ সাহেবের মেয়ে চামেলী খুরশিদ (নজরুল-গীতির শিল্পী) ছিল সোনালির সহপাঠী ও বন্ধু। সোনালি নেত্রকোনায় চামেলীদের বাসায় যেত। খুরশিদ সাহেব সোনালিকে তাঁর কন্যার বান্ধবী হিসেবে চিনতেন। বাবা-মা এবং ভাইবোনদের সঙ্গে কথা বলেন, আমাদের পরিবার সম্পর্কে অবহিত হওয়ার পর, বিশেষ করে আমি সোনালির ভাই—, এ কথা জানার পর খুরশিদ সাহেবের মন আমার প্রতি কিছুটা দ্রব হয়। তিনি আমার পলাতক জীবনের অবসান ঘটানোর জন্য তাঁর পক্ষে যা করা সম্ভব, করবেন বলে আমার বাবা ও ক্রন্দনরত সোনালিকে আশ্বস্ত করে নেত্রকোনায় ফিরে যান। আমার ছোট বোন সোনালি আর কিছু না পারলেও ঐ বড় উপকারটা করেছিল।

মামলাটি ময়মনসিংহ কোর্টে স্থানান্তরিত হয়। বারহাট্টার চৌধুরী দারোগা, সিআই অব পুলিশ জনাব খুরশিদ সাহেবের সরেজমিন তদন্তের রিপোর্টের ভিত্তিতে আমার নাম ফাইন্যাল রিপোর্ট থেকে বাদ দিতে বাধ্য হন। প্রয়োজনীয় সাক্ষীসাবুদের অভাবে এবং ব্যবসায়ী সুধীর পালের অনাগ্রহের কারণে, শেষ পর্যন্ত লঘু দণ্ডের ভিতর দিয়েই ঐ গুরুমামলাটির অবসান ঘটে। ধৃত ডাকাত নিজেকে একজন নিরীহ-নিরপরাধ ট্রেনযাত্রী বলে দাবি করে। মাননীয় বিজ্ঞ বিচারক ডাকাত সন্দেহে ধৃত ঐ ডাকাতকে নিরীহ ট্রেনযাত্রী হিসেবে পুরোপুরি মানতে পারেননি। আবার ডাকাতকে ডাকাত হিসেবে প্রমাণ করার মতো যথেষ্ট তথ্যও হাতে পাননি। বিজ্ঞ হাকিম এরপরও ঐ ব্যক্তিকে ছয় মাসের জেল দেন। আমি আমার পলাতক জীবনযাপনের দুর্বিষহ যাতনার হাত থেকে মুক্তি লাভ করি।

আমার লেখা ঢাকার বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ার কারণে এলাকায় জানাজানি হয়ে যায় যে, আমি ভারতে যাইনি, ঢাকাতেই কোথাও আছি। বাকি যে সন্দেহটুকু ছিল, ঢাকা থেকে গ্রামে ফিরে গিয়ে গিরীন্দ্র তা দূর করে। সে গলায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঢোল নিয়ে সারা বারহাট্টায় প্রচার করে, নির্মলেন্দু ঢাকাতেই আছে এবং খুব বড় নাট্যকার হয়েছে। আমি নিজে তাঁর লেখা নাটক দেখে এসেছি।

ডাকাতির মামলা থেকে আমার নাম বাদ পড়াতে আমার অবস্থান সম্পর্কে গোপনীয়তা রক্ষার আর কোনো প্রয়োজন ছিল না। তাই আমি ঢাকাতে আছি—এ-কথা জেনে আমার বাবা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেন।

আওয়ামী লীগের ছয়-দফা কর্মসূচীর পক্ষে তখন দেশ জুড়ে আন্দোলন দানা বাঁধছে। নবজাগ্রত বাঙালি জাতীয়তাবাদের অসাম্প্রদায়িক চেতনা ও শেখ মুজিবের ছয় দফাকে সমর্থন করার অপরাধে তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া সম্পাদিত বহুল-প্রচারিত ইত্তেফাক পত্রিকা তখন সরকারি রোষানলে পড়ে বন্ধ হয়ে গেছে। শেখ মুজিবসহ আওয়ামী লীগের প্রথম সারির নেতারা (ময়মনসিংহের সৈয়দ নজরুল ইসলাম ছাড়া) তখন সবাই কারাগারে। আমেনা বেগম আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভানেত্রী। সংবাদ পত্রিকার প্রতিও সরকার তুষ্ট নন। ডিক্লারেশন নবায়নের সময় সেই পত্রিকার ওপরও দমনমূলক ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে। মাসখানেক সংবাদও বন্ধ ছিল। পরে হাইকোর্টের রুলিং বলে এক মাস বন্ধ থাকার পর ১৯৬৭-র জুন মাস থেকে সংবাদ আবার প্রকাশিত হতে শুরু করেছে। সুতরাং বলা যায়, সময়টা মোটেও ভালো নয়। সংবাদের সাহিত্য বিভাগের সম্পাদক রণেশ দাশগুপ্ত জেলে। শহীদুল্লাহ কায়সার পত্রিকার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক এবং তিনি পত্রিকার সাহিত্য বিভাগটিও দেখেন।

AMARBOI.COM

আমি শেখ মুজিবকে উৎসর্গ করে লেখা আমার একটি কবিতা সংবাদের সাহিত্য বিভাগে প্রকাশের জন্য শহীদুল্লাহ কায়সারের হাতে দিয়ে এসেছিলাম। কবিতার নাম 'প্রচ্ছদের জন্য'। কবিতাটি বেশ দীর্ঘ। শহীদ ভাই আমার কবিতা নিয়ে পড়লেন মহা বিপদে। আমি তাঁকে ঐ কবিতাটি ছাপার জন্য যখন খুব চাপ দিচ্ছি, তখন তিনি আমাকে বললেন, সময়টা ভালো না, শেখ মুজিবের নামে লেখা কবিতা ছাপার ছুতায় সংবাদ যদি আবার বন্ধ করে দেয়, তখন খুব বিপদ হবে। তুমি বরং একটু অপেক্ষা কর। দেখা যাক।

তরুণ কবি বলে আমি তখনকার বাস্তব অবস্থাটা বুঝতে চাইতাম না, তাই অপেক্ষা করার মতো ধৈর্য আমার ছিল না। আমি তাঁর ওপর চাপ অব্যাহত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাখলাম। একদিন রাতে সংবাদে গিয়ে তাঁকে পেলাম না। না পেয়ে তাঁর টেবিলে একটি ছোট্ট চিরকুট লিখে রেখে এলাম। তাতে লিখলাম :

> *'শহীদ ভাই, আমি আমার কবিতাটির ব্যাপারে আপনার সিদ্ধান্ত জানতে এসেছিলাম। আর সময় দেয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আগামী সংখ্যায় যদি কবিতাটি না ছাপেন, তবে আমি গভর্নর মোনায়েম খানকে উৎসর্গ করে কবিতাটি 'পয়গাম' পত্রিকায় ছাপব। (তখন পয়গাম নামে মোনায়েম খান একটি পত্রিকা বের করেছিলেন। তাঁর পুত্র আখতারুজ্জামান বাচ্চু ছিলেন ঐ পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক। তিনি কায়রো প্লেন ক্রাশে নিহত হয়েছিলেন) আপনি কি তাই চান?'*
>
> ইতি আপনার নির্মল।

কী অবিবেচকের মতোই না তখন আমি শহীদ ভাইয়ের ওপর চাপ সৃষ্টি করেছিলাম। তিনি চিঠি পেয়ে বোধ করি আমার সম্পর্কে এমনটিও ভেবে থাকবেন যে, নির্মল যেমন পাগল, হয়তো সে যেমন লিখেছে তেমনটি করে বসতেও পারে। সুতরাং সংবাদ বন্ধ হওয়ার ঝুঁকিও নিলেন তিনি, কিন্তু আমার ব্যাপারে ঝুঁকি নিলেন না। এটা যে কত বড় সাহসিকতা ও ভালোবাসার কাজ, তা এখন মর্মে-মর্মে বুঝি। ঠিক পরের সাহিত্য বাসরেই আমার দীর্ঘ-কবিতাটি তিনি ছেপে দিলেন। আমি সংবাদে প্রকাশিত ঐ দীর্ঘ কবিতার ওপর চোখ বুলিয়ে অনির্বচনীয় আনন্দ পেলাম। শহীদুল্লাহ কায়সারের প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতায় আমার মন ভরে গেল। কবিতার নামের নিচেই ছোট হরফে থার্ড ব্র্যাকেটে ছাপা হয়েছে শেখ মুজিবুর রহমানকে। প্রকাশের তারিখ ১২ নভেম্বর ১৯৬৭।

ওটাই ছিল পূর্ব বাংলার উদীয়মান নেতা শেখ মুজিবুর রহমানকে উৎসর্গ করে রচিত প্রথম কবিতা।

১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানের চাপে শ্রী রণেশ দাশগুপ্ত জেল থেকে বেরিয়ে এলে তাঁর কাছে শুনেছি, ঐ কবিতাটি শেখ সাহেবের কাছে পৌঁছেছিল এবং তিনি আমার কবিতাটি পড়ে খুব খুশি হয়েছিলেন। তিনি রণেশদার রুমে ছুটে গিয়েছিলেন তাঁকে কবিতাটি পড়ে শোনাতে। আমার এ কথা ভাবতে খুব আনন্দ লাগে যে, শেখ মুজিব, কিছুদিনের ব্যবধানে যাঁর কণ্ঠে উচ্চারিত হবে বাংলার স্বাধীনতার কথা; ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে বন্দি অবস্থায় ঐ কণ্ঠ থেকে আমার ঐ তুচ্ছ-কবিতাটি আবৃত্ত হয়েছিল। শুধু রণেশদা নয়, তখন যাঁরা জেলে ছিলেন তাদের আরও অনেকের হাতেই তিনি ঐ কবিতাটি তুলে দিয়েছিলেন পড়বার জন্য। রণেশদার ভাষায়, শেখ সাহেবকে (তখন তিনি শেখ সাহেব বা শেখ মুজিব নামেই পরিচিত ছিলেন) একজন খুব আনন্দিত শিশুর মতো লাগছিল যখন তিনি কবিতাটি নিয়ে তাঁর আবেগ ও আনন্দ প্রকাশ করছিলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরে জনাব লতিফ সিদ্দিকীর (তিনি তখন সলিমুল্লাহ্ মুসলিম হল ছাত্র সংসদের ভিপি ছিলেন) কাছে শুনেছি, তিনিই দৈনিক সংবাদ-এ প্রকাশিত আমার কবিতাটি জেলখানায় শেখ মুজিবকে পাঠ করে শুনিয়েছিলেন। ছাত্রনেতা লতিফ সিদ্দিকীও তখন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে শেখ মুজিবের সহবন্দী ছিলেন।

আমার মতো একজন তরুণ কবির জন্য ঐ ঘটনাটি ছিল খুবই গর্বের বিষয়। এখনও যখন আমি ঐ ঘটনাটির কথা ভাবি, আমার খুব ভালো লাগে এই মনে করে যে, সঠিক সময়ে সঠিক কবিতাটি আমি লিখতে পেরেছিলাম। তাঁর কাছে আমার ঐ কবিতাটি পৌঁছবে, এ রকম লোভ আমার ছিল বটে, কিন্তু আমার গোপন ইচ্ছে যে এমন চমৎকারভাবে পূর্ণ হবে, তা আমার জানা ছিল না।

যারা আমার কোনো কাব্যগ্রন্থে শেখ মুজিবকে উৎসর্গ করা ঐ কবিতাটি খুঁজে পাবেন না, তাদের জন্য এই কবিতা প্রসঙ্গে ব্যাখ্যা দেয়ার প্রয়োজন বোধ করছি।

আমি যখন বাংলায় অনার্স নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হই, তখন আমার চেয়ে এ্যাকাডেমিকেলি দুই বছরের ছোট মুজিব-কন্যা শেখ হাসিনা আমার সহপাঠিনীতে পরিণত হন। একদিন ক্লাসে গিয়ে মুজিব-কন্যা শেখ হাসিনাকে ক্লাসে দেখে আমর খুব ভালো লাগে। তাঁর চেহারার সঙ্গে শেখ মুজিবের চেহারার মিল আছে। আমার খুব আনন্দ হয় শেখ হাসিনাকে খুব কাছে থেকে দেখতে পাচ্ছি এবং পাব ভেবে। আমি তাঁর মধ্যে যেন শেখ মুজিবকেই প্রত্যক্ষ করি। শেখ হাসিনার সঙ্গে পরিচিত হতে আমার খুব ইচ্ছে করে—কিন্তু এগিয়ে গিয়ে পরিচিত হতে আমার ব্যক্তিত্বে বাধে। তিনিও খুবই ব্যক্তিত্বসচেতন। নিজের মধ্যে নিজেকে সর্বদা গুটিয়ে রাখেন। সকলের সঙ্গে কথা বলেন না। তাই আমারও তাঁর সঙ্গে যেচে কথা বলার সুযোগ হয় না। আমি কবি, তাঁর চেয়ে বয়সে বড়—আমি কেন তাঁর কাছে যাব? তাঁরই উচিত আমার কাছে আসা। আমি তাঁর বাবাকে উৎসর্গ করে সংবাদে যে দীর্ঘ-কবিতাটি রচনা করেছি, সেটি তিনি নিশ্চয়ই পড়েছেন। আর পড়ে থাকলে আমাকে ঐ কবিতার জন্য তাঁর প্রশংসা করা উচিত। আমি ভাবতাম, একদিন তিনি আমার কাছে এসে বলবেন, 'আপনার সঙ্গে পরিচিত হতে এলাম, আমার নাম শেখ হাসিনা। আব্বাকে নিয়ে লেখা আপনার কবিতাটি আমার খুব ভালো লেগেছে। আমি আপনার ভক্ত।'

কিন্তু না, দিনের পর দিন চলে যায়, তিনি আমার সঙ্গে কথাই বলেন না। বলেন না তো বলেনই না। আমার ব্যাপারে এমন কোনো আগ্রহই তিনি প্রকাশ করেন না, যাতে কবি হিসেবে আমি নিজেকে সম্মানিত ভাববার এতটুকু সুযোগ পাই। ফলে সঙ্গতকারণেই এই ব্যাপারটা নিয়ে আমার মনের ভিতরে ক্ষোভ জমছিল। আর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সম্ভবত আমার অজ্ঞাতে আমার সম্পর্কে ক্ষোভ জমছিল তাঁর মনেও। একদিন উভয়ের ক্ষোভের বিস্ফোরণ ঘটল এভাবে :

তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কৃষ্ণাঙ্গ-নেতা ডক্টর মার্টিন লুথার কিং মেম্ফিসে James Earl Ray নামে একজন জেল-পলাতক খুনীর হাতে গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হয়েছেন। তারিখটি ছিল, ২৯ এপ্রিল ১৯৬৮। আমি মার্টিন লুথার কিং-এর ভক্ত ছিলাম। মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র ৩৯ বছর। শান্তির জন্য ৩৪ বছর বয়সে তিনি নোবেল শান্তি পুরস্কার লাভ করেছিলেন। আমেরিকার কালোদের অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়ে তিনি তখন বিশ্বখ্যাতির অধিকারী। লুথার কিংয়ের অকাল মৃত্যুতে আমি গভীরভাবে মর্মাহত হই। ঐ হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় অন্য যারা ব্যথিত হয়েছিল, তাদের সঙ্গে আলাপ করে আমরা মার্টিন লুথার কিংয়ের প্রতি শ্রদ্ধা এবং হত্যাকাণ্ডের প্রতি আমাদের ঘৃণা ও প্রতিবাদ প্রকাশের জন্য একটা ছোট্ট কবিতা-সংকলন প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নিই। খুব দ্রুতই ঐ সংকলনটি প্রকাশিত হয়। সংকলনটির নাম দিই 'লুথার কিং-কে নিবেদিত কবিতাগুচ্ছ'। আমার সহপাঠী বন্ধু আতিকুল ইসলাম (খোকন (এখন যুব মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক, তখন এনএসএফ করতেন) ছিলেন ঐ সংকলনের সম্পাদক। আতিক ঐ সংকলনের জন্য বেশ কিছু টাকা দিয়েছিল। আমার আরেক সহপাঠিনী, ছাত্র ইউনিয়নের নেত্রী বেবী মওদুদ ছিলেন ঐ সংকলনের প্রকাশক। তাতে আমার, আবুল হাসান, হুমায়ুন কবির, সেলিম সারোয়ার ও সেলিম আল দীনের কবিতা ছিল। নাট্যকার সেলিম আল দীন তখন কবিতা লিখতেন। পরে কাব্যাঙ্গনের ভিড় দেখে নাট্যাঙ্গনে চলে যান।

ঐ সংকলনটি এখন আমার সঞ্চয়ে নেই। আমাদের শিক্ষক ড. আনিসুজ্জামান আমার অনুরোধে ঐ সংকলনের একটি ছোট্ট আলোচনা লিখেছিলেন তৎকালীন দৈনিক পাকিস্তানের সাহিত্য-পাতায়। কবি আহসান হাবীব ছিলেন ঐ পাতার সম্পাদক। আমাকে ও আবুল হাসানকে তিনি খুব স্নেহ করতেন। তাই তিনি পরের রবিবারেই ঐ আলোচনাটি ছেপে দেন। ডক্টর আনিসুজ্জামানের ক্ষুদ্র আলোচনাটি এখানে উদ্ধৃত করছি :

> 'ডক্টর লুথার কিংয়ের হত্যাকাণ্ডে বিশ্বের সকল শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ হতচকিত হয়েছেন, ঘৃণায় ও ক্ষোভে তাদের অন্তর ছেয়ে গেছে। এই প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টিধর্মী প্রকাশের কিছু নমুনা সংকলিত হয়েছে আতিকুল ইসলাম সম্পাদিত ও বেবী মওদুদ প্রকাশিত লুথার কিংকে নিবেদিত কবিতাগুচ্ছ নামক পুস্তিকায়। ডক্টর কিংয়ের স্মরণে এতে কবিতা রচনা করেছেন নির্মলেন্দু গুণ, আবুল হাসান, সেলিম সারোয়ার, হুমায়ুন কবির ও সেলিম আল দীন। প্রতিটি কবিতায় এই তরুণ সাহিত্যব্রতীদের আন্ত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রিক অনুভূতি ও আধুনিক মননের ছাপ আছে। এগুলোর মধ্যে নির্মলেন্দু গুণ ও হুমায়ুন কবিরের কবিতা দুটি আমার বিশেষ করে ভালো লেগেছে।

যে-বেদনা, সার্বজনীনতা ও মানবিকতার বোধ থেকে এ কবিতাগুলোর সৃষ্টি—তা শ্রদ্ধার যোগ্য। তাই এই পুস্তিকা প্রকাশে যাঁরা উদ্যোগী, তাঁদেরকে আমি অভিনন্দন জানাই।

—আনিসুজ্জামান

[দৈনিক পাকিস্তান : রবিবার, ১২ মে ১৯৬৮ ।]

আমার কবিতাটির নাম ছিল 'শ্বেতাঙ্গের শরে বিদ্ধ'। অন্যদের কবিতার নাম মনে পড়ছে না। আমরা ঐ সংকলনটি আমাদের ক্লাসে ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিক্রি করছিলাম। উদ্দেশ্য ছিল, প্রকাশনার খরচ উঠিয়ে যতটা সম্ভব লাভ করা। সংকলনটি মোটামুটি ভালোই বিক্রি হচ্ছিল। তাতে উৎসাহিত হয়ে বিক্রির এক পর্যায়ে আমি আর আবুল হাসান একদিন একসঙ্গে বন্ধুপরিবেষ্টিত শেখ হাসিনার কাছে যাই। গিয়ে সংকলনটি তুলে ধরি তাঁর সামনে। বলি, আমরা মার্টিন লুথার কিংকে নিয়ে এই সংকলনটি বের করেছি, আপনাকে দশ টাকা দিয়ে এটি কিনতে হবে।

তখনকার দিনে অবশ্য দশ টাকা মানে অনেক টাকা। শেখ মুজিবের কন্যা বলেই একটু বাড়িয়ে চাওয়া। এমন ছিল না যে, দশ টাকার কমে রফা হতো না। হতো। তিনি যদি সানন্দে আমাদের হাতে একটি টাকাও গছিয়ে দিতেন, আমরা নিতাম। কিন্তু তিনি ঐ সংকলনটি তো নিলেনই না, উপরন্তু উপস্থিত সকলের সামনে আমাদের সম্পর্কে, বিশেষ করে আমার দিকে বাঁকা চোখে তাকিয়ে এমন মন্তব্য করলেন, যা ছিল আমার জন্য খুবই অপমানজনক।

আবুল হাসান ও আমার সম্পর্কে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তখন প্রচলিত মূল্যবোধ-বিবেচনায় শোভন নয়, এমন মুখরোচক গল্প চালু ছিল। আমরা একসঙ্গে থাকি, খাই, ঘুমাই এবং ...... ইত্যাদি ইত্যাদি। গল্পগুলো মাঝে-মাঝে কিছুটা অতিরঞ্জিত রূপ নিলেও একেবারে মিথ্যা ছিল না, আমরা ওরকমই ছিলাম বটে। শেখ হাসিনার কানেও হয়তো ঐসব কথা পৌছে থাকবে। তাই অসৎপথেই ঐ সংকলনের বিক্রয়লব্ধ অর্থ ব্যয় হবে, এমন ইঙ্গিত দিয়ে তিনি বললেন, এর চেয়ে ভিক্ষুককে দশটা টাকা দিলে সেটা তার সত্যিকারের কাজে লাগবে। এইরূপ বলে, আমাদের প্রতি কটাক্ষ হেনে তিনি তাঁর বন্ধুদের (কাজী রোজী, সালমা যারা ছাত্রলীগ করত) নিয়ে দ্রুত চলে যান। আমরা কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মতো তাঁর গমনপথের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকি।

আমরা অপমানিত বোধ করলাম। বিশেষ করে আমি। আবুল হাসানকে আমিই নিয়ে গিয়েছিলাম। সুতরাং দায়িত্বটা আমার। অন্য কেউ এমনটি করলে হয়তো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার মনে এতটা কষ্ট হতো না—কিন্তু শেখ হাসিনা বলে কথা। তিনি ঐ ছাত্র ইউনিয়নের বেবী মওদুদ এবং এনএসএফের আতিকের সংশ্লিষ্টতার কারণে যদি সংকলনটি কিনতে না চান, তা খুলে বললেই পারতেন। অথবা টাকা সঙ্গে না থাকলে বলতে পারতেন, আমার হাতে এখন টাকা নেই, পরে আসেন। তিনি এসব কথা কিছুই বললেন না, তিনি বললেন 'ঐসব' কথা।

অনেক ভেবেচিন্তে আমি স্থির কললাম, শেখ হাসিনাকে ছাড়া যাবে না। এই অপমানের শোধ তুলতে হবে। আমি তোমার বাবাকে নিয়ে কবিতা লিখব—আর তুমি আমাকে পাত্তা দিবা না, আমার কবিতা তুমি পড়বা না, আমার কবিতার প্রশংসা করবা না, গা জ্বালা করা কথা শুনাইবা, নিস্পৃহতা দিয়ে অপমান করবা; তা সহ্য করা হবে না। আমি নিশ্চয়ই একটা কিছু করব। কী করব তা তখনই স্থির করি, কিন্তু সিদ্ধান্তটি বাস্তবায়িত করা হয় আরও অনেক পরে। ১৯৭০ সালে।

বাংলাদেশের ইতিহাস থেকে যারা শেখ মুজিবের নাম কেটে বাদ দিতে চান, তারা জেনে খুশি হবেন যে, আমিই ঐ কাজটি সর্বপ্রথম শুরু করেছিলাম। দীর্ঘদিন ধরে অভিমানমিশ্রিত রাগকে মনের ভিতরে পোষার পর, ১৯৭০-এর শেষদিকে আমি যখন আমার প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'প্রেমাংশুর রক্ত চাই' প্রকাশ করি তখন 'প্রচ্ছদের জন্য' কবিতার নাম বদল করে রাখি 'স্বদেশের মুখ শেফালি পাতায়' এবং কবিতার উৎসর্গপত্র থেকে শেখ মুজিবের নাম কেটে বাদ দিয়ে দিই।

এখন যখন আমি ঐ ঘটনার কথা মনে করি, আমার খুব লজ্জা হয়, কিন্তু আনন্দ পাই এই ভেবে যে, কী অমূল্য নিষ্পাপ আবেগই না তখন ছিল আমার! ছিল আমাদের!

অন্য কিছুও হয়তো করা যেত, কিন্তু ঐ বয়সে (আমার বয়স তখন আজকের বাংলাদেশের মতো, ২২-২৩ বছর) প্রিয়জনকৃত অপমানের হাত থেকে স্পর্শকাতর কবি-সত্তাকে মুক্ত করার আর কোনো সহজ পথ আমি খুঁজে পাইনি। আমি তো বলেছিই যে, 'কবিতা আমার নেশা, পেশা এবং প্রতিশোধ গ্রহণের হিরন্ময় হাতিয়ার।'

সাহিত্যের ছাত্রী এবং একজন লেখিকা হিসেবে শেখ হাসিনা নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন যে, পরাজিত কবিসত্তা উৎকৃষ্ট কবিতা রচনা করতে পারে না। বাইরে পরাজিত হলেও আপন-অন্তরে তাকে জয়ী হতে হয়। এই জয়ী হওয়ার জন্য আমার কবিতা থেকে নাম কেটে দিয়ে আমি কি সেদিন শেখ মুজিবকে অপমান করেছিলাম? না, আমার তা তখনও মনে হয়নি। এখনও মনে হয় না। মনে হয়, পুরো ব্যাপারটার মধ্যেই ছিল একটা ছেলেমানুষি। সহজ-সরল-সুন্দর ছেলেমানুষি। যা আছে বলেই কবি এখনও কবিতা লেখে, মানুষ এখনও কবিতা পড়ে। মানুষ এখনও মানুষকে ভালোবাসে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৯৬৮ সালের জানুয়ারি মাসের শেষ সপ্তাহে দু'জন সোভিয়েট লেখক এক সপ্তাহের জন্য পাকিস্তান সফরে আসেন। পাকিস্তানের সঙ্গে সোভিয়েট ইউনিয়নের সম্পর্ক ভালো ছিল না। জন্মের পর থেকেই পাকিস্তান ছিল আমেরিকাপন্থী। সোভিয়েট ইউনিয়ন ছিল পাকিস্তানের চিরশত্রু ভারতের বিশ্বস্ত বন্ধু। এমতাবস্থায় সোভিয়েট ইউনিয়নের দুই জন লেখকের পাকিস্তান আগমনের সংবাদে আমি খুবই অবাক হই। ঐ দুই সদস্যবিশিষ্ট সোভিয়েট লেখক প্রতিনিধি দলের মধ্যে একজন ছিলেন কবি। তাঁর নাম মিখাইল লুকোনিন। পুশকিন-মায়াকোভস্কি-পস্তারনাকের দেশের তরুণ-প্রজন্মের কবিদের মধ্যে পাশ্চাত্যের প্রচার ও প্রকাশনা মাধ্যমের কল্যাণে ইয়েভতুশেংকো ও ভজনেসেনস্কির নাম তখন আমরা জানতাম। কিন্তু ইয়েভতুশেংকোর শিক্ষক মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ের কবিতা বিভাগের প্রধান কবি মিখাইল লুকোনিনের নাম আগে শুনিনি। লুকোনিনের সফরসঙ্গী ছিলেন সাহিত্য-সমালোচক ইউরি রোমাইসেভ।

পশ্চিম পাকিস্তান সফর শেষে সোভিয়েট লেখকগণ পূর্ব পাকিস্তান সফরে আসেন। ২৬ জানুয়ারি শনিবার পূর্বাঞ্চলীয় লেখক সংঘের উদ্যোগে বাংলা একাডেমীতে সোভিয়েট লেখকদের সম্মানে এক সংবর্ধনা সভার আয়োজন করা হয়। পরের দিন ২৭ জানুয়ারির দৈনিক পাকিস্তানে খবর বেরোয় যে, ঐদিন সন্ধ্যায় আণবিক শক্তি কমিশনের কনফারেন্স কক্ষে সোভিয়েট কবি মিখাইল লুকোনিন কবিতা পাঠ করে শোনাবেন। খবরটি পড়ে আমি খুবই উত্তেজিত বোধ করি। একজন সোভিয়েট কবিকে কাছে থেকে দেখার এবং তাঁর স্বকণ্ঠে কবিতা পাঠ শোনার এই বিরল সৌভাগ্য অর্জনের জন্য আমি খুব খুশি হই। আমি অনুষ্ঠান শুরুর একটু আগে থেকে আণবিক শক্তি কমিশনের সামনে গিয়ে হাজির হই।

আমার ধারণা ছিল, সোভিয়েট ইউনিয়নের কবির কণ্ঠে কবিতা শুনবার জন্য ঢাকার কবি এবং কাব্যামোদীরা এসে আণবিক শক্তি কমিশনে ভিড় জমাবে। আগে না গেলে বসবার স্থানই হয়তো পাওয়া যাবে না। কিন্তু আমি খুবই অবাক হয়ে লক্ষ্য করি যে, আণবিক শক্তি কমিশনের ভিতরে বা বাইরে কোনো লোকজনই নেই। ঐ দিন রবিবার থাকায় রেসকোর্স ময়দানে ঘোড়-দৌড় ছিল। সেখানে প্রচুর লোকের ভিড়। আমি যখন হতাশ হয়ে রেসকোর্স মাঠের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম ঠিক তখন কবি শামসুর রাহমান একটি রিক্সায় চেপে অনুষ্ঠানে আসেন। তাঁকে পেয়ে আমি খুব খুশি হই। একজন কথা বলার মতো মানুষ পাই। আমরা দু'জনে আণবিক শক্তি কমিশনের ভিতরে যাই। কিছুক্ষণের মধ্যে সোভিয়েট

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কবিকে নিয়ে লেখক সংঘের কর্মকর্তারা আসেন এবং ক্রমশ আরও কয়েকজন লেখক-বুদ্ধিজীবীর আগমন ঘটে। তবে দর্শক-শ্রোতার সংখ্যা ছিল খুবই কম। এত কম যে আমার খুব লজ্জাই লাগছিল। শুনেছি সোভিয়েত কবিদের কবিতা পাঠের আসরে হাজার হাজার দর্শক-শ্রোতার সমাগম হয়। আমাদের মতো একটি জনবহুল দেশে এসে এত কম মানুষের মধ্যে কবিতা পাঠ করতে গিয়ে সোভিয়েট কবি নিশ্চয়ই আনন্দ পাবেন না। তিনি আমাদের কাব্যপ্রীতি সম্পর্কে খুব খারাপ ধারণা নিয়েই দেশে ফিরে যাবেন।

কিছুক্ষণ অপেক্ষার পরও যখন বোঝা গেল যে, আর দর্শক-শ্রোতার আগমন ঘটবে না তখন অনুষ্ঠান শুরু করা হয়। লেখক সংঘের পূর্বাঞ্চলের সভাপতি প্রফেসর খান সারওয়ার মুরশিদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠান শুরু হয়। হলরুমটি খুব ছোট হওয়ায় মোটামুটিভাবে হলরুমটিকে ভর্তি বলে মনে হয়। দর্শকদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কবি শামসুর রাহমান, প্রফেসর আবদুল হাই, ঔপন্যাসিক-সাংবাদিক শহীদুল্লাহ কায়সার, ঔপন্যাসিক শওকত ওসমান, কবি-সাংবাদিক আবদুল গণি হাজারী, অধ্যাপক মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, কবি মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, সাহিত্যিক-সাংবাদিক সন্তোষ গুপ্ত, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের লেকচারার শিরিন হাসিব, আমার কবি-বন্ধু হুমায়ুন কবির, রুবী রহমান, আবুল হাসনাত প্রমুখ।

আবদুল গণি হাজারী সন্তোষ গুপ্ত কর্তৃক অনূদিত দগ্ধ দিগন্ত কবিতার অংশবিশেষ পাঠ করেন। মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান মিখাইল লুকোনিনের 'স্মৃতিস্তম্ভের উক্তি' কবিতার অনুবাদ পাঠ করে শোনান।

কবির কবিতা থেকে পাঠ শেষ হলে পর কবি মিখাইল লুকোনিন তাঁর মাতৃভাষা রুশ ভাষায় আবৃত্তি করেন Sleep, O sleep এবং The charcold frontier কবিতার অংশবিশেষ। কবিতার ইংরেজি অনুবাদ পাঠ করে শোনান শিরিন হাসিব। শিরিন হাসিবের কবিতা পাঠ শেষ হলে কবি ঐ সুন্দরী শিরিন হাসিবকে লক্ষ্য করে বলেন, I'am grateful to this young beautiful lady. I like man but woman specially. রুশ-ভাষার বাঙালি শিক্ষক জনাব শাহাবুদ্দিন মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন। তিনি ইংরেজিতে কবির তাৎক্ষণিক কথাগুলো শ্রোতাদের বুঝবার জন্য বাংলায় অনুবাদ করে শোনাচ্ছিলেন। আমরা কবির কথা শুনে খুবই আনন্দ পাই। নারী সম্পর্কে কবিদের বিশেষ দুর্বলতার পক্ষে এমন জোড়ালো চমৎকার সত্য ও সুন্দর বক্তব্য আমি ইতিপূর্বে আর কখনও কারও মুখে শুনিনি। বইয়েও পড়িনি। পরে লুকোনিনের ঐ কথাটি আমার জীবনদর্শনে পরিণত হয়।

ঐদিনের অনুষ্ঠানে সোভিয়েট কবির কবিতা পাঠ আমার মনকে কতটা দোলা দিয়েছিল তার প্রমাণ পাওয়া যাবে আমার তখনকার একটি গদ্য রচনায়। লেখাটি সংবাদের সাহিত্য সাময়িকীতে প্রকাশিত হয়েছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"তাঁর নিজের ভাষায় আবৃত্তি শুনলাম Sleep, O sleep এবং The charcold frontier বা দগ্ধ সীমান্ত কবিতার অংশবিশেষ। (মাত্র কিছুদিন আগে যুদ্ধবিধ্বস্ত ভিয়েতনাম এবং কম্বোডিয়া ভ্রমণ করার সময় কবি লুকোনিন ঐ দীর্ঘ কবিতাটি লিখেছিলেন এবং বিখ্যাত প্রাভদা পত্রিকায় কবিতাটি প্রকাশিত হয়।) কবি অনর্গল গড় গড় করে কখনও জোরে, কখনও মন্থরভাবে কিন্তু খুবই আবেগকাতর শিশুর মতো আবৃত্তি করে গেলেন তাঁর কবিতা। তাঁর কোনো কথাই বোধগম্য হবার নয়, অথচ মনে হচ্ছিল বাইরে কোথাও বৃষ্টি হচ্ছে—একটা ছন্দোবদ্ধ সেতারের সুর বেজে চলেছে আমাদের রক্তে-রক্তে। যেন হারমোনিয়ামের রীডে সুনিপুণ এক শিল্পীর আঙুল খেলা করছে কাছেই কোথাও।..."

(দ্রঃ কবি দর্শন : সংবাদ সাহিত্য সাময়িকী, ১১ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৮)

যে দেশে তিনি জন্মগ্রহণ করেন, শুধুমাত্র সেই দেশের চৌহদ্দির মধ্যেই কবি আবদ্ধ থাকেন না—পৃথিবী নামক এই সম্পূর্ণ গ্রহটিই কবির দেশ, লোক থেকে লোকান্তরে, দেশ থেকে দেশান্তরে কবির মন তাই ছুটে বেড়ায়। যেখানে সুন্দরের সন্ধান মেলে সেখানেই কবির মন আনন্দ পায়, পৃথিবীর যে কোনো দেশের মানুষের দুঃখ-কষ্টেই তাঁর মন ব্যথিত হয়। লুকোনিনের 'দগ্ধ সীমান্ত' কবিতার মধ্যে কবির সেই উদার আন্তর্জাতিকতাবাদী মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পেয়ে আমার কাব্য জীবনের শুরুতে আমি খুবই উপকৃত বোধ করি।

তাঁর রচিত দগ্ধ সীমান্ত কবিতার কিছু অনূদিত অংশ এখানে উদ্ধৃত করছি।

দগ্ধ সীমান্ত

শীতার্ত পৃথিবীর নিচে
ঊর্ধ্বে হাওয়াই জাহাজে চলেছি
উঠছি উঁচু-পাহাড় শিখরে
দিগন্ত বিসারী আলা-তাউ
পিছনে আলমা আতা, মেডেও স্টেডিয়ামে
পর্বতের উত্তুঙ্গ চূড়ায়
দাঁড়িয়েছিলাম আমি।

পৃথিবীর সব নরনারী
জনে জনে সবাকার কাছে আমার এ আবেদন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলো, কেমনে সে-কাহিনী শোনাবো?
তবুও সাদামাটা সহজ ভাষায়
আমাকে বলতেই হবে...
বছর পিছনে ফেলে চলো,
যেদিন ৩ জানুয়ারি
আজ থেকে ঠিক পুরো একটি বছর
কম্বোডিয়ার সীমান্তে সেদিন
দাঁড়িয়েছিলাম তছনছ করা কলাবাগানে
চোখের সামনে ভয়াবহ অবিশ্বাস্য দৃশ্য।

সুড়ঙ্গ-পথের মুখে—পশুর বিবর যেন—
দুর্গম জঙ্গলে
ভোঁতা কোদালের ঘায়ে উপড়ে ফেলে জমি
তৈরি হয়েছিল এই গোপন আস্তানা।
দেখলাম দলা দলা রক্ত ছিটকে পড়া
রক্তাক্ত মাটিতে
নিভন্ত চুল্লির পাশে জননীর
শোকাহত সুরে ঘুম পাড়ানিয়া গান
শূন্য দোলনা দোলে।
দুগ্ধভারে স্ফীত স্তনে পিঙ্গল বৃন্তের
থরো থরো প্রতীক্ষিত
শিশুর অধর পিষ্ট শোষণ তিয়াস।

আতংকে আর দুঃখে
আর্তনাদ করছে মেয়েরা।
হায় আমেরিকা, কান পেতে শোনো
শোনো গুমরানো আর্তস্বর আর চাপা কান্না—
পৃথিবীর কৃত্রিম স্পুতনিকের মাধ্যমে
আমি ঘোষণা করছি, শোনো!

[দগ্ধ সীমান্ত : অনুবাদ : সন্তোষ গুপ্ত]

'স্মৃতিস্তম্ভের উক্তি' কবিতাটি মূল রুশ থেকে ইংরেজিতে অনুবাদ করেছিলেন রুশ লেখিকা মরিয়ম সালগানিক। মরিয়ম সালগানিকের ইংরেজি অনুবাদ অনুসরণে কবি মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ঐ কবিতাটির বাংলা রূপান্তর করেন।

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চৌদ্দ বছরের ব্যবধানে, ১৯৮২ সালে একদিন আমি যুদ্ধবিধ্বস্ত ভিয়েতনাম ও কম্বোডিয়ার সীমান্তে গিয়ে দাঁড়াবার সুযোগ পাব, এবং মস্কো রাইটার্স ইউনিয়নের কর্মকর্তা লেখিকা কমরেড মরিয়ম সালগানিকের সঙ্গে আমার অন্তরঙ্গ পরিচয় ঘটবে, তা তখন আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি।

আমার দুর্ভাগ্য যে, আমার মস্কো যাওয়ার ঠিক আগের বছরই (১৯১৮-১৯৮১) রুশ কবি মিখাইল লুকোনিন লোকান্তরিত হন।

আমার মধ্যে সোভিয়েত-প্রীতি এবং সমাজবাস্তবতাবাদী মার্কসীয় সাহিত্যদর্শনের প্রতি আস্থা সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে সোভিয়েট কবি মিখাইল লুকোনিন আমাকে অনেকটাই প্রভাবিত করেছিলেন বলে আমার ধারণা।

১৯৬৫-তে ইত্তেফাক পত্রিকায় একটি পুরো পাতাজুড়ে সমকালের 'কবিতা সংখ্যা'র আলোচনা বেরিয়েছিল। ট্রেনে নেত্রকোনা থেকে বারহাট্টা যাবার পথে আমি এক যাত্রীর কাছে ইত্তেফাকের ঐ সংখ্যাটি দেখেছিলাম। তখন আমাদের এলাকায় খুব বেশি পত্রিকা যেত না। ফলে ঐ সংখ্যাটি আমার আর সংগ্রহ করা হয়ে ওঠেনি। কিন্তু স্মরণে রয়ে গিয়েছিল ঐ পাতায় কিছুক্ষণ চোখ বোলানোর স্মৃতি। সেখানে কবিদের নানা-ভঙ্গির পাসপোর্ট সাইজ ছবি এবং তাদের কবিতার অংশবিশেষ ছাপা হয়েছিল। কবি শামসুর রাহমানের ছবি আমি সেখানেই প্রথম দেখি। 'রৌদ্র করোটিতে' কাব্যগ্রন্থের জন্য যখন তিনি আদমজী সাহিত্য পুরস্কার পান, তখনও পত্রিকায় তাঁর ছবি প্রকাশিত হয়। ফলে তাঁর ছবি এবং কবিতার সঙ্গে আমি বলা যায়, আগে থেকেই পরিচিত ছিলাম।

শামসুর রাহমানের ছবি দেখেই আমার মনে হয়—ইনি অন্যরকম। চেহারা এবং পরিধেয় দেখে তাঁকে কবি বলে মনে হয় না। তখন আমার এমন ধারণা ছিল যে, কবিদের চেহারা এবং পোশাক হবে লালন-রবীন্দ্রনাথ বা নজরুলের কাছাকাছি একটা কিছু। তাদের বড় চুল থাকবে। গায়ে থাকবে পাঞ্জাবি এবং কাঁধে একটা খদ্দরের চাদর। দাড়ি থাকলে ভালো, না থাকলেও চলে। পরে অবশ্য আমার ঐ ধারণার কিছুটা পরিবর্তন ঘটে, যখন আমি তিরিশের কবিদের ছবি ও জীবনীর সঙ্গে ক্রমশ পরিচিত হই।

শামসুর রাহমান সুদর্শন। তাঁর কপাল নায়ক উত্তম কুমারের মতো চওড়া। মাথায় ফণা তোলা ঘন কালো চুল। চোখে ভারী কালো ফ্রেমের চশমা। ঈষৎ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উন্মোচিত ঠোঁটে রোমান্টিক হাসি। চোখের দৃষ্টিতে লাজুকতা। শামসুর রাহমানের ছবি দেখে আমার ঈর্ষা হয়। ভাবি, আহা! আমার চেহারাটা যদি এরকম হতো, তাহলে প্রেম করতে কতই না সুবিধে হতো আমার। নেত্রকোনায় থাকতেই তাঁর 'প্রথম গান দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে' এবং 'রৌদ্র করোটিতে' পড়েছি। এর অনেক ক'টি কবিতাই আমার ভালো লাগে। যদিও তাঁর কবিতার অনেককিছুই আমি তখন ভালো বুঝতে পারিনি। ঢাকায় এসে জানতে পারি যে, তিনি প্রেস ট্রাস্টের পত্রিকা, দৈনিক পাকিস্তানের সহকারী-সম্পাদক। ইংরেজি সাহিত্য নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েছিলেন—কিন্তু এমএ প্রথম পর্ব শেষ করার পর আর পড়েননি। কিছুদিন রেডিওতে কাজ করেছিলেন, পরে চাকরি নেন মর্নিং নিউজ পত্রিকায়। সেখান থেকে এখন গেছেন দৈনিক পাকিস্তানে।

কবি শামসুর রাহমানের সঙ্গে আমার চাক্ষুষ পরিচয় ঘটে ১৯৬৭ সালে, তাঁর পুরনো ঢাকার আওলাদ হোসেন রোডের পৈতৃক বাড়িতে। আমার আগে ঢাকায় আসায় এবং কণ্ঠস্বর, কবিকণ্ঠ (শামসুর রাহমান ও ফজল শাহাবুদ্দীন সম্পাদিত), কালবেলা (জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত ও হায়াৎ মামুদ সম্পাদিত)সহ ঢাকার নামী-দামী সকল লিটল ম্যাগাজিনে আবুল হাসানের কবিতা প্রকাশিত হওয়ার কারণে, ঢাকার গুরুত্বপূর্ণ লেখকদের প্রায় সবার সঙ্গেই তার পরিচয় হয়ে গিয়েছিল। আমি একটু পরে আসাতে ঢাকার কবি-সাহিত্যিকদের সঙ্গে পরিচয়ের ব্যাপারে অনেক ক্ষেত্রেই আমাকে আবুল হাসানের ওপর নির্ভরশীল হতে হয়। আবুল হাসানের মাধ্যমেই অনেকের সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটে।

আমি আর আবুল হাসান এক সন্ধ্যায় শামসুর রাহমানের বাড়িতে যাই। পুরনো ঢাকার একটি অতি পুরনো বাড়িতে তিনি তখন থাকেন। চারদিকে উঁচু দালান থাকায় ঐ বাড়িতে বেশি আলো-হাওয়া আসে না। বাড়ির নিচেই ইউনিভার্সেল প্রেস। ঐ প্রেস থেকে সর্বদা মুদ্রণযন্ত্রের বিদঘুটে আওয়াজ ভেসে আসে। এই বাড়িতে বসেই তিনি 'রূপালি স্নান', 'দুঃখ' 'পার্কের নিঃসঙ্গ খঞ্জ', 'কখনো আমার মাকে'—এই বিখ্যাত কবিতাগুলো লিখেছেন, ভেবে আমার খুব ভালো লাগে।

কবি শামসুর রাহমান খুব মিশুক নন বলে শুনেছিলাম, কিন্তু সেদিন তিনি আমাদের সঙ্গে বেশ সময় নিয়েই কথা বলেন। চা-বিস্কিট সহযোগে আমাদের আপ্যায়নও করেন। কথা প্রসঙ্গে কবি জীবনানন্দ দাশের সঙ্গে তাঁর চাক্ষুষ পরিচয়ের স্মৃতিচারণও করেছিলেন তিনি। জীবনানন্দ দাশের সঙ্গে কবি শামসুর রাহমানের সাক্ষাৎ ঘটেছিল জীবনানন্দের অপঘাত মৃত্যুর মাত্র কিছুদিন আগে। বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত 'কবিতা' পত্রিকায় শামসুর রাহমানের কবিতা গুরুত্বসহকারে ছাপা হওয়ার কারণে জীবনানন্দ শামসুর রাহমানের কবিতার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। শুনে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার খুব গর্ব হয়, মনে হয় শামসুর রাহমানের ভিতর দিয়ে যেন আমরা কবি জীবনানন্দ দাশকেও দেখতে পাচ্ছি। আর এ কথা তো তখন সবারই জানা যে, শামসুর রাহমানের প্রথমদিকের কবিতায় জীবনানন্দ দাশের খুব প্রভাব ছিল। তাঁর নিজের ভাষায়, রবীন্দ্রনাথ নন, তাঁর মন কেড়েছিল 'সম্মিলিত তিরিশের কবি'। জীবনানন্দ ছিলেন তিরিশের কবিকুল-শিরোমণি। আমরা সেদিন জীবনানন্দকে নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেছিলাম। আবুল হাসান বরিশালের কবি, জীবনানন্দের মতোই। ফলে জীবনানন্দকে নিয়ে তার বিশেষ আগ্রহ এবং গর্ব ছিল। আমাদের দৈনিক পাকিস্তান কার্যালয়ে যাবার আমন্ত্রণ জানিয়ে তিনি আমাদের বিদায় জানান। কবি-পত্নী জোহরা রাহমানকে একনজর দেখার গোপন-ইচ্ছেটি সেদিন আমাদের পূর্ণ হয়নি। এখানেই 'দুঃখ তার লেখে নাম।'

কবি আল মাহমুদের সঙ্গে আমার চাক্ষুষ পরিচয় ঘটে এর কিছুদিন আগে। 'সমকাল' পত্রিকায় আমার কবিতা আমার সমসাময়িক কবি-বন্ধুদের আগে প্রকাশিত হওয়ার কারণে (১৯৬৭ সালের শুরুতে) সমকাল-সম্পাদক কবি-নাট্যকার সিকানদার আবু জাফরের সঙ্গে আমার একটা সুসম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। সমকালে প্রকাশিত আমার ঐ কবিতাটি (দ্বিতীয় সত্তাকে) এমন কোনো উন্নত মানের কবিতা ছিল না, যাতে ঐ কবিতাটির জন্য আমাকে খুব প্রতিশ্রুতিশীল বলে ভাবা যায়। বলা যায়, অকারণেই তিনি আমাকে স্নেহ করতেন। আমার প্রতি তাঁর এমন একটা আস্থা ছিল যে, এখন না পারলেও পরে একসময় আমার হাত দিয়ে ভালো কবিতা লেখা হবে। আমার ওপর কবি সিকানদার আবু জাফরের ঐরূপ আস্থা আমাকে খুবই উৎসাহিত করত। আমি তাঁকে জাফর ভাই বলে ডাকতাম। কারণে-অকারণে ডিআইটি এভিন্যুতে অবস্থিত সমকাল কার্যালয়ে গিয়ে বসে থাকতাম। ঐ প্রেসের কম্পোজ সেকশনে কাজ করতেন আফজাল ভাই (বর্তমানে বাংলা একাডেমীর প্রেসের প্রোডাকশন ম্যানেজার), হারুন সাহেব, বাঁধাই সেকশনে ছিলেন আওলাদ ভাই। অফিস পিয়ন ছিল বাচ্চা মিয়া। এঁদের সবার সঙ্গেই আমার খুব ভাব হয়ে গিয়েছিল। আমি পাশে বসে তাঁদের কাজ দেখতাম। কীভাবে কবিতা কম্পোজ হয়, কীভাবে বই-পত্রিকা বাঁধাই হয়, এইসব।

ঐ সমকালেই কবি আল মাহমুদকে আমি প্রথম দেখি।

আমি আল মাহমুদের লিরিক কবিতার ভক্ত। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'লোক লোকান্তর'-এর অনেক কবিতাই আমার মুখস্থ। আমি তাস খেলার পাগল। পরে অন্য খেলায় চলে গেলেও, শুরুতে ব্রে ছিল আমারও প্রিয় খেলা। আমি আল মাহমুদের ব্রে কবিতাটি পড়ে খুব মুগ্ধ হই। স্ত্রী নাদিরাকে উৎসর্গ করা ঐ কবিতাটির

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটি স্তবক এখনও আমার মনে পড়ে :

> 'যখন জীবনে শুধু অর্থহীন লাল হরতন
> একে একে জমা হলো, বলো, এ-কী অসম্ভব বোঝা;
> মুক্ত হয়ে হাঁটবার বন্ধ হলো সব পথ খোঁজা—
> আর এ দিকে তুমিও এলে ইস্কার বিবির মতন।'

যারা ব্রে খেলা জানেন, তারা এই কবিতার রস যতটা গ্রহণ করতে পারবেন, যারা জানেন না তারা ততটা পারবেন না। তাস খেলার এমন নৈপুণ্যভাস্বর ব্যবহার বাংলা কবিতায় অদ্বিতীয়। নবাগতা স্ত্রীকে বিড়ম্বিত কবি-জীবনে স্বাগত জানাবার এর চেয়ে বুদ্ধিদীপ্ত কৌশল আর কী হতে পারে? এই কবিতার বহুমাত্রিকতা আজও অনাবিষ্কৃত রয়ে গেছে বলেই আমার মনে হয়।

সেই আল মাহমুদ এক দুপুরে সমকালে আসেন। আমি তখন জাফর ভাইয়ের সামনে বসে গল্প করছিলাম। স্পঞ্জের স্যান্ডেল পরা, গলায় ময়লা মাফলার জড়ানো, প্রায় নিঃশব্দ চরণে সমকালে প্রবেশ করা ঐ আগন্তুককে দেখে আমি ভাবতেই পারিনি, ইনি কবি আল মাহমুদ, যদিও পত্রিকায় তাঁর ছবিও আমি দেখেছিলাম। আগন্তুককে স্বাগত জানিয়ে জাফর ভাই বললেন, এই যে আল মাহমুদ, তোমার জন্য এই তরুণ কবি বসে আছে।

আল মাহমুদ? আমি চমকে উঠে দাঁড়িয়ে গেলাম চেয়ার ছেড়ে। কবি আল মাহমুদ আমার উদ্দেশ্যে করমর্দনের জন্য তাঁর ডান হাতখানা বাড়িয়ে দিলেন। আমি মুগ্ধ হলাম তাঁর সারল্যে। তাকে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে ভাবলাম, কোট-প্যান্ট পরা আধুনিক কবির দাপটের এই যুগেও আল মাহমুদের মতো কবি তাহলে এখনও সম্ভব?

আল মাহমুদ তখন ইত্তেফাক পত্রিকায় প্রুফ-রীডার হিসেবে অতি সামান্য বেতনে কাজ করতেন। তিনি উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত কেউ নন,—এ কথা জেনে আমি নিজের ব্যাপারেও কিছুটা আশ্বস্ত বোধ করলাম। আমার প্রিয় দুই প্রধান কবির শিক্ষাভাগ্য আমার শিক্ষা-দুর্ভাগ্যের বেদনাকে অনেকটাই লাঘব করে দিল। তাঁর কবিতা আমার মুখস্থ আছে শুনে আল মাহমুদ খুব খুশি হলেন। তাঁকে আমার বেশ ভালো লাগে।

সমকালের কবিতা সংখ্যায় রফিক আজাদের কবিতাও ছাপা হয়েছিল। সে-কারণে ইত্তেফাকের ঐ পাতায় রফিক আজাদের ছবিও ছাপা হয়। আমি তখনই জানতে পারি যে, জন্মগতভাবে টাঙ্গাইলের লোক হলেও বড় ভাইয়ের চাকরিসূত্রে ইনি নেত্রকোনা কলেজে পড়াশোনা করেছেন এবং একসময় তার কিছুটা সময় বারহাট্টাতেও কেটেছে। শুনে আমার খুব ভালো লাগে। তার মানে হচ্ছে বারহাট্টা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থেকেও কবি হওয়া সম্ভব। তখন আমার মনে এমন সন্দেহ কাজ করত যে, সব মাটিতে যেমন আঙুর, কমলা বা ল্যাংড়া আম হয় না, সব মাটিতেও তেমনি কবি হয় না। আমি ভাবতাম কবিও এক-ধরনের ফল। সব মাটিতে তা ফলবে কেন?

রফিক আজাদ নেত্রকোনা থেকে প্রকাশিত খালেকদাদ চৌধুরী সম্পাদিত 'উত্তর আকাশ' পত্রিকায় কবিতা লিখতেন। একসময় আমার এলাকায় ছিলেন, এ-কারণে আমি ঐ তাঁর সঙ্গে এক ধরনের নৈকট্য অনুভব করি। কিছুকাল পরে, সম্ভবত ১৯৬৬ সালে যখন আমি জানতে পারি যে তিনি ঢাকা হলে থাকেন, আমি একদিন বিকেলে তাঁর রুমে যাই। গিয়ে তাঁকে পেয়ে যাই। তিনি রুমেই ছিলেন। সেদিন তাঁর রুমে মাহবুবুল আলম ঝিনু এবং প্রশান্ত ঘোষালও ছিলেন। মাহবুবুল আলম ঝিনু লরেন্স ফার্লিংহেট্টির 'আণ্ডারওয়্যার' কবিতাটি অনুবাদ করেছিলেন। সম্ভবত 'স্বাক্ষর' পত্রিকায় তা ছাপা হয়েছিল। ঐ কবিতাটি পড়ে আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম। মার্কিন বীট-বংশের কবিদের সঙ্গে ওটাই ছিল আমার প্রথম যোগসূত্র। নেত্রকোনার লোক জেনে রফিক আজাদ আমাকে বেশ খাতির করেন। আমার কাছ থেকে নেত্রকোনার বিভিন্ন বন্ধু-বান্ধবের খোঁজখবর নেন। বারহাট্টার কথাও আসে। সন্ধ্যার দিকে ঢাকা হল থেকে বেরিয়ে তারা গুলিস্তানের কোথাও আড্ডা দিতে যাবেন। তারা আমাকে বিদায় করার চেষ্টা করছিলেন। আমি তা বুঝে ফেলি এবং তাদের সঙ্গে আড্ডা দেবার লোভে তাদের পিছু নিই। কিন্তু খুব বেশি দূর যাওয়া সম্ভব হয় না। তাদের পাশাপাশি হেঁটে আমাকে তাঁরা প্রেস ক্লাব পর্যন্ত যাবার সুযোগ দেন। তবে আমার মতো মফস্বলাগত গোত্রহীন কবি-যশপ্রার্থী তরুণের পক্ষে ঐ সুযোগ পাওয়াটাও সেদিন কম ভাগ্যের ব্যাপার ছিল না।

শহীদ কাদরীর সঙ্গে আমার পরিচয় হয় তাঁর গোপীবাগের বাসায়। তিনি তাঁর বড় ভাই শাহেদ কাদরীর সঙ্গে থাকতেন। টিভিতে প্রযোজকের চাকরি করেন। খুব আড্ডাবাজ মানুষ। তাঁর ঘরভর্তি ছিল পশ্চিমা-সাহিত্যের নানা ধরনের মূল্যবান বই। তাঁর উন্নাসিকতা-দোষ ছিল। আবুল হাসানের সঙ্গে কথা বললেও, আমাকে সেদিন তিনি কথা বলার যোগ্য বলে মনে করেননি।

আবদুল মান্নান সৈয়দের নিজস্ব বাড়ি ছিল গ্রীন রোডে। গ্রীন রোডের ওপর একটা ওষুধের ফার্মেসী ছিল, নাম ভুলে গেছি, ওটার পেছনে একটা বেশ বড় বাড়ি। আম, কাঁঠাল গাছ ছিল ঐ বাড়িতে। বাড়ির সামনের দিকে একটা আলাদা একতলা ঘর। সেখানেই তিনি থাকতেন। আবুল হাসান আমাকে একদিন তাঁর কাছে নিয়ে যায়। তিনি জন্মসূত্রে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ। খুব চমৎকার শুদ্ধ ভাষায় কথা বলেন। তবে আমি যতটা ভয় পেয়েছিলাম, ততটা নয়। তাঁর গল্প-কবিতা এবং প্রবন্ধের ভাষার চেয়ে তাঁর আলাপের ভাষা বেশ সহজ এবং বোধগম্য ছিল। তাঁর মাংস গল্পটি যে প্রথম পাঠেই আমার খুব ভালো লেগেছিল, আমি তাঁকে সে-কথা জানাই। তিনি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খুশি হন। আবুল হাসানের সঙ্গে তিনি পরাবাস্তবতা বিষয়ে আলোচনায় লিপ্ত হন। আমি শ্রোতা ও দর্শকে পরিণত হই। বাস্তবতা সম্পর্কে আমার কিছুটা ধারণা থাকলেও পরাবাস্তবতা বিষয়ে আমার তখন কোনো ধারণাই ছিল না।

কিছুদিনের ব্যবধানে এমএ পাস করে ফেলার কারণে কবি রফিক আজাদের মতো আবদুল মান্নান সৈয়দও অধ্যাপনার চাকরি নিয়ে ঢাকার বাইরে চলে যান। রফিক আজাদ যান টাঙ্গাইলে। মান্নান সৈয়দ যান সিলেটে। ফলে ষাট দশকের এ দুই কিঞ্চিৎ অগ্রজ সাহিত্য-সারথীর সান্নিধ্য থেকে আমরা বঞ্চিত হই।

একদিন আমরা দৈনিক পাকিস্তানে যাই। একটি বিশাল চারতলা দালান। এর নাম প্রেস ট্রাস্ট ভবন। এবারও আবুল হাসান আমার গাইড। কবি আহসান হাবীব দৈনিক পাকিস্তানের সাহিত্য পাতায় আবুল হাসানের কবিতা ছেপেছেন। হাসান ইতিমধ্যেই তাঁর স্নেহ অর্জনে সফল হয়েছে। আমরা স্কুল-কলেজের বাংলা পাঠ্যপুস্তকে কবি আহসান হাবীবের কবিতা পড়েছি। পরীক্ষায় তাঁর কবিতা 'এই মন, এই মৃত্তিকা' থেকে প্রশ্ন এসেছে। সেই কবির সঙ্গে পরিচিত হওয়া! আমার বেশ ভয় ভয় লাগছিল। হাসান বলল, ভয়ের কিছু নেই। কিন্তু ভিতরে গিয়ে দেখলাম হাসানের কথাটি পুরোপুরি ঠিক নয়, ভয়ের সঙ্গত কারণ আছে। তিনি পড়াশোনা কী করেছি, সে সম্পর্কে প্রশ্ন করেন। ছন্দ সম্পর্কে আমার জ্ঞান যাচাই করতে চান। এগুলো কী কম ভয়ের ব্যাপার?

একই রুমে বসতেন মহিলা পাতার সম্পাদিকা মাফরুহা চৌধুরী। তিনি গল্প লিখতেন। এবং তাঁর আরও একটি পরিচয় ছিল,—তিনি কবি তালিম হোসেন সাহেবের স্ত্রী এবং নজরুল গীতির উঠতি-গায়িকা সুন্দরী শবনম মুশতারীর মা।

AMARBOI.COM

আমাদের বিপদ দেখে তিনি একটু দূরে বসে মুচকি হাসতেন। কী আর করা? বুঝলাম হাবীব ভাই (হাসানের দেখাদেখি আমিও তাঁকে হাবীব ভাই বললাম) বেশ কড়া সম্পাদক। তিনি অত সহজে কবিতা ছাপবেন না। আমাদের সামনেই তিনি বেশকিছু লেখার পাণ্ডুলিপি কাটাকুটি করছিলেন এবং অধিকাংশই ফেলে দিচ্ছিলেন বাতিল কাগজের ঝুড়িতে। এক পর্যায়ে চা এলো। তিনি টেবিলের উপর পড়ে থাকা ক্যাস্টানের প্যাকেট থেকে একটি সিগারেট বের করে আলতো করে ঠোঁটে রেখে ধীরস্থিরভাবে পকেট থেকে দিয়াশলাই বের করে তাতে অগ্নিসংযোগ করলেন। পুরো ব্যাপারটার মধ্যেই ছিল একটা সুশৃঙ্খল শান্ত মন ও স্নিগ্ধরুচির প্রকাশ।

হাবীব ভাই বললেন, ঠিক আছে কবিতা নিয়ে এস, দেখব।

হাসান তখন আমার প্রতি হাবীব ভাইয়ের মনটাকে কিছুটা দ্রব করার জন্য ওকালতি করে বলল, আপনার কবিতা নির্মলের মুখস্থ আছে। তারপর আমাকে পা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিয়ে দিল টিপ। আমি আর কী করি? আবৃত্তি শুরু করলাম 'এই মন আর এই মৃত্তিকা' থেকে। হাবীব ভাই হাসলেন। তার রহস্যজনক হাসি দেখে আমাকে থামতে হলো। আমি তখন মাঝপথে ঐ কবিতা থামিয়ে আবৃত্তি করলাম তাঁর নতুন লেখা 'ফুলের এমন শোভা' এই কবিতা থেকে। এবার খুব কাজ হলো। আলাপ শুরু হলো ফুল নিয়ে। আমি ভাবলাম, ফুলের প্রতি তাঁর যখন এতই দুর্বলতা তখন ওটা কাজে লাগাই না কেন? হাসান তখন উল্টোপাল্টা কীসব বলে যাচ্ছিল, আমার মনে নেই। আমি বললাম, হাবীব ভাই, আমাদের বাড়িতে বিরল-ধরনের স্থলপদ্ম ফুলের গাছ আছে। ঐ গাছ যখন ফুলে ফুলে ভরে যায়, তখন কী যে সুন্দর লাগে! আমি ঐ স্থলপদ্মের একটি কলম কেটে আপনাকে দিতে চাই।

আমার প্রস্তাব শুনে হাবীব ভাই নতুন করে একটা সিগারেট ধরালেন। বুঝলাম, তিনি খুব খুশি হয়েছেন। আর খুশি হয়েছেন বলেই আবার সিগারেট। সিগারেটে সুখটান দিয়ে একটু ভেবে হাবীব ভাই বললেন, ঠিক আছে, দিও। তবে...

আমি বললাম, বুঝেছি, এর সঙ্গে কবিতা ছাপার কোনো সম্পর্ক নেই।

হাবীব ভাই মাথা দুলিয়ে হেসে বললেন, ঠিক তাই।

আমরা হাবীব ভাইয়ের মন জয় করে তাঁর ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। হাসান বলল কাজ হয়েছে। হাবীব ভাইয়ের মন গলেছে। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে হাসান বলল, তুমি তো বেশ চালাক লোক হে। হাবীব ভাইকে প্রথম দিনেই জয় করে ফেললে।

আমি হেসে বললাম, 'ফুলের এমন শোভা।'

হাসান মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, হ্যাঁ কবিতাটি সত্যিই খুব ভালো।

এবার আমাদের গন্তব্য উপরের তলায়। সেখানে এক রুমে বসেন কবি শামসুর রাহমান আর কবি হাসান হাফিজুর রহমান। এক রুমে বসেন সানাউল্লাহ নূরী এবং আহমেদ হুমায়ুন। এক রুমে বসেন কবি ফজল শাহাবুদ্দিন ও কবি মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ।

হাসান হাফিজুর রহমান কবি হিসেবে যতটা না খ্যাত, তার চেয়ে বেশি বিখ্যাত ছিলেন কাব্য সংগঠক হিসেবে। তাঁর সম্পাদিত একুশের সংকলনটি ছিল আমাদের সকলের নিত্য পাঠ্য। সিকানদার আবু জাফরের সঙ্গে যৌথভাবে সমকাল সম্পাদনা করেছেন কিছুদিন। তারপর অধ্যাপনা করেছেন জগন্নাথ কলেজে। আধুনিক বাংলা কবিতা সম্পর্কে তিনি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ লিখেছেন। তাঁর কাব্যগ্রন্থ 'বিমুখ প্রান্তর' আমি পড়েছি। এলিয়টের Waste Land-এর আবহকে তিনি পূর্ব বাংলার প্রেক্ষাপটে ব্যবহার করেছেন তাঁর ঐ গ্রন্থে। রাজনৈতিক অঙ্গীকারকে তিনি কবিতার জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে মনে করেন। তিনি খুব মিশুক মানুষ। বাড়ি জামালপুর।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জামালপুর তখনও ময়মনসিংহ থেকে আলাদা হয়ে যায়নি। আমার বাড়ি নেত্রকোনা জেনে তিনি খুশি হলেন। বললেন, জাফর ভাইয়ের কাছে আমি তোমার কথা শুনেছি। তোমার একটি কবিতাও পড়েছি। ভালো। বেশ ভালো। রসিকতা করে বললেন, এবার তোমাকে দিয়ে আবুল হাসানকে টাইট দেয়া যাবে।

তিনি খুব জর্দা দিয়ে পান খেতেন এবং একটু পরে পরেই চেয়ার ছেড়ে উঠে যেতেন পানের পিক ফেলতে। শামসুর রাহমান পান সিগারেট কিছুই খেতেন না। হাসান ভাইও সিগারেট খেতেন না কিন্তু পান খেতেন খুব বেশি। অবজারভার পত্রিকার উল্টোদিক দিয়ে ফকিরাপুলের ভিতরে যে রাস্তাটি ঢুকেছে ঐ রাস্তার শুরুতে একটা হোটেল ছিল, হোটেলের পাশেই ছিল একটা ছোট্ট পানের দোকান। দোকানের মালিক ছিল বিহারি। খুব ভালো পান বানাত। হাসান ভাই ওখান থেকে একসঙ্গে অনেকগুলো পান কিনে নিতেন। সঙ্গে নিতেন কালা জর্দা। তারপর একটা একটা করে খাওয়া। পরিচয়ের পর আমাকে প্রায়ই ঐ দোকানের পান তাঁকে এনে দিতে হতো। এক-পর্যায়ে আমারও অভ্যাস হয়ে যায়। জর্দা সহযোগে পান খাওয়ার অভ্যাসটা আমি হাসান ভাইয়ের কাছ থেকেই পেয়েছিলাম। হাসান ভাই নেই কিন্তু তাঁর ঐ অভ্যাসটি আমার মধ্যে এখনও বেঁচে আছে। আমার ও আমাদের পরবর্তী জীবনে হাসান ভাই খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন। সে বিষয়ে পরে বলব।

ফজল শাহাবুদ্দিনের কবিতার বই 'তৃষ্ণার অগ্নিতে একা' তখন সবে বেরিয়েছে। চমৎকার প্রোডাকশন। তাঁর কামজাগরূক কবিতাগুলো আমার খুব ভালো লেগেছিল। তাঁর একটি কবিতার চিত্রকল্প আমার মনে এখনও গেঁথে আছে। চিত্রকল্পটি ছিল এ রকম :

'শ্রাবণ মেঘেতে ভিজে দেহ যার ফুলে ওঠে
ঘননীল উতলা সেমিজে—
সেই মেয়ে তুমি ছাড়া আর কেউ নয়।'

এমন চমৎকার চিত্রকল্প বাংলা কবিতায় খুব সহজলভ্য ছিল না। মনে হয়, ভ্যান গগের আঁকা একটি তৈলচিত্র আমাদের চোখের সামনে এইমাত্র উন্মোচিত হলো।

কবি ফজল শাহাবুদ্দিন এবং কবি মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহর সঙ্গেও দৈনিক পাকিস্তান কার্যালয়েই আমার প্রথম পরিচয় হয়।

একই কাগজে গুরুত্বপূর্ণ কবি-সাহিত্যিকের সমাহার, তাঁদের সঙ্গে আমার পরিচিত হওয়ার জন্য কিছুটা সুবিধের হলেও—জাতির জন্য ব্যাপারটা খুব সুবিধের ছিল না। কেননা, প্রেস ট্রাস্ট ছিল বুদ্ধিজীবীদের বশ করার জন্য স্বৈরশাসক ফিল্ড মার্শাল মুহম্মদ আইয়ুব খানের তৈরি করা একটি চমৎকার ফাঁদ। সেই ফাঁদে আমাদের দেশের প্রথম সারির কবি-সাহিত্যিক ও সাংবাদিকরা জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে ধরা পড়েছিলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ডাকাতি-মামলা থেকে অব্যাহতি পাওয়ার সংবাদে গ্রামের জন্য আমার মন উতল হয়। কতদিন গ্রামে যাই না। পুলিশের দৃষ্টি এড়িয়ে যদিও রাতের অন্ধকারে দু'একবার গ্রামের বাড়িতে গেছি—তাতে মন ভরেনি। চলে আসার সময় মনটা বিষাদে ছেয়ে গেছে। ঐ যাওয়া ছিল অনেকটাই নজরুলের গানের মতো—'অন্ধকারে এসেছিলাম, থাকতে আঁধার যাই চলে।' এবার বীরের বেশে গ্রামে যাব। আমার মন ভরা আনন্দ। মামুন আর হাসানকে সঙ্গে নিয়ে নিলাম। বলা তো যায় না, সংবাদটি যদি মিথ্যা হয়ে থাকে! মনে মনে হাসি আর বলি, যাব না কেন? যাব। তবে একা একা যাব না। তোমাদেরও সঙ্গে নিয়ে যাব।

মামুনের বাড়ি টাঙ্গাইল। শহরে ওদের বাড়ি আছে। আমি ওদের টাঙ্গাইলের বাড়িতে গেছি। হাসানের বাড়ি বরিশালের এক অজপাড়া গাঁয়ে। হাসান সর্ব অর্থেই একেবারে গ্রামের ছেলে। আমাদের গ্রাম থেকে মাইল দেড়েক দূর দিয়েই রেল লাইন গেছে। বরিশালে রেল নেই। সেদিক থেকে আমাদের গ্রামটি হাসানের গ্রামের মতো অতটা অজ নয়। আমাদের গ্রামটি বিশেষ করে আবুল হাসানের খুব ভালো লেগে গেল। সোনালি সদ্য প্রবেশিকা পাস করেছে। ডাকাতি মামলার হাত থেকে অব্যাহতি পাওয়ার ব্যাপারে ওর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল, সে-কথা আগে বলেছি। ঐ ঘটনার পর বাড়িতে সোনালির দাপট বেড়ে যায়। ওর দাপটে বাড়িতে তিষ্ঠানো কঠিন হয়ে পড়ে। যে আমার চোখের দিকে তাকিয়ে কথা বলতে সাহস পেত না, সে এখন আমাকে নিয়মিত উপদেশ দিতে শুরু করে। বহু কষ্টে সংগ্রহ করা সিদ্ধির পুইরা আমার পাঞ্জাবির পকেট থেকে চুরি করে নিয়ে গিয়ে পুকুরের জলে ভাসিয়ে দেয়। বলে, এসব নাকি ছোটলোকদের খাদ্য। হদীদের খাদ্য।

শোন কথা! যা ছাড়া আমাদের দেবতাকুলশিরোমণি মহাদেবের পেটের ভাত হজম হয় না, তা নাকি ছোটলোকদের খাদ্য। তবে মাঝে মাঝে ওকে মান্য করার ভানও করতে হয়। সে-ই আমাদের খেতে দেয়।

ঝিল্লিও কিশোরী, সদ্য প্রস্ফুটিত ফুলের ন্যায়। মেজদা, মামুন ভাই, হাসান ভাই, বলে আমাদের চারপাশে ঘুরঘুর করে। আমার দিদি রূপালি, সে ছিল চির রুগ্ণা। তাই সহজে আমাদের সামনে আসে না। একটু আড়ালে আড়ালে থাকে। ছোট ভাই দুটি, লিপটন ও পল্টু সর্বদা আমাদের অর্ডার মতো কাজ করে। আমি যে বাঘের মুখ থেকে ফিরে আসতে পেরেছি তাতে তাদের খুশির অন্ত নেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার বাবা-মা মামুন আর হাসানকে সানন্দে গ্রহণ করেন। খুব সুখেই আমাদের গ্রামের বাড়িতে কয়েকটি দিন কেটে যায়। তারপর আবার ঢাকার পথে আমাদের যাত্রা শুরু হয়।

মামুন একবারই আমাদের গ্রামের বাড়িতে গিয়েছিল। হাসান তিনবার আমাদের বাড়িতে গেছে। তাই কবি হিসেবে বারহাট্টা ও নেত্রকোনার কবি-সাহিত্যিক মহলে সে বেশ পরিচিত হয়ে উঠেছিল। আমাকে পলিটেকনিকের ছাত্র ভেবে পলিটেকনিকের ছাত্ররা যেমন ভ্রম করত, আবুল হাসানকেও আমাদের এলাকার কবি বলে মন করত অনেকে।

একবার আমি আবুল হাসানকে নিয়ে নেত্রকোনায় যাই (১৯৬৮) এবং খালেকদাদ চৌধুরীর সঙ্গে তাকে পরিচয় করিয়ে দিই। তিনি তখন নেত্রকোনা পাবলিক লাইব্রেরীটিকে গড়ে তোলার কাজে ব্যস্ত ছিলেন। পাবলিক লাইব্রেরীটি তখন সিদ্দিক প্রেসের মুখোমুখি ডাকবাংলোর পশ্চিম দিকের বাউন্ডারি ওয়াল ঘেঁষে একটি টিনশেড ঘরে ছিল। আমি আমাদের বাড়িতে যেসব মূল্যবান বই ও পত্র-পত্রিকা ছিল তার অধিকাংশই ঐ লাইব্রেরীতে সংরক্ষণের জন্য জনাব খালেকদাদ চৌধুরীর হাতে তুলে দিয়েছিলাম। সেখানে কলকাতার 'প্রবাসী' এবং ময়মনসিংহ থেকে বিশের দশকে প্রকাশিত, কেদারনাথ মজুমদার সম্পাদিত 'সৌরভ' পত্রিকার বেশ কিছু দুর্লভ সংখ্যা ছিল। সৌরভ পত্রিকাতেই চন্দ্রকুমার দে সংগৃহীত ময়মনসিংহ গীতিকার বিখ্যাত পালাগানগুলো ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতো। ড. দীনেশ চন্দ্র সেন ঐ পত্রিকাতেই প্রথম ঐ পালাগানগুলো পড়ে মুগ্ধ হন এবং পরে সেগুলো কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশ করেন। ঐ সব দুর্লভ পত্র-পত্রিকার বিনিময়ে আমার বাবাকে নেত্রকোনা পাবলিক লাইব্রেরীর আজীবন সদস্যপদ দান করা হয়। নেত্রকোনা পাবলিক লাইব্রেরীর অনার্স বোর্ডে তাঁর নাম আছে। বই দান করার ব্যাপারে বাবার অমত থাকলেও আমার ঐ সিদ্ধান্তটি ছিল খুবই যথার্থ এবং দূরদৃষ্টিসম্পন্ন। তা না হলে, অন্য অনেক কিছুর মতো ঐ পত্রিকাগুলোও ১৯৭১-এ লুটপাট হয়ে যেত।

ঐ সময় সাংবাদিক জীবন চৌধুরী, কবি-সাংবাদিক আল আজাদ, ছড়াকার দিলীপ দত্ত, প্রণব চৌধুরী এবং শহরের কয়েকজন কাব্যামোদীর উদ্যোগে পাবলিক লাইব্রেরীর পক্ষ থেকে আমাদের সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। জনাব খালেকদাদ চৌধুরী ঐ অনুষ্ঠানে পৌরহিত্য করেছিলেন। কবি হেলাল হাফিজের পিতা কবি খোরশেদ আলী তালুকদার সাহেবও ঐ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। আবুল হাসান এবং আমি ঐ অনুষ্ঠানে কবিতা পাঠ করি। পাকিস্তান অবজারভারে আমাদের সংবর্ধিত হওয়ার খবর প্রকাশিত হয়। জীবন তখন অবজারভার ও সাপ্তাহিক পূর্বদেশ পত্রিকার সাংবাদিক। তা ছাড়া সে ছিল সাহা বোর্ডিং নামে একটি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বোর্ডিংয়ের সুপারিনটেনডেন্ট। ঐ সাহা বোর্ডিংটি ছিল নেত্রকোনা বড় পুকুরের উত্তর-পুব কোণায়। ভিটে পাকা একটি বেশ বড় এল টাইপের টিনের ঘর ছিল। জীবনের জন্য ছিল একটি আলাদা কোঠা। ঐ বোর্ডিংটিতে স্কুল এবং কলেজের ছেলেরা পাশাপাশি থাকত। জীবন ছাত্রদের সঙ্গে দূরত্ব বজায় রেখে চলত। শব্দ গুনে-গুনে পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদের বিল পাঠাতে পাঠাতে ওর এমন অভ্যেস হয়ে গিয়েছিল যে, ছাত্রদের সঙ্গেও সে গুনে গুনে শব্দ প্রয়োগ করে কথা বলত। কিন্তু আমাদের প্রকৃতি ছিল ভিন্ন। আমরা ছোট-বড় ভালো-মন্দ এবং মূর্খ বা পণ্ডিতের মধ্যে পার্থক্য করতাম না।

পুকুরের পশ্চিম পারে সিনেমা হল। ওখানে আমরা একই সিনেমা বার বার দেখতাম। কারণ, আমাদের পয়সা লাগত না। সিনেমা হলের পাশে ছিল একটি পশ্চিমা রেস্টুরেন্ট। সেখানে ভালো মুরগির মাংস ও পরোটা হয়। আমরা খেয়ে-দেয়ে জীবনের নাম বলতাম। জীবন পরে আমাদের বিল শোধ করত; তবে মফস্বল শহরের সাংবাদিকদের কাছ থেকে পারতপক্ষে কেউ পয়সা নিতে চাইত না বলেই আমরা জানতাম। হাসান ফলমূল খেতে পছন্দ করে, ফলে ফলের দোকানেও কিছু বাকি পড়ে। এইভাবে দিনের পর দিন জীবনের জীবন অতীষ্ট করে দিয়ে আমরা একদিন ঢাকার উদ্দেশে নেত্রকোনা ত্যাগ করি।

বাড়ি থেকে নিয়ে আসা বিছানাপত্র কুলির মাথায় চাপিয়ে দিয়ে আমি ঢাকা শহরে প্রবেশ করিনি। শিশু যেমন শূন্য হাতে, ন্যাংটো হয়ে এই পৃথিবীতে আসে, আমিও অনেকটা সেরকমভাবেই ঢাকায় এসেছিলাম। তবে একেবারেই খালি হাতে এসেছিলাম, তাও বলা যাবে না। আমার বাম হাতে ছিল বাবার কিনে দেওয়া একটা ক্যাভেলরি ঘড়ি আর ডান হাতের অনামিকায় ছিল ঝিলমিলে-পাথর বসানো একটি চার আনা স্বর্ণের আঙটি। এই নগরী প্রথম সুযোগেই ও দুটো আমার হাত থেকে পর্যায়ক্রমে খুলে নেয়। বাবার ঘড়িটি যায় জুয়ার আড্ডায়, আর নাম-ভুলে-যাওয়া সুদর্শন পাথর বসানো আমার ঐ সুবর্ণ-অঙ্গুরীয়টি গ্রাস করে পুরনো-ঢাকার অবলা মাসির মেয়েরা। এরপর যথার্থ অর্থেই আমি ছিলাম একেবারে ঝাড়া হাত-পা। কবিতার পাণ্ডুলিপি ছাড়া আগলে রাখার মতো আমার আর কিছুই ছিল না।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দিনগুলো ভালোভাবেই শুরু হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার সুবাদে আমার অনেক নতুন বন্ধু জোটে। তাদের মধ্যে মেয়েবন্ধুও ছিল, যেমন কাজী রোজী। কাজী রোজী কবিতা লিখত। সে সমকাল সম্পাদক কবি সিকানদার আবু জাফরের সম্পর্কিত বোন ছিল। আমি প্রায়ই রোজীকে নিয়ে রিক্সায় চেপে সমকালে জাফর ভাইয়ের কাছে যেতাম। জাফর ভাই আমাদের দু'জনের সম্পর্ক নিয়ে সন্দেহজনক রসিকতা করতেন। আমার ভালোই লাগত। রোজী ছাত্রলীগ করত এবং শেখ হাসিনার খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল। মেয়েবন্ধুদের সঙ্গে তো রাত্রিযাপন করা যায় না,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাই ছেলে বন্ধুরাই আমার বেশি কাজে আসে। আমার সহপাঠীদের মধ্যে বিশেষ করে তাদের সঙ্গেই আমার সম্পর্ক খুব নিবিড় হয়, যারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হলের আবাসিক ছাত্র। তাদের মধ্যে কেউ কবি, কেউ গল্পকার, কেউ নাট্যকার, কেউ গবেষক, কেউ সাংবাদিক। তাদের কেউ জগন্নাথ হলে, কেউ মহসীন হলে, কেউ জিন্নাহ হলে, কেউ ইকবাল হলে, কেউ-বা সলিমুল্লাহ মুসলিম হলে থাকে। ব্রেক অব স্টাডির কারণে জগন্নাথ হলে সিট পাবার চেষ্টা করেও আমি ব্যর্থ হই। ফলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হলে আমার রাত কাটানোর সুযোগ হয়।

ইঞ্জিনীয়ারিং বিশ্ববিদ্যালয়ে আহসানউল্লাহ হলে আমার পিসতুতো ভাই সুকোমল থাকত। ওর রুমেও মাঝে মাঝেই আমি আর আবুল হাসান হানা দিতাম। সুকোমলের রুমমেট শ্যামাপ্রসাদ চক্রবর্তী ছিল আমাদের কবিতার ভক্ত। ওর একটি খুব দামি GRUNDIG টেপরেকর্ডার ছিল। তখনকার দিনে ঐরকমের উন্নতমানের ক্যাসেট-রেকর্ডার ছিল খুবই দুর্লভ। আমরা শ্যামাপ্রসাদ চক্রবর্তীর ক্যাসেটে আমাদের সদ্য রচিত কবিতা টেপ করে শুনতাম। আহসানউল্লাহ হলে যাবার পেছনে ওটা ছিল আমার আরেক আকর্ষণ। পরে একসময় কবি আবুল কাশেমকে আমি সুকোমলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই। কাশেম আমাকে না জানিয়ে দিনের পর দিন ঐ হলে থাকত।

AMARBOI.COM

বিভিন্ন মেসেও আমি থেকেছি। মনে পড়ছে, লক্ষ্মীবাজারে একটি মেস ছিল, সেখানে ছোটগল্প লেখক মাযহারুল ইসলাম থাকত। মাযহার কাজ করত ব্যাংকে। ঘটনাটি ভুলে গিয়েছিলাম। মনে করিয়ে দিল কবি-বন্ধু সানাউল হক খান। সানাউল তখন একটি বীমা কোম্পানিতে কাজ করত। সানাউলের বাড়ি ছিল পুরনো ঢাকার বসুবাজারে। ওদের বসুবাজারের বাড়িতেও আমি আর আবুল হাসান রাত কাটিয়েছি।

বাংলাদেশ রেলওয়ের নগর কেন্দ্র অফিসটি এখন যেখানে আছে,—এর আশপাশে কোনো একটা জায়গায় একটা মেসের মতো ছিল। ওখানে একটি ছোট্ট কামরায় থাকত গল্পকার বুলবুল চৌধুরী। ওখানেও আমরা রাত কাটাতাম। বুলবুলের বাসার পাশেই ছিল চোরাই মদের গোপন আস্তানা। গোপন মানে খদ্দের এবং পুলিশ ছাড়া আর সকলের জন্য গোপন।

একবার আমি আর হাসান স্থির করলাম একটা আয়রন কিংয়ের ছোট্ট আলমারি কিনব। যাতে আমাদের কিছু প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র নিরাপদে রাখা যায়। কিছু টাকাও ছিল তখন হাতে। কিন্তু সমস্যা হলো আলমারিটি রাখা নিয়ে। কোথায় রাখা যায়? অগত্যা পল্টনস্থ স্কাউট ভবনের নিচের তলার যে দোকান থেকে ঐ আলমারি কিনব বলে সাব্যস্ত করেছিলাম, ঐ দোকানের একজন কর্মচারীকেই একদিন বললাম,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভাই আলমারি আমরা কিনব ঠিকই কিন্তু একটা শর্ত আছে। শর্তটি হলো, আলমারির দাম আমরা এখনই দিয়ে দেব, কিন্তু আলমারিটি আমরা নেব না। ওটি আপনার দোকানেরই এক-কোণায় পড়ে থাকবে। আমরা শুধু এর চাবিটি নিয়ে যাব। এর মধ্যে আমরা আমাদের কিছু প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র রাখব। আপনাদের ব্যবসার যাতে ক্ষতি না হয় সেদিকটা আমরা লক্ষ্য রাখব। প্রতিদিন এসে আপনাদের বিরক্ত করব না। কালে ভদ্রে আমরা আসব। রাজি থাকলে বলেন।

আমাদের কথা শুনে বিক্রেতার চোখ ছানাবড়া। অনেকক্ষণ বাকরহিত থাকার পর ভদ্রলোক বললেন, এমন অদ্ভুত কথা আমি জীবনে এই প্রথম শুনলাম। যান, আপনাদের আলমারি কিনতে হবে না, দয়া করে চা খেয়ে বিদায় হন।

স্বপ্নভঙ্গের বেদনায়, অভিমানে হাসান চা খেতে চাচ্ছিল না, কিন্তু আমি দেখলাম ওটাই লাভ। বললাম হ্যাঁ, চা চলতে পারে।

অগত্যা চা খেয়ে আমরা বিদায় হলাম। আমাদের নিজস্ব আলমারি আর হলো না।

বিছানা-বালিশ, গামছা-মশারি, থালা-সাবন এগুলো যে নিজের থাকতে হয়—তা আমি জানতাম, কিন্তু থাকার নির্দিষ্ট জায়গা ও টাকার অভাবে ওগুলো সংগ্রহ করা হয়ে ওঠেনি। আর এগুলো যে আমার নেই তা বুঝতেও আমার বেশ সময় লেগেছিল।

আমি মহসীন হলে সাযযাদ কাদিরের রুমে থাকতাম। ওর রুম নম্বর ছিল ২১১। সাযযাদ আমাকে কিছু কাজ জুটিয়ে দিয়েছিল। পাণ্ডুলিপি তৈরির কাজ। পুরনো দুষ্প্রাপ্য বই থেকে হাতে লিখে প্রেস কপি তৈরি করার কাজ। বাংলা বিভাগের শিক্ষকরা তখন ঐ সব প্রাচীন গ্রন্থ সম্পাদনা করতেন। বাংলাবাজারের প্রকাশকরা সেগুলো ছাপতেন। আমার হাতের লেখা সুন্দর এবং স্পষ্ট ছিল বলে বাংলা-বিভাগের স্যাররা আমার পাণ্ডুলিপিতে সন্তুষ্ট ছিলেন—তাঁদের কাজ চলত। সাযযাদের মাধ্যমে পাণ্ডুলিপি তৈরির কাজ করে আমি বেশকিছু টাকা পেয়েছিলাম। ঐ সূত্রে বাংলাবাজারের অনেক প্রকাশকের সঙ্গেও আমার পরিচয় ঘটেছিল। তাঁরা আমাকে প্রুফ দেখার কাজ দিতেন। সাযযাদ কাদির আমাকে প্রুফ দেখার কাজ শিখতে সাহায্য করেছিল। গল্পকার আলমগীর রহমানের বাবার একটি বড় প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান ছিল পাটুয়াটুলিতে। নাম পাকিস্তান বুক কর্পোরেশন। ঐ প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজার ছিলেন রতন বাবু। রতন ঘোষাল। গায়ক ও মুক্তিযোদ্ধা মনোরঞ্জন ঘোষালের বড় ভাই। আমি আলমগীরের বন্ধু, এ কথা জানার পর তিনি আমাকে প্রচুর প্রুফের কাজ দিতেন। ফলে আমার একটা নিয়মিত আয়ের পথ হয়েছিল। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রতন বাবু পবিত্র-বাহিনীর ভাইদের হাতে নির্মমভাবে নিহত হন।

আমি থাকতাম আমার সহপাঠী বন্ধু আখতার-উন-নবীর রুমে। ওর রুম নম্বর ছিল ৩৪৭। আখতার-উন-নবী ভালো উর্দু জানত। সে বিভিন্ন উর্দু লেখকের গল্প অনুবাদ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করে তখন বেশ নাম করেছিল। নবীর সঙ্গে আমার চমৎকার বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। ও মদের একটা নতুন নাম বের করেছিল, দমস্। নবীকে আমি খুব পছন্দ করতাম এজন্য যে, কখনও নবী কোনোকিছুতেই আপত্তি করত না। ভেজা এবং গরম, সব ব্যাপারেই ওর সমান আগ্রহ ছিল। ওর মাধ্যমে ফেনীর নাট্যকর্মী মুজিব বিন হক, কবি জাহিদুল হক, কবি শামসুল ইসলাম, সাংবাদিক আবদুল মালেক, অবজারভার পত্রিকার হিসাবরক্ষক মহিউদ্দিন এবং ছাত্রলীগ নেতা জয়নাল হাজারীর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়।

জয়নাল হাজারীর কাছে আমি শেখ মুজিবের স্বহস্ত লিখিত একটি চিঠি দেখেছিলাম। শেখ মুজিব ঐ চিঠিটি লিখেছিলেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড.এ. আর. মল্লিকের কাছে, হাজারীর ভর্তির ব্যাপারে সোপারিশ করে।

জয়নাল হাজারী ছিল জুয়ার রাজা। ওর মতো ভাগ্যবান জুয়াড়ী আমি কম দেখেছি। মুহূর্তের মধ্যে আমাদের পকেট ফাঁকা করে দিয়ে সে গোঁফে তা দিত, আর মুচকি মুচকি হাসত। রাগে-দুঃখে আমাদের গা জ্বলে গেলেও করার কিছুই ছিল না। ওর বুক পকেটে একটি চকচকে ভারী পিস্তল থাকত। ওটাই ছিল আমার খুব কাছে থেকে দেখা প্রথম পিস্তল।

মহসীন হলে ইংরেজি বিভাগের ভালো ছাত্র, তরুণ কবি মুহম্মদ নূরুল হুদার রুমেও আমি পত্রিকা বিছিয়ে ঘুমিয়েছি। নূরুল হুদা ওর রুমে (রুম নং ২৬৫) হিটারে রান্না করত। ওর রান্না ছিল অনেকটা শ্যামা-পিরিতির গানের মতো 'চাইলে ডাইলে মিশাইলে গো সই।' তবে তখন হুদার রান্নাও অমৃতের মতোই স্বাদু মনে হতো।

বেশ কিছুদিন আমি আর আবুল হাসান একনাগাড়ে কয়েকদিন বসবাস করেছিলাম ময়মনসিংহের আবৃত্তিকার তারিক সালাউদ্দিন মাহমুদের রুমে। জিন্নাহ হলের গ্রাউন্ড ফ্লোরে। নম্বরটা মনে নেই। নিচতলার দক্ষিণ সারিতে, ওয়েটিং রুমের কাছেই ছিল ঐ রুমটি। তারিকের কথা বিশেষভাবে বলতে হয় এজন্য যে, আমার আর হাসানের জন্য বেচারির জিন্নাহ হলের সীট বাতিল হয়ে যায়। আমাদের হাতে রুমের চাবি তুলে দিয়ে তারিক রোজার ছুটিতে গিয়েছিল ময়মনসিংহে। আমরা ঐদিন ঐ চাবি হারিয়ে ফেলি। গভীর রাতে হলে ফিরে একে অন্যের পকেট ভালো করে খুঁজেও চাবি পাই না। অগত্যা তালার হুক ভেঙে আমরা রুমে ঢুকি। ভাঙতে গিয়ে শব্দ হওয়াতে ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে যায়। পরদিন রুমটি অবৈধ দখলদারদের হাতে ছেড়ে দেবার জন্য তারিকের নামে কারণ দর্শানের নোটিস জারি করা হয়। আমরা সে-নোটিসটি গায়েব করে ফেলি। ফলে তারিকের পক্ষে ঐ নোটিসের জবাব দেওয়া আর হয়ে ওঠেনি। হবে কী করে? বেচারি নোটিস হাতে পেলে তো! তারপর আমরা দীর্ঘদিন আর তারিকের খবর নিই না। জিন্নাহ হলের ছায়াও মাড়াই না। তারিকের কথা ভুলে যাই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনেকদিন পরে একদিন তারিকের সঙ্গে নিউ মার্কেটে দেখা হয়। তারিক আমাদের দু'জনকে কাছে ডাকে। বলে, আসেন না কেন? তারিকের কণ্ঠস্বরে একেবারেই কোনো ঝাঁঝ নেই। ভাবলাম ব্যাপারটা সে সামাল দিতে পেরেছে নিশ্চয়ই। বললাম, যাব। সময় করে উঠতে পারছিলাম না তাই যাওয়া হচ্ছিল না। তা ছাড়া... ঠিক আছে এবার যাব।

আসেন চা খান! আমরা বললাম।

তারিক বলল, না, আজ চলে যাই, আপনারা আসবেন। কিভাবে আসতে হবে তা বলে দিচ্ছি। ফ্রি স্কুল স্ট্রিট দিয়ে যতদূর চোখ যায় ভিতরে চলে যাবেন, দেখবেন একটা পুকুর আছে। ওখানে থামবেন। ঐ পুকুরের পশ্চিম পারেই আমি নতুন একটা বাসা ভাড়া নিয়েছি। আপনারা চাইলে ওখানে থাকতেও পারবেন। পুকুরটা আপনাদের খুব পছন্দ হবে। ঐ পুকুরে রাজহাঁস সাঁতার কাটে।

জিন্নাহ হল থেকে তারিকের সিট চলে গেছে এমন সংবাদ বাতাসে শুনেছিলাম, তদন্ত করে জানবার সাহস হয়নি। এবার একেবারে তারিকের নিজের মুখ থেকেই তা ভিন্নভাবে জানা হলো। সিটের জন্য যেখানে খুনোখুনি পর্যন্ত হয়ে যায়, সেখানে তাঁর সিট চলে যাওয়া নিয়ে তারিক একটি শব্দও উচ্চারণ করল না। ক্ষমা চাইবার ভঙ্গিতে আমি যখন কিছু একটা বলতে চাইলাম, চোখ বন্ধ করে তারিক বলল, এমনতো হতেই পারে। এ নিয়ে আমার একটুও ক্ষোভ নেই। দেখবেন ঐ ঘটনাটি আমাদের সারাজীবনের হাসির খোরাক হয়ে থাকবে। বলে তারিক তার এক বন্ধুর সঙ্গে চলে যায়। আমি আর হাসান তারিকের গন্তব্যপথের দিকে অপরাধীর মতো তাকিয়ে থাকি।

AMARBOI.COM

আমরা থাকতাম সলিমুল্লাহ হলে হাসানের বাল্যবন্ধু মাহফুজুল হক খানের রুমে। একবার সালামত আলী ও নাজাকত আলী ঐ হলে সারারাত উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীত পরিবেশন করেছিলেন। আমরা রাত জেগে ঐ আলী ভ্রাতৃদ্বয়ের পাশে বসে তাঁদের গান শুনে বিস্মিত হয়েছিলাম। মাহফুজ ছাড়াও ঐ হলে আমাদের আরও বেশকিছু বন্ধু জুটেছিল। দুর্বল মেধার কারণে তাঁদের মুখ মনে পড়ে, নাম ভুলে গেছি।

ইকবাল হলে থাকতাম শাজাহান, হাসান ইমাম ও হেলাল হাফিজের রুমে। হেলাল তখন কবিতা লিখত না। পরে আমাদের সঙ্গে মিশেই সে-ও কবিতা লিখতে শুরু করে। আমি ওকে উৎসাহিত করি। ওর রুমে খুব জুয়া খেলা হতো। মনে পড়ে কবি আবুল কাশেম যদি জুয়ায় জিতত—ওর একটা অভ্যাস ছিল জিতলে আর বেশিক্ষণ খেলতে চাইত না। তখন বাধ্য হয়েই আমরা রুমের দরজা বন্ধ করে দিয়ে ওকে আরও খেলতে বাধ্য করতাম এবং সম্পূর্ণ না হারা পর্যন্ত কাশেমের ওপর আমরা চাপ অব্যাহত রাখতাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাঝে মাঝে মাসুদ পারভেজের রুমেও থাকতাম। আমার আনন্দমোহন কলেজে জীবনের বন্ধু ও সহপাঠী মাসুদ পারভেজ ইকবার হলের ভিপি হয়েছিল। আরও কত বন্ধুর রুমেই না আমরা রাত কাটিয়েছি। আমি আর আবুল হাসান তখন এতটাই অভিন্ন হয়ে উঠেছিলাম যে, হাসান আর আমার আলাদা ঠিকানা ছিল না। সবাই জানত যে গুণকে থাকতে দিলে হাসানকেও থাকতে দিতে হবে। হাসানকে থাকতে দিলে গুণকেও থাকতে দিতে হবে।

হাতের পাঁচ মামুন তো ছিলই। তাঁকে আমি আর হাসান ছায়ার মতো অনুসরণ করতাম। সে যেখানে যায় আমরাও ছায়ার মতো তার সঙ্গে সঙ্গে যাই। পলিটেকনিকের পড়া শেষ করে মামুন পাবলিক হেলথ ইঞ্জিনিয়ারিং-এ চাকরি পায়। তখন বাসা নেবার প্রশ্ন দেখা দেয়। সে বাসা নেয় আগারগাঁও বাজারের কাছে। তালতলায়। তালতলা তখন একেবারে গ্রাম। ঐ এলাকাটা এখন দেখে তখনকার অবস্থা অনুমান করা যাবে না। একটা টিনের চালা ঘরে আমরা থাকতাম। কত ভাড়া ছিল মনে নেই। বাড়ির পাশে একটা বড় পুকুর ছিল। ঐ পুকুরে নেমে আমরা স্নান করতাম। শ্যামলী বাসস্টপে মিরপুর-গুলিস্তানের বাস ধরেই তখন নগরীর অভ্যন্তরে যাওয়া-আসা করতে হতো।

তখনকার লেখা একটি কবিতায় শ্যামলীর স্মৃতি রয়ে গেছে।

'বাসন্তী হলুদে হাঁটো, তাই
বাস থেকে নেমে পড়ি নীল মেডিক্যোলে,
অথচ টিকিটগুলি শ্যামলী! শ্যামলী!'

(জনাকীর্ণ মাঠে জিন্দাবাদ : প্রেমাংশুর রক্ত চাই)

AMARBOI.COM

মামুনের অফিস ছিল নিউ এলিফ্যান্ট রোডে। বাটার দোকানের পেছনে একটা দোতলা বাড়িতে। পরে মামুনের অফিসের সহকারী পরেশচন্দ্র, যে আমাদের বন্ধুমহলে পিসি নামেই অধিক পরিচিত, মামুনকে ফ্রি স্কুল স্ট্রিটের মুশতাকদের বাড়িতে থাকার জন্য একটি ঘর ভাড়া নিয়ে দেয়। পরেশ ওর একটি ছোট ভাইকে নিয়ে আগে থেকেই মোশতাকদের বাড়িতে ভাড়া থাকত। আমাদের ঘরটির ছিল পাকা দেয়াল, টিনের চাল। দশ ফুট বাই দশ ফুটের বেশি হবে না। আসলে ওটি ছিল একটি মোটর গ্যারেজ। এর দরোজাটা ছিল শাটারের মতো। হয়তো ছোট্ট দোকান বা গ্যারেজ করার চিন্তা নিয়েই সেটি তৈরি করা হয়েছিল। ঘরটি ছিল একেবারে রাস্তার পাশে। মামুনের একটা নড়বড়ে চকি ছিল। তাতে দু'জন একসঙ্গে শুতে পারত না। তাই মামুন যখন চকিতে থাকত, আমি আর হাসান মেঝেতে তোষক বিছিয়ে শুতাম। শীতের সময় মামুন লেপ নিয়ে নিচে নেমে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আসত, আমাদের সঙ্গে লেপের উত্তাপ ভাগ করে নেবার জন্য। কিন্তু তাতে দেখা দিত বিপত্তি। ঘুমের ঘোরে লেপ নিয়ে চলত টানটানি। যত রাজ্যির গল্প, আর লেপ নিয়ে টানাটানির ফলে আমাদের ঘুম যেত পালিয়ে। তাই এক-পর্যায়ে আমরা একটা চমৎকার পন্থা আবিষ্কার করি। আমি আর হাসান গা জড়াজড়ি করি শুই। মামুন ধুলো-বালিতে কচকচ-খচখচ করা তেল চিটচিটে তোষকটা দুদিক থেকে আমাদের গায়ের ওপর তুলে দেয়। একটা ধুলোমলিন উষ্ণ কফিনের মধ্যে আমরা দু'জন বন্দি হয়ে পড়ি।

ছুটির দিনে আমাদের ঘরে তিন তাসের আসর বসে। দিন রাত খেলা চলে। পাঁচ পয়সা-দশ পয়সার খেলা। নো জাম্প হিট। ধাতব মুদ্রার টুং-টাং আওয়াজে পথচারীর কান পাতে। ঐ জুয়ার আসরে হাতিরপুল এলাকার অনেকই সামিল হতো। তাদের মধ্যে একজনের নাম জাহিদ। রেল লাইনের ওপারে থাকত। জাহিদ পরে পুলিশে চাকরি পায় এবং কিছুদিনের জন্য বারহাট্টায় দারোগা হয়েছিল।

হাসান সঙ্গে না থাকলে ওর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আমার কবিতা লেখা হতো না। কে জানে, আমি হয়ত শুধু জুয়াড়ীই থেকে যেতাম। এখানেই আবুল হাসানের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আমি আমার দীর্ঘ 'অসমাপ্ত কবিতা' লিখেছিলাম লণ্ড্রির কাপড় ঢুকিয়ে দেয়া একটি নিউজপ্রিন্টের প্যাকেটের গায়ে। ঐ প্যাকেটটিতে আর লেখার জায়গা অবশিষ্ট ছিল না বলেই লেখার পর ঐ কবিতাটির নাম দিয়েছিলাম 'অসমাপ্ত কবিতা'। পল্টনের জনসভায় প্রদত্ত তোফায়েল আহমদ প্রমুখ ছাত্রনেতাদের ভাষণ এবং ছাত্রজীবনে মুখস্থ হয়ে যাওয়া বিদায় হজ্বের ভাষণটিকে আমি ঐ কবিতা রচনায় ব্যবহার করেছিলাম। শচীন সেনগুপ্তের 'সিরাজউদ্দৌলা' নাটকের সংলাপ প্রক্ষেপণ পদ্ধতিও আমার মনে ছিল। এসব কারণেই ঐ দীর্ঘ কবিতাটি প্রকাশের কিছুদিনের মধ্যেই অনেকে মুখস্থ করে ফেলতে পেরেছিলেন।

ব্যক্তিগত গোপনীয়তা রক্ষা করা বা নির্জনতার মধ্যে থাকা আমাদের পক্ষে তখন একেবারেই সম্ভব ছিল না। তাই জনারণ্যে শূন্যতাকে ধারণ করার একটা কৌশল আপনা থেকেই আমাদের আয়ত্তে এসে যায়। আমরা শুনেছিলাম অংকের পণ্ডিত যাদববাবু নাকি কোলাহলের মধ্যে বসেও জটিল অংক কষতে পারতেন। ঘরে জুয়া চলছে, রাস্তায় চলছে হল্লা, মিছিল—এমন পরিস্থিতিতেও পরস্পরের দিকে পেছন ফিরে বসে আমরা তখন কবিতা লিখতে পারতাম।

আমি যে-রাতে 'অসমাপ্ত কবিতা'টি লিখি, সে রাতে আবুল হাসান লিখেছিল 'মিস্ট্রেস : ফ্রি স্কুল স্ট্রিট' নামক তার মিষ্টি প্রেমের কবিতাটি। আমাদের থাকার ঘরটির উল্টোদিকে ছিল একটি প্রাইমারী স্কুল। খুব সকালের দিকে স্কুল বসত। অনেক রাত করে ঘুমাতাম বলে আমরা ছিলাম লেটরাইজার। তবে আবুল হাসানের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভোর দেখার অভ্যাস ছিল। সে মাঝে মাঝে সকালে উঠে রাস্তায় হাঁটতে যেত। আমার কাছে ভোর আর অভোরের কোনো তফাৎ ছিল না। আমি যথাসম্ভব ঘুমিয়ে রাত্রি জাগরণের জন্য শরীরটাকে চাঙ্গা করে নিতাম। স্কুলে আসা ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের কলকোলাহলে আমার ঘুম ভাঙত। ঐ স্কুলে এবং এলাকায় জানাজানি হয়ে গিয়েছিল যে, স্কুলের সামনের ঐ ছোট্ট ঘরটিতে দু'জন কবি ও একজন নাট্যকার থাকেন। ফলে স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী এবং শিক্ষক-শিক্ষিকারা খুব কৌতূহল নিয়েই আমাদের ঘরটির দিকে তাকাত। ঐ স্কুলের একজন শিক্ষিকার প্রতি হাসানের নজর পড়ে। সকালে ওঠার আসল কারণ ছিল সেটিই। ঐ শিক্ষিকার চোখে পড়া—খুব সকালে ঘুম থেকে ওঠে তাকে জানানো যে, আমি আপনার জন্যই এত সকালে ওঠেছি। নির্মল তো জুয়াড়ী, তাই সে এখনও ঘুম থেকে ওঠেনি।

আমরা খেতাম মামার হোটেলে। ফ্রি স্কুল স্ট্রিটটি হাতিরপুল বাজারের কাছে গিয়ে যেখানে বড় রাস্তার সঙ্গে মিশেছে, ঐ মিলনস্থলেই ছিল হোটেলটি। হোটেলের মালিকের বাড়ি ছিল সিলেট। এলাকার ছেলেরা হোটেলটির নাম দেয় মামার হোটেল। তবে হোটেলের একটি ভিন্ন নাম ছিল । মালিক বেচারা টাকা খরচ করে সাইনবোর্ডে হোটেলের আসল নামটি লিখিয়েছিলেন এবং হোটেলের নাকের ডগায় সেটি টানানোও থাকত। কিন্তু ঐ নামটি আমাদের নজরে পড়ত না। নকল নামের দাপটে আসল নামটি চাপা পড়ে যায় এবং মামার হোটেল নামেই হোটেলটি চালু হয়।

হোটেলে বাকিতে খাওয়ার ব্যাপারে মামুন ছিল পাকা ওস্তাদ। সে ঐ হোটেলটিকে টার্গেট করে অগ্রসর হয়। মামুন একদিন আমাদের দু'জনকে নিয়ে ঐ হোটেলে যায়। যাবার আগে পাশের একটি দোকান থেকে একটি দুই নম্বর খাতা কিনে নেয়। ঐ খাতা, আমরা ভেবেছিলাম তার নতুন নাটক লেখার কাজে ব্যবহৃত হবে। কিন্তু না। মামুন বলল, এর অন্য একটা মাজেজা আছে। একটু পরেই বুঝবেন।

আমরা একটা রহস্যের মধ্যে অপেক্ষা করতে থাকি। খাওয়া শেষে মামুন কাউন্টারের দিকে অগ্রসর হয়। আমরা অন্যান্য দিনের মতোই তার পিছু পিছু যাই। সে কাউন্টারের পাশে ঝুলিয়ে রাখা তেল চিটচিটে গামছাটিতে হাত এবং মুখ মোছে। তারপর পকেট থেকে ঐ রহস্যজনক খাতাটা টেনে বের করে কাউন্টারে বসে থাকা হোটেলের মালিকের সামনে স্থাপন করে। মালিক ঠিক বুঝে উঠতে পারে না, এই খদ্দেরটি কী করতে যাচ্ছে।

মামুন তখন ঐ খাতার একটি অত্যন্ত নিরীহ শাদা পাতাকে দুই ভাগে ভাগ করে বাম ভাগে সুন্দর করে লেখে—'জমা'। তারপর শব্দের নিচে দুই টান। অনুরূপ গুরুত্বসহকারে সে পাতার ডান দিকে লেখে—'খরচ'। নিচে আবার দুই টান।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তারপর পকেট থেকে একটি চকচকে দশ টাকার নোট বের করে, খাতার ভিতরে নোটটিকে যত্নসহকারে পুরে মালিকের দিকে খাতাটি এগিয়ে ধরে। আমাদের তিনজনের বিল হয়েছিল তিন টাকার মতো। মামুন মালিককে এমন করুণভাবে মামা বলে সম্বোধন করে যেন সত্যি সত্যি সে তার আপন মামার সঙ্গে কথা বলছে। মামুনের কণ্ঠস্বরে আবদার, অধিকার এবং এক ধরনের প্রেট মিলেমিশে কাজ করে। কিন্তু হোটেলের মালিক, মামুনের জোর করে পাতানো ঐ মামা ভাগনের কোনো কথারই উত্তর দেয় না।

এবার সম্পর্ক ভুলে গিয়ে মামুন বলে, ভাই সব জিনিসেরই পাকাপাকি হিসেব থাকা ভালো। এখন থেকে আমরা আপনার হোটেলেই খাব। যখনই টাকা আসবে আমরা আপনার কাছে জমা দিয়ে রাখব। টাকা পেলে পর কোথায় এবং কীভাবে তা জমা দিতে হবে, মামুন আমাদের খুব ভালো করে বোঝায়। আমরাও খুব আগ্রহ নিয়ে তা বুঝি।

হোটেলের মালিক বিভিন্ন ধরনের প্রতারণার সঙ্গে পরিচিত থাকলেও এমন অভিনব প্রয়াসের সঙ্গে পরিচিত ছিল না। এমন অভিনব আক্রমণ মোকাবিলা করার কোনো পূর্ব প্রস্তুতিও তাঁর ছিল না। তাই আমাদের আচমকা আক্রমণে ভদ্রলোক পরাভূত হন।

দীর্ঘ অপেক্ষার পরও হোটেলের মালিকের কণ্ঠ থেকে কোনো সম্মতিসূচক বাক্য বা স্বর নির্গত হয় না। তিনি আমাদের দিকে অসহায়ের মতো তাকিয়ে থাকেন। তখন আমরা তার অনুমতি না নিয়েই হোটেল ত্যাগ করতে বাধ্য হই। তারপর থেকে আমরা নিয়মিত ঐ হোটেলে খেতে শুরু করি। জাপানের সঙ্গে আমেরিকার বাণিজ্য ঘাটতির মতো আমাদের সংরক্ষিত হিসাবের খাতায় জমা ও খরচের পার্থক্যও ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে।

একসময় আমরা ঐ হোটেলে যাওয়া বন্ধ করে দিই।

ফলে পাশের রেললাইনটির মতোই একদিন ঐ হোটেলটিও উঠে যায়।

তেজগাঁও থেকে মগবাজার-মালীবাগ হয়ে কমলাপুর রেলস্টেশনের সঙ্গে সংযোগকারী বর্তমান রেললাইনটি তখন ছিল না। তেজগাঁও থেকে কাওরান বাজারের দিকে বাঁক নিয়ে বর্তমান সোনারগাঁও হোটেলের সামনে দিয়ে হাতিরপুল-নীলক্ষেত-পলাশী-চানখাঁর পুল হয়ে ট্রেনগুলো ঢুকত ফুলবাড়িয়া স্টেশনে। ফুলবাড়িয়া ছেড়ে ঠাঠারিবাজার-জয়কালীমন্দির-হরদেও গ্লাস ফ্যাক্টরি-সায়দাবাদ-গেণ্ডারিয়া-ফতুল্লা-চাষাঢ়া পেরিয়ে যেতো নারায়ণগঞ্জ। ঢাকা ক্রমশ বড় হতে থাকলে নগরীর ভিতর দিয়ে ট্রেনের চলাচল সীমাহীন ট্রাফিক সমস্যার সৃষ্টি করে। তেজগাঁও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থেকে গেণ্ডারিয়া পৌঁছতে ১২টি লেভেল ক্রসিং পার হতে হতো। ফলে মাঝে মাঝেই ঘটত দুর্ঘটনা। শহরবাসীর চলাচলে প্রচণ্ড ভোগান্তি হতো। যাত্রী হিসেবে আমার কিন্তু ভালোই লাগত ট্রেনে বসে অপেক্ষমাণ যানবাহনকে সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে। শহরের ভিতর দিয়ে পথ-পরিক্রমার একটা চক্ষুনন্দন আনন্দ তো আছেই।

আইয়ুবের ক্ষমতা গ্রহণের পর, ষাটের দশকের শুরুতেই ফুলবাড়িয়া রেলস্টেশন শহরের এক প্রান্তে স্থানান্তরিত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল। কিন্তু সেটি কার্যকর করতে দীর্ঘদিন লেগে যায়। ঢাকার নতুন রেলস্টেশনের জন্য কমলাপুরকে নির্বাচন করা হয়। ১৯৬৬ সালের ১ মে তারিখে নবনির্মিত কমলাপুর স্টেশন থেকে মালগাড়ি চলাচল শুরু করে। পরের বছর ১৯৬৭ সালের ১ মে থেকে কিছু কিছু যাত্রীবাহী ট্রেন কমলাপুর থেকে যাতায়াত করতে থাকে। তার মধ্যে একটির নাম ছিল সুন্দরবন এক্সপ্রেস। ঐ ট্রেন ময়মনসিংহ-যশোর হয়ে খুলনা পর্যন্ত যেত। আমি ঐ ট্রেনের নিয়মিত যাত্রী ছিলাম। পরে ১৯৬৮ সালের ১ মে গভর্নর জনাব আবদুল মোনায়েম খান সাহেব আনুষ্ঠানিকভাবে সরকারি ভাষায় 'এশিয়ার সর্ববৃহৎ' রেলস্টেশনটির উদ্বোধন করেন। মুসলিম স্থাপত্যরীতিতে নির্মিত ঐ নয়নমনোহর স্টেশনটি নির্মাণ করতে তখনকার দিনে প্রায় তেরো কোটি টাকা ব্যয় হয়েছিল। এর মধ্যে জমি অধিগ্রহণের ব্যয় ধরা হয়নি।

কমলাপুর চালু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ফুলবাড়িয়ার মৃত্যুবার্তা ঘোষিত হয়। এককালের জনকলরব মুখরিত ফুলবাড়িয়ায় নেমে আসে শ্মশানের নীরবতা। তারপরও কিছুদিন ঐ লাইনটি চালু ছিল। রাতের দিকে মাঝে মাঝে দ্রুতগতিতে ইঞ্জিন ছুটে যেত ফুলবাড়িয়ায়। আমার একটি ছোটগল্পে তার উল্লেখ আছে। [দ্রঃ কয়লা : আপন দলের মানুষ]। ঐ গল্পের পটভূমি হলো কাঁটাবন বস্তি, যেখানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমান হল এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব হলটি নির্মিত হয়েছে। ঐ বস্তিবাসীরা নিকটবর্তী পাওয়ার স্টেশনের ফেলে যাওয়া কয়লার ভস্মস্তূপের ভিতর থেকে আংশিক পোড়া ও না পোড়া কয়লা খুঁজে বের করত। আমার মনে পড়ে, আমি ওখানে একটি গোলাকৃতির ঘোড়ার আস্তাবলও দেখেছি। ঐ আস্তাবলে কাদের ঘোড়া থাকত, তা আমার জানা নেই। মনে হয় রেসের ঘোড়াই হবে। ট্রেন চলাচল না থাকলেও ১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানের সময় পর্যন্তও ঐ রেললাইনটি উঠিয়ে ফেলা হয়নি। উনসত্তরের উপর্যুপরি কার্ফুর মধ্যে ঐ রেললাইন দিয়ে হেঁটেই আমি হাতিরপুল থেকে ইকবাল হল ও মহসীন হলে যাতায়াত করতাম।

১৯৭০ থেকে রেললাইন উঠানোর কাজ শুরু হয় এবং স্বাধীনতার পর ধীরে ধীরে বহু স্মৃতিবিজড়িত ঐ রেলপথটি উঠে যায়। এখন এটি ঢাকার একটি অন্যতম ব্যস্ত-প্রশস্ত রাজপথে পরিণত হয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঢাকায় জন্মগ্রহণকারী এবং শৈশব-কৈশোর কাটানো কবি শামসুর রাহমান ফুলবাড়িয়া স্টেশন উঠে যাওয়ার পর তাঁর আবেগকাতর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছিলেন এভাবে :

> 'মনটা হু হু করে ওঠে। ট্রেন ধরতে আর কোনোদিন ফুলবাড়িয়া স্টেশনে যাবো না। এ কথা মনে করতেই খারাপ লাগে। বুক চিরে বেরোয় দীর্ঘশ্বাস। সেই ট্রেনের ঝকঝক শব্দ, গার্ডের হুইশিল, কুলিদের জটলা, যাত্রীদের ভিড়—এই সবকিছু ছেড়ে গেছে ফুলবাড়িয়া। ঢাকার রেলস্টেশন এখন উঠে গেছে কমলাপুরে।'
>
> [জনান্তিকে : জনৈক; দৈনিক পাকিস্তান, ৪ মে ১৯৬৮]

এই নগরীতে আমি কত জায়গায় বাস করেছি, হিসেব করে বলা কঠিন। সেই তালিকাটি যদি নির্ভুলভাবে তৈরি করা যেত, তাহলে তা হতো অতিশয় দীর্ঘ। দুর্বল স্মৃতির ওপর নির্ভর করে আমার কোনো আশ্রয়দানকারীকে আমি আহত করতে চাই না। আমি অনেকের কথা ভুলে গেছি। তবে কেউ স্মরণ করিয়ে দিলে একটু একটু করে মনে আসে। থাকা মানে শুয়ে থাকা নয় শুধু, খাওয়াও। কত মানুষের অন্ন যে ঢুকিয়েছি এই পেটে! এই যে দেহ এত মানুষের খাদ্যদানে পুষ্ট হয়েছে—তাকে আমি শুধুই আমার দেহ বলি কেমন করে? আমি তা বলিও না। আমি বলি, আমি একা নই, আমি অনেক।

কত মানুষ ফুটপাতে সংসার গড়ে তোলে। সেখানে তারা খায়-দায়, এমনকি সন্তানেরও জন্ম দেয়। আকাশের তারা গুনতে গুনতে খোলা আকাশের নিচে তারা ঘুমিয়ে পড়ে। তারা যদি পারে, তো আমরা পারব না কেন? রাত কাটানোর ব্যাপারে অন্যের ওপর নির্ভরশীলতা কাটানোর উপায় সন্ধান করতে গিয়ে একদিন আমি ফুটপাতের বাসিন্দাদের দিকে ভালো করে তাকাই। ভাবি, মন্দ কি? নিত্যনব অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হোক জীবন। প্রতিভা অনেকেরই থাকে, অভিজ্ঞতাই প্রতিভাবানদের জীবনকে পৃথক করে। আবুল হাসানও আমার প্রস্তাবে রাজি হয়ে যায়। ফলে ঢাকায় আমাদের থাকার জায়গার অভাব দূর হয়। ঘটনাটা ছিল দু'বিঘার পরিবর্তে বিশ্বনিখিল হাতে পাওয়ার মতো।

আমরা আটকেপড়া ট্রেনযাত্রীদের মতো বহু রাত কাটিয়ে দিতে শুরু করি নবনির্মিত কমলাপুর রেলস্টেশনের ওয়েটিং রুমে। ওখানে জায়গা না পেলে পত্রিকা বিছিয়ে নিজের লেখা কবিতার ওপর শুয়ে পড়ি প্ল্যাটফরমের ঝকঝকে মেঝেতে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বুড়িগঙ্গার কুলুধ্বনি আর দূরগামী স্টিমারের ভেঁপুর আওয়াজ শুনতে শুনতে আমরা ঘুমিয়ে পড়ি কুলিদের পায়ের তলায়, সদরঘাটের স্টিমার টার্মিনালে। কন্ডাক্টারের সাথে খাতির জমিয়ে গুলিস্তানের নিকটবর্তী বিআরটিসির বাস ডিপোর বাসের ভিতরে আমরা ঘুমাই। এখন ঐ ডিপোটি বঙ্গভবনের সামনের পার্কের ভিতরে মিশে গেছে। পাবলিক লাইব্রেরীর (তখন পাবলিক লাইব্রেরীটি বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরীর সংলগ্ন ছিল, পরে তা শাহবাগের নতুন ভবনে স্থানান্তরিত হয়) মোজাইক করা মেঝেতে, নভেরা আহমেদের ভাস্কর্যের দিকে তাকিয়ে কেটে গেছে আমাদের কত রাত!

পাবলিক লাইব্রেরীতে ঘুমানোর একটা সুবিধা ছিল এই যে, পরদিন সকালের নাস্তার জন্য আমাদের খুব একটা ভাবতে হতো না। কিছুক্ষণের মধ্যেই শরীফ মিয়ার ক্যান্টিন খুলে যেত এবং আমরা ওখানে বাকিতে নাস্তা সারতে পারতাম। পরে আমাদের বন্ধু বা ভক্তদের কেউ এসে নাস্তার মূল্য পরিশোধ করত। রমজান ও শরীফ ভাই আমাদের ঐ স্ট্রাটেজির কথা জানত। তাই তারা আপত্তি করত না। বরং প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে আমাদের কবি সা'ব বলে সম্বোধন করে, নবাগতকে স্মরণ করিয়ে দিত যে, উনারা কবি কবিদের পরিচর্যা করাটা সকলেরই দায়িত্ব।

রমজান আর শরীফ ভাই কেউই আজ আর বেঁচে নেই। রমজান অনেকদিন আগেই অন্ত্রনালীর রোগে ভুগে অকালে মারা গিয়েছিল। শরীফ ভাই গত বছর, ১৯৯৩ সালে মারা গেছেন। শরীফের ক্যান্টিনের কাছে আমরা অনেকভাবে ঋণী।

মনে পড়ে, আউটার স্টেডিয়ামের গ্যালারীতে শুয়ে আকাশের 'সাতটি তারার তিমির'-এর দিকে তাকিয়ে জীবনানন্দের কবিতা আবৃত্তি করতে করতে আমরা ঘুমিয়েছি। পরদিন ভোরের সূর্য আমাদের ঘুম ভাঙিয়েছে। আগের দিন বিকেলে ইনার স্টেডিয়ামে দেখেছি ভিক্টোরিয়া আর ওয়ান্ডারার্সের খেলা। তখন ঐ দুটো দলই ভালো ছিল। বিআইডিসি নামেও খুব ভালো একটি দল ছিল। আমি ফুটবল খেলা খুব দেখতাম। হাসানও আমার পাল্লায় পড়ে মাঝে মাঝে স্টেডিয়ামে গেছে। তবে সে খেলাপাগল ছিল না। আমাদের মধ্যে খুব খেলাপাগল ছিল সানাউল হক খান আর মুহম্মদ নূরুল হুদা। মুহম্মদ নূরুল হুদা তো নিজেই খেলত। আমাদের বড় কবিদের মধ্যে খুব ভালো ফুটবলার ছিলেন কবি হাসান হাফিজুর রহমান। তিনি ওয়ান্ডার্সে খেলতেন।

একদিন বাংলাবাজারের বিউটি বোর্ডিং আর 'পানিয়ম'-এ অনেক রাত পর্যন্ত আড্ডা দেওয়ার পর কোথায় রাত কাটানো যায়—এ নিয়ে ভাবছিলাম। তখন হাসান বলল, চল নারিন্দায় যাই, ওখানে একটা চমৎকার মসজিদ আছে। ওখানে ঘুমানো যাবে। ঐ মসজিদের ভেতরে আছে একটা খুব বড় চৌবাচ্চা। সেখানে টলটল করে জল। আর স্ফটিকস্বচ্ছ জলের ভিতরে নানা রঙের মাছ খেলা করে। চল, আজ ওখানে ঘুমাব।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেলাম। ইতিপূর্বে বায়তুল মোকাররম মসজিদে ঘুমিয়েছি। ওটি তখন তৈরি হচ্ছে। এত বড় একটা গগনচুম্বী অট্টালিকার মধ্যে নিজেকে খুঁজে পাওয়া কঠিন। হাসান যখন নারিন্দার মসজিদটির বর্ণনা দিল, আমার খুব ভালো লেগে গেল। যেতে যেতে হাসান বলল, ওখানে একটাই অসুবিধা, নামাজ ফাঁকি দেয়ার উপায় নেই। কম লোক তো, তাই নামাজ না পড়লে চোখে পড়ে যায়। ভোরের দিকে মুসুল্লিরা ডেকে ঘুম ভাঙিয়ে দেয়। তখন কিছুক্ষণের জন্য নামাজের কাতারে সামিল হতে হয়।

আমি বললাম, তাহলে?

হাসান বলল, তাতে কী? ওজু করে তুমিও দাঁড়িয়ে যাবে আমার পাশে। আমার দেখাদেখি তুমিও ওঠ-বস করবে। তাতেই হবে। নামাজে দাঁড়িয়ে কে কী বলছে, তা কি কেউ জানে? এটা হচ্ছে মনের একটা শুদ্ধতার ব্যাপার। কবির চেয়ে শুদ্ধ মনের অধিকারী আর কে? ছোটবেলায় আমি আমার গ্রামে হরিনামের আসরে বসে কতদিন হরিকীর্তন করেছি। [দ্র : পাখি হয়ে যায় ঐ প্রাণ : আবুল হাসান : রাজা যায় রাজা আসে কাব্যগ্রন্থ]। তুমিও তো হাইকোর্টে বসে জিকির করো। করো না?

আমি হাসানের কথায় সায় দিই। কথা ঠিক। আমি হাইকোর্টের মাজারে মাঝে মাঝে ফকিরদের সঙ্গে জিকিরে অংশ নিতাম। জিকিরের সময় প্রথমে ধীর লয়ে শুরু করে পরে ক্রমশ দ্রুত লয়ে 'আল্লাহু আল্লাহ' উচ্চারণ করার মধ্যে যে-ধ্বনিতরঙ্গের সৃষ্টি হয়, তা আমার কানকে ছন্দঝংকারে সমৃদ্ধ করত। একটা জগতাতীত ভাবও মনে আসে। বেশ ভালো লাগে। সে জন্যেই আমি মাঝে মাঝে জিকিরে অংশ নিতাম। 'হরিবোল....হরিবোল' ধ্বনির মধ্যেও আমি একই রকমের ভাবমত্ত ছন্দের ওঠানামা লক্ষ্য করেছি। মনে পড়ে, পরবর্তীকালে জিকিরের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে একটি সাহিত্য সভায় কুমিল্লায় যাবার পথে আমি একটি চমৎকার জিকির বানিয়েছিলাম— 'ইল্লাহ্-লা—কুমিল্লা।' আমরা বন্ধুরা সবাই মিলে কুমিল্লার নামে ঐরূপ জিকির করতে করতে মহানন্দে কুমিল্লায় পৌঁছাই।

আমরা নারিন্দা মসজিদে যাই। গিয়ে দেখি চমৎকার মসজিদই বটে। চৌবাচ্চার জলে সন্তরণশীল রঙ-বেরঙের মাছ আমাদের স্বাগত জানায়। ভেতরে লোকজন বেশি নেই। বেশ একটা নির্জন ছিমছাম ভাব। গভীর রাতের কোলাহলহীন নির্জনতা আমার মনকে স্পর্শ করে। খুব স্বাভাবিকভাবেই আমাদের ঐ রাত্রির আলোচনায় আধ্যাত্মিকতা প্রাধান্য পায়। একসময় আমরা ঘুমিয়ে পড়ি। ভোরের দিকে আমাদের ঘুম ভাঙে আজানের শব্দে। হাসানের দেখাদেখি আমিও মুসল্লিদের সঙ্গে চৌবাচ্চার জলে বিনিদ্র মাছদের নির্মিত দৃশ্যকাব্য দেখতে দেখতে হাত-পা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ও মুখমণ্ডল ধুয়ে পরিচ্ছন্ন হয়ে নিই। তারপর মাথায় রুমাল চাপিয়ে হাসানের পাশে গিয়ে নামাজের সারিতে দাঁড়াই।

আমি ধার্মিক নই। আমি ইহজাগতিকতায় বিশ্বাসী। তবে এক অজ্ঞাত-শক্তির প্রতি আমার এক ধরনের অব্যাখ্যাত দুর্বলতা রয়েছে। তাঁকে আমি আমার মতো করে ভাবি। আমার ভাষায় আমি তাঁর স্তব করি। আমি তাঁর বন্দনা করি আমার মতো করে। তার কোনো নির্দিষ্ট নিয়ম নেই। কোনো পূর্বনির্ধারিত পথই কবির পথ নয়। আমার সবকিছুই পৃথক। আমার ভাষা পৃথক। আমার চিন্তা পৃথক। আমি আমার ভাষায় তাঁর সঙ্গে কথা বলি। তাঁর কাছে মানুষের মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করি। গৌতম বুদ্ধের মতো জরা-ব্যাধি ও জাগতিক যাতনার হাত থেকে মানুষকে ত্রাণ করার জন্য আমি হাত তুলে তাঁর কাছে প্রার্থনা জানাই। আমি অনুভব করি তাঁর অসীমত্ব। কোনো বিশেষ নামে ডেকে আমি তাঁকে সীমিত করি না, আমি তাঁর নাম দিই 'তুমি'।

অন্যদের মতো একসময় আমারও নামাজ শেষ হয়, কিন্তু আমার মনের ভিতরে এক অন্তহীন নামাজ চলতে থাকে। মানুষের কল্যাণের জন্য আমার নামাজে কখনও ছেদ পড়ে না। আমি ভুলে যাই আমি কে? শুধু মনে পড়ে, ভিন্ন ভিন্ন ধর্মে ভাগ হয়ে গেলেও একইভাবে সৃষ্ট, আমি মাতৃগর্ভজাত এক অনাদি-আদিম মানবসন্তান। এটাই আমার প্রধান পরিচয়।

AMARBOI.COM

দৈনিক পাকিস্তান কার্যালয়ে আমাদের যাতায়াত বৃদ্ধি পায়। বড় বড় কবিদের সান্নিধ্য লাভের আনন্দ ছাড়াও ওখানে ঘন ঘন যাওয়ার পেছনে ঐ পত্রিকার সাহিত্য বিভাগে কবিতা প্রকাশের পরিকল্পনাও কাজ করে। তখন কবি আহসান হাবীবের মতো দক্ষ কবির হাতে সম্পাদিত হতো বলে দৈনিক পাকিস্তানের সাহিত্য বিভাগের মূল্য ও মর্যাদা দুটোই ছিল খুব উঁচুতে। পত্রিকাটি তখন চালুও ছিল। আমি আমার গ্রামের বাড়ি থেকে কবি আহসান হাবীবকে সদ্য শুভ্র শিকড় গজানো একটি বিরল স্থলপদ্মের কলম এনে উপহার দিই। আবুল হাসান ঐ ঘটনাটি জানত না। আমি তাকে বলিনি। হাবীব ভাই খুব খুশি হন। তিনি আমাকে তাঁর মোহাম্মদপুরের বাড়ি দেখাতে নিয়ে যান। ঐ বাড়িতে স্থলপদ্মের কলমটি রোপণ করা হবে। একদিন বাড়ির উঠোন আলো করে এর ডালে ডালে ফুটবে শত শত স্থলপদ্ম। ঐ দিনটির কথা ভেবে আমার মন ব্যাকুল হয়। হাবীব ভাইয়ের বাড়ি তৈরির কাজ তখন শুরু হয়েছে। পেছনে টাকার জোর নেই, তাই কবে এর নির্মাণ কাজ শেষ হবে, বলা মুশকিল। হাবীব ভাই এ নিয়ে বেশ চিন্তিত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দৈনিক পাকিস্তানে আগে শুধু হাসানের কবিতাই বেরুত—এরপর আমার কবিতাও ঘন ঘন ছাপা হতে শুরু করে। একটি বিশেষ সংখ্যায় এমন ঘটনা ঘটে যে, হাসান খুবই অবাক হয়। ঐ সংখ্যায় আমার কবিতা যায়, হাসানের যায় না। হাবীব ভাই তখন ক্ষিপ্ত আবুল হাসানকে হাসতে হাসতে জানিয়ে দেন যে, আমি স্থলপদ্মের প্রতিশ্রুত কলমটি এনে দিয়েছি। আমি তখন হাসানের সামনে লজ্জায় কুঁকড়ে যাই। ভাবি, কেন যে ওটা লুকাতে গেলাম? হাসান হাসে। সেই হাসি এমন দুর্বোধ্য নয়, যে তার অর্থ আমি বুঝতে পারি না।

শিল্পী কালাম মাহমুদের কৃপায় বিশেষ সংখ্যার কবিতায় আমার ও আবুল হাসানের নামের ওপর রঙের প্রলেপ পড়ে। কোন কবিতা যাবে আর কোন কবিতা যাবে না—তা হাবীব ভাইয়ের ওপর নির্ভর করলেও কোন কবিতাতে রঙ যাবে আর কোন কবিতাতে যাবে না, তা নির্ভর করত শিল্পী কালাম মাহমুদের ওপর। সেজন্যই আমরা নারিন্দায় কালাম ভাইয়ের বাড়িটি খুঁজে বের করি। বিরাটাকৃতির রোটারি অফসেট মেশিনে গভীর রাতের দিকে পত্রিকা ছাপা হতো। পরদিন হয়তো কোনো বিশেষ সংখ্যা বেরুবে। সেখানে আমাদের কবিতা যাবে—তাই আমরা দৈনিক পাকিস্তানের চারপাশে রাতভর প্রবল উত্তেজনা নিয়ে ঘুরে বেড়াই। আমাদের চোখে কিছুতেই ঘুম আসে না। কবিতাকে জাগিয়ে রেখে কবির কি ঘুমানো উচিত?

কবি হাসান হাফিজুর রহমান আমার ও আবুল হাসানের সম্পর্কটাকে খুব এনজয় করতেন। মাঝে মাঝে আমাদের মধ্যে ঝগড়া লাগিয়ে দিয়ে মজা দেখতেন। তিনি তখন পূর্ব পাকিস্তান লেখক সংঘের সম্পাদক। নামের মিল থাকার কারণে আবুল হাসানের প্রতি তাঁর কিছুটা পক্ষপাত থাকলেও আমার প্রতিও তাঁর সবিশেষ দুর্বলতা ছিল। লেখক সংঘ থেকে 'পরিক্রম' নামে একটি মাসিক পত্রিকা বের হতো। একসময় কবি গোলাম মোস্তাফা ঐ পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। হাসান ভাই তখন ঐ পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্ব পান। তার একজন বিশ্বস্ত সহযোগী দরকার। 'কণ্ঠস্বর' পত্রিকায় কাজ করার অভিজ্ঞতা বিবেচনা করে হাসান ভাই আমাকে ঐ পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্য বলেন। প্রুফ দেখা, লেখকদের লেখা সংগ্রহ করা, ইত্যাদি কাজ। বিজ্ঞাপন সংগ্রহের কোনো দরকার নেই। এ তো আর কণ্ঠস্বর নয়, লেখক সংঘের টাকা আছে। আমি মহানন্দে কাজে লেগে গেলাম।

হাসানও তখন বেকার। হাসান রেগে গেল, তাকে কাজটা না দিয়ে হাসান ভাই কাজটা আমাকে দিলেন বলে। তখন হাসান ভাই আমাকে না জানিয়ে একই কাজ আবুল হাসানকেও দিলেন। হাসান ভাই হয়তো আমাদের বন্ধুত্বের গভীরতা পরীক্ষা করবার জন্যই এমনটি করে থাকবেন। প্রথমে দু'জনের মধ্যে ঐ কাজ নিয়ে একটু মন কষাকষি হলেও, আমরা ব্যাপারটা বুঝে ফেললাম। আমরা ঠিক করলাম বেতন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যা পাই দু'জনে ভাগ করে নেব। দ্রৌপদীকে যদি পঞ্চভ্রাতা মিলে ভাগ করে নিতে পারে, তো লেখক সংঘের এই সামান্য বেতনের কাজটি কি আমরা দু'জনে ভাগ করে নিতে পারব না? নিশ্চয়ই পারব।

চাকরি নিয়ে আমাদের মধ্যে কোনো ঝগড়া বাধেনি দেখে হাসান ভাই খুবই অবাক হলেন। তিনি তখন স্বীকার করলেন, তোমরা তো সত্যিকারের বন্ধু হে! না, কবিদের মধ্যে এ রকমের বন্ধুত্ব আমি আর দেখিনি।

হাসান ভাইয়ের একটি ভকসওয়াগন গাড়ি ছিল। গাড়ির ড্রাইভারের নাম ছিল বাসু। তিনি বাসুকে বলতেন মাঝে মাঝে আমাদের গাড়িতে লিফট দিতে। আমরা হাসান ভাইয়ের গাড়িতে চড়ে মাঝে মাঝে রোকেয়া হলের সামনে গাড়ি থেকে নেমে রোকেয়া হলের মেয়েদের তাক লাগিয়ে দিতাম। তারপর শরীফ মিয়ার স্টলের চা খাইয়ে বিদায় করতাম বাসুকে। বাসুর সঙ্গে আমাদের খুব ভাব হয়ে গিয়েছিল। হাসান ভাই বাসুকে খুবই ভালোবাসতেন। সে ছিল খুবই বিশ্বস্ত এবং হাসিখুশি।

আমরা দিনে লেখক সংঘের কাজ করি। রাতে ওর কার্যালয়ে ঘুমাই। বাংলা একাডেমীর মূল গেট সংলগ্ন টিনের লাল-ঘরটিতে ছিল লেখক সংঘের অফিস। অর্থাৎ পোস্ট অফিস-সংলগ্ন টিনের ঘরটি। ইংরেজি বিভাগের হেড ক্লার্ক বজলুর রহমান সাহেব ছিলেন অফিস-সেক্রেটারি। তার আগে অফিস সেক্রেটারি ছিলেন নজরুল-গবেষক শাহাবুদ্দিন আহমদ সাহেব। একজন পিয়ন ছিল, ওর নামটি ভুলে গেছি, সে ওখানে রাতে থাকত। আমরা খুব রাত করে ওখানে এসে ঐ যুবককে ঘুম থেকে ডেকে তুলতাম। আমাদের ডাকে সহজে সে সাড়া দিত না। তখন ওকে অশ্রাব্য ভাষায় গালাগাল করতে হতো। ভয় দেখাতে হতো। তাতে কাজও হতো। একসময় যেন এইমাত্র আমাদের ডাক শুনতে পেয়েছে, এমন ভান করে তিনি ঘুম থেকে উঠতেন এবং দরোজা খুলে দিতেন।

সকালের দিকে বাংলা একাডেমীর কর্মচারীরা যখন অফিসে আসত তখন দেখা যেত আমরা দু'জন বড় টেবিলের উপর মড়ার মতো পড়ে ঘুমাচ্ছি। মাথার উপর সর্বোচ্চ গতিতে শোঁ শোঁ শব্দ করে ফ্যান ঘুরছে। দৃশ্যটি অনেকেরই দৃষ্টিপীড়ার কারণ হয় এবং ঘটনাটি আলোচ্য বিষয়ে পরিণত হয়।

কার পরামর্শে জানি না, একদিন ঐ ছেলে কিছুতেই দরজা খুলতে চায় না। তখন এক-পর্যায়ে ইটের আঘাতে কাচের জানালা ভেঙে, সিঁদেল চোরের মতো ভাঙা জানালা দিয়ে আমরা ঐ ঘরটিতে ঢুকি এবং এ ছেলেটিকে প্রহার করি। ঘটনাটি পরদিনই জানাজানি হয়ে যায়। হাসান ভাই স্থানীয় তদন্তে আসেন এবং

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লেখক সংঘের ভাঙা জানালাটি দেখতে পান। তখন আমাদের চাকরি চলে যাবার উপক্রম হয়। শেষে হাসান ভাই আমাদের মাফ করে দেন এই শর্তে যে, আমরা আর ঐ অফিসে রাতে হামলা করব না।

আমরা তাতে রাজি হই। আমাদের কি জায়গার অভাব?

সারা ঢাকা শহরই তখন আমাদের দখলে।

হাসান ভাইয়ের কারণে পরিক্রম পত্রিকায় তখন তরুণ কবিদের কবিতা খুব ছাপা হতে থাকে। ১৯৬৮ সালের নভেম্বর পর্যন্ত হাসান ভাই পরিক্রমের সম্পাদক ছিলেন। তাঁর ইমিডিয়েট আগে ছিলেন কবি আবদুল গণি হাজারী। ১৯৬৯ থেকে সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী পরিক্রমের সম্পাদক হন। আমার 'প্রেমাংশুর রক্ত চাই'সহ পাঁচটি কবিতা পরিক্রমে প্রকাশিত হয়েছিল।

পরিক্রমে যোগদান করার আগে কিছুদিন আমি আহমদ রফিক সম্পাদিত নাগরিক পত্রিকায় কাজ করেছিলাম। নাগরিক ছিল ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকা। ডা. আহমদ রফিক তখন আলবার্ট ডেভিড নামক একটি ওষুধ কোম্পানিতে কাজ করতেন। সেগুনবাগিচায় তাঁর অফিস ছিল এবং বাসা ছিল গোপীবাগে। নাগরিক পত্রিকায় বেশিদিন কাজ করা হয়নি বলে ঐ পত্রিকা বিষয়ে আমার আর বেশি কিছু মনে নেই।

ঐ সময়টা শুধু আমার জন্যই অস্থির সময় ছিল না, ঐ অস্থিরতা কমবেশি ছিল পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত সকল বাঙালির মধ্যেই। ঐ সময়টা ছিল পূর্ব বাংলার বাঙালিদের আত্ম-আবিষ্কারের সময়। তার ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির আবহমান ঐতিহ্যের ওপর অধিকার প্রতিষ্ঠার সময়। পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানের অধিবাসীদের ঘনায়মান সংঘাত মোকাবিলার প্রস্তুতি গ্রহণের সময়। ফলে জ্ঞাতে বা অজ্ঞাতে আমাদের সাংস্কৃতিক কর্মপ্রবাহ অগ্রসর হচ্ছিল সেই পথ লক্ষ করে। রবীন্দ্রসঙ্গীত ও রবীন্দ্রসাহিত্য সম্পর্কে তথ্যমন্ত্রী খাজা শাহাবুদ্দিনের মন্তব্য ও মূল্যায়ন তখন শুধু প্রতিবাদের ঢেউ তুলেই শান্ত হয়ে যায়নি। সে উজ্জীবিত হতে শুরু করেছিল প্রতিরোধের প্রত্যয়ে। তাই ৩১ এপ্রিল ১৯৬৮ ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটে 'বজমে নও' নামক একটি প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে যখন উর্দু মোশায়রা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে, তার অল্পকিছুদিনের ব্যবধানেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা সমিতি আয়োজন করে 'হাজার বছরের বাংলা কবিতা'র এক আশ্চর্য সফল অনুষ্ঠান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শিক্ষক কেন্দ্রে ঐ অনুষ্ঠানটি হয় ১৪ মে ১৯৬৮।

ঐ অনুষ্ঠানের ঐতিহাসিক সাংস্কৃতিক তাৎপর্য ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মুনীর চৌধুরী ঐ অনুষ্ঠানে শামসুর রাহমানের 'দুঃখ' কবিতাটি আবৃত্তি করে শুনিয়েছিলেন। মুনীর স্যার যে কত বড় আবৃত্তিকার ছিলেন, তা আমি সেদিন অনুভব করেছিলাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শামসুর রাহমানের দুঃখ কবিতাটি আমার কাছে নতুনভাবে আবিষ্কৃত হয়েছিল। হলভর্তি শ্রোতার পিনপতন নীরবতার মধ্যে মুনীর স্যারের আবৃত্তি শুনে আমি মনে মনে ভাবছিলাম, আহা, এমন দিন কি কখনও আসবে, যেদিন মুনীর স্যার আমার কোনো কবিতা এ রকম কোনো অনুষ্ঠানে আবৃত্তি করবেন?

'বজমে নও'-এর মোশায়রায় অংশগ্রহণ করতে ঢাকায় এসেছিলেন পাকিস্তানের প্রখ্যাত উর্দু কবি যোশ মালিহাবাদী, ফয়েজ আহমদ ফয়েজ, আহমদ নদীম কাজমী, কাতিল শিফাই প্রমুখ। বাঙালি কবিদের মধ্যে ছিলেন কবি জসীম উদ্‌দীন এবং বেগম সুফিয়া কামাল। রাত আড়াইটা পর্যন্ত ঐ মোশায়রা অনুষ্ঠানটি চলেছিল।

আমরা আগে এ খবর জানতাম না। পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ার পর হাসান ভাই খুবই রাগ করেন। তিনি পূর্ব পাকিস্তান লেখক সংঘের উদ্যোগে ঢাকার প্রবীণ-নবীন কবিদের নিয়ে একটি খুব জমজমাট (পাল্টা?) কবিতা পাঠের আসর অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত নেন। সেটি অনুষ্ঠিত হয় শাহবাগ হোটেলের ব্যাংকোয়েট হলে। এর আগে এমন অভিজাত স্থানে এরূপ কাব্যানুষ্ঠান ঢাকায় আর হয়নি। হাসান ভাই ঐ অনুষ্ঠানে তরুণ কবিদের মধ্য থেকে শুধু আবুল হাসানকে কবিতা পড়ার সুযোগ দেন। আমি বাদ পড়ি। এই নিয়ে তখন মন খারাপ হলেও এখন আমার মনে হয় হাসান ভাই সঠিক সিদ্ধান্তই নিয়েছিলেন। আমার প্রথমদিগের কবিতাগুলোর চেয়ে আবুল হাসানের প্রথমদিগের কবিতা ভালো ছিল। আমার উল্লেখ করার মতো কবিতাগুলো আমি লিখি আরও কিছুদিন পরে। ঐ কবিতা পাঠের আসর সম্পর্কে পরদিনের পত্রিকায় যে রিপোর্ট প্রকাশিত হয়, তা ছিল নিম্নরূপ :

লেখক সংঘের

কবিতা পাঠের আসর

ঢাকার বিশিষ্ট কবিরা গতকাল (১৯ মে ১৯৬৮) মিলিত হয়েছিল এক মনোরম কবিতাসন্ধ্যায়। অন্তরঙ্গ পরিবেশে তাঁরা আসর জমিয়েছিলেন স্বরচিত কবিতা পাঠের। ঢাকায় এই প্রথম এ-ধরনের একটি কবি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হলো। এতে সভাপতিত্ব করেন কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন বোর্ডের পরিচালক ড. মুহম্মদ এনামুল হক।

পাকিস্তান লেখক সংঘের পূর্বাঞ্চল শাখা এই কবিতা-সন্ধ্যার আয়োজন করে। হোটেল শাহবাগে অনুষ্ঠিত প্রবীণ ও নবীন কবিদের এই সমাবেশে স্বরচিত কবিতা পড়ে শোনান কবি জসীম উদ্‌দীন, আবদুল কাদির, আহসান হাবীব, সিকানদার আবু জাফর, আহসান আহমদ আশক, আবদুর রশীদ খান, শামসুর রাহমান, ফজল শাহাবুদ্দিন, লতিফা হিলালী, জাহানারা আরজু, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ, শহীদ কাদরী ও আবুল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাসান। সুফিয়া কামালের কবিতা তাঁর অনুপস্থিতিতে পাঠ করে শোনান জনাব কামালউদ্দিন খান।

রাজধানীর বহুসংখ্যক কবি-সাহিত্যিক ও শিল্পানুরাগী এই কবিতা পাঠের আসরে উপস্থিত ছিলেন।

[দৈনিক পাকিস্তান : সোমবার, ২০ মে ১৯৬৮]

ঐ অনুষ্ঠানটি আমাদের কবিতাঙ্গনে প্রবল প্রেরণার সঞ্চার করেছিল এবং ঢাকার পত্র-পত্রিকায় ঐ কবিতা পাঠের সংবাদ খুব ফলাও প্রচারও লাভ করে।

আধুনিক কবিতা দুর্বোধ্য, তার পাঠক নেই। পাঠকের সঙ্গে আধুনিক কবিতা তার যোগসূত্র হারিয়ে ফেলছে—এমন অভিযোগ তখন খুবই বাস্তব ছিল। ঐ অভিযোগ মোকাবিলা করার জন্য আমরাও একটি উদ্যোগ নিয়েছিলাম। সেলিম সারওয়ারকে আহ্বায়ক করে একটি কমিটিও গঠন করা হয়েছিল। শামসুর রাহমান ঐ উদ্যোগের সঙ্গে থাকবেন বলেছিলেন। আমরা রমনা রেস্তরাঁয় এক বিকেলে মিলিতও হয়েছিলাম। তারিখ ১ ডিসেম্বর ১৯৬৭। 'অধিক কবিতা ফলাও' ছিল আমাদের স্লোগান। রমনা রেস্তরাঁর ঐ সমাবেশে পূর্ব পাকিস্তান লেখক সংঘের তখনকার সভাপতি প্রফেসর খান সারওয়ার মুর্শিদ সাহেব এসেছিলেন। তরুণ কবি-সাহিত্যিকদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রফিক আজাদ, আবুল হাসান, হুমায়ুন কবির, সিকদার আমিনুল হক, সৈয়দ আবুল আকরাম, আবুল কাশেম ফজলুল হক, জামান খান, সেলিম সারোয়ার, রাজনীতিক মোহাম্মদ শাজাহান এবং আমি। শেষ পর্যন্ত শামসুর রাহমান এবং হাসান ভাই না আসায় ঐ সভাটি স্থগিত হয়ে যায়।

তখন এমন বক্তব্য এসেছিল যে, শামসুর রাহমান... হাসান হাফিজুর রহমানে কাজ হবে না, যা করতে হয় আমাদেরই করতে হবে। ঐ সমাবেশে রফিক আজাদ রঙ-বেরঙের পোশাক পরে ঢাকার রাজপথে কবিতা পড়ার ইচ্ছা ব্যক্ত করেছিলেন।

পরে আমরা ঐ লক্ষ্য নিয়ে আবার মিলিত হব, এমন সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল, যা আর কোনোদিনই বাস্তবায়িত হয়নি।

আবদুল্লাহ্ আবু সায়ীদ এবং রাজীব আহসান চৌধুরীও একবার সারা দেশের কবিদের নিয়ে একটি কবি-সম্মেলন করার ঘোষণা দিয়েছিলেন। সেটিও আলোর মুখ দেখেনি।

[দ্র : অটোগ্রাফ ফটোগ্রাফ—শুভেন্দু :
দৈনিক আজাদের সাহিত্য মজলিশ : ৪ মে ১৯৬৯]

আমাদের ব্যর্থতার পটভূমিতে শাহবাগ হোটেলের কবিতা পাঠের আসরের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। নিঃসন্দেহে বলা যায়, কবি হাসান হাফিজুর রহমান সেদিন আমাদের কবিতার সঙ্গে পাঠকের হারানো যোগসূত্র পুনর্স্থাপনের ক্ষেত্রে একটি ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছিলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শাহবাগ হোটেলে সর্বশেষ সাহিত্য অনুষ্ঠানটি হয় ১০ জুন ১৯৬৮। লেখক সংঘের উদ্যোগে আয়োজিত ঐ সাহিত্যানুষ্ঠানের বিষয় ছিল—'আমাদের সাহিত্যিকরা কী ভাবছেন?' অবশ্য আমি আর ঐ অনুষ্ঠানে যাইনি।

আজকের পিজি হাসপাতালটিই যে তখনকার শাহবাগ হোটেল ছিল—সে বিষয়ে বিস্তারিত বলার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না।

আমাকে শাহবাগ হোটেলে কবিতা পড়তে না দেবার কারণে হাসান ভাইয়ের সঙ্গে আমার সম্পর্কের অবনতি ঘটেছিল। শেষে আমার নিস্পৃহতা এবং অভিমান হাসান ভাইয়ের মনকে স্পর্শ করে। তিনি আমার সঙ্গে সম্পর্ক ভালো করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। একদিন আমাকে কাছে ডেকে বলেন, নির্মল, তুমি মন খারাপ করো না। আমি জানি তুমি মন খারাপ করেছো। তুমি আরেকটি কবিতা পাঠের আসরের আয়োজন করো। এটি হবে শুধুই তরুণ কবিদের অনুষ্ঠান। আবুল হাসানকে ঐ অনুষ্ঠান থেকে বাদ দেবে। ও তো প্রবীণ কবি। আমি যা টাকা লেগে দেব। কিন্তু তার আগে আমরা একটা বড় কাজ করতে যাচ্ছি। সেখানে তোমাকে কাজ করতে হবে। খাটতে হবে। হারামজাদারা বাংলা ভাষা ও বানান সংস্কার করার ষড়যন্ত্র করছে। এদের বিরুদ্ধে বুদ্ধিজীবীদের কাছ থেকে বিবৃতি সংগ্রহ করতে হবে। আমরা কয়েকজন মিলে ঐ বিবৃতির ড্রাফট তৈরি করছি। এটা নিয়ে তোমাকে বিভিন্ন কবি-সাহিত্যিকের কাছে যেতে হবে। এর পরপরই আমরা বড় আকারে মহাকবি স্মরণোৎসব করব। ইঞ্জিনিয়ার্সে পাঁচদিন ব্যাপী ঐ অনুষ্ঠান হবে, ১৪ জুন থেকে ১৮ জুন পর্যন্ত। মাইকেল, গালিব, রবীন্দ্রনাথ, ইকবাল ও নজরুল—এই পঞ্চকবির উদ্দেশ্যে নিবেদিত হবে পাঁচ দিনের অনুষ্ঠান। এটা আসলে রবীন্দ্র-বিরোধিতার মোকাবিলায় আমাদের একটি কৌশুলি প্রয়াস। বোঝই তো, ওদের অস্ত্রেই ওদের ঘায়েল করা। তারপর জুলাই মাসে পূর্বাণী হোটেলে হবে তরুণ কবিদের কবিতা পাঠের আসর।

হাসান ভাইয়ের কথায় আমার মন প্রফুল্ল হয়। আমি নব-উদ্যমে কাজে লেগে যাই। আমার ওপর দায়িত্ব পড়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট কর্তৃক প্রস্তাবিত বর্ণমালা ও বানান সংস্কারের বিরুদ্ধে প্রদত্ত বিবৃতিতে কবি-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীদের স্বাক্ষর সংগ্রহ করা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঢাকা শহরে টাকা ছাড়া চলাটা সহজ ছিল না। বেশ কষ্ট করতে হয়েছে। বেশ। ছাপা হতে না হতেই কবিতার টাকার জন্য পত্রিকা অফিসে ধর্ণা দিয়েছি। বিল হয়েছে তো ক্যাশে টাকা নেই। ক্যাশে টাকা আছে তো বিল হয়নি। কবিতার বিল নিয়ে পত্রিকার সম্পাদকদের সঙ্গে মন কষাকষি হয়েছে। তাতে মনের ঝাল মিটেছে বটে কিন্তু পেটের ক্ষিদে মেটেনি। শূন্যপকেটে, পেটভরা খিদে নিয়ে বন্ধু-বান্ধব ও ভক্তদের দেয়া সৌজন্যসূচক চা-বিস্কিট খেয়ে দিন কাটিয়েছি। ঐসব ভয়াবহ দিনগুলোর কথা ভেবে যখন এই দেহের দিকে তাকাই, মায়া হয়। শুধু কবি হওয়ার জন্য কী পাগলামিটাই না করেছি।

তখনকার অবস্থা বিশ্লেষণে আমার বাবার লেখা ঐ সময়ের একটি চিঠি এখানে মানাবে ভালো। একটু পরের লেখা হলেও, কবিতা নামক অধরার পেছনে মত্ত থাকার কারণে আমি আমার বাবাকেও কী রকম কষ্ট দিয়েছিলাম, তার প্রমাণ পাওয়া যাবে এ চিঠিতে।

AMARBOI.COM

৫ বৈশাখ, শুক্রবার। কাশবন।

কল্যাণীয়েষু,

তোমার চিঠি না পাওয়াতে আমরা খুব চিন্তাযুক্ত আছি। তবে 'রাখে কৃষ্ণ মারে কে'—এই কথা ছাড়া তোমার উপর প্রয়োগ করার মতো অন্য কোনো কথা নাই। তোমার না আছে বিছানা, না আছে গায়ে দিবার চাদর, না আছে থাকিবার প্রয়োজনীয় আস্তানা। স্থায়ী আস্তানা যে তোমার কোথায় এবং তোমাকে খুঁজিলে কোথায় পাওয়া যাইবে এবং তোমার শরীর কেমন আছে, বাঁচিয়া আছো কি না—এইসব শারীরিক কুশলাদি জানিতে হইলে কোন্ ঠিকানায় তাড়াতাড়ি জানা যাইবে তাহারও কোনো নিশ্চয়তা নাই—তাই ভাবিয়া দেখিলাম, তোমার মতো ছেলের জন্মদাতা বাস্তবিকই ধন্য। মনে হয় তুমিই আমার মৃত্যুর কারণ হইবে। অথচ তোমাকে নিয়া সংসারের অনেক আশাই করিয়াছিলাম। শ্রী শ্রী ঠাকুর কেন যে তোমার উপর এত নিষ্ঠুর হইলেন তাহাই বুঝি না। ঢাকায় প্রবল ঝড় হইয়া গেল। ... Transistor-এ খবর, কত যে হত হইয়াছে তাহা এখনও সঠিক বলা যায় না—এমতাবস্থায় পত্র দিয়া তোমার কুশল জানানো উচিত। শ্রী শ্রী ঠাকুর তোমাকে কেমন রাখিয়াছেন জানি না, তবে তোমার চিন্তা করিয়া আমরা মৃতপ্রায়। সংক্রান্তি, মাস পহেলা চলিয়া গেল, তোমার চিঠি দেবার কথা থাকিলেও তুমি চিঠি দিলে না। বাড়িতেও আসিলে না। ঢাকায় থাকিয়া তুমি এমন কি মহৎ কাজ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাধন করিতেছো তাহাও বুঝিতেছি না। ঢাকা শহর তোমার বেলায় সর্বদাই বিপদগ্রস্ত, উহাই ভাবিতেছি...

ইতি আং তোমার বাবা।

** এখানে ১৯৬৯-এর ঘূর্ণিঝড়ের কথা বলা হয়েছে। বৈশাখের প্রথম দিবসে, নববর্ষ বরণের ভোরে ঐ ঘূর্ণিঝড় ঢাকায় আঘাত হেনেছিল। ঢাকার নিকটবর্তী ডেমরা শিল্পাঞ্চলে প্রচণ্ড ক্ষয়-ক্ষতি হয়েছিল। ঐ ঝড়ে প্রচুর প্রাণহানি হয় এবং অসংখ্য ঘরবাড়ি বিনষ্ট হয়। আমি ওখানে রিলিফ-ওয়ার্কে গিয়েছিলাম এবং আমার অভিজ্ঞতা থেকে 'একটি গৃহিণী গ্রাম, গ্রামবাসী' কবিতাটি লিখেছিলাম। রিলিফকর্ম এবং কবিতা-রচনা নিয়ে ব্যস্ত থাকায় বাড়িতে চিঠি দিয়ে কুশল জানানোর সময় পাইনি। এই পত্রটি এসেছিল লেখক সংঘের ঠিকানায়।

[সূত্র : ফটোগ্রাফ-অটোগ্রাফ : শুভেন্দু :
আজাদের সাহিত্য মজলিশ। ১৫ জুন, ১৯৬৯]

বাংলা একাডেমীর আশ্চর্য সমৃদ্ধ লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত পুরনো কাগজপত্র ঘাঁটতে গিয়ে একটি লেখা পেয়ে গেলাম যেখানে আবুল হাসান ঐ সময়ের স্মৃতিচারণ করেছিল এভাবে :

> ...'ভার্সিটিতে ছিলাম ভালো। কি জানি কোন অলৌকিক অন্ধকার আলোর মতো সঠিক হয়ে বাজলো বক্তৃতা ছেড়ে দিলাম তার সোনালি করিডোর। কান্নার মতো দীর্ঘ অথচ সংক্ষিপ্ত স্বপ্নগুলো আমার সাজুয্য পেলো না বলে বুঝি ছেড়ে দিলাম ছত্রবদ্ধ ভবিষ্যৎ। বাঁধতে পারলাম না তাকে তুমুল রঙ্গীন কোনো মলাটের মর্মার্থে। একটি বিষাদের উজ্জ্বল আক্রমণ যখন আমাকে পেয়ে বসলো, তখন ধীরে-ধীরে গুটানো মাঝির মতো নিজের নিয়তির নৌকা উজান পথে ইচ্ছার রশি দিয়ে টেনে যেতে থাকলাম। কোথাও কোনো পার নেই। সাথী নেই। সঙ্গী নেই। কারো সাথে গলা মিলিয়ে গলায় গলায় গাইতে পারি না। কিন্তু না, মিলে গেলো। ধীর মফস্বল দৃশ্যের মতো নমনীয় একটি লোক এলো। দেখা স্টেডিয়ামের মোড়ে। বললাম, কি করবেন? কবিতা লিখছেন দেখলাম পত্র-পত্রিকায়। কোথায় পড়বেন? 'ভার্সিটিতে।' মনটা দমে গেল। অন্তত একটা গুনটানার সঙ্গী চাই। টেপরেকর্ডারের গানে সমভাবে ঘুরপাক খাওয়ার জন্য আরো একটি সমান বেদনা চাই। পরিশেষে তার ভর্তি। পরিশেষে তার খোঁপায় গোলাপ খোঁজা। পরিশেষে নিজের বুকের ভিতর বাঘিনীর দাঁতের ধার পুষে সে নিক্রান্ত হলো। যেন একটি দুপুর এলো আর একটি দুপুরের কাছে। হেঁটে হেঁটে ছায়ার তলা থেকে। অবশেষে দুই দুপুরের রোদের সমকোণে মিলে অপরাহ্নের মতো একাত্ম হলাম। থাকি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এখানে-ওখানে। টেপরেকর্ডারের মতো গুটিয়ে যাই স্মৃতির ভিতর। মফস্বল ফিরতি দু'জন। কিন্তু একাধিক স্বাতন্ত্র্য লুকিয়ে আছে দুই দরিদ্রের আস্তিনে। ... সব তুমুল, তুঙ্গ মানুষের মধ্যে, মহিলার মধ্যে বিচরণ করি; কিন্তু নই আমি তাদের কেউ। শুধু জানি, এইই আমার অবিহিতি। এর থেকে দূরে যেতে পারবো না কখনও। তবুও তো বন্ধু, বিরচিত বাক্যে তাকে মনে হয়েছিল আমার আলোর মতো সঠিক। যখন চলি শহরের পথ দিয়ে দু'জন। মাঝে মধ্যে পকেটে পরিচ্ছন্ন পরিতাপ ছাড়া পয়সা বাজে না। স্মৃতি সম্ভাবিত সংগ্রহের মতো দুর্বল দেহ ধারণ করে আবার অনধিকভাবে দিনে একবার উপোস দিই। তবু দু'জনে কবি বলেই একই রেখার মধ্যে একটি রাগিণী খুঁজে পেলাম। হোক নিহত সুখ, তবু দু'জন, আছি কথাবার্তায়। পরস্পর পরিচিত বেদনায়। তাই ভালো লাগে উল্লোল জাগরণ। কত জায়গায় রাতবিরেতে ঘুরি। আড্ডা দিই। নিখুঁত সঞ্চয়ের মতো একে অপরের নিঃসঙ্গতায় লেগে থাকি।...

[যে যার স্বভাবে : পাক জমহুরিয়াত, ৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১ ।]

আমি যদি এই গ্রন্থ রচনা না করতাম, আবুল হাসানের এই রচনাটির প্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হতো না। আবুল হাসান যে এমন একটি লেখা লিখেছিল তা সে আমাকে কখনও বলেনি। আমারও চোখে পড়েনি। আমার কাছে লেখা হাসানের জীবনের শেষ চিঠিটিতেও এ রকম স্মৃতিচারণ আছে। এখানে এসে আমি হাসানকে যেন আবার জীবন ফিরে পেতে দেখলাম। আমার মনে হলো কোনো একটা অচেনা স্থানে বসে আমি হাসানের সঙ্গে গল্প করছি। সে আমাকে সাহায্য করছে এই গ্রন্থ লিখতে।

AMARBOI.COM

অনেক দুঃখের কথা বলা হয়েছে। এবার একটি হাসির ঘটনা বলি। একদিন আমার পকেটে পয়সা ছিল না। কারো কাছে চেয়ে ধারও পাইনি। পেটে চা ছাড়া আর কিছুই পড়েনি। প্রচুর সিগারেট খেতাম তখন। তাও আবার কিংস্টার্ক সিগারেট। খুব কড়া, টোস্টেড টোব্যাকো। দাম ছিল প্রতি প্যাকেট চার আনা। খালি পেটে ঐ সিগারেট খাচ্ছি। একটার পর একটা। যারা বলেন সিগারেটে ফুডভ্যালু নেই, তারা ভুল বলেন। এখন আছে কি না জানি না, তখন ছিল।

বিকেলে বাংলাবাজারের একজন প্রকাশকের কাছ থেকে কিছু টাকা পাই। প্রুফ দেখার টাকা। টাকা নিয়ে ছুটলাম ঠাঠারিবাজারের হাক্কার জুয়ার আড্ডায়। উদ্দেশ্য টাকাটা বাড়িয়ে নেওয়া। সেখানে রাতদিন জুয়া চলত। চরকি ঘোরানো জুয়া। একদিকে ভাগ্যের চাকা ঘুরছে আর চারদিক থেকে ভাগ্যসন্ধানীদের টাকা এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ছে অয়েল ক্লথে আঁকা জুয়ার সুদৃশ্য পটের বিভিন্ন মার্কায়। মাছ, হাতি, ঘোড়া, ময়ূর—আরো কত কি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার জুয়ার ভাগ্য চিরদিনই খুব খারাপ। কিছুক্ষণের মধ্যেই বহু কষ্টে উপার্জিত টাকা মাহবুব আলী ইনস্টিটিউটের প্রাঙ্গণে বিছানো হাক্কার জুয়ার পটের বাঘ-ভাল্লুক-মাছ-মুরগি মিলে গিলে ফেলল। রাগে, দুঃখে, শূন্য হাতে জুয়াস্থল থেকে বেরিয়ে আসি। ক্ষুধায় আমার পেট চোঁ চোঁ করে। আমি চলতে পারি না। কোথায় যাব, কী করব কিছুই ভেবে পাই না। ঠিক তখনই মাথায় একটা দুষ্ট বুদ্ধি খেলা করে। সিদ্ধান্ত নিই, যা থাকে কপালে! আগে তো পেট পুরে খেয়ে নেই, পরে দেখা যাবে।

গুলিস্তানের পেছনে, এখন যে জায়গাটায় গোলাপ শাহ মাজার তৈরি হয়েছে, ঠিক ঐ স্থানেই ছিল একটি খুব চালু হোটেল। হোটেলটিতে ভিড় লেগেই থাকত। ঐ ভিড়টাই আমার দরকার। আমি স্থির করি, পেট পুরে খাওয়ার পর গায়ে যখন জোর পাব, দেব দৌড়। আমি সিদ্ধান্তমতো অগ্রসর হই। পেট পুরে ডাল-মাছ-ভাত কর্মসূচী বাস্তবায়িত করি। তারপর মুখ হাত ধুয়ে অতিশয় সতর্কতার সঙ্গে অগ্রসর হই কাউন্টারের দিকে। সেখানে ঝোলানো গামছায় হাত মুছি, আর আড়চোখে রাস্তার দিকে তাকাই। রাস্তা আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকে, আয়, আয়। পেছন থেকে খাদ্য-পরিবেশনকারী ছেলেটি চিৎকার করে আমার খাদ্যের মূল্য ঘোষণা করে। আমি এমন একটা ভাব দেখাই যে, এত টাকা হতেই পারে না। তারপর, তখন টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছিল, ঐ বৃষ্টির মধ্যে বেন জনসনের বেগে চোখের পলকে দেই ভোঁ দৌড়।

আমি যে দৌড় দেব, তা হোটেলের কেউই ভাবতে পারেনি। আমি লক্ষ্য করি, আমার পেছনে 'ধর-ধর' বলে চিৎকার করে কয়েকজন ছুটে আসছে। তারা ধর ধর ছাড়া অন্য কিছু বলছে না। আসলে তারা আমাকে কী বলবে, তা ঠিক করতে পারছিল না। চোর বলবে? না, আমি তো চোর নই। ডাকাত বলবে? না, আমি তো ডাকাত নই। হোটেল থেকে খেয়ে পয়সা না দিয়ে যে দৌড় দেয়, তাকে কী বলা হয়, বাংলা ভাষায় তা নেই। আমি ভাষার সীমাবদ্ধতার ঐ সুযোগটা উপরি হিসেবে পেয়ে যাই। ধর ধর বলে আমিও দৌড়াতে শুরু করি। একটি দোতলা বাস গুলিস্তান থেকে ছেড়ে যাচ্ছিল, আমি ঐ চলন্ত বাসে লাফিয়ে উঠে পড়ি। তখন আমাকে আর পায় কে? কন্ডাক্টর ছাড়া তখন আমি আর কাউকে ভয় করি না।

কিছুদিন পরে একবার আবুল হাসানকে নিয়ে আমি ঐ ঘটনার পুনরাবৃত্তি করেছিলাম মধুর ক্যান্টিনে। আবুল হাসান তার দুর্বল হার্টের কারণে আমার মতো দ্রুত দৌড়াতে পারত না। ফলে হাসান ধরা পড়ে যায়। বৃষ্টির জন্য কলাভবনের মূল গেটের ছাদের নিচে দাঁড়িয়েছিলেন আমার শিক্ষক ড. আহমদ শরীফ এবং হাসানের শিক্ষক ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী—ঐ কালসন্ধ্যায় আগুনে পোড়া চেলা কাঠ নিয়ে তেড়ে-আসা মধুর ক্যান্টিনের কর্মচারীদের হাত থেকে তাঁরাই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাসানকে মুক্ত করেছিলেন। সেদিন খেয়েছিলামও আমরা প্রাণ ভরে। ক্যান্টিনে যা ছিল সবই খেয়েছিলাম, কিছুই বাদ দিইনি।

আমার জীবন-সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত আরেকটি সোনালি ঘটনার কথা আমার খুব মনে পড়ে। মামুন একবার আমাকে কণ্ট্রাক্টর বানাতে চেয়েছিল। সে একদিন আমাকে প্রস্তাব দেয়, আপনি আমার অফিসে এসে একটা কোটেশন দিন, আমার হাতে একটা কাজ আছে।

আমি জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল বিভাগের তালিকাভুক্ত ঠিকাদার নই। আমি কী করে কোটেশন দেব? মামুনের কথা শুনে আমি তো আকাশ থেকে পড়লাম।

তখন মামুনই আমাকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলল। বলল, আপনার হাতের লেখা ভালো। আপনি রাস্তার পাশে যখন খোড়াখুড়ির কাজ চলে তখন নিশ্চয়ই লক্ষ করেছেন, রাস্তার পাশে একটা বর্গাকৃতির কাঠ বা টিনের উপর বড় বড় হরফে লেখা বিজ্ঞপ্তি বসানো থাকে : 'সামনে খাদ আস্তে চলুন। মেরামত কাজ চলছে। আমরা দুঃখিত। ওয়াসা।' দেখেন নি?

আমি বললাম, দেখব না মানে? খুব দেখেছি।

মামুন বলল, ঐ রকমের স্ট্রিট সাইন লেখার একটা কাজ আমার হাতে আছে। আমি ঐ কাজ আপনাকে দেব। আপনি একটা দরপত্র জমা দিন। কাজটাতে লাভ হবে।

আমি বললাম, আপনি ঠিকই ধরেছেন, আমি পারব, আপনি ব্যবস্থা করুন।

তারপর আমাকে বেশি কিছুই করতে হয়নি। আমার স্বাক্ষরিত একটা সাদা কাগজে লেখা দরপত্রের ভিত্তিতে মামুন ঐ কাজ আমাকে পাইয়ে ওয়ার্ক অর্ডার এনে দেয়।

আমি রাতারাতি পূর্ব পাকিস্তান সরকারের জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল বিভাগের ঠিকাদারে পরিণত হই। বাজার থেকে ভালো তুলি এবং কালি কিনে আনি। স্ট্রিট সাইনগুলো পাবলিক হেলথের বকশীবাজারের গোডাউনেই ছিল। স্ট্রিট সাইনগুলো পরিষ্কার করে, তাতে অফ-হোয়াইট রঙ লাগিয়ে রৌদ্রে শুকাতে দিই। কাজ পেয়ে আমি খুব খুশি। আমার মনে বহু টাকার স্বপ্ন এসে ভিড় করে। নব-উদ্যমে কাজে লেগে যাই। সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠেই চলে যাই বকশীবাজার। আলিয়া মাদ্রাসার পেছনে, নবকুমার স্কুলের কাছে পথের পাশেই ঐ গোডাউন। স্কুল কলেজের ছেলেমেয়েরা ঐ পথ দিয়ে চলাচল করে। তারা হয়তো আমার উপস্থিতির প্রতি কোনো গুরুত্বই দেয় না, তবু আমার কেবলই মনে হয় সবাই আমাকে দেখছে। আমাকে বুঝি ওরা চিনে ফেলল।

আমার হাতের লেখা ভালো, তাতে কোনোই সন্দেহ নেই। একসময় পোস্টারও লিখেছি। সুতরাং বড় হরফে বাংলা বর্ণমালাগুলো বসানো আমার জন্য কঠিন হবার

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কথা ছিল না। কিন্তু কাজ করতে নেমে দেখলাম, এ কাজের রকম ভিন্ন। রঙ মুখে নিয়ে তুলি যখন চলতে শুরু করে তখন সেই তুলির আচড়ে অক্ষরের চেয়ে অনক্ষরই সৃষ্টি হয় বেশি। তুলিতে কালি কম নিলে অক্ষর স্পষ্ট হয় না, আর বেশি নিলে বোর্ডের পরিচ্ছন্ন সারফেসে রঙের ফোঁটা পড়ে একটা বিদঘুটে আকার ধারণ করে। গড়িয়ে-পড়া রঙ সারফেস থেকে উঠানোর কৌশল আমার জানা নেই। ফলে আমি কখনো আঙুলের সাহায্যে কখনো বা তুলা দিয়ে সেগুলো উঠিয়ে ফেলার চেষ্টা করি। কিন্তু ততক্ষণে রঙ তার কাজ সেরে ফেলে। তাকে উঠানো কঠিন হয়ে পড়ে। সে যে ভুল জায়গায় ভুলভাবে বসেছে, সে কথা তাকে বোঝানোই যায় না। কিন্তু আমি হাল ছাড়তে চাই না। কূলে এসে নাও ডুবাতে কার মন চায়? কাজ শেষ হলেই যেখানে নগদ টাকা!

কিন্তু কাজটা কি আদৌ হচ্ছে? প্রশ্ন জাগে। আমার অংকিত বাংলা হরফগুলোকে দেখে আমার নিজের কাছেই কেমন অচেনা মনে হয়। ভাবি, ঐ রকমের হস্তলিপি সম্বলিত বিজ্ঞপ্তি যদি খোঁড়াখুঁড়ি করা রাস্তার পাশে বসিয়ে রাখা হয়, তাহলে পথচারীরা ওয়াসার লোকজনদের মারতে আসবে।

মামুনের দিকেও রাগ হয়। মামুন কীভাবে ভাবতে পারল, এ কাজ আমাকে দিয়ে হবে? কয়েকটি স্ট্রিট সাইন লেখার পর আমি রাতে বাসায় ফিরে গিয়ে আমার সমস্যার কথা মামুনকে জানাই।

মামুন বলে, কোনো চিন্তা নেই। আমি ও-কে করলেই হবে। পড়া যায় তো?

আমি বলি, আমার লেখা আমি তো পড়তেই পারি কিন্তু পথচারীরা, যারা আপনার মতো আমার লেখার সঙ্গে আগে থেকে পরিচিত নয়, তাদের সম্পর্কে আমার সন্দেহ আছে। আপনি কাল আমার সঙ্গে চলুন। দেখে আসবেন।

মামুন এবার একটু চিন্তায় পড়ে। ঠিকাদার নিজেই যেখানে রণে ভঙ্গ দেয়ার মতো কথা বলছে, সেখানে চিন্তা তো হবেই। মামুন নিজ-দায়িত্বেই কাজটা আমাকে দিয়েছে। ভালো না হলে, এ নিয়ে তাকে হয়তো ওপরওয়ালার কাছে কৈফিয়ত দিতে হবে। আমি তখন আমার জন্য নয়, মামুনের জন্যই বেশি চিন্তিত বোধ করি। রাতে কিছুতেই আমার ঘুম আসে না। রঙ-তুলিতে আঁকা বিকৃত বর্ণমালাগুলোকে আমি চোখ থেকে তাড়াতে পারি না। তারা আমার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে হাসে।

পরদিন, রাত পোহালেই নাস্তা সেরে আমি আর মামুন বকশীবাজারে যাই।

আমাদের দেখে গোডাউনের দারোয়ান এগিয়ে আসে। মামুনকে উদ্দেশ্য করে বলে, স্যার, এই সায়বের লেখা রাস্তায় দিলে মাইনষে মারব। স্যার, উনি তো এই কামের লোক না। উনারে এই কাম দিল কে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ততক্ষণে মামুন আমার গত তিন দিনের কাজের ওপর চোখ বুলিয়ে সেরেছে। মামুনের মুখও গম্ভীর। তার মুখ থেকে হাসিও উধাও হয়।

'উনারে এই কাম কে দিল?' দারোয়ানের ঐ জটিল প্রশ্নের কোনো সদুত্তর না দিয়েই মামুন বলে, একজন প্রফেশনাল আর্টিস্ট খুঁজে বের করেন। আমার চাকরি চলে যাবে। তাড়াতাড়ি করেন। আমি অফিসে যাই। আপনি যান আর্টিস্টের খোঁজে। এগুলো সব মুছে ফেলতে হবে, তারপর নতুন করে লেখাতে হবে। কিছু গচ্চা দিয়ে হলেও কাজটা দ্রুত শেষ করেন। টাকার জন্য ভাববেন না।

হায় কপাল, টাকার জন্যই এত, আর মামুন এখন বলে কি না টাকার জন্য ভাববেন না! আমি আমার কৃতকর্মের সামনে দাঁড়িয়ে তখন নিজের ভাগ্যকেই দোষারোপ করি।

মামুন দ্রুত অফিসে চলে যায়। আমি যাই কাঁটাবনের বস্তিতে। ওখানে একজন কমার্শিয়াল আর্টিস্ট ছিল, আমার চেনা। আমি তাঁর নামটা ভুলে গেছি। মনে পড়ছে না।

আমি তাঁর হাত ধরে বলি, ভাই, আমাকে বাঁচান।

আমার মুখে আমার সমস্যার কথা বিস্তারিত জেনে তিনি আমার প্রতি সদয় হন এবং আমার সঙ্গে বকশীবাজারে যান। আমার কাজ দেখে তিনিও হাসি লুকাতে পারেন না।

চায়ের টেবিলে বসে তখন তার সঙ্গে আমার রফা হয়। আমার পণ্ডশ্রমের কথা মনে রেখে, তিনি কাজটা আমার কোটেশনকৃত মূল্যের চেয়ে কমে করে দিতে রাজি হন।

আমি তাতেই মহা খুশি। যে বিপদে পড়েছিলাম, তার হাত থেকে আমি যে উদ্ধার পাচ্ছি, তাতেই আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচি। লাভ না করতে পারলেও ঐ কাজটা আমি ঐ শিল্পীকেই দিতাম। তিনি আমার প্রতি সদয় ছিলেন বলেই সুযোগ থাকা সত্ত্বেও বিপদের মুহূর্তে তিনি আমার সঙ্গে কমার্শিয়াল আচরণ করেননি। এ জন্য আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ।

ঐ ঘটনা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার পরই আমার ক্ষণস্থায়ী ঠিকাদারি জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে। আমি আর ও পথে পা বাড়াইনি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার মতোই দেশের অবস্থাও তখন খুবই খারাপ। বাংলা ভাষা, তার সাহিত্য-সংস্কৃতি, তার আবহমান কালের ঐতিহ্য—যা এ মাটির হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলমান-খ্রিস্টানের মিলিত শ্রমে নির্মিত হয়েছে—তার শিকড় কেটে দেবার ষড়যন্ত্র চলছে।

ষড়যন্ত্র চলছে রবীন্দ্রসাহিত্য ও রবীন্দ্রসঙ্গীত নিয়ে। রোমান হরফে বাংলা লেখার পাশাপাশি বাংলা বর্ণমালা, তার লিখনরীতি এবং বানান-পদ্ধতি পরিবর্তনের চিন্তাভাবনাও করছেন কেউ কেউ। ভাষা আন্দোলনের অর্জন থেকে বাঙালিকে বঞ্চিত করার জন্য নেয়া হচ্ছে নিত্যনতুন পদক্ষেপ।

ধর্মনিরপেক্ষ বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার জনক শেখ মুজিবের নামে সাজানো হয়েছে 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা।' তাঁর কণ্ঠকে স্তব্ধ করে দেবার জন্য আইয়ুব খান উঠেপড়ে লেগেছেন। এই মামলাকে সত্য প্রমাণ করতে পারলে নির্ঘাৎ তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে।

এরকম অবস্থায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় একাডেমিক কাউন্সিলের পক্ষ থেকে যখন বাংলা ভাষা সংস্কারের প্রস্তাব উত্থাপিত হয়, তখন ঐ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে দেশের প্রগতিশীল কবি-সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও বুদ্ধিজীবীরা প্রতিবাদমুখর হয়ে ওঠেন। তাঁরা তখন যে সময়োচিত বিবৃতি প্রদান করেন, তা ছিল এ রকম :

> 'আমরা সংবাদপত্র মারফত জানিয়া বিস্মিত হইলাম যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিল বর্ণমালা, লিখনরীতি এবং বানান পদ্ধতির পরিবর্তন সাধনে তৎপর হইয়াছেন।...
>
> ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিল আজ অবধি তাহাদের প্রস্তাবিত সংস্কারের পূর্ণ বিবরণ জনসমক্ষে প্রকাশ করেন নাই। তবে আশংকা করা হইতেছে যে, জনসাধারণের অজ্ঞাতেই টেক্সট বুক বোর্ডের মাধ্যমে তাঁহারা প্রস্তাবিত বর্ণমালা ও বানান পদ্ধতি শিক্ষাক্ষেত্রে কার্যকর করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। যতদূর জানা গিয়াছে, বর্ণমালা হইতে তাহারা ঈ,ঊ,ঐ,ঔ,ঙ,ঞ, ণ,ষ এবং ঐ-কার (ৈ), ঔ-কার (ৌ), ইত্যাদি বর্জন, যুক্ত বর্ণের উচ্ছেদসাধন, ব-ফলা, ম-ফলা, য-ফলা ইত্যাদির পরিবর্তে দ্বিত্ব বর্ণ গ্রহণ, শ-স, জ-য, নবোদ্ভাবিত নিয়মে প্রয়োগ, এ-কারকে (ে) বর্ণের ডানদিকে আনয়ন এবং ঈ-কার (ী) দ্বারা ই-কারের (ি) কাজ সাধনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন।...

দেশের প্রথম সারির ৪১ জন কবি-সাহিত্যিক, সাংবাদিক, শিক্ষাবিদ ও বুদ্ধিজীবী ঐ অপসিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে, দেশবাসীকে ভাষা বিনষ্টির ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ার করে দিয়ে বিবৃতিতে স্বাক্ষরদান করেন। স্বাক্ষরকারীরা ছিলেন :

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১। শিক্ষাবিদ ড. কাজী মোতাহার হোসেন ২। শিক্ষাবিদ ও রাজনীতিক আবুল হাশিম ৩। শিক্ষাবিদ-গবেষক অধ্যাপক মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন ৪। লেখক সৈয়দ মুর্তাজা আলী ৫। সওগাত সম্পাদক মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন ৬। কবি বেগম সুফিয়া কামাল। ৭। সাংবাদিক কাজী মোহাম্মদ ইদ্রিস ৮। কবি সিকানদার আবু জাফর ৯। সাংবাদিক জহুর হোসেন চৌধুরী ১০। কবি-সাংবাদিক আবদুল গণি হাজারী ১১। শহীদুল্লাহ কায়সার ১২। কবি হাসান হাফিজুর রহমান ১৩। কবি শামসুর রাহমান ১৪। কবি-সাংবাদিক ফজল শাহাবুদ্দিন ১৫। সাংবাদিক আহমেদ হুমায়ুন ১৬। সাংবাদিক সানাউল্লাহ নূরী ১৭। গল্পকার সাংবাদিক সাইয়িদ আতীকুল্লাহ ১৮। ঔপন্যাসিক লায়লা সামাদ ১৯। শিশুসাহিত্যিক আফলাতুন ২০। কবি শহীদ কাদরী ২১। শিল্পী কালাম মাহমুদ ২২। সাংবাদিক কে.জি মোস্তাফা ২৩। সাংবাদিক আতাউস সামাদ ২৪। সাংবাদিক আনোয়ার জাহিদ ২৫। সাংবাদিক আবদুল গাফফার চৌধুরী ২৬। চিত্রপরিচালক ও ঔপন্যাসিক জহির রায়হান ২৭। শিশুসাহিত্যিক রোকনুজ্জামান খান ২৮। বেগম সম্পাদিকা নূরজাহান বেগম ২৯। সাংবাদিক এহতেশাম হায়দার চৌধুরী ৩০। সাংবাদিক ফয়েজ আহমদ ৩১। আলী আকসাদ ৩২। সাংবাদিক খালেদ চৌধুরী ৩৩। ওয়াহিদুল হক ৩৪। অনুবাদক কাজী মাসুম ৩৫। ঔপন্যাসিক ইসহাক চাখারী ৩৬। ঔপন্যাসিক শওকত আলী ৩৭। মোস্তফা সালেউদ্দিন ৩৮। সাংবাদিক মওলানা আবদুল আওয়াল ৩৯। কবি জামালউদ্দিন মোল্লা ৪০। শিশু-সাহিত্যিক গোলাম রহমান ৪১। গল্পকার-সাংবাদিক শহীদুর রহমান।

হাসান ভাইয়ের নির্দেশে এঁদের অনেকের স্বাক্ষরই আমি সংগ্রহ করি। ঐ বিবৃতি প্রকাশিত হওয়ার কিছুদিন পর কবি জসীম উদ্‌দীন ঐ বিষয়ে একটি পৃথক বিবৃতি প্রদান করেছিলেন। তাতে তিনি বলেন :

> 'সম্প্রতি বাংলা বানান লইয়া দেশে কথা কাটাকাটি হইতেছে। উ-কার, ঊ-কার এবং দুই ন, ণ ও তিনটা শ,ষ,স'র অত্যাচারে সারাজীবন আমাকে ভুগিতে হইয়াছে। সেজন্য দুই বৎসর আগে আমার 'বালুচর' গ্রন্থে আমি শুধু উ-কার এবং এ-কার ব্যবহার করিয়াছি। যাহারা এইভাবে বানান সংস্কার করিতে চাহেন তাহাদের সহিত আমি কতকটা একমত। কিন্তু আমরা, পূর্ব পাকিস্তানি জনগণ যদি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় একাডেমিক কাউন্সিল কর্তৃক গৃহীত হরফ ও বানান সংস্কার মানিয়া লই, তবে আমাদের বংশধরদিগের একচক্ষু অন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে। যদি কোনো বানান সংস্কার করিতেই হয়, বাংলা ভাষার সকল সাহিত্যসেবীরা যদি তাহা করেন, তাহা হইলেই পূর্বসূরিদের গ্রন্থাবলীসহ সকল সাহিত্য প্রয়াস নতুন বানান পদ্ধতিতে রূপান্তরিত হওয়ার সম্ভাবনা রহিবে। কিন্তু একক পূর্ব পাকিস্তান যদি ধীরে ধীরে নিজেদের বানান-পদ্ধতি সম্পূর্ণ আলাদা করিয়া ফেলেন তাহা হইলে তাহা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমাদের চক্ষু উৎপাটনের সামিল হইবে। আমি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে এই বানান সংস্কার হইতে নিবৃত্ত হইতে অনুরোধ করিতেছি। নতুবা জনগণের মধ্যে মারাত্মক বিভ্রান্তির সৃষ্টি হইয়া দেশের শাসকবর্গের বিরুদ্ধে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশিত হইবে।'

জসীম উদ্‌দীন।
৩০। ৮। ৬৮
{পরিক্রম : সম্পাদক হাসান হাফিজুর রহমান।
পঞ্চম বর্ষ ॥ ১-২ সংখ্যা, জুলাই-আগস্ট ১৯৬৮}

ঐ বিবৃতিতে স্বাক্ষর সংগ্রহ করতে আমি একদিন সর্বজনশ্রদ্ধেয় আবুল হাশিম সাহেবের কাছে যাই। তিনি তখন ইসলামিক একাডেমির পরিচালক। বুড়ো মানুষ। চোখে দেখেন না। গরমের দিন ছিল। তিনি একটি ফতোয়া গায় দিয়ে অফিসে চেয়ারে বসে গুড়গুড়িতে তামাক খাচ্ছিলেন। সুগন্ধিযুক্ত খাম্বিরা তামাকের ঘ্রাণে ঘরটি ছিল মোহিত। অখণ্ড বাংলাকে রক্ষা করার জন্য শরৎ বসুকে সঙ্গে নিয়ে শেষ পর্যন্ত ইনি লড়াই করেছিলেন, এ কারণে তাঁর প্রতি আমার বিশেষ কৌতূহল ও শ্রদ্ধাবোধ ছিল। আমি তাঁর কক্ষে প্রবেশের অনুমতি চাইলে তিনি আমাকে ভিতরে যাবার অনুমতি দেন। আমি ভিতরে প্রবেশ করে তাঁকে আদাব দিই এবং আমার অভিপ্রায়ের কথা তাঁকে জানাই। বলি, কবি হাসান হাফিজুর রহমান সাহেব আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন।

তিনি তখন আমাকে ঐ বিবৃতিটি পাঠ করে শোনাতে বললেন। তখন আমি পকেট থেকে ঐ বিবৃতি বের করে তা তাঁকে পাঠ করে শোনাই।

তাঁর সামনে, আমার পাশের চেয়ারে বসে ছিলেন একজন নামী লেখক। তাঁকে আমি আগে থেকেই জানতাম। তিনিও বিবৃতিটি গভীর মনোযোগসহকারে শুনলেন।

আমার পড়া শেষ হওয়ার পরপরই হঠাৎ হাশিম সাহেব কেন জানি আমার নাম জানতে চাইলেন। বললেন, তোমার নাম কি? বাড়ি কোথায়?

আমার ত্রুটিপূর্ণ উচ্চারণের জন্যই আমার সম্পর্কে জানবার কৌতূহল হয়েছিল তাঁর।

আমি আমার নাম বললাম, বললাম আমার বাড়ি ময়মনসিংহ জেলার নেত্রকোনায়। তিনি জানতে না চাইলেও আমি জানালাম, আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের ছাত্র। কিছুদিন ধরে লেখক সংঘে কাজ করছি।

তিনি আমার কথা শুনে তামাক সেবন বন্ধ করেন। হাত থেকে নলটা টেবিলের উপর নামিয়ে রাখেন। তারপর বলেন, তুমি হিন্দুর পোলা?

এ রকম প্রশ্নের জন্য আমি তৈরি ছিলাম না। বেশ লজ্জা পাই। তবু মাথা নত করে ঐ প্রশ্নের উত্তরে আমাকে বলতেই হয়, জ্বি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তিনি তখন অট্টহাসিতে ফেটে পড়েন। বলেন, তোমার তো সাহস কম নয়, হিন্দুর পোলা হইয়া তুমি মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতাছো?

এবার আমি একটু ঘাবড়ে যাই। কিন্তু তাঁর কথার ভিতরের উত্তাপ থেকে বেশ বুঝতে পারছিলাম, যে এগুলো তাঁর মনের কথা নয়। এসব কথা বলার কোনো ভিন্ন উদ্দেশ্য আছে।

আমি মাথা নিচু করে বসে আছি। পাশের ঐ লেখক সাহেব চোখের ইশারায় আমাকে অভয় দেন, যার অর্থ এগুলো এমনতেই বলা। ঘাবড়াবার কিছু নেই।

আমার জন্য ঘাবড়াবার কিছু না থাকলেও ঐ লেখক সাহেবের জন্য ঘাবড়াবার অনেক কিছুই সেদিন ছিল। তা তখন আমি তো পারিইনি, তিনিও বুঝতে পারেননি।

আবুল হাশিম সাহেব জিজ্ঞেস করলেন, অমুক আছ?

লেখক সাহেব বললেন, জ্বি আছি।

হাশিম সাহেব বললেন, এই যে অমুককে দেখতাছো সে এখনই বাংলা একাডেমীতে যাইব, গিয়া দীনু মোহম্মদের (ড. কাজী দীন মোহাম্মদ) কাছে খবরটা পৌছাইয়া দিব। বলব, এইডা হইতাছে হিন্দুদের ষড়যন্ত্র। কি মিয়া, মিছা কইলাম?

আমার সামনে তাঁর সম্পর্কে এরূপ মন্তব্য করাতে লেখক সাহেব খুবই লজ্জিত বোধ করছিলেন। মনে মনে খুশি হলেও তাঁর বিব্রতকর অবস্থা দেখে আমিও একটু বিব্রত বোধ করছিলাম। এবার প্রসঙ্গান্তরে গিয়ে, মাথা নেড়ে তিনি বললেন, না-না, হাসানের এইডা উচিত হয় নাই।

তারপর আমাকে উদ্দেশ করে বলেন, তুমি মিয়া বিপদে পড়বা। তুমি তো জান না, এরা কী রকম বদ! যাও হাসানকে বইলো আমি একটা আলাদা বিবৃতি দিব।

আমিও তখন আবুল হাশিম সাহেবকে জোরে এবং লেখক সাহেবকে আস্তে আদাব দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে আসি। পরে হাসান ভাই নিজে গিয়ে তাঁর কাছ থেকে স্বাক্ষর নিয়ে এসেছিলেন। এবং বাংলা ভাষা ও বানান সংস্কারের বিরুদ্ধে তিনি একটি আলাদা বিবৃতিও দিয়েছিলেন।

মহাকবি স্মরণোৎসব
[৫-৮ জুলাই, ১৯৬৮]

১৪ জুন—১৮ জুন মহাকবি স্মরণোৎসব অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা থাকলেও পরে ঐ অনুষ্ঠানটি ৫ জুলাই—৮ জুলাই তারিখ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়। স্থান : ইঞ্জিনীয়ার্স ইনস্টিটিউট মিলনায়তন মঞ্চ। প্রতিদিন সন্ধ্যার দিকে অনুষ্ঠান শুরু হতো। আমি ঐ মহোৎসবের স্যুভেনির প্রকাশের সঙ্গে জড়িত ছিলাম। সমকাল মুদ্রণালয়ে সেটি ছাপা হয়েছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মহাকবি মাইকেলকে দিয়ে শুরু পাঁচ দিনব্যাপী স্মরণোৎসব অনুষ্ঠানটি শুরু থেকেই জমে ওঠে। হল ভরে যেত অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার অনেক আগেই। প্রতিদিনই আলোচনা অনুষ্ঠানের পাশাপাশি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান থাকায় হাজার হাজার মানুষ ইঞ্জিনীয়ার্সে ভিড় জমাতেন।

গালিব দিবসের অনুষ্ঠানে সভাপতি ছিলেন বিচারপতি এস এম মুর্শেদ, রবীন্দ্র দিবসের সভাপতি আবুল হাশিম, মাইকেল দিবসের সভাপতি ছিলেন প্রফেসর মুনীর চৌধুরী, ইকবাল দিবসের সভাপতি ছিলেন ড. মুহম্মদ এনামুল হক এবং নজরুল দিবসের সভাপতি ছিলেন কবি আবদুল কাদির। প্রতিদিনই একটি মূল প্রবন্ধ পড়া হতো এবং পঠিত প্রবন্ধের ওপর বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবীরা আলোচনায় অংশ নিতেন। এবং শেষে হতো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। ঢাকার নামী-বরেণ্য শিল্পীরাই সেইসব অনুষ্ঠানে অংশ নিতেন।

রবীন্দ্র দিবসে অনুষ্ঠানের সভাপতি হিসেবে জনাব আবুল হাশিম সাহেব রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দিয়েছিলেন। তিনি তাঁর ভাষণে বলেন, ...'যাঁহারা ইসলাম ও পাকিস্তানি আদর্শের নামে রবীন্দ্র-সঙ্গীত বর্জনের ওকালতি করিতেছেন, তাঁহারা শুধু মূর্খই নহেন, দুষ্টবুদ্ধি প্রণোদিত এবং তাঁহারা না বোঝেন রবীন্দ্রনাথ না বোঝেন ইসলাম।'

পূর্ব পাকিস্তানি সাহিত্যের ভাষার প্রশ্নে যাহারা সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গির বশবর্তী হইয়া জটিলতা সৃষ্টি করিতে চাহিতেছেন, তাহাদের উদ্দেশ্যে জনাব হাশিম বলেন যে, 'বাংলার প্রতিটি মা যে ভাষা বোঝে ও যে ভাষায় নিজেকে প্রকাশ করে, একমাত্র উহাই বাংলা সাহিত্যের মাধ্যম হইতে পারে না। শুদ্ধ বাংলাই হইবে বাংলা সাহিত্যের মাধ্যম, অশুদ্ধ বাংলা নহে।' জনাব আবুল হাশিম বলেন, ...'এইসব মূর্খ আদর্শবাদীরা শুদ্ধ-বাংলাকে হিন্দুয়ানী বাংলা বলিতেছে এবং অশুদ্ধ-বাংলাকেই মুসলমানী বাংলা বলিয়া চালাইবার চেষ্টা করিতেছে।'

রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন যে, রবীন্দ্রবিরোধীরা তিনটি কারণ দেখাইয়া রবীন্দ্রনাথের বিরোধিতা করেন।

১. রবীন্দ্রনাথের আদর্শ ইসলামবিরোধী।

২. রবীন্দ্রনাথ অখণ্ড ভারতের স্তব করিয়াছেন।

৩. তিনি মুসলমানদের জন্য কিছু লিখেন নাই।

তিনি বলেন, তাঁর কোনো রচনাই ইসলামবিরোধী নয় এবং প্রতিটি রচনাই জাতিধর্মবর্ণ নির্বিশেষে প্রতিটি মানুষের জন্য লেখা।

রবীন্দ্রনাথ অখণ্ড ভারতের চিন্তা করিতেন—ইহা কোনো অন্যায় নহে। কারণ রবীন্দ্রনাথের যুগে ভারতীয় মুসলমানরাও পাকিস্তানের কল্পনা করিতেন না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রবীন্দ্রনাথের শিবাজী স্তবের সমর্থনে তিনি বলেন যে, মহারাষ্ট্রের নেতা শিবাজী, রাজপুত নেতা রাণা প্রতাপ সিংহ প্রমুখ জাতীয় বীরদের বন্দনা করা কোনো অন্যায় নহে। দেশপ্রেমিকের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা সকলেরই কর্তব্য।'

[পরিক্রম : ৫ম বর্ষ ॥ ১-২ সংখ্যা, জুলাই-আগস্ট ১৯৬৮]

তরুণ কবিদের কবিতা পাঠের আসর

[২৯ জুলাই ১৯৬৮]

২৯ জুলাই, ১৯৬৮ হোটেল পূর্বাণীতে আমাদের বহু-প্রতীক্ষিত কবিতা পাঠের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ আসরটি অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা টেলিভিশনের জাতীয় সংবাদে ঐ অনুষ্ঠানের সচিত্র সংবাদ প্রচারিত হয়েছিল। ফলে বলা যায়, ওটাই ছিল ষাট-দশকের তরুণ কবিদের সবচেয়ে প্রচার পাওয়া কবিতা পাঠের আসর। পরদিন দৈনিক পাকিস্তানের প্রথম পাতায় কবিতা পাঠের ঐ সংবাদ ছাপা হয়। শেষ পাতায় ছিল কবিতা পাঠরতা কবি রুবী রহমানের ছবি। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেছিলেন সমকাল-সম্পাদক কবি সিকানদার আবু জাফর। খবরটি পরিবেশিত হয়েছিল এভাবে :

মনোরম একটি সন্ধ্যা
তরুণ কবিদের স্বরচিত কবিতা পাঠের আসর

পূর্ব পাকিস্তানের আটজন তরুণ কবি গতকাল রোববার হোটেল পূর্বাণী ইন্টারন্যাশনালে এক মনোরম কবিসন্ধ্যায় স্বরচিত কবিতা পাঠ করে শোনান। এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন লেখক সংঘ পূর্বাঞ্চল শাখা। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কবি সিকানদার আবু জাফর। কবিতা পাঠের আসরে যে-সব তরুণ কবি এতে অংশগ্রহণ করেন তারা হলেন : রফিক আজাদ, মাহবুব তালুকদার, সুব্রত বড়ুয়া, আবু কায়সার, জিনাত আরা মালিক, রুবী রহমান, আবুল হাসান ও নির্মলেন্দু গুণ।

অনুষ্ঠানে সভাপতির ভাষণে কবি সিকানদার আবু জাফর বলেন, নবীনদের প্রতি প্রবীণদের কেমন যেন অসহিষ্ণুতা লক্ষ্য করেছি। এটা পীড়াদায়ক। সাহিত্য ক্ষেত্রে সব সময়ই একদলের পর আরেক দল আসছে। সব সময় নবীনরা হচ্ছে 'এ্যাংরি জেনারেশন'। একে স্বীকার করে নিতে হবে।

তরুণ কবিদের লক্ষ করে তিনি বলেন, 'চিৎকার করার চেয়ে সত্যিকার কৃতিত্ব নিয়ে আমাদের নিস্তব্ধ করার চেষ্টা করুন।' সভাপতি নিজেও একটি স্বরচিত কবিতা পাঠ করে শোনান। অনুষ্ঠানে বহু প্রবীণ-নবীন কবি-সাহিত্যিক উপস্থিত ছিলেন।

[সূত্র : দৈনিক পাকিস্তান : সোমবার, ৩০ জুলাই, ১৯৬৮]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনুষ্ঠান শেষে পূর্বাণী হোটেল থেকে আমরা দল বেঁধে গিয়েছিলাম নবাবপুর রোডের আরজু হোটেলে আড্ডা দিতে। তখন ঐ হোটেলে খুব আড্ডা হতো। ঐ আড্ডার মধ্যমণি ছিলেন কবি শহীদ কাদরী। আড্ডাবাজ হিসেবে শহীদ কাদরীর কদর ছিল। ঢাকাইয়া ভাষায় তিনি খুব খিস্তি-খেউর করতেন। তাতে আড্ডা বেশ জমত। আধুনিক পশ্চিমা-সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর বিশেষ পড়াশোনা ছিল বলে আমরা তাঁকে সমীহ করতাম। তাঁর শিকড়ছেঁড়া বোহেমিয়ান কবিতাগুলো আমার প্রিয় ছিল। ঐ আড্ডায় মুশাররফ রসুল (বুড়ো ভাই) নিয়মিত উপস্থিত থাকতেন। আর বুড়ো ভাই মানেই বিপ্লব। বিপ্লব দাশ। এই দু'জনের গভীর-নিবিড় সম্পর্ক চিরকুমার বুড়ো ভাইয়ের অকাল মৃত্যু পর্যন্ত অক্ষুণ্ন ছিল। ঐ আড্ডায় থাকতেন জামাল খান। মুহম্মদ ইয়াসিন। মাহবুবুল আলম ঝিনু। রণজিৎ পাল চৌধুরী। রফিক আজাদ। আবুল হাসানের সঙ্গে আমিও মাঝে মাঝে ঐ আড্ডায় যেতাম। ঐ হোটেলে একটি টিভি ছিল। আমরা আমাদের সদ্যসমাপ্ত কবিতা-অনুষ্ঠান নিয়ে কথা বলছিলাম, তখন হঠাৎ দেখা গেল টিভি সংবাদে আমাদের দেখানো হচ্ছে। ঘটনাটি আমার জন্য ছিল খুবই অভিনব এবং আনন্দদায়ক। কিন্তু কবি শহীদ কাদরী কেন জানি ঘটনাটি নিয়ে খুশি হতে পারেননি। পঞ্চাশ এবং ষাটের কবিদের মাঝখানে পড়ে শহীদ কাদরী কিছুটা অস্বস্তির মধ্যে বাস করতেন।

ঐ কবিতা পাঠের আসরটি পাঠকমহলে পরিচিতি ও কবি মহলে প্রতিষ্ঠা লাভের ক্ষেত্রে আমার জন্য খুবই সহায়ক হয়েছিল। আমি কোন কবিতাটি পড়েছিলাম আমার মনে নেই। তবে মনে আছে আবুল হাসান আগের দিন রাত জেগে যে ইংরেজি কবিতাটি অনুবাদ করেছিল—পূর্বাণীর আসরে ঐ কবিতাটিকে সে নিজের কবিতা বলে চালিয়ে দেয়। কবিতাটি পরে সে কোনো বইয়ে নেয়নি। সম্ভবত কোথাও ছাপায়ওনি। শুধু আসর মাত করার জন্যই সে ঐ কবিতাটি নিজের বলে চালায়। কবিতাটি ছিল কার্ফ্যুর মধ্যে নগরীর শুঁড়িখানায় আটকা-পড়া এক ব্যক্তির নিঃসঙ্গ ভাবনার বর্ণনা।

আমি ছাড়া ঐ ঘটনাটি অন্য কেউ জানত না।

আমি জিজ্ঞেস করাতে হাসান বলেছিল, 'সব ভালো কবিতাই আমার কবিতা।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৯৬৮ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি আমার ছোটবোন সোনালি ভারতে চলে যায়। সোনালির দেশত্যাগের ঐ ঘটনাটি খুবই বেদনাদায়ক। ওকে ভারতে পাঠিয়ে দেবার সিদ্ধান্তের প্রতি আমার সায় ছিল না। কিন্তু আমি ঢাকায় থাকি। বাউন্ডুলে জীবনযাপন করি। কখন কোথায় থাকি ঠিক নেই। বড় ভাই হিসেবে ছোট ভাইবোনদের প্রতি দায়িত্ব পালন করতে পারি না। এমতাবস্থায় ভেবে দেখলাম, এটাই ভালো।

ইতিপূর্বে সোনালিকে ঢাকার আজিমপুরের মাতৃসদন ও শিশুমঙ্গল কেন্দ্রে নার্স হিসেবে ট্রেনিং নেবার ব্যবস্থা প্রায় করে ফেলেছিলাম। অল্পের জন্য হয়নি। বাবা এ ব্যাপারে আমার বড় ভাইয়ের মত জানবার জন্য চিঠি লেখেন। আর এ কথা যখন আমার বড় ভাইয়ের কানে যায়, তখন তিনি খুবই রেগে যান। ঐ রকমের পেশা আমাদের পরিবারের আভিজাত্যবোধের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল না। আমি তথাকথিত আভিজাত্যবোধের ব্যাপারে ছিলাম চরমভাবে উদাসীন। আমার ভাবনা ছিল অন্যরকম। সোনালি ঢাকায় থেকে চাকরি করলে আমার পক্ষে চাকরি না করেও চলা সম্ভব হবে। ওর চাকরির টাকায় ভাগ বসাতে পারব এবং স্বাধীনমতো কবিতা নিয়ে থাকতে পারব। কবিতার জন্য আমি যখন আমার জীবন সেকরিফাইস করতে চলেছি, তখন আমার বোনই-বা আমার জন্য এটুকু সেকরিফাইস করবে না কেন?

সোনালি ছিল সরল এবং বোকা। সে আমার ফাঁদে ধরা দিয়েছিল। কিন্তু আমার বাবা ও আমার বড় ভাইয়ের কারণে ঐ পরিকল্পনাটি মাঠে মারা পড়ে। কলকাতা থেকে আমার মাসিমা এবং দুর্গাপুর থেকে আমার বড় ভাই বাবার সঙ্গে পত্রালাপের মাধ্যমে সোনালিকে ভারতে নিয়ে যাবার পাকাপাকি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। আমার ওপর দায়িত্ব পড়ে সোনালির মাইগ্রেশন করিয়ে দেওয়ার।

আমি ভারতীয় হাই কমিশনারের অফিসে লাইন দিয়ে সোনালির জন্য মাইগ্রেশন ফর্ম সংগ্রহ করি। তারপর যথারীতি তা পূরণ করে জমা দিই। তখন হিন্দুদের মাইগ্রেশন সহজেই দেয়া হতো। শুধু ভারত থেকে একজনকে 'এপিঠ-ওপিঠ' পাঠাতে হতো। আমার বড় ভাই তা পাঠান। ফলে সোনালির মাইগ্রেশনও সহজেই হয়ে যায়।

ঐ মাইগ্রেশন পাওয়ার পর আমার বড় ভাইয়ের সঙ্গে পত্রযোগে সোনালির যাবার দিনক্ষণ স্থির করা হয়। সিদ্ধান্ত হয় যে, আমার বড় ভাই নির্দিষ্ট দিনে হরিদাশপুর সীমান্তে আসবেন। একই দিনে সকালের দিকে আমরা বেনাপোল সীমান্তে সোনালিকে নিয়ে যাব। তারপর পাকিস্তানের সীমান্ত অতিক্রম করে সোনালি যখন ভারতের মাটিতে পা দেবে তখন আমার বড় ভাই তাকে ভারতের মাটিতে স্বাগত জানাবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘটনাটি ছিল একটি মহাশূন্য খেয়ার সঙ্গে আরেকটি মহাশূন্য খেয়ার মিলিত হবার মতো ব্যাপার। হিসেবে একটু এদিক সেদিক হলেই সমূহ বিপদের সম্ভাবনা। কিন্তু না, কোনো অসুবিধে হয়নি। আগের দিন যশোহরে রাত্রি বাস করে পরদিন ভোরে আমরা (আমি, আমার বাবা এবং প্রদীপ মামা) সোনালিকে নিয়ে যথাসময়ে বেনাপোল সীমান্তে পৌঁছাই। এপার থেকে ওপারের লোকজনদের স্পষ্টই দেখা যায়। আমরা ওপারে আমার বড় ভাইকে চোখে সানগ্লাস পরিহিত অবস্থায় দণ্ডায়মান দেখতে পাই।

তখন নিয়ম ছিল, বর্ডার এলাকায় যেতে হলে স্থানীয় চেয়ারম্যান ও থানার দারোগার কাছ থেকে পরিচয়পত্র নিয়ে সীমান্তে যেতে হতো। মুসলমানদের জন্য কী নিয়ম ছিল জানি না, হিন্দুদের জন্য ঐ নিয়মই চালু ছিল। আমরা ঐসব প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সঙ্গে নিয়েছিলাম, ফলে পুলিশ হয়রানি করে আমাদের কাছ থেকে টাকা আদায়ের চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়।

আমরা পুলিশকে কিছু টাকা দিই, যাতে আমাদের সীমান্তের শেষ সীমা পর্যন্ত যেতে দেওয়া হয়। এর ফলে অন্তিম মুহূর্ত পর্যন্ত আমরা সোনালিকে দেখতে পাব।

আমার বড় ভাই ভারতীয় পুলিশের মাধ্যমে বাবার কাছে একটি চিরকুট লিখে পাঠান। পাকিস্তানি পুলিশের মাধ্যমে তা আমাদের হাতে আসে। তাতে তিনি হরিদাশপুর সীমান্তে তাঁর আগমন সংবাদ আমাদের জ্ঞাত করেন।

AMARBOI.COM

দাদামণিকেও (আমার বড় ভাইকে আমরা দাদামণি বলতাম) আমরা অনেক দিন দেখি না। তাঁকেও দূর থেকে দেখতে পাওয়া সম্ভব হয়। তিনি হাত নাড়িয়ে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা করেন। আমরাও হাত নাড়িয়ে জবাব দিই। পুরো ব্যাপারটাই আমার কাছে হাস্যকর বলে মনে হতে থাকে।

ঐ নাটকের শেষ-দৃশ্যটি যতই এগিয়ে আসতে থাকে, ততই তার কুশীলবরা বিদায় বেদনায় বাকহীন হতে শুরু করে। তখন আমাদের মুখে কোনো কথা আসে না। প্রত্যেকের চোখের কোণে জলবিন্দু জমা হয়। ভারতের প্রখর সূর্যের আলো পড়ে এপারের চোখের জলবিন্দুসমূহ অজানা আশংকায় চিকচিক করে।

সোনালি আমাদের ছেড়ে যাচ্ছে। এই দেশ, এই জন্মভূমি, মা-বাবা, ভাই-বোন-বন্ধু-বান্ধব, সব। যে ছেড়ে যায় দুঃখটা তারই বেশি। ফলে অন্তিম মুহূর্তে, সে যখন সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল, তখন সে আর হাঁটতে পারছিল না। আমাদের দিকে তাকিয়ে, ফিরে-ফিরে কান্নায় সে বারবার ভেঙে পড়ছিল। তখন বাবাও তাঁর চোখের জল রোধ করতে পারছিলেন না। প্রদীপ মামাও না। শুধু পাষাণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলেই, ঐরকম একটি দৃশ্যের মুখোমুখি নিশ্চল পাথরের মতো দাঁড়িয়ে থেকে সেদিন আমি বঙ্গভঙ্গের ইতিহাসের পাতায় চোখ বুলাচ্ছিলাম। ভাবছিলাম, ইংরেজ-কংগ্রেস আর মুসলিম লীগ মিলে এই যে কাজটা করলেন, কাজটা কি ভালো হলো? কারও কারও জন্য ভালো হলেও আমাদের জন্য ভালো হয়নি!

সেদিন সোনালির জন্য তার বড় ভাই ওপারে অপেক্ষা করছিল। কিন্তু যাদের অপেক্ষা করার মতো কেউ নেই, বেনাপোল-হরিদাশপুর সীমান্তে সেদিন তাদেরও কম ভিড় ছিল না।

সোনালিকে বিদায় দিয়ে ঐদিনই আমরা সুন্দরবন এক্সপ্রেসযোগে ময়মনসিংহের পথে যশোহর ত্যাগ করি। ফেরার পথে আমার খুব মন খারাপ লাগে। মনে পড়ে কংসের জলে দুর্গা বিসর্জন দিয়ে বাড়ি ফেরার সময় আমার এ রকমই খারাপ লাগত। হিন্দুদের জন্য নিরাপদ আশ্রয়রূপে গণ্য হলেও আমার মনে হয়েছিল, ভারতবর্ষ নামক এক নদীতে সোনালিকে বিসর্জন দিয়ে আমরা বাড়ি ফিরছি।

ঐ বছরেরই মাঝামাঝি সময়ে ঝিল্লির এসএসসি পরীক্ষার ফল বেরোয়। সে পরীক্ষায় ভালোভাবেই পাস করে। তখন তাকে কলেজে ভর্তি করার প্রশ্ন দেখা দেয়। বছরের শেষ দিকে ঝিল্লিকে টাঙ্গাইলের কুমুদিনী কলেজে ভর্তি করা হয়। কলেজ-সংলগ্ন হোস্টেলে তার থাকার ব্যবস্থা হয়। দানবীর রণদাপ্রসাদ সাহা তাঁর মায়ের নামে ঐ মহিলা মহাবিদ্যালয়টি স্থাপন করেছিলেন। বেশ চমৎকার কলেজ। আমি মাঝে মাঝে ঝিল্লিকে ঐ কলেজে নিয়ে যেতাম এবং ছুটিছাটায় বাড়িতে নিয়ে আসতাম। তখন ভালুকা-কিশোরগঞ্জ রাস্তাটি ছিল না। বাসরুটে টাঙ্গাইল হয়েই ঢাকা-ময়মনসিংহ যাতায়াত করতে হতো। ফলে টাঙ্গাইল আমার যাত্রাপথেই পড়ত।

AMARBOI.COM

ছোট ভাইবোনদের পড়াশোনার ব্যয় নির্বাহের জন্য মামুন মাঝে মাঝে বাড়িতে টাকা পাঠাত। আমিও মামুনের সঙ্গে ঝিল্লিকে দেখার জন্য মাঝে মাঝে টাঙ্গাইল যেতাম। ষাট দশকের কবিদের মধ্যে টাঙ্গাইলের পাল্লাটি খুবই ভারী ছিল। রফিক আজাদ, সাযযাদ কাদির, আবু কায়সার, মাহবুব সাদিক, অরুণাভ সরকার, আল মুজাহিদী, বুলবুল খান মাহবুব, আরশাদ আজিজ— সবাই ছিলেন টাঙ্গাইলের বাসিন্দা। এত কবি অন্য কোনো জেলায় ছিল না। সেখানে গেলে চুটিয়ে কবিদের সঙ্গে আড্ডাও দেওয়া যেত।

আমি মামুনের সঙ্গে টাঙ্গাইল যাই। মামুনের বাসায় থাকি। মামুনের দেখাদেখি, তখন আমারও মনে পড়ে, আমিও তো বড় ভাই। আমারও তো কর্তব্য বলে একটা কথা আছে। মনটা খুব দুর্বল হয়ে যায়। ঠিকাদারি করে পাওয়া টাকা থেকে কিছু টাকা ঝিল্লিকে দিয়ে আসি। ঝিল্লি ঐ আনন্দ সংবাদটি চিঠি লিখে বাবাকে জানায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাতে আমার বিপদ বাড়ে। বাবা মনে করেন, আমার বুঝি সাহায্য করার মতো সঙ্গতি হয়েছে। তিনি আমাকে নিয়মিত ঝিল্লিকে কিছু টাকা দেবার জন্য তাগিদ দিয়ে চিঠি লেখেন। আমি যে কী ভাবে ঐ টাকা উপার্জন করেছিলাম, তা তাঁকে বলিনি। বলেছিলাম আমার সব টাকাই কবিতার টাকা। ঠিকাদারির কথা অনেক পরে তাঁকে জানিয়েছিলাম। তবে আমার হাতে টাকা এলে আমি ঝিল্লিকে কিছু দিতাম। যদিও তার পরিমাণ উল্লেখ করার মতো ছিল না।

ছাত্রনেতা লতিফ সিদ্দিকীর ছোট বোন রহিমা সিদ্দিকী ঝিল্লির সঙ্গে পড়ত। রহিমা আমার কবিতার ভক্ত ছিল। রহিমা নিজেও লেখালেখি করত। ঝিল্লির সঙ্গে আমি রহিমাদের বাসাতেও যেতাম। তখন কাদের সিদ্দিকীকে বিশেষভাবে লক্ষ্য করিনি। লক্ষ্য করবার কোনো কারণও ঘটেনি। ঐ সুদর্শন তরুণ যে ভবিষ্যতে বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী হিসেবে আবির্ভূত হবে, তা তখন কে জানত?

পরে কুমুদিনী কলেজ থেকে আইএ এবং বিএ পাস করে ঝিল্লি ময়মনসিংহ টিচার্স ট্রেনিং কলেজে ভর্তি হয়।

আমার চির-রুগ্ণা বড় বোনের নাম ছিল রূপালি। খুব ছোটবেলা থেকেই অসুস্থ থাকার ফলে সে পড়ালেখায় আমাদের সকলের পেছনে পড়ে গিয়েছিল। পড়ালেখায় পেছনে পড়া এবং সারা বছর অসুস্থ থাকার অপরাধে আমি তাকে দিদি বলে ডাকতাম না, নাম ধরে রূপালি বলে ডাকতাম। তবে তাঁর প্রতি আমার খুবই সহানুভূতি ছিল। সোনালি ভারতে চলে যাবার পর, ঝিল্লি যখন কুমুদিনী কলেজে ভর্তি হলো, তখন বাড়িতে রূপালি ছিল একা। তাঁর খুব মন খারাপ থাকত। মানসিকভাবে সে খুব ভেঙে পড়ে। সবাই যার যার ভবিষ্যত-পথে অগ্রসর হচ্ছে। সে শুধু পেছনে পড়ে যাচ্ছে। এই নিয়ে সে হয়তো খুব ভাবত। ফলে তার বুকের অসুখটা খুবই মারাত্মক আকার ধারণ করে। কাশির সঙ্গে রক্ত যেতে থাকে। জ্বর লেগেই থাকে। বাবা তাকে ঢাকায় ভালো ডাক্তার দেখানোর চিন্তা-ভাবনা করে আমাকে চিঠি লেখেন। আমি মহাখালী বক্ষ-ব্যাধি হাসপাতালে যোগাযোগ করি। সেখানে ভালো চিকিৎসার ব্যবস্থা রয়েছে। ঐ হাসপাতালে মেট্রন হিসেবে কর্মরত ছিলেন কবি দিলওয়ারের স্ত্রী। দিলু ভাই সেই সুবাদে হাসপাতাল সংলগ্ন স্ত্রীর নামে বরাদ্দকৃত একটি কোয়ার্টারে থাকতেন।

দিলু ভাইয়ের মাধ্যমে ভাবীর সঙ্গে আমার কথা হয়। ভাবী ছিলেন একজন অবাঙালি মহিলা। সম্ভবত বিহারী। তাঁর সঙ্গে আমি উর্দু-বাংলা মিশিয়ে আলাপ করতাম। খুব মজা হতো। ভদ্রমহিলা ছিলেন রূপসী, স্বাস্থ্যবতী এবং আমুদে প্রকৃতির। তিনি আমার বোনের চিকিৎসার ব্যাপারে আমাকে যথাসম্ভব সাহায্য-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সহযোগিতা করার আশ্বাস দেন। আমি এসব তথ্য বাবাকে লিখে জানাই। কিছুদিনের মধ্যেই বাবা রূপালিকে নিয়ে ঢাকায় আসেন এবং রূপালিকে মহাখালী বক্ষ-ব্যাধি হাসপাতালে ভর্তি করে দিয়ে গ্রামে ফিরে যান। আমার ওপর দায়িত্ব পড়ে তার দেখাশোনা করার। রূপালি তখনকার বিখ্যাত সার্জন ডা. মোমিনুল হকের চিকিৎসাধীন ছিল। ডা. মোমিনুল হক রূপালির খুবই যত্ন নিতেন। কিন্তু তার অসুখটা ছিল খুবই কঠিন ধরনের। ঠিক যক্ষ্মা নয়, তার চেয়েও মারাত্মক কিছু। তার ফুসফুসে জল জমে যেত। ঐ জমে-যাওয়া জল তার ফুসফুসে ক্ষতের সৃষ্টি করত। একসময় ঐ ক্ষতস্থান থেকে রক্ত ঝরত। ছোটবেলায় হাম বসে গিয়ে তার এই রোগের উৎপত্তি হয়েছিল।

আমার ঐ বোনটির সঙ্গে আবুল হাসানের পরিচয় ছিল। হাসান যখন আমাদের গ্রামের বাড়িতে গেছে এবং যখনই সে জানতে পেরেছে যে, রূপালির বুকের অসুখ, তখন থেকেই হাসান ছিল তার প্রতি সহানুভূতিশীল। ছোটবেলায় রিউম্যাটিক ফিভারে ভুগে হাসানের হৃৎপিণ্ডও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। হাসানেরও মাঝে মাঝে কাশির সঙ্গে ছিটেফোঁটা রক্ত যেত। শারীরিক শ্রমসাধ্য কাজ সে করতে পারত না। ফলে বলা যায়, আবুল হাসানও ছিল একই ব্যথার সাথী। সে আমার সঙ্গে প্রায়ই মহাখালী হাসপাতালে যেত রূপালিকে দেখতে।

আমরা রূপালিকে দেখে চলে যেতাম দিলু ভাইয়ের বাসায়। ওখানে গেলে দুপুরের বা রাতের খাওয়াটা একেবারে নিশ্চিত ছিল। দিলু ভাবী আমাদের যা আছে তাই খেয়ে যেতে বলতেন। 'কী দরকার ছিল'... বলে আমরাও খাবার টেবিলে বসে যেতাম। তখন দিলু ভাইয়ের একটি ছেলে একটি মেয়ে। তাঁর দ্বিতীয় পুত্রটির তখন জন্ম হয়েছে কি-না আমার সঠিক মনে নেই। শুধু মনে পড়ে, দিলু ভাইয়ের পুত্র-কন্যা দুটোই ছিল খুব নাদুস-নুদুস ধরনের। ভালো স্বাস্থ্য। ভালো চেহারা। হাসি-খুশি। দিলু ভাই ভগ্ন স্বাস্থ্যের অধিকারী হলেও তাঁর সন্তানেরা ওদের মায়ের পেটা স্বাস্থ্য ও বাড়ন্ত চেহারা দুটোই পেয়েছিল। আমরা দিলু ভাইয়ের ছেলেমেয়ে দুটোকে কোলে নিয়ে আদর করতাম। ঐ ছেলেটিই আজকের তরুণ কবি কিশওয়ার ইবনে দিলওয়ার। মেয়েটির খবর সঠিক জানি না। নিশ্চয়ই কোথাও স্বামী-সন্তান নিয়ে সুখে সংসার করছে। তবে ভাবী অকালে লোকান্তরিত হয়েছেন।

আমি এত দূরের মহাখালী হাসপাতালে যেতে চাইতাম না। কিন্তু আবুল হাসান কিছু ফল কিনে নিয়ে এসে আমাকে বলত, চল, দিদিকে দেখে আসি। তাকে ঐ ফলগুলো দিয়ে আসব। বেচারি সেখানে একা একা থাকে।

হাসানের আগ্রহেই আমি তখন মহাখালীতে যেতাম। হাসানের দিদি-সম্বোধনে রূপালি সর্বদা সহাস্যে সাড়া দিতে পছন্দ করত। হাসানের প্রতি রূপালিরও এক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধরনের দুর্বলতা ছিল। আমি একা গেলে সে জিজ্ঞেস করত, হাসান আসেনি কেন? ও কেমন আছে? আমি ওর সঙ্গে ঝগড়া করেছি কি না। ইত্যাদি। আমার এবং হাসানের মধ্যে যে মাঝে মাঝে ঝগড়া হয় এবং ঐ ঝগড়া নিয়ে যে বেশ কিছুদিন আমাদের মধ্যে মান-অভিমান চলে, ঐ তথ্য সে হাসানের মুখেই শুনেছিল। ফলে একা গেলে রূপালি খুব চিন্তিত বোধ করত। মনে হয় হাসানের সঙ্গসুখ থেকে বঞ্চিত হওয়ার আশংকা ছিল তার মনে। ফলে হাসানকে নিয়ে না গেলে, আমি যদি বলতাম হাসানের সঙ্গে আমার ক'দিন দেখা হচ্ছে না, সে তা বিশ্বাস করত না। বলত, নিশ্চয় হাসানের সঙ্গে তুই ঝগড়া করেছিস। তা না হলে দেখা হবে না কেন? আমাকে বাধ্য হয়েই তখন হাসানের খোঁজ করতে হতো।

রূপালি ও আবুল হাসানের কথা বলতে গিয়ে মনে পড়ল, ঔপন্যাসিক-সাংবাদিক রাহাত খানের স্ত্রীর কথা। রাহাত ভাই আমাদের খুব ভালবাসতেন। আমি ও হাসান প্রায়ই তাঁর সেগুনবাগিচার বাসায় যেতাম। রাহাত ভাই ভাবীর কাছে আমাদের বোহেমিয়ান জীবনের সহানুভূতি-আকর্ষক যে-চিত্রটি এঁকে দিয়েছিলেন, তাতে আমাদের খুবই লাভ হয়েছিল। বাসায় গেলে না চাইলেও ভাবী আমাদের না-খাইয়ে ছাড়তেন না। ঐ ভাবীরও বুকের ব্যাধি ছিল। তিনি শ্বাসকষ্টে ভুগতেন। রূপালির মতো বক্ষব্যাধিহেতু ভাবীর সঙ্গেও আবুল হাসানের একটি গোপন বোঝাপড়া গড়ে ওঠে।

ভাবতে খুব কষ্ট লাগে, অল্প সময়ের ব্যবধানে, শেষপর্যন্ত বক্ষব্যাধির কারণেই রূপালি, রাহাত ভাবী এবং আবুল হাসান—তিনজনেরই অকাল মৃত্যু ঘটে।

রূপালির মহাখালী হাসপাতালে অবস্থানের দিনগুলো আমার এবং বিশেষ করে দিলু ভাবী ও আবুল হাসানের কারণে বেশ ভালোই কাটছিল। হাসপাতালের নিয়মবাঁধা ব্যালেন্সড ডায়েট খেয়ে তাঁর স্বাস্থ্যেরও কিছুটা উন্নতি হয়। কিন্তু কিছুদিন পর ডা. মোমিনুল হক সাহেব আমাকে জানান যে, এই রোগের চিকিৎসা এখানে সম্ভব নয়। সুতরাং এখানে সময় নষ্ট করে কোনোই লাভ নেই। একটি জটিল ওপেন-চেস্ট অপারেশনের দরকার আছে। রোগীকে কলকাতায় নিয়ে যেতে পারলে ভালো হয়। সেখানে এরূপ অপারেশনের ভালো ব্যবস্থা রয়েছে।

আমি এসব কথা লিখে বাবাকে জানাই। আমার চিঠি পেয়ে বাবা ঢাকায় আসেন। চিকিৎসার জন্য রূপালিকে কলিকাতায় নিয়ে যাওয়ার মতো অর্থ আমাদের ছিল না। ফলে কলিকাতায় নিয়ে যাবার নাম করে বাবা রূপালিকে গ্রামের বাড়িতে নিয়ে যান।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হরিদাস কর মারা গেলেন

এটি আমার লেখা একটি গল্পের নাম। গল্পটি প্রকাশিত হয়েছিল কামাল বিন মাহতাব সম্পাদিত ছোটগল্প পত্রিকায়। ৩/১২ লিয়াকত এভিনিউ থেকে ঐ পত্রিকাটি বেরুত। এর প্রথম সংখ্যাটি বেরোয় বর্ষা সংকলন হিসেবে ১৩৭৪ সনে অর্থাৎ ইংরেজি ১৯৬৭ সালে। এটি ছিল ছোটগল্প আন্দোলনের মুখপত্র। কামাল ভাইয়ের বাবার একটি বিজ্ঞাপনী সংস্থা ছিল। খুব নামকরা। হেরাল্ড পাবলিসিটি। বিশেষ করে পাকিস্তানের উর্দু সিনেমাগুলোর বিজ্ঞাপন ঐ হেরাল্ড থেকেই ঢাকার বিভিন্ন কাগজে রিলিজ করা হতো। কামাল ভাইয়ের বাবা ছিলেন সেনাবাহিনীর একজন প্রাক্তন ক্যাপ্টেন। কামাল ভাই তাঁর পিতার সংগঠনে কাজ করতেন। ওখানে একটি চমৎকার সাহিত্যিক আড্ডা ছিল। আমরা প্রায়ই ওখানে যেতাম। ঐ পত্রিকার সহযোগী সম্পাদক হিসেবে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন লেখক যুক্ত থেকেছেন। শুরুর দিকে ছিলেন কায়েস আহমেদ, পরে একসময় ছিলেন আহমদ ছফা, অভিনয় কুমার দাশ এবং আনোয়ার ইবনে গণি। ফাতেমা জোহরা নামে একজন মহিলার নাম ঐ পত্রিকায় সহযোগী হিসেবে সর্বদা ছাপা হতো কিন্তু ঐ মহিলার মুখদর্শন আমাদের ভাগ্যে ঘটেনি। সম্ভবত ইনি ছিলেন কামাল ভাইয়ের ঘরের মানুষ। হেরাল্ডে শিল্পী গোপাল মণ্ডল কাজ করতেন। ঐ কর্মসূত্রে ছোটগল্পের প্রচ্ছদও তিনিই আঁকতেন।

ষাটের কবিরাও ঐ পত্রিকায় গল্প লিখতেন। আমার তিনটি-চারটি গল্প ছোটগল্প পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল। অন্য কবিদের মধ্যে আবদুল মান্নান সৈয়দ, সাযযাদ কাদির ও আবুল হাসান লিখতেন। একবার আমি ভারতের দুর্গাপুর থেকে বাবার কাছে লেখা সোনালি ও ওর সঙ্গে নতুন পরিচয় হওয়া হরিদাস কর নামে এক ভদ্রলোকের লেখা কয়েকটি চিঠি পরপর সাজিয়ে একটি গল্প তৈরি করি। গল্পের নাম দিই 'হরিদাস কর মারা গেলেন'। এটি আসলে গল্প ছিল না। ছিল সত্যিকারের ঘটনানির্ভর কয়েকটি সত্যিকারের চিঠি। আমার বর্তমান রচনাটির জন্য তখনকার ঐ চিঠিগুলো সহায়ক হবে বলে মনে করি।

সোনালি ১৯৬৭ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি ভারতে যায়, ওর ঐ চিঠিগুলো ছিল খুবই কাছাকাছি সময়ের লেখা। জন্মভূমি ও পিতা-মাতার আশ্রয় ছেড়ে দেশান্তরী হওয়ার পর সে পশ্চিমবঙ্গে গিয়ে কীভাবে একজন 'জন্মান্তর-বিশ্বাসী' পিতৃতুল্য বৃদ্ধের স্নেহসান্নিধ্য লাভ করে এবং কীরকম আকস্মিকভাবে ঐ বৃদ্ধের স্নেহসান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত হয়, ঐ ঘটনাটিই চিঠিগুলোর ভিতর দিয়ে বর্ণিত হয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুর্গাপুর-২
২৫ জুন ১৯৬৮

শ্রীচরণেষু বাবা,

তোমাকে আগের একটি চিঠিতে জানিয়েছিলাম—ঐ যে বাসে যেতে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল, উনি গতকাল আমাদের কোয়ার্টারে এসেছিলেন। চা-বিস্কিট খাওয়ালাম। উনি বললেন, সত্যি মা, তোকে আমার এত স্নেহ করতে ইচ্ছে হয় কেন জানি না। আমার চারটি মেয়ে ও একটি ছেলে। চার মেয়েরই বিয়ে দিয়েছি। এক জনের কোয়ার্টার আমাদের কোয়ার্টার থেকে খুব কাছে। খুবই বড়লোক। উনি আমাদের তাঁর মেয়ের কোয়ার্টারে নিয়ে যেতে চাইলেন। দাদামণি প্রথমে রাজি হয়নি, শেষে তাঁর পীড়াপীড়িতে নিচের মেয়েটিকে (মাধবী) নিয়ে গেলাম। গিয়ে খুব ভালোই হলো। কি সুন্দর যে দেখতে মেয়েটি তা আর বলার নয়। আর কি বড়লোক! সর্বদা যে কাপড় পরে দেখে আমার লজ্জা লাগছিল। আমি একা থাকি, তাই আমাকে সবসময় আসতে বলল এবং বলল সে নিজেও যাবে সময় করে। কোনো বাচ্চা হয়নি আজও, সবেমাত্র বিয়ে হয়েছে। তার জামাইর সঙ্গে দেখা হলো—বুড়ো ভদ্রলোক জামাইকে বললেন—ও তোমার শালী, আমার হারানো একটি মেয়ে। আমরা সবাই হাসি। জামাই খুব লাজুক। এসেই আমাকে বলল, নমস্কার। আমি বললাম, এ কী! আমি আপনার শালী। ভদ্রলোক লাল হয়ে গেলেন। মেয়ে বিএ পাস কিন্তু কোনো অহংকার নেই। তারপর মিষ্টি দই খেলাম। বুড়ো ভদ্রলোককে মেশোমশাই ডাকাতে বললেন, না তুই আমাকে বাবা ডাকবি। তোর এক বাপ পাকিস্তানে আর আমি এখানে, আমিই তোকে ভালো দেখে বিয়ে দেব। বুড়ো ভদ্রলোক দেখতে অনেকটা দাদু (ব্রজেন্দ্র দত্ত)-র মতো। আমাকে বাসায় পৌঁছে দিয়ে গেলেন। তোমার আঁকা ছবিগুলো দেখে খুব প্রশংসা করলেন। ভদ্রলোককে আমার খুবই ভালো গেলেছে। তোমার কাছে চিঠি লিখবেন বললেন। মেজদার (নির্মলেন্দু গুণ) কথা শুনে খুব দুঃখিত হলেন।

ইতি প্রণতা সোনালি।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

হরিদাস কর
এ ভি বি কলোনী, দুর্গাপুর-৬
৭ জুলাই ১৯৬৮

প্রিয় মহাশয়,

শ্রদ্ধেয় সুখেন্দু বাবু, প্রথমে আপনি ও আমার বৌদি শ্রীযুক্তা গুণ চৌধুরাণী (চারুবালা গুণ) মহাশয়া আমার নমস্কার গ্রহণ করিবেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আপনাদের সহিত আমি সম্পূর্ণ অপরিচিত। তবে কিশোরগঞ্জে থাকিতে আমি আপনার নাম শুনিয়াছি। এখন আমার পরিচয় দেওয়ার মতো কিছুই নাই, তবু লিখি, আমি কিশোরগঞ্জে মোক্তারি করা অবস্থায় প্রায় দেড় লাখ টাকা খরচ করিয়া 'রঙমহল' নামে একটি সিনেমা হল তৈরি করি। তাহা তথায় ফেলিয়া রাখিয়া ১৯৫০ সালে পশ্চিমবঙ্গে চলিয়া আসি এবং কৃষ্ণনগরে Law Practice করিতে থাকি। বর্তমানে আমার বয়স ৬৪ চলছে। আমার একমাত্র পুত্র এখানে এ-ভি-বিতে কাজ করে। আমার ৪ মেয়ে, সবাইকে এখানে এনে বিবাহ দিয়েছি। এখন পুত্রের বিবাহ দিতে পারলেই মুক্ত। তখন একেবারে বৃন্দাবনবাসী। কি বলেন? তার মা আমার সঙ্গে থাকতে পারে— ইচ্ছা করলে তার ছেলের সঙ্গেও। তখন আমাকে আর পায় কে?

আমি আজ তিন চার মাস যাবত ছেলের কাছে আছি। তার ইচ্ছে নয় যে আমি Practice করি। যেহেতু আমার বয়স হয়েছে আর পরিশ্রম করার দরকার নাই। তবে ভাই, আমি ভগবানের কৃপায় কর্মক্ষম আছি।

এখন আপনার নিকট পত্র লিখার প্রেরণা পাচ্ছি শ্রীমান পূর্ণেন্দু ও আমার সুনা মার (সোনালি) সহিত পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা হওয়ার জন্য। আমি শ্রীমতী সোনালির ছেলে হইয়াছি। সে-ও আমাকে মা'র মতোই আদর যত্ন করে এবং শ্রীমান পূর্ণেন্দুও আমাকে শ্রদ্ধা করে। তাঁহাদের কোয়ার্টারের নিকট আমার এক মেয়েজামাই থাকে। সে সেখানকার একজন সরকারি কন্ট্রাক্টর। সেখানে প্রায়ই যাই। সেখানে গেলেই শ্রীমানের বাসায় যাই এবং খানিকক্ষণ বেশ আনন্দে কাটাই। তারাও খুব আনন্দ পায়। আসতে দিতে চায় না। কয়েকদিন না গেলে পূর্ণেন্দু বাবাজি আমার মাকে বলে—'কিরে সুনু তোর ছেলে আসছে না কেন? অনেকদিন ধরে—রাগ টাগ করেছেন নাকি?' আমি গেলেই তা নিয়ে হাসাহাসি হয়। আমি আমার মাকে বলি, 'দেখত মা, বিনা যত্নে কত বড় ছেলে পেয়েছ। এখন অন্তত ছেলেকে ভালো করে খেতে দিও।' এইভাবে সময়টুকু বেশ কাটে।

এখন আমার রিটায়ার্ড লাইফ। চিন্তাভাবনা সব ছেড়ে দিয়েছি। শুধু ভগবানের চিন্তা-ভাবনাই করি। এখন ভালোয় ভালোয় চলে যেতে পারলেই হয়।

শ্রীমান পূর্ণেন্দু এবং শ্রীমতী, এখন মা-ই লিখি, তাদের সহিত এত ঘনিষ্ঠতা হয়েছে যে বেশ নিকটতম আত্মীয় বলেই মনে হয়। আর মেয়ের বাসার সহিতও তাদের সর্বদাই যাতায়াত হচ্ছে। আমি 'জন্মান্তরবাদে' বিশ্বাসী, হয়তো পূর্বজন্মে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা ছিল, তাই এই জন্মে তার সঙ্গে আমার মিলন হয়েছে।

যাক অনেক বাজে কথা লিখলাম— মনে কিছু করিবেন না।

আমার মা'র জন্য আপনারা মোটেই চিন্তা করিবেন না। শ্রীমান পূর্ণেন্দু তাহার সুখ-সুবিধা ও স্বাস্থ্যের জন্য সকল প্রকার ব্যবস্থাই করিতেছে এবং

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভগবান কৃপায় তার স্বাস্থ্যের অনেক উন্নতি হয়েছে। আমিও আপনার হিতাকাঙ্ক্ষী একজন আছি, যদিও বিশেষ কিছুই করবার ক্ষমতা নাই। এখন এখানেই শেষ করি। আমার নমস্কার গ্রহণ করবেন এবং শ্রীমান-শ্রীমতীদের কুশলসহ সকলের কুশল সংবাদদানে বাধিত করিবেন।

নিবেদন ইতি—
শ্রী হরিদাস কর।

ওঁ কালী

এ/ভি/বি কলোনী, দুর্গাপুর-৬
৭ আগস্ট ১৯৬৮

প্রিয় সুখেন্দু (সুখেন্দু প্রকাশ গুণ চৌধুরী) বাবু,

আমি বিগত ১৫ জুলাই এখনে হইতে কৃষ্ণনগর যাই এবং ৬ আগস্ট এখানে ফিরিয়া আসি। আসিয়া আপনার দু'খানা পত্র পাই। উত্তর দিতে দেরি হইল, কিছু মনে করিবেন না।

আপনি মা সোনালিসহ শ্রীমান পূর্ণেন্দুর যাহা-যাহা করিতে লিখিয়াছেন আমি তাহা অক্ষরে অক্ষরে পালন করিব। এখন ভগবানের কৃপা। আমি পরশু দিন সুনা মা-র এখানে গিয়াছিলাম, তাহারা ভালোই। কৃষ্ণনগর গিয়া জ্বরে অসুস্থ হইয়া পড়ি, এখনও খুব ভালো নয়। শরীর খুব দুর্বল। বিস্তারিত পরে লিখেতেছি। আপনাদের সকলের কুশল প্রার্থী—

AMARBOI.COM

ইতি নিবেদক—
শ্রী হরিদাস কর।

ওঁ

দুর্গাপুর
৮ সেপ্টেম্বর ১৯৬৮

শ্রদ্ধাস্পদেষু

মাননীয় সুখেন্দু বাবু, আপনার ২৬ আগস্টের পত্রখানা গতকল্য পাইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম। আমার সুনা মা আজ প্রায় ১৫ দিন হইল বর্ধমানে তার মাসির বাড়ি গিয়াছে, তথায় ভালোই আছে। এখানে একা একা একঘেয়ে লাগে, তাই ওখানে খুব আনন্দেই আছে। আমিও বলিয়াছিলাম যে সেখানে কয়েকদিন থাকিয়া আসিতে। খুব সম্ভবত ২/১ দিনের মধ্যেই চলিয়া আসিবে। আমি কোক-ওভেনে গিয়াছিলাম। শ্রীমান পূর্ণেন্দুও তাই বলল। বর্ধমান যাবার আগে সুনা মাকে একদিন আমার বাসায় আনিয়াছিলাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সকালবেলা আসিয়াছিল, দুপুরটা থেকে আবার বিকালে আমিই দিয়া আসিয়াছি। শ্রীমান পূর্ণেন্দুও আসিয়াছিল। আমি ২/১ দিন থাকিতে বলিয়াছিলাম কিন্তু কিছুতেই থাকিল না। আবার যাইয়া একদিন নিয়া আসিব। **আমার ইচ্ছা সে আমার কাছে সর্বদাই থাকুক**। সুনা মা-ও আমাকে ছেলের মতোই ভালোবাসে। ভগবানের কী সুন্দর বিধান। আপনি লিখিয়াছেন যে, এই অজানা মেয়ে আমার ঘাড়ে কেন আসিয়া পড়িল। এইসব কথা আপনি লিখিবেন না—আমি খুব কষ্ট পাই। মা কি ছেলের কাছে অজানা হয়? আমি অত্যন্ত ঠাকুরভক্ত। সুতরাং সহজেই বুঝেন যে মা আমার বহুজন্মেই বিশেষত পূর্ব জন্মেই নিকটতমা আত্মীয় ছিল। কিছুদিন মাত্র ছাড়াছাড়ি ছিল, এখন পুনরায় হঠাৎ দেখা হইয়া গেল। আশ্চর্য যে, শুধু আমি কেন, আমার স্ত্রী ও মেয়েরাও আমার মাকে স্নেহ করে ও অত্যন্ত ভালোবাসে। ইহাই আমাদের হিন্দু শাস্ত্রের জন্মান্তরবাদ।

আমার কথা বলি— ১৯৫০ সালে কপর্দকশূন্য হইয়া এখানে আসি। আজ পর্যন্ত এক কপর্দকও পাইনি। আর পাওয়ার সম্ভাবনাও নাই। এখানে আট জনের সংসার ভগবানই চালাইয়া নিয়াছেন। তাঁহার ওপর আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে এবং তাহাতেই আমি আত্মসমর্পণ করিয়াছি। তাঁহার যাহা ইচ্ছ এবং আমার প্রারব্ধ কর্মফল ভোগ করিতেই হইবে। ইহা শুধু আমার নয়, এই জীবজগতের প্রত্যেকের জন্যই এই বিধান। প্রারব্ধ ভোগ করিতেই হইবে। এর জন্য ভাবব কেন?

বর্তমানে ভগবানের কৃপায় ভালো আছি। দুর্বলতা অনেকটা কাটিয়াছে। হাজার হইলেও বয়স তো হইয়াছে। আমি ২/১ দিনের মধ্যেই কোক-ওভেনে যাইব আমার মাকে দেখিতে। তথা হইতে আসিয়া আপনাকে পুনঃ পত্র লিখিব। যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি পাসপোর্ট পাওয়ার চেষ্টা করিবেন। আপনারা আসিলেই আমার ইচ্ছা শ্রীমান ও সুনা মায়ের বিবাহ একসঙ্গে দিবার ব্যবস্থা করিব। অবশ্য নিয়তির বিধান, ভগবান জানেন কি হইবে! আর বিশেষ কি? আপনাদের কুশল প্রার্থী।

ইতি

Yours Haridas Kar.

বর্ধমান

৫ অক্টোবর ১৯৬৮

শ্রীচরণেষু—

বাবা, যে মেশোমশায় আমাকে মেয়ের মতো স্নেহ করিতেন, তিনি আর কোনোদিন আমাকে সুনা মা বলিয়া ডাকিবেন না। পূজার তিনদিন আগে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শ্রদ্ধেয় হরিদাস করের মৃত্যু হইয়াছে। শনিবার দিন আমাকে লইয়া যাবার কথা, কিন্তু মঙ্গলবার রাত ৪টার সময় তিনি মারা যান। মৃত্যুর সময় নাকি আমাকে খুব ডাকিয়াছিলেন। আমি উনার জন্য দুইদিন খুব কাঁদিয়াছি—দাদামণি আমাকে বর্ধমানে দিয়া গিয়াছে। কান্নাকাটি করি বলে আমাকে উনার বাসায়ও নিয়া যায় নাই। উনার ছেলের নিকট তুমি চিঠি দিও। উনার নিকট যা স্নেহ পেয়েছি তা পত্রে লিখার নয়। উনি বলতেন, তোর হাতের রান্না খাব, তোর বাপ আসলে। বাবা, উনি তো আর কোনোদিন আমার হাতের রান্না খেতে আসবেন না। উনার সে আশা পূর্ণ হলো না।

উনি মারা গেলে তার জামাই এসে দাদামণিকে খবর দেয়। দাদামণি উনাকে খুব সুন্দর করে সাজিয়ে, ফুলের মালা দিয়ে, নতুন জামা-কাপড় পরিয়ে শ্মশানে নিয়ে গিয়েছিল। উনি বলতেন, পরকে আপন করতে হলে নাকি নিজের চেয়েও অপরকে ভালবাসতে হয়। দাদামণি তার শেষ কাজে যে একটু কর্তব্য করতে পারিয়াছে তাতেই শান্তি।

উনি মৃত্যুর আগের দিন কোর্ট থেকে এসেছিলেন। খুব কর্মঠ মানুষ ছিলেন। তোমার খুব প্রশংসা করতেন। উনি আজ নাই—কিন্তু উনার কথাগুলো আমার মনের মধ্যে চিরদিনের মতো রয়ে গেল। হঠাৎ তিনি এভাবে মারা যাইবেন তা আমি কল্পনাও করি নাই। উনি রবিবারে আসিয়াছিলেন এবং মঙ্গলবার মারা যান। রবিবারে উনাকে শরবত করে দিয়াছিলাম। চা, বিস্কিট, কলা ইত্যাদি দিয়াছিলাম। যাবার সময় উনি আমাকে মাথায় হাত বুলিয়ে বলেছেন,—তুমি তৈরি থাকবে, আমি পুজোতে তোমাকে আমার বাসায় নিয়া যাইব। একা একা থাকবি তাই। আমি বলেছিলাম, আচ্ছা। পুজোতে মেয়েদের অনেক কিছু দিয়েছিলেন। আমাকে বললেন, তুই আমার মেয়ের মতো আমার কাছ থেকে চেয়ে নিবি। আজ আমি কার কাছে দাবি জানাব?

ইতি প্রণতা সোনালি

(দ্র : কামাল বিন মাহতাব সম্পাদিত ছোটগল্প, ষষ্ঠ সংকলন)

একদিন বাস্তবকে গল্পে পরিণত করেছিলাম, এবার সেই গল্পকে বাস্তবের হাতে ফিরিয়ে দিলাম। এটাই আমার কাজ।

ছোটগল্পের ঐ সংখ্যায় আমার ও আবুল হাসানের একটি যৌথ কাব্যগ্রন্থের পূর্ণ পৃষ্ঠা বিজ্ঞাপন ছাপা হয়। ছোটগল্পের ঐ বিজ্ঞাপনটি দেখে মনে পড়ল 'সমকালে'ও ঐ বিজ্ঞাপনটি কয়েক সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। আমিই ঐ বিজ্ঞাপনটি লিখেছিলাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঐ বিজ্ঞাপনটি ছিল এ রকম :

নির্মলেন্দু গুণ বললেন
আমার কবিতাংশের নাম হবে
কবিতা, অমীমাংসিত রমণী

আবুল হাসান বললেন
যে তুমি হরণ করো

একত্রে গ্রথিত হয়ে কবিতার বই
দুই তরুণের অভাব ও স্মৃতির ফটোগ্রাফ
এলোমেলো রক্তধারার বিবরণী
প্রকাশিত হচ্ছে বিধুর বর্ষায়।

প্রকাশক : ভূঁইয়া ইকবাল।
পূর্বলেখ প্রকাশনী। ঢাকা।

ভূঁইয়া ইকবাল পুরনো ঢাকার বিসিসি রোড থেকে পূর্বলেখ নামে একটি কবিতা পত্রিকা সম্পাদনা করতেন। ঐ বিজ্ঞাপিত যৌথ কাব্যগ্রন্থটি শেষ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়নি। সম্ভবত ভূঁইয়া ইকবাল টাকা জোগাড় করতে পারেনি বলেই হয়নি। পরে একসময় 'কবিতা, অমীমাংসিত রমণী' নামে আমার তৃতীয় এবং 'যে তুমি হরণ করো' নামে আবুল হাসানের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ পৃথকভাবে প্রকাশিত হয়।

AMARBOI.COM

১৯৬৯ সালটি যে আমাদের ইতিহাসে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বছর হিসেবে পরিণত হবে, তা যেন শুরু থেকেই সে জানান দিতে থাকে। পাকিস্তানের উভয় অংশের ছাত্ররাই আইয়ুবশাহীর পতন ঘটাতে মরিয়া হয়ে ওঠে। আইয়ুব খান তাঁর ক্ষমতা দখলের দশ বছরপূর্তিতে এমন বেশিমাত্রায় ফুর্তি করতে থাকেন যে, ঐ দশক পূর্তির ফুর্তিই তাঁর কাল হয়। পশ্চিম পাকিস্তান কর্তৃক পূর্ব পাকিস্তানকে শোষণ করার বাস্তব অভিযোগে শেখ মুজিব তো তাঁর পেছনে লেগে ছিলেনই, এবার পশ্চিম পাকিস্তানের নেতারাও আইয়ুবের পেছনে লাগেন। রাজনীতিবিদদের পাশাপাশি পশ্চিম পাকিস্তানের ছাত্ররাও আইয়ুববিরোধী আন্দোলনে অগ্রবাহিনীর ভূমিকা পালন করতে থাকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র-জনতার সমস্যা আর পশ্চিম পাকিস্তানের ছাত্র-জনতার সমস্যা এক-পর্যায়ে ছিল না। তবু আইয়ুবের পতনের আন্দোলনে উভয় অংশের নেতৃবৃন্দ ও ছাত্র-ছাত্রীরা সমভাবে সাড়া দেয়। পশ্চিম পাকিস্তান, বিশেষ করে পাঞ্জাবীদের স্বার্থের বিশ্বস্ত রক্ষক হওয়ার পরও, মনে হয় আইয়ুব খান পশ্চিম পাকিস্তানের তাবৎ রাজনীতিকদের রুচি বদলের নিঃসঙ্গ শিকারে পরিণত হন।

১৯৬৪ সালে অনুষ্ঠিত প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ফলাফল পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, আইয়ুব খান পশ্চিম পাকিস্তানে প্রদত্ত ভোটের শতকরা ৭৩.৫৬ ভাগ ভোট পেয়েছিলেন আর পূর্ব পাকিস্তানে পেয়েছিলেন প্রদত্ত ভোটের শতকরা ৫৩.১২ ভাগ। রুচিবদল ছাড়া আইয়ুবের প্রশ্নে পাকিস্তানের দুই অঞ্চলের জনমতের মধ্যকার এই বিপুল ব্যবধান হ্রাস পাওয়ার কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ ঘটেনি। আইয়ুব খান পূর্ব বাংলাকে শোষণ করে পশ্চিম পাকিস্তানের ধনিকশ্রেণীর পেট মোটা করার কাজটা চমৎকারভাবেই করে যাচ্ছিলেন। কিন্তু বাধ সাধেন ভুট্টো। আইয়ুবের দীর্ঘকালের বিশ্বস্ত পররাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টো ভারতের সঙ্গে হাজার বছর ঘাস খেয়ে যুদ্ধ করার যে প্রতিজ্ঞা ব্যক্ত করেছিলেন, তা পশ্চিম পাকিস্তানে জনপ্রিয়তা লাভ করে। উচ্চাভিলাষী ভুট্টো আইয়ুবের বিকল্প হিসেবে পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের মধ্যে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে যথেষ্ট সফলতা অর্জন করেন। পূর্বে মুজিব এবং পশ্চিমে ভুট্টোর আক্রমণে আইয়ুবের অবস্থা কাহিল রূপ ধারণ করে।

ঐ সময় পাকিস্তানে জন্মগ্রহণকারী অক্সফোর্ডের ছাত্রনেতা তারিক আলী ইউরোপের ছাত্র-আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়ে পশ্চিমী দুনিয়ায় গণতন্ত্রকামী পাকিস্তানের যে-ভাবমূর্তি তৈরি করেছিলেন, সেটাও আইয়ুবের জন্য কাল হয়ে দাঁড়ায়। ঐ ভাবমূর্তির সঙ্গে তাল মিলাতে গিয়েই পশ্চিম পাকিস্তানের ছাত্ররাও গণতন্ত্র উদ্ধারের নামে আইয়ুবের বিরুদ্ধে আন্দোলনে সামিল হয়, যদিও তার সূত্রপাত হয়েছিল লান্ডিকোটাল থেকে আসা একদল ছাত্রের ওপর পুলিশের নির্যাতনের মতো একটি তুচ্ছ ঘটনার মধ্য দিয়ে।

মোনায়েমের হাতে-গড়া ছাত্র সংগঠন এনএসএফের একটি বড় অংশ পূর্ব পাকিস্তানের গণতন্ত্রের আন্দোলনে মুজিববাদী তোফায়েলদের সহযাত্রীতে পরিণত হয়। ১৯৬৮ সালের ডিসেম্বরে ডাকসুর নেতৃত্বে পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্ররা ১১ দফা কর্মসূচীর ভিত্তিতে সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠন করে।

রাজনৈতিক অঙ্গনেও ঐক্যবদ্ধ ছাত্র আন্দোলনের প্রভাব পড়ে। ১৯৬৯-এর ৮ জানুয়ারি পাকিস্তানে পূর্ণাঙ্গ গণতন্ত্র এবং জনগণের পূর্ণ রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে আন্দোলন তীব্র করার অঙ্গীকার নিয়ে আওয়ামী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লীগ, কাউন্সিল মুসলিম লীগ, পিডিপি, ন্যাপ, জামায়াত ইত্যাদি ৮টি রাজনৈতিক দল, ডেমোক্রাটিক এ্যাকশন কমিটি বা সংক্ষেপে DAC গঠন করে। আইয়ুব খান খুবই বিপদের মধ্যে পড়ে যান। পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর মি. মোনায়েম খান আইয়ুবের লাইবেলিটিতে পরিণত হন।

শেখ মুজিবকে চিরদিন জেলের ভাত খাওয়ানো সম্ভব হবে বলে গভর্নর মোনায়েম খান আইয়ুব খানকে যে-ধারণা দিয়েছিলেন, ক্রমশ ঐ ধারণায় চিড় ধরতে শুরু করে। মুজিব-বধের সমস্ত আয়োজন বুমেরাং হবার উপক্রম হয়। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার রোমাঞ্চকর নাটকটি প্রতিদিন পত্রিকায় ফলাও করে প্রচারের ফলে বন্দী-মুজিব বাংলার মানুষের মধ্যে দ্রুত জনপ্রিয়তা অর্জন করতে থাকেন। মুজিবের পাশাপাশি ত্রিপুরা রাজ্যের রাজধানী আগরতলাও জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

১৯৬৯ সালের শুরুতেই নবগঠিত 'ডাক' ১৭ জানুয়ারি দেশব্যাপী প্রতিবাদ দিবস পালনের ডাক দেয়। তাতে অভূতপূর্ব সাড়া মেলে। বিশেষ করে ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীরাও তখন অগ্নিকন্যা মতিয়া চৌধুরীর নেতৃত্বে খুবই সাহসী হয়ে উঠেছিলেন। শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের বোনাফাইড ছাত্র-ছাত্রীরাই নয়, আমার মতো বিশ্ববিদ্যালয়ের খাতা থেকে নাম কাটা যাওয়া ছাত্ররাও ঐ ছাত্র-আন্দোলনে যোগ দেয়। আইয়ুববিরোধী আন্দোলনে এনএসএফ যোগ দেওয়ার ফলে আমার মতো অনেকেরই পাঁচ পাত্তু-খোকাদের চাকু ও সাপের ভয় কেটে যায়। তাই একরূপ নির্ভয়েই ঐ ছাত্র আন্দোলনে যোগদান করাটা আমার মতো অনেকের পক্ষেই সম্ভব হয়েছিল।

বছরের শুরুতেই আমি একটি নতুন কাজ পেয়ে যাই। কাজটি হচ্ছে প্রতিদিনের ছাত্র মিছিলে অংশ নেওয়া, রাষ্ট্রীয় সম্পদ ভাঙচুর করা, গাড়িতে ও বাড়িতে অগ্নিসংযোগ করা ও পুলিশের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়া।

সুন্দরী ছাত্রীদের জঙ্গী মিছিলে অংশগ্রহণের বিষয়টিও আমাকে দারুণভাবে অনুপ্রাণিত করে। আমার মনে পড়ে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায় ছাত্রসভা শেষে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে নীলক্ষেতের পথে পথে আমরা যখন পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হতাম, তখন অপরিচিত মেয়েরাও কাঁদানে গ্যাসের ক্রন্দন-যন্ত্রণা দূর করার জন্য তাদের ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে সুগন্ধি রুমাল বের করে জলে ভিজিয়ে তা এনে আমাদের চোখে দিতেন। আমার ঐ শুশ্রূষাটি খুবই ভালো লাগত। রুমালের ফাঁক দিয়ে চট করে দেখেই, অপরিচিত মুখটাকে আমি মুখস্থ করে ফেলতাম। আহত অবস্থায় নিজেকে হাসপাতালের শয্যায় কল্পনায় আবিষ্কার করে তখন আনন্দ পেতাম। আইয়ুবের পুলিশী নির্যাতন নিয়ে, তাই আমার কোনো ব্যক্তিগত ক্ষোভ ছিল না। আমার খুব ভালো লাগত প্রতিদিন মিছিলে যেতে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একবার নিজেকে সাহসী প্রমাণ করবার জন্য আমাদের পায়ের কাছে পড়া একটি অপ্রস্ফুটিত কাঁদানে গ্যাসের শেলকে আমি হাতে ধরে পুলিশের দিকে উল্টো ছুঁড়ে মেরেছিলাম। মেরে আমি পুলিশের দিকে তাকাইনি—তাকিয়েছিলাম ঐ মেয়েটির দিকে, যে ছিল আমার সকল সাহসী প্রেরণার উৎস, স্বপনচারিণী। তখন আমার মুখে নতুন গজানো দাড়ি ছিল। আমার সাহসিকতায় খুশি হয়ে ঐ মেয়েটি আমাকে একটি চমৎকার হাসি উপহার দিয়েছিল আর বিরক্ত হয়ে পুলিশের অভিযানে নেতৃত্বদানকারী পুলিশ অফিসারটি 'ঐ দাড়িওলাটারে মার, ঐ যে দাড়িওলাটারে মার...' বলে চিৎকার করে পলায়নপর পুলিশদের নির্দেশ দিচ্ছিলেন। পরে জেনেছিলাম, উনার নাম নবী চৌধুরী।

১৭ জানুয়ারি বিকেলে পল্টন ময়দানে (এখনকার আউটার স্টেডিয়াম) বড় জনসভা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন পিডিপি নেতা জনাব নূরুল আমীন। আইয়ুবের দুঃশাসনের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করেন সর্বজনাব :

আতাউর রহমান খান
প্রফেসর মোজাফফর আহমদ
আবদুল মালেক উকিল
সৈয়দ নজরুল ইসলাম
আসাদুজ্জামান খান
মিজানুর রহমান চৌধুরী
অধ্যাপক গোলাম আযম এবং
মাওলানা আবদুর রহিম।

AMARBOI.COM

জনসভায় মুজিব-ভুট্টো ও ওয়ালী খানের অবিলম্বে নিঃশর্ত মুক্তি দাবি করা হয়।

১৪৪ ধারা ভঙ্গ, শহরে ছাত্র-পুলিশ সংঘর্ষ, ইপিআর বাহিনীর ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষক নির্যাতন—ইত্যাকার ঘটনার পুনরাবৃত্তির ভিতর দিয়ে ১৭-১৮-১৯, এই তিন দিন অতিক্রান্ত হওয়ার পর আসে ২০ জানুয়ারি।

২০ তারিখের জঙ্গী ছাত্র-মিছিলটি কী ভাবে চানখাঁর পুলের চৌরাস্তার বেষ্টনীতে গিয়ে সমবেত হয়েছিল, তা ঠিক মনে পড়ছে না। তবে ঐ দিনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাটি ঘটে ওখানেই। পুলিশকে চারদিক থেকে ছাত্র-জনতা বেষ্টন করে ফেলে। ওখানে পৌঁছার আগে আমি আর কবি হুমায়ুন কবির পাবলিক লাইব্রেরীর সামনের রাস্তা দিয়ে শাহবাগের দিকে ছুটে-যাওয়া একটি ডবল ডেকার বাসের গতিরোধ করি। হুমায়ুন কবির তখন আমার কাছ থেকে একটি দিয়াশলাই চেয়ে নেয়। তার আগে অগ্নিসংযোগে ব্যবহার করার জন্য যে তাঁর প্রেমিকা সুলতানা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেরুর কাছ থেকে ওর রুমালটি চেয়ে নিয়ে এসেছিল। হুমায়ুন কবির বলে, আয় বাসে কীভাবে অগ্নিসংযোগ করতে হয় তোকে শিখিয়ে দিচ্ছি। হুমায়ুনের কাছেই আমি বাসে অগ্নিসংযোগ করা শিখি।

চোখের সামনে এত বড় একটি বাসকে জ্বলে-পুড়ে যেতে দেখে আমার বেশ খারাপই লেগেছিল। কিন্তু না পুড়িয়ে উপায়ও ছিল না।

আমার কবি-বন্ধুদের মধ্যে হুমায়ুন কবিরই ছিল আমার মিছিল সঙ্গী। আমি আর হুমায়ুন মিছিল করে ফিরে এসে শরীফে বসে বীরত্ব জাহির করতাম।

এখন যেখানে ঢাকা মেডিকেল কলেজের ইমারজেন্সি বিভাগটি রয়েছে তখন সেটি ছিল পোস্ট গ্রাজুয়েট মেডিসিন ইনস্টিটিউট। পরে আইপিজিএমআর শাহবাগ হোটেলে স্থানান্তরিত হয়। ২০ তারিখে সকাল ১১টার দিকে পুলিশ ঐ ভবনটির সামনে অবস্থান নেয়। আমরা শহীদ মিনারের দিক থেকে এবং ঢাকা হলের দিক থেকে পুলিশের ওপর ইষ্টক বর্ষণ করতে থাকি। এদিকে পুলিশের নির্গমন পথ বলতে যা ছিল অর্থাৎ চানখাঁর পুলের দিকটা, সেখানেও ছাত্রদের পাশাপাশি জনতা অবস্থান গ্রহণ করে। ফলে পুলিশ একপর্যায়ে নিজেদের অবরুদ্ধ ভাবতে থাকে। তখনই ছাত্র-জনতার উৎসাহ বেড়ে যায়। ইষ্টক বর্ষণ করতে করতে আমার হাত থেকে রক্ত ঝরছিল—কিন্তু সেদিকে আমার খেয়ালই ছিল না। পাশের একজন আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তখন হাতে রুমাল বেঁধে শুরু করি আবার ঐ কাজ।

ঠিক তখনই গুলির শব্দে এলাকাটি প্রকম্পিত হয় এবং পুলিশ বাঁশি বাজাতে বাজাতে ঐ স্থান ত্যাগ করতে শুরু করে। জনতা পলায়নপর পুলিশের কিছু ধাওয়া করে। তাতে কিছু পুলিশ ধরা পড়ে যায়। আমিও ছুটে যাই সেই পলায়নপর পুলিশের পিছু পিছু। তখন শুনতে পাই একজন ছাত্রনেতার বুকে গুলি লেগেছে। গুলি তাঁর বুক ভেদ করে বেরিয়ে গেছে। বাঁচার আশা নেই। ছাত্রটির নাম আসাদ। বাড়ি শিবপুরে। সে ছাত্র ইউনিয়নের একজন নেতা।

আসাদ নামটি তখন বিদ্যুৎবেগে মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ে।

আমি ক্রুদ্ধ ছাত্র-জনতার হাতে মার-খাওয়া একজন নিরীহ পুলিশকে বাঁচাতে যাই। বেচারি পলায়নপর পুলিশভ্যানে অনেক চেষ্টা করেও উঠতে পারেনি। ঐ পুলিশকে বাঁচাতে গিয়ে আমাকে কিল-ঘুষি ও লাঠির আঘাত খেতে হয়। তারপর টুপি ও গরম স্যুয়েটারের বিনিময়ে ঐ পুলিশের সঙ্গে সঙ্গে আমার রফা হয়। টুপিটি শেষ পর্যন্ত রক্ষা করতে পারিনি কিন্তু স্যুয়েটারটি আমি গায়ে পরেই নিয়েছিলাম, ফলে সেটি আর খোয়া যায়নি।

হাসপাতালের ভিতরে প্রবেশ করে জানতে পারি, আসাদের ছোট ভাই ঐ হাসপাতালেরই একজন ইন্টার্নি ডাক্তার। সেদিন পাকিস্তান অবজারভার পত্রিকার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফটোসাংবাদিক জনাব মোজাম্মেল হোসেনও পুলিশের লাঠিচার্জে মারাত্মকভাবে আহত হয়েছিলেন। আসাদের পাশাপাশি তাঁকেও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সৌভাগ্যক্রমে তিনি বেঁচে যান।

আসাদকে রক্ত দেবার জন্য যারা অপেক্ষা করছিল, তারা অচিরেই হতাশ হয়। ডাক্তাররা আসাদকে মৃত ঘোষণা করেন। তখন আসাদের লাশ নিয়ে মিছিলের কথা ভাবা হয়। কিন্তু তা সম্ভব হয় না। ইপিআর এসে সংগীন উঁচিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রবৎ ঢাকা মেডিকেল কলেজের চারপাশে অবস্থান গ্রহণ করে। সেখান থেকে আসাদের লাশ বের করাটা অসম্ভব হয়ে পড়ে।

আসাদের রক্তমাখা শার্ট মিছিলের পুরোভাগে আকাশে উড়িয়ে, ঢাকার রাজপথ প্রকম্পিত করে ছাত্র-জনতার মিছিল ছোটে পল্টন ময়দানের দিকে। অনির্ধারিত জনসভা তখনকার নৈমিত্তিক ঘটনায় পরিণত হয়েছিল। পুলিশের গুলিতে আসাদের মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়লে, দেখা যায় হাজার-মানুষের মিছিল ক্রমশ লাখো-মানুষের মিছিলে পরিণত হয়েছে।

পরদিন ছিল হরতাল। ঐ হরতালের দিন আজিমপুর আর্মি রিক্রুটিং অফিসের সামনে সলিমুল্লাহ অরফেনেজ স্কুলের অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র, ইপিআর মসজিদের ইমাম সাহেবের পুত্র মনিরুল ইসলাম ইপিআরের বেয়নেট চার্জে মারাত্মকভাবে আহত হয়। (১৮ দিন মৃত্যুর সাথে লড়াই করে মনিরুল ইসলাম ৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে)। ২১ জানুয়ারি পূর্ণ হরতাল পালন শেষে পল্টন ময়দানে আসাদের গায়েবানা জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। ভর দুপুরে, ১-১৫ মি:। জানাজা শেষে এক লক্ষ মানুষের একটি মিছিল সমগ্র ঢাকা শহর প্রদক্ষিণ করে। শহীদ আসাদের রক্তমাখা শার্টটিকে রক্ত-পতাকার মতো মিছিলের পুরোভাগে উড়তে দেখা যায়।

কবি শামসুর রাহমান ঐ মিছিল দেখেই 'আসাদের শার্ট' কবিতাটি রচনা করেন। কবিতাটি এখানে তুলে দিচ্ছি। তখন কবিতাটি খুবই জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল।

আসাদের শার্ট

গুচ্ছ গুচ্ছ রক্ত করবীর মতো কিম্বা সূর্যাস্তের
জ্বলন্ত মেঘের মতো আসাদের শার্ট
উড়ছে হাওয়ায়, নীলিমায়।
বোন তার ভায়ের অম্লান শার্টে দিয়েছে লাগিয়ে
নক্ষত্রের মতো কিছু বোতাম কখনো
হৃদয়ের সোনালি তন্তুর সূক্ষ্মতায়;

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বর্ষীয়সী জননী সে-শার্ট
উঠোনের রৌদ্রে দিয়েছেন মেলে কতদিন স্নেহের বিন্যাসে।

ডালিম গাছের মৃদু ছায়া আর রোদ্দুর শোভিত
মায়ের উঠোন ছেড়ে এখন সে-শার্ট
শহরের প্রধান সড়কে
কারখানার চিমনি-চূড়োয়
গমগমে এভেন্যুর আনাচেকানাচে
উড়ছে, উড়ছে, অবিরাম
আমাদের হৃদয়ের রৌদ্র-ঝলসিত প্রতিধ্বনিময় মাঠে,
চৈতন্যের প্রতিটি মোর্চায়।

আমাদের দুর্বলতা, ভীরুতা কলুষ আর লজ্জা
সমস্ত দিয়েছে ঢেকে একখণ্ড বস্ত্র মানবিক;
আসাদের শার্ট আজ আমাদের প্রাণের পতাকা।

[আসাদের শার্ট : নিজ বাসভূমে]

AMARBOI.COM

সপ্তাহব্যাপী পুলিশ ও ইপিআর বাহিনীর নির্যাতন এবং ছাত্র হত্যার প্রতিবাদে ২৪ জানুয়ারি সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ প্রদেশব্যাপী হরতাল আহ্বান করে। বিকেল তিনটায় পল্টন ময়দানে জনসভায় কর্মসূচী ঘোষণা করা হয়।

তখন ছাত্র-জনতার সম্ভাব্য অভ্যুত্থান মোকাবিলার জন্য যখন-তখন নগরীতে কার্ফ্যু জারি করা হতো। আগের দিন জনাব নূরুল আমীনের বাসভবনে ডাকের সভা বসে। সেখানে যখন তখন কার্ফ্যু জারি করার বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা হয় এবং ঐ দমনমূলক সরকারি ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করা হয়।

২৪ তারিখের হরতালে ঢাকার জনগণ আরও জোরের সঙ্গে সাড়া দেয়। হরতালের পক্ষে সকাল থেকেই নগরীতে খণ্ড-খণ্ড মিছিল বের হতে থাকে। সকাল দশটার দিকে হাজারখানেক ছাত্র-জনতার একটি জঙ্গী মিছিল সচিবালয়ের দক্ষিণ দিকের রাস্তা, আবদুল গণি রোড ধরে অগ্রসর হয়। ঐ মিছিলে আমি নিজেকে কীভাবে আবিষ্কার করেছিলাম তা আমার সঠিক মনে পড়ে না। মনে হয় মিছিলটি বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা থেকে এসেছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি তখন ফ্রি স্কুল স্ট্রিটে মামুনের সঙ্গে থাকি। ঘুম থেকে উঠেই মুখ ধুয়ে চার আনার রিক্সা ভাড়া দিয়ে শরীফের ক্যান্টিনে চলে যাই। ওখানে আট আনার নাস্তা সেরে পাঁচ পয়সা দিয়ে দুটো কিংস্টার্ক সিগারেট কিনে, একটিতে অগ্নিসংযোগ করে প্রিয়দর্শিনীদের দর্শন লাভের আশায় রোকেয়া হলের সামনে গিয়ে একটু দাঁড়াই, একথা জানান দেয়ার জন্য যে, আমি এসে গেছি। আমার নাস্তা হয়ে গেছে। একটু পরেই আমি মিছিলে চলে যাব। মিছিল থেকে আমি আর নাও ফিরতে পারি। তাই আমাকে শেষবারের মতো দেখে নাও। আমার 'ভালোবাসার টাকা' কবিতায় ঐ সময়ের কিছু চিত্র আছে। কবিতাটি এ রকম :

একটি টাকা রেখে দিলুম, কাল সকালে
টিফিন করে তোমার মুখ দেখতে যাবো।
একটি টাকা বুক-পকেটে রেখে দিলুম
কাল সকালে তোমাকে আমি দেখতে যাবো।

বুকের কাছে একটি টাকা ঘুমিয়ে আছে,
কাল সকালে জলের দামে শহীদ হবে।
আমার চোখ তোমার দেহে হাজার চোখ,
একটি টাকা হাজার টাকা রস-উৎসবে।
আগামীকাল সকাল হবে ভালোবাসার,
নাশ্‌তা করেই তোমাকে আমি দেখতে যাবো।

[ভালোবাসার টাকা : প্রেমাংশুর রক্ত চাই]

AMARBOI.COM

তোমাকে দেখার কাজটি শেষ করে আমি যাই বটতলায় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নেতাদের জ্বালাময়ী বক্তৃতা শুনতে। শুনি। অতঃপর ছাত্রদের জঙ্গী মিছিলে নেমে পড়ি। মোটামুটিভাবে ওটাই আমার তখনকার প্রতিদিনের রুটিন। সম্ভবত ওভাবেই আমি ঐ দিনের মিছিলে ভিড়ে গিয়ে থাকব। মিছিলের শুরুটা আমার খুব মনে না থাকলেও আবদুল গণি রোডে সকাল ১১-৫ মি. যখন গুলি হয়, তখন আমার মাথার উপর দিয়ে এবং কানের পাশ দিয়ে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মতো ছুটে-যাওয়া বুলেটের রোমাঞ্চকর দৃশ্যটি এখনও আমার চোখে লেগে আছে। আমার চোখের সামনে, ঐ রকমেরই একটি গুলি এসে মতিয়ুরের বুকে আঘাত করে এবং কিশোর ছেলেটি আবদুল গণি রোডের পিচঢালা রাস্তার উপর লুটিয়ে পড়ে। তখন আরো কয়েকটি ছেলে গুলিবিদ্ধ হয়। পুলিশ এবং ইপিআর সচিবালয়ের ভিতর থেকে উপর্যুপরি মিছিলকে লক্ষ করে গুলি ছুড়তে থাকে। আমি লম্বা ছিলাম বলে আমার ভয় ছিল বেশি। আমি তখন মাটিতে শুয়ে পড়ি এবং ক্রল করে গুলিবর্ষণ থেকে আত্মরক্ষা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করার জন্য সচেষ্ট হই। পরে জনতা যখন কিশোর মতিয়ুরকে নিয়ে প্রেসক্লাবের দিকে যায়, আমিও তাদের সঙ্গী হই। ততক্ষণে মতিয়ুর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে। ঐ ঘটনার বিষাদছায়া পড়েছে আমার একটি কবিতায়। ঐ কবিতার কয়েকটি পঙক্তি নিম্নে উদ্ধৃত হলো :

তুমি বোললে তাই আমরা এগিয়ে গেলাম,
নিষ্পাপ কিশোর মরলো আবদুল গণি রোডে।
তুমি বোললে রাজপথ মুক্তি এনে দেবে,
আমরা ভীষণ দুঃখী, নিপীড়িত শত-অত্যাচারে
'গীতাঞ্জলি' অকর্মণ্য হবে। আমরা তাই রঙিন প্ল্যাকার্ড
সাজিয়েছি মাও সেতুং, গোর্কি, নজরুলে।

[জনাকীর্ণ মাঠে জিন্দাবাদ : প্রেমাংশুর রক্ত চাই।]

ঐ সকালের মিছিলে পুলিশের গুলিতে মতিয়ুর ছাড়াও আরও তিন কিশোর নিহত হয়েছিল। এদের একজনের নাম রুস্তম আলী এবং আরেকজনের নাম মকবুল। রুস্তম আলীর বয়স ছিল মতিয়ুরের সমান, ১৪ বছর। মকবুলের বয়স ছিল ২০ বছর। তা ছাড়া একজন অপরিচিত যুবকও ঐ সকালে নিহত হয়। ঐ চার কিশোর-যুবক শহীদের মধ্যে আসাদের মতো মতিয়ুরও দ্রুত পরিচিতি লাভ করে। এর কারণ বোধহয় মনুষ্য স্বভাব। মানুষের স্মৃতি বেশি-সংখ্যক শহীদকে সমআবেগে ধারণ করতে পারে না। তাই সে একজন প্রতীক-শহীদকে নির্বাচন করে। অন্য শহীদদের কাউকে খাটো না করেই সে তা করতে চায়। কিন্তু বাস্তব সত্য এই যে, ওই প্রতীকায়নের ফলে অন্য শহীদরা খাটো হয়। এই অনতিক্রম্য বাস্তবতাকে মেনে নেওয়া ছাড়া আমাদের আর কিছুই করার থাকে না। শুধু পত্রিকার পাতায় সংবাদরূপে নয়, আমাদের অন্যতম প্রধান কবি আল মাহমুদের একটি ছড়াতেও কিশোর মতিয়ুর অমর শহীদের সম্মান লাভ করে।

ট্রাক! ট্রাক! ট্রাক!
শুয়োরমুখো ট্রাক আসবে
দুয়োর বেঁধে রাখ।

কেন বাঁধবো দোর-জানালা
তুলবো কেন খিল?
আসাদ গেছে মিছিল নিয়ে
ফিরবে সে মিছিল।

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ট্রাক! ট্রাক! ট্রাক!
ট্রাকের মুখে আগুন দিতে
মতিয়ুরকে ডাক।

কোথায় পাবো মতিয়ুরকে
ঘুমিয়ে গেছে সে।
তোরাই তবে সোনামাণিক
আগুন জ্বেলে দে।

[ঊনসত্তরের ছড়া-১ : আল মাহমুদের কবিতা]

মতিয়ুর ছিল নবকুমার ইনস্টিটিউটের দশম শ্রেণীর ছাত্র। তার আসল নাম মতিয়ুর রহমান মল্লিক। মতিয়ুর এবং রুস্তমের লাশ নিয়ে ছাত্র-জনতা প্রেসক্লাবের সামনে দিয়ে মতিঝিলের দিকে অগ্রসর হয়। তখন মর্নিং নিউজ পত্রিকায় গেট এ ওয়ার্ড খেলা হতো। ওটা ছিল অনেকটা শব্দ নিয়ে জুয়া খেলার মতো। আমিও খেলতাম। ভাগ্যসন্ধানী প্রচুর লোকের ভিড় লেগে থাকত মর্নিং নিউজ পত্রিকার অফিসের সামনে। মওলানারা বায়তুল মোকাররম কমপ্লেক্সের ভিতরে বিভিন্ন ফুটবল ক্লাব থাকা ও সরকারি পত্রিকায় শব্দের নামে জুয়া খেলা নিয়ে মর্নিং নিউজ পত্রিকার বিরুদ্ধে খুবই ক্ষিপ্ত ছিল। আর জনগণ ক্ষিপ্ত ছিল এই প্রেস ট্রাস্ট থেকে প্রকাশিত ইংরেজি ও বাংলা পত্রিকা দুটো বিরোধী দলের খবর চেপে দিয়ে আইয়ুব-মোনায়েমের সরকারি ভাষ্য প্রচার করে বলে। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার খবর পরিবেশন নিয়েও জনগণের মধ্যে প্রবল অসন্তোষ ছিল। আসাদ ও মতিয়ুরের মৃত্যুর পটভূমিতে বাঙালি জাতীয়তাবাদীদের অসন্তোষের সঙ্গে বামপন্থী এবং মওলানাদের অসন্তোষও যুক্ত হয়।

AMARBOI.COM

প্রেস ট্রাস্টে যাবার পথে পড়ে লস্কর সাহেবের বাড়ি। এন.এ.লস্কর। উনি মুসলিম লীগের এমএনএ ছিলেন। লস্কর সাহেব জাতীয় সংসদে পূর্ব পাকিস্তানে একটি অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরি নির্মাণ করার প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছিলেন। জনগণ ঐ কারণে লস্করের বিরুদ্ধে খুবই ক্ষিপ্ত ছিল।

ঐদিন মিছিল থেকে ক্ষিপ্ত জনতার একটি অংশ লস্করের বাড়িতে ঢুকে পড়ে। তারা বাড়ির লোকজনদের বাড়ি থেকে বের করে দেয় এবং পরে ঐ বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেয়। আগুন ধরানোর জন্য পাশের পেট্রল পাম্প থেকে পেট্রল সংগ্রহ করা হয়। আগুনের লেলিহান শিখা যেন জনতার রক্তেও ছড়িয়ে পড়ে। জনতা তখন প্রেস ট্রাস্ট ভবনের দিকে ছুটে যায় এবং গেট ভেঙে প্রেস ট্রাস্টের ভিতরে প্রবেশ করে মর্নিং নিউজ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পত্রিকার প্রেসটিতে আগুন ধরিয়ে দেয়। আমিও তাদের সঙ্গে সহযোগিতা করি। ঐ প্রেসের প্রতি আমার কোনো দুর্বলতা ছিল না। কিন্তু জনতা যখন একই ভবনে অবস্থিত দৈনিক পাকিস্তানের প্রেসে আগুন লাগাতে যায়, তখন আমি তাদের বাধা দেওয়ার চেষ্টা করি। আমি চিৎকার করে বলি, ভাইসব, এই প্রেসে আগুন দেবেন না। এই কাগজে আমার ও আবুল হাসানের কবিতা ছাপা হয়। এখানে আমাদের দেশের অনেক কবি-সাহিত্যিক-সাংবাদিক আছেন যারা আমাদের আন্দোলনের সমর্থক। রাশেদ খান মেনন এবং আসম আবদুর রবের মতো আমিও পায়জামা পাঞ্জাবি পরতাম বলে এবং মুখে বিপ্লবীদের মতো অগোছালো দাড়ি থাকায় আমাকে কিছুটা নেতা নেতা মনে হতো। তাই আমার বাধায় পুরো কাজ না হলেও কিছুটা কাজ হয়। আমি জনতার রোষ কিছুটা হলেও নিবৃত্ত করতে সক্ষম হই। তাই দৈনিক পাকিস্তানের প্রেসটি খুব বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি। কিন্তু মর্নিং নিউজ পত্রিকার প্রেসটি সম্পূর্ণভাবে ভস্মীভূত হয়। প্রেস ট্রাস্ট বন্ধ থাকার কারণে পত্রিকার প্রকাশনাও কিছুদিন বন্ধ থাকে।

দমকল বাহিনী আগুন নিভাতে আসে। কিন্তু ক্ষিপ্ত জনতার প্রতিরোধের কারণে দমকলের গাড়ি আগুন নিভাতে প্রেস ট্রাস্ট ভবনের কাছে আসতে ব্যর্থ হয়। তখন পুলিশ গুলি চালায়। তাতে একজন নিহত হয়। ঐ নিহত ব্যক্তির নাম জানা যায়নি।

২-৪৫ মি. ঐ এলাকায় কার্ফ্যু জারি করা হয়। তখন জনতা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। আসলে ২৪ তারিখে ঢাকা শহর ছাত্র-জনতার দখলেই চলে গিয়েছিল। আইয়ুবের প্রশাসন ভেঙে পড়েছিল। কার্ফ্যু জারি করা ছাড়া কোনো উপায় ছিল না।

AMARBOI.COM

কার্ফ্যুর কারণে পল্টন ময়দানে শহীদদের নামাজে জানাজা দ্রুত শেষ করতে হয়। জনগণ ঐ জানাজায় তুষ্টি বোধ করতে না পেরে লাশ নিয়ে মিছিল করে ইকবাল হলের খেলার মাঠে গিয়ে সমবেত হয়। মাঠ লোকে ভরে যায়। সেখানে মতিয়ুরের বাবাও শোকক্ষুব্ধ জনতার উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন। তিনি অন্য শহীদদের পিতার মতোই বলেন যে, এক মতিয়ুরকে হারিয়ে তিনি হাজার মতিয়ুরকে ফিরে পেয়েছেন। যা পৃথিবীর কোনো পিতারই মনের কথা নয়। শহীদ হওয়ার জন্য কোনো পিতাই সন্তানের জন্ম দেন না।

ঐদিন পুলিশের গুলিতে ময়মনসিংহে আলমগীর মনসুর নামে একজন ছাত্র নিহত হয়।

এর পরদিন মুসলিম লীগের এমপিএ আবদুর রহমান বিশ্বাস ও মন্ত্রী সুলতানউদ্দিন আহমদ পত্রিকায় বিবৃতি দিয়ে ২৪ তারিখের ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানকে 'সুবিধাবাদী রাজনীতিবিদদের লেলিয়ে দেওয়া গুণ্ডা-বদমাইশদের কাজ' বলে নিন্দা করেন।

[দ্র: পয়গাম : ২৬ জানুয়ারি ১৯৬৯]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শহীদ হতে না পারার জন্য আমার খুব লজ্জা লাগছিল। ফুলের মতো নিষ্পাপ কিশোররা শহীদ হচ্ছে—আর আমরা মিছিল থেকে ভালোয় ভালোয় ফিরে আসছি। এটা কি ভালো হচ্ছে? 'আমিও শহীদ' এই নামে তখন একটি কবিতা লিখি। ঐ কবিতাটি একটি নতুন সাপ্তাহিক পত্রিকার একুশে ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় প্রথম পাতায় রিভার্স করে ছাপা হয়েছিল। কবিতাটি আমার সংগ্রহে নেই।

আমি আমার কবিতার রচনা-তারিখ বা স্থান কখনই লিখে রাখতাম না। ফলে কোনো কবিতারই সঠিক রচনা তারিখ ও রচনার স্থান নির্ণয় করা সম্ভব নয়। তবে অধিকাংশ কবিতাই যে পত্রিকায় প্রকাশের তারিখের কাছাকাছি সময় রচিত, তা বলা যায়। 'সূর্য ভেঙেছে অশ্লীল কারাগার' এই নামে আমার একটি কবিতা ছাপা হয় আজাদের সাহিত্য মজলিশে (২ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯)। বইয়ে নেবার সময় আমি ঐ কবিতার নাম পরিবর্তন করে রাখি—'উন্নত হাত'।

প্রেস ট্রাস্টে অগ্নিসংযোগের সময় লেলিহান অগ্নিশিখার দিকে তাকিয়ে ঐ কবিতার প্রথম পঙক্তিটি আমার মনে আসে : 'আগুন লেগেছে রক্তে, মাটির গ্লোবে।' পরে কবিতা লেখার সময় 'পুরোভাগে হাঁটে মুক্ত-ভূমণ্ডল' চিত্রকল্পটি আমি নির্মাণ করি। আমি আমার চোখের সামনে আমার প্রার্থিত 'মুক্ত-ভূমণ্ডলের' ছবিটি দেখতে পাই।

কবিতাটি এখানে তুলে দিচ্ছি :

আগুন লেগেছে রক্তে মাটির গ্লোবে,
যুবক গ্রীষ্মে ফাল্গুন পলাতক।
পলিমাখা চাঁদ মিছলে চন্দ্রহার
উদ্ধত শিশু উন্নত হাত ডাকে
সূর্য ভেঙেছে অশ্লীল কারাগার।

প্রতীক সূর্যে ব্যাকুল অগ্নি জ্বলে,
সাম্যবাদের গর্বিত কোলাহলে
আগুন লেগেছে রক্তে মাটির গ্লোবে।
রক্তক্ষরণে সলিল সমাধি কার?
মানুষের মুখে গোলাপের স্বরলিপি
মৃত্যু এনেছে নির্মম দেবতার।

পুরোভাগে হাঁটে মুক্ত-ভূমণ্ডল...
আগুন লেগেছে রক্তে মাটির গ্লোবে।

মানুষের হাতে হত্যার অধিকার?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পুষ্পের নিচে নিহত শিশুর শব,
গোরস্থানেও ফসফরাসের আলো
অর্জুন সবে স্বপ্নের সম্ভবে,
আগুন লেগেছে রক্তে মাটির গ্লোবে।

[উন্নত হাত : প্রেমাংশুর রক্ত চাই]

এর মাত্র কিছুদিন আগে আমি লিখি 'প্রেমাংশুর রক্ত চাই' । ঐ কবিতা লেখার পর আমি কবি হাসান হাফিজুর রহমানকে কবিতাটি পড়ে শোনাই। তিনি কবিতাটি খুব পছন্দ করেন এবং তাঁর আগ্রহেই কবিতাটি লেখক সংঘের 'পরিক্রম' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

[পরিক্রম : ৫ বর্ষ, ৬-৭ সংখ্যা, ডিসেম্বর-জানুয়ারি ১৯৬৯]

আমার অবচেতন মনে তখন কী ক্রিয়া করেছিল আমি ঠিক বলতে পারব না। প্রেমাংশু নামটি ছিল আমার খুব প্রিয়। প্রেমাংশুকে শত্রুপক্ষের কেউ বলে ভাববার কোনো বাস্তব কারণ ছিল না। তবে প্রেমাংশুর রক্ত চাওয়া কেন? এই প্রশ্ন লেখার সময় আমার মনে আসেনি। একটানেই আমি ঐ কবিতাটি লিখে ফেলেছিলাম। পরে বুঝেছিলাম, সময় আমার হাত দিয়ে আগামী ঐ কবিতাটি লিখিয়ে নিয়েছিল। প্রার্থিত 'মুক্ত ভূমণ্ডল'-এর জন্ম দিতে গিয়ে যে অনেক প্রিয়-প্রেমাংশুর রক্তদানের প্রয়োজন হবে, সময় যেন আগামীদিনের সেই দাবির কথাই আমার কবিতার ভিতর দিয়ে সেদিন প্রকাশ করেছিল। কবিরা ভবিষ্যতদ্রষ্টা হন—; এই কবিতাটি হয়তো-বা তারই প্রমাণ বহন করে।

AMARBOI.COM

ঢাকা, ময়মনসিংহ ও চট্টগ্রামে ৬ জন নিহত হওয়ার পটভূমিতে ২৪ তারিখের রাতে ঢাকা এবং নারায়ণগঞ্জে ২৪ ঘণ্টার জন্য সান্ধ্য আইন জারি করা হয় এবং সান্ধ্যআইন বলবৎ করার জন্য সেনাবাহিনীকে তলব করা হয়। পাশাপাশি পশ্চিম পাকিস্তানেও আন্দোলন পরিস্থিতির অবনতি (সরকারের চোখে) ঘটে। ক্ষিপ্ত ছাত্র-জনতাকে শান্ত করার জন্য করাচিতেও সান্ধ্য আইন জারি করতে হয়।

ঢাকার সান্ধ্য আইন নবায়নের মাধ্যমে কয়েকদিন ধরেই চলতে থাকে। ২৫ জানুয়ারি সান্ধ্য আইন ভঙ্গ করার জন্য ঢাকায় সেনাবাহিনীর গুলিতে ২ জন নিহত হয়। খুলনার খালিশপুরে ৫ জনের মৃত্যু ঘটে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২৬ তারিখে ঢাকা ও নারায়নগঞ্জে ৪ জন নিহত হয়।

খুব অল্প সময়ের জন্য সান্ধ্য আইন শিথিল করা হতো। তখন নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি কেনার জন্য বাজারে-দোকানে ভিড় লেগে যেত।

২৭ তারিখে ময়মনসিংহের গৌরীপুরে একজন ছাত্র পুলিশের গুলিতে মারা যায়। ক্রমশ সরকারি বাহিনীর হাতে নিহতের সংখ্যা কমে আসতে থাকে। সে-কারণে দেশের অবস্থাও কিছুটা শান্ত রূপ ধারণ করে।

কিন্তু পূর্বাঞ্চল শান্ত হয়ে এলেও পশ্চিমাঞ্চলের অবস্থা খারাপ হতে থাকে। পাকিস্তানের তথ্যমন্ত্রী যে সঙ্গীতের নাম শুনতে পারতেন না, সেই রবীন্দ্রসঙ্গীতের মতোই 'তোমার হলো শুরু আমার হলো সারা...' অবস্থা দেখা দেয়। ঢাকার দেখাদেখি করাচির ছাত্র-জনতাও সেখানকার সরকারি পত্রিকা 'কোহিস্তান'-এর অফিসে আগুন লাগিয়ে দেয়। ফলে সেখানেও একই কায়দায় সান্ধ্য আইন জারি ও সেনাবাহিনী তলবের ঘটনা ঘটে। করাচিতে ৬ জন গুলিতে প্রাণ হারায়। ঢাকাতেও পূর্বের সংঘর্ষে আহতদের মধ্যে ২ জন মৃত্যু বরণ করে।

২৮ তারিখে সেনাবাহিনী তলব করা হয় পেশোয়ারে। তবে ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জের অবস্থার উন্নতি ঘটে। ঢাকায় ১০ ঘণ্টার জন্য সান্ধ্য আইন শিথিল করা হয়।

২৯ তারিখে গুজরানওয়ালাবাগে সেনা তলবের ঘটনা ঘটে। পুলিশের গুলিতে সেখানে ৩ জন প্রাণ হারায়।

পূর্ব পাকিস্তান একটি মৃত্যুহীন দিন কাটায়।

পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করলে মনে হয়, ১৯৬৯ সালের জানুয়ারি মাসেই আইয়ুবের পতন হওয়াটা স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু ঐ পতনের ঘটনা তখন কেন ঘটেনি, তা একটা বিরাট বিস্ময়ের ব্যাপার। পাকিস্তানের সেনাবাহিনী তখনও তার আন্তর্জাতিক মোড়লদের কাছ থেকে ক্ষমতা দখলের সবুজ সংকেত পায়নি বলেই অতি-প্রত্যাশিত ঘটনাটি তখন ঘটেনি। আরো একটি ব্যাপার লক্ষণীয়। দেখা গেছে, মানবদেহে নতুন চামড়া না গজানো পর্যন্ত পুরনো বাতিল চামড়া দেহ থেকে খসে পড়ে না। পাকিস্তানকে একটি মানবদেহ হিসেবে যদি ভাবি, তাহলে আইয়ুব খানকে তার পুরনো চামড়া বলে ধরে নিতে পারি। আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে দেশের দুই অংশের জনগণই অজস্র মৃত্যুর ভিতর দিয়ে তাদের রায় জানিয়ে দিয়েছিল। তারপরও নতুন চামড়া না গজানোর কারণেই যেন আইয়ুব খান আরও দুই মাস ক্ষমতায় টিকে থাকেন।

পাকিস্তানের গায়ের নতুন চামড়া যে একটি নয়, দুটি ছিল, পাকিস্তানের পরবর্তী ইতিহাস থেকে আমরা সে কথা জানতে পারি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পূর্বে শেখ মুজিব এবং পশ্চিমে জুলফিকার আলী ভুট্টো আইয়ুব খানের ডানা দুটিকে দু'দিক থেকে কেটে নেবার জন্য যে গোকুলে বাড়ছিল, তা স্পষ্টতা পেতে কিছুটা সময় নেয়। তবে সার্বিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় বলা যায়, পাকিস্তানে আইয়ুবের বিকল্প হিসেবে জুলফিকার আলী ভুট্টো নন, শেখ মুজিবই আবির্ভূত হচ্ছিলেন। তাই আইয়ুবের চূড়ান্ত পতনের ঘণ্টা বাজানোর জন্য শেখ মুজিবের মুক্তির বিষয়টি অনিবার্য শর্তরূপে দেখা দেয়।

পশ্চিম পাকিস্তানের জনপ্রিয় দুই নেতা, ভুট্টো ও ওয়ালী খান আইয়ুবের কারাগার থেকে মুক্তি লাভ করেন ফেব্রুয়ারির ১৩ তারিখে। পূর্ব পাকিস্তানের জনপ্রিয় দুই নেতার একজন, মৌলানা ভাসানী সর্বদা মুক্তই ছিলেন। তাঁর হাতেই ১৯৬৮-র ডিসেম্বরে লাট ভবন ঘেরাও আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছিল। কিন্তু তাঁর সমর্থন ছাত্র সংগঠন, বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন মেনন গ্রুপ ছাত্র আন্দোলনে এবং এনএসএফের ত্রাস পাঁচ পাত্তুর অপসারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখার পরও মৌলানা ভাসানী ৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানের অধিনায়কত্ব অর্জন করতে পারেননি। এর কারণ এই যে, ব্যক্তিগতভাবে জনপ্রিয় হলেও সংগঠনগতভাবে তাঁর দল ছিল খুবই দুর্বল।

অন্যদিকে কারাভ্যন্তরে দীর্ঘদিন ধরে বন্দি থেকেও ক্রমশ জনগণের মানসপটে ৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানের অধিনায়কে পরিণত হচ্ছিলেন শেখ মুজিব। লক্ষণীয় যে, শেখ মুজিবই ছিলেন আইয়ুবের কারাগার থেকে মুক্তি-পাওয়া সর্বশেষ রাজনৈতিক আসামী। তাঁর মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে ক্ষতস্থানে নতুন চামড়া গজানোর কাজটি সম্পন্ন হয়। তাই শেখ মুজিবের মুক্তি লাভের পরই আইয়ুব নামের পুরনো চামড়াটি পাকিস্তানের গাত্র থেকে খসে পড়তে থাকে। ১৯৬৬-র ছয় দফা কর্মসূচী, ১৯৬৮-র আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা এবং ১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান বন্দি শেখ মুজিবকে পাকিস্তানের শীর্ষনেতায় পরিণত করে।

AMARBOI.COM

এবার দেখা যাক, পাকিস্তানের লৌহমানব প্রেসিডেন্ট ফিল্ড মার্শাল মোহাম্মদ আইয়ুব খানের সাজানো আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার লৌহবেষ্টনী ভেদ করে পূর্ব বাংলার নবীন নেতা শেখ মুজিব কীভাবে বীরের বেশে বের হয়ে আসেন।

২৪ তারিখের পর থেকে ছাত্র আন্দোলনে ভাটার টান শুরু হয়। ঢাকা থেকে সান্ধ্য আইন প্রত্যাহার করা হয়। ১৪৪ ধারা সীমিতভাবে জারি থাকে। ১৩ দিন রাজপথ প্রকম্পিত করার পর ছাত্র-ছাত্রীরাও ক্রমশ ক্লাসে ফিরে যেতে শুরু করে। পয়গাম পত্রিকার পাতায় মোনায়েম খানের স্বস্তির নিশ্বাসের ধ্বনি টের পাওয়া যায়। পরিস্থিতি সামাল দেওয়া গেছে মনে করে লৌহমানব আইয়ুব খানের গলা থেকেও নরম সুর নির্গত হয়। তিনি তাঁর মাস-পহেলা (১ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯) বেতার ভাষণে 'দায়িত্বশীল রাজনৈতিক দলগুলোর' সঙ্গে আলোচনায় বসার আগ্রহ প্রকাশ করেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধের সময় জারিকৃত জরুরি অবস্থা প্রত্যাহার করার কথাও বাতাসে শোনা যেতে থাকে। নতুন সংবিধান প্রণয়নে তাঁর আগ্রহের কথাও তিনি জানান। তিনি বলেন যে, সংবিধান কোনো ঐশী বাণী নয়।

এ যেন এক ভিন্ন আইয়ুব খান! মোনায়েম খানও যাকে চিনেন না। পাকিস্তান ডাক-এর আহ্বায়ক নওয়াবজাদা নসরুল্লা খানের মাধ্যমে তিনি বিরাজমান রাজনৈতিক সংকট নিরসনের উদ্যোগ নেন এবং মুসলিম লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে যোগদানের জন্য ৬ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় আগমন করেন। তিনি যে মুসলিম লীগের ঢাকা অধিবেশনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পুনরায় মুসলিম লীগের প্রধান নির্বাচিত হবেন, তা পূর্বে থেকেই নির্দিষ্ট করা ছিল। তিনি তা আগে থেকেই জানতেন। তবে এটাই যে তাঁর শেষ ঢাকা ভ্রমণ হবে তা তিনি জানতেন না।

আইয়ুব খান যখন ঢাকায় আসেন তখন দুপুর। চতুর্দিকে চিক চিক করছে রোদ্দুর। শোঁ শোঁ করছে হাওয়া। গভর্নর মোনায়েম খান তাঁকে বিমান বন্দরে আলিঙ্গন করে ঢাকার মাটিতে শেষবারের মতো স্বাগত জানান। অবস্থা স্বাভাবিক হয়ে গেছে, এইটে বোঝানোর জন্য ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জ থেকে সেনাবাহিনী প্রত্যাহার করা হয়। কিন্তু ঢাকার ছাত্ররা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নেতৃত্বে সেদিন কৃষ্ণদিবস পালন করে এবং আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয় যে, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার এবং শেখ মুজিবের নিঃশর্ত মুক্তি ছাড়া আইয়ুবের প্রস্তাবিত শাসনতান্ত্রিক জটিলতা নিরসনের বৈঠকে আওয়ামী লীগ কখনই যোগ দেবে না।

ইতিমধ্যে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা আসামীদের জবানবন্দী প্রদানপর্ব সমাপ্ত হয়ে গেছে। মোনায়েম খানের পয়গাম পত্রিকাসহ ঢাকার প্রায় প্রতিটি পত্রিকা সেই জবানবন্দীগুলো ফলাও করে প্রচার করে। পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ খুব আগ্রহ ও উত্তেজনা নিয়ে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামীদের বক্তব্য পাঠ করেছেন। কোনো চাঞ্চল্যকর হত্যা মামলার খবর যেমন পাঠকরা পাঠ করেন, অনেকটা সেরকম ভাবেই। ঐ মামলার আসামীদের জবানবন্দী ছিল আমার নিত্য পাঠ্য। বিশেষ করে শেখ মুজিবের জবানবন্দীটি ছিল খুবই সুলিখিত, সুচিন্তিত এবং আবেগসঞ্চারী।

সেনানিবাসে তিনি তাঁর জবানবন্দী শেষ করার পর সেখানে উপস্থিত জনতার মধ্য থেকে তাঁর নামে জয়ধ্বনি ওঠে। আবেগকাতর ক্ষুব্ধ জনতাকে সামলাতে গিয়ে সৈনিকদের হিমশিম খেতে হয়। আইয়ুব খান ভেবেছিলেন, তাঁকে হয়তো এমন ধারণা দেয়া হয়েছিল যে, ঐ মামলার সংবাদ পত্রিকায় প্রকাশিত হলে শেখ মুজিব জনগণের মধ্যে অপ্রিয় হয়ে উঠবেন, তখন তাঁকে ফাঁসিতে ঝোলানো সহজ হবে। কিন্তু পূর্ব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাকিস্তানের বাস্তবতা ছিল ভিন্ন। ঐ মামলার প্রধান হিসেবে শেখ মুজিব একেবারে বিনা খরচে তাঁর কথা জনগণের কাছে পৌঁছে দেবার মোক্ষম সুযোগ লাভ করেন।

আইয়ুবের পাশাপাশি নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ্ খানও ঢাকায় আসেন। মুজিবকে বাদ দিয়ে যে সমস্যার সমাধান সম্ভব হবে না, তা তখন পূর্ব ও পশ্চিমের সরকার ও বিরোধী মহলে অনুভূত হতে থাকে। নসরুল্লা খান শেখ মুজিবের সঙ্গে একাধিকবার দেখা করেন। বিশেষ ব্যবস্থাধীনে মুজিবের সঙ্গে তাঁর আলাপ আলোচনা হয়। নসরুল্লাহ্ খান আলাপে সন্তোষ প্রকাশ করেন।

তবে নসরুল্লাহ্ খান যে আইয়ুবের হয়েই কাজ করছিলেন তা ছিল খুবই স্পষ্ট।

শেখ মুজিবের ৬ দফা সমর্থন করার অভিযোগে ১৯৬৬ সালের ১৬ জুন থেকে দীর্ঘ ২ বছর ৮ মাস বন্ধ থাকার পর ইত্তেফাক পত্রিকা ১৯৬৯ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি তারিখে রাহুমুক্ত হয়। ইত্তেফাক প্রকাশের পথের অন্তরায় দূর হওয়ার ফলে বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে নব-প্রেরণার উজ্জীবন ঘটে।

৮ ফেব্রুয়ারি তারিখে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায় সভা করে ডাকের নেতাদের উদ্দেশ্যে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে এই বলে যে, কোনো নেতাকে জেলে রেখে তাঁরা যেন আইয়ুবের গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান না করেন।

৯ তারিখে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ পল্টনে জনসভা করে। সেখানেও আইয়ুবের প্রস্তাবিত বৈঠকে যোগদানের ব্যাপারে ১০টি পূর্বশর্ত আরোপ করা হয়। যার অন্যতম প্রধান শর্তই ছিল শেখ মুজিবসহ সকল রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের নিঃশর্ত মুক্তি। ঐ সভায় ২১ ফেব্রুয়ারি সরকারি ছুটি ঘোষণার দাবি জানানো হয় এবং আইয়ুব গেটের নাম পরিবর্তন করে আসাদ গেট ও আইয়ুব পার্কের নাম বদলে কিশোর মতিয়ুর পার্ক রাখার দাবি জানানো হয়।

আওয়ামী লীগ ১১ ফেব্রুয়ারিকে ৬ দফা দিবস হিসেবে ঘোষণা করে এবং দেশব্যাপী হরতাল পালনের ডাক দেয়।

আগে সিদ্ধান্ত ছিল আইয়ুব খান ১৪ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ঢাকায় থাকবেন। কিন্তু পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে বিরোধী দলের সঙ্গে প্রস্তাবিত বৈঠকের আয়োজন করতে তিনি তাঁর সফল সংক্ষিপ্ত করে ১০ ফেব্রুয়ারি, অর্থাৎ হরতালের আগের দিন করাচির উদ্দেশে ঢাকা ত্যাগ করেন, যাতে ঢাকার বিখ্যাত হরতাল তাকে নিজ চোখে দেখতে না হয়। ঢাকায় আর আসা হবে না—এ কথা জানলে তিনি হয়তো তাঁর সফর সংক্ষিপ্ত করতেন না।

যাবার আগে আইয়ুব খানকে খুব ভালো করেই বুঝিয়ে দেওয়া হয় যে, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলাটি তাঁকে গিলে ফেলতে হবে। তা ছাড়া কোনো উপায় নেই। তিনি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এটাও টের পেয়ে যান যে, পূর্ব পাকিস্তানে একজন নতুন নেতার আবির্ভাব ঘটেছে। তাঁর নাম শেখ মুজিবুর রহমান। যাকে ষড়যন্ত্র মামলার মাধ্যমে স্তব্ধ করা বা 'দাবায়া রাখার' ক্ষমতা তাঁর নেই। রাজনৈতিক দাবার চালে একটা বড় ভুল তিনি করে ফেলেছেন। এখন তার তা সংশোধন করা যাবে না। বড় বেশি দেরি হয়ে গেছে।

ঢাকা থেকে পিন্ডি ফিরে যাবার পথে ১১ ফেব্রুয়ারি লাহোর বিমান বন্দরে সাংবাদিকদের কাছে আইয়ুব খান শেখ মুজিব সম্পর্কে বলেন :

> 'আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবকে প্যারোলে মুক্তিদানের সম্ভাবনা নাই। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলাকে হালকাভাবে গ্রহণ করা যায় না। ইহা একটি ষড়যন্ত্র মামলা, ইহার সহিত শুধুমাত্র বেসামরিক নাগরিক নয়, সামরিক কর্মচারীরাও জড়িত রহিয়াছে।'

'সামরিক কর্মচারীরাও জড়িত রহিয়াছে'—ফিল্ড মার্শাল আইয়ুবের এই কথা বলার মধ্যে পরোক্ষভাবে একটি সম্ভাব্য কোর্ট মার্শালের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ঐ লক্ষ্যেই মামলাটি রুজু করা হয়েছিল। কিন্তু ঐ মামলাটি যে একদিন বুমেরাং হয়ে আইয়ুব খানেরই পতন ঘটাতে পারে—তা আইয়ুব এবং তাঁর পরামর্শকরা ভাবতেও পারেননি। অন্তত ১১ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত আইয়ুব খান শেখ মুজিব সম্পর্কে যে বেশ অনমনীয় মনোভাব পোষণ করতেন, তা তাঁর লাহোর বিমান বন্দরের ভাষ্য থেকে সহজেই আঁচ করা যায়। কিন্তু দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি শেখ মুজিবের মুক্তির অনুকূলে দ্রুত নাটকীয় মোড় নিতে থাকে এবং আইয়ুব খান ক্রমশ বেকায়দার পড়তে থাকেন।

AMARBOI.COM

এই মামলা পরিচালনার জন্য পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক সরকারের তহবিল থেকে ৩ লক্ষ ৭৯ হাজার টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল। এই অর্থ বরাদ্দ নিয়ে সংসদে তীব্র বাকবিতণ্ডা ঘটে। কেন্দ্রীয় সরকারের দায়েরকৃত মামলার ব্যয় দরিদ্র প্রাদেশিক সরকার কেন বহন করবে, এ নিয়ে প্রাদেশিক সংসদে জনাব আসানুজ্জামান খান প্রশ্ন উত্থাপন করেন। এই অর্থ বরাদ্দের প্রশ্নটি পূর্বাঞ্চলের জনগণের মনেও রেখাপাত করে।

১২ ফেব্রুয়ারি, ৩৩ মাস দেশরক্ষা আইনে কারাভোগের পর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক তাজউদ্দীন আহমদ কারাগার থেকে মুক্তি লাভ করেন। ১৯৬৬ সালের ৯ মে তাঁকে শেখ মুজিবের সঙ্গে গ্রেফতার করা হয়েছিল। বন্দিদশা থেকে মুক্তি পেয়েই তাজউদ্দীন ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে ছুটে যান রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিব মামলার ট্রাইব্যুনালে, শেখ মুজিবের সঙ্গে দেখা করার জন্য। ট্রাইব্যুনালে তখন ঐ মামলার বাদী ও বিবাদী পক্ষের উকিলদের মধ্যে জেরা চলছিল। শেখ মুজিব ছিলেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়ানো। জেরা সমাপ্ত হওয়ার পর তাজউদ্দীন দর্শকদের আসন থেকে তাঁর নেতা শেখ মুজিবের দিকে এগিয়ে যান। তখন এক মর্মস্পর্শী দৃশ্যের অবতারণা হয়। দুই নেতা একে অপরকে গভীর আবেগে বুকে জড়িয়ে ধরেন। ৩৩ মাস পর দু'জনের মধ্যে দেখা হয়। ইতিমধ্যে সিন্ধু-গঙ্গা-পদ্মা-মেঘনা-যমুনা দিয়ে অনেক জল গড়িয়েছে। শেখ মুজিবের ৬-দফার মর্মবাণী বাঙালির মনে পশে গেছে। তারা নতুনভাবে স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছে। তারা তাদের কণ্ঠে তুলে নিয়েছে এক নতুন স্লোগান—'তোমার আমার ঠিকানা/ পদ্মা-মেঘনা-যমুনা'।

ঐ স্লোগানের ভিতরে সিন্ধুর কোনো স্থান নেই।

১৩ ফেব্রুয়ারি পশ্চিম পাকিস্তানের কারাগার থেকে পিপলস পার্টির নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টো এবং মস্কোপন্থী ন্যাপ-এর নেতা খান আবদুল ওয়ালী খান মুক্তি লাভ করেন। ভুট্টো এবং ওয়ালী খানের মুক্তি লাভের ফলে পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনৈতিক উত্তাপ কিছুটা কমে আসে। কিন্তু একই কারণে, শেখ মুজিবের মুক্তির প্রশ্নটি পূর্বের চেয়ে অধিকতর প্রাধান্য লাভ করে। মনে হতে থাকে যে, আইয়ুব খানের যত ভয় ঐ মুজিবকে নিয়ে। তাই তিনি অন্য সবাইকে মুক্তি দিলেও মুজিবকে মুক্তি দিচ্ছেন না। তাঁকে তিনি ভয় পাচ্ছেন। সুতরাং জনগণ ভাবতে শুরু করে যে, শেখ মুজিবই পাকিস্তানের এক নম্বর নেতা। পাকিস্তানের এক নম্বর নেতা শেখ মুজিব এবং গোপন কমিউনিস্ট পার্টির নেতা কমরেড মণি সিংহ ছাড়া আইয়ুবের কারাগারে আর কোনো নেতাই তখন আর বন্দি ছিলেন না। শেখ মুজিবের এই নিঃসঙ্গ-বন্দিত্ব তাঁর রাজনৈতিক ভাবমূর্তিকে দেশবাসীর মনে ক্রমশ আরও উজ্জ্বল করে তোলে।

AMARBOI.COM

১৪ ফেব্রুয়ারি ছিল দেশব্যাপী হরতাল এবং বিকেলে পল্টন ময়দানে ডাক-এর জনসভা। ঐদিন পল্টনের জনসভায় উপস্থিত লক্ষ লক্ষ ছাত্র-জনতা মুজিবের প্রতি তাদের অন্তরের আবেগ ও আস্থার প্রকাশ ঘটায়। ডাকের ঐ জনসভাটি পরিচালনা করছিলেন ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের নেতা, ডাকসু ভিপি তোফায়েল আহমদ। বিশাল বিশাল সভা পরিচালনা করে তোফায়েল তখন তাঁর দক্ষতা, বুদ্ধিমত্তা ও প্রজ্ঞার পরিচয় দিয়ে বিপুল জনতার প্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। তোফায়েল যদি ঐ দিনের সভা পরিচালনার দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করতে না পারতেন—তবে ঐদিনই ডাকের সমাধি রচিত হতে পারত এবং তাতে শেখ মুজিবের মুক্তির আন্দোলন ক্ষতিগ্রস্ত হতো। ঐ দিন সভা চলার এক-পর্যায়ে জনাব তাজউদ্দীন আহমদও ক্ষিপ্ত জনতাকে শান্ত করার জন্য যথার্থ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছিলেন। তিনি শেখ মুজিবের আঁকা একটি প্রতিকৃতি এনে সভামঞ্চে স্থাপন করেন এবং বলেন 'এই আপনাদের প্রিয় নেতা এখানে আছেন।' এই প্রতিকৃতি দর্শনে জনতা শান্ত হয় এবং সভার কাজ সুশৃঙ্খলভাবে চলে।

[সংবাদ সূত্র : ইত্তেফাক।]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মস্কোপন্থী ন্যাপের নেতা জনাব মহিউদ্দিন আহমদ যখন সভার সভাপতি হিসেবে পিডিপি নেতা জনাব নূরুল আমীন সাহেবের নাম প্রস্তাব করেন, তখনই সভায় গণ্ডগোলের সূত্রপাত হয়। লক্ষ জনতা 'না-না' ধ্বনি তোলে। মুহূর্তের মধ্যে হাজার হাজার জুতা আকাশে উত্থিত হয়। ডাক আওয়ামী লীগের ৬ দফা এবং ছাত্রদের ১১ দফা দাবিকে পাশ কাটিয়ে আইয়ুবের প্রস্তাবিত গোলটেবিল বৈঠকে অংশ নেবার শর্ত হিসেবে ৮ দফা কর্মসূচী গ্রহণ করেছিল। এবং তা গ্রহণ করেছিল আওয়ামী লীগের অনুমোদন সাপেক্ষেই। কিন্তু জনতা এসব মারপ্যাঁচের কথা মানতে রাজি নয়। তাদের এক কথা, নূরুল আমীন দালাল। তিনি এই সভার সভাপতি হতে পারবেন না। নূরুল আমীনের পক্ষে কথা বলতে এসে আওয়ামী লীগ নেতা খোন্দকার মোশতাক আহমদ, ন্যাপ নেতা অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ জনতা কর্তৃক নাজেহাল হন। তখন এক পর্যায়ে জনতার তীব্র প্রতিবাদের মুখে জনাব নূরুল আমীনকে মঞ্চের পেছন দিয়ে নিরাপদে পল্টন ময়দান থেকে তাঁর বাসায় পৌঁছে দেয়া হয়।

পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে নেতারা ব্যর্থ হলে, ছাত্রনেতা তোফায়েল আহমদ তাঁর যাদুকরী কায়দায় অশান্ত জনতাকে শান্ত করেন। তারপর ৩-৫০ মি. আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভানেত্রী আমেনা বেগমের বক্তৃতা দিয়ে জনসভার কাজ শুরু হয়। সদ্য কারামুক্ত আওয়ামী লীগের নেতা তাজউদ্দীন আহমদের বক্তব্য জনতা শ্রদ্ধা ও নীরবতার সঙ্গে শ্রবণ করে।

তারপর আবার আসে নেতার নাজেহাল হবার পালা। এবার জনতার হাতে নাজেহাল হন নেজামে ইসলামী নেতা মৌলবী ফরিদ আহমদ। তিনি শেখ মুজিবের সঙ্গে তাঁর ২৩ বছরের অন্তরঙ্গ পরিচয়ের কথা বলেও রেহাই পান না। তিনি বলেন, শেখ মুজিব আমাকে 'তুই' বলে সম্বোধন করেন। তাঁকে জেলে রেখে আমি কি গোলটেবিল বৈঠকে যেতে পারি? এরপরও জনতা তাঁর বক্তৃতা শ্রবণ করতে অস্বীকার করে। জনাব ফরিদ আহমদকে মাইক ছেড়ে তখন বসে পড়তে হয়। জনাব ফরিদ আহমদের জন্য আমার তখন বেশ মায়া হয়েছিল। আমার মনে হয়েছিল, পল্টনের জনতা তাঁর প্রতি অবিচার করেছে।

আমি যখন মৌলবী ফরিদ আহমদ সম্পর্কে এ রকম ভাবছিলাম, ঠিক তখনই অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ অভাবিতভাবে জনতার রোষে পড়েন। তিনি জনতাকে ডাকের ৮-দফা বোঝাতে গিয়ে নিজের বিপদ ডেকে আনেন। জনতা ক্ষেপে যায় এবং 'দালাল' 'দালাল' বলে ধ্বনি দিতে থাকে। এক পর্যায়ে তাঁকেও রণে ভঙ্গ দিয়ে বসে যেতে হয়। সবশেষে বক্তৃতা করেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম। জনগণ শান্ত হয়ে তাঁর কথা শ্রবণ করেন। তিনি বলেন, 'শেখ মুজিবের নির্দেশ লইয়া আমি আগামীকল্য লাহোর যাইতেছি।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সভাপতিহীন ঐ জনসভাটি চরম বিশৃঙ্খলার মধ্যে শেষ হলেও পল্টনের ১৪ ফেব্রুয়ারির ঐ জনসভা থেকে একটি কথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ শেখ মুজিব ছাড়া অন্য কিছুই বুঝতে চায় না। মুজিবের মুক্তির কথা ছাড়া আর কোনো কথাই তারা শুনতে চায় না।

১৪ ফেব্রুয়ারি অবসানে আসে ১৫ ফেব্রুয়ারি। সন্ধ্যার দিকে রেডিও পাকিস্তানের ঢাকা কেন্দ্র থেকে গভর্নর মোনায়েম খান সাহেব তাঁর সর্বশেষ মাস-মধ্য বেতার ভাষণ প্রদান করেন। আইয়ুবের অনুসরণে 'সকলে মিলে দেশ গঠনে' এগিয়ে আসার জন্য তিনিও আহ্বান জানান। তাঁর সেই আহ্বান রেডিও পাকিস্তানের রেকর্ড এবং তাঁর পয়গাম পত্রিকা ছাড়া অন্য কোথাও বিন্দুমাত্র রেখাপাত না করেই হাওয়ায় হারিয়ে যায়।

রাত ক্রমশ গভীর হয়ে আসে। আমি ফ্রি স্কুল স্ট্রিটে মামুনের আস্তানায় ফিরে যাই এবং রাতভর জুয়া খেলার জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ করি। রাত তখন এগারটার কাছাকাছি। হঠাৎ রাতের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে চারদিক থেকে মানুষের চিৎকারধ্বনি ভেসে আসে। শোনা যায় গগনভেদী শ্লোগান। আমরা দ্রুত তাস ফেলে ঘর ছেড়ে পথে বেরিয়ে আসি। হাতিরপুল বাজারের কাছে তখন জনতার ভিড়। সেখানে এসে জানতে পারি, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম আসামী সার্জেন্ট জহুরুল হককে ক্যান্টনমেন্টে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। রাত ৯.৫০ মি. তিনি কমবাইন্ড মিলিটারি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন।

এই সংবাদ প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ছাত্র-জনতার জঙ্গী মিছিল রাজপথে নেমে পড়ে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হল থেকেও ছাত্ররা মিছিল নিয়ে রাস্তায় নামে। তাদের হাতে লাঠিসোটা। প্রত্যেকটি মিছিলই ছিল খুব উগ্র ধরনের। সার্জেন্ট জহুরুল হকের নাম সকলের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ে। এলিফ্যান্ট রোডে ছাত্রলীগ নেতা মণ্টু-সেলিমের বাসা। তাই ঐ এলাকা থেকে ছাত্রলীগের নেতৃত্বে জঙ্গী মিছিল বের হয়। আমি, পরেশচন্দ্র (পি.সি), নাসির, বেলাল, বাবর (অভিনেতা) ঐ মিছিলে ভিড়ে যাই। পরে ইকবাল হলে (পরবর্তীকালে সার্জেন্ট জহুরুল হক হল) গিয়ে জানতে পারি যে, ঢাকা নগরীতে সর্বত্রই মিছিল হয়েছে এবং হচ্ছে। সেদিন রাতে অনেকের মনেই একটা ভয় কাজ করছিল—সার্জেন্ট জহুরুল হককে যেভাবে হত্যা করা হয়েছে, একই কায়দায় যদি শেখ মুজিবকেও হত্যা করা হয়, তাহলে?

সেদিন ঢাকার নগরবাসী, বলা যায় একটি অনিদ্র রজনী যাপন করে। পরদিন ভোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যখন সার্জেন্ট জহুরুল হকের হত্যার বিস্তারিত সংবাদ প্রকাশ পায়, তখন তাঁর মৃত্যু সংক্রান্ত সরকারি ভাষ্যে সন্তুষ্ট হতে না পেরে ঢাকার ছাত্র-জনতা প্রচণ্ড বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। সরকারি ভাষ্যে বলা হয় যে, পালানোর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চেষ্টা করার সময় সকাল নয়টার দিকে সার্জেন্ট জহুরুল হক এবং ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট মোয়াজ্জেম হোসেন প্রহরারত সৈনিকের রাইফেলের গুলিতে আহত হন। জহুরুল হকের বুকে গুলি লেগেছিল। তাই তাঁকে অনেক চেষ্টা করেও ডাক্তাররা বাঁচাতে পারেনি। মোয়াজ্জেম হোসেনের অবস্থা উন্নতির দিকে বলে জানানো হয়।

সরকারি ভাষ্য জনগণ সরাসরি প্রত্যাখ্যান করে। তারা মনে করে, যখন প্রবল গণ-আন্দোলনের মুখে আইয়ুব খান স্বয়ং ঐ ষড়যন্ত্র মামলাটি উঠিয়ে নেবার কথা ভাবতে শুরু করেছেন, তখন সার্জেন্ট জহুরুল হক এবং ফ্লাইট লে. মোয়াজ্জেম হোসেন কেন পালানোর ঝুঁকি নিতে যাবেন? এটা অবিশ্বাস্য। এটা হতেই পারে না। এর মধ্যে একটা কিন্তু আছে। জনগণের মনে এই বিশ্বাস কাজ করে যে, প্রচণ্ড অত্যাচারের পরও রাজসাক্ষী হতে অস্বীকার করার জন্যই সার্জেন্ট জহুরুল হককে প্রাণ দিতে হয়েছে। ভাগ্য ভালো বলে মোয়াজ্জেম হোসেন বেঁচে গেছেন। ধন্য জহুরুল হক। নিজের জীবন দিয়ে তিনি শেখ মুজিবের জীবন রক্ষা করে গেলেন।

এমন ধারণাও তখন জন্মে যে, সার্জেন্ট জহুরুল হককে হত্যা করে সরকার হয়তো এর প্রতিক্রিয়া কী হতে পারে তা-ই দেখতে চেয়েছিলেন। অর্থাৎ এটি ছিল আইয়ুব সরকারের একটা টেস্ট কেস। এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে যদি সেদিন রাতের ঢাকা প্রচণ্ড রুদ্রবিক্ষোভে ফেটে না পড়ত, তাহলে কী হতো বলা যায় না!

সকালের দিকে সার্জেন্ট জহরুল হকের লাশ তাঁর পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়। নামাজে জানাজা পড়ার জন্য দুপুরের দিকে জহুরুল হকের লাশ পল্টন ময়দানে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে কয়েক লক্ষ লোকের সমাগম হয়। আসাদ এবং মতিয়ুরের পর পল্টনের ময়দান আবার বীর শহীদের লাশ বুকে নিয়ে বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে।

জানাজা শেষে একটি বিরাট শোভাযাত্রা পল্টন ময়দান থেকে আজিমপুর কবরস্থানের দিকে অগ্রসর হয়। মিছিলটি আবদুল গণি রোড দিয়ে যাবার সময় মিছিলের কিছু লোক জহুরুল হকের কবরে দেওয়ার জন্য মন্ত্রী সুলতান উদ্দিনের বাসভবন থেকে ফুল সংগ্রহ করতে যায়। তখন প্রহরারত পুলিশ জনৈক কিশোর ছাত্রকে বেয়নেটের খোঁচায় আহত করে। ক্ষিপ্ত জনতা তখন ঐ বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয়। পাশেই ছিল মন্ত্রী মং শ প্রু চৌধুরীর বাড়ি। ক্ষিপ্ত জনতা ঐ বাড়িটিতেও আগুন ধরায়। আগুনের লেলিহান শিখা জনতার রক্তে প্রবেশ করলে জনতার মনের চাপা পড়া আগুন ঢাকার সর্বত্র ছড়িয়ে পড়তে থাকে।

ছাত্র-জনতা আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা পরিচালনার জন্য গঠিত বিশেষ ট্রাইব্যুনালের প্রধান বিচারপতি এসএ রহমানের বাংলোতেও (ঐ বাংলোটি বাংলা একাডেমীর পাশে বর্তমান পুষ্টি ভবনের ভিতরে অবস্থিত ছিল) আগুন ধরিয়ে দেয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মিছিলটিকে পাহারা দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে আসা পুলিশ এবং সেনাবাহিনীর সাথেও মিছিলের সংঘর্ষ হয়। ঐ সংঘর্ষে পলাশী এলাকায় একজন প্রেস কম্পোজিটর নিহত হন। তাঁর নাম ইসহাক। বয়স ২৬।

বীর শহীদ সার্জেন্ট জহুরুল হককে আজিমপুর কবরস্থানে কবর দেয়া হয়।

ঐদিন পাকিস্তানের তথ্যমন্ত্রী খাজা শাহাবুদ্দিনের পরিবারের বাসাটিতেও জনতা আগুন দেয়। খাজা শাহাবুদ্দিনের বিরাট বাড়িটি আমাদের ক্ষুদ্র বাসস্থলের নিকটবর্তী ছিল বলে আমিও ঐ অগ্নিকাণ্ডে কিঞ্চিৎ অবদান রাখার সুযোগ পাই। প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি নওয়াব হাসান আসকারীর বাড়িতেও জনতা আগুন ধরিয়ে দেয়।

ঐদিন ২৪ জানুয়ারির মতোই অগ্নিদগ্ধ ঢাকা নগরী ক্ষুব্ধ ছাত্র-জনতার দখলে চলে যায়। ফলে সরকার নগরীতে বিরতিহীন সান্ধ্য আইন জারি করে সেনাবাহিনীর সাহায্যে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে বাধ্য হয়।

বিকেলে পল্টনে ভাসানী ন্যাপের জনসভা ছিল। সেখানে ভাসানীও উপস্থিত ছিলেন। ঐ সভায় মৌলানা ভাসানী বলেন : 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার না করিলে ও শেখ মুজিবকে মুক্তি দেওয়া না হইলে ফরাসি বিপ্লবের ন্যায় জেলখানার প্রাচীর ভাঙিয়া শেখ মুজিবকে মুক্ত করিব।'

জেনারেল আজম খান, এয়ার মার্শাল আসগর খান এবং বিচারপতি এসএম মোর্শেদ আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার ও শেখ মুজিবের মুক্তির দাবি তোলেন।

সার্জেন্ট জহুরুল হকের হত্যাকাণ্ডের দায় এড়াতে গিয়ে সরকার যখন হিমশিম খাচ্ছে—সান্ধ্য আইনকে যখন দেশের তপ্ত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য যথেষ্ট বলে মনে হচ্ছে না, তখন পরদিন রাতে ঢাকায় খবর আসে যে, রাজশাহীতে ডক্টর শামসুজ্জোহাসহ তিনজন পুলিশের গুলিতে নিহত হয়েছেন। ঐ খবর ঢাকায় পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গে এক অভাবিত অবস্থার সৃষ্টি হয়। সান্ধ্য আইন উপেক্ষা করে ঢাকার মানুষ রাজপথে নেমে আসে। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার এবং মুজিবের মুক্তির দাবিতে হাজার হাজার মানুষ বিক্ষোভ মিছিলে সামিল হয়। আমরা হাতিরপুল থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে নিউ মার্কেটের দিকে অগ্রসর হই। আমার সঙ্গে ছিল পরেশ। ঐ দিন ভাগ্যক্রমে আমি বেঁচে যাই। উল্টোদিক থেকে বেয়নেট উঁচিয়ে মার্চ করতে করতে আমাদের দিকে এগিয়ে আসা একদল সৈনিককে আমি লাঠিসোটা উঁচিয়ে আসা একটি খণ্ড-মিছিল বলে ভ্রম করি। আমরা মাত্র কয়েকজন যুবক ঐ চোরাবালির দিকে দ্রুত ধাবিত হই। তখন হঠাৎ পরেশ আবিষ্কার করে যে, ওরা আসলে মিলিটারি। ততক্ষণে আমরা ঐ মিলিটারিদের খুবই কাছাকাছি এসে গেছি। পেছনে ফেরারও উপায় নেই। একটি ছোট্ট মাইকে তখন মিলিটারিদের ভিতর থেকে একজন আমাদের রাস্তা থেকে সরে যাবার নির্দেশ দেয়। আমরা ভাবি সান্ধ্য আইন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভঙ্গ করে মিছিল করার অপরাধে আমাদের পেছন থেকে গুলি করা হতে পারে। আমরা একটি গলির ভিতরে ছুটে যাই। ঐ মিলিটারিদের কমান্ডে যিনি ছিলেন—তিনি নিতান্ত দয়াপরবশ হয়েই আমাদের পেছনে গুলি খরচ না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তা না হলে ঐ দিন আমার মৃত্যু ঠেকাবার শক্তি আমেরিকারও ছিল না।

পরেশ, আমি ও মিছিলের অগ্রসারির অপরিচিত আরও কয়েকজন সৌভাগ্যক্রমে বেঁচে যাই। এখনও চোখ বন্ধ করলে আমি মার্চ করতে করতে আমাদের দিকে এগি য়ে আসা উর্ধ্বমুখী বেয়নেটের চকচক করা ধার দেখতে পাই। এমনও হতে পারে যে, বিক্ষোভ মিছিলে গুলি না চালাবার নির্দেশ ছিল বলেই আমরা সেদিন বেঁচে গিয়েছিলাম।

পাকিস্তানের পরিস্থিতি খুবই উত্তপ্ত রূপ ধারণ করে। শেখ মুজিবের মুক্তির ব্যাপারে আইয়ুবের ওপর চাপ বাড়তে থাকে। তাঁর প্রস্তাবিত গোলটেবিল বৈঠকটির সাফল্য আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার ও শেখ মুজিবের মুক্তির সঙ্গে শর্তযুক্ত হয়ে যায়। আইয়ুব খান উপায়ান্তর না দেখে বৈঠকে শেখ মুজিবের অংশগ্রহণের ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণে রাজি হন। আইয়ুবের প্রস্তাবিত গোলটেবিল বৈঠক ১৭ তারিখের পরিবর্তে ১৯ মার্চ তারিখে পরিবর্তন করা হয়।

AMARBOI.COM

২১ ফেব্রুয়ারি সরকারী ছুটি

পূর্ব পাকিস্তান সরকার আগামী ২১ ফেব্রুয়ারি সারা দেশে সরকারি ছুটি ঘোষণা করিয়াছেন। গতকল্য (রবিবার) ঢাকায় এক সরকারি ঘোষণায় এই কথা বলা হয়।

আইয়ুব খান দেশ থেকে জরুরি অবস্থা প্রত্যাহার এবং রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্তি ও নাগরিক অধিকার পুনপ্রতিষ্ঠার শর্ত মেনে নেন। তবে শেখ মুজিব কীভাবে ঐ বৈঠকে অংশ গ্রহণ করবেন, সে বিষয়টি অস্পষ্ট থেকে যায়।

ঢাকায় মোনায়েম খানের পত্রিকা পয়গামে খবর বেরোয় যে 'একজন স্বাধীন নাগরিক হিসেবে প্রাদেশিক আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান কেন্দ্রীয় গণতান্ত্রিক সংগ্রাম কমিটির (ডাক) বৈঠকে যোগদানের জন্য আগামী ১৮ ফেব্রুয়ারি লাহোর যাইতে পারেন।'

—এপিপি।

[পয়গাম, ১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯]

এদিকে শেখ মুজিব সম্পর্কে লাহোরে ডাক নেতা মাহমুদ আলী সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে যা বলেন, তা ছিল নিম্নরূপ :

প্রশ্ন: শেখ মুজিব বৈঠকে অংশ গ্রহণ করিবেন—তিনি কি প্রহরাধীনে আসিবেন, না একজন মুক্ত নাগরিক হিসেবে আসিবেন?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উত্তর : সে কথা আমি বলিতে পারি না, সরকারই তাহা বলিতে পারেন। তবে আমরা তাঁহাকে একজন মুক্ত নাগরিক হিসেবেই আলোচনা বৈঠকে দেখিতে চাই।

> রাওয়ালপিন্ডি, ১৬ ফেব্রুয়ারি : অদ্য প্রেসিডেন্ট জরুরী অবস্থা প্রত্যাহার করিয়াছেন। আগামীকল্য (১৭ ফেব্রুয়ারি) হইতে এই বাতিল আদেশ কার্যকর হইবে। ১৯৬৫ সালের ৬ সেপ্টেম্বর প্রেসিডেন্ট এই অবস্থা জারী করিয়াছিলেন।

শেখ মুজিবসহ ডাক প্রতিনিধিদের নাম ঘোষণা করার পাশাপাশি ঢাকা থেকে এপিপি পরিবেশিত সংবাদে বলা হয় যে, শেখ মুজিবের বিচারের জন্য গঠিত ট্রাইব্যুনালের শুনানি ৩ সপ্তাহের জন্য মুলতবি থাকবে। আগামী ১০ মার্চ থেকে তা আবার শুরু হবে।

১৯ তারিখে রাওয়ালপিন্ডিতে কেন্দ্রীয় উজিরসভার এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। প্রেসিডেন্ট আইয়ুব ঐ উজিরসভায় সভাপতিত্ব করেন। ঐ উজিরসভাতেই ষড়যন্ত্র মামলাটি গিলে ফেলা এবং শেখ মুজিবকে মুক্তিদানের বিষয়টি অনুমোদিত হয়েছিল বলে মনে হয়।

AMARBOI.COM

সরকার ১৭ তারিখে রাওয়ালপিন্ডিতে প্রস্তাবিত গোলটেবিল বৈঠকে অংশগ্রহণের জন্য ডাক প্রতিনিধিদের নাম ঘোষণা করেন। ডাকের প্রতিনিধিত্বকারী দলনেতাদের নামের তালিকাটি ছিল নিম্নরূপ :

<u>৬ দফা পন্থী আওয়ামী লীগ</u>

১. শেখ মুজিবুর রহমান

২. শেখ মুজিব কর্তৃক মনোনীত অপর একজন

<u>মস্কোপন্থী ন্যাপ</u>

১. খান আবদুল ওয়ালী খান

২. অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ

<u>পিডিএম পন্থী আওয়ামী লীগ</u>

১. নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ খান

২. আবদুস সালাম খান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এনডিএফ

১. নুরুল আমীন

২. হামিদুল হক চৌধুরী

কাউন্সিল মুসলিম লীগ

১. মমতাজ মোহাম্মদ দৌলতানা

২. খাজা খয়েরউদ্দিন

নেজামে ইসলামী

১. চৌধুরী মোহাম্মদ আলী

২. মওলবী ফরিদ আহমদ

জামায়াতে ইসলামী

১. মওলানা মওদুদী

২. অধ্যাপক গোলাম আযম

জমিয়তে ওলামায়ে

১. মুফতি মাহমুদ

২. পীর মোহসেনউদ্দিন দুদু মিয়া।

AMARBOI.COM

আজম খান, বিচারপতি এসএম মোরশেদ এবং এয়ার মার্শাল আসগর খান শেখ মুজিবের মুক্তির বিষয়টিকে আইয়ুবের গোলটেবিল বৈঠকে তাঁদের যোগদানের পূর্বশর্ত হিসেবে ঘোষণা করেন। এয়ার মার্শাল আসগর খান মুজিবকে প্যারোলে মুক্তিদানের বিষয়টিকে নাকচ করে দিয়ে বলেন :

'শেখ মুজিবকে যদি প্যারোলে মুক্তি দিয়ে বৈঠকে আনা হয় তাহা হইলে তাঁহার সম্মুখে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব স্বয়ং অস্বস্তিকর পরিস্থিতিতে পড়িবেন। আমরা ইহার সমর্থন করিতে পারি না— বা শেখ মুজিবও পারেন না।'

আইয়ুবের পক্ষ হইতে শেখ মুজিবকে প্যারোলে মুক্তি দেওয়ার যে চিন্তাভাবনা চলছিল— ৬ দফাপন্থী বা মুজিবপন্থী আওয়ামী লীগের মধ্যেও ঐরূপ মুক্তি লাভের বিষয়টি নিয়ে চিন্তাভাবনা চলে। সেই মুহূর্তে আসগর খানের ঐ বিবৃতিটি মুক্তির ব্যাপারে শেখ মুজিবকে অনমনীয় মনোভাব গ্রহণ করতে সাহায্য করে। এ ব্যাপারে বেগম মুজিবের ভূমিকাও ছিল বেশ সাহসী ও বিচক্ষণ। তিনি ট্রাইব্যুনালে গিয়ে তাঁর স্বামীকে কোনোরূপ শর্তযুক্ত মুক্তির প্রস্তাব গ্রহণ না করার জন্য পরামর্শ দেন। বেগম মুজিবের ঐরূপ অনমনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের পশ্চাতে সোহরওয়ার্দীকন্যা বেগম আখতার সোলায়মানেরও বিশেষ ভূমিকা ছিল। তিনি তখন পশ্চিম পাকিস্তান থেকে একটি গোপন মিশনে ঢাকায় এসেছিলেন এবং শেখ মুজিবকে যে শেষ পর্যন্ত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শর্তহীনভাবেই মুক্তি দেয়া হবে সে-ব্যাপারে তিনি বেগম মুজিবকে নিশ্চিত করেছিলেন। বেগম আখতার সোলায়মান কীভাবে তা করেছিলেন— এটা খুবই রহস্যজনক। তবে কি বেগম আখতার সোলায়মানের সঙ্গে সামরিক বাহিনীর কোনোরূপ সম্পর্ক ছিল?

পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা ও স্বরাষ্ট্র উজির ভাইস এডমিরাল এআর খান যখন 'বিশেষ মিশনে' ঢাকায় আসেন তখন তাঁকে প্রত্যাশার অতীত দৃঢ়চেতা ও অনমনীয় এক জননেতার মুখোমুখি হতে হয়।

ইতিমধ্যে রেডিও পাকিস্তান নৈশ সংবাদে মৌলবী ফরিদ আহমদের বরাত দিয়ে প্রচার করে দেয় যে, শেখ মুজিব প্যারোলে মুক্তির প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন। তিনি ডাকের সম্মেলনে আসছেন। ঐ সংবাদে জনগণের মধ্যে আনন্দ-উল্লাস ছড়িয়ে পড়ে। জনগণ যে কোনো শর্তেই মুজিবের মুক্তি চাচ্ছিল। তারা ভাবছিল, আগে তো তাদের প্রিয় নেতা কারাগারের বাইরে বেরিয়ে আসুক। তাদের ভাবনা ছিল, একবার যদি বাইরে বেরুতে পারেন তবে পরে শেখ মুজিবকে আর কারাগারের ভিতরে নেয়া যাবে না। ফলে প্যারোলে মুক্তির সংবাদ শুনেই হাজার হাজার মানুষ ঢাকার রাজপথে নেমে এসেছিলেন আনন্দ প্রকাশ করতে।

তখন আওয়ামী লীগের পক্ষে ঐ সংবাদের সত্যতা অস্বীকার করা হয়। বলা হয় যে খবরটি সম্পূর্ণ মিথ্যা। শেখ মুজিব প্যারোলে মুক্তি চান না। এটা সরকারের একটা কারসাজি। মৌলবী ফরিদ আহমদ এর জন্য দায়ী। তখন ঐ ভুয়া খবর প্রদানের জন্য ফরিদ আহমদ তীব্রভাবে নিন্দিত হতে থাকেন।

এদিকে দেশব্যাপী সরকারী ছুটির মধ্যে একুশে ফেব্রুয়ারি পালনের ধুম পড়ে যায়। ভাষা আন্দোলনের অমর শহীদদের পাশাপাশি গণ-অভ্যুত্থানের নবীন শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য ঢাকা নতুন সাজে সজ্জিত হয়। শহীদ মিনারের মাতৃরূপী মূল স্তম্ভের পেছনে লালশালু দিয়ে নির্মিত একটি বিরাটাকৃতির লাল সূর্য যুক্ত হয় এবং তার সঙ্গে যুক্ত হয় রবীন্দ্রোত্তর তিরিশের অন্যতম প্রধান কবি জীবনানন্দ দাশের আত্মপরিচয়সন্ধানী অমর পঙক্তি— 'বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি।'

সান্ধ্য আইন এবং ১৪৪ ধারা থেকে মুক্ত হওয়ার ফলে অনেকদিন পর ঢাকার মানুষ বহু আত্মদানের ভিতর দিয়ে অর্জিত মুক্ত পরিবেশের মধ্যে একুশের অনুষ্ঠানে নিজেদের যুক্ত করার সুযোগ লাভ করে। আগের রাত থেকেই রাজপথে নগ্নপদ মানুষের বন্যা নামে। 'আমার ভায়ের রক্তে রাঙানো' গানটি নতুন তাৎপর্য নিয়ে ঢাকার আকাশ ও বাতাস মথিত করে নারী ও পুরুষের সম্মিলিত কোরাস কণ্ঠে গীত হতে থাকে। ঐ গানের পাশাপাশি নজরুলের 'কারার ঐ লৌহ কপাট ভেঙে ফেল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করবে লোপাট', ডিএল রায়ের 'ধন ধান্য পুষ্পে ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা' এবং কবিগুরুর 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি'— বাউল সুরের ঐ গানটিও খুব বেশি করে গাওয়া হয়।

একুশের ভোরে বাংলা একাডেমীর বটতলায় বসে শহীদদের উদ্দেশ্যে নিবেদিত কবিতা পাঠের আসর। খুব সকাল থেকেই বাংলা একাডেমী প্রাঙ্গণ লোকে লোকারণ্য হয়ে যায়। ইতিপর্বে একাডেমীর একুশের কোনো অনুষ্ঠানেই এরূপ লোক সমাগত আর হয়নি। কবিতা পাঠের আসরে উপস্থিত হাজার হাজার কাব্যানুরাগীর ভিড় দেখে আমি ভীষণ উত্তেজিত বোধ করি। ভিড় শুধু কাব্যানুরাগীদের নয়— ভিড় ছিল কবিদেরও। কবিদের ভিড়ে বটতলায় নির্মিত ছোট্ট মঞ্চটি যেন উপচে পড়ে। সেখানে কবিতা পড়ার সুযোগ পাওয়াটাই খুব কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। আমার ভাগ্য ভালো, কবি সিকানদার আবু জাফর ছিলেন ঐ আসরের সভাপতি। তাঁর অনুগ্রহেই আমি একটি ছোট্ট কবিতা পাঠ করার অনুমতি পাই। কিন্তু মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে, যখন ছোট্ট একটি কবিতা (গণতন্ত্র) পাঠ করার পর বুঝতে পারি যে শ্রোতারা আমার আরও কবিতা শুনতে চাচ্ছে—এবং আমার মনটাও ঐরূপ ছোট্ট একটি কবিতা পাঠ করে তৃপ্ত হয়নি, তখন আমি চোখ বন্ধ করে আমার পকেট থেকে বার করি 'প্রেমাংশুর রক্ত চাই' নামক দীর্ঘ কবিতাটি এবং তা খুব দ্রুত পড়তে শুরু করে দিই, যাতে জাফর ভাই বুঝতে না পারেন যে আমি একাধিক কবিতা পড়ছি। আগের কবিতাটি খুব ছোট ছিল বলে এবং মঞ্চে কবিদের খুব চাপ থাকায় শুরুতে তিনিও বুঝতে পারেননি। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যে তিনি আঁচ করতে পারেন যে আমি তাঁর সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তি ভঙ্গ করেছি। দর্শক শ্রোতা যদিও আগ্রহের সঙ্গেই আমার কবিতাটি শ্রবণ করছিল, তবু আমি অনুভব করি যে, পেছন থেকে আমার পাঞ্জাবির খুঁট ধরে কে যেন টানছে। আমি বুঝতে পারি, যিনি টানছেন, তিনি আর কেউ নন— সভাপতি স্বয়ং। কিন্তু টের পেয়েও আমি টের না পাওয়ার ভান করে কবিতাটি পড়ে যেতে থাকি। কবিতাটি ছিল খুবই নাটকীয় আবেগে ভরা। ফলে আবৃত্তিকারের মনে এক ধরনের বিপ্লবী-মগ্নতার ভাব এসে যাওয়াটা মেকি বলে বিবেচিত হওয়ার মতো ছিল না। বিশেষ করে তিনি নিজেই যখন ঐ কবিতার রচয়িতা। পাঞ্জাবির মায়া আমি ত্যাগ করেছিলাম। ছিঁড়ে গেলে যাবে। এক পাঞ্জাবি গেলে আরেক পাঞ্জাবি পাওয়া যাবে— কিন্তু কবিতা শোনার এমন বিহ্বল বাঙালী শ্রোতার সমাবেশ সহজে পাওয়া যাবে না। তার জন্য চাই গণঅভ্যুত্থান। যা কোনো জাতির ইতিহাসে সচরাচর ঘটে না। এ পৃথিবী একবারই পায় তারে—।

আমাকে যে পেছন থেকে পাঞ্জাবির খুঁট ধরে টানা হচ্ছে, আমি তা সামনের শ্রোতাদের কাউকে বুঝতে দিইনি। আমি দর্শক শ্রোতার পূর্ণ নীরবতার মধ্যেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পুরো কবিতাটি পাঠ করতে সক্ষম হই। আমার উচ্চারণ এবং আবৃত্তির কৌশল কোনোটাই উন্নতমানের ছিল না। এর পরও দীর্ঘ কবিতাটি পাঠের পর শ্রোতারা যখন হাততালি দিয়ে আমাকে উৎসাহিত করে, তখন আমার খুবই আনন্দ হয়।

কবিতা পাঠ শেষ করে মঞ্চ থেকে নেমে যাবার সময় জাফর ভাই আমাকে ঠ্যাং ভেঙে দেবেন বলে শাসান। এটা ছিল জাফর ভাইয়ের খুব প্রিয় গালি। তাই আমার আনন্দভাবটা নষ্ট হয় না।

কবিতা পাঠের পর শুরু হয় আলোচনা অনুষ্ঠান। ঐ আলোচনা অনুষ্ঠান চলাকালে রবীন্দ্রসঙ্গীতের বিরুদ্ধে বিবৃতিদানের অভিযোগে বাংলা একাডেমীর অনুষ্ঠান থেকে তিন জন 'দালাল' সাহিত্যিককে ছাত্র-জনতা বের হয়ে যেতে বাধ্য করে। ঐদিনের অনুষ্ঠান থেকে বহিষ্কৃত তিনজন প্রবীণ-সাহিত্যিক ছিলেন :

১. ড. কাজী দীন মোহাম্মদ
২. প্রিন্সিপাল ইব্রাহিম খাঁ
৩. ড. আশরাফ সিদ্দিকী।

অধ্যাপক অজিতকুমার গুহ যখন জানান যে, ঐ তিনজন বুদ্ধিজীবী একাডেমীর পেছনের দরোজা দিয়ে পালিয়ে গেছেন—তখন ক্ষিপ্ত ছাত্র-জনতা শান্ত হয়।

ঐদিন সন্ধ্যায় প্রেসিডেন্ট আইয়ুব দেশবাসীর উদ্দেশে প্রদত্ত ভাষণে ঘোষণা করেন, তিনি আগামী প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন না। আইয়ুবের এই ঘোষণা চিরস্থায়ী আইয়ুব শাসনের ভয়ে শংকিত দেশবাসীর মনে স্বস্তিভাব ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করে।

একুশে ফেব্রুয়ারির বিকেলে পল্টনে ছিল ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের জনসভা। ছাত্রনেতা তোফায়েল আহমদ সভায় সভাপতিত্ব করেন। ছাত্রনেতাদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মাহবুবুল হক দোলন, আসাদের বড় ভাই ড. রশিদুজ্জামান, সাইফুদ্দিন আহমদ মানিক, আবদুর রউফ, মোস্তফা জামাল হায়দার এবং নাজিম কামরান চৌধুরী।

লক্ষ লক্ষ লোকের উপস্থিতিতে ঐ জনসভায় ঘোষণা করা হয় যে, অবিলম্বে শেখ মুজিবকে মুক্তি দেওয়া না হলে আগামী ৪ মার্চ প্রদেশব্যাপী হরতাল পালন করা হবে।

ঐদিন খুলনায় ছাত্র-জনতার হাতে জনৈক পুলিশের মৃত্যু হওয়ার পর পুলিশ একুশের মিছিলে নির্বিচারে গুলি বর্ষণ করে। তাতে ৮ জন প্রাণ হারায়। ক্ষিপ্ত ছাত্র-জনতা কেন্দ্রীয় যোগাযোগমন্ত্রী খান আবদুস সবুর এবং শিক্ষামন্ত্রী আমজাদ হোসেনের বাড়িতে অগ্নিসংযোগ করে। ১৬ ফেব্রুয়ারি ঢাকায় আমজাদ হোসেনের গাড়িটি জনতা পুড়িয়ে দিয়েছিল— এবার তাঁর বাড়িটিও যায়। তিনি গাড়ি-বাড়ি দুটোই হারান।

ঐদিন পুলিশের গুলিতে পাবনাতে দুই জন ছাত্র নিহত হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পূর্ব পাকিস্তানের মানুষ যখন একুশের অনুষ্ঠান এবং সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ নিয়ে ব্যস্ত, পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা উজির এডমিরাল এআর খান তখন তাঁর মিশন নিয়ে খুব ব্যস্ত থাকেন। ঐ মিশন ছিল শেখ মুজিবকে কৌশলে জামিন বা প্যারোলের টোপ গেলানো যায় কি-না, তা পরীক্ষা করা দেখা। তিনি শেখ মুজিবকে জামিনের আবেদনে স্বাক্ষর করতে রাজি করানোর জন্য এক সুচিন্তিত কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করেন। একদিকে চলে চাপ প্রয়োগ, অন্যদিকে তোয়াজ। পূর্ব পাকিস্তানের জিওসি মেজর জেনারেল মোজাফফরউদ্দিন এবং ট্রাইব্যুনালের দু'জন বিচারপতি এবং ষড়যন্ত্র মামলার আসামীদের সামরিক কাস্টডিয়ান মেজর হাসানকে নিয়ে পাকিস্তানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট গিয়ে হাজির হন। আইনবিদ ড. কামাল হোসেন এবং আমিরুল ইসলামকেও সঙ্গে নেয়া হয়। তাঁরা শেখ মুজিবের জন্য একটি জামিনের আবেদনপত্র তৈরি করেন। তারপর মুজিবঘনিষ্ঠ ঐ দুই নবীন আইনবিদকে সাথে নিয়ে মেজর হাসান শেখ মুজিবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তারা জামিনের জন্য প্রণীত দরখাস্তে সই করার জন্য শেখ মুজিবকে বলেন। ইতিমধ্যে সুকৌশলে শেখ মুজিবকে জানানো হয় যে, জামিনের এই সুযোগ গ্রহণ না করলে তাঁর ক্ষতির সম্ভাবনা আছে। কিন্তু জামিনের দরখাস্ত হাতে নিয়ে ড. কামাল হোসেন এবং আমিরুল ইসলামের উপস্থিতিতেও শেখ মুজিব বিভ্রান্ত না হয়ে ঐ আবেদন স্বাক্ষর করতে দৃঢ়ভাবে অস্বীকার করেন।

AMARBOI.COM

ফলে ভগ্নমনোরথ হয়ে তাদের ফিরে আসতে হয়। তখন ক্ষিপ্ত হয়ে জিওসি মোজাফফরউদ্দিন নিজে গিয়ে বন্দি শেখ মুজিবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। মুজিব তাঁকেও স্পষ্ট ভাষায় না বলে দেন। তখন জিওসি আইনজীবীদের সঙ্গে প্যারোলের বিষয়ে আলোচনা করেন। আইনজীবীরা তাঁকে প্যারোলের ব্যাপারে মুজিবের উষ্মার কথা বলেন।

জিওসি মেজর জেনারেল মোজাফফরউদ্দিন ড. কামাল হোসেনকে নিয়ে আবারও শেখ মুজিবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। আসলে তখন শেখ মুজিবের নার্ভের পরীক্ষা চলছিল। তুখোড় পাঞ্জাবী জেনারেল কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছিলেন না, এই মানুষটির সাহসের উৎস কোথায়? ঐ লোকটি এত অনমনীয় কেন? লোকটার কি ভয়ডর বলে কিছু নেই? লোভ লালসা বা মোহ বলে কিছু নেই? তাঁকে সিদ্ধান্ত থেকে টলাতে পারে, এমন মানুষ কি কেউ নেই এ জগতে?

জিওসি মোজাফফরউদ্দিন ব্যর্থ হয়ে ফিরে এসে প্রতিরক্ষামন্ত্রী ভাইস এডমিরাল এআর খানকে বললেন, স্যার হলো না। শেখ মুজিব কিছুতেই জামিনে বা প্যারোলে মুক্তি নিতে রাজি নন। এমন গোঁয়ার লোক আমি জীবনে দেখিনি। এখন আপনি চেষ্টা করে দেখেন, আমি ফেইল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্বরাষ্ট্র উজির পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের সঙ্গে ফোনে কথা বলেন। প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান তখন পাকিস্তানের তথ্যমন্ত্রী খাজা শাহাবুদ্দিনকে 'গুরুত্বপূর্ণ মিশনে' ঢাকায় প্রেরণ করেন। রাত নয়টার দিকে ঢাকায় অবস্থানরত স্বরাষ্ট্র উজির ভাইস এডমিরাল এআর খান খাজা শাহাবুদ্দিনকে পুরনো তেজগাঁও বিমানবন্দরে স্বাগত জানান।

তথ্যমন্ত্রী খাজা শাহাবুদ্দিন তাঁর পুড়িয়ে দেওয়া পরিবারের বাড়িতে না গিয়ে সরাসরি ক্যান্টনমেন্টে চলে যান। সেখানে তিনি শেখ মুজিবের সঙ্গে দেখা করেছিলেন কি না,—তা জানা যায়নি। মনে হয় তিনি শেখ মুজিবের সঙ্গে দেখা করেছিলেন। ঐ রাত্রে ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় গাড়ি চলাচল নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। পরে খাজা শাহাবুদ্দিন গভীর রাতে গভর্নর হাউসে যান। সেখানে গুরুত্বপূর্ণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। গভর্নর মোনায়েম খানকে জানানো হয় যে, কেন্দ্রীয় সরকার আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলাটি প্রত্যাহার করে শেখ মুজিবকে ছেড়ে দেবার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করেছেন। মোনায়েম খানকে বলা হয় যে, শেখ মুজিবকে যতদিন ক্ষমতায় আছেন ততদিন জেলের ভাত খাওয়াবেন বলে তিনি যে ঘোষণাটি দিয়েছিলেন, তার প্রতি সুবিচার করা আইয়ুবের পক্ষে আর সম্ভব হচ্ছে না।

বিলম্বে হলেও গভর্নর আবদুল মোনায়েম খান বুঝতে পারেন, এ জগতে কেউ কারও নয়। এ জগত নিশার স্বপন।

নিশি অবসানে আসে ২২ ফেব্রুয়ারি

তখন দুপুর। চতুর্দিকে চিকচিক করছে রোদ।

বেগম মুজিব স্বামীর জন্য রান্না করা দুপুরের খাবার নিয়ে ক্যান্টনমেন্টে যাবার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন। এমন সময় দীর্ঘ ৩৩ মাসের নির্জনতা ভঙ্গ করে বত্রিশ নম্বরের নিঃসঙ্গ বাড়িটি হঠাৎ আলোর ঝলকানিতে যেন ঘুম ভেঙে জেগে উঠল। একসঙ্গে বাড়িতে প্রবেশ করল কয়েকটি মিলিটারি জিপ। গাড়ির শব্দে বুক কেঁপে উঠল বেগম মুজিবের। আবার কোনো দুঃসংবাদ নয় তো! তিনি ছুটে এলেন রান্নাঘর থেকে বাইরে। তিনি নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারলেন না। তিনি দেখলেন, একটি মিলিটারি জিপ থেকে তাঁর প্রিয় গৃহপ্রাঙ্গণে অবতরণ করছেন মুক্তমানব শেখ মুজিব।

রেডিও পাকিস্তানের দুপুরের খবরে শেখ মুজিবের মুক্তির খবর প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঢাকা নগরী পরিণত হলো মিছিলের নগরীতে। আনন্দ মিছিল করে প্রিয় নেতার নামে জয়ধ্বনি দিতে দিতে চারদিক থেকে জনতা ছুটে এলো ধানমণ্ডির বত্রিশ নম্বরের বাড়িতে। আর লোকমুখে পিতার মুক্তির খবর পেয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রোকেয়া হল থেকে একটি বেবিটেক্সি নিয়ে ছুটে গেলেন মুজিবকন্যা শেখ হাসিনা। ৩৩

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাস আগে যার হাতের গরম চা খেয়ে মুজিব উঠেছিলেন পুলিশের জিপে। আজ কতদিন পর নিজ হাতে, নিজ বাড়িতে আবার এক চা তৈরি করে বাবাকে খাওয়াতে পারবেন তিনি। আজ তাঁর বড় আনন্দের দিন। খবরটা বিশ্বাস হচ্ছিল না বলে পথে যেতে যেতে তিনি জিজ্ঞেস করেন বেবিচালককে, আমার বাবা সত্যিই মুক্তি পেয়েছেন তো?

বাবা? তখন বেবিচালক বুঝতে পারে, সে যাকে বহন করছে তিনিই শেখ মুজিবের আদরের কন্যা, শেখ হাসিনা। আনন্দের দিনে প্রিয় নেতার কন্যাকে তার বেবিতে বহন করতে পারার জন্য তার খুব আনন্দ হয়। সে হাসতে হাসতে বলে, জ্বি, তিনি মুক্তি পেয়েছেন। একটু আগেই আমি তাঁকে তাঁর বাড়ির সামনে দূর থেকে দাঁড়িয়ে এক নজর দেখেছি।

হাসিনা বললেন, আমার খুব খুশি লাগছে। আজ আমার খুব আনন্দের দিন।

আরোহিণীর দিকে পেছন ফিরে তাকিয়ে বেবিচালক বলল—জ্বি আপা, আমরাও।

১৯৬৬ সালের ৮ মে'র গভীর রাতে ৬ দফা কর্মসূচী প্রদানের অভিযোগে দেশরক্ষা আইনে যে শেখ মুজিব গ্রেফতার হয়েছিলেন, আর ১৯৬৯-এর ২২ ফেব্রুয়ারি যে শেখ মুজিব মুক্তি লাভ করেন— নামে বিচারে এক হলেও, বাস্তবে ঐ দুই মুজিবের মধ্যে ছিল আসমান-জমিন ফারাক।

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলাটি ছিল তাঁর জন্য এক অগ্নি-পরীক্ষার মতো। সেই অগ্নি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে আকাশস্পর্শী জনপ্রিয়তা নিয়ে তিনি কারাগার থেকে খোলা হাওয়ায় বেরিয়ে আসেন। তাঁর মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তান পূর্ব বাংলায় পরিণত হয়। এই বাংলার মানুষ দীর্ঘদিন ধরে যে-নেতার সন্ধান করছিল, শেখ মুজিবের মধ্যে তারা তাদের সেই প্রত্যাশিত নেতার প্রতিচ্ছবি খুঁজে পায়। তারা তাদের সদ্যমুক্ত প্রিয় নেতাটিকে নিয়ে কী করবে, ঠিক বুঝে উঠতে পারে না। মুজিব আসবে, এইরূপ সংবাদ পেয়ে হাজার হাজার মানুষ পল্টন ময়দানে ছুটে যায়। কয়েক হাজার মানুষ তাঁকে এক নজর দেখার আশায় অপেক্ষা করতে থাকে শহীদ মিনারের চারপাশে। আগরতলা মামলা প্রত্যাহার করার ফলে ঐ মামলার অন্য অভিযুক্ত আসামীগণও শেখ মুজিবের সঙ্গে মুক্তি লাভ করেছিলেন। তাঁরা প্রত্যেকেই ছিলেন এক একজন বীর। তাঁরা পল্টন ময়দানের অঘোষিত জনসভায় উপস্থিত হয়ে লাখো জনতার অভিবাদন গ্রহণ করেন। পল্টনের জনতা তাঁদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ও ভালোবাসা নিবেদন করে। সবাই উন্মুখ হয়ে থাকে তাদের প্রিয় নেতার জন্য। কখন আসবেন তিনি? কখন আসবেন তিনি? অপেক্ষার প্রহর যেন কাটতে চায় না।

অনেক পরে তারা জানতে পারে যে, শারীরিকভাবে অসুস্থ বোধ করায় শেখ মুজিব বাসায় ফিরে গেছেন। একটা অতৃপ্তির মধ্যেই তখন পল্টন ময়দানের অনির্ধারিত জনসভাটি শেষ হয়। যারা শহীদ মিনারের কাছে অবস্থান নিয়েছিলেন, তারাই সৌভাগ্যবান বলে প্রমাণিত হয়।

শেখ মুজিবকে নিয়ে একটি ট্রাকমিছিল ধানমণ্ডি থেকে শহীদ মিনারের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়। জনতার ভিড় ঠেলে ঐ ট্রাকমিছিলটি দুই ঘণ্টায় শহীদ মিনারের কাছে এসে পৌঁছে। কিন্তু শহীদ মিনারের চারপাশে শেখ মুজিবকে এক নজর দেখার জন্য এত মানুষের ভিড় জমে যায় যে, তিনি ট্রাক থেকে নামতে পারেননি। তাঁর ফুলের স্তবকটি একজন ছাত্রনেতা বহন করে মিনারের বেদীতে দিয়ে আসে। তারপর জনতার উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য প্রদান করে তিনি আজিমপুর কবরস্থানে যান সার্জেন্ট জহুরুল হকসহ গণআন্দোলনে নিহত বীর শহীদানের কবর জিয়ারত করতে। সেখান থেকে তিনি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে গিয়ে চিকিৎসাধীন আহতদের খোঁজখবর নেন। তারপর শেরে বাংলা ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও খাজা নাজিমুদ্দিনের মাজারে ফাতেহা পাঠ করে সার্জেন্ট জহুরুল হকের বাসভবনে গিয়ে ঐ বীর শহীদের পরিবারের সঙ্গে কিছুটা সময় কাটান। তারপর শারীরিকভাবে অসুস্থ বোধ করায় তিনি আর পল্টন ময়দানের সমাবেশে যেতে পারেননি। বিকেল পাঁচটার দিকে তিনি ৩২ নম্বর ধানমণ্ডিতে ফিরে যান। তাঁর এখন একটু বিশ্রাম নেওয়া দরকার।

ঐদিনই বিকেলের দিকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে কিংবদন্তির নেতা কমরেড মণি সিংহ, অগ্নিকন্যা বেগম মতিয়া চৌধুরীসহ ৩৪ জন রাজনৈতিক বন্দি মুক্তি লাভ করেন। বলা যায় প্রেসিডেন্ট আইয়ুব জেলখানা খালি করে দেন। তাঁরাও বিপুল গণসংবর্ধনা লাভ করেন। বিশেষ করে মণি সিংহের প্রতি মানুষের আগ্রহ ছিল অপরিসীম। তিনি কমিউনিস্ট বলে জীবনের অধিকাংশ সময় বিভিন্নস্থানে আত্মগোপন করে কাটিয়েছেন। লোকে তাঁর নাম জানত, তাঁর সম্পর্কে অনেক বীরত্বব্যঞ্জক গল্পকথা লোকমুখে চালু ছিল। কিন্তু তাঁকে খুব কম লোকই চাক্ষুষ দেখেছে। ফলে কমরেড মণি সিংহের মুক্তিতেও জনগণ খুব খুশি হয়। সদ্য কারামুক্ত বিপ্লবী নেতা কমরেড মণি সিংহ এবং জনাব আতাউর রহমান খান ৩২ নম্বরে শেখ মুজিবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

তাদের বিদায় জানিয়ে শেখ মুজিব সাইদুল হাসানের বাসায় যান মাওলানা ভাসানীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। সেখানে তিনি ভাসানীর সঙ্গে এক রুদ্ধদ্বার বৈঠকে মিলিত হন। বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে শেখ মুজিব জানান যে, জনগণের অনুমতি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পেলে তিনি আইয়ুব খানের প্রস্তাবিত গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করবেন। মাওলানা ভাসানী জানান যে, তিনি গোলটেবিলে যাবেন না। একই আলোচনা থেকে দুই নেতা দুই রকমের সিদ্ধান্তে আসার পরও শেখ মুজিব এবং মাওলানা ভাসানী বলেন আলোচনা খুবই ফলপ্রসূ হয়েছে। ব্যাপারটা খুবই রহস্যময় বলে মনে হয়।

এই দুই নেতার কেউই তাঁদের জীবনীগ্রন্থ রচনা করে যাননি। ফলে তাঁদের মধ্যকার সম্পর্ক এবং তাঁদের গৃহীত রাজনৈতিক স্ট্র্যাটেজি সম্পর্কে জানবার কৌতূহল সৃষ্টি হলেও সে-কৌতূহল নিরসনের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য আমরা পাই না। ফলে অনেক ক্ষেত্রে এই দুই নেতার চিন্তাভাবনা ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের মধ্যে প্রচণ্ড বিরোধ থাকার পরও শেখ মুজিব কেন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবার সময় মাওলানা ভাসানীর সঙ্গে একান্তে মতামত বিনিময় করতেন, তা আমাদের কল্পনার বিষয় হয়েই থেকে যায়। এটা কি ছিল শুধুই একজন প্রবীণ নেতার প্রতি শ্রদ্ধা? না অন্য আরও কিছু?

ইতোমধ্যে পাকিস্তান থেকে পিপলস্ পার্টির নেতা জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টোও টেলিফোনে শেখ মুজিবের সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলেন।

শেখ মুজিবের মুক্তিলাভের পরদিন, ২৩ ফেব্রুয়ারি গভর্নর মোনায়েম খানের পত্রিকা 'পয়গাম' মুজিবের মুক্তির সংবাদটি এভাবে প্রকাশ করে :

AMARBOI.COM

> শেখ মুজিবের মুক্তিলাভ : ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার
>
> তথাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার এক নম্বর অভিযুক্ত ব্যক্তি আওয়ামী লীগ প্রধান ৪৯ বৎসর বয়স্ক শেখ মুজিবর রহমানকে ঢাকার লক্ষ লক্ষ উল্লাস-বিহ্বল জনসাধারণ গতকাল (শনিবার) বীরোচিত সংবর্ধনা প্রদান করেন। স্মরণকালে ইতিহাসে পাকিস্তানের কোনো জননেতা এমনি ধরনের সংবর্ধনায় সিক্ত হওয়ার বিরল সৌভাগ্য লাভ করেন নাই।

দৈনিক আজাদ পরিবেশিত সংবাদটি ছিল এ রকম :

> মুক্তমানব শেখ মুজিব
>
> খাইবার থেকে কক্সবাজার পর্যন্ত সচেতন মানুষের নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামের মুখে সরকার শেখ মুজিবকে মুক্ত করিতে বাধ্য হইয়াছে এবং সরকার তথাকথিত আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করে নিয়েছে।

লক্ষণীয় যে, উভয় পত্রিকার সংবাদেই আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আগে 'তথাকথিত' শব্দটি ব্যবহার করা হয়। একদিন আগেও যা ছিল খুবই অকল্পনীয় একটি ব্যাপার।

দীর্ঘদিন পর শেখ মুজিব নিজ গৃহে ঘুমাতে যান।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২২ তারিখের ঢাকা তার সদ্যমুক্ত প্রিয় নেতা শেখ মুজিবকে নিয়ে যখন অভাবনীয় আনন্দ-উল্লাসে ফেটে পড়ে তখন পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর মোনায়েম খান খুবই ভয় পেয়ে যান। প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য তাঁর পিণ্ডি যাওয়া পূর্ব থেকেই স্থির ছিল। কিন্তু সমস্যা দেখা দেয় কীভাবে তিনি গভর্নর হাউস থেকে বিমান বন্দরে যাবেন, তা নিয়ে। তখন তিনি সেনাবাহিনীর শরণাপন্ন হন। তাঁকে সেনাবাহিনীর রেসকিউ হেলিকপ্টারের সাহায্য নিতে হয়। প্রবল শক্তিধর গভর্নর জনতার চোখ ফাঁকি দিয়ে কীভাবে সেদিন পিণ্ডির বিমানে উঠেছিলেন, তার বিবরণ পাওয়া যায় পরদিনের ইত্তেফাক পত্রিকার পাতায়। খবরটি ছিল এ রকম :

গভর্নরের পিণ্ডি যাত্রা

পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর জনাব মোনায়েম খান গতকাল (শনিবার) রাওয়ালপিণ্ডি রওয়ানা হইয়া গিয়াছেন। গতকাল দ্বিপ্রহরে একটি সামরিক রেসকিউ (উদ্ধারকারী) হেলিকপ্টার গভর্নর ভবন হইতে তাঁহাকে তুলিয়া নেয় এবং তারপর ঢাকা বিমান বন্দরের পিএএফ হ্যাঙ্গারের নিকট অবতরণ করে। সেখান থেকে তিনি একটি মোটরযোগে বিমানের নিকট আগমন করেন। একই বিমানে দেশরক্ষা মন্ত্রী ভাইস এডমিরাল এ আর খানও রাওয়ালপিণ্ডি রওয়ানা হন। পিণ্ডিতে তিনি প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবেন।

[ইত্তেফাক : ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯]

একটি লোকরঞ্জক সংবাদ হিসেবে পাঠকমহলে খবরটি বিবেচিত হতে থাকে।

আজ ২৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯।

কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে ঢাকার সর্ববৃহৎ ময়দান রেসকোর্স মাঠে শেখ মুজিবের গণসংবর্ধনা। এর আগে পাকিস্তানের জনক কায়দে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ এই রেসকোর্স মাঠে ভাষণ দিয়েছিলেন। তারপর থেকে ঐ বিশাল মাঠটি শুধুমাত্র রেস খেলার মাঠ হিসেবেই ব্যবহৃত হয়ে আসছিল। কায়দে আজমের পর শেখ মুজিবুর রহমানকে কেন্দ্র করে এই মাঠটি আবার জনসভার মাঠে পরিণত হয়।

গতকাল ঢাকার মানুষ যখন তাদের প্রিয় নেতাকে এক নজর দেখার জন্য ছুটছিল, আমিও তাদের সঙ্গী হয়েছিলাম। কিন্তু পল্টন ময়দানে অবস্থান গ্রহণ করার কারণে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অন্য বীরদের দেখতে পেলেও শেখ মুজিবকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেখতে পাইনি। আগেই জানিয়েছি, মুজিবকন্যা শেখ হাসিনার সঙ্গে আমার তখন একটি স্নায়ুযুদ্ধ চলছিল। ফলে তাঁর সাহায্যে শেখ মুজিবের সান্নিধ্য-লাভের চিন্তাটা মাথায় এলেও শেষ পর্যন্ত তা কার্যকর করিনি। শেখ হাসিনার কাছে পরাভব মানতে আমার মন সায় দেয়নি। অথচ শেখ মুজিবের সান্নিধ্যলাভের গোপন ইচ্ছাও আমার মধ্যে পুরোমাত্রায় কাজ করছিল। তাই সারারাত একটা অতৃপ্তি ও উত্তেজনার মধ্যে কাটে। তবে কোথায় যে কাটে, তা মনে নেই, সম্ভবত ফ্রি স্কুল স্ট্রিটের আস্তানাতেই হবে। কোনো ছাত্রাবাসেও হতে পারে।

পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে সোজা শরীফের ক্যান্টিনে চলে যাই। সেখানে বাকিতে নাস্তা সেরে, কিছুক্ষণ বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা মেরে, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রিয়দর্শিনীদের মুখদর্শন করে রেসকোর্স মাঠের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে একটু আগে থেকেই গিয়ে হাজির হই।

আমার বন্ধু কবি আবুল হাসানের রাজনীতি সম্পর্কে এক ধরনের এলার্জি ছিল। আমাকে উৎসর্গ করা তাঁর অসভ্য দর্শন কবিতাটির কথা পাঠক এখানে স্মরণ করতে পারেন।

[দ্র : অসভ্য দর্শন : আবুল হাসান : রাজা যায় রাজা আসে]

আবুল হাসান রাজনীতিকে একটি অনতিক্রম্য অসভ্য দর্শন বলে মনে করত। আমি ঐ কাজে প্রবলভাবে লিপ্ত থাকতাম বলে সে আমাকে লক্ষ্য করেই ঐ কবিতাটি লিখেছিল। পরে ঐ কবিতাটি আমাকে সে উৎসর্গ করে। রাজনীতি নিয়ে আমার অতিরিক্ত মাতামাতি করাটাকে সে পছন্দ করত না। সে মনে করত এটা কবির কাজ নয়— এটা রাজনীতিকদের কাজ। এ নিয়ে তার সঙ্গে আমার খুব তর্ক হতো। নিজ বিশ্বাস থেকে সে-ও আমাকে টলাতে পারত না, আমিও তাকে টলাতে পারতাম না। তবে শেখ মুজিব সম্পর্কে তাঁর মনে এক ধরনের দুর্বলতা ছিল। তার কিছুটা এ কারণেও যে, আবুল হাসানের গ্রামের বাড়ি থেকে টুঙ্গিপাড়ার দূরত্ব পাঁচ/সাত মাইলের বেশি নয়। আমি ঐ তথ্যটি জেনে তাঁকে ইঙ্গিত করে বলি যে, একই স্থান থেকে একজন বড় কবি এবং একজন বড় নেতার আবির্ভাব হলো কীভাবে? তখন কিছুটা পুলকিত চিত্তেই আবুল হাসান বিষয়টি নিয়ে ভাবতে রাজি হয়। ফলে মিছিলে না পেলেও শেখ মুজিবের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে আবুল হাসানকে আমি সঙ্গী হিসেবে পাই।

ঐদিন আমরা দু'জন রেসকোর্স মাঠের ভিতরে অবস্থিত রমনা কালীবাড়ির পুকুর ঘাটে বসে গল্প করতে করতে একটি বিশাল জনশূন্য মাঠকে বানের জলের মতো ছুটে আসা মানুষের ধীরে ধীরে সয়লাব হয়ে যেতে দেখেছিলাম।

বাংলা একাডেমীর উল্টো দিকে, বর্তমান সোহরওয়ার্দী উদ্যানের ভিতরের বড় পুকুরটির পাড়ে অবস্থিত ছিল ঐ উচ্চশিরবিশিষ্ট প্রাচীন কালীবাড়িটি। ভাওয়ালের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রানী বিলাসমণি কালীবাড়ির সামনের ঐ পুকুরটি খনন করিয়াছিলেন বলে কথিত। প্রায় চার 'শ বছরের পুরনো রমনা কালীবাড়িটি একাত্তরে পাকিস্তানের তৎকালীন ধর্মান্ধ সৈনিকরা ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দেয়। অতঃপর স্বাধীন বাংলার কোনো নৃপতিই ঐ ঐতিহ্যবাহী কালীবাড়িটি আর পুনঃনির্মাণ করেননি। ফলে আজ তা এক বিস্মৃত ইতিহাস মাত্র। আগ্রহী পাঠক এ-সম্পর্কে জানবার জন্য ঢাকা বিশেষজ্ঞ ড. মুনতাসীর মামুনের বই পড়তে পারেন।

দুপুরের মধ্যেই রেসকোর্স মাঠটি ঢাকা ও ঢাকার নিকটবর্তী অঞ্চলসমূহ থেকে আসা মানুষে ভরে যায়। সুনির্মিত মঞ্চে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের তুখোড় ছাত্র নেতারা তাদের আসন গ্রহণ করেন। শত শত 'কল-রেডী' মাইক দিয়ে পুরো মাঠটিকে জড়িয়ে ফেলা হয়। শেখ মুজিবের মঞ্চে আগমনের আগ পর্যন্ত পাঁতি ছাত্রনেতারা মাইক ও মাঠ গরম করে রাখেন। বেলা দুটোর দিকে শেখ মুজিব তাঁর সহকর্মীদের নিয়ে রেসকোর্স ময়দানে আসেন। তাঁর আগমনে সারা মাঠ প্রচণ্ড উল্লাসে ফেটে পড়ে।

সংবর্ধনা সভার সভাপতির দায়িত্বে ছিলেন যথারীতি ডাকসু-ভিপি তুখোড় ছাত্রনেতা তোফায়েল আহমদ। সভার কাজ শুরু হয়। শেখ মুজিব ও লাখো জনতাকে উদ্দেশ্য করে একে একে ভাষণদান করেন :

১. খালেদ মোহাম্মদ আলী (ছাত্রলীগ)
২. সাইফুদ্দিন আহমদ মানিক (ছাত্র ইউনিয়ন, মতিয়া গ্রুপ)
৩. মোস্তাফা জামাল হায়দার (ছাত্র ইউনিয়ন, মেনন গ্রুপ)
৪. মাহবুবুল হক দোলন (এন এস এফ)
৫. মাহবুবউল্লাহ (ছাত্র ইউনিয়ন, মেনন গ্রুপ)।

ছাত্রনেতাদের বক্তৃতা শেষ হওয়ার পরই আসে বহু প্রত্যাশিত মুহূর্তটি। সমবেত দশ লক্ষাধিক জনতার উদ্দেশ্যে কথা বলবার জন্য জনতার প্রিয় নেতা শেখ মুজিব উঠে দাঁড়ান। উল্লসিত জনতার করতালি আর মুহুর্মুহু জয়ধ্বনিতে আকাশ বাতাস প্রকম্পিত হতে থাকে।

আমরা শেখ মুজিবের ভাষণ এর আগে কখনও শুনিনি। তাই খুব আগ্রহ নিয়ে আমরা তাঁর বক্তৃতার প্রতিটি শব্দ শ্রবণ করি। তিনি ছিলেন উদাত্ত কণ্ঠস্বরের অধিকারী, দৃঢ়চেতা, বিচক্ষণ এবং অসম্ভব এক রসিক মানুষ। তিনি শুরুতেই আমাদের জানিয়ে দেন যে, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলাটির প্রকৃত নাম হওয়া উচিত ইসলামাবাদ ষড়যন্ত্র মামলা। তিনি জনতাকে জানান যে, তাঁর ৬ দফা কর্মসূচী মোকাবিলা করতে ব্যর্থ হয়েই আইয়ুব খান সেকেন্ড ডিফেন্স হিসেবে এই মামলাটি দায়ের করেছিলেন। তিনি বলেন, তাঁকে ঐ ষড়যন্ত্র মামলা থেকে মুক্ত করার জন্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যাঁরা অকাতরে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন তাঁদের রক্তের সঙ্গে তিনি কখনই বিশ্বাসঘাতকতা করবেন না। বাংলার মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার স্বার্থে প্রয়োজনে সংগ্রাম করে তিনি আবারও কারাগারে যাবেন।

তিনি পশ্চিম পাকিস্তান থেকে এক ইউনিট বাতিল করার প্রস্তাব করেন এবং পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে পূর্বে মেনে নেওয়া সংখ্যাসাম্য রদ করে জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রাপ্তবয়স্কের প্রত্যক্ষ ভোটাধিকারের ভিত্তিতে জাতীয় পরিষদের নির্বাচন দাবি করেন।

ঐ সভায় তিনি দুটি রসিকতাপূর্ণ বক্তব্য প্রদান করেছিলেন। রসিকতা দুটোই ছিল গভর্নর মোনায়েম খান সাহেবকে নিয়ে।

গভর্নর মোনায়েম খানের পিণ্ডি গমনের খবরের প্রতি ইঙ্গিত করে তিনি প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানকে উদ্দেশ করে বলেন, জনাব প্রেসিডেন্ট, আপনি আপনার গভর্নরকে পিণ্ডিতেই রেখে দেবেন। এই রত্নটিকে আর ঢাকায় ফেরত পাঠানোর কোনো প্রয়োজন নেই। তাঁর মুখ দেখলেই আমার না-দেখা নমরুদের কথা মনে পড়ে।

এরপর রবীন্দ্রসঙ্গীত বিষয়ে তিনি তাঁর বক্তব্য হাজির করেন। তিনি কঠোর ভাষায় হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন, আমরা রেডিও-টিভিতে নিয়মিত রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনতে চাই। রবীন্দ্রনাথ আমাদের গর্ব। তিনি বিশ্বকবি। তাঁর গান আমাদের গান। এই গান কেউ বন্ধ করতে পারবে না। এর পরপরই মোনায়েম খানকে নিয়ে তিনি তাঁর দ্বিতীয় রসিকতাটি জনতার সামনে নিবেদন করেন। শেখ মুজিব বলেন, গভর্নর হাউসে একদল বুদ্ধিজীবীর সঙ্গে কথা বলার সময় গভর্নর মোনায়েম খান সাহেব নাকি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রধান প্রখ্যাত ভাষাবিদ প্রফেসর আবদুল হাই সাহেবকে বলেছেন, কী করেন সায়েব, রবীন্দ্র সঙ্গীত নিয়ে চিল্লাপাল্লা করেন, নিজেরা রবীন্দ্রসঙ্গীত লিখতে পারেন না?

গভর্নরের কথা শুনে তো হাই সাহেবের চোখ ছানাবড়া। লোকটা বলে কী! অনেক কষ্টে হাসি চেপে প্রফেসর আবদুল হাই সাহেব উত্তর দেন, তা তো পারি স্যার কিন্তু তাতে তো সমস্যা মিটবে না, বরং আরও বাড়বে। সেগুলো রবীন্দ্রসঙ্গীত হবে না, হবে হাই-সঙ্গীত।

আজ পর্যন্ত ঐ গল্পটি ঢাকার বুদ্ধিজীবী মহলে চালু আছে। কিন্তু ঐ গল্পটি যে শেখ মুজিবই আমাদের বলেছিলেন, তা অনেকের জানা নেই। অনেকেরই স্মরণে নেই।

জড়তামুক্ত উদাত্ত কণ্ঠে, গল্প বলার অননুকরণীয় ভঙ্গির কারণে লক্ষ লক্ষ জনতা সেদিন শেখ মুজিব পরিবেশিত গল্পের রসসুধা পানে আনন্দ লাভ করেছিল।

হাস্যরসময় গল্পটি পরিবেশন করার পরপরই তিনি তাঁর জীবনের একটি বিষাদময় অভিজ্ঞতার কথা জনতাকে জানান। ঘটনাটি এ রকম :

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তিনি তখন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দি। দিনটি ছিল ১৯৬৮ সালের ১৮ জানুয়ারি। কারাগারের একজন কর্মকর্তা গভীর রাতে অপ্রত্যাশিতভাবে তাঁর কাছে যান। ঐ জেল কর্মকর্তাটি তাঁর কাছে গিয়ে তাঁকে জানান যে, তিনি সরকারের বিশেষ নির্দেশে মুক্তি পেয়েছেন। এখনই তাঁকে জেল থেকে ছেড়ে দেওয়া হবে। তিনি যেন তৈরি হয়ে নেন।

শেখ মুজিব এর মধ্যে ষড়যন্ত্রের গন্ধ টের পান। তিনি বুঝতে পারেন যে, এটা আসলে মুক্তি নয়— অন্যকিছু। সরকার এত সহজে তাঁকে মুক্তি দিতেই পারে না। মুক্তি পাওয়ার মতো কোনো কাজ তিনি করেননি। আনন্দের পরিবর্তে তাঁর মনে দুশ্চিন্তা এসে ভিড় করে। কারারক্ষীরা তাঁকে কারাগারের বাইরে নিয়ে আসে। আর ঠিক তখনই আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার এক নম্বর আসামীরূপে একদল মিলিটারি তাঁকে কারাগারের গেট থেকে গ্রেফতার করে। মিলিটারিরা তাঁকে জিপে উঠতে বলে।

তিনি জিপে উঠবার আগে জেলখানার দিকে ফিরে তাকান। অব্যক্ত আবেগে ও অজানা আশংকায় তাঁর মন কেঁদে ওঠে। তিনি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। তিনি ভাবেন হয়তো এটিই হবে তাঁর শেষ-যাত্রা। তিনি তখন জেলখানার সামনের মাঠ থেকে একমুঠো মাটি এক খামচায় তুলে নিয়ে তাঁর কপালে মাখেন এবং বাংলার আদুরে মাটি কপালে মাখতে মাখতে আবৃত্তি করেন তাঁর প্রিয় গানের একটি প্রিয় চরণ :

'এই দেশেতে জন্ম আমার, যেন এই দেশেতেই মরি...।'

এমন এক নিপুণ-কথকের ভঙ্গিতে তিনি তাঁর জীবনের করুণ অভিজ্ঞতার কথা শ্রোতাদের শোনাচ্ছিলেন, মনে হচ্ছিল রেসকোর্সের নির্জন প্রান্তরে দাঁড়িয়ে একজন প্রেমিক প্রেমিকার কানেকানে তাঁর জীবনের করুণ অভিজ্ঞতার গল্প বলছে। পিনপতন নীরবতার মধ্যে শেখ মুজিব তাঁর জীবনের গল্প বলে যান। আমরা অবাক হয়ে তাঁর গল্প শুনি। শুনতে শুনতে আমরা তন্ময় হয়ে যাই। এক সময় যখন তিনি তাঁর বক্তব্য শেষ করেন, তখন আমরা বাস্তবে ফিরে আসি। বুঝতে পারি, এতক্ষণ তিনি আমাদের যাদুমন্ত্রে সম্মোহিত করে রেখেছিলেন। তখন দেশ ও দেশের মানুষের প্রতি তাঁর সুগভীর ভালোবাসা উপস্থিত জনতার মনের এমন একটা স্তরকে স্পর্শ করে, যেখানে তা প্রমাণের জন্য মূর্খ এবং বদ ছাড়া আর কেউ-ই অপেক্ষা করে না।

শেখ মুজিবের কথা শেষ হবার পর, সম্মোহিত সংবর্ধনা সভার সভাপতি তোফায়েল আহমদ উঠে মাইকের কাছে যান। তিনি তাঁর স্বভাবসুলভ তীক্ষ্ণ ও তির্যক কণ্ঠের সংক্ষিপ্ত ভাষণে জনতাকে জানান যে, এই ঐতিহাসিক জনসভার পক্ষ থেকে সভার আয়োজকরা অকৃত্রিম দেশপ্রেমের স্বীকৃতিস্বরূপ শেখ মুজিবকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। রেসকোর্সের দশ লক্ষাধিক জনতার মহাসমুদ্র একবাক্যে বিশ লক্ষাধিক হাতে করতালি দিয়ে তোফায়েল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আহমদের প্রস্তাবের প্রতি সমর্থন দান করে। শেখ মুজিবের জন্য নির্বাচিত উপাধিটি সকলেরই খুব পছন্দ হয়। তিনি যে ঐ গুণবাচক উপাধিটির যোগ্য, এ-ব্যাপারে কারো মনেই সন্দেহের লেশমাত্র থাকে না।

শেখ মুজিবকে বঙ্গবন্ধুতে উত্তীর্ণ করে একটি ঐতিহাসিক জনসভার সমাপ্তি ঘটে। তখন অস্তরাগ ছড়িয়ে দিনের সূর্য পশ্চিমের আকাশে ঢলে পড়েছে। উপমহাদেশের মানুষ, বিশেষ করে বাঙালিরা এমন জনসভার সঙ্গে ইতিপূর্বে পরিচিত ছিল না। মনে হয়, রেসকোর্সের বৃক্ষহীন বিশাল প্রান্তর যেন এতদিন এমন এক নেতাকে বরণ করার জন্যই অপেক্ষা করছিল। পরদিনের ইত্তেফাক পত্রিকায় শেখ মুজিবকে বঙ্গবন্ধু উপাধি প্রদানের যে-রিপোর্ট প্রকাশিত হয়, সেটি ছিল এ রকম :

> ঢাকার রেসকোর্স ময়দানের গণমহাসাগর গতকাল রবিবার পূর্ব বাংলার নির্যাতিত জননায়ক শেখ মুজিবুর রহমানকে বঙ্গবন্ধু উপাধিতে ভূষিত করে।
>
> কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক ও গতকালের সংবর্ধনা সভার সভাপতি জনাব তোফায়েল আহমদ শেখ মুজিবুর রহমানের বাংলা ও বাঙালির স্বার্থে অবিচল ও অবিরাম সংগ্রামের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া ঢাকার ইতিহাসের সর্বকালের সর্ববৃহৎ জনসমাবেশের উদ্দেশ্যে বলেন যে, আমরা বক্তৃতা-বিবৃতিতে শেখ মুজিবুর রহমানকে নানা বিশেষণে বিশেষিত করিবার প্রয়াস পাই। কিন্তু তাঁর রাজনৈতিক জীবন বিশ্লেষণ করিলে যে সত্যটি সবচাইতে ভাস্বর হইয়া ওঠে তা হইতেছে, তিনি মানবদরদী— বিশেষ করিয়া বাংলা ও বাঙালির দরদী, প্রকৃত বন্ধু। তাই আজকের এই ঐতিহাসিক জনসমুদ্রের পক্ষ হইতে আমরা তাঁহাকে বঙ্গবন্ধু উপাধিতে ভূষিত করিতে চাই। রেসকোর্সের জনতার মহাসমুদ্র তখন একবাক্যে এই প্রস্তাব সমর্থন করেন।

AMARBOI.COM

[ইত্তেফাক : ২৪ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯]

ইত্তেফাকের ঐ রিপোর্টটি কে লিখেছিলেন জানি না। তিনি আমাদের প্রশংসাভাজন এজন্য যে, ঐ দিনের রেসকোর্সের গণসমাবেশকে বর্ণনা করার জন্য অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে তিনি একটি নতুন শব্দ তৈরি করেছিলেন— গণমহাসাগর।

সেই থেকে শেখ মুজিবের নামের অগ্রভাগে অবিচ্ছেদ্যরূপে বঙ্গবন্ধু শব্দটি যুক্ত হয়ে যায়। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক, মহাত্মা গান্ধী বা কায়দে আজম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ— এঁদের কেউই তাঁদের নামের অগ্রভাগে যুক্ত গুণবাচক উপাধিসমূহ শেখ মুজিবের বঙ্গবন্ধু উপাধি পাওয়ার মতো এমন ঘটা করে পাননি। পৃথিবীর খুব অল্পসংখ্যক নেতাই এরূপ সম্মানসূচক উপাধির অধিকারী হয়েছেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এর পর থেকে এই ভূখণ্ডে জন্মগ্রহণকারীদের মধ্যে কায়দে আজমের অনুসারী এবং কিছুসংখ্যক প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনীতিক ছাড়া আর সবাই শেখ মুজিবুর রহমানকে বঙ্গবন্ধু বলে সম্বোধন করেন। এরূপ সম্বোধনের ভিতর দিয়ে তাঁরাই ১৯৬৯-এর ২৩ ফেব্রুয়ারির রেসকোর্স মাঠের দশ লক্ষাধিক গণমহাসাগরের রায়ের প্রতিই সম্মান দেখান। শেখ মুজিবকে বঙ্গবন্ধু বলাটা সাংবিধানিকভাবে বাধ্যতামূলক নয়, এই অজুহাতে যারা তাঁকে বঙ্গবন্ধু বলতে অনিচ্ছুক, ১৯৬৯ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারির গণকল্লোল মুখরিত রেসকোর্সের বিপরীত শিবিরেই তাদের অবস্থান ছিল।

তবে পাশাপাশি পারসোনালিটি ক্লাসের মনস্তত্ত্বটিকেও আমি বিবেচনায় রাখতে চাই। শেখ মুজিব যখন বঙ্গবন্ধু উপাধি পান তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র ৪৯ বছর। তাঁর সমকালীন প্রথম সারির নেতারা সবাই ছিলেন তাঁর চেয়ে বয়সে অনেক বড়। ঐরূপ অগ্রজতার সুযোগ নিয়ে পক্ষের লোক হয়েও অনেকেই তাঁকে শেখ মুজিব বলে সম্বোধন করতেন। কেউ কেউ সম্মান করে বলতেন শেখ সাহেব। বয়োজ্যেষ্ঠ নেতাদের মধ্যে কমরেড মণি সিংহকেই আমি 'বঙ্গবন্ধু' বলতে শুনেছি।

AMARBOI.COM

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করার পর মিলিটারিরা যখন শেখ মুজিবকে তাঁর মুক্তির খবর পৌঁছে দিতে যান তখন ঐ মামলার অন্য সকল অভিযুক্তকে মুক্তি দেয়া হচ্ছে কি-না, সে সম্পর্কে তিনি নিশ্চিত হতে চান। যখন তাঁকে জানানো হয় যে হ্যাঁ, ঐ মামলার অন্য অভিযুক্তরাও একইসঙ্গে মুক্তি পাচ্ছেন, তখন তিনি খুশি হন। তার আগ পর্যন্ত নয়। তার মনে হচ্ছে, আন্দোলনের চাপে ও গোলটেবিলের স্বার্থে অন্যদের বাদ দিয়ে শুধু তাঁকেই যদি সরকার মুক্তি দিত, তাহলে তিনি সেই মুক্তি গ্রহণ করতেন না। এ তথ্যটি প্রকাশিত হয় করাচীর ডন পত্রিকায়।

> 'Sheikh Mujibur Rahman was the last man to come out of custody, after their release, he waited to see all the accused come out of custody, and then followed them.'
>
> [Dawn : 24 Feb. 1969]

অর্থাৎ সকলের আগে আগে না গিয়ে তিনি সেদিন তাঁর সহযোদ্ধাদের পেছন থেকে অনুসরণ করেছিলেন। এটি একটি সামান্য ঘটনা—কিন্তু এই সামান্য ঘটনাটি তাঁর নেতৃত্বের অসামান্যতাকে প্রকাশ করে। এ রকমের কমরেডশিপ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের মধ্যে ছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২৩ ফেব্রুয়ারি তিনি 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত হন। ঐদিনই সন্ধ্যায় জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টো ঢাকায় আসেন। পূর্ব পাকিস্তানের ডাক-নেতারা আইয়ুবের সঙ্গে গোলটেবিল বৈঠকে বসার জন্য যখন পশ্চিম পাকিস্তানের পথে, তখন পিপলস পার্টির নেতা ভুট্টোর এই উল্টো ভ্রমণ কিছুটা কৌতূহলের সৃষ্টি করে। স্থির ছিল, শেখ মুজিব পরদিন লাহোর হয়ে রাওয়ালপিণ্ডি যাবেন। এমতাবস্থায় টাকা খরচ করে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দেখা করার জন্য ভুট্টোর ঢাকায় ছুটে-আসাটা মোটেই বুদ্ধিমানের কাজ ছিল না। মনে হয় বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে দেখা করাটাই জনাব ভুট্টোর ঢাকা আগমনের আসল উদ্দেশ্য নয়—তাঁর উদ্দেশ্য ছিল অন্য কিছু।

ঢাকায় এসে বঙ্গবন্ধুর অনুকরণে তিনিও শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন, আজিমপুর কবরস্থান ও তিন নেতার মাজার জিয়ারত করেন এবং ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আহতদের সঙ্গে দেখা করতে যান।

বঙ্গবন্ধুর মুক্তি লাভ এবং আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করার পর তাঁর গোলটেবিল বৈঠকে যোগদানের সম্ভাবনা আছে কি না, এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হলে জনাব ভুট্টো বলেন, গোলটেবিল বৈঠকে শেখ মুজিবের যোগদান নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ; কিন্তু তাহাই সবকিছু নয়।

এই 'তাহাই সবকিছু নয়' কথাটাই ছিল ভুট্টোর মনের কথা।

তিনি আইয়ুবের প্রস্তাবিত গোলটেবিল বৈঠক নিয়ে মাওলানা ভাসানী এবং বঙ্গবন্ধুর মতবিরোধ দূর করার জন্য স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে দূতিয়ালি শুরু করেন। এ ব্যাপারে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে তাঁর দুই দফা আলোচনাও অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু ভুট্টোর দূতিয়ালি কোনো সুফল বয়ে আনে না। মাওলানা ভাসানী এবং শেখ মুজিব তাদের স্ব-স্ব সিদ্ধান্তেই বহাল থাকেন।

অগত্যা পরদিন ২৪ ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে তিনিও লাহোরের পথে একই বিমানের যাত্রী হন। যদিও এক সপ্তাহের ভ্রমণে তিনি ঢাকায় এসেছিলেন। ভুট্টোর সফর বাঙ্গালীর মনে প্রত্যাশিত রেখাপাত না করেই সম্পন্ন হয়।

গণজাগরণের তোড়ে আইয়ুবের পতন যতই আসন্ন হয়ে উঠছিল, বিপরীতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের ভাবমূর্তি ততই উজ্জ্বল হচ্ছিল। পশ্চিম আকাশের অস্তমিত সূর্যটি যে এবার স্বাভাবিক নিয়মে পূর্বের আকাশেই উদিত হবে, আকাশে বাতাসে সে রকমের ইঙ্গিতই পাওয়া যাচ্ছিল।

তখন আইয়ুবের শূন্যস্থান দখল করার জন্য আইয়ুবের এক সময়ের বিশ্বস্ত পররাষ্ট্রমন্ত্রী, স্বঘোষিত সমাজতন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টো মরিয়া হয়ে ওঠেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাকিস্তানের রাজনীতিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের উত্থান তাঁকে বিচলিত করে। তিনি টুঙ্গিপাড়ার মতো এক অজপাড়া গাঁয়ে জন্মগ্রহণকারী এই নির্ভয়চিত্ত বাঙাল নেতাটিকে তাঁর রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী বলে ভাবতে বাধ্য হন।

১৯৬৮ সালের শেষ দিকে ভুট্টোকে গ্রেফতার করার পর পাকিস্তান সরকার তাঁর নামে একটি ট্রাক্টর কেলেঙ্কারি মামলা দায়ের করেছিল। ঐ মামলাটি ছিল নিছকই একটি দুর্নীতির মামলা। মামলাটি তেমন একটা প্রচার পায়নি। ছাত্র-জনতার আন্দোলনের মুখে ১২ ফেব্রুয়ারি খান আবদুল ওয়ালী খানের সঙ্গে ভুট্টোও মুক্তি পান। কিন্তু ভুট্টোর দল ডাক-এর সঙ্গে না থাকাতে তাঁর মুক্তির ব্যাপারটি গোলটেবিল বৈঠকের সঙ্গে শর্তযুক্ত হয়নি। পক্ষান্তরে শেখ মুজিবের নামে দায়ের করা আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার রাজনৈতিক গুরুত্ব, মর্যাদা এবং ঝুঁকি— সবই ছিল সমীহ আদায়কারী। তাই অত্যন্ত নাটকীয় চরিত্রের অধিকারী হওয়ার পরও ভুট্টোর মুক্তিতে এমন কোনো নাটকের সৃষ্টি হয়নি, যা তাঁর রাজনৈতিক গুরুত্ব বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে সহায়ক হতে পারে।

পক্ষান্তরে এক চরম নাটকীয় সংঘাতের উত্তুঙ্গ চূড়া স্পর্শ করে শেখ মুজিব যখন মুক্তি লাভ করেন, তখন শুধু পূর্ব পাকিস্তানে নয়, পশ্চিম পাকিস্তানেও আনন্দের বন্যা বয়ে যায়। সরকার এবং বিরোধী— উভয় শিবিরেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের মুক্তির প্রচণ্ড প্রভাব পড়ে। ভুট্টোর মুক্তি নিয়ে পূর্ব পাকিস্তানে তো নয়ই,—পশ্চিম পাকিস্তানেও আশাপ্রদ আনন্দ বা উচ্ছ্বাস প্রদর্শিত হয়নি। ভুট্টোকে আইয়ুবের মন্ত্রী হিসেবেই ঐ অঞ্চলের মানুষ বেশি চিনত; বিরোধী দলের নেতা হিসেবে নয়। ভুট্টোর পক্ষে এই অবমাননাকর বাস্তবতা মেনে নেয়াটা ছিল খুবই কঠিন। ফলে মুক্তি লাভের পর নিজের মুখেই ট্রাক্টর মামলার মতো একটি তুচ্ছ মামলা প্রত্যাহারের কথা তাঁকে প্রচার করতে দেখা যায়।

বাংলাদেশে একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে—কোথায় আগরতলা আর কোথায় উগারতলা। ভুট্টোর মুখে ট্রাক্টর মামলার কথা শুনে ঐ প্রবাদের বাস্তবতা নতুন করে উপলব্ধিতে আসে।

আইয়ুব খান ভুট্টোর নামে কোনো রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রে মামলা রুজু না করায় রাজনৈতিকভাবে ভুট্টো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন, এটা তিনি জানতেন। তাই ঐরূপ একটি মামলা যাতে আইয়ুব খান তাঁর নামেও দায়ের করেন, সেজন্য তিনি আইয়ুবকে প্ররোচনাও দিয়েছিলেন। সেই প্ররোচনাটি ছিল বিশেষভাবে পশ্চিম পাকিস্তানীদের জন্য স্পর্শকাতর বিষয়, কাশ্মীর-বিরোধ সম্পর্কিত। ১৯৬৫ সালে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সম্পাদিত তাসখন্দ শান্তি চুক্তিটি হতে পারত ঐরূপ একটি রাষ্ট্র বনাম ভুট্টো মামলার ভিত্তি। সে লক্ষ্যেই জনাব ভুট্টো জনসভায় আইয়ুবকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্রমাগত হুমকি দিচ্ছিলেন এই বলে যে, তিনি সোভিয়েট ইউনিয়নের মধ্যস্থতায় পাকিস্তানের চিরশত্রু ভারতের সঙ্গে তাসখন্দ চুক্তি সম্পাদনের সময়কার কিছু গোপন তথ্য ফাঁস করে দেবেন। এই কথা বলে তিনি জনগণের মনে কিছুটা কৌতূহলও সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন। ঐ চুক্তি নিয়ে বিতর্কে লিপ্ত হওয়ার জন্য তিনি তথ্যমন্ত্রী খাজা শাহাবুদ্দিনের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ ছোড়েন।

তথ্যমন্ত্রী খাজা শাহাবুদ্দিন তাসখন্দ চুক্তির সময় ভুট্টোর মতোই তাসখন্দে উপস্থিত ছিলেন। খাজা সাহেব ভুট্টোকে একজন 'উচ্চাভিলাষী মিথ্যাবাদী' বলে অভিহিত করেন এবং কথিত গোপন তথ্যসমূহ ফাঁস করার জন্য ভুট্টোর প্রতি আহ্বান জানান। তখন ভুট্টোকে আর ঐ বিষয়টি নিয়ে তৎপর হতে দেখা যায় না। পরে সুযোগ এবং প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও ভুট্টো তাঁর কথিত 'গোপন তথ্য' আর ফাঁস করেননি।

ঐরূপ চ্যালেঞ্জ প্রদান জনাব ভুট্টোর জন্য নতুন ছিল না। বঙ্গবন্ধু যখন ৬ দফা কর্মসূচী ঘোষণা করেছিলেন, আইয়ুবের বিশ্বস্ত মন্ত্রী হিসেবে তখনও তিনি ঐ কর্মসূচী নিয়ে প্রকাশ্য ময়দানে বিতর্কে লিপ্ত হওয়ার চ্যালেঞ্জ দিয়েছিলেন। শেখ মুজিবের ৬ দফাকে চ্যালেঞ্জ করেই ভুট্টো রাতারাতি পাঞ্জাবীদের নেতা বলে যান। পরে যখন প্রথমে জনাব তাজউদ্দীন ও পরে বঙ্গবন্ধু নিজেই ভুট্টোর সঙ্গে প্রকাশ্য বাহাসে লিপ্ত হওয়ার অভিপ্রায় ব্যক্ত করে বিতর্কের স্থান এবং তারিখ ঘোষণা করেন, তখন বিতর্ক-বিশারদ ভুট্টো সময়ের অভাবের কথা বলে রণে ভঙ্গ দেন। ভুট্টো বেশ নির্লজ্জও ছিলেন।

তাসখন্দ শান্তি চুক্তির প্রসঙ্গ তুলে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অনুরূপ একটি মামলাকে অত্যন্ত সুকৌশলে ইনভাইট করেছিলেন ভুট্টো। কিন্তু আইয়ুব খান আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার তিক্ত অভিজ্ঞতার কারণে ভুট্টোর ফাঁদে আর পা বাড়াননি। তা ছাড়া প্রেসিডেন্ট আইয়ুব ভুট্টোকে ষড়যন্ত্র মামলার যোগ্য নেতা ভাবতেন বলে মনে হয় না। যদি ভাবতেন, তা হলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের মতো জনপ্রিয়তা লাভের জন্য ভুট্টোকে আইয়ুবের পতন ও রাষ্ট্রক্ষমতায় জেনারেল ইয়াহিয়ার আগমন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হতো না। আইয়ুবের বর্তমানেই অন্ততপক্ষে 'পাঞ্জাববন্ধু' 'শেরে পাঞ্জাব' বা এ ধরনের কিছু একটা উপাধি তিনিও পেয়ে যেতে পারতেন। প্রেসিডেন্ট আইয়ুব তা হতে দিলেন না। এ কারণে আইয়ুব খানের ওপর জুলফিকার আলী ভুট্টোর রাগ ছিল খুবই উঁচুলয়ে বাঁধা। তৎকালীন পাকিস্তানের রাজনীতিতে তিনি হয়ে উঠেছিলেন বঙ্গবন্ধুর চেয়েও কয়েক ডিগ্রি বেশি আপোসহীন নেতা।

সিন্ধু, বেলুচ ও সীমান্ত প্রদেশবাসীর এক ইউনিট (One-unit dictatorship) বাতিলের জনপ্রিয় দাবি সমর্থন করে বঙ্গবন্ধু ভুট্টোকে রাজনৈতিকভাবে আরও বেকায়দায় ফেলে দিয়েছিলেন। ঐ এক ইউনিট বিষয়টি ছিল জনাব ভুট্টোর জন্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খুবই মারাত্মক। ভুট্টো না পারছিলেন তা গিলতে, না পারছিলেন উগলে দিতে। উগলে দিলে পাঞ্জাব ভিন্ন অন্য তিন প্রদেশ তার হাতছাড়া হয়, গিললে পাকিস্তানের রাজনৈতিক ক্ষমতার মৃগয়াভূমি পাঞ্জাব যায়। তাই ঐ এক ইউনিট প্রসঙ্গটি তিনি যতটা সম্ভব এড়িয়ে চলার চেষ্টা করছিলেন। আইয়ুবের সঙ্গে গোলটেবিলে বসলে বঙ্গবন্ধু কর্তৃক উত্থাপিত ৬ দফা এবং ছাত্রদের ১১ দফা সম্পর্কে তাঁকে মতামত দিতে হবে। ঐ দুই দফাতেই এক ইউনিট সম্পর্কে সুস্পষ্ট বক্তব্য রয়েছে। ওখানে তাঁর ধরা খেয়ে যাবার সম্ভাবনা খুবই প্রকট। তাই ভুট্টোর পক্ষে গোলটেবিলে না বসাটাই ছিল বুদ্ধিমানের কাজ।

কিন্তু গোলটেবিল যে জনমনে প্রবল আগ্রহ সৃষ্টি করেছিল—সে ব্যাপারে কোনোই সন্দেহ নেই। পূর্ব বাংলার নবীন নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের অংশগ্রহণের ফলে ঐ বৈঠকের গুরুত্ব চতুর্গুণ বৃদ্ধি পায়। ভুট্টো তখন কিছুটা একঘরে বোধ করতে থাকেন। তাঁর তখনকার অবস্থা ছিল গ্যালারিতে বসে মাদক সেবনের দায়ে অভিযুক্ত ম্যারাডোনার ফুটবল খেলা দেখার মতো। তিনি গোলটেবিল বৈঠক পণ্ড করার জন্য ব্যর্থ চেষ্টা চালাতে থাকেন।

ঐ গোলটেবিল তো ভুট্টোকে তেমন কিছু দেয়নি। অন্যদিকে ঐ গোলটেবিলই আগরতলা মামলার মতো একটি কঠিন রাষ্ট্রদ্রোহী মামলার কাঠগড়া থেকে শেখ মুজিবকে দেশনেতার আসনে বসিয়েছে। গোলটেবিল সম্পর্কে তাই খুব স্বাভাবিকভাবেই বঙ্গবন্ধু ও জনাব ভুট্টোর মূল্যায়ন কখনই এক হবার ছিল না।

এমত পরিস্থিতিতে গোলটেবিল বৈঠক-বিরোধী অভিযানের নিঃসঙ্গ নেতা ভুট্টো 'ব্যক্তিগতভাবে আমন্ত্রিত' পূর্ব বাংলার বর্ষীয়ান নেতা মাওলানা ভাসানীকে সঙ্গী হিসেবে পাওয়াতে তাঁর কিছুটা সাময়িক লাভ হয়। তিনি ভাবতে পারেন যে, তিনি একা নন। তাঁরা দু'জনে মিলে এক। দু'জনে দু'জনার।

তবে গোলটেবিল না যাবার কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ভাসানী একটু ভিন্ন কথা বলেন, যা ভুট্টোর মূল্যায়ন থেকে ভিন্ন। মাওলানা ভাসানী বলেন, যেহেতু তিনি একটি রাজনৈতিক দলের নেতা, সেহেতু তিনি জেনারেল আজম খান, এয়ার মার্শাল আসগর খান বা বিচারপতি মুর্শেদের মতো ব্যক্তিগত আমন্ত্রণে গোলটেবিলে যেতে পারেন না। দলগতভাবে আমন্ত্রণ পেলে তিনি নিজে না গেলেও তাঁর দলের দুজন প্রতিনিধিকে তিনি ঐ বৈঠকে পাঠাবেন।

এর পরও আইয়ুবের পক্ষ থেকে যখন দলগতভাবে মাওলানা ভাসানীকে আমন্ত্রণ জানানো হলো না, তখন গোলটেবিলবিরোধী আন্দোলনে ভুট্টোর সহযোগী হওয়াটা তাঁর জন্য কিছুটা বাধ্যতামূলকও হয়ে দাঁড়ায়।

২৪ তারিখ সকালের বিমানে বঙ্গবন্ধু পিণ্ডির উদ্দেশে ঢাকা ত্যাগ করেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাঁর সঙ্গীদের মধ্যে ছিলেন : তাজউদ্দীন আহমদ, মিজানুর রহমান চৌধুরী, আবদুল মালেক উকিল, আবদুল মান্নান, জহুর আহমদ চৌধুরী, এমএ আজিজ ও ময়েজউদ্দিন। সৈয়দ নজরুল ইসলাম, খন্দকার মোশতাক আহমদ, এএইচএম কামরুজ্জামান আগেই ডাক-এর বৈঠকে যোগদানের জন্য সেখানে গিয়েছিলেন।

গোলটেবিল বৈঠকে ৬ দফাপন্থী আওয়ামী লীগের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য বঙ্গবন্ধু সৈয়দ নজরুল ইসলামকে মনোনীত করেন।

ডাক-নেতাদের মোকাবিলা করার জন্য প্রেসিডেন্ট আইয়ুব তাঁর দলীয় নেতাদের নাম ঘোষণা করেন। তাঁরা ছিলেন :

স্বরাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষামন্ত্রী ভাইস এডমিরাল এআর খান, তথ্যমন্ত্রী খাজা শাহাবুদ্দিন, যোগাযোগমন্ত্রী খান এ সবুর খান, আইনমন্ত্রী এসএম জাফর, অর্থমন্ত্রী ড. এমএন হুদা, মুসলিম লীগ পার্লামেন্টারি দলের নেতা মোহাম্মদ কাশিম, ফখরুদ্দিন আহমদ, পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগের সম্পাদক হাশিমউদ্দিন প্রমুখ।

এখানে এসে মনে পড়ল, ফখরুদ্দিন আহমদ সাহেবের পুত্র বাচ্চু আনন্দমোহন কলেজে আমার সহপাঠী বন্ধু ছিল। বাচ্চু ছিল খুবই সহজ-সরল প্রকৃতির।

আইয়ুবের গোলটেবিল-সহযোগীদের তালিকা থেকে দেখা যায় যে, আইয়ুবের দলের পূর্ব পাকিস্তানী নেতাদেরই প্রাধান্য ছিল। আইয়ুব-শিবিরে বাঙালি নেতাদের এই প্রাধান্যদৃষ্টে মনে হয়, ডাকের অন্য নেতারা আইয়ুবের লক্ষ্য ছিল না। শেষ পর্যন্ত তাঁকে যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নামক মানুষটিকেই মোকাবিলা করতে হবে, তা তিনি খুব ভালোভাবেই জানতেন। আইয়ুব খান যে খুব বুদ্ধিমান ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন একজন রাষ্ট্রনেতা ছিলেন, এটা অস্বীকার করার উপায় নেই।

যে নেতার মুক্তির জন্য ডাক-এর নেতারা আইয়ুবের সঙ্গে দরকষাকষি করতে বাধ্য হয়, যার অবর্তমানে গোলটেবিলে বৈঠক বারবার পিছিয়ে যায়, রাষ্ট্রদ্রোহী মামলার বহু বিজ্ঞাপিত আসামী, বাংলার সেই অকুতোভয় নেতাকে এক নজর দেখার জন্য পশ্চিম পাকিস্তানের মানুষের মধ্যেও কী পরিমাণ কৌতূহল ও আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছিল, তার একটি চিত্র ঐ সময়ের ডন পত্রিকা থেকে উদ্ধৃত করা হলো।

> Rawalpindi 20 Feb, About 1,000 student & youngstars this after-noon gathered at the Chaklala airport to received Sheikgh Mujibur Rahman who was reportedly scheduled to travel from Dacca to Rawalpindi.
>
> Although it was known hours before the arrival of the plane that Mr. Rahman is not travelling to Rawalpindi by that flight, people still gathered there, as the PIA Fokker flight

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

> PK-622 landed at the airport. The crowd rushed to the aircraft & mobbed it. Latter they spotted a former W.P. Cheif Minister, Sarder Abdur Rashid and raised "Zindabad" Slogan for him.
>
> [Dawn- Feb. 21, 1969]

২০ তারিখের রাওয়ালপিণ্ডির চাকলালা বিমান বন্দরে প্রিয় নেতাকে না পেয়ে হতাশ হয়ে ফিরে গিয়েছিল এক সহস্র জনতা। এবার আর ভুলের সম্ভাবনা ছিল না। তাই ২৬ মার্চ বঙ্গবন্ধুকে কাছ থেকে দেখার জন্য লাহোর বিমান বন্দরে কয়েক সহস্র মানুষ এসে ভিড় জমায়। ঐ জনতার মধ্যে কিছুসংখ্যক ছিল পিপলস পার্টি নেতা ভুট্টোর সমর্থক। তাঁরা এসেছিল ভুট্টোকে স্বাগত জানাতে। কিন্তু অধিকাংশই এসেছিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে স্বাগত জানাতে। উন্মত্ত জনতার ভিড় রানওয়েতে উপচে পড়ে। বঙ্গবন্ধুকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য বিমান বন্দরে এসেছিলেন এয়ার মার্শাল আসগর খান, জেনারেল আজম খান এবং বিচারপতি এসএম মোর্শেদ। তাদের পক্ষে বিমানের কাছে যাওয়া কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। পুলিশের বেষ্টনী ভেদ করে জনতা ছুটে যায় বিমানের কাছে। তখন ভুট্টো ঐ জনতাকে শান্ত করার ব্যর্থ চেষ্টা করেন। জনতা ভুট্টোর কথায় কর্ণপাত করে না। তাঁরা ভুট্টোকে নয়, বঙ্গবন্ধুকেই দেখতে চান।

অগত্যা ভুট্টো বিদায় নিয়ে বিমান ত্যাগ করেন। ভুট্টোর সমর্থকরা তাঁকে নিয়ে মোটর শোভাযাত্রা করে শহরের দিকে অগ্রসর হয়। যাবার সময় তারা 'এক ইউনিট জিন্দাবাদ' এবং জেডএ ভুট্টো জিন্দাবাদ' ধ্বনি তোলে।

ভুট্টো চলে যাবার পর বঙ্গবন্ধু অনেক কষ্টে এবং বিপুল আনন্দে বিমান থেকে বাইরে বেরিয়ে আসেন, অপেক্ষমাণ তিন নেতা তাঁকে মাল্যভূষিত করেন। বঙ্গবন্ধুও ঐ তিন নেতাকে মাল্যভূষিত করেন। তাঁর মুক্তির দাবিতে আইয়ুব খানের ওপর চাপ অব্যাহত রাখার জন্য বঙ্গবন্ধু ঢাকা থেকেই ঐ তিন নেতার জন্য ফুলের মালা সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলেন। তারপর তাঁকে নিয়ে একটি বড় শোভাযাত্রা শহরের দিকে অগ্রসর হয়। পথের পাশে দাঁড়িয়ে লাহোরের লাখো মানুষ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে স্বাগত জানায়।

চাকলালা বিমান বন্দরের মতোই লাহোর বিমান বন্দরেও একটি খুব মজার ঘটনা ঘটে। ঘটনাটি এ রকম :

> 'An Awami League leader of Lahore Mr. Hamid Sarfaraz had a bad time as the people, taking him as Mr. Mujibur Rahman would not let him go till well after the East Pakistan Awami League Chief had left the airport.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

> When Sheikh Mujibur Rahman was still inside the plane. Mr. Hamid Sarfaraz, with great difficulty, appeared on the gangway and people took him as Sheikh Mujibur Rahman and raised slogans. He was also garlanded. While most of the people later realised that he was not SMR. a section of the people kept him sorrownded and raised slogans.

[Dawn : 25 Feb, 1969]

বেচারি হামিদ সরফরাজের জন্য দুঃখ হয়, মায়া হয় এবং প্রাণখোলা হাসিও পায়।

শুধু পূর্ব পাকিস্তানে নয়, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে ঘিরে কী নির্মল আনন্দহিল্লোলই না সৃষ্টি হয়েছিল সেদিন পশ্চিম পাকিস্তানেও।

তাই শেখ মুজিবকে মুক্তি দিয়ে রাওয়ালপিণ্ডিতে ফিরে গিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তথ্যমন্ত্রী খাজা শাহাবুদ্দিন বলেছিলেন :

> 'The people of East Pakistan were bubbling with joy over the withdrawal of the Conspiracy Case & release of Sheikh Mujibur Rahman.'

বঙ্গবন্ধুর মুক্তিতে এই আনন্দে টগবগ করার ভাবটা কমবেশি পশ্চিম পাকিস্তানেও ছিল। পাঞ্জাবের অবস্থাই যখন এমন — তখন সিন্ধু, বেলুচিস্তান বা উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের মানুষ খুব সঙ্গতকারণেই তাঁর মুক্তিতে ছিল অধিকতর আনন্দিত।

বঙ্গবন্ধু যখন রাওয়ালপিণ্ডিতে ডাকের বিভিন্ন নেতার সঙ্গে আলোচনা করে আসন্ন গোলটেবিল বৈঠকের আলোচ্যসূচীতে ৬ দফা ও ১১ দফা কর্মসূচীকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য তৎপর ছিলেন, তখন ঢাকায় (২৫ মার্চ বিকেল ৩ ঘটিকায়) সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে সদ্য-কারামুক্ত বিপ্লবী নেতা কমরেড মণি সিংহ এবং আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অন্য বীরদের পল্টন ময়দানে গণসংবর্ধনা জানানো হচ্ছিল। ঐ দিনের গণসংবর্ধনাতেও পল্টন ময়দানে লাখো মানুষের জমায়েত হয়।

যথারীতি ছাত্রনেতা তোফায়েল আহমদই ঐ সংবর্ধনা সভায় সভাপতিত্ব করেন এবং জনতার সামনে নেতাদের পরিচয় করিয়ে দেন। সেদিনের সংবর্ধনা সভার মূল আকর্ষণ ছিলেন কমরেড মণি সিংহ। মস্কোপন্থী ছাত্র ইউনিয়নের সাংস্কৃতিক কর্মীরা তাঁদের প্রিয় নেতা মণি সিংহের প্রতি শ্রদ্ধা ও অন্তরের আবেগ প্রকাশের জন্য ঐদিন পল্টনে একটি নয়নশোভা ও অর্থবহ মঞ্চ বানিয়েছিলেন।

ইতিপূর্বে কোনো ঘোষিত কমিউনিস্ট নেতাকে ঢাকার মানুষ জনসভায় বক্তৃতা দিতে দেখেনি বা শোনেনি। ঐ সংবর্ধনা সভাতেই ঢাকার বীর-জনতা কমরেড মণি সিংহকে প্রথম দেখে। নানাবিধ বিশেষণপূর্ণ ভাষায় তোফায়েলের পরিচিতি প্রদানের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পর কমরেড মণি সিংহ যখন বক্তৃতা দেবার জন্য উঠে দাঁড়ান তখন তাঁকে দেখে জনতা অবাক হয়। এই ছোট্টখাটো মানুষটিই যে মণি সিংহ তা তারা মানতে পারে না। তাদের কল্পলোকে মণি সিংহের চেহারাটি ছিল ভিন্ন। কিন্তু তাঁর দুর্বিনীত বিপ্লবী চেতনাসমৃদ্ধ ভাষণ শুনে ময়দানের জনতা মুগ্ধ হয়। কমরেড মণি সিংহ সংগ্রামী জনতার প্রতি বিপ্লবী অভিনন্দন ও লাল সালাম জানান। তিনি বর্তমান গণঅভ্যুত্থানকে ভিয়েতনামের বীর জনতার সংগ্রামের সঙ্গে তুলনা করে এই আন্দোলনকে দেশের কৃষক-শ্রমিককের মুক্তির আন্দোলনে পরিণত করার কথা বলেন। তিনি বলেন, সকল সংবর্ধনা বীর জনতার প্রাপ্য। কমরেড মণি সিংহ সমাজবাদী কর্মসূচীকে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ধারার সঙ্গে যুক্ত করার প্রয়োজনীয়তার কথা চমৎকারভাবে বুঝিয়ে বলেন। আমি ঐ সংবর্ধনা সভায় কমরেড মণি সিংহের বক্তৃতা শুনে মুগ্ধ হয়েছিলাম।

আগের দিন রাত্রে নিউ মার্কেটের নিকটবর্তী হকার্স মার্কেটের ছাদে তাঁকে মস্কোপন্থী ন্যাপের পক্ষ থেকে সংবর্ধনা জানানো হয়েছিল। সেখানেই আমি ঐ নেতাকে প্রথম দেখি। খুব ছোটবেলা থেকেই আমি তাঁর নাম শুনে আসছিলাম। নেত্রকোনা-ময়মনসিংহ এলাকায় তাঁর নামে বহু কিংবদন্তি প্রচলিত আছে। টংক বিদ্রোহ ও তেভাগা আন্দোলনের নেতা হিসেবে তিনি ছিলেন সকলের শ্রদ্ধার পাত্র। সুসঙ্গের মহারাজার ভাগনে হিসেবে তিনি মণিরাজ নামেই এলাকার মানুষের কাছে খ্যাত ছিলেন। এ দেশে কমিউনিস্ট আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছিল তাঁর হাতেই। মুসলিম লীগ সরকারের শত অত্যাচারের মুখেও তিনি সাম্প্রদায়িক চক্রান্তের কাছে মাথা নত করে ভারতের নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যাননি। এ দেশের গরিব কৃষক শ্রমিক ও মুসলমান কমরেডদের বাড়িতেই তিনি আত্মগোপন করে কাটিয়েছেন দিনের পর দিন, বছরের পর বছর এবং একটি ইসলামিক প্রজাতন্ত্রে নিষিদ্ধ কমিউনিস্ট পার্টিকে গোপনে সচল রাখার ক্ষেত্রে যুগান্তকারী ভূমিকা পালন করেছেন। কমিউনিজম ও সমাজতন্ত্রের মর্মবাণী প্রচার করেছেন। ধর্মীয় সমাজতন্ত্রের প্রবক্তা হওয়াটা জন্মগত ধর্মীয় সীমাবদ্ধতার কারণেই তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। ফলে দেশপ্রেমের অগ্নি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েও সকল যোগ্যতা থাকার পরও পাকিস্তানের রাজনীতিতে মাওলানা ভাসানী বা জুলফিকার আলী ভুট্টোর মতো প্রত্যক্ষভাবে নিয়ামক ভূমিকায় তিনি কখনও অংশগ্রহণ করতে পারেননি। কিন্তু পরোক্ষভাবে পাকিস্তানের রাজনীতিকে তিনি প্রভাবিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

তাই লাহোর যাবার পথে ঢাকা বিমান বন্দরে বঙ্গবন্ধুকে বলতে হয়েছে, কমিউনিস্ট পার্টিকে প্রকাশ্য রাজনীতি করার অধিকার দেয়া উচিত বলেই তিনি মনে করেন।

কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষে এইরূপ সাফাই গাওয়াটা বঙ্গবন্ধুর জন্য ঝুঁকিপূর্ণ ছিল। তবু তিনি বলেছিলেন এ জন্যই যে, তখন কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষে কথা না বলাটাও তাঁর জন্য কম ঝুঁকিপূর্ণ হতো না। ১৯৭১ সালে তা হাতেনাতেই প্রমাণিত হয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, আতাউর রহমান খানকে গোলটেবিলে বৈঠকে ডাকা উচিত, কিন্তু মণি সিংহকেও যে ডাকা উচিত—তা তিনি মুখ ফুটে বলেননি। তবে কমিউনিস্ট পার্টির প্রকাশ্য রাজনীতির অধিকারকে সমর্থন করার ভিতর দিয়ে প্রকারান্তরে তিনি এ কথাই বুঝিয়েছিলেন যে, গোলটেবিল বৈঠকে কমরেড মণি সিংহকেও ডাকা উচিত।

লাহোরে পশ্চিম পাকিস্তান আওয়ামী লীগের নেতা মালিক গোলাম জিলানীর বাসভবনে পাঁচ ঘন্টা অবস্থান করার পর সন্ধ্যায় তাঁর সহকর্মীদের নিয়ে বঙ্গবন্ধু রাওয়ালপিণ্ডির পথে লাহোর ত্যাগ করেন। রাত ৮-১০ মি. তাঁকে বহনকারী বিমান রাওয়ালপিণ্ডির চাকলালা বিমান বন্দরে অবতরণ করে। বিকেল থেকেই সেখানে কয়েক হাজার মানুষ তাঁকে এক নজর দেখার জন্য অপেক্ষা করছিল। এর আগে ২০ ফেব্রুয়ারি তারিখেও শেখ মুজিব আসবেন, এমন সংবাদ পেয়ে তারা ঐ বিমান বন্দরে এসে ভিড় করেছিল নেতাকে দেখতে। সেদিন তাদের আশা পূর্ণ হয়নি। কিন্তু আজ তিনি মুক্ত বিহঙ্গ। পিণ্ডির জনতা, তাই খুব আশা নিয়েই এসেছিল বাংলার নেতাকে আজ তারা দেখতে পাবে। কিন্তু না, আজও তাদের সেই আশা পূর্ণ হলো না। বঙ্গবন্ধু উল্লসিত জনতার চাপ এড়িয়ে ভিন্ন পথে বিমান বন্দর থেকে বের হয়ে দ্রুত শহরের ভিতরে ইস্ট পাকিস্তান হাউসে চলে যান।

বঙ্গবন্ধু কেন সেদিন চাকলালা বিমান বন্দরে তাঁকে দেখার জন্য সমবেত জনতার সঙ্গে এমন আচরণ করেছিলেন, তা রহস্যজনক। এর সম্ভাব্য কারণ হতে পারে নিম্নরূপ :

১. তিনি ছিলেন দীর্ঘ ভ্রমণ এবং বিভিন্ন নেতার সঙ্গে সারাদিনের আলাপ-আলোচনার কারণে খুবই ক্লান্ত। তাই তিনি উল্লসিত জনতার মুখোমুখি হতে চাননি। জনতার হাতে ধরা দেয়া মানেই যে বেশ কয়েক ঘন্টার ধকল, তা তিনি জানতেন।

২. লাহোর বিমান বন্দরে তিনি জুলফিকার আলী ভুট্টো এবং এক ইউনিটের নামে জিন্দাবাদ ধ্বনি শুনেছিলেন। পিণ্ডিতে ঐ ধ্বনি আরও জোরের সঙ্গে উত্থাপিত হওয়ার কথা। তিনি হয়তো ঐ ধ্বনিটি আর শুনতে চাননি।

৩. তিনি হয়তো তাঁকে ঘিরে কোনো ষড়যন্ত্রের আভাসও পেয়ে থাকতে পারেন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য চাকলালা বিমান বন্দরে এসেছিলেন ডাক কেন্দ্রীয় কমিটির আহ্বায়ক নওয়াবজাদা নসরুল্লাহ খান এবং

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাউন্সিল মুসলিম লীগের নেতা মিয়া মমতাজ দৌলতানা। তাঁরাও বিমান বন্দরে বঙ্গবন্ধুকে স্বাগত জানাবার সুযোগ পাননি।

রাওয়ালপিণ্ডির ইস্ট পাকিস্তান হাউসে তিনি ওঠেন। গভীর রাত পর্যন্ত তিনি দলীয় নেতাদের সঙ্গে বিভিন্ন জটিল রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে আলাপ-আলোচনা করেন। ঐ সভায় গোলটেবিল উত্থাপিতব্য ডাকের দাবির প্রশ্নে আওয়ামী লীগের দলীয় মনোভাব কী হবে, তা চূড়ান্ত করা হয়।

পরদিন ২৫ ফেব্রুয়ারি তিনি ডাকের কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠকে যোগদান করেন।

ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী জনাব জাফর, পূর্ব পাকিস্তানের অর্থমন্ত্রী ড. এমএন হুদা এবং কাউন্সিল মুসলিম লীগের নেতা সরদার শওকত হায়াত খান ভিন্ন ভিন্নভাবে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

পূর্বাহ্নে বঙ্গবন্ধু মস্কোপন্থী ন্যাপ নেতা খান আবদুল ওয়ালী খানের সঙ্গে এক রুদ্ধদ্বার বৈঠকে মিলিত হন। ঐ বৈঠকের সময় তাঁদের সঙ্গে অন্য কেউ উপস্থিত ছিলেন না। মনে হয় ঐ রুদ্ধদ্বার বৈঠকে গোলটেবিলে অভিন্ন স্ট্রাটেজি গ্রহণের ব্যাপারে বিচ্ছিন্নতার অভিযোগে অভিযুক্ত পাকিস্তানের দুই প্রান্তের দুই নেতা একমত হয়েছিলেন।

একপর্যায়ে তিনি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়া জামায়াতে ইসলামীর আমীর মওলানা আবুল আলা মওদুদীর সঙ্গে দেখা করতে যান। ঐ সাক্ষাৎকারটি বয়োবৃদ্ধ মওদুদীর কুশল সম্পর্কে খোঁজখবর নেয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল বলে প্রকাশ। সাক্ষাতের সময় তাজউদ্দীন আহমদ বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে ছিলেন।

AMARBOI.COM

রাজনৈতিক মতবিরোধ থাকার পরও বয়োবৃদ্ধ মৌলানাদের প্রতি বঙ্গবন্ধুর যে এক ধরনের 'ক্রনিক দুর্বলতা' ছিল, এই সাক্ষাৎকার থেকে ঐ ধারণা আরও স্পষ্ট হয়। জামায়াত-আমীর মওলানা মওদুদী এমনকিছু অসুস্থ হয়ে পড়েননি যে, তাঁকে দেখতে না যাওয়াটা অমানবিক বলে বিবেচিত হতে পারত। মওলানা মওদুদী পরদিন যথারীতি গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করেন। গোলটেবিল বৈঠকের যে সব ছবি পরদিনের পত্র-পত্রিকায় ছাপা হয়, সেখানে আবুল আলা মওদুদীকে বেশ সুস্থ এবং প্রফুল্ল দেখা যায়।

আজ ২৬ ফেব্রুয়ারি। বুধবার। গোলটেবিল বৈঠকের দিন।

পাকিস্তানের ইতিহাসের ক্রান্তিলগ্ন অতিক্রমের জন্য দিনটি ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দিনটি প্রকৃতির আশীর্বাদ দিয়ে শুরু হয়। সকালের দিকে বৃষ্টি নামে পিণ্ডিতে। সে বৃষ্টি বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় না। কিছুক্ষণের মধ্যেই রাওয়ালপিণ্ডির আকাশ পরিষ্কার হয়ে যায়। তাই বৃষ্টিস্নাত চমৎকার আবহাওয়ার মধ্যে অনুষ্ঠান কক্ষের দরোজা উন্মুক্ত করা হয়। বৈঠক শুরু হওয়ার কথা ছিল ১০.৩০ মি.। বিরোধী দলের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নেতারা একে একে সবাই এসে সভাকক্ষে পৌঁছে যান। কিন্তু আইয়ুব খানের দেখা নেই। তিনি এখনও আসছেন না কেন? যতই সময় যেতে থাকে সমবেত নেতৃবৃন্দ এবং সংবাদ সংগ্রহ করার জন্য উপস্থিত সাংবাদিকদের কৌতূহল ততই সন্দেহের রূপ নিতে শুরু করে— তবে কি শেষ-মুহূর্তে এমন কিছু ঘটল নাকি, যা পাকিস্তানের রাজনীতিতে ছিল খুবই স্বাভাবিক? এ রকম দুর্ভাবনা যখন অনেকের মনেই উঁকি দিচ্ছে, ঠিক তখনই প্রেসিডেন্টকে বহন করে তাঁর পাঁচ তারকাখচিত লিমুজিন গাড়িটি প্রেসিডেন্টের অতিথি ভবনে প্রবেশ করে। ঘড়িতে তখন ১০টা বেজে ৪৫ মিনিট।

তিনি দ্রুত সভাকক্ষে প্রবেশ করেন এবং নির্ধারিত আসরে বসার আগে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ একে একে সকল বিরোধী নেতার সঙ্গে করমর্দন ও কুশল বিনিময় করে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আইয়ুব খানের করমর্দনের দৃশ্যটি ছিল খুবই উপভোগ্য। ছবিতে দেখা যায়, করমর্দনরত অবস্থায় বঙ্গবন্ধু আইয়ুব খানের মুখের দিকে সরাসরি তাকিয়ে রয়েছেন—কিন্তু আইয়ুবের দৃষ্টি বঙ্গবন্ধুর মুখাবয়বকে অতিক্রম করে অন্য কোথাও স্থিরতার সন্ধান করছে। মনে হয় ঐ বিশেষ ঐতিহাসিক মুহূর্তটিতে আইয়ুব খান বঙ্গবন্ধুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, গোলটেবিলে বৈঠকে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার এক নম্বর আসামীকে স্বাগত জানাতে গিয়ে কিছুটা লজ্জিত বোধ করছিলেন। এটা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু রাজনীতি বলে কথা—এখানে লজ্জা-শরম বা মান-অভিমানের কোনো স্থান নেই। কাল যে রাষ্ট্রদ্রোহী আজ সে দেশপ্রেমিক। আজ যে দেশপ্রেমিক কাল সে রাষ্ট্রদ্রোহী। আজ সে সিংহাসনে, কাল তাঁর স্থান হয় কারাগারে। আজ যে কারাগারে কাল হয়ত দেখা যাবে সে-ই বীরদর্পে সিংহাসনে বসেছে। এখানে কালকের শত্রু আজকের বন্ধুতে পরিণত হয়। আজ যে বন্ধু কাল সে পরিণত হয় শত্রুতে। এখানে কোনো স্থির নিয়ম নেই। অনিয়মই এখানকার নিয়ম— অআইনই এখানকার আইন। এখানে নীতি মুখ্য নয়, মুখ্য হচ্ছে রাজ শব্দটি।

গোলটেবিলে প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের মুখোমুখি আসনটি নির্ধারিত ছিল ডাকের আহ্বায়ক নওয়াবজাদা নাসরুল্লাহ খানের জন্য। তাঁর বাম পাশে ছিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের আসন। ডানপাশে বসেন জাতীয় সংসদের বিরোধীদলীয় নেতা জনাব নূরুল আমীন। আইয়ুব খানের বামপাশে বসেছিলেন কেন্দ্রীয় যোগাযোগমন্ত্রী খান আবদুস সবুর খান এবং ডানপাশে বসেন আইয়ুবের মন্ত্রিসভার সবচেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ সদস্য তথ্যমন্ত্রী খাজা শাহাবুদ্দিন।

তার মানে হচ্ছে, গোলটেবিলের গুরুত্বপূর্ণ প্রথম সারির ছয় নেতার মধ্যে চারজনই ছিলেন বাঙ্গালী। ১০টা ৫৫ মি. কোরান তেলওয়াতের মাধ্যমে বহু প্রত্যাশিত গোলটেবিল বৈঠক শুরু হয়। কোরান তেলওয়াত করেন জামিয়তে উলেমায়ে দলের নেতা জনাব মুফতি মোহাম্মদ আহমদ। আগে থেকেই স্থির ছিল যে, আসন্ন ঈদের জন্য গোলটেবিল বৈঠক আগামী ১০ মার্চ পর্যন্ত মুলতবি হয়ে যাবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

 প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান জাতির এই ক্রান্তিলগ্নে দেশের বিরাজমান রাজনৈতিক সংকট নিরসনকল্পে তাঁর প্রস্তাবিত গোলটেবিল বৈঠকে অংশগ্রহণ করার জন্য বিরোধী দলের সম্মানিত নেতৃবৃন্দের প্রতি আন্তরিক অভিনন্দন ও মোবারকবাদ জ্ঞাপন করে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য দেন। তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, এই সম্মেলনের মাধ্যমে জাতি শাসনতান্ত্রিক জটিলতার আবর্ত থেকে উদ্ধার লাভ করবে।

তারপর ডাকের পক্ষ থেকে আহ্বায়ক নওয়াবজাদা নাসরুল্লাহ্ খান গোলটেবিল বৈঠক আহ্বান করা এবং দেশের বিরাজমান সংকট সমাধানের জন্য প্রেসিডেন্টের উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে বক্তব্য রাখেন। তিনি শান্তিবিঘ্নিত দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

এর পরপরই ১১-৩৫ মিনিটে ৪০ মিনিট স্থায়ী গোলটেবিল বৈঠকের উদ্বোধনী অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। স্থির হয়, ঈদের পর আগামী ১০ মার্চ সকাল ১০ ঘটিকায় গোলটেবিল বৈঠক আবার বসবে।

স্মরণীয় যে, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার শুনানিও ১০ মার্চ সকাল ১০টা পর্যন্ত মুলতবি ঘোষণা করা হয়েছিল। কিন্তু ঐ মুলতবি করা মামলার শুনানি আর অনুষ্ঠিত হয়নি। গণঅভ্যুত্থানের মুখে ঐ মামলা চিরদিনের জন্য ইতিহাসের আঁস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত হয়। অসমাপ্ত গোলটেবিলের ভাগ্যে কী আছে তা কে জানে?

 বৈঠক শেষ হওয়ার পর মিনিট দশেক সময় আইয়ুব খান বিরোধী দলের নেতাদের সঙ্গে খোশগল্পে ও চা-কফি পান করে কাটান। ১১-৪৫ মি. তিনি সভাস্থল ত্যাগ করেন।

ডাক নেতারা সিদ্ধান্ত নেন যে, আগামী ৬ মার্চ লাহোরে ডাকের কেন্দ্রীয় কমিটি বৈঠকে বসবে। ৬ মার্চের বৈঠকেই ১০ মার্চের গোলটেবিলে আইয়ুবের সামনে উপস্থাপনের জন্য ডাক-এর কেন্দ্রীয় কমিটি তার সর্বসম্মত দাবিনামা চূড়ান্ত করবে।

এদিকে জুলফিকার আলী ভুট্টোও বসে নেই। গোলটেবিলে বসতে না পারার ক্ষতি পুষিয়ে নেবার জন্য ঐদিনই পিণ্ডিতে পিপলস পার্টি রাওয়ালপিণ্ডিতে বিরাট জনসভার আয়োজন করে। ঐ জনসভা খুবই বিরাট আকার ধারণ করে। পিণ্ডির লক্ষ-জনতা তাদের প্রিয় নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টোকে বিপুলভাবে প্রাণঢালা সংবর্ধনা জানায়।

জনসভায় ভুট্টো প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের পদত্যাগ দাবি করেন এবং সামরিক বাহিনীর জেনারেলদের সাম্প্রতিক ভূমিকার প্রশংসা করেন। তিনি বলেন :

> '... military generals by refusing to promalgate Martial Law have earned the respect of the nation & proved that they are not the personal servants of <u>some one</u>.'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই 'some one' মানে আর কেউ নয়, আইয়ুব খান। ভুট্টোর বক্তব্য থেকে এই ধারণা হয় যে, আইয়ুব খান নিজেকে ক্ষমতায় রেখেই দেশে সামরিক শাসন জারি করার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু পাক সামরিক বাহিনীর জেনারেলেরা আইয়ুবের কথায় রাজি হননি। সুতরাং পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর জেনারেলরা যে কোনো ব্যক্তিবিশেষের (আইয়ুবের) চাকর নয়— তা এবার তাঁরা প্রমাণ করতে পেরেছেন। ভাবটা এমন যে, সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ইস্কান্দার মির্জাকে হটিয়ে ক্ষমতা দখলকারী জেনারেল আইয়ুবের মন্ত্রিসভায় তিনি দীর্ঘ আট বছর ধরে গোলামি করেননি।

গোলটেবিল বৈঠক শুরুর দিনটিতে পিণ্ডির জনসভায় দাঁড়িয়ে ভুট্টো কর্তৃক পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর জেনারেলদের প্রকাশ্য প্রশংসায় ঐ ঘটনাটি যে কতটা সুপরিকল্পিত ছিল, পাকিস্তানের পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ তা প্রমাণ করে। ব্যক্তিবিশেষের (আইয়ুবের) চাকররূপে না এসে দেশের প্রভু হয়ে যদি কেউ আসেন, তবে পাকিস্তানী জেনারেলদের স্বাগত জানাতে তাঁর আপত্তি থাকবে কিনা, তা তিনি স্পষ্ট করে সেদিন বলেননি।

এরপর ১ মার্চ ১৯৬৯ ভুট্টো বলেন, আইয়ুব খান যদি তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করে ঐ সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করেন, তাহলে তিনি আরটিসিতে যাবেন। আইয়ুবের অবর্তমানে আরটিসি কাকে নিয়ে কীভাবে, কেন এবং কোথায় হবে, সে সম্পর্কে তিনি স্পষ্ট করে কিছুই বলেন না।

ঢাকায় ফেরার পথে লাহোর বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ভুট্টো ও ভাসানীর গোলটেবিল বয়কট প্রসঙ্গে মন্তব্য করেন এভাবে :

> '...they (Bhutto & Bhasani) should not that is was an open conference without any rigid agenda and hence they could raise any question they liked. He failed to understand as to why they do not come to put forward their viewpoint. "Why are they afraid"-- Mujib asked'.

AMARBOI.COM

ভুট্টোর গোলটেবিল বৈঠক বর্জন করা সম্পর্কে সিন্ধুর জনপ্রিয় নেতা জিএম সাইদের বক্তব্য ছিল এ রকম :

> 'Mr Bhutto was avoiding his participation in the RTC as he was afraid of taking a firm stand on the One Unit issue.'

গোলটেবিল বৈঠক শুরুর দিন, ২৬ ফেব্রুয়ারি Pakistan Times পত্রিকায় একটি সম্পাদকীয় নিবন্ধ বেরোয় 'Who Speaks for W. Pakistan' এই শিরোনামে।

রাওয়ালপিণ্ডির সাংবাদিকরা ঐ সম্পাদকীয়র প্রতি বঙ্গবন্ধুর দৃষ্টি আকর্ষণ করলে বঙ্গবন্ধু বলেন, আমি পূর্ব-পশ্চিম নির্বিশেষে উভয় অঞ্চলের বঞ্চিত মানুষের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পক্ষেই কথা বলব। পশ্চিম পাকিস্তানের মানুষ আমার প্রতি যে গভীর ভালোবাসা প্রদর্শন করেছেন, তাতে আমি অভিভূত হয়েছি।

একই প্রশ্নের উত্তরে ভুট্টোর ভাষ্য ছিল এ রকম : 'আমিই পাকিস্তানীদের নির্ভরযোগ্য প্রতিনিধি।'

সন্ধ্যার দিকে বঙ্গবন্ধু ঢাকায় ফিরে আসেন। একই বিমানে তাঁর দলীয় সঙ্গী ছাড়াও এনডিএফ নেতা হামিদুল হক চৌধুরী এবং জামায়াত নেতা গোলাম আযমও ঢাকায় আসেন।

পরদিন (২৭ ফেব্রুয়ারি) রাতে তিনি গ্রামের বাড়িতে অবস্থানরত তাঁর অসুস্থ মায়ের সঙ্গে ঈদ পালন করার জন্য স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদের নিয়ে টুঙ্গিপাড়ায় যান। তেত্রিশ মাস একনাগাড়ে কারাগারে বন্দি থাকার কারণে বিগত ছয়-ছয়টি ঈদ-উৎসবের আনন্দ থেকে তিনি ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা বঞ্চিত থেকেছে। অনেক দিন পর শেখ-পরিবারে ফিরে এসেছে ঈদের আনন্দ। ঐ পরিবারের ঈদের আনন্দ ছড়িয়ে পড়েছে দেশের মানুষের মনে।

বঙ্গবন্ধু যখন গ্রামের বাড়িতে ছিলেন তখন পাকিস্তানের শিল্পপতি, করাচীর বিখ্যাত ডন পত্রিকার মালিক জনাব ইউসুফ হারুন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে ভাড়া করা হেলিকপ্টার নিয়ে টুঙ্গিপাড়ায় যান। প্রথমবার হেলিকপ্টারের চালক আকাশ থেকে টুঙ্গিপাড়ার মতো একটি অজপাড়া-গ্রামকে সনাক্ত করতে ব্যর্থ হয়ে ঢাকায় ফিরে আসে। পরে দ্বিতীয় প্রচেষ্টায় ঐ হেলিকপ্টার টুঙ্গিপাড়ায় অবতরণ করতে সমর্থ হয়। সম্ভবত ওটাই ছিল টুঙ্গিপাড়ার মাটিতে প্রথম কোনো আকাশযানের অবতরণ। জনাব ইউসুফ হারুনের টুঙ্গিপাড়া ভ্রমণ সাধারণভাবে জনমনে এবং বিশেষভাবে রাজনৈতিক মহলে কৌতূহলের সৃষ্টি করে। ঐ শিল্পপতির সঙ্গে আইয়ুবের সুসম্পর্কের কথা সবারই জানা ছিল। ইউসুফ হারুন অবশ্য সাংবাদিকদের বলেন যে, তিনি তাঁর বন্ধুর সঙ্গে ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময় করার জন্যই এসেছেন। তিনি শেখ মুজিবের জন্য আইয়ুবের কোনো বার্তা বহন করছেন না।

কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই ইউসুফ হারুনের টুঙ্গিপাড়া ভ্রমণ-রহস্যের অবসান ঘটে। আইয়ুব খান ১৫ মার্চ জনাব ইউসুফ হারুনকে পশ্চিম পাকিস্তানের গভর্নর নিয়োগ করেন। মনে হয় এই নতুন নিয়োগের ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে ইউসুফ হারুনের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ককে আইয়ুব খান রাজনৈতিক বিবেচনায় প্লাস পয়েন্ট হিসেবে নিয়েছিলেন।

বঙ্গবন্ধুর জনপ্রিয় দাবি অবশ্য ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল মুসার অপসারণ নয়, পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর জনাব মোনায়েম খানের দ্রুত অপসারণ।

কিছুদিন বিলম্বে তাঁর ঐ দাবি পূরণ হয়েছিল, ২১ মার্চ ১৯৬৯।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

টুঙ্গিপাড়ায় ক'দিন আত্মীয় পরিজন ও গ্রামবাসীদের সঙ্গে কাটিয়ে, ঈদ শেষে বঙ্গবন্ধু ৫ মার্চের সকালে ঢাকায় ফিরে আসেন। ঐদিনই তাঁর বত্রিশ নম্বর ধানমণ্ডির বাসায় আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটির জরুরী সভা বসে। ওয়ার্কিং কমিটি সর্বসম্মতিক্রমে আওয়ামী লীগের ৬ দফা ও ছাত্রদের ১১ দফার ভিত্তিতে ডাকের সঙ্গে আলোচনা করার জন্য বঙ্গবন্ধুকে দায়িত্ব প্রদান করে।

ডাকের লম্বা টেবিল (৬-৯ মার্চ) এবং আইয়ুবের গোলটেবিল (১০ মার্চ - মার্চ) অংশগ্রহণ করার জন্য বঙ্গবন্ধু প্রয়োজনীয় যুদ্ধ-প্রস্তুতি সম্পন্ন করেন। প্রকৃত প্রস্তাবে বঙ্গবন্ধুর জন্য DAC এবং RTC দুটোই ছিল যুদ্ধক্ষেত্রবিশেষ।

রাত পোহালেই তাঁর যুদ্ধযাত্রা শুরু হবে।
এখন তাঁর জন্য প্রয়োজন কিছুক্ষণের নিশ্চিত-নিরাপদ নিদ্রা।

AMARBOI.COM

৩ মার্চ ঢাকায় পাকিস্তান ও ইংল্যান্ডের মধ্যে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় ক্রিকেট টেস্ট ম্যাচটিও অমীমাংসিতভাবেই শেষ হয়। ঐ সিরিজের প্রথম টেস্টটি লাহোরে অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়েছিল। ঢাকায় আইয়ুববিরোধী আন্দোলনজনিত উত্তপ্ত পরিস্থিতির কারণে ম্যাচটি প্রথমে পরিত্যক্ত ঘোষিত হয়। ঢাকার ক্রিকেটভক্তরা ক্ষিপ্ত হয়ে তখন রাজপথে মিছিল করে এবং ব্যাট-প্যাড, স্টাম্প ও ক্রিকেট বল পুড়িয়ে ঐসব ক্রিকেটসামগ্রীর চিতাভস্ম পাকিস্তান ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড এবং ইংল্যান্ডের ক্রিকেট বোর্ড কর্তৃপক্ষ বরাবরে পাঠিয়ে দেয়। প্রবল গণদাবির মুখে পরে ঢাকায় দ্বিতীয় টেস্ট ম্যাচটি অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। ঐ টেস্ট ম্যাচটি ছিল চার দিনের। ওটাই ছিল (মাঠে বসে দেখা) কোনো আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ম্যাচে আমার প্রথম অংশগ্রহণ। এর আগে পর্যন্ত আমি ক্রিকেটকে দেখার খেলা বলে মনে ভাবতেই পারতাম না— আমার মনে হতো ক্রিকেট হচ্ছে শোনার খেলা। আমি রেডিও সেটে কান পেতেই ঐ খেলার ধারাবিবরণী শুনতে ভালোবাসতাম। মাঠে বসে খেলা দেখার পরও আমার ঐ ধারণার পরিবর্তন ঘটেনি।

আগরতলা মামলা প্রত্যাহার, বঙ্গবন্ধুর মুক্তি এবং শাসনতান্ত্রিক সংকট নিরসনকল্পে পিণ্ডিতে গোলটেবিল বৈঠক চলার ফলে ঢাকার রাজনৈতিক পরিস্থিতি শান্ত হয়ে এসেছিল বলেই ঐ খেলাটি কোনোরূপ গণ্ডগোল ছাড়াই সুসম্পন্ন হয়। এ ঘটনাটি প্রমাণ করে যে, ভাসানী ও ভুট্টোর বিরোধিতা সত্ত্বেও বিরোধী দলের নেতাদের সঙ্গে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আইয়ুবের গোলটেবিল বৈঠকটি ঢাকাবাসীর মনে স্বস্তি ও আস্থার মনোভাব সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিল।

শেখ মুজিবের মুক্তি ও ১১ দফা বাস্তবায়নের দাবিতে সংগ্রামী ছাত্রসমাজ ২১ ফেব্রুয়ারির পল্টনের জনসভা থেকে ৪ মার্চ দেশব্যাপী হরতালের ডাক দিয়েছিল। পরে শেখ মুজিবের মুক্তির দাবি পূরণ হলেও যেহেতু ছাত্রদের ১১ দফা দাবি আদায় হয়নি, তাই ছাত্ররা ঐ হরতালের আহ্বান বহাল রাখে এবং বঙ্গবন্ধুও ঐ হরতালের প্রতি সমর্থন দান করেন এ বিবেচনায় যে, তাতে ডাকের বৈঠকে ১১ দফা উত্থাপনের সুযোগ বাড়বে।

তাই ৪ মার্চ প্রদেশব্যাপী পূর্ণ হরতাল খুব ভালোভাবেই পালিত হয়।

৬ মার্চ সকালে বঙ্গবন্ধু তাঁর দলীয় নেতৃবৃন্দকে নিয়ে লাহোরের পথে ঢাকা ত্যাগ করেন।

লাহোরে পৌঁছে তিনি সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে বলেন, 'তিন হাজার দ্বীপ লইয়া ইন্দোনেশিয়া যদি ঐক্যবদ্ধ থাকিতে পারে, তাহা হইলে দুই অংশ লইয়া পাকিস্তান কেন ঐক্যবদ্ধ থাকিতে পারিবে না?'

AMARBOI.COM

ডাকের নেতাদের বহু প্রত্যাশিত বৈঠক শুরু হলে ৬-দফাপন্থী আওয়ামী লীগের নেতা সৈয়দ নজরুল ইসলাম এবং ন্যাপ (ওয়ালী) নেতা অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ যৌথভাবে সভায় প্রস্তাব রাখেন— ১। আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন, ২। জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্ব এবং ৩। এক ইউনিট বিলোপ; গোলটেবিল বৈঠকে আইয়ুবের সঙ্গে বসার আগে এই তিনটি বিষয়ে ডাকের নেতাদের মধ্যে মতৈক্য হওয়া দরকার।

কিন্তু মওলানা মওদুদী, চৌধুরী মোহাম্মদ আলী বা মিয়া মমতাজ দৌলতানা; এদের কেউই উত্থাপিত বিষয় তিনটিকে আলোচনার এজেন্ডাভুক্ত করতে কোনোরূপ আগ্রহ দেখান না; আবার আপত্তিও প্রকাশ করেন না। তারা এক ধরনের নিস্পৃহ-নীরবতা পালন করেন।

তখন অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ বলেন, যেহেতু এই তিনটি বিষয়ে কারোরই আপত্তি নেই (নীরবতা সম্মতির লক্ষণ) সেহেতু ধরে নেয়া যায় যে, এই দাবি তিনটির ব্যাপারে ডাকের নেতাদের কারোরই ভিন্নমত নেই।

তখনই মওলানা মওদুদী ত্বরিত উঠে দাঁড়ান। তিনি বুঝতে পারেন যে, মুখে কুলুপ এঁটে বসে থাকা আর ঠিক নয়। তিনি বলেন, আমরা যেসব বিষয়ে একমত নই, সেগুলোর ব্যাপারে আমরা অবশ্যই নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা চালিয়ে যাব। এভাবেই তিনি বুঝিয়ে দেন যে, ৬-দফাপন্থী আওয়ামী লীগ ও ওয়ালী ন্যাপ কর্তৃক উত্থাপিত তিন দফা ডাকের সর্বসম্মত দাবিরূপে গ্রাহ্য হতে পারে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এ প্রসঙ্গে জনাব নুরুল আমীন বলেন, 'RTC'-র বিবেচনার জন্য যদি ঐ তিন দফা দাবিকে 'agreed formula' হিসেবে গ্রহণ করে নেয়া হয়, তাতে কোনো ক্ষতি নেই।'

জনাব নুরুল আমীনের সমর্থনের সঙ্গে সঙ্গে অন্য পাঞ্জাবী নেতাদের মুখের কুলুপও খুলে যায়। জামায়াতে ইসলামী, নেজামে ইসলামী, পিডিএমপন্থী আওয়ামী লীগ এবং জামায়াতে ওলামায়ের নেতারা তখন এই অভিমত ব্যক্ত করেন যে, উত্থাপিত তিন দফা দাবির প্রশ্নে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভার নির্বাচিত সংসদের হাতে ছেড়ে দেয়া উচিত।

বঙ্গবন্ধু ব্রংকাইটিসে আক্রান্ত হওয়ার কারণে ডাকের সভায় যেতে পারেননি। তিনি ডাক্তারের পরামর্শে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। তারপরও ৬ দফা ও ১১ দফার প্রশ্নে সমর্থন লাভের আশায় অসুস্থ শরীর নিয়েই বঙ্গবন্ধু আবারও জামায়াত নেতা মওদুদীর সঙ্গে ৪০ মিনিট গোপন বৈঠকে মিলিত হন।

ঐ বৈঠকে অন্যদের মধ্যে মওদুদীর সঙ্গে মওলানা আবদুর রহিম এবং অধ্যাপক গোলাম আযম উপস্থিত ছিলেন।

৭ মার্চ লাহোরে অনুষ্ঠিত পাকিস্তান আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন।

AMARBOI.COM

আগেই ঘোষণা করা হয়েছিল যে, মাওলানা ভাসানী ৮ মার্চ তিন সপ্তাহব্যাপী পশ্চিম পাকিস্তান সফরে যাবেন। তিনি যে সেখানে গিয়ে ভুট্টোর সঙ্গে মিলে আইয়ুব ও RTC-র পাশাপাশি বঙ্গবন্ধুর বিরোধিতায়ও লিপ্ত হবেন, তা স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল।

তাই শেষ চেষ্টা হিসেবে ভাসানীর ঢাকা ত্যাগের আগের দিন, ৭ মার্চ ছাত্রনেতা তোফায়েল আহমদ সংবাদপত্রে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে বলেন :

"যদি তিনি (ভাসানী) সত্যি সত্যিই ১১ দফা সমর্থন করেন তাহলে তাঁর RTC-তে যাওয়া উচিত এবং শেখ মুজিবের সঙ্গে মিলে গোলটেবিলে ১১ দফা তোলা উচিত।"

কিন্তু মুজিবভক্ত ছাত্রনেতা তোফায়েল আহমদের ঐ বিবৃতি মাওলানা ভাসানী বিন্দুমাত্র বিবেচনায় না নিয়েই পরদিন লাহোর পৌছান এবং মূলত ভুট্টোর ভক্তরাই তাঁকে বিমান বন্দরে 'ভাসানী-ভুট্টো ভাই ভাই' ধ্বনি দিয়ে মহাসমারোহে বরণ করে।

ভাসানী গোলটেবিলের বিরুদ্ধে ৩০ মার্চ একটি জেনারেল কনভেনশন আহ্বান করার কথা ঘোষণা করেন এবং এ-ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পাশে বসা পার্টি সেক্রেটারি জনাব মোহাম্মদ তোয়াহাকে নির্দেশ দেন, যে কনভেনশনটি আর কখনই অনুষ্ঠিত হয়নি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ডাকের কর্মতৎপরতার প্রতি লক্ষ্য রাখার জন্য আইয়ুবের দূত (না-কি গোয়েন্দা?) হিসেবে আইনমন্ত্রী এসএম জাফর এবং তথ্যমন্ত্রী খাজা শাহাবুদ্দিন লাহোরেই অবস্থান করছিলেন। বিশেষ করে ডাকের পাঞ্জাবী নেতৃবৃন্দের ওপর তাদের প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণ ছিল। ফলে ৬ দফা ও ১১ দফাকে ডাকের দাবিরূপে গ্রাহ্য করানোর ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধু অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ, পিডিএম নেতা নূরুল আমীন ও ওয়ালী খান ছাড়া আর কোনো নেতাকেই রাজি করতে পারেননি। ডাকের ঐকমত্য শুধুমাত্র প্রাপ্ত বয়স্কের ভোটের ভিত্তিতে একটি পার্লামেন্টারি পদ্ধতির সরকার গঠনের প্রশ্নেই সীমাবদ্ধ থাকে। তবে ডাকের তিন দিনব্যাপী আলোচনার পর এও সিদ্ধান্ত হয় যে, ঐ সর্বসম্মত দুই সিদ্ধান্তের বাইরেও নেতৃবৃন্দ তাঁদের নিজ নিজ দাবি গোলটেবিল বৈঠকে প্রেসিডেন্টের সামনে উত্থাপনের সুযোগ পাবেন।

ঐ সুযোগটুকু ছিল বলেই বঙ্গবন্ধু সেদিন লাহোর থেকে পিণ্ডি পর্যন্ত গিয়েছিলেন, তা না হলে ডাকের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে তিনি ১০ মার্চেই ঢাকায় ফিরে আসতেন বলে মনে হয়।

১৯৬৬ সালে পাকিস্তানের বিরোধীদলীয় কনভেনশনেও তিনি তাঁর ৬ দফা কর্মসূচী উত্থাপন করার সুযোগ পাননি। সেবার তাঁকে একরূপ পালিয়ে ঢাকায় ফিরতে হয়েছিল। তিন বছর পর এবার তিনি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের গোলটেবিলে তাঁর ৬ দফা উত্থাপনের যে সুযোগ পেয়েছেন, সেই সুযোগ তাঁকে কাজে লাগাতেই হবে। এটাই বুদ্ধিমানের কাজ। ডাকের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার বিষয়টিকে তিনি তখনকার মতো পিছিয়ে দেন। আগে তো গোলটেবিল শেষ হোক। ডাক নামক ফোরামটিকে তিনি ঐ পর্যন্ত ব্যবহার করতে চান। বঙ্গবন্ধুর কণ্ঠে ধ্বনিত হয় কবিগুরুর বাণী: 'যদি তোর ডাক (এ ডাক DAC নয়) শুনে কেউ না আসে.... তবে একলা চল রে। একলা চল, একলা চল, একলা চল রে... ।'

AMARBOI.COM

১১ দিন বিরতির পর ১০ মার্চ আবারও নির্ধারিত সময়ের পনের মিনিট পর ১০ টা ১৫ মিনিটে গোলটেবিল বৈঠকের দ্বিতীয় অধিবেশন শুরু হয়। পূর্বের তুলনায় বৈঠকস্থলের চারপাশে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যসংখ্যা অনেক বৃদ্ধি করা হয়। এবার আর বিলম্ব নয়। বৈঠক শুরু হওয়ার ১ মিনিট আগেই আইয়ুব খান সভাকক্ষে প্রবেশ করেন। তিনি যথারীতি টেবিলের চারপাশে ঘুরে ঘুরে ডাকের নেতাদের (এয়ার মার্শাল আসগর খান ও বিচারপতি মুর্শেদসহ) সঙ্গে করমর্দন করেন।

মুফতি মাহমুদ আহমদের কোরান তেলওয়াত-পর্ব সম্পন্ন হলে পর প্রেসিডেন্ট আইয়ুব ডাকের কনভেনর নওয়াজবজাদা নাসরুল্লাহ খানকে আলোচনা শুরু করার আহ্বান জানান।

নওয়াবজাদা নাসরুল্লাহ ডাকের সর্বসম্মত দুই দফা দাবি গোলটেবিলে পেশ করেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নাসরুল্লাহ্ খানের বক্তব্য পেশের পরপরই আসে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের পালা। তিনি তাঁর স্বভাবসুলভ দৃপ্ত-ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়ান এবং তাঁর দলের ৬ দফা ও পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্রসমাজের ১১ দফা দাবিসম্বলিত একটি অত্যন্ত সুলিখিত ভাষণ পাঠ করেন।

তাঁর ভাষণ শেষ হলে কতিপয় স্পর্শকাতর দাবির বিষয়ে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব বঙ্গবন্ধুকে প্রশ্ন করেন। বঙ্গবন্ধু ঐসব প্রশ্নের ব্যাখ্যাদান করেন।

প্রয়োজনের তুলনায় সংখ্যায় কম হলেও বিচারপতি এসএম মুর্শেদ, অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ ও জনাব নুরুল আমীন বঙ্গবন্ধুর দাবির প্রতি সমর্থন দান করেন।

দুই ঘণ্টা চলার পর গোলটেবিল বৈঠক ১১ মার্চ সকাল ১০টা পর্যন্ত মুলতবি হয়ে যায়।

সন্ধ্যায় আইয়ুব খান তাঁর উজিরদের সঙ্গে এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে মিলিত হন এবং বিশেষ করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কর্তৃক উত্থাপিত দাবিগুলো নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা করেন।

১০ মার্চ যখন রাওয়ালপিণ্ডিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের গোলটেবিলে তাঁর দলের ৬ দফা ও পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্রদের ১১ দফা দাবি উত্থাপন করছিলেন, তখন লাহোরে মাওলানা ভাসানী ও জুলফিকার ভুট্টোর মধ্যে তিন দফা সহযোগিতার চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। পাকিস্তান পিপলস পার্টি এবং ভাসানী ন্যাপের মধ্যে সম্পাদিত ঐ সহযোগিতা চুক্তিটি ছিল নিম্নরূপ :

১. পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে পূর্ণ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা

২. পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় আদর্শের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, এবং

৩. সকল প্রকারের বিদেশী হস্তক্ষেপ অপসারণ, সকল প্রকার উপনিবেশবাদ, নয়া-উপনিবেশবাদের বিরোধিতা, সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা এবং সিয়াটো-সেন্টোসহ সকল সামরিক চুক্তি থেকে দেশকে বের করে আনার লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন শুরু করা।

AMARBOI.COM

লক্ষণীয় যে, বঙ্গবন্ধুর সহযাত্রী হিসেবে আইয়ুবের সঙ্গে গোলটেবিলে বসার প্রশ্নে পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্রসমাজের ১১ দফা দাবিকে পূর্বশর্ত হিসেবে আরোপ করলেও, ভুট্টোর সঙ্গে চুক্তি সম্পাদনার সময় মাওলানা ভাসানী পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্রদের ১১ দফার কথা মনে রাখেননি। তাই ভুট্টোর সঙ্গে সম্পাদিত তিন দফার মধ্যে ১১ দফার কোনো উল্লেখ নেই। এতে এই ধারণাই দৃঢ় হয় যে, বঙ্গবন্ধুর জনপ্রিয় ৬-দফাকে আড়াল করার কৌশল হিসেবেই মাওলানা ভাসানী ছাত্রদের ১১ দফাকে লুফে নিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধু যদি গোলটেবিলে ৬ দফার পাশাপাশি ছাত্রসমাজের ১১ দফা দাবি উত্থাপন না করতেন, তাহলে ভাসানীর পক্ষে ছাত্রদের বুঝানো সহজ হতো যে, শেখ মুজিব নন, তিনিই বিপ্লবী ছাত্রসমাজের গ্রহণযোগ্য নেতা। সেই লক্ষ্যেই তিনি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৯ মার্চ লাহোরে বলে রেখেছিলেন, 'যদি ১১ দফাকে গোলটেবিলে আলোচনার এজেন্ডাভুক্ত করা হয় তবে তিনি গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দিতে রাজি আছেন।'

১১ মার্চ সকালে আবারও ১৫ মিনিট বিলম্বে ১০ টা ১৫ মি. বৈঠক শুরু হয়। যথারীতি মুফতি মাহমুদ আহমদ তাঁর ধর্মীয় দায়িত্ব পালন করার পর আইয়ুবের আহ্বানে পর্যায়ক্রমে চৌধুরী মোহাম্মদ আলী, নূরুল আমীন, মিয়া মমতাজ দৌলতানা প্রমুখ নেতা বক্তৃতা করেন। সকাল এবং রাতে দুই কিস্তিতে মিলিয়ে ঐ দিনের বৈঠক চলে মোট সাড়ে পাঁচ ঘণ্টা।

ঐদিনই পেশোয়ারে ছাত্রদের এক ইউনিট সম্পর্কিত প্রশ্নবাণে বিদ্ধ-বিব্রত ভুট্টো হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন : 'সামরিক আইন জারি হইলে দেশ ছিন্নভিন্ন হইয়া যাইবে।... দ্বিধাবিভক্ত পাকিস্তানকে বলপ্রয়োগে ঐক্যবদ্ধ রাখা সম্ভব নয়।'

সামরিক আইন জারি হলে দেশের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবার আশংকার কথা এয়ার মার্শাল আসগর খানের কণ্ঠেও ধ্বনিত হয়। তবে আসগর খানের আশংকা নব্য সমাজতন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টোর মতো এতটা দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ছিল না। ভুট্টোর মুখ ফসকে ঐ রকমের একটি ত্রিকালদর্শী উক্তি ১৯৬৯ সালের ১১ মার্চ কীভাবে বেরিয়ে এসেছিল, আমরা জানি না। তবে তিনি যে তাঁর ঐ উপলব্ধির প্রতি সুবিচার করেননি, পাকিস্তানের পরবর্তী ইতিহাস তার সাক্ষ্য বহন করে।

দেশে সামরিক শাসন জারি হওয়ার সম্ভাবনা সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু একটি কথাও বলেননি। তিনি ঐ মুহূর্তে প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের পদত্যাগের দাবিও তোলেননি বা অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের দাবিকেও সমর্থন করেননি। বঙ্গবন্ধুর আশংকা ছিল, এর ফলে দেশে সামরিক শাসন জারির পথ প্রশস্ত হবে। বঙ্গবন্ধু চাচ্ছিলেন, যেহেতু আগামী নির্বাচন থেকে নিজেকে প্রত্যাহার করে নেয়ার ঘোষণা আইয়ুব দিয়েছেন, সেহেতু পুরনো আইয়ুবই নতুন কোনো আইয়ুবের চাইতে অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য হবেন। তাঁকে ক্ষমতায় রেখে যদি আগামী নির্বাচন হয়, তাহলেই ভালো। ভুট্টোর সঙ্গে আইয়ুবের ব্যক্তিগত বৈরিতার কারণেও আইয়ুব খান বঙ্গবন্ধুর কাছে অধিকতর গ্রহণযোগ্য ছিলেন। ফলে তখনকার পরিস্থিতিতে পাক-সিংহাসনে নতুন কোনো অচেনা অজানা সামরিক শাসককে স্বাগত জানানোটা ছিল বঙ্গবন্ধুর জন্য আত্মঘাতী সিদ্ধান্তের সামিল। পক্ষান্তরে, পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট পদে পুরনো আইয়ুবের অবস্থান দলত্যাগী ভুট্টোর জন্য সর্বদাই ছিল আতংকময়। ঐ আতংক থেকে নিজেকে মুক্ত করার জন্যই ভুট্টো আইয়ুবের প্রশ্নে প্রায় এক শ'ভাগ আপোসহীন ছিলেন। তাই ভুট্টোর ভাবনায় এ-চিন্তাই প্রাধান্য পায় যে, আপাতত পুরনো আইয়ুবের চেয়ে একজন 'নতুন আইয়ুব' তাঁর জন্য অধিকতর নিরাপদ। তাই আইয়ুব খানকে পাঁতি লেবুর মতো চিপতে-চিপতে ছোবড়ায় পরিণত করার চেষ্টা তিনি অব্যাহত রাখেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১২ মার্চের বৈঠকে হামিদুল হক চৌধুরী এবং পাঞ্জাবী নেতা সরদার শওকত হায়াত খান বক্তব্য রাখেন। শওকত হায়াত খান আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের পক্ষে কথা না বললেও পশ্চিম পাকিস্তান থেকে এক ইউনিট বাতিলের পক্ষে অভিমত রাখেন।

তবে ঐ দিনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল বঙ্গবন্ধুর প্রতি আইয়ুবের একটি প্রশ্ন। প্রেসিডেন্ট আইয়ুব বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে লক্ষ্য করে বলেন যে, তাঁর কাছে খবর এসেছে, প্রায় ৩০,০০০ (ত্রিশ হাজার) ভারতীয় সৈন্য পূর্ব পাকিস্তানে প্রবেশ করেছে।

এ রকম একটি স্পর্শকাতর তথ্য যে আইয়ুব খান বৈঠকে উত্থাপন করতে পারেন, তা ছিল উপস্থিত সকলের কল্পনার অতীত। মনে হয়, আইয়ুবের বিবেচনায় গভর্নর মোনায়েম খান বা জিওসি মেজর জেনারেল মোজাফফরউদ্দিন নয়, বঙ্গবন্ধুই ছিলেন তখন পূর্ব পাকিস্তানের অলিখিত অভিভাবক।

বঙ্গবন্ধু বুঝতে পারেন যে, এটি হচ্ছে এক নতুন ষড়যন্ত্র এবং তিনি এ-ও বুঝতে পারেন যে, আইয়ুব খানের মন থেকে আগরতলার ভূতটি এখনও পুরোপুরি নামেনি।

বঙ্গবন্ধু ঐ খবরটিকে একটি ডাঁহা মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেন।

তখন আইয়ুব খান কিছুটা স্বস্তি বোধ করেন। মনে হয় আইয়ুব খান সত্যি সত্যিই মনে করতেন যে, ভারত বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে অঙ্গীকারাবদ্ধ। বঙ্গবন্ধু যখনই চাইবেন তখনই ভারতীয় সৈন্য পূর্ব পাকিস্তানে ঢুকবে। অথবা এমনও হতে পারে যে, ভারতীয় সৈন্য প্রবেশের কথা বলে বঙ্গবন্ধুকে টোকা দিয়ে আইয়ুব খান বঙ্গবন্ধুর মনোভাব বুঝতে চেয়েছিলেন। অখণ্ড পাকিস্তানের হেফাজতকারী হিসেবে আইয়ুব খান যে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে কতটা উদ্বিগ্ন ছিলেন, এ ঘটনাটি তাই প্রমাণ করে। একই সঙ্গে এর মধ্য দিয়ে আইয়ুবের সামরিক এবং রাজনৈতিক দূরদর্শিতারও পরিচয় পাওয়া যায়।

ঐদিনই অক্সফোর্ডের ছাত্রনেতা পাকিস্তানী নাগরিক তারিক আলী চারদিনের সফরে ঢাকায় আসেন। ঢাকার ছাত্ররা তাঁকে উষ্ণ অভিনন্দন জানায়। ১৩ মার্চ সকালে তারিক আলীর সম্মানে ছাত্র ইউনিয়ন মেনন গ্রুপ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায় এক ছাত্রসভার আয়োজন করে। তারিক আলীর কণ্ঠেও ভুট্টো ও মাওলানা ভাসানীর সুর শোনা যায়।

১৩ মার্চ প্রাপ্ত বয়স্কের ভোটাধিকার এবং পার্লামেন্টারি পদ্ধতির সরকার গঠনের দুই দফা দাবি মেনে নিয়ে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব তাঁর গোলটেবিল বৈঠকের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

বৈঠকে উত্থাপিত অন্যান্য দাবি প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, আগামী নির্বাচনে নির্বাচিত জাতীয় সংসদই ঐ দাবিগুলো সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আইয়ুবের সিদ্ধান্তকে নওয়াবজাদা নাসরুল্লাহ খানসহ ডাকের নেতাদের প্রায় সবাই স্বাগত জানান। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব তাঁর ৬ দফা ও ১১ দফা সম্পর্কে আইয়ুবের নীরবতায় যতটা না ক্ষুব্ধ হন, তার চেয়ে বেশি ক্ষুব্ধ হন ডাকের পাঞ্জাবী ও পূর্ব পাকিস্তানের নামে-বাঙ্গালী নেতাদের বিরোধিতার কারণে। তাই বৈঠক ব্যর্থ হয়েছে, এমন কথা বঙ্গবন্ধু কখনও বলেননি। বৈঠক সফল হয়েছে কি না— এমন প্রশ্নের জবাবে বঙ্গবন্ধু সাংবাদিকদের বলেন : 'Meetting is always good.'

সাংবাদিক সম্মেলনে আইয়ুবের নিন্দা না করে, বঙ্গবন্ধু তাঁর উত্থাপিত আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন ও এক ইউনিট বাতিলের দাবি সমর্থন করতে ব্যর্থ হওয়ার জন্য ডাকের সঙ্গে তিনি তাঁর দলের সম্পর্কচ্ছেদের কথা ঘোষণা করেন।

সাংবাদিকরা প্রশ্ন করেন, আপনার ভাষায় যেহেতু এই বৈঠকে পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানের ছোট প্রদেশগুলোর দাবি অগ্রাহ্য করা হয়েছে, সেহেতু এই পরিস্থিতিতে পূর্ব পাকিস্তানে কি আন্দোলন অব্যাহত থাকবে?

বঙ্গবন্ধু বলেন, শুধু পূর্ব পাকিস্তানে কেন, সারা পাকিস্তানেই আন্দোলন চলবে।

বঙ্গবন্ধু ডাকের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণা দিবার পরপরই DAC-এর আহ্বায়ক নওয়াবজাদা নাসরুল্লাহ খান আট দলের সমন্বয়ে গঠিত DAC-এর আনুষ্ঠানিক বিলুপ্তি ঘোষণা করেন।

ডাকের নেতারা গোলটেবিলে উত্থাপিত বঙ্গবন্ধুর ৬ দফা ও ছাত্রদের ১১ দফা দাবি সমর্থন করতে ব্যর্থ হলেও এবং বঙ্গবন্ধুর সম্পর্কচ্ছেদের পটভূমিতে নাসরুল্লাহ খান কর্তৃক ডাকের বিলুপ্তি ঘোষিত হলেও; পাকিস্তানের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ইতিহাসে ডাকের ভূমিকা স্মরণীয় হয়ে থাকবে। পাকিস্তানের ইতিহাসের এক চরম দুঃসময়ে 'ডাক' সুসময়ের ইঙ্গিত দিয়েছিল। একনায়ক আইয়ুবের দুঃশাসনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো পাকিস্তানের জঙ্গী ছাত্র-জনতাকে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের পথে ডাক অভিভাবকত্ব দান করেছিল। অন্যথায় আইয়ুববিরোধী আন্দোলন মাঝপথে মুখথুবড়ে পড়তে পারত।

বঙ্গবন্ধু আইয়ুবের গোলটেবিল থেকে বলা যায় প্রায় শূন্য হাতেই ঢাকায় ফিরে আসেন। কিন্তু ঢাকার জনতা তাঁকে ঢাকা বিমান বন্দরে এমন বীরোচিত সংবর্ধনা প্রদান করে যে, তিনি আর শূন্য বোধ করেন না। অজস্র মৃত্যু দিয়ে লেখা বাঙালির প্রাণের দাবি আদায় করতে ব্যর্থ হলেও পিণ্ডির গোলটেবিলে বাংলার মানুষের ভালোবাসার সঙ্গে তিনি যে প্রতারণা করেননি, তিনি যে আপোস করেননি আত্মস্বার্থে— বাংলার মানুষ তা কৃতজ্ঞচিত্তে স্বীকার করে তাঁকে বুকে জড়িয়ে নেয়। তাঁকে প্রাণঢালা সংবর্ধনা প্রদান করা হয়।

তিনি বিমানবন্দরে সমবেত জনতাকে জানান যে, বিচারপতি মুর্শেদ, অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ ও নূরুল আমীন ছাড়া বাংলার আর কোনো নেতাই গোলটেবিলে তাঁকে সমর্থন করেননি। করলে আইয়ুব আমাদের দাবি মেনে নিতে বাধ্য হতেন।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাওলানা ভাসানী সম্পর্কে সংযত বাক ও শ্রদ্ধাশীল বঙ্গবন্ধু দীর্ঘদিনের নীরবতা ভঙ্গ করে ঐদিনই প্রথমবারের মতো বলেন, ...'মাওলানা ভাসানীর সাম্প্রতিক কথাবার্তার মধ্যে কোনো সামঞ্জস্য নাই। তাই তাঁর রাজনীতি ত্যাগ করা উচিত। তাঁর বয়স এখন ৮৬ হইয়াছে।'

বঙ্গবন্ধু কর্তৃক নামে-বাঙালী নেতাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপিত হওয়ার পরদিনই জামায়াতে ইসলামের দুইজন প্রাদেশিক নেতা বত্রিশ নম্বরে গিয়ে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাত করেন এবং আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন এবং জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্বের দাবিতে আওয়ামী লীগের সঙ্গে কাজ করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

দেশে সামরিক শাসন জারি হওয়ার সম্ভাবনার প্রশ্নে নওয়াবজাদা নাসরুল্লাহ খান মাওলানা ভাসানী এবং ভুট্টোকে অভিযুক্ত করে বলেন : "They are paving the way of Martial Law and revival of a dictatorsial regime."

২৩ মার্চ আদমজীনগরে স্মরণকালের বৃহত্তম এক জনসভায় দাঁড়িয়ে বঙ্গবন্ধু পাঞ্জাবী নেতাদের উদ্দেশ্য করে বলেন : 'গোলটেবিলে সমাধান না করিয়া আপনারা ভুল করিয়াছেন। পূর্ব বাংলার মানুষ এখন গুলি খাইতে শিখিয়াছে, আর দাবি নিয়া ছিনিমিনি খেলিবেন না। অবিলম্বে স্বায়ত্তশাসন দিয়া দেন, পশ্চিম পাকিস্তানের এক ইউনিট ভাঙিয়া দেন। তবেই দেশে শান্তি আসিবে।'

অবশেষে গভর্নর মোনায়েম খানের পতন ঘটে। ২৪ মার্চ গভর্নর মোনায়েম খানের সোনালি যুগের অবসান ঘটিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর হিসেবে অর্থনীতিবিদ ডক্টর এমএন হুদা শপথ গ্রহণ করেন। দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে বঙ্গবন্ধু নতুন গভর্নরের সঙ্গে সহযোগিতা করার প্রতিশ্রুতি দেন।

গোলটেবিলে পূর্ব পাকিস্তানের দাবি-দাওয়া মানা হয় নাই— বঙ্গবন্ধুর এই বক্তব্যের মৃদু প্রতিবাদ জানিয়ে পাকিস্তানের তথ্য উজির খাজা শাহাবুদ্দিন বাঙ্গালীদের উদ্দেশ্যে বলেন যে, আওয়ামী লীগের কোনো দাবিই প্রত্যাখ্যান করা হয় নাই। শুধু বলা হয়েছে যে, ঐ দাবির প্রশ্নে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে প্রাপ্ত বয়স্কের ভোটে নির্বাচিত আগামী জাতীয় সংসদ। আগামীর নির্বাচিত জাতীয় সংসদই দেশের জন্য নতুন সংবিধান প্রণয়ন করবে।

খাজা সাহেবের ঐ ব্যাখ্যার মধ্যে যুক্তি ছিল। কারণ তিনি জানতেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের দাবি না মানার জন্য আইয়ুব দায়ী নন, দায়ী ডাকের নেতারা। দায়ী পূর্ব পাকিস্তানের বাঙ্গালী নামধারী নেতারা। আগামী নির্বাচনে তাদের সকলকে পরাভূত করেই এর জবাব দিতে হবে। তাই বঙ্গবন্ধু খাজা সাহেবের যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যাকে সরল মনেই গ্রহণ করেন। তিনি তাঁর সংবিধান-বিশেষজ্ঞদের নিয়ে ৬ দফা ও ১১ দফা ভিত্তিতে একটি খসড়া শাসনতন্ত্র তৈরি করে তার বিবেচনার জন্য ২৪ মার্চ প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের কাছে পাঠান।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বঙ্গবন্ধুর ঐ খসড়া শাসনতন্ত্রটি যখন আইয়ুব খানের হাতে পৌঁছায়, আইয়ুব খান তখন জাতির উদ্দেশ্যে প্রদানের জন্য তাঁর জীবনের শেষ ভাষণ রচনায় ব্যস্ত।

ঐদিনই সন্ধ্যায় লৌহমানব বলে পরিচিত প্রেসিডেন্ট ফিল্ড মার্শাল মুহম্মদ আইয়ুব খান কিছুটা কান্নাবিজড়িত কণ্ঠেই পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর কাছে তাঁর সকল ক্ষমতা হস্তান্তরের সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেন।

১৯৫৮ সালে পাকিস্তানের রাজনৈতিক গগনে সুপুরুষ আইয়ুব খান পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় উদিত হয়েছিলেন, আমি তখন স্কুলের সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র। রাজনীতির কিছু না বুঝেই আমি তাঁকে স্বাগত জানিয়েছিলাম। আমার তখনকার প্রিয় পত্রিকা রঙধনু-তে তাঁর একটি চমৎকার ছবি প্রকাশিত হয়েছিল। ছবির ক্যাপশনে আইয়ুব খানকে তুলনা করা হয়েছিল ইসলামের ইতিহাসের গৌরববাহী শাসকদের সঙ্গে। সেই ছবি আমার মনে গভীর রেখাপাত করেছিল।

১১ বছর পর তাঁর বিদায়-ভাষণ শুনে আমার মনে আইয়ুবের জন্য এক ধরনের কষ্ট বোধ হয়। তাঁর পতনের জন্য নিজেকে দায়ীও মনে হয় কিছুটা। আহা, বেচারা আইয়ুব!

ঐ রাতে আমি যে ডাইরি লিখেছিলাম, তা ছিল ঐ রকম :

> '... বিষাক্ত সাপ তার সতেজ পৌরুষ নিয়ে যদি মাথা তুলে ফোঁস ফোঁস করে—আমার আপত্তি নেই; বরং তার পৌরুষ আমাকে আনন্দই দেয়। কিন্তু সে যদি আমার রক্ত মাংসের উর্বর জমিতে বিষের ফসল ফলাতে চায়—আমি তাকে যথাসাধ্য প্রতিহত করি। কিন্তু সেই দুর্দান্ত প্রতাপী সাপকে বেদিনীর কারাগারে যখন বন্দি ক্রীড়নক হতে দেখি, আমার দুঃখ লাগে। তার জন্য মায়া হয়।... ... আমি মৃত্যুপথযাত্রী গণশত্রুকেও প্রতিশোধী শূলে বিদ্ধ দেখতে ভয় পাই। তার জন্য আমার দুঃখ হয়।...

[মিথ্যে গল্প : সমকাল, ১৯৬৯]

২৫ মার্চ, পাকিস্তান সেনাবাহিনীর অধিনায়ক লে.জে. আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খানকে অপসারিত করে পাকিস্তানের রাষ্ট্রক্ষমতায় আসীন হন।

১৯৫৮ সালে ইস্কান্দার মির্জাকে ক্ষমতা থেকে হটানোর জন্য জন্য প্রণীত সামরিক অভ্যুত্থানে আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া ছিলেন আইয়ুবের এক বিশ্বস্ত তরুণ সহযোগী। দ্বিতীয় সামরিক অভ্যুত্থানে নেতৃত্ব দিতে তাঁকে দশ বছর অপেক্ষা করতে হয়। পূর্ব অভিজ্ঞতা থাকার কারণে ইয়াহিয়ার সামরিক অভ্যুত্থানটি ছিল দশ বছর আগের আইয়ুবের সামরিক অভ্যুত্থানের চাইতে অনেক বেশি কুশলী।

তাৎক্ষণিকভাবে সারাদেশে সামরিক শাসন জারি করা হয়। সংবিধান, জাতীয় ও প্রাদেশিক সংসদ বাতিল এবং সকল রাজনৈতিক তৎপরতা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জাতির উদ্দেশে প্রদত্ত মুখরক্ষাকারী এক ভাষণে আইয়ুব খান বলেছিলেন যে, প্রেসিডেন্ট হয়ে তিনি পাকিস্তানের ধ্বংসের অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করতে পারেন না, সে কারণেই তিনি সেনাবাহিনীর হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আইয়ুবের আবেগস্পর্শী ভাষণটি আসলে ছিল নবাগত সেনাশাসকদের ক্ষমতালিপ্সু রূপটিকে আড়াল করার ঢালবিশেষ। তাই পরদিন ২৬ মার্চ দ্বিপ্রহরে জাতির উদ্দেশে৭৮৭৭ নবাগত 'নতুন আইয়ুবের' ভাষণ থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেবার জন্য আইয়ুব খান তাঁকে ডেকে আনেননি, জাতির কাছে সামরিক শাসনের যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করে বিদায় ভাষণ দেবার জন্য লে. জেনারেল আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খানই প্রেসিডেন্ট ফিল্ড মার্শাল মুহম্মদ আইয়ুব খানকে রেডিও পাকিস্তানের মাইক্রোফোনের সামনে ধরে এনে বসিয়ে দিয়েছিলেন।

আইয়ুব খানকে ক্ষমতাচ্যুত করে দেশে সামরিক শাসন জারি করার প্রস্তুতিপর্বটি আরও আগেই শুরু হয়েছিল। তিনি আর নির্বাচনে দাঁড়াবেন না,—এই প্রতিশ্রুতিপূর্ণ ২১ ফেব্রুয়ারির ভাষণ রচনায় পাকিস্তান সেনাবাহিনীর তিন প্রধানের হস্তক্ষেপ ছিল বলে করাচীর ডন পত্রিকায় একটি খবর বেরোয়। খবরটি এ রকম :

> 'It is no more a secret that a draft of the Presidential statement was prepared more than a week ago with a proposal that it should be made public on Feb 16th or in the opening session of the RTC. There was a sharp difference of opinion among his advisers and close associates on the contents of the draft.
>
> He was helped in his final assesment of the situation by the Services intelligence reports which were believed to be completely objective. Before he finally made up his mind and redrafted his statement he consulted the three Services Chiefs, who called on him yesterday.'

DAWN, 23, 1969

[ইতি সমাপ্ত আইয়ুব পতন পর্ব]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিজের কাছে ফেরা

সামরিক শাসন জারির পর দেশে সকল প্রকার রাজনৈতিক তৎপরতা নিষিদ্ধ হওয়ার ফলে একটু বিশ্রাম লাভের সুযোগ পাওয়া গেল। গত তিন মাস আইয়ুব বিতাড়নের উন্মত্ত আন্দোলনের সঙ্গে নিজেকে এমনভাবে জড়িয়ে ফেলেছিলাম যে, দীর্ঘদিন নিজের দিকে ফিরে তাকানোর কোনো অবকাশ পাইনি। আমি ঐ আন্দোলনের এমন কোনো গুরুত্বপূর্ণ নেতা বা কর্মী ছিলাম না, যার অনুপস্থিতিতে ঐ আন্দোলন মার খাওয়ার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু একবারও ঐরূপ বিবেচনা আমার মনে আসেনি। আমার ঐ সময়টা একটা প্রচণ্ড ঘোরের মধ্যে কেটেছে। এ রকম আন্দোলনের ঘোরের মধ্যে জড়িয়ে-পড়া মানুষরাই পুলিশের গুলিতে সহজে শহীদ হয়। তখন মানসিক অবস্থা এমন হয়ে যায় যে, যারা শহীদ হয় তারা টেরও পায় না কখন শহীদ হয়ে গেল। আমি যে শহীদ হইনি, সে আমার সাত-পুরুষের ভাগ্য। বড় বাঁচা বেঁচে গেছি।

যথাসময়ে পাকিস্তানের হাল ধরে যাবতীয় রাজনৈতিক তৎপরতা নিষিদ্ধ ঘোষণা করার জন্য মনে মনে ইয়াহিয়া খানকে ধন্যবাদ জানাই। আরও কিছুদিন এভাবে চলতে থাকলে অগণিত শহীদের তালিকায় হয়তো আমার নামটিও যুক্ত হয়ে যেতে পারত। ধন্যবাদ আইয়ুবকে, তিনিও ক্ষমতায় আঁকড়ে থাকার জন্য গোঁ ধরেননি। তাই শান্তিপূর্ণভাবেই ক্ষমতার বদল ঘটল।

লেখার মাঝখানে বিরতি থাকে, সিনেমার মাঝখানেও বিরতি থাকে—রাজনৈতিক খেলার মাঝখানেও বিরতি থাকাটা যে ভালো, তা ইয়াহিয়ার আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই আমি টের পেলাম। সেই দিক থেকে আন্দোলনের রণাঙ্গনে সাময়িক বিরতি প্রদানকারী সামরিক শাসন আমার মতো অনেকের কাছেই গ্রহণযোগ্য একটি ব্যবস্থা বলে প্রতিভাত হলো। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানও ঐ অন্তর্বর্তীকালীন অস্থায়ী সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে খুব একটা উচ্চবাচ্য করলেন না। ছাত্ররাও ধীরে ধীরে তাদের স্ব স্ব শিক্ষায়তনে ফিরে গেল।

নতুন দেশকর্তা জেনারেল ইয়াহিয়া খান গণ-অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে অর্জিত রাজনৈতিক সাফল্যগুলোকে রক্ষা করে, অবাধ-নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত নতুন সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে ব্যারাকে ফিরে যাবার প্রতিশ্রুতি দিলেন। তিনি দেশবাসীকে আশ্বস্ত করলেন এই বলে যে, তাঁর রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষ নেই। কোনো উপায়ান্তর না দেখে পাকিস্তানকে রক্ষা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করার সুমহান কর্তব্যবোধের ডাকে সাড়া দিয়েই তিনি ক্ষমতা গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছেন... ইত্যাদি... ইত্যাদি।

তাঁর চেহারার মধ্যে রামায়ণে বর্ণিত বীর হনুমানের প্রভাব থাকায়, একটা সম্ভাব্য লংকাকাণ্ডের কথা আমার মনে একবার উঁকি দিয়েছিল বটে, তবে পাকিস্তানের প্রেক্ষাপটে ঐ সম্ভাব্য লংকাকাণ্ডের পটভূমি ও তার পরিণতি কী হবে, সে-ব্যাপারে তখন পর্যন্ত আমার কোনো স্পষ্ট ধারণা ছিল না। কিন্তু এই ক্ষমতাবদলের ভিতর দিয়ে কট্টর মুজিববিরোধী জুলফিকার আলী ভুট্টো যে মুজিবের চেয়ে বেশি লাভবান হবেন, তা আমার মনে হয়েছিল। বঙ্গবন্ধুর মতো নেতা বুঝেননি তা নয়; তবে প্রতিশ্রুত সংসদ নির্বাচনের ব্যাপারে তিনি যুক্তিসঙ্গত কারণেই খুব আস্থাশীল ছিলেন বলেই ইয়াহিয়াকে তাৎক্ষণিকভাবে প্রত্যাখ্যান করার রাজনৈতিক ঝুঁকি তিনি নেননি।

আইয়ুববিরোধী আন্দোলনের উন্মত্ততার মধ্যে আমি প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম, গ্রামে আমার একটি বাড়ি আছে। বাড়িতে আমার বাবা-মা, ভাই-বোন আছে। আমি তাদের সঙ্গে যোগাযোগ না রাখলেও, তারা আছে। তারা আমাকে নিয়ে ভাবে। তারা আমার জন্য দুশ্চিন্তা ভোগ করে। তারা ঢাকায় আমার অনিশ্চিত জীবনযাপনের কথা ভেবে কষ্ট পায়।

ইয়াহিয়া খান ঢাকার রাজপথ থেকে উঠিয়ে আমাকে আমার পরিবারের কাছে ফিরিয়ে দেন। তাই অনেক দিন পর গ্রামের বাড়িতে আমার আপনজনদের মধ্যে ফিরে যাবার সুযোগ হয়।

ফ্রি স্কুল স্ট্রিটের গ্যারেজ বাড়ি ছেড়ে মামুন ও আমি মোতালেব কলোনির পাশে একটি একতলা পাকা বাড়িতে উঠে যাই। মামুনই ভাড়া দিত বলে ঐ বাড়ির ভাড়া কত ছিল, তা আমার মনে পড়ে না। জায়গাটা ছিল খুবই নির্জন। বাড়িটির পশ্চিম দিক দিয়ে গেছে রেললাইন আর পূর্ব দিকে দিয়ে প্রবাহিত ছিল একটি সরু খাল। ঐ খালের জলে চোখ রেখে নান্দনিক সুখ লাভের উপরি সুযোগ ছিল। আবুল হাসান, আখতার উন নবী, আবুল কাশেম এরা প্রায়ই ঐ বাড়িতে এসে আমাদের সঙ্গে রাত কাটাত। সোনারগাঁও রোড এবং ইস্টার্ন প্লাজা নির্মিত হওয়ার ফলে ঐ জায়গাটা এখন খুব মূল্যবান স্থানে পরিণত হয়েছে। তখন ঐ এলাকার বাড়ি ভাড়া ছিল খুবই কম।

আমার বাবা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন-ঠিকানায় আমাকে চিঠি লিখেছেন। তাঁর কিছু আমার হাতে আসত। তাঁর সব চিঠি আমার হাতে এসে পৌঁছাত না। পূরবীর সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হওয়ার পর, তিনি আমার বন্ধু পূরবী বসুর ঠিকানায় চিঠি লিখতে শুরু করেন।

একটু ছেলেখেলার মতো করেই পূরবীর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পূবরী এইচএসসি পরীক্ষার সম্মিলিত মেধা-তালিকায় প্রথম দশজনের মধ্যে স্থান লাভ করে। তাই কৃতিছাত্রী হিসেবে কোনো একটি দৈনিক পত্রিকায় তার পাসপোর্ট সাইজের ছবি ছাপা হয়। ঐ সচিত্র-সংবাদে এই তথ্যটিও ছিল যে, পূরবী বসু একজন গল্প-লেখিকা। তিনি সাহিত্য ভালোবাসেন।

পত্রিকায় প্রকাশিত পূরবীর ছবি দেখে আমি ঐ মেধাবী-প্রিয়দর্শিনীর প্রতি এক ধরনের দুর্বলতা বোধ করি। বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসু এবং রাজনীতিবিদ সুভাষচন্দ্র বসু—আমি খুব ছোটবেলা থেকেই এই দুই বসুর ভক্ত। পূরবীর উপাধিও বসু হওয়াতে আমি খুব খুশি হই। বংশকৌলীন্যের এই দুর্বলতা আমি পেয়েছিলাম আমার বাবার কাছ থেকে।

পূরবীর সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপনের লোভ আমার মধ্যে জাগ্রত হয়। আমি তার সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে জানতে পারি, নির্বাচনী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েও আমি যে-বিভাগে ভর্তি হতে পারিনি—পূরবী সেই ফার্মেসি বিভাগের ছাত্রী। থাকেন রোকেয়া হলে। তার বাড়ি মুন্সীগঞ্জে।

আমি 'সূর্যফসল' পত্রিকার সম্পাদকের পরিচয় দিয়ে, একটি গল্প চেয়ে রোকেয়া হলের ঠিকানায় পূরবীকে চিঠি লিখি। শুধু পূরবীর সঙ্গে সম্পর্ক সৃষ্টি করার জন্যই 'সূর্যফসল'-এর দ্বিতীয় সংখ্যা প্রকাশের চিন্তা তখন আমার মাথায় এসেছিল। আসলে পূরবীর গল্প বা আমার 'সূর্যফসল'—কোনোটাই মুখ্য ছিল না। কোনো একটা ওছিলায় পূরবীর সঙ্গে পত্রসম্পর্ক স্থাপন করাটাই ছিল আমার আসল উদ্দেশ্য।

আমার পত্রটি আদৌ পূরবীর কোমল হাতের স্পর্শ পাবে কি-না, তা নিয়ে আমার মনের ভিতরে সংশয়ের অন্ত ছিল না। এখন পূরবীর ঠিকানা যেমন বহুভাবে সংগ্রহ করা সম্ভব, তখন তা ছিল না। তাই অনেকটা অন্ধকারে ঢিল ছোঁড়ার মতো করেই আমি লিখেছিলাম—পূরবী বসু। প্রথম বর্ষ, বি. ফার্ম (অনার্স)। রোকেয়া হল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। ঢাকা।

ঐ চিঠি ডাকবাক্সে ড্রপ করার পর থেকে গোপন উৎকণ্ঠার মধ্যে আমার দিন কাটতে থাকে। ভাবি, হাতে পৌঁছালেও পূরবী কি আমার পত্রের জবাব দেবে? যে কবিতা সংকলন প্রকাশ করার অপরাধে আমি পুলিশের তাড়া খেয়েছি। পূরবীর কাছে ঐ সংকলনের মূল্য কতখানি? ঐ সংকলন কি তার চোখে পড়েছে আদৌ? নানা প্রশ্নে আমার মন চঞ্চল হয়। আমি যে কবি, তা কি সে জানে?

একদিন আমার সকল উৎকণ্ঠা ও সংশয়ের অবসান ঘটে। গল্প না পাঠালেও পূরবী বসু আমার পত্র-প্রাপ্তির কথা স্বীকার করে কয়েকটি সুনির্বাচিত শব্দে ঐ পত্রের সৌজন্যমূলক উত্তর দান করেন। ঐ চিঠিটি কোন ঠিকানায় এসেছিল, তা এখন আমার মনে নেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোনো কারণ ছাড়াই আমি পূরবীর ঐ পত্রটিকে প্রেমপত্রজ্ঞানে বুক-পকেটে গোপনে বহন করতে থাকি। সময় পেলেই লুকিয়ে লুকিয়ে পড়ি। ঐ চিঠির মধ্যে আমি যেন পূরবীকে দেখতে পাই। পূরবীকে নিয়ে আমার মনের মধ্যে রোমান্টিক স্বপ্ন এসে ভিড় জমতে শুরু করে। আমি তাঁকে নিয়ে কবিতা লেখার সিদ্ধান্ত নিই।

পূরবীকে কেন্দ্র করে আমার মনের ভিতরে তৈরি-হওয়া দুর্বলতার কথা আমি কাউকে জানতে দিই না। পূরবীকে তো নয়ই।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, Love is communicated before it is understood.

আমার মনের ভিতরে ঐ প্রিয়দর্শিনীর চিত্তজয়ের গোপন প্রস্তুতি চলতে থাকে।

পরের পত্রটি আমি কোন ওছিলায় পূরবীকে লিখব তাই নিয়ে যখন ভাবছিলাম, তখন একদিন আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ আমাদের নিউমার্কেটের আড্ডায় আসেন। আমাদের টেবিল-আড্ডায় তিনি জানান যে, গল্পকার জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত বিয়ে করেছেন। মুন্সীগঞ্জের মেয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে। নাম পূরবী।

সায়ীদ ভাই পূরবীকে আগে থেকেই চিনতেন। বললেন, খুব চমৎকার মেয়ে।

পূরবী? পূরবী বসু? আমি আবার জিজ্ঞেস করি নামটা।

সায়ীদ ভাই মাথা নাড়িয়ে বলেন, হ্যাঁ পূরবী। পূরবী বসু। আপনি চেনেন নাকি তাকে?

আমি চুপ করে থাকি। মাথা নাড়িয়ে বলি, না।

সায়ীদ ভাই রহস্যময় হাসি হাসেন।

তিনি কি আমার মুখ দেখে কিছু টের পান? আমি খুব ভিতরে কেঁপে উঠি।

আমার পূরবীনিমগ্ন পৃথিবী মুহূর্তের ব্যবধানে এক অনন্ত বিরহের মুখোমুখি হয়।

আমার রবীন্দ্রনাথের বাঁশি কবিতার কথা মনে পড়ে।

আমার শীতলক্ষ্যা নদীর কথা মনে পড়ে।

রবীন্দ্রনাথ কি আমার কথা জানতেন?

রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর চার বছর পর আমার জন্ম। তাঁর পক্ষে আমার কথা জানাটাই তো স্বাভাবিক। যারা মৃত এবং যাদের এখনও জন্ম হয়নি, তারা তো সব একই জায়গায় থাকে। তাদের মধ্যে চেনা-জানা তো থাকতেই পারে। থাকা উচিত। আমি রবীন্দ্রনাথের কথা ভাবি। বুঝি, কত বড় কবি ছিলেন তিনি!

গল্পকার জ্যোতিপ্রকাশ দত্তকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের প্রধান ডক্টর গোবিন্দ দেব পুত্র হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। তিনি ডক্টর দেবের সঙ্গেই থাকতেন। ডক্টর দেবের বাসভবনটি ছিল বুড়ো-শিববাড়ির লাগোয়া। বিয়ের পর রোকেয়া হলের পাশাপাশি ঐ বাড়িটি পূরবী বসুর নতুন ঠিকানায় পরিণত হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জ্যোতিপ্রকাশের সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল। আমি তাঁর গল্পের ও গদ্যশৈলীর ভক্ত ছিলাম। পূরবীকে বিয়ে করার সংবাদ পাওয়ার পর জ্যোতিপ্রকাশ দত্তের সঙ্গে আমার এক ধরনের মানসিক দূরত্ব তৈরি হয়। তাঁর তা জানবার কথা নয়। আসলে ঐ ঘটনাটির জন্য আমি, জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত বা পূরবী বসু—কেউ দায়ী ছিলাম না। যদি খুব সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ করি, তাহলে এই ঘটনার দায় হয়তোবা আমার কাঁধেই বেশি বর্তায়। জানি না, আমার বিচারেও হয়তো ভুল হতে পারে। নিজের বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত দিলেই বিচার সর্বদা সঠিক হয় না।

প্রথম কবে, কীভাবে এবং কোথায় পূরবীর সঙ্গে আমার মুখোমুখি দেখা হয়েছিল, অনেক চেষ্টা করেও আমি তা আমার দুর্বল স্মৃতিভাণ্ড থেকে খুঁজে বের করতে পারিনি। এর কারণ হয়তো এই যে, প্রার্থিতাকে পাবার আগেই হারানোর বেদনায় আমার স্মৃতিভাণ্ডের কিছু অংশ অকেজো হয়ে গিয়েছিল। যে-স্মৃতি আমি হয়তো আর কোনোদিনই ফিরে পাব না।

পূরবীর বিবাহ-সংবাদ শোনার পর থেকে আমি আমার মধ্যে একজন ব্যর্থ প্রেমিকের অস্তিত্বকে অনুভব করতে থাকি। ঘটনাটি আমার কাছে মধ্যরাতে দেখা এবং ভোরের আলো ফুটে উঠবার আগেই মুহূর্তে মিলিয়ে-যাওয়া একটি মায়াময় স্বপ্নের মতো মনে হতে থাকে।

আমি যখন আমার জীবনের দিকে খুব গভীর দৃষ্টিতে তাকাই— কখনও কখনও একটি পূর্বনির্ধারিত জীবনের ছক আমার চোখে ভাসে। অন্য সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে পূর্ব নির্ধারিত জীবন-ছকের এ-ধারণা প্রযোজ্য নাও হতে পারে। আমি গোপনে গোপনে নিজেকে অসাধারণ এবং পূর্ব-নির্ধারিত জীবনের অধিকারী বলেই ভাবি। তখন আমার জীবনে ঘটে যাওয়া অনেক রহস্যময় ঘটনার হিসেব মিলে যায়। আমার মনে হয়, বড়-কবি হওয়ার জন্য সর্বদাই বড় ধরনের বিরহ দরকার। পূরবীর মধ্যে আমি সে রকমের এক অন্তহীন বিরহকে আবিষ্কার করি।

আবুল হাসান রাজিয়া নামে একটি মেয়েকে ভালোবাসত। ঐ মেয়েটি পড়ত বায়োকেমেস্ট্রিতে। একদিন হাসান রাজিয়ার সঙ্গে আমাকে পরিচয় করিয়ে দেবার জন্যে আমাকে কার্জন হলে নিয়ে যায়। তখন বিকেল ছিল। রাজিয়া ওর বান্ধবীদের সঙ্গে কার্জন হল থেকে বেরিয়ে আসছিল। হাসান তার পথ আগলে দাঁড়ায় এবং আমার প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে বলে—এর নাম নির্মল, কবি, আমার বন্ধু। তোমার সঙ্গে ওকে পরিচয় করিয়ে দিতে নিয়ে এলাম। হাসান মাথা নিচু করে রাজিয়ার পথ আগলে দাঁড়িয়ে থাকে।

রাজিয়া হাসানকে একটুও পাত্তা না দিয়ে বলে, 'আমি আপনার সঙ্গে কোনো কথা বলতে আগ্রহী নই। রাস্তা ছাড়ুন।' এই বলে রাজিয়া হন হন করে বন্ধুদের সঙ্গে চলে যায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি অপমানাহত হাসানের পাশে কার্জন হলের সবুজ ঘাসের ওপর দাঁড়িয়ে থাকি এবং মনে মনে পূরবীর কথা ভাবি। পরে হাসানের দুঃখের ভার লাঘব করার জন্যই এক-পর্যায়ে পূরবীর প্রতি আমার দুর্বলতার কথা হাসানের কাছে খুলে বলি। বলি, দুঃখ করো না, আমিও তোমার মতোই একজন ব্যর্থ-প্রেমিক। তাতে কাজ হয়। আমি আর হাসান গলাগলি করে পুরনো ঢাকার দিকে পা বাড়াই। সেখানে কী চমৎকার অন্ধকার!

যেসব 'হতে-পারত' প্রেমের গোড়ায় আমি প্রয়োজনীয় জল ঢালিনি, বা যাদের প্রেমকে উপেক্ষা করে ঢাকায় চলে এসেছি, তাদের কথা আমার মনে পড়ে। নিজেকে শাস্তিযোগ্য ভেবেই পূরবীকে হারানোর শাস্তি আমি প্রাপ্যজ্ঞানে মাথা পেতে নিই। তখন ঐ নবদম্পতিকে ন্যায়সঙ্গত ও নিয়তিনির্ধারিত বলে মেনে নেবার সংগ্রামে আমার জয় হয়। আমি ক্রমশ এই নবীন-পরিবারের পারিবারিক বন্ধুতে রূপান্তরিত হই। পূরবীদের ডাইনিং টেবিলে আমার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত এবং পূরবী বসু আমার অনেক কবিতারই প্রথম শ্রোতায় পরিণত হয়। কবিতা শুনিয়ে পূরবীকে মুগ্ধ করার মধ্যে আমি এক ধরনের অনাস্বাদিত আনন্দের সন্ধান লাভ করি। সেই আনন্দ যে সর্বদা নির্মল ছিল তা নয়; কখনও কখনও তা নির্মমরূপও পরিগ্রহ করে। আমার আনন্দসন্ধানী মনে, কোথা থেকে যেন বেদনামুখ্য কবিতার পঙক্তিরা এসে ভিড় জমাতে থাকে। আমি কিছু লিখি— কিছু লিখিও না।

আমার প্রতি পূরবী পক্ষপাতিত্বের কারণেই ডক্টর দেব তাঁর বাড়িতে আমার উপস্থিতিজনিত উৎপাত মুখ বুজে সহ্য করতে রাজি হন। তিনি আমাদের তিনজনের ভিতরকার জটিল সম্পর্কটা বুঝতে পারতেন কি-না, আমি জানি না। এই বৃদ্ধ-দার্শনিকের সঞ্চিত অপত্য স্নেহের গোপন-ভাণ্ডারে আমিও মাঝে মাঝে হানা দিতাম। তখন টের পেতাম, আমার প্রতিও তাঁর স্নেহের কমতি ছিল না। আমি যদি একটানা কিছুদিন ঐ বাসায় না যেতাম, তখন তিনি পূরবীর কাছে জানতে চান, ঐ ছেলেটা আসে না কেন? ও আবার আমার ওপর রাগ করেনি তো?

তাঁর টেলিফোনটি আমি প্রায়ই ব্যবহার করতাম। তিনি তা একেবারেই পছন্দ করতেন না। তিনি ভাবতেন, আমার পেছনে সর্বদাই একজন গোয়েন্দা লেগে আছে। আমার কারণে একদিন তাঁর বিপদ হতে পারে। তখন আমি বলতাম, আমাকে টেলিফোন করতে না দেবার জন্যও তো আপনার বিপদ হতে পারে। আমি কি আইয়ুব খানের চেয়ে কম খারাপ?

ড. দেবের শোবার ঘরের দেয়ালে জিন্নাহর ছবির পাশে তাঁর নিজের একটি ছবি টানানো ছিল। এ নিয়ে আমি আর জ্যোতিপ্রকাশ একদিন খাবার টেবিলে বসে তাঁকে একটু বিদ্রূপমতো করেছিলাম। তিনি খুব রেগে গিয়েছিলেন। তখন বুঝেছিলাম, জিন্নাহর প্রতি তাঁর সত্যিকারের দুর্বলতা ছিল। তিনি উগ্র জাতীয়তাবাদী হাওয়ার মধ্যে থেকেও জিন্নাহর ছবি দেয়াল থেকে নামিয়ে ফেলতে সেদিন রাজি হননি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার মুখে পূরবীর প্রশংসা শুনে আমার বাবা তাঁর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে বুঝতে পারেন, আমার চিরদুরন্ত পোষ না-মানা অস্থির চিত্তের ওপর বিক্রমপুরের বসু-পরিবারের ঐ মেধাবী মেয়েটির এক ধরনের রহস্যময় প্রভাব রয়েছে। তাই এক-পর্যায়ে আমার বাবা পূরবীকে তাঁর মানসকন্যা হিসেবে গ্রহণ করেন। পূরবীও আমার বাবাকে প্রশ্রয় দেন। ফলে আমার সঙ্গে আমার বাবার সম্পর্ক রক্ষার ক্ষেত্রে পূরবী এক অত্যন্ত কার্যকর মাধ্যমে পরিণত হন। বাবার প্রশ্রয় পেয়ে পূরবীও আমার সঙ্গে গার্জিয়ানসুলভ আচরণ করার সুযোগ লাভ করে।

বাবা পূরবীর ঠিকানায় পূরবী ও আমাকে চিঠি লিখতেন। পূরবীর কাছে লেখা চিঠি পূরবী আমাকে দেখাতেন না। আমার চিঠিগুলোই আমি তাঁর কাছ থেকে পেতাম। বাবা পোস্টকার্ডের এক তিল পরিমাণ জমিও অনাবাদী রাখতেন না। তদুপরি তাঁর হাতের লেখা ছিল খুবই ছোট। আমি আমার বাবার উপদেশপূর্ণ চিঠিগুলো একবারের বেশি পড়তাম না। বিশ্বসাহিত্যের সেরা রচনা যেখানে পড়ার সময় পাই না, সেখানে বাবার দীর্ঘ চিঠিগুলোকে আমার এক-ধরনের উপদ্রব বলেই তখন কখনও কখনও মনে হতো। তবে তাঁর চিঠিগুলো যে বেশ সুলিখিত ছিল, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। একজন উদ্বেগবিদ্ধ পিতার যথার্থ প্রতিমূর্তি ছিলেন আমার বাবা।

ইয়াহিয়ার সামরিক শাসনের ছত্রছায়ায় কয়েকদিন গ্রামের বাড়িতে কাটিয়ে, ঢাকায় ফিরে পূরবীর সঙ্গে কথা বলে সিদ্ধান্ত নিলাম, বাবার অন্তিম একটি অনুরোধ আমি রক্ষা করব। আমি প্রাইভেটে বি.এ পরীক্ষা দেব। আবুল হাসানের সঙ্গে 'আর পরীক্ষা নয়' চুক্তিটি লংঘন করেই আমি সিদ্ধান্তমতো প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হিসেবে বি.এ পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করি।

বাংলাবাজারের প্রকাশকের কাছ থেকে বিনামূল্যে সংগ্রহ করা নোট বই পড়ে, শরীফের ক্যান্টিন থেকে টিফিন করে আমি যেতাম পরীক্ষা দিতে। ঢাকা কলেজে আমার সিট পড়েছিল। পরীক্ষার হলে আমার সামনের বেঞ্চে সিট পড়েছিল লেখক-গবেষক সৈয়দ আবুল মকসুদের। তাতে আমাদের উভয়েরই লাভ হয়।

একেবারে টায় টায় দ্বিতীয় বিভাগে পাস করার মতোই আমি প্রস্তুতি নিয়েছিলাম। কিন্তু মাত্র পাঁচ নম্বরের অভাবে আমি তৃতীয় বিভাগে পাস করি। তাতে কোনো ক্ষতি নেই। গ্রাজুয়েট হওয়া নিয়ে কথা। আসলে আমার বাবার ইচ্ছাপূরণই ছিল আমার লক্ষ্য। বাবা কলকাতা আর্ট স্কুলের পড়া শেষ করতে পারেননি। তাঁর বড় পুত্র বাবার সঙ্গে রাগ করে ভারতে চলে গিয়েছে। সেখানে গিয়ে টেকনিক্যাল লাইনে কাজ শিখেছে। গ্রাজুয়েট হতে পারেনি। আমার প্রতিভা

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিদেনপক্ষে গ্রাজুয়েশন প্রাপ্তির মধ্য দিয়ে সমাপ্ত হোক, এটাই বাবা চাচ্ছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন কোনোমতে আমাকে দিয়ে বিএ-টা পাস করাতে পারলে পূরবীকে ধরেটরে আমাকে দিয়ে ওকালতিটাও হয়তো পড়ানো সম্ভব হবে। আর তা যদি হয়, তাহলে বাবার সঙ্গে তর্ক না করে আমি মক্কেলদের হয়ে কোর্টে দাঁড়িয়ে মহামান্য হাকিমদের সামনে তর্ক করতে পারব। আমার তর্কের তোড়ে মক্কেলদের পকেট থেকে ঝনঝন করে টাকা গড়িয়ে পড়বে মাটিতে। কিন্তু তাঁর সেই ইচ্ছা পূর্ণ হবার কোনো কারণ ছিল না। আমার শিক্ষার কোটা ছিল শেষ। বিএ যে পাস করেছি, সেটাই বেশি। আর নয়।

বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএ পাসের প্রভিশনাল সার্টিফিকেটটি তুলে আমি তা আমার বাবা কাছে পাঠিয়ে দিই। আমি জানতাম, বাবার আনন্দবর্ধন করা ছাড়া ঐ সার্টিফিকেট আমার আর কোনো কাজে আসবে না। শিক্ষকতা বা চাকরি করার জন্য দরকারী হলেও কবিতা লেখার জন্য কোনো সার্টিফিকেটের দরকার পড়ে না।

AMARBOI.COM

টেলিভিশন নতুন এসেছে। প্রচার মাধ্যম হিসেবে রেডিওই তখন পর্যন্ত দাপটের সঙ্গে দখল করে আছে দেশ। তাই টেলিভিশনের চাইতে রেডিও প্রোগ্রামের গুরুত্ব বেশি। প্রচার বেশি। কিন্তু না টিভি না রেডিও—কোথাও কবিতা পড়ার কোনো সুযোগ পাচ্ছিলাম না। দেশের বড় এবং বয়স্ক কবিরাই তখন রেডিওতে কবিতা পাঠ করার সুযোগ পেতেন। লাইনবাজি করে দু'চারজন ছোট কবিও যে মাঝে মাঝে বড় কবিদের আসরে ঢুকে পড়তেন না, তা নয়। ঢুকে পড়তেন এবং তারা কবিতাও পড়তেন। আমার বাবার কাছে আমি নিজেকে বড় কবি বলে দাবি করতাম। কিন্তু রেডিওতে কবিতার প্রোগ্রাম না পাওয়ার কারণে তিনি প্রায়ই আমাকে উপহাস করে বলতেন,—তুই আবার কিসের বড় কবি, রেডিওতে তোর কবিতা কই?

কথাটা মিথ্যে নয়। বড় কবি হতে হলে রেডিওতে কবিতা পড়া খুবই দরকার। তাই উপায়ান্তর না দেখে কবিতা পড়ার সুযোগ প্রদানের জন্য আমি রেডিও কর্তৃপক্ষের কাছে ফুলস্ক্যাপ কাগজে একটি দরখাস্ত পেশ করি। তাতেও কোনো লাভ হয় না। মনটা খুবই ভেঙে পড়ে। তবু কান পেতে অপেক্ষায় থাকতাম, এই বুঝি শাহবাগ রেডিও থেকে ডাক আসে।

রেডিওতে আমার কিছু পরিচিত লোক ছিলেন। যেমন সৈয়দ শামসুল হুদা সাহেব। তিনি গীতিকার নির্বাচনের দায়িত্বে ছিলেন। আমি একবার তাঁর কাছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পঁচিশটি স্বলিখিত গান জমা দিয়েছিলাম। তিনি আমার গানগুলো পড়ে, কিছুদিন পর আমাকে গান না লিখে কবিতা লেখার পরামর্শ দিয়েছিলেন। তার মানে আমি গীতিকারের চেয়ে কবি হিসেবেই যে উত্তম তা তিনি মানতেন। তাই আমি আমাকে রেডিওতে কবিতা পড়ার সুযোগ দেবার জন্য তাঁর ওপর চাপ সৃষ্টি করি। আমাদের বন্ধু আবৃত্তিকার আশরাফুল আলমও তখন ওর দেবদুলালীয় (আকাশবাণী খ্যাত দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়) সুকণ্ঠের সুবাদে রেডিওতে অনুষ্ঠান ঘোষকের কাজ পেয়েছিল। বিকেলের দিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে লাইব্রেরী মাঠের সবুজ ঘাসের গালিচায় গোল হয়ে বসে আমারা আশরাফুল আলমের কণ্ঠে দেবদুলালের সংবাদ ও সংবাদ-পরিক্রমা পাঠ শুনতাম। সে চমৎকার কবিতা আবৃত্তি করত। তবে আবৃত্তির বিষয়টা তখন তেমন জনপ্রিয়তা পায়নি। আশরাফও রেডিওতে কবিতা পড়ার সুযোগ লাভের জন্য আমার পক্ষে চেষ্টা করে। কিন্তু কাজ হয় না। আসলে তখন রেডিওতে তরুণ কবিদের কবিতা পাঠের রেওয়াজই তৈরি হয়নি।

পরে ঊনসত্তরের প্রথম দিকে, সঠিক তারিখটি আমি উদ্ধার করতে পারিনি—গণঅভ্যুত্থানের সাফল্যেই হয়তো, হঠাৎ একদিন রেডিও থেকে আমার ডাক আসে। ষাট দশকের পাঁচজন তরুণ কবিকে নিয়ে কণ্ঠস্বর-সম্পাদক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ একটি কবিতা পাঠের অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন। অনুষ্ঠানের নাম : 'আধুনিক কবিতা : কয়েকটি কণ্ঠস্বর।'

ঐ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী কবিরা ছিলেন আবুল হাসান, আবু কায়সার, হুমায়ুন কবির, হুমায়ুন আজাদ এবং আমি।

হুমায়ুন আজাদ দাবি করেছেন, তিনিই ঐ অনুষ্ঠানটি রেডিওর তৎকালীন প্রযোজক আহমদ জামান সাহেবের সঙ্গে আলাপ করে আদায় করেছিলেন। তার দাবির সপক্ষে একটি অব্যর্থ যুক্তি ছিল। তিনি বলেছেন, তিনি এরেঞ্জ করেছিলেন বলেই ঐ অনুষ্ঠানে তিনিও কবিতা পড়ার সুযোগ পান, অন্যথায় পূর্বাণী হোটেলের কবিতা পাঠের আসর থেকে তিনি যেমন বাদ পড়েছিলেন, রেডিওর অনুষ্ঠান থেকেও তেমনি তার বাদ পড়ারই কথা ছিল। হতে পারে। তবে এর অর্থ এই নয় যে, পূর্বাণী হোটেলের কবিতা পাঠের আসর থেকে তাঁকে সচেতনভাবে বাদ দেয়া হয়েছিল। আসলে হুমায়ুন আজাদের নাম কেউ প্রস্তাব করেননি। ভালো ছাত্র হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ে তার খ্যাতি থাকলেও, কবি হিসেবে তখনও তার কোনো খ্যাতি ছিল না।

ঐ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী কবিরা তাদের কাব্যদর্শন বিষয়ে যতটা সম্ভব জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য উপস্থাপন করে শ্রোতাদের মাথা ঘুরিয়ে দেবার চেষ্টা করেন।

আবুল হাসান : 'বাস্তবহীন হয়েও আমি অন্তর্যামীন। কবিতা যেহেতু অনুভূতি-সংক্রান্ত অভিজ্ঞতার চিত্রলেখা, তাই আমিও আমার অনুভূতি এবং সহিষ্ণুতাকে রসায়ন করে তাকে একটি বিশেষ ফর্ম দিতে চেষ্টা করি।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হুমায়ুন কবির : 'জীবন ও শিল্পের মধ্যে জীবনকেই আমার অনেক বড় মনে হয়। জীবনের সমস্ত উল্লাসই আমার আরাধ্য।'

আবু কায়সার : 'কবিতা কবিতাই। তার কোনো বংশ বা সীমান্ত আছে বলে আমি মনে করি না। ধূসর, সুদূর কোনো গ্যালারির দিক থেকে আমার চোখ ফেরানো; কিন্তু নিজের দুর্বলতা আর সরলতার দিকে আমার কান এবং মন জাগুয়ারের মতো সজাগ।'

হুমায়ুন আজাদ : 'নিজেকে যতটুকু বুঝতে পেরেছি, তা হলো—আমি অন্ধকারে বদ্ধমূল, আলোর দিকে উঠছি, হয়তো আলোদর্শনের পূর্বেই আবার অন্ধকারে হারাব। কবিতা আমার কাছে ক্ষমাহীন শত্রু এবং অত্যাজ্য পরমাত্মীয়, তাই তাকে ধরতে চাই।'

নির্মলেন্দু গুণ : 'অমিতব্যয়িতা আমার স্বভাব, ব্যক্তিগত জীবনে এবং স্বভাবতই কবিতাতেও। কবিতা কী? জানিনে। ছন্দ কাকে বলে—ভালো করে বুঝিনে। কাব্য বিচারের মানদণ্ড কী?—আমি নিরুত্তর। আমি শুধু উড়নচণ্ডি প্রেমিকের মতো অবিবেচক, যুক্তিহীন এবং ব্যক্তিগত। আমার কাছে কবিতা তা-ই, আমি যা লিখি। অন্যের কাছে সেটা গল্প হলেও ক্ষতি নেই, এলজেব্রা হলেও না।'

রাতের দিকে ঐ অনুষ্ঠানটি প্রচারিত হয়। আমি 'ফুলদানি' এবং 'মিউনিসিপ্যালিটির ট্রাক' কবিতা দুটি পাঠ করি। তখন রেডিও-অনুষ্ঠানের শ্রোতা এই ঢাকা নগরীতেও ছিল। আমার কবিতা পাঠের অনুষ্ঠানটি অনেকেই বেশ আগ্রহ নিয়ে শুনেছিলেন। তার প্রমাণ মিলবে নিচে বর্ণিত ঘটনাটিতে। একদিন সন্ধ্যার দিকে আমি নিউ মার্কেটে টহল দিচ্ছি। এমন সময় এক স্বল্পপরিচিত যুবক এক সুন্দরী ভদ্রমহিলাকে নিয়ে আমার কাছে আসেন। ঐ সুন্দরী ভদ্রমহিলা ছিলেন ঐ যুবকের ভাবী। পরিচিত হওয়ার পরপরই ঐ ভদ্রমহিলা আমাকে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করেন, তারপর আমার মুখের দিকে তাকিয়ে একটুও ভনিতা না করে বলেন, 'ছি! ছি! ছি!— আপনি এতো খারাপ কবিতা লেখেন।'

ভদ্রমহিলার কথা শুনে আমি খুব লজ্জা পাই। রেগে গিয়ে কিছু একটা খারাপ কথাই বলতে গিয়েছিলাম, বুঝতে পেরে তখন ঐ যুবক আমাকে জানায়, ঐ দিন রেডিওতে আপনাদের অনুষ্ঠানটি যখন প্রচারিত হচ্ছিল তখন আমরা ডাইনিং টেবিলে খেতে বসেছিলাম। আপনার 'মিউনিসিপ্যালিটির ট্রাক' কবিতা শুনে ভাবীর বমি এসে যায়। তিনি ডাইনিং টেবিল থেকে উঠে যেতে বাধ্য হন। সেই থেকে ভাবী আপনার দিকে একটু রেগে আছেন। আপনাকে যখন পেয়ে গেলাম তখন ভাবলাম, আপনার সঙ্গে ভাবীকে পরিচয় করিয়ে দিই। আমার ভাবী একটু মুখকাটা। কিছু মনে করবেন না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যুবকের মুখে পুরো ঘটনা জানার পর আমার মন শান্ত হয়। তখন ঐ সুন্দরী মহিলাকে উদ্দেশ্য করে বলি, আমার ঐ কবিতাটির জন্য আমি দুঃখিত। তবে ভয় পাবেন না, আপনাদের মতো আদুরে নগরবাসিনীদের চমৎকার বমি তুলে নিয়ে যাবার জন্য আমার মিউনিসিপ্যালিটির ট্রাক সর্বদাই তৈরি আছে।

তাই বুঝি? ভদ্রমহিলা আমার কথার ধারটাকে কিছুটা লঘু করার চেষ্টা করলেন।

আমি বললাম, জ্বি।

তিনি একটি চমৎকার সন্ধিপ্রস্তাববাহী হাসি উপহার দিলেন আমাকে।

তখন আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, আমার 'ফুলদানি' কবিতাটি আপনার কেমন লাগল, তা তো বললেন না?

ভদ্রমহিলা এবার একটু লজ্জা পেলেন। বললেন, আপনার আগের কবিতার প্রতিক্রিয়া এতই প্রবল ছিল যে, আপনার পরের কবিতাটি আমি আর শুনতে পাইনি। তিনি জানতে চাইলেন, ঐ কবিতাটির বিষয় কী ছিল?

আমি ভদ্রমহিলার মরাল গ্রীবার ওপর এলানো খোঁপায় বাঁধা দীঘল চুলের দিকে তাকিয়ে বললাম, 'খোঁপার মতন কোনো ফুলদানি নেই।'—ঠিক এই কথাটাই ছিল।

আমার কথা শুনে মহিলার ফর্সা কাঁধের ওপর এলানো কালো খোঁপাটি দুলে উঠল। তিনি আর আমার সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে চাইলেন না। কোমর ও খোঁপা দুলিয়ে চলে যাবার সময় আমাকে তিনি আশ্বস্ত করলেন এই বলে যে, এখন থেকে তিনি আমার কবিতার প্রতি লক্ষ্য রাখবেন। তখন থেকেই আমি নিশ্চিন্ত হয়েছিলাম, আর যাই হোক, আমার কবিতা একেবারে 'লক্ষ্যহীন' কিছু নয়।

বহু কষ্টে পাওয়া ঐ রেডিও অনুষ্ঠান সম্পর্কে আমার বাবার প্রতিক্রিয়া ছিল আরও গা-পোড়ানো। তিনি তাঁর বিখ্যাত সাধু ভাষায় পূরবীর ঠিকানায় আমাকে একটি দীর্ঘ পত্র লেখেন। তাঁর মোদ্দা কথা ছিল এ রকম : যেদিন তুমি জসীম উদ্‌দীন, সুফিয়া কামাল বা সিকানদার আবু জাফরের মতো কবিদের সঙ্গে রেডিওতে কবিতা পড়িবার সুযোগ পাইবে, সেদিনই তোমাকে আমি বড়-কবি বলিয়া মানিব। তার আগে নয়।

বাবার চিঠি পড়ে অপমানে আমার গা জ্বলে যায়।

পূরবী হাসে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার প্রিয় সম্পাদকদের একজন ছিলেন গল্পকার এবং ঔপন্যাসিক হুমায়ুন কাদির। তিনি 'পাক জমহুরিয়াত' পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্বে ছিলেন। উনি প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ও বিদগ্ধ সমালোচক এস এন কিউ জুলফিকার হায়দার সাহেবের পুত্র। পাক জমহুরিয়াত পত্রিকার অফিস ছিল পুরানা পল্টনে। আমি ১৯৬৯-৭০ সালে ঐ পত্রিকাতে প্রচুর কবিতা লিখেছি। আমার এবং আবুল হাসানের কবিতা তিনি ঐ পত্রিকায় ঘন ঘন ছাপতেন শুধু আমাদের টাকা দিয়ে সাহায্য করার জন্য।

হুমায়ুন কাদির ছিলেন খুবই নিঃসঙ্গ মানুষ। তাঁর পিতা ময়মনসিংহ টিচার্স ট্রেনিং কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন বলে তাঁর ছাত্র-জীবনের অনেকটা সময় কেটেছে ময়মনসিংহে। আমি ময়মনসিংহের মানুষ হিসেবে তাঁর কাছে বেশ খাতির পেতাম, তাছাড়া কবি হিসেবেও তিনি আমাকে খুব মূল্য দিতেন; উৎসাহিত করতেন।

তাঁর বিবাহিত জীবন ছিল খুবই অসুখী। বিবাহের কিছুদিন পর থেকেই স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। তাঁর স্ত্রী একমাত্র পুত্রকে নিয়ে পিত্রালয়ে চলে যান। এ কারণে তাঁর মনের গভীরে একটা খুব বড় ধরনের ক্ষত ছিল। চাপা স্বভাবের কারণে তিনি এসব কথা আমাদের বলতেন না। তবে আমরা বিভিন্ন সূত্রে ঐসব তথ্য জেনেছিলাম। তিনি মাঝে মাঝে আমাদের তাঁর বাসায় নিয়ে যেতেন। তিনি থাকতেন বেইলি রোডের একটি সরকারী বাসভবনের দোতলায়। বিরাট ফ্ল্যাটে তিনি থাকতেন একা। আমি বুঝতে পারতাম, উদ্দাম বোহেমিয়ান জীবনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে জীবননাশের স্রোতে গা ভাসানোর ইচ্ছে থাকলেও বয়স ও চাকরির কারণে তিনি আমাদের সঙ্গে প্রাণ খুলে মিশতে পারতেন না।

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সময় থেকে তাঁর সঙ্গে আমি যোগাযোগ হারিয়ে ফেলি। দীর্ঘদিন তাঁর সঙ্গে আমার আর যোগাযোগ ছিল না। শারীরিক ও মানসিকভাবে দীর্ঘদিন কষ্ট ভোগ করার পর ১৯৭৭ সালের ১৯ এপ্রিল তাঁর প্রিয়-পরিজনহীন বিপর্যস্ত নিঃসঙ্গ জীবনের সমাপ্তি ঘটে। আবু শাহরিয়ার কর্তৃক সম্পাদিত এবং বাংলা একাডেমী কর্তৃক প্রকাশিত তাঁর জীবনীগ্রন্থ পড়ে জানতে পারি, তাঁর মৃত্যুর পর বায়তুল মোকাররম মসজিদে নামাজে জানাজা সম্পাদনের সময় একটু দূরে তাঁর স্ত্রীকে একটি গাড়িতে ক্রন্দনরত অবস্থায় বসে থাকতে দেখা যায়। দীর্ঘদিন পিতার সান্নিধ্য থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার পর তাঁর কিশোর পুত্রটিও পিতার নামাজে জানাজায় শরিক হন। বনানী কবরস্থানে তাঁকে কবর দেয়া হয় এবং তাঁর কবরের পাদদেশে তাঁর বিমাতা ফিরোজা বেগম-রচিত একটি কবিতা উৎকীর্ণ করা হয়। এমন করুণ মৃত্যুর অধিকারী লেখকের সংখ্যা বাংলা সাহিত্যে বেশি নেই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তিনি আমাদের দেশের প্রথম সারির গল্পকার ও ঔপন্যাসিকদের একজন ছিলেন। তাঁর রচিত গ্রন্থের মধ্যে আছে 'নির্জন মেঘ' (উপন্যাস), আদিম অরণ্যে এক রাত্রি (গল্প) এবং একগুচ্ছ গোলাপ ও কয়েকটি গল্প (গল্প)। তা ছাড়াও তাঁর রচিত বহু গল্প বিভিন্ন পত্রিকায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে।

১৯৮০ সালে বাংলা একাডেমী তাঁকে মরণোত্তর সাহিত্য পরস্কারে ভূষিত করে, যা আরও আগেই তাঁর প্রাপ্য ছিল। মৃত্যুর আগে নির্জন মেঘের মতো এই বেদনানির্জন মানুষটিকে সঙ্গ দিতে না পারার দুঃখ আমার চিরদিনের মতো থেকে যাবে।

'পাকিস্তানী খবর' নামে তখন একটি সরকারী প্রচার পত্রিকা ছিল। অফিস ছিল সেগুনবাগিচায়, এজি অফিসে। এই সাপ্তাহিক পত্রিকাটির সম্পাদনার দায়িত্বে ছিলেন জনাব সুশোভন আনোয়ার আলী সাহেব। ঐ পত্রিকার বিশেষ সংখ্যায় দেশের সেরা লেখকদের কবিতা-গল্প-প্রবন্ধ ছাপা হতো। সরকারী প্রচার পত্রিকা হলেও সম্পাদনা-গুণে ও দুর্লভ লাইনো টাইপে মুদ্রিত হওয়ার কারণে ঐ পত্রিকার প্রতি লেখকদেরও দুর্বলতা ছিল। আবুল হাসান একদিন আমাকে সুশোভন আনোয়ার আলী সাহেবের কাছে নিয়ে যায়। আনোয়ার আলী সাহেব ছিলেন লেখক মুহম্মদ ওয়াজেদ আলীর পুত্র। আমাকে তিনি হাসানের বন্ধু হিসেবে প্রথম দিন থেকেই খাতির করতে শুরু করেন। আবুল হাসানের পাশাপাশি আমার কবিতাও তিনি পাকিস্তানী খবরে প্রকাশ করেন। ঐ পত্রিকায় লিখে বেশ ভালো সম্মানী পাওয়া যেত। আমার স্পষ্ট মনে পড়ছে বিল না হলেও অনেক সময় আনোয়ার আলী সাহেব নিজের পকেট থেকে আবুল হাসানকে কিছু টাকা আগাম দিয়ে দিতেন। পরে হাসান ঐ টাকা খুব কমই শোধ করেছে। তিনি দেশের নাজুক পরিস্থিতি এবং বিভিন্ন নামকরা বুদ্ধিজীবীর অপকর্ম সম্পর্কে বিরক্তিভাব প্রকাশের জন্য এমন একটা মুখভঙ্গি আয়ত্ত করেছিলেন, যা ছিল তাঁর একান্ত নিজস্ব। তাঁর ঐ বিরক্তি প্রকাশের চমৎকার ভঙ্গিটি এখনও আমার মনে পড়ে। তাঁর মুখের হাসি ছিল দুর্লভ বস্তু। কিন্তু ভিতরে ভিতরে তিনি ছিলেন খুবই বন্ধুবৎসল ও স্নেহপ্রবণ। তিনি লোকান্তরিত হয়েছেন—কিন্তু কৃতী সম্পাদক এবং একজন উপকারী মানুষ হিসেবে সুশোভন আনোয়ার আলী সাহেবের কথা অনেক লেখকই এখনও স্মরণ করেন। তিনি নিজে লেখক ছিলেন না, কিন্তু তিনি জাত-লেখকদের কদর করতে জানতেন।

কবি হাবীবুর রহমানের পর আজাদের সাহিত্য বিভাগের দায়িত্ব নেন জনাব আজিজ মিসির। লেখার সম্মানী নিয়ে একদিন আজাদ অফিসে তাঁর সঙ্গে আমার উত্তপ্ত বাকবিতণ্ডা হয়। সে-কারণে আমি আজাদে লেখা ছেড়ে দিয়েছিলাম। এর কিছুদিন পরপরই আজাদ পত্রিকার সাহিত্য বিভাগের সম্পাদক হন আ.ন.ম. গোলাম মোস্তফা (জন্ম : ১৯৪০)। তিনি ছোটগল্প লিখতেন। একটি মাত্র বই তাঁর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রকাশিত হয়েছিল। বিশিষ্ট সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীদের সাক্ষাৎকারভিত্তিক ঐ বইটির নাম 'অন্তরঙ্গ আলোকে'। তাঁর বাড়ি ছিল দিনাজপুরে। বয়সে আমার চেয়ে কয়েক বছরের বড় ছিলেন। তাঁকে কেন্দ্র করে আজাদ পত্রিকা অফিসে তরুণ কবি-সাহিত্যিকদের একটি চমৎকার আড্ডার পরিবেশ গড়ে উঠেছিল।

আজাদের সামনে একটি ছোট্ট হোটেল ছিল—ঐ হোটেলে আমরা প্রায়ই খেতাম। মোস্তফা ভাই প্রায়ই আমাদের খাবারের টাকা শোধ করতেন। তিনি টেবুলয়েড ফর্মে আজাদের রবিবারের সাহিত্য মজলিসটি প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নেন এবং আমাদের কয়েকজনকে সেখানে নিয়মিত লিখতে বলেন। আমি ঐ কাগজে একটি সাপ্তাহিক কলাম লিখতে শুরু করি। নাম দিই 'ফটোগ্রাফ অটোগ্রাফ'। ঐ কলামের হেডপিসটি আমি নিজেই তৈরি করেছিলাম। আমার ছদ্মনাম ছিল শুভেন্দু। শুভেন্দু ছিল আমার কাকার নাম।

আজাদ থেকে 'চিত্রাকাশ' নামে একটি সিনেমা পত্রিকাও বেরুত। সেখানে অভিনয় কুমার দাশ এবং আখতার উন নবী চাকরি পায়। আজাদের সাহিত্য মজলিসে আমি, আবুল হাসান, আবুল কাশেম, সাযযাদ কাদির, ফরহাদ মজহার, হুমায়ুন কবির, আখতার হুসেন নিয়মিত লিখতাম। কাদের মাহমুদও তখন ঐ পত্রিকায় ছিলেন। ছিলেন গল্পকার-সাংবাদিক আহমেদ নূরে আলম।

আমার ঐ কলামটি ছিল বাবার সঙ্গে যোগাযোগ রাখার একটি কার্যকর মাধ্যম। আমার বাবা প্রতি রবিবার নেত্রকোণায় চলে যেতেন আমার কলাম পড়ার জন্য। অটোগ্রাফ-ফটোগ্রাফ পাঠ করে তিনি আমার কুশল জানতে পারতেন এবং আমার ভবিষ্যত পরিকল্পনা সম্পর্কেও কিছুটা ধারণা নিতে পারতেন, যা আমি চিঠি লিখে তাঁকে জানানোর সময় পেতাম না।

AMARBOI.COM

মোস্তফা ভাইয়ের কারণেই 'অটোগ্রাফ ফটোগ্রাফ' কলামটি আমি খুবই স্বাধীনভাবে লিখতে পারতাম। আমাকে আজাদে স্বাধীনভাবে লিখতে দিয়ে তিনি আমার লেখার সাহস বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। একজন উঠতি তরুণ কবির জন্য ঐ ঘটনাটি ছিল খুবই জরুরী। লেখক হিসেবে এমন প্রশ্রয় আমি আর কোনো সাহিত্য সম্পাদকের কাছে পাইনি।

পরে সাপ্তাহিক পূর্বদেশ পত্রিকা যখন দৈনিক পত্রিকা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে (১৪ আগস্ট ১৯৬৯) তখন আ.ন.ম গোলাম মোস্তফা পূর্বদেশ পত্রিকায় সাহিত্য বিভাগে জয়েন করেন। মোস্তফা ভাইকে অনুসরণ করে আমরাও তখন আজাদ পত্রিকা ছেড়ে পূর্বদেশ পত্রিকার অফিসে গিয়ে ভিড় জমাই।

অবজারভার হাউসের গুরুত্বপূর্ণ পদে 'কতিপয় আমলার স্ত্রী' কবিতার রচয়িতা কবি আবদুল গণি হাজারী বেশ আগে থেকেই কাজ করতেন। প্রিন্টিং জগতে তাঁর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জুড়ি ছিল না। তাঁর 'কালাপেঁচার ডাইরী' খুবই জনপ্রিয় কলাম ছিল। হাজারী ভাই ও শিল্পাচার্য কামরুল হাসান ছিলেন ঘনিষ্ঠ বন্ধু। এঁরা দু'জন কী কারণে জানি না, দেখা হলেই আমাকে 'রাজপুটিন' বলে ডাকতেন। আমার চেহারা এবং স্বভাবের মধ্যে রাজপুটিনের কিছুটা ছায়া থাকলেও রাজপুটিনের মতো অলৌকিক শক্তির অধিকারী আমি কখনই ছিলাম না। ছিলাম কী?

হাজারী ভাইয়ের স্ত্রী, হাসনা ভাবীর স্নেহসান্নিধ্যও আমি লাভ করেছিলাম। স্নেহসান্নিধ্য মানে, ভালো খাওয়া-দাওয়া এবং মাঝে মাঝে পাঁচ দশ টাকা আনরিফান্ডেবল ধার হিসেবে পাওয়া। কামরুল ভাইয়ের সঙ্গে তাঁর স্ত্রী বিবাহ-বিচ্ছেদ হয়ে গিয়েছিল। ফলে কামরুল ভাইও এক পর্যায়ে তাঁর বন্ধুপত্নীর ওপর কিছুটা নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিলেন। হাজারী ভাইয়ের ইন্দিরা রোডের বাড়িতে কামরুল ভাইকে দেখে আমার সে রকমই মনে হতো।

জনপ্রিয় সাংবাদিক-লেখক এবং একুশের অমর গানের রচয়িতা আবদুল গাফফার চৌধুরীও আজাদ ছেড়ে পূর্বদেশে জয়েন করেন। আদমজী পুরস্কারপ্রাপ্ত ঔপন্যাসিক আবদুর রাজ্জাক, সাংবাদিক নূরুল ইসলাম পাটোয়ারী (নুইপা) এবং এহতেশাম হায়দার চৌধুরীও পূর্বদেশে যোগ দেন। একসঙ্গে দেশের বেশ ক'জন খ্যাতিমান সাহিত্যিক-সাংবাদিকের যোগদানের কারণে পূর্বদেশ পত্রিকার পাল্লা খুবই ভারী হয়।

স্যাড জেনারেশন ও কণ্ঠস্বর-খ্যাত কবি রণজিত পাল চৌধুরী এবং ইউসুফ পাশার পাশাপাশি সহকারী-সম্পাদকের চাকরি পেয়ে মহাদেব সাহা তখন রাজশাহী থেকে ঢাকায় আগমন করেন। মহাদেব ছিল তখনকার দিনে একটি প্রথম শ্রেণীর দৈনিকের সর্বকনিষ্ঠ সহকারী-সম্পাদক।

খুব সম্ভবত মলয় ভৌমিকের মাধ্যমে মহাদেব সাহার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয়। পরিচয়ের কিছুদিনের মধ্যেই মহাদেবের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। জীবনযাপন, কাব্যভাবনা এবং যৌবন-সমস্যার সমাধানচিন্তায় আমাদের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য থাকার পরও, Political-oppression-এর অভিন্ন-অভিজ্ঞতা মোকাবিলায় আমরা ক্রমশ পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইয়াহিয়া খান জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন সম্পন্ন করে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে ব্যারাকে ফিরে যাবেন বলে জাতিকে কথা দিয়েছিলেন। কিন্তু দেখা গেল তিনি ক্রমশ দেশের রাজনীতিকে প্রভাবিত করার মতো কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত সামরিক ফরমান বলে জাতির ওপর চাপিয়ে দিতে শুরু করেছেন। এক ইউনিট প্রশ্নে আইয়ুবের গোলটেবিল বৈঠকে যে-সিদ্ধান্তগুলো নেয়া সম্ভব হয়নি, তার মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দুটো বিষয়ে তিনি সামরিক সরকারের প্রধান হিসেবে তাঁর সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন।

১। তিনি ঘোষণা করেন যে, আগামী নির্বাচন হবে মাথাপিছু এক ভোটের ভিত্তিতে, অর্থাৎ জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্ব।

এর ফলে পূর্ব পাকিস্তান জাতীয় সংসদে ১৭টি অধিক আসন লাভ করে এবং পূর্ব পাকিস্তানের জনমনে ইয়াহিয়ার ভাবমূর্তি কিছুটা উজ্জ্বল হয়।

২। তিনি বহু বিতর্কিত এক ইউনিটের বিলুপ্তি ঘোষণা করেন।

এর ফলে পশ্চিম পাকিস্তানের পাঞ্জাব ভিন্ন অন্য তিন প্রদেশে শেখ মুজিবের ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা হ্রাস পায়। তাতে জুলফিকার আলী ভুট্টোর বেশ সুবিধে হয়। স্পর্শকাতর এক ইউনিট ভাঙার দায় তাঁকে আর নিতে হয় না। এক ইউনিটের দায় থেকে অব্যাহতি দিয়ে ইয়াহিয়া খান ভুট্টোকে রাজনৈতিকভাবে এক ধরনের বোনাস প্রদান করেন।

AMARBOI.COM

কিছুদিনের মধ্যেই বিমানবাহিনী প্রধান এয়ার মার্শাল নূর খানের নেতৃত্বে তিনি একটি নতুন শিক্ষা কমিশন গঠন করেন। সেই কমিশন দ্রুততার সঙ্গে একটি নতুন শিক্ষানীতি তৈরি করে এবং ৩ জুলাই তা ঘোষণা করা হয়। নূর খান শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেশজুড়ে প্রবল প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। পূর্ব পাকিস্তানের ২৬ জন বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী বিবৃতির মাধ্যমে নূর খানের শিক্ষানীতির বিরোধিতা করেন।

১২ আগস্ট, ১৯৬৯ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি মিলনায়তনে ডাকসুর পক্ষ থেকে ঐ শিক্ষানীতি সম্পর্কে একটি মুক্ত আলোচনার ব্যবস্থা করা হয়।

আমি ঐ দিন শরীফের ক্যান্টিনে বসে আড্ডা দিচ্ছিলাম। তখন দুপুর গড়িয়ে গেছে। ক্যান্টিনে এসে হাজির হন নাসিরুল ইসলাম বাচ্চু। বাচ্চু ছিলেন তখনকার ছাত্র লীগের কেন্দ্রীয় কমিটির সাহিত্য-সংস্কৃতি বিভাগের সম্পাদক। কবিতাও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লিখতেন। আমার সঙ্গে তার খুবই সুসম্পর্ক ছিল। বাচ্চু এসে আমার পাশে বসেন এবং চা খাওয়ার পর বলেন, চলেন টিএসটিতে যাই। সেখানে নূর খানের শিক্ষানীতি নিয়ে মুক্ত আলোচনা চলছে। আমার রাজনীতির রক্তটা আবার মাথাচাড়া দিয়ে জেগে উঠল। বললাম, ঠিক আছে, চলেন।

আমি আর নাসিরুল ইসলাম বাচ্চু গিয়ে মিলনায়তনের ভিতরে মাঝামাঝি একটা জায়গায় পাশাপাশি আসন গ্রহণ করলাম। ছাত্রনেতা তোফায়েল আহমদ ঐ সভায় সভাপতিত্ব করছিলেন এবং মস্কোপন্থী ছাত্র ইউনিয়নের নেতা শামসুদ্দোহা বক্তৃতা করছিলেন। হঠাৎ ইসলামী ছাত্র-সংঘের কর্মীরা 'ইসলামী শিক্ষা কায়েম কর, ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা চাই না'—ইত্যাকার শ্লোগানসহকারে মিলনায়তনের ভিতরে প্রবেশ করে এবং বক্তব্য রাখার সুযোগ দাবি করে স্টেজে উঠে যায়। তারা মাইক নিয়ে কাড়াকাড়ি করতে থাকে। অতর্কিত কমান্ডো আক্রমণের মুখে অনুষ্ঠানটি পণ্ড হবার সম্ভাবনা দেখা দেয়।

ঠিক তখনই দোতলা থেকে ইসলামী ছাত্র শিবিরের কর্মীদের ছুঁড়ে মারা একটি চেয়ার এসে আমার পাশে বসে-থাকা নাসিরুল ইসলাম বাচ্চুর মাথায় আঘাত করে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মাথা ফেটে রক্ত ছিটকে পড়ে। বাচ্চু আর্তচিৎকারে জ্ঞান হারায়। ছাত্র লীগের কর্মীরা তখন দ্রুত ছুটে এসে বাচ্চুকে ধরাধরি করে হাসপাতালের উদ্দেশ্যে বাইরে নিয়ে যায়। আমি কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মতো দাঁড়িয়ে থাকি। এ রকম একটি দুর্ঘটনার জন্য আমি একেবারেই প্রস্তুত ছিলাম না। কী করব ভেবে পাই না। টিএসসিতে মারামারির খবর বাইরে ছড়িয়ে পড়লে পর মধুর ক্যান্টিন থেকে ছাত্র ইউনিয়ন এবং ছাত্র লীগের কর্মীরা লাঠিসোটা নিয়ে টিএসসি ঘিরে ফেলে। টিএসসি একটি রণক্ষেত্রে পরিণত হয়। আমি ভেতরে আটকা পড়ি।

আমার মুখে দাড়ি থাকায় শিবিরের কর্মীরা আমাকে তাদের কর্মী বলে ভ্রম করে এবং প্রতিপক্ষের নিক্ষিপ্ত ইটপাটকেল ও লাঠির আঘাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য আমার হাতে একটি চেয়ার তুলে দেয়। অবস্থা বেগতিক বুঝে আমি ঐ চেয়ারটি গ্রহণ করি। ততক্ষণে শিবিরের কর্মীরা সম্মুখ রণে পরাভব মেনে টিএসসি ছেড়ে পালাতে থাকে। কিছুক্ষণ শিবিরের হয়ে যুদ্ধ করার পর আমারও পালানো পথ খুঁজতে হয়। পালাতে গিয়ে আমিও ছাত্র ইউনিয়ন ও ছাত্রলীগের মারমুখো অচেনা-কর্মীদের টারগেটে পরিণত হই। তখন আমি আণবিক কমিশনের দিকের দেয়াল টপকে প্রাণভয়ে বাংলা একাডেমীর দিকে দৌড়াতে থাকি। ধর ধর বলে একদল মারমুখো ছাত্র আমাকে ধরতে আসে। ভাগ্যিস ভালো দৌড়াতে পারতাম। দৌড়াতে দৌড়াতে আমি বাংলা একাডেমীর গেটে পৌঁছি। বোরহান ভাই (প্রফেসর বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর) তাঁর ছোট্ট অস্টিন গাড়িটিতে আমাকে তুলে নেবার জন্য অনেক আগে থেকেই সেখানে প্রস্তুত ছিলেন। তিনি আমাকে তাঁর গাড়িতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তুলে নিয়ে দ্রুত ঘটনাস্থল থেকে সচিবালয়ের পথে ধাবিত হন। তিনি তখন সচিবালয়ে কাজ করতেন। পরে একসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন। ছাত্র ইউনিয়ন এবং ছাত্র লীগের গুণ্ডারা মাত্র কয়েক হাতের ব্যবধান থেকে আমার নিষ্ক্রমণ দৃশ্যটি প্রবল হতাশার সঙ্গে প্রত্যক্ষ করে।

ঐদিনই ছাত্র শিবিরের নগর প্রধান আবদুল মালেক এবং আলীয়া মাদ্রাসার ছাত্র ইদরিস আলী প্রতিপক্ষের হাতে ধরা পড়ে রেসকোর্সে নির্মমভাবে প্রহৃত হয়।

তিন দিন পর মালেক ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে শেষ-নিঃশ্বাস ত্যাগ করে। করাচী থেকে নিয়ে আসা প্রখ্যাত সার্জন ডাক্তার জুম্মা খান মালেকের জীবন রক্ষায় ব্যর্থ হন। মালেক ইসলামী আন্দোলনের প্রথম শহীদে পরিণত হন। ইদরিস এবং নাসিরুল ইসলাম বাচ্চু ক্রমশ সুস্থ হয়ে ওঠেন।

তবে নাসিরুল ইসলাম বাচ্চু তখন সুস্থ হয়ে উঠলেও দীর্ঘদিন পর তাঁর যে মনোবৈকল্য ঘটে, আমার মনে হয়, ঐ দিনের মাথায় আঘাতটি ছিল তার অন্যতম কারণ।

AMARBOI.COM

আজকাল প্রতিপক্ষের কর্মীর লাশ পড়লে নেতারা যেমন খুশি হন বা নির্বিকার ভাব দেখান, তখন রাজনীতিতে তেমন অমানবিক অবস্থা ছিল না। তাই মালেকের মৃত্যুর পরদিন আওয়ামী লীগ প্রধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একটি শোকবাণী দেন। এমন কি পুরানা পল্টনস্থ আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে তাজউদ্দীনের সভাপতিত্বে আওয়ামী লীগ মালেকের মৃত্যুতে একটি শোকসভারও আয়োজন করে।

ছয় ছাত্রনেতাও আবদুল মালেকের অকাল মৃত্যুতে শোকবাণী প্রদান করেন।

৬ ছাত্র নেতার বিবৃতি

> 'আমরা সুস্পষ্টভাবে বলছি যে, শিক্ষাকে বিজ্ঞানসম্মত, ধর্মনিরপেক্ষ, গণতন্ত্রসম্মত ও সহজলভ্য করা হোক। ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ ধর্ম বিরোধিতা নয়। কিন্তু একটি গোষ্ঠী বিশেষ ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ ইসলাম বিরোধিতা হিসেবে দাঁড় করিয়ে দেশে উত্তেজনা ও বিভেদ সৃষ্টির অপচেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে।'

[দ্র : বাংলাদেশের ছাত্র- আন্দোলনের ইতিহাস,
প্রাক মুক্তিযুদ্ধ পর্ব : ড. মোহাম্মদ হান্নান।]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৯৬৯ সালটি গণঅভ্যুত্থানকারী বাঙালিদের জন্যই নয়, মানবজাতির জন্যই ছিল খুব গুরুত্বপূর্ণ বছর। ঐ বছরই মর্ত্যের মানুষ আকাশের চাঁদকে স্পর্শ করার স্পর্ধা প্রদর্শন করে। তিনজন মার্কিন নভোচারী— নীল আর্মস্ট্রং, এডউইন এলড্রিন এবং মাইকেল কলিন্স চন্দ্র-অভিযানে অবিশ্বাস্য সাফল্য অর্জন করেন। এই ঘটনাটি ঘটবার আগ পর্যন্ত বিজ্ঞানে পিছিয়ে থাকা, এশীয়-তমসায় আচ্ছন্ন আমাদের মতো অনুন্নত দেশের মানুষ চাঁদকে অজেয় এবং পূজনীয় বলেই ভাবত। ওখানে কোনোদিন পৌঁছা যেতে পারে, মানবসন্তানের পদস্পর্শে ঐ পবিত্র-চন্দ্রভূমি কোনোদিন কলংকিত হতে পারে, তা তারা ভাবতেও পারত না। মার্কিন নভোচারীরা যেদিন চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণ করেন, সেদিন ঐ বিস্ময়কর ঘটনাটি টেলিভিশনের মাধ্যমে সারা বিশ্বে প্রচার করা হয়েছিল। আমার যতদূর মনে পড়ে আমিও কোনো একটি টেলিভিশন সেটের সামনে বসে এই শতাব্দীর সবচেয়ে বিস্ময়কর ও দুর্লভ দৃশ্যটি দেখেছিলাম। মানবসন্তানদের চন্দ্রগমনের ঐ ঘটনাটি শুধু পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের মধ্যেই নয়, সারা পৃথিবীর মানব-চৈতন্যেও প্রচণ্ড আলোড়নের সৃষ্টি করে।

১৯৬৯ সালের ১৬ জুলাই পূর্ব পাকিস্তান সময় সন্ধ্যা ৭-৩১ মি. তিন নভোচারীকে নিয়ে মার্কিন মহাশূন্য-নভোযান এ্যাপোলো-১১ চাঁদের উদ্দেশ্যে মর্ত্যপৃষ্ঠ ত্যাগ করেছিল। তাঁদের ঐ অভিযানের স্থায়িত্বকাল ছিল আট দিন। ১৬-২৪ জুলাই। তিন দিন তিন রাত্রি দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে ২০ জুলাই গভীর রাত ২-৩০ মি. অর্থাৎ ২১ জুলাই ১৯৬৯— ঐ তিন নভোচারী চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণ করে মানুষের চাঁদ ছোঁয়ার মায়াবী স্বপ্নকে সত্যে পরিণত করেন।

আমরা আমাদের ছোটবেলায় একটা খুব মজার ছড়া আওড়াতাম। ছড়াটি ছিল :

চক্কর চক্কর ময়মনসিং
ঢাকা যাইতে কতদিন?
ঢাকার বাবু কইয়া দিছে
ঢাকা যাইতে তিন দিন।

মার্কিন নভোচারীরা প্রমাণ করে যে, তোমাদের দেশের মানুষের ময়মনসিংহ থেকে ঢাকায় যেতে তিন দিন সময় লাগলেও, আমরা কিন্তু তিন দিনের মধ্যেই চাঁদে চলে যেতে পারি।

চন্দ্রের মাটি স্পর্শ করে ১৯৬৯ সালের জুলাই মাসেই মার্কিনীরা প্রকারান্তরে বাকি বিশ্বকে বুঝিয়ে দিয়েছিল যে, আগামী দিনে এই পৃথিবীর নেতৃত্ব দেবেন তারাই। অবশ্য আমরা যারা বিশ্বে মার্কিন দাপট দেখে চিন্তিত ছিলাম, তারা তখন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাকিয়েছিলেম সোভিয়েটের মহাশূন্য কর্মসূচীর সাফল্যের দিকে। শুধু মর্ত্যে নয়, মহাশূন্য অভিযানের ক্ষেত্রেও তাঁরাই ছিলেন মার্কিনীদের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী। রুশ নভোচারী ইউরি গ্যাগারিন ছিলেন প্রথম মহাশূন্যচারী (১৯৬২) কিন্তু মার্কিনীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অর্থনৈতিক দুর্বলতার কারণে সোভিয়েট ইউনিয়ন ক্রমশ পিছিয়ে পড়ে এবং আমেরিকা এগিয়ে যায়।

মাত্র তিন মাসের ব্যবধানে মানবজাতির স্বপ্ন-পুরুষ, ঐ তিন চন্দ্রবিজয়ী মার্কিন নভোচারী ঢাকায় আসবেন, তা ভাবা যায় না। তিন নভোচারীর ঢাকা আগমনের সংবাদে পূর্ব পাকিস্তারেন মানুষের মনে আনন্দের বন্যা বয়ে যায়। তারা দলে দলে নভোচারীদের স্বাগত জানাবার জন্য ঢাকায় এসে ভিড় করে। চন্দ্রবিজয়ী মার্কিন নভোচারীরা একদিনের এক সংক্ষিপ্ত সফরে ঢাকায় আসেন ২৭ অক্টোবর ১৯৬৯।

ঢাকার মানুষ ঐ তিন নভোচারীকে সেদিন কীভাবে ঢাকার মাটিতে স্বাগত জানিয়েছিলেন, তার চমৎকার বিবরণ পাওয়া যাবে 'সংবাদ' পত্রিকার পাতায়।

সংবাদ-শিরোনাম

<u>আর্মস্ট্রং-এলড্রিন-কলিন্সকে একনজর দেখার জন্য বিমানবন্দরে ও</u>
<u>রাজপথে হাজার হাজার লোকের ভিড়</u>

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

> মর্ত্যের মানুষের যুগ-যুগান্তের শত সংস্কারকে ভাঙ্গিয়া দিয়া যে তিন জন মানবসন্তান স্বপ্নময় চন্দ্রপৃষ্ঠে পদচারণা করিয়া আসিয়াছেন, চন্দ্রবিজয়ী সেই বীর সন্তানত্রয় নীল আর্মস্ট্রং, এডউইন এলড্রিন এবং মাইকেল কলিন্স গত পরশু (সোমবার) অগণিত মানুষের হৃদয়নিঃসৃত অভিনন্দনের মধ্যে রাজধানী ঢাকায় আসিয়াছিলেন।

নভোচারীরা সস্ত্রীক ঢাকা ভ্রমণ করেন। সকাল ১১টার দিকে তাঁদের বহনকারী বিমান তেজগাঁও বিমানবন্দরে অবতরণ করে। বিমানবন্দর থেকে যাত্রা শুরু করে ঢাকার বিভিন্ন রাজপথ পরিক্রমা করে নভোচারীরা হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে ফিরে যান।

ঐদিনই ২-৩০ মি. তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর এসএম আহসান গভর্নর হাউসে তিন চন্দ্রবিজয়ী ও তাঁদের ভ্রমণসঙ্গী স্ত্রী ও পুত্র-কন্যাদের বিপুলভাবে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন। নভোচারীরা সাংবাদিক সম্মেলনেও বক্তব্য রাখেন। সেখানে তাঁরা মহাশূন্য থেকে এই পৃথিবীকে কত ছোট দেখায় তার বর্ণনা দেন এবং এই ছোট্ট পৃথিবীতে বসবাসকারী মানবজাতির প্রতি সংঘাতের পথ পরিহার করে শান্তি ও সহযোগিতার পথে অগ্রসর হওয়ার আহ্বান জানান। চন্দ্রবিজয়ীদের উদার মনের এই মানবিক উপলব্ধি বিশ্বের সকল শান্তিকামী মানুষের মনকে স্পর্শ করে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তিন সুদর্শন মার্কিন নভোচারী ও তাদের সুন্দরী স্ত্রীদের দর্শন লাভ করে এবং মানবজাতির বহুদিনের স্বপ্নপূরণকারী বীরদের প্রাণঢালা অভিনন্দন জানাতে পেরে ঢাকার মানুষ খুবই আনন্দিত হয়। ঘটনাটি দেশের কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষের মন থেকে ভ্রান্ত ধারণা দূর করতে যেমন সাহায্য করে তেমনি বিজ্ঞানমনস্ক মনেরও জন্ম দেয়।

১৯৬৯ এর নভেম্বর মাসে বাংলাবাজার থেকে একটি সিনেমা পত্রিকা বের হয়। নাম জোনাকী। মাসিক পত্রিকা। সম্পাদকের নাম আবদুল মতিন। বাংলাবাজারে তাঁর একটি প্রকাশনী ছিল। শুরু থেকেই আমি ঐ পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হই। কার মাধ্যমে যে জোনাকী-সম্পাদকের সঙ্গে আমার যোগাযোগ ঘটেছিল, মনে পড়ে না। বেশ কয়েক মাস আমি ঐ পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলাম। প্রুফ দেখা, সম্পাদকীয় পরামর্শ প্রদান করা ছাড়াও আমি ঐ পত্রিকার একটি নিয়মিত কলাম লিখতাম। কলামটির নাম দিয়েছিলাম 'ফসল বিলাসী হাওয়া'। ছদ্মনাম ছিল যথারীতি শুভেন্দু। তা ছাড়া আমার একাধিক গল্প জোনাকীতে ছাপা হয়। বলা যায় গল্পগুলো ছিল জোনাকীর জন্যই লেখা। পুরনো সংখ্যা ঘেঁটে অন্তত দুটো গল্পের সন্ধান পেয়েছি।

১. নায়ক-নায়িকা। [তৃতীয় সংখ্যা, জানুয়ারি ১৯৭০]
২. আপন দলের মানুষ। [চতুর্থ সংখ্যা, ফেব্রুয়ারি ১৯৭০]

জোনাকীর সঙ্গে অন্য যাঁরা যুক্ত ছিলেন তাঁদের মধ্যে আখতার উন নবী এবং অভিনয় কুমার দাশের সঙ্গে আমার আগে থেকেই নিবিড়ঘন বন্ধুত্ব ছিল। নতুন পত্রিকায় এসে চিত্রগ্রাহক নাজির আহমেদ, লেখক এবং পরে চিত্র-পরিচালক আল মাসুদ এবং আহমদ সানবীবকে নতুন বন্ধু হিসেবে পাই। আমাদের যৌথ শ্রমে প্রকাশিত পত্রিকাটি বাজারে ভালোই নাম করে। ঐ সিনেমা পত্রিকায় কাজ করার ফলে ঢাকার সিনেমাজগতের অনেকের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। আমাদের লেখা ও কাজের জন্য মতিন সাহেব আমাদের 'যথাসাধ্য' পারিশ্রমিক দান করতেন। কিছু লেখার টাকা, কিছু প্রুফ দেখাদেখির টাকা এবং কিছু ধার-ফার করে দিনগুলো খেয়ে না খেয়ে বেশ ভালোই কেটে যাচ্ছিল। ভালো মানে, 'যায় দিন ভালো'—এই প্রবাদী অর্থে।

পরে মেধাবী তরুণ আহমদ সানবীব টিএসসির নিকটে এক সড়ক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারায়। সে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতার চাকরি পেয়েছিল। টিভিতেও নিয়মিত অনুষ্ঠান করত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জোনাকীর তারাভরা অন্ধকার রাতগুলোর কথা আমার বেশ মনে পড়ে। জোনাকীর কাজ এবং আড্ডা শেষ করে আমি, অভিনয়, নবী ও নাজির—প্রায়ই দল বেঁধে রাতের বেলায় অবলা মাসির মৌজায় গিয়ে হাজির হতাম। 'সামবাদিক' হিসেবে সেখানে আমাদের দাপট ছিল খুব উঁচুলয়ে বাঁধা। বঙ্গরমণীদের কোমল হাতে পরিবেশিত বঙ্গবারিকে যদি তখন অমৃত না ভাবতাম, তা হলে অমৃতেরই অমর্যাদা করা হতো। নব-জাগ্রত বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদী চিন্তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ঐ বঙ্গসামগ্রীটির তখন একটা পৃথক কদর তৈরি হয়েছিল। ঐ সব রমণীয় রজনীগুলোতে আরেকজন সিনে-সাংবাদিক ও কথাশিল্পী আমাদের খুব প্রিয় এবং অভিজ্ঞ সঙ্গী ছিলেন, তিনি হচ্ছেন শেখ আবদুর রহমান। তাঁর ছদ্মনামে রচিত 'কোলাহল' নামে একটি পর্নো তখন ঢাকায় খুব আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। সাংবাদিকতার পাশাপাশি শেখ আবদুর রহমান ভালো গল্পও লিখতেন এবং খুব আড্ডাবাজ ছিলেন।

আমরা যখন জোনাকী নিয়ে ব্যস্ত ছিলাম, তখন ইয়াহিয়ার সামরিক সরকার তাদের পছন্দ নয় এমন পুস্তক-পুস্তিকা বাজেয়াপ্ত করার কাজে লিপ্ত ছিল। এইসব পুস্তক-পুস্তিকার মধ্যে ছিল 'বাইশ থেকে চব্বিশ': সম্পাদক সিরাজুল আলম খান ও আমিনুল হক বাদশা। ১৯৬৯ সালের ২২ মার্চ থেকে ২৪ মার্চ পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু যেসব ভাষণ প্রদান করেন ঐ পুস্তিকায় সেগুলো গ্রন্থিত হয়েছিল।

২৭ সেপ্টেম্বর ১৯৬৯ আবুল কালাম আজাদ রচিত বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের উন্মেষ নামে একটি গ্রন্থ পাকিস্তানের দুই প্রদেশের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টির অভিযোগে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়।

এরপর সামরিক সরকার একে একে বেশ কতগুলো বইয়ের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। কোনো কোনো লেখক ও প্রকাশকের নামে কারণ দর্শানোর নোটিস জারি করা হয়। এর মধ্যে কামরুদ্দিন আহমদ-এর 'সোশ্যাল হিস্ট্রি অব ইস্ট পাকিস্তান', মহারাজ ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তীর 'জেলে তিরিশ বছর', বদরুদ্দীন উমরের 'সাংস্কৃতিক সাম্প্রদায়িকতা', সত্যেন সেনের 'আল বেরুনী' এবং আবদুল মান্নান সৈয়দের গল্পগ্রন্থ 'সত্যের মতো বদমাশ' ছিল উল্লেখযোগ্য। লেখকের স্বাধীনতার ওপর সামরিক সরকারের ঐরূপ হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী প্রতিবাদ উত্থিত হয়। কবি-সাহিত্যিক-সাংবাদিক ও শিক্ষকদের পাশাপাশি রাজনীতিবিদরাও ঐ প্রতিবাদে সামিল হন। বাংলা একাডেমীতে কবি সিকানদার আবু জাফরের সভাপতিত্বে এক প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং সভায় লেখক স্বাধিকার সংরক্ষণ কমিটি গঠিত হয়।

একদিন কণ্ঠস্বর সম্পাদক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদের কাঁঠালবাগানের বাসায় আমরা তরুণ কবি-সাহিত্যিকরা মিলিত হই। ঐ ঘরোয়া প্রতিবাদ সভায় যারা উপস্থিত ছিলেন তারা হলেন জনাব মনসুর মুসা, মোহাম্মদ আবু জাফর, আবদুল্লাহ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবু সায়ীদ, মহাদেব সাহা, আবুল হাসান, আবদুল মান্নান সৈয়দ, আবুল কাশেম ফজলুল হক, মোহসীন রেজা, মাহমুদ আবু সায়ীদ, সিকদার আমিনুল হক, নির্মলেন্দু গুণ, মোহাম্মদ মোজাদ্দেদ, আল মনসুর ও আসাদ চৌধুরী।

পরে বিভিন্ন বইয়ের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেবার দাবিতে আমরা একদিন ঢাকায় একটি জঙ্গী মিছিলও বের করি। তারিখটি ছিল খুব সম্ভবত ১০-১৫ জানুয়ারি ১৯৭০। মিছিল যখন আবদুল গনি রোড ধরে গুলিস্তান অভিমুখে অগ্রসর হচ্ছিল তখন মিছিলের অগ্রভাগে থেকে আমি স্লোগান দিচ্ছিলাম, সবাই আমার স্লোগানে সাড়া দিচ্ছিল। আমি চিৎকার করে মুষ্টিবদ্ধ হাত আকাশের দিকে নিক্ষেপ করে বলছিলাম... সত্যের মতো বদমাশ—বা আল বেরুনী আল বেরুনী, মিছিল থেকে জবাব আসছিল পড়তে চাই, পড়তে চাই। হঠাৎ আমার কী খেয়াল হলো, মনে পড়ে গেল আমার প্রকাশিতব্য কাব্যগ্রন্থের কথা। আমার মনে হলো ঐ বইটিও নিষিদ্ধ হওয়ার যোগ্যতা রাখে। বের হয়নি বলেই নিষিদ্ধ হয়নি। সুতরাং আমি এবার আমার স্লোগানে আমার প্রকাশিতব্য বইটির নাম যুক্ত করে দিয়ে বললাম... প্রেমাংশুর রক্ত চাই। মিছিল থেকে জবাব এলো... পড়তে চাই, পড়তে চাই। কিছুক্ষণ পড়তে চাওয়ার পর ব্যাপারটা ফাঁস হয়ে যায়। তখন নতুন স্লোগানদাতা সামনে এসে আমার স্থান দখল করেন।

আমাদের জঙ্গী মিছিলটি বায়তুল মোকাররমের প্রতিবাদ সভায় গিয়ে শেষ হয়।

জোরের সঙ্গে শুরু হলেও কিছুদিনের মধ্যেই ঐ আন্দোলন স্তিমিত হয়ে পড়ে। ব্যক্তিগতভাবে মনে হয়, ঐ আন্দোলন থেকে আমিই যা একটু লাভবান হয়েছিলাম। প্রকাশ হওয়ার আগেই আমার কাব্যগ্রন্থের নাম অনেকেরই জানা হয়ে গিয়েছিল।

কবিতার নিচে রচনার তারিখ লিপিবদ্ধ করাটা যে কতটা জরুরী, তা এখন মর্মে মর্মে উপলব্ধি করছি। রবীন্দ্রনাথের প্রতি সম্মান দেখাতে গিয়ে কী ভুলটাই না করেছি। আজ পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর আগের লেখা কবিতার দিকে যখন তাকাই, আবছা স্মৃতির মতো অতি সামান্য কিছু মনে পড়ে। বুঝি, ঐ সব কবিতার সঠিক রচনা-তারিখ কোনোদিনই আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। তবু রচনার কাছাকাছি সময়টা কবিতার চেহারার দিকে তাকিয়ে আমি ধরতে পারি। কিন্তু একটি কবিতা (হুলিয়া) নিয়ে আমি খুবই ধন্ধের মধ্যে পড়েছি। কবিতাটিকে অনেকেই আমার প্রথম সফল কবিতা বলে বিবেচনা করেন, আমি নিজেও করি। ঐ জনপ্রিয় কবিতাটির রচনাকাল নির্ণয় করার ব্যাপারে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার প্রবল আগ্রহ ছিল। প্রয়োজনও ছিল। এখনও আছে। এবং সবসময়ই থাকবে। কিন্তু গত ছয় মাস ধরে তদন্ত করেও আমি এর রচনাকাল নির্ণয়ে সফল হইনি। অনেক (আজাদ, সংবাদ, পূর্বদেশ) পত্র-পত্রিকা ঘেঁটেও আমি ঐ কবিতার রচনাকাল, কবিতাটি প্রথম কোথায় প্রকাশিত হয়েছিল, প্রথম কোথায় কবিতাটি পাঠ করেছিলাম, বা ঐ কবিতার প্রথম শ্রোতা কে ছিল, কিছুই আমি আবিষ্কার করতে পারিনি।

আমার শুধু মনে পড়ে, বাংলা একাডেমীর কোনো একটি অনুষ্ঠানে আমি ঐ কবিতাটি পাঠ করেছিলাম। কবিতা পাঠের আসরে প্রচুর জনসমাগম হয়েছিল। কবিতা পাঠের পর মঞ্চ থেকে নেমে এসে প্রখ্যাত অভিনেতা ও আবৃত্তিকার জনাব গোলাম মোস্তফা আমাকে তিরস্কার করে বলেছিলেন, একটি ভালো কবিতার বাজে আবৃত্তিতে তিনি খুবই মর্মাহত হয়েছেন।

সেটি কি একুশের অনুষ্ঠান ছিল? খুব সম্ভবত ১৯৭০-এর একুশে ফেব্রুয়ারির ভোরেই হবে। বাংলা একাডেমী একুশের অনুষ্ঠানগুলোতে পাঠ করা কবিতা বা পঠিত প্রবন্ধের কোনো রেকর্ড রাখে না। তাই একাডেমীর সংস্কৃতি বিভাগ থেকেও এ-বিষয়ে কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি। তবে আইয়ুব খান এখন কোথায়? কবিতার মধ্যে উত্থাপিত ঐ প্রশ্ন থেকে মনে হয় কবিতাটি আইয়ুবের পতনের অব্যবহিত পরে রচিত হয়েছিল। রচয়িতা এবং তাঁর সহযাত্রী কবিদের মধ্যে অনেকের জীবদ্দশায়ও হুলিয়ার রচনাকাল এবং প্রথম প্রকাশের স্থান নির্ণয় করা সম্ভব হলো না— এটা খুবই দুঃখের বিষয়।

হুলিয়া কবিতার প্রথম খসড়াটি আমার প্রিয়বন্ধু শ্রীমান আবুল হাসান রাগ করে ছিঁড়ে ফেলেছিলেন। আগের দিন রাতে আমি আর হাসান সলিমুল্লাহ হলে ছিলাম। সম্ভবত হাসানের বাল্যসুহৃদ মাহফুজুর হক খানের রুমে। পান এবং আড্ডার কারণে অনেক রাত করে আমরা ঘুমাই। তাই পরদিন বেশ দেরিতে আমার ঘুম ভাঙে। ঘুম ভাঙার পর উঠে দেখি রুম ফাঁকা। হাসান চলে গেছে। তাকিয়ে দেখি টেবিল থেকে 'হুলিয়া' উধাও। তাড়াতাড়ি হাত মুখ ধুয়ে, রুম বন্ধ করে ছুটলাম শরীফের উদ্দেশ্যে। শরীফে যাবার পথে ঘাসের মধ্যে ঐ কবিতার কিছু ছেঁড়া অংশ আবিষ্কার করি। বুঝতে একটুও অসুবিধে হয় না যে, আমার বন্ধু কবিতাটি পড়তে পড়তে এবং ছিঁড়তে ছিঁড়তে শরীফের দিকে গেছে। জটায়ুর কর্তিত ডানা পথে পড়ে থাকতে দেখে শ্রীরামচন্দ্র যে রকম সীতার গমন পথের সন্ধান পেয়েছিলেন, অনেকটা সে রকমের ঘটনা।

আমি যখন শরীফে পৌঁছি তখন দুপুর নয়, সকাল দশটা। হাসান চা-নাস্তা সেরে, একটি অকবিতার হাত থেকে বাংলা সাহিত্যকে মুক্ত করতে পারার আনন্দে চুটিয়ে আড্ডা দিচ্ছিল এবং তার চারপাশে ভিড় করে বসা তাঁর কয়েকজন ভক্তকে কবিতা জিনিসটা আসলে কী, সে সম্পর্কে জ্ঞানদান করছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি শরীফে ঢুকেই পথ থেকে কুড়িয়ে পাওয়া হুলিয়া কবিতার কিছু ছেঁড়া অংশের প্রতি তার দৃষ্টি আকর্ষণ করি। তখন সে হাসে। বলে, এটা তো কবিতা নয়, গল্প, আবার লিখে ফেলো। রাগ করার কী আছে?

এজরা পাউন্ড যে এলিয়টের ওয়েস্ট ল্যান্ডের কতটা কেটে বাদ দিয়ে দিয়েছিলেন, আমি জানি, তর্কে লিপ্ত হলে হাসান ঐ প্রসঙ্গটি তুলবে। তাই আর তর্ক করলাম না। ঘটনাটি স্বীকার করায় হাসানের ওপর থেকে আমার রাগ পড়ে গেল। অবশ্য আমি খুব একটা রাগ করিওনি। আমি জানতাম, ঐ কবিতাটি আমার পক্ষে আবার রচনা করা খুবই সম্ভব।

আমি হাসানের পাশে গিয়ে বসলাম। বুঝলাম, মুখে সে যাই বলুক না কেন, হুলিয়া কবিতাটি তার কবিতা সম্পর্কিত ধারণাকে পাল্টে দিতে উদ্যত হয়েছিল বলেই ঐ কবিতাটিকে সে না পারছিল সহ্য করতে, না পারছিল উপেক্ষা করতে। ঐদিনই আমি পাবলিক লাইব্রেরীতে বসে আবার 'হুলিয়া' কবিতাটি নতুন করে লিখি। দ্বিতীয়বারের লেখাটি প্রথমবারের লেখা থেকে খুব একটা পৃথক হয়নি বলেই আমার ধারণা। আমি হাসানকে কবিতাটি পাঠ করে শোনাই। হাসান হুলিয়া-র দ্বিতীয় পাঠ শোনার পর একটি পরিবর্তনমুখী সময়ই যে এই কবিতাটি আমার হাত দিয়ে লিখিয়ে নিয়েছে, তা স্বীকার করতে বাধ্য হয়। এই কবিতার মধ্যে 'আমি' এবং 'দেশ' এমনভাবে মিশে গেছে যে একটি থেকে অন্যটিকে পৃথক করা কঠিন। আমার হুলিয়াকবলিত জীবনের অভিজ্ঞতা একদিন এ রকম একটি কবিতার রূপ নিয়ে বেরিয়ে আসবে—আমি ভাবিনি। কবিতাটি লেখার পর আমি খুব খুশি হই।

প্রথম কোথায় হুলিয়া কবিতাটি প্রকাশিত হয়েছিল, তার সন্ধান পাওয়া সম্ভব হয়নি, আগেই বলেছি। এ-প্রসঙ্গে কবি মুহম্মদ নুরুল হুদা তাঁর স্মৃতি থেকে বলেছেন, আমার কণ্ঠে এ কবিতা তিনি প্রথম বাংলা বিভাগের একটি অনুষ্ঠানে শুনেছিলেন। ঐ অনুষ্ঠানটি কলাভবনের ২০১৩ নম্বর কক্ষটিতে হয়েছিল এবং বাংলা বিভাগের প্রধান প্রফেসর আবদুল হাই ঐ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেছিলেন। আমারও এ রকম একটা অনুষ্ঠানের কথা মনে পড়ে। কিন্তু ঐ অনুষ্ঠানে আমি কোন কবিতাটি পড়েছিলাম, তা মনে পড়ে না। হতে পারে হুলিয়া।

পরে কবিতাটি জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের 'বই' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। আমার জানামতে সেটি ছিল হুলিয়া কবিতার পুনর্মুদ্রণ। ২১ জুলাই ১৯৭০ জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রে তরুণ কবিদের কবিতাপাঠের একটি আসর বসেছিল। ঐ কবিতা পাঠের আসরে আবদুল মান্নান, সৈয়দ আবু কায়সার, হুমায়ুন কবির, আবুল হাসান, মহাদেব সাহা, সানাউল হক খান, দাউদ হায়দার প্রমুখ কবি কবিতা পাঠ করেছিলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঐ আসরে আমি হুলিয়া কবিতাটি পাঠ করি। জনাব আবদুল গাফফার চৌধুরী ঐ আসরে উপস্থিত ছিলেন। ঐ কবিতা শোনার পর তিনি তাঁর জনপ্রিয় কলাম 'তৃতীয় মত'-এ হুলিয়া সম্পর্কে এ রকম মন্তব্য করেন :

> 'গত মঙ্গলবার ঢাকার জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রে আয়োজিত একটি কবিতা পাঠের আসরে উপস্থিত ছিলাম। কয়েকজন তরুণ কবি কয়েকটি বিস্ময়কর উজ্জ্বল কবিতা পাঠ করেছেন এই আসরে। শ্রাবণ সন্ধ্যায় এমন কবিতার আসর ঢাকায় আজকাল দুর্লভ। ভেবেছিলাম, অধিকাংশ তরুণ কবি এই আসরে এমন কবিতা পাঠ করবেন, যার মূল কথা হবে— 'সমাজ সংসার মিছে সব, মিছে এই জীবনের কলরব।'
>
> কিন্তু তা নয়। এই আসরে একটি আশ্চর্য সুস্থ, সাম্প্রতিক কণ্ঠ শুনলাম একটি কবিতায়। কবিতার নাম সম্ভবত হুলিয়া। কবির নাম নির্মলেন্দু গুণ। ফেরারী নায়ক গ্রামে ফিরেছেন। তার শৈশব ও কৈশোরের অতি-পরিচিত খাল-বিল, মাঠ-ঘাট, পথ সবই তার কাছে বহুবার দেখা ছবির মতো। অথচ কেউ তাকে চিনতে পারছে না। যেমন তাকে চিনতে পারেনি স্টেশনের গোয়েন্দা পুলিশ এবং টিকিট চেকার। নায়ক ফিরে এলো মায়ের কাছে, সংসারের প্রাত্যহিক দাবির কাছে। কিন্তু সবকিছু ছাপিয়ে সকলের কণ্ঠেই একটি প্রশ্ন—দেশের কী হবে? শেখ সাহেব এখন কী করবেন? কবিতার নায়ক জবাব দেয়... আমি এসবের কিছুই জানি না—আমি এসবের কিছুই বুঝি না।'
>
> জানি না কবিতাটির আখ্যান সংক্ষেপে বর্ণনা করতে পেরেছি কি না। দীর্ঘ কবিতা। তাতে শুধু কবিতার স্বাদ নয়, সাম্প্রতিক রাজনীতির যুগ-জিজ্ঞাসাও বেশ স্পষ্ট। এ যেন বাংলার ক্ষুব্ধ তারুণ্যের স্বগতোক্তি। এই জবাবের চাইতে বড় সত্য এই মুহূর্তে জন-চেতনায় আর কিছু নেই।

[দ্র : তৃতীয় মত : আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী।
পূর্বদেশ, ২৪ জুলাই ১৯৭০]

আবদুল গাফফার চৌধুরীর ঐ কলামটি তখন খুবই জনপ্রিয় ছিল বলে ঐ কলাম পাঠ করে অনেকেই আমার হুলিয়া কবিতার খোঁজ করেন। ঐ কবিতা আমার কবি-স্বীকৃতি লাভের শুধু সহায়তা করেনি, আমার প্রথম কাব্যগ্রন্থের প্রকাশক পাওয়ার ব্যাপারেও 'হুলিয়া' সহায়ক হয়েছিল। ঐ কবিতা প্রকাশিত হওয়ার পরই খান ব্রাদার্স এ্যান্ড কোং-এর মালিক জনাব মোসলেম খান সাহেব তাঁর পুত্রদের 'হুলিয়া'র কবিকে খুঁজে বের করার নির্দেশ দেন। তাঁর আগ্রহের কারণ অবশ্য শুধুই হুলিয়া ছিল না, আমার গুণ পদবীটিও ছিল তাঁর আগ্রহের অন্যতম উৎস। ছাত্রজীবনে তিনি মানিকগঞ্জের ইব্রাহিমপুর স্কুলে মণীন্দ্র গুণ মহাশয়ের ছাত্র ছিলেন, আমি ঐ মণীন্দ্র গুণের সঙ্গে রক্তসূত্রে যুক্ত কি-না, তা জানার জন্যও তিনি আমার সন্ধান করেন। ঐ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মণীন্দ্র গুপ্ত মহাশয় ছিলেন আমার জ্ঞাতিভাই। একদিন বিউটি বোর্ডিংয়ে ঢোকার পথে মোসলেম খান সাহেবের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। তিনি আমাকে হুলিয়া কবিতাটির জন্য প্রশংসা করেন এবং আমাকে আমার প্রথম কাব্যগ্রন্থের পাণ্ডুলিপি তৈরি করতে বলেন। জীবনানন্দ দাশের কাব্যসমগ্র প্রকাশ করার কারণে ঐ প্রকাশনীটি তখন সুধীমহলের, বিশেষ করে কবিমহলের সুনজরে পড়েছিল।

আমার কবিতার বই প্রকাশ করার জন্য আমি নওরোজ কিতাবিস্তান, মাওলা ব্রাদার্স এবং বইঘর-এর কাছে ধর্ণা দিয়ে ব্যর্থ হই। তাদের কেউ-ই আমার বই প্রকাশ করার ঝুঁকি নিতে রাজি হননি। তখন পর্যন্ত আধুনিক কবিতার বইয়ের কাটতি এমন কম ছিল যে, আল মাহমুদের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'লোক লোকান্তর' কবি-সাহিত্যিকের যৌথ উদ্যোগে গড়া কপোতাক্ষ নামক একটি প্রকাশনী থেকে প্রকাশ করতে হয়েছিল। শামসুর রাহমানের প্রথম কবিতার বইও প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর অনুরাগী-বন্ধু শিল্পপতি আবদুল বারিক চৌধুরীর (ABC নামেই তিনি ঢাকার সুধীমহলে পরিচিত ছিলেন) আর্থিক আনুকূল্যে। আবদুল মান্নান সৈয়দ তাঁর প্রথম কবিতার বই 'জন্মান্ধ কবিতাগুচ্ছ' নিজেই প্রকাশ করেছিলেন।

কবিতার বইয়ের এই প্রকাশনা ও পাঠক সংকটজনিত পরিস্থিতিটা আমার কাছে একেবারেই গ্রহণযোগ্য ছিল না। কয়েকজন প্রকাশক আমাকে নিরাশ করলেও আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, অচিরেই এই অবস্থার অবসান হবে। পাঠক যখন কবিতার দিকে ঝুঁকছে, তখন প্রকাশকরাও ক্রমশ কবিতার দিকে ঝুঁকবে।

খান ব্রাদার্স নিজ থেকে আমার কবিতার বই প্রকাশ করতে আগ্রহী হওয়ায় আমি খুব খুশি হই। আমার জেনারেশনের কবিদের মধ্যে এমন সৌভাগ্য হয় আমারই প্রথম।

আমার শিক্ষক, প্রখ্যাত ভাষাবিদ, প্রফেসর আবদুল হাই (৩ জুন ১৯৬৯) কমলাপুরের স্টেশনের কাছে ভোরের দিকে চলন্ত ট্রেনের নিচে পড়ে মৃত্যু বরণ করেন। স্বাভাবিক অবস্থায়, নীলক্ষেত এলাকা থেকে এত দূর তাঁর প্রাতঃভ্রমণে যাবার কথা নয়। তবে কি তিনি কোনো অজানা কারণে, কবি জীবনানন্দ দাশের মতো, আত্মহননের ঝুঁকি নিয়েই ওখানে প্রাতঃভ্রমণ সম্পন্ন করতে গিয়েছিলেন? কেন গিয়েছিলেন?

শোনা যায়, বাংলা বিভাগের অর্থসংক্রান্ত কিছু অবমাননাকর বিষয় নিয়ে তিনি মৃত্যুর কিছুদিন আগ থেকেই প্রচণ্ড মানসিক অশান্তির মধ্যে দিন কাটাচ্ছিলেন, যা একজন আত্মমর্যাদাসম্পন্ন সৎ-মানুষের জন্য ছিল খুবই দুঃসহ। ঐ দুঃসহ যাতনার হাত থেকে পরিত্রাণ লাভের জন্যই তিনি আয়োজন করেছিলেন ঐ অগস্ত্য যাত্রার? ঈশ্বর জানেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্যারের মৃত্যুতে আমি খুব ব্যথিত বোধ করি। তাঁর মৃত্যু আমাদের অপরাধী করে তোলে।

বঙ্গবন্ধু কবি হিসেবে আমাকে আগে থেকেই জানতেন। আগরতলা ও গোলটেবিলের চাপে হয়তো ভুলে গিয়েছিলেন। গাফফার ভাইয়ের কলাম পাঠ করার পর আমার কথা নতুন করে তাঁর মনে পড়ে। তিনি আমার সঙ্গে হুলিয়া নিয়ে আলাপ করার আগ্রহ প্রকাশ করেন।

[তথ্য : আবিদুর রহমান, সম্পাদক, দি পিপলস পত্রিকা।]

কিন্তু আমি বঙ্গবন্ধুকে সময় দিতে পারিনি বলেই তাঁর সঙ্গে ঐ কবিতা নিয়ে আমার আর কোনোদিনই কথা বলা হয়ে ওঠেনি। অনেকদিন পরে, আর বিলম্ব করা ঠিক নয় মনে করে একদিন আমি বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে ঐ কবিতাটি নিয়ে কথা বলতে তাঁর বত্রিশ নম্বর রোডের বাড়িতে যাই। কিন্তু তখন বড় বেশি দেরি হয়ে গিয়েছিল। বাংলাদেশকে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হওয়ার অপরাধে ঐ রাতেই তিনি পাক-বাহিনীর হাতে বন্দি হন।

তারিখটি ছিল ২৫ মার্চ ১৯৭১ সাল।

হুলিয়া কবিতার মধ্যে রফিজের স্টলের উল্লেখ আছে। রফিজ মানে ঐ রফিজ, যাকে আমি আমার স্কুল-জীবনের প্রথম স্বাধীন মানব বলে জানতাম। এই রফিজ পরে বারহাট্টা রেলস্টেশনে একটি চায়ের স্টল দেয়। ঐ স্টলে আমরা আড্ডা দিতাম। আমার হুলিয়া কবিতাটি বারহাট্টার বন্ধুদের হাতে পৌঁছালে পর, তারা দল বেঁধে রফিজের ওপর চড়াও হয়।

AMARBOI.COM

'পুনর্বার চিনি দিতে এসেও রফিজ আমাকে চিনল না...' হুলিয়া কবিতার ঐ পঙক্তিটি আমার বাল্যবন্ধুরা ব্যাখ্যা করে এইভাবে যে, আমি নিশ্চিয়ই কোনোদিন রফিজের স্টলে চা খেতে গিয়েছিলাম এবং রফিজ আমাকে যোগ্য সম্মান দেখায়নি, যার ফলে আমি মনের দুঃখে এরকম একটি পঙক্তি রচনা করেছি। আমার বন্ধুদের চাপের মুখে রফিজ তার ত্রুটি স্বীকার করে। সেই থেকে রফিজ আমার অপেক্ষায় ছিল। একদিন তার অপেক্ষার অবসান হয়। আমি পেটের পীড়ার কারণে কিছুদিনের জন্য গ্রামের বাড়িতে যাই। স্টেশনে নেমে রফিজের সঙ্গে আমি নিতান্তই এক সৌজন্য সাক্ষাতে মিলিত হই। আর ওটাই আমার জন্য কাল হয়ে দাঁড়ায়। রফিজ আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলে, 'আমারে তুমি মাফ কইরা দেও। আমি তোমারে লক্ষ্য করি নাই। বস চা খাও।'

কিসের মাফ? কিসের লক্ষ্য— আমি কিছুই বুঝে উঠতে পারি না।

তখন রফিজ আমাকে সকল ঘটনা খুলে বলে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি শুনে হাসি। ঐ পঙক্তিটির এমন ব্যাখ্যা যে হতে পারে, তা আমি স্বপ্নেও ভাবিনি। আমি তাকে বুঝিয়ে বলি যে, একটি কবিতা— এর মধ্যে কোনো সত্য নেই।

কিন্তু রফিজ মানতে রাজি নয়। সে আমার জন্য নিজ হাতে চা তৈরি করতে লেগে যায়। আমি কিছুতেই চা খাব না। যতই আমি আমার পেটের পীড়ার কথা বলি, রফিজের ধারণা ততই দৃঢ় হয় যে, আমি নিশ্চয় এখনও মনের মধ্যে রাগ পুষে রেখেছি, তাই চা খেতে চাচ্ছি না।

যারা তখন স্টলে উপস্থিত ছিল তারাও রফিজের হয়ে ওকালতি শুরু করে। শেষে পেটের অসুখের কথা ভুলে গিয়ে আমাকে রফিজের তৈরি চা নিম্নমানের ক্রিম বিস্কিট সহযোগে গলাধঃকরণ করে প্রমাণ দিতে হয় যে আমি ঐ ঘটনাটি নিয়ে আর কখনও কিছু লিখব না। চা পান শেষে আসে জর্দা-খয়েরযুক্ত পান। সেই পান চিবুতে-চিবুতে রফিজের সঙ্গে আবার কোলাকুলি করে তবেই তার স্টল থেকে বিদায় নেবার অনুমতি পাই।

বিকেলের মধ্যে সারা বারহাট্টায় রাষ্ট্র হয়ে যায় যে, আমি বাড়ি এসেছি এবং রফিজের সঙ্গে আমার সকল ঝগড়া মিটে গেছে। কী আর করা! বন্ধুর সঙ্গে ঝগড়া মিটে যাবার পর বন্ধুত্বে নতুন করে গাঢ়তা আসে। বিকেলে রফিজের স্টলে বসে বন্ধুদের কৌতূহলী চোখের সামনে অভিনয়ের মাধ্যমে আমাকে ঐ প্রবাদের সত্যতাও প্রমাণ করতে হয়।

AMARBOI.COM

জোনাকীতে কর্মরত থাকা অবস্থাতেই আমি একটি সত্যিকারের চাকরির সন্ধান পাই। শাহবাগ এলাকা থেকে একটি ইংরেজী দৈনিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পত্রিকার নাম দি পিপল। সম্পাদক আবিদুর রহমান। তিনি পত্রিকার মালিকও বটে। ধনী মানুষ। বঙ্গবন্ধুর অনুসারী। আগে ঐ পত্রিকাটি সাপ্তাহিক হিসেবে প্রকাশিত হতো। ১৪ আগস্ট ১৯৭০ থেকে পত্রিকাটি দৈনিক পত্রিকারূপে প্রকাশিত হতে শুরু করে। আবিদুর রহমান সাহেব ছিলেন একজন সৌখিন কবি ও গীতিকার। শাহবাগ এলাকা থেকে বোধহয় ওটিই ছিল প্রথম পত্রিকা। বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে হওয়ায় ঐ পত্রিকার চাকরি পাওয়ার জন্য আমি খুবই আগ্রহী হয়ে উঠি। কবিদের প্রতি দুর্বলতা ছিল বলেই সম্ভবত জনাব আবিদুর রহমান সাহেব আমাকে ঐ পত্রিকায় সাব-এডিটর হিসেবে নিয়োগ করেন। খ্যাতিমান লেখক-সাংবাদিক জনাব আবদুল গাফফার চৌধুরীর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

‘তৃতীয় মত’ কলামে আমার হুলিয়া কবিতার প্রশংসা প্রকাশিত হওয়ার ঘটনাটিও পিপল পত্রিকায় আমার কাজ পাওয়াতে সাহায্য করে। পত্রিকার নিউজ এডিটর ছিলেন জনাব আবদুস সোবহান সাহেব। অন্যতম সহকারী সম্পাদক হিসেবে যোগদান করেছিলেন ভাসানী ন্যাপের নেতা ও সাংবাদিক জনাব আনোয়ার জাহিদ। যেখানে সহকর্মী হিসেবে পাই খ্যাতিমান সাংবাদিক-নেতা শাহজাহান মিয়া, মাহফুজুল হক খান, আবদুল মতিন (পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের শিক্ষক) প্রমুখকে। প্রশাসনিক বিভাগের কামাল এবং তাহেরের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। কামাল ছিল আবিদ ভাইয়ের শ্যালক। আবিদ ভাইয়ের অনুকরণে আমার সঙ্গে দেখা হলেই তার কবি কবি ভাব এসে যেত। আমাকে উদ্দেশ্য করে কামাল আবৃত্তি করত— ‘কবি তবে উঠে এস, যদি থাকে প্রাণ’...।

আমি নাইট শিফট পছন্দ করতাম। তাতে সারাদিন ‘চাকরি নাই’ ভাবটা বজায় রেখে স্বাধীনভাবে ঢাকায় যেখানে খুশি ঘুরে বেড়াতে এবং যত খুশি আড্ডা দিতে পারতাম। নিউজ এডিটর সোবহান সাহেব আমাকে খুবই স্নেহ করতেন। ফলে আমার পছন্দমতোই তিনি আমাকে ডিউটি করতে দিতেন। রাতে কাজ করার আর একটা সুবিধে ছিল এই যে, অফিসের গাড়ি আমাদের বাসায় বা বাসার কাছাকাছি পৌঁছে দিত— দিনে বাসায় ফিরতে হতো নিজ খরচে। গভীর রাতে হাতে যখন সংবাদ অনুবাদ করার কাজ থাকত না তখন এলএনটিসি-র (লেইট নাইট টেলিফোন কল) ডিরেক্টর সেজে কত নামী-দামী মানুষের যে ঘুম ভাঙিয়েছি। ঐ কৃত-অপরাধের জন্য আজ আমি তাদের সকলের কাছে ক্ষমা চাই।

হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালের (বর্তমান শেরাটন) উল্টোদিকে গ্রীন হোটেলের সঙ্গেই ছিল দি পিপল পত্রিকার কার্যালয়। এখন ঐ গ্রীন হোটেলও নেই, পিপল পত্রিকাও নেই।

পিপল পত্রিকা অফিসের খুব কাছেই ছিল ‘সিদ্ধাবাবার আস্তানা’। ঐ আস্তানায় ঢাকার বেশকিছু নামী লেখক-সাংবাদিক-সঙ্গীতশিল্পী আসতেন। ওখানেই গায়ক আবদুল জব্বার, ওস্তাদ ফজলুল হক খান, ওস্তাদ খাদেম হোসেন খান ও রাজা হোসেন খানের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল। আবৃত্তিকার আশরাফুল আলম এবং রেডিওর অনুষ্ঠান ঘোষক মোসাব্বিরও সেখানে যেত। পরে মোসাব্বির নিজেই একজন সফল পীর হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে এবং গদিনশীন হয়। এখন, শুনেছি তাঁর প্রচুর ভক্ত-মুরিদ তৈরি হয়েছে।

পিপল পত্রিকায় চাকরি পাওয়ার সূত্রে দীর্ঘদিন অস্থির থাকার পর ঐ প্রথম আমার বেতন স্থির হয় মাসে ২৫০ টাকা বেসিক। ঐ পরিমাণ টাকা তখন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একজনের জন্য যথেষ্ট বলেই বিবেচিত হতো। তাই এ রকম একটি চাকরি পেয়ে আমি খুবই খুশি হই। সিদ্ধান্ত নিই, প্রথম মাসের বেতনের টাকাটা হাতে পেয়েই আমি একটা তুলতুলে নরম বালিশ কিনব। আহা বালিশ ছাড়া ঘুমাতে ঘুমাতে ঘাড় ও গর্দান একাকার হয়ে গেল। মামুনকে মুক্তি দিয়ে নতুন কোনো মেসে চলে যাবার চিন্তাও করি। আমি বুঝতে পারি মামুনের অসুবিধা হচ্ছে— কিন্তু মুখ ফুটে বেচারা কিছু বলতে পারছে না। সেই সুযোগও এসে যায়। আমার বন্ধু নাট্যকার মুজিব বিন হক নিউ মার্কেটের পেছনে নতুন পল্টন লাইনে একটি মেসে থাকত। আমি ঐ মেসে যাতায়াত করতাম। ফলে ঐ মেসের অন্য সদস্যদের (আতিক, কাশেম, হারুন, ফারুক) সঙ্গেও আমার ভালো সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। আতিক নিউ মার্কেটে একটি মনোহারি দোকানে কাজ করত। কাশেম কাজ করত নিউ মার্কেটের একটি জুয়েলারি শপে। হারুন এবং ফারুক ছিল ব্যাংক কর্মচারী। ফারুক একজন ভালো জুয়াড়ী ছিল। আতিকও মাঝে মাঝে খেলত।

সম্ভবত পিপল পত্রিকায় চাকরি পাবার দ্বিতীয় মাসের মাথায় আমি মোতালেব কলোনির পাট চুকিয়ে দিয়ে নিউ পল্টন লাইনের দীর্ঘ টিনশেড মেসটিতে উঠে যাই। সময়টা ১৯৭০-এর সেপ্টেম্বর বা অক্টোবর মাসের কোনো এক সময় হবে। সিট ভাড়া মাসে ২০ টাকা। খুব কম দামে একটি নড়বড়ে চকিও পাওয়া যায়। অল্পদিনের মধ্যেই আমি তোষক-বালিশ-চাদর এবং মশারির মালিকে পরিণত হই। চাকরির টাকায় একটি স্টেনলেস স্টিলের খাবারের থালাও কিনেছিলাম বলে মনে পড়ে। অন্যরা অন্যের থালায় খাক, আমি অন্যের থালায় খাব কেন?

AMARBOI.COM

তিন কক্ষবিশিষ্ট ঐ মেসটিতে স্নান-খাবারের ব্যবস্থাও ছিল। তবে ঐ মেসের প্রধান আকর্ষণ ছিল জুয়া। দশ পয়সা বিশ পয়সা থেকে শুরু করে চার আনা আট আনা পর্যন্ত চলত। জুয়া মানে তিন তাসের ফ্লাশ খেলা। রাতদিন আমাদের জুয়ার আসরটি থাকত জমজমাট। তখনই নিউ পল্টনের সমবয়সী কয়েকজনের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। আজিমপুর কবরের পশ্চিমে এখন যেখানে শহীদ মানিক বালিকা বিদ্যালয়টি অবস্থিত, ঠিক তার পেছনেই ছিল ঐ মেসটি। মেসের সামনে দিয়ে রিক্সা ঢোকার উপযোগী যে চিকন রাস্তাটি গেছে তার নাম গ্রীন লেন। এমন গুরুত্বহীন একটি ছোট্ট রাস্তার জন্য এমন একটি গুরুগম্ভীর চমৎকার নাম কারা রেখেছিল, জানি না। গ্রীন লেন নামটা আমার খুবই পছন্দ হয়।

আমার রুশ কবি মায়াকোভস্কির কথা মনে পড়ে। তিনিও রুশ বিপ্লবের আগে মস্কো শহরের একটি ছোট্ট গলির মধ্যে থাকতেন। রুশ বিপ্লবের পরে ঐ ছোট্ট বাড়িটিই মায়াকোভস্কি-মিউজিয়ামে পরিণত হয়। গ্রীন লেনের ঐ মেসে থাকার সময় আমার মনের মধ্যেও ঐ রকমের একটা স্বপ্ন দানা বেঁধেছিল। আমি ভাবতাম আমাদের দেশেও একদিন বিপ্লব হবে। আমি হব সেই বিপ্লবের কবি। একদিন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গ্রীন লেনের এই মেসটি সরকার কিনে নেবে এবং সরকারী উদ্যোগে এখানে আমার নামে গড়ে উঠবে একটি চমৎকার মিউজিয়াম। শত শত লোক প্রতিদিন ঐ মিউজিয়াম পরিদর্শন করতে আসবে। লুকিয়ে লুকিয়ে আমি ও রকম ভাবতাম আর নিজের মধ্যে এক ধরনের উত্তেজনা বোধ করতাম।

আমার লেখা 'গ্রীন লেনে রাত্রি' ও 'ভাড়া বাড়ির গল্প' (দ্রঃ কবিতা, অমীমাংসিত রমণী) নামক কবিতা দুটোতে ঐ এলাকার বর্ণনা আছে। কবিতা, অমীমাংসিত রমণী বইটি আমার তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ হলেও ঐ বইয়ের কিছু কবিতা পাকিস্তান আমলেই লেখা হয়েছিল। আমার দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'না প্রেমিক না বিপ্লবী'-র অনেক কবিতাই ৬৮-৬৯-৭০ সালের লেখা। যদিও বইটি বেরোয় ১৯৭২ সালে। এত অগোছালো ছিলাম যে, সব রচিত এবং পত্রিকায় প্রকাশিত কবিতা সংগ্রহ করে সারতে পারতাম না। তা ছাড়া কাব্যগ্রন্থের চরিত্র অনুসারে কবিতা নির্বাচন করতাম। তাতে পরের দিকের লেখা কিছু কবিতা হয়তো আগের বইয়ে চলে গেছে আবার আগের লেখা কবিতা হাতে থেকে গেছে পরের বইয়ের জন্য। অর্থাৎ গ্রন্থের প্রকাশকালের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সকল কবিতার রচনাকাল অনুমান করারও উপায় নেই। আমার উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপনের প্রভাব যে আমার কবিতার মধ্যেও পড়বে, সেটাই স্বাভাবিক।

মেস-সংলগ্ন দক্ষিণের ত্রিতল বাড়িটি শরীয়তুল্লাহ চেয়ারম্যানের বাড়ি, উত্তরে শাহজাহানদের বাড়িটিতে ছিল টিনের ঘর, পশ্চিমে মিলন-রতন-শাহজাদাদের একতলা দালান বাড়ি এবং পূর্বে শহীদ মানিক স্কুল। একটু দূরেই জহুরদের বাড়ি। গ্রীন লেনের পশ্চিমের সমান্তরাল রাস্তার পাশে জালালদের (জালাল আহমদ চৌধুরী) বাড়ি। নিউ পল্টনে নিজস্ব বাড়ি থাকলেও শরীয়তুল্লাহ সাহেবের শ্যালক, আমাদের মামা, নওয়াব জহুর, শাহজাদা জালাল আমাদের মেসেই অধিকাংশ সময় কাটাত।

ঐ মেসে নিউ পল্টনের বাইরে থেকে যারা নিয়মিত আসত তাদের মধ্যে ছিল সৈয়দ কাশেম আলী, দৌড়বিদ জহুরুল হক রতন, করিমুল হক, বজল, খোকা...।

দিনের পর দিন, রাতের পর রাত এবং কখনো কখনো দিন-রাত্রির ব্যবধান ঘুচিয়ে দিয়ে আমরা ঐ মেসে তিন তাসের মাধ্যমে আমাদের স্ব-স্ব ভাগ্য যাচাই করার প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হতাম। একে কেউ ইচ্ছে করলে নিজ দায়িত্বে জুয়াও বলতে পারেন, কিন্তু আমরা বিষয়টাকে সেভাবে বিবেচনা করতাম না। আমাদের কাছে এর অন্য একটা গভীর গোপন অর্থ ছিল। অর্থটা হচ্ছে এই যে, আমরা শুধু অর্থের জন্য খেলতাম না। ঐ খেলাটা ছিল আমাদের নেশা ও উত্তেজনার যোগানদাতা। একটা কম খারাপ কিছুর মধ্যে নিজেদের মত্ত ও মগ্ন রাখার মাধ্যম। এখনও আমি জুয়াটাকে ঐভাবেই দেখি। কারণ অর্থ আমার অন্বিষ্ট নয়, আমার অন্বিষ্ট আনন্দ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'তাসের প্রাণ আছে'—এই তথ্যটি আমি ঐ মেসেই আবিষ্কার করি।

আমার কারণে ঐ মেসে পরে ক্রমশ ঢাকার অনেক তরুণ কবি-সাহিত্যিক ও জুয়াড়ীর সমাবেশ ঘটে। মহাদেব সাহাও নিউ পল্টনের কাছাকাছি আজিমপুরে এসে তাঁবু ফেলেন। কবরস্থানের উত্তরে আজিমপুর রোডের ১১৩ নম্বর বাড়িটি ভাড়া নিয়ে সেখানে মেস করে কয়েকজন মিলে থাকতে শুরু করে। আমার মেস থেকে মহাদেবের মেসে যেতে পাঁচ মিনিটের বেশি সময় লাগত না। ফলে মহাদেবের সঙ্গে আমার যোগাযোগ বৃদ্ধি পায়।

মহাদেব ধোয়া কাপড়ের মতো খুব টিপটপ জীবনযাপন করত। স্বাস্থ্য খারাপ হতে পারে ভেবে সিগারেট পর্যন্ত খেত না। তার প্রচুর ভালো ভালো বইয়ের কালেকশন ছিল। রবীন্দ্রনাথের তাসের দেশ পড়ে আমাদের দেশের অধিকাংশ লেখকের মতোই সে-ও চার-জাতির তাসের নাম জেনেছিল। এ-ছাড়া তাসের সঙ্গে তার বাস্তব সম্পর্ক ছিল না। তাই আমার মেসের প্রতি মহাদেবের কোনো বিশেষ আকর্ষণ থাকবার কথাও নয়। ছাত্র ইউনিয়ন করা মহাদেব আমার মেসে খুব একটা আসতও না। আমিই মাঝে মাঝে মহাদেবের সঙ্গে তর্ক করবার লোভে ওর মেসে চলে যেতাম। কখনও আবুল হাসান আমার সঙ্গে থাকত। কখনও একা। মহাদেব ছিল উল্টাপাল্টা তর্কের মাস্টার এবং খুব সিরিয়াসলি ঝগড়া করতে পারত।

আবুল হাসান মাঝে মাঝে আমার মেসে থাকত। আমার যখন টুংটাং ভাগ্য পরীক্ষায় লিপ্ত থাকতাম, হাসান তখন পাশের ঘরে একাগ্র মনে কবিতা লিখত। হাসান খেলতও মাঝে মাঝে, তবে সে প্রফেশনাল জুয়াড়ী ছিল না। সে আমার কাছ থেকেই খেলা শিখে নিয়েছিল। জুয়ায় হারলে সে নিয়মিত তার হারানো টাকা ফেরত চাইত। বিরক্ত হয়ে আমরা ওর টাকা ফেরত দিয়ে ঝামেলা চুকিয়ে দিতাম। তাসের মাধ্যমে অর্থের হস্তান্তর প্রক্রিয়ার প্রতি হাসানের শ্রদ্ধাবোধ ও আস্থা ছিল না। যাদের ছিল, তাদের এখনও আছে। আমরা এখনও ঐ হস্তান্তর প্রক্রিয়া চালিয়ে যাচ্ছি।

আমি এখনও ঐ এলাকাতেই বাস করি। ঐ এলাকাটা আমার কাছে নিজের গ্রামের মতোই প্রিয় হয়ে উঠেছে। আমি জন্মের পর থেকে এক নাগাড়ে ষোল বছর গ্রামে কাটিয়েছি। আজিমপুর কবরের আশপাশে আমি কাটিয়েছি তার চেয়ে অনেক বেশি সময়। সে-কারণেই আজিমপুরকে আমি বলি, আমার দ্বিতীয় গ্রাম।

'কবরের পাশে থেকে হয়ে গেছি নিজেই কবর,
শহীদের পাশে থেকে হয়ে গেছি নিজেই শহীদ।'

পঙক্তি দু'টি আজিমপুর কবরের পাশ দিয়ে হাঁটার সময় একদিন আমার মনে এসেছিল।

[দ্রঃ আমাকে কী মাল্য দেবে দাও : কবিতা, অমীমাংসিত রমণী।]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমাদের খুব জমজমাট একটি আড্ডাস্থল ছিল আজিমপুর সরকারী নিউ মার্কেটে। নিউ মার্কেটের যে-দুটো রেস্তোরাঁয় আমরা তখন চুটিয়ে আড্ডা দিতাম সেগুলোর একটিও এখন আর নেই। একটির নাম ছিল মোনিকো। ওখানে খাদ্যদ্রব্যের দাম ছিল অপেক্ষাকৃত সস্তা। ফলে ওখানেই স্বল্পআয়ের তরুণ কবি-সাহিত্যিক ও আঁতেলদের ভিড় হতো বেশি। অন্য রেস্তোরাঁটি ছিল একটু উন্নতমানের। নাম লিবার্টি কাফে। যখন হাতে একটু বেশি পয়সা থাকত, আমরা লিবার্টিতে ঢুকে পড়তাম।

তবে মধ্য-ষাটের পরের কবি-সাহিত্যিক, যারা যখন পর্যন্ত ভালো চাকরি-বাকরি পায়নি, তারা মোনিকোতেই নিয়মিত বসত। উজালা বলে আরেকটি রেস্তোঁরা ছিল—ওখানেও আড্ডা হতো,—তবে আমি ওখানে খুব বেশি বসতাম না। মোনিকোর আড্ডার সদস্যদের মধ্যে ছিল এনামুল কবির ব্রহ্মা (উনি বয়সে আমাদের চেয়ে একটু বড় হলেও আমাদের সঙ্গেই তিনি নিয়মিত আড্ডা দিতেন। তিনি ছিলেন খুবই নিঃসঙ্গ প্রকৃতির মানুষ।) কবি আবুল হাসান, কবি হুমায়ুন আজাদ, কবির মজুমদার, কবি সানাউল হক খান, কবি হুমায়ুন কবির, কবি মহাদেব সাহা, কবি মুহম্মদ নূরুল হুদা, কবি অরুণাভ সরকার, কবি আবুল কাশেম, কবি জাহিদুল হক, কবি শামসুল ইসলাম, গল্পকার বিপ্রদাশ বড়ুয়া, কবি-গল্পকার সুব্রত বড়ুয়া, অনুবাদক আখতার উন নবী, শফিকুর রহমান (এখন সাংবাদিক-নেতা), কবি-নাট্যকার সেলিম আল দীন, নাট্য সংগঠক মুজিব বিন হক, গল্পকার-সাংবাদিক শেখ আবদুর রহমান, কবি সাযযাদ কাদির, কবি মাহবুব সাদিক, কবি শাহ্ নূর খান, কবি-ইঞ্জিনিয়ার হাবীবুল্লাহ সিরাজী, কবি-ইঞ্জিনিয়ার সুকোমল বল, কবি মাহমুদ আবু সায়ীদ, কবি হেলাল হাফিজ, কবি-ডাক্তার সুকান্ত চট্টোপাধ্যায়, গল্পকার বিপ্লব দাশ, সাংবাদিক-কবি হীরেন দে, কবি রাজীব আহসান চৌধুরী, সাহিত্য-সমালোচক রফিক কায়সার, কবি রফিক নওশাদ, আবৃত্তিকার আশরাফুল আলম, গীতিকার শহীদুল ইসলাম, আবৃত্তিকার তারিক সালাউদ্দিন মাহমুদ, শিল্পী মুনশী মহিউদ্দিন, শিল্পী কাওসার আহমদ চৌধুরী, ছড়াকার আখতার হুসেন, কবিতানুরাগী বন্ধু শাহ নজরুল ইসলাম, গল্পকার বারেক আবদুল্লাহ, কবি শাহাদাৎ বুলবুল, গল্পকার বুলবুল চৌধুরী, কবি অসীম সাহা, কবি মাকিদ হায়দার, কবি দাউদ হায়দার প্রমুখ।

অসীম খুব ভালো কীর্তন গাইত। আমরা সন্ধ্যার দিকে পাবলিক (তখন পাবলিক লাইব্রেরীটি ছিল ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরীসংলগ্ন। এখন ওটা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরীর সঙ্গে মিশে গেছে।) লাইব্রেরীর সবুজ ঘাসের লনে গোল হয়ে বসে অসীমের কীর্তন শুনতাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শাহ্ নজরুল ইসলাম একসময় হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে ফ্রন্ট অফিস ম্যানেজার হিসেবে করাচীতে কর্মরত ছিল। ফলে ভালো ইংরেজী এবং পাঞ্জাবী ও পশতু ভাষা তার আয়ত্তে ছিল। ঐ চাকরি ছেড়ে দিয়ে ঢাকায় এসে সে একটি বিদেশী তেল কোম্পানির এজেন্ট হিসেবে নিযুক্ত হয়। শাহ্ থাকত ঢাকা হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে। তার জন্য একটি কক্ষ বরাদ্দ ছিল। আমার এবং আবুল হাসানের সঙ্গে শাহর খুব বন্ধুত্ব হয়ে যায়। সে ছিল খুব কবিতার ভক্ত। নিজে কবিতা লিখত না। আমাদের কবিতা খুব মন দিয়ে পড়ত। প্রেম করত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি মেয়ের সঙ্গে।

আমরা মাঝে মাঝে ওর কল্যাণে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে মূল্যবান খাদ্য গ্রহণের সুযোগ পেতাম। কেন জানি ওর নগদ টাকার অভাব ছিল। খুবই ফিউজিটিভ ধরনের মানুষ ছিল শাহ। কী কাজ করে তা কাউকে খুলে বলত না। একটা গভীর রহস্যজালের ভিতরে নিজেকে সর্বদা বন্দি করে রাখতে ভালোবাসত। চমৎকার পোশাক পরত। খুব স্মার্ট ছিল। শরীফের ক্যান্টিনে দুপুরে আমি যদি শাহকে চা-বিস্কিট ও বিরিয়ানি খাওয়াতাম, বিনিময়ে সে রাতে ইন্টারকন্টিনেন্টালে আমাকে খাওয়াত।

কিছুদিন পর, এক-পর্যায়ে আমরা জানতে পারি যে, শাহ বিবাহিত। কুমিল্লায় গ্রামের বাড়িতে ওর স্ত্রী এবং সন্তান আছে। তা থাকলে কী হবে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যে-মেয়েটির সঙ্গে ও প্রেম করত, পরে তাকে বিয়েও করে। মেয়েটির বাসা ছিল নারায়ণগঞ্জে। ঐ মেয়েটির মন জয় করবার সুবিধের কথা বিবেচনা করেই, শাহ আমাদের মাধ্যমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবন এলাকায় প্রবেশ করে। পরে জেনেছিলাম, শাহর প্রেমিকা আমার ও আবুল হাসানের কবিতার ভক্ত ছিল। আমরা শাহর বন্ধু— তার প্রেমিকার কাছে এইটে প্রমাণ করার জন্যই সে আমাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতায়। প্রিয় নারীর চিত্তজয়ের জন্য এমন পরিকল্পিত পদক্ষেপ গ্রহণের ঘটনা খুব বেশি দেখা যায় না। তাই ঐ নারীকে পেতে আমরা শাহকে সাহায্য করেছিলাম। প্রথমে আমাদের অজ্ঞাতসারে, পরে অনেকটা জেনেশুনেই।

মোনিকো রেস্তোরাঁয় রফিক নামে একটি কিশোর কর্মচারী ছিল। আমাদের দেখাদেখি এক-পর্যায়ে রফিকও নিজেকে কবি বলে ঘোষণা করে। এবং তার সুফলও সে লাভ করে। বিভিন্ন পত্রিকায় তার কবিতা ছাপা হয় এবং তাকে নিয়ে কিছু ফিচারও প্রকাশিত হয়।

বিকেলের দিকে নিউ মার্কেটটি মোটামুটিভাবে বলা যায় ঢাকার তরুণ কবি-সাহিত্যিকদের দখলেই চলে যেত। ঐ দখল চালু থাকত বেশ রাত অবধি। এখন নিউ মার্কেটের ভিতরে যেখানে মসজিদ তৈরি হয়েছে সেখানে তখন একটি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চমৎকার ছোট্ট পার্ক ছিল। আমরা গরমের দিনে মাঝে-মাঝে ঐ পার্কটিতেও ছোট-ছোট গ্রুপে বিভক্ত হয়ে বসতাম। আমাদের মধ্যে সমকালীন বাংলা ও বিশ্বের সাহিত্য নিয়ে আলোচনা হতো। দেশ-বিদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়েও আমরা মতবিনিময় করতাম। তবে আমরা যে ক্রমশ খুব বড় ধরনের পরিবর্তনের মুখে এসে দাঁড়িয়েছি; অল্প কিছুদিনের ব্যবধানেই যে আমরা একটি স্বাধীন দেশের নাগরিকে পরিণত হব, তা আমাদের অনেকেই বিশ্বাস করতে পারত না। আমি নিজে ঐ রকমের একটা পরিবর্তন চাইতাম বলেই আমার প্রত্যাশিত পরিবর্তনের ছবিটি আমার চোখে অকারণেও ভেসে উঠতে পারে বলে আমি তখন মনে করতাম। তবে আমরা সবাই আমাদের মনের ভিতরে একটা প্রচণ্ড বাঁধ ভাঙা চঞ্চলতাকে অনুভব করতাম। সেই চঞ্চলতার টানে জীবনের চেয়ে মৃত্যুর আরাধনাই আমাদের অধিকতর কাম্য হয়ে উঠেছিল। কিন্তু কেন এমনটি হচ্ছিল, তার কারণ আমাদের জানা ছিল না।

লিটল ম্যাগাজিনের জন্য বিখ্যাত ছিল নলেজ হোম। নলেজ হোমে আমরা যেতাম ঢাকা ও ঢাকার বাইরে থেকে প্রকাশিত নতুন লিটল ম্যাগাজিনের সন্ধানে। নলেজ হোমের মালিক মজলিশ ভাই আমাদের খুব খাতির করতেন। তিনি প্রকাশক হিসেবে খুব একটা সফল হতে পারেননি। পুস্তক বিক্রেতা হিসেবেও না। সেজন্য তিনি যেমন দায়ী—আমরাও তার জন্য কম দায়ী নই। ঘন্টার পর ঘন্টা ঐ দোকানে দাঁড়িয়ে এবং কখনও চেয়ারে বা টুলে বসে আমরা না কিনেই ম্যাগাজিনগুলো পড়তাম। সেখানে কলকাতার পত্র-পত্রিকাও আসত, যেমন দেশ, চতুরঙ্গ ইত্যাদি। তিনি কিছু বইও প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু প্রকাশক হিসেবে দাঁড়াতে পারেননি। শেষ পর্যন্ত তাঁকে রণে ভঙ্গ দিয়ে ব্যবসা গুটাতে হয়। তিনি বহু স্মৃতিবিজড়িত তাঁর ঐ প্রিয় দোকানটি বিক্রি করে দিতে বাধ্য হন। শিশু-সাহিত্যিক মরহুম গোলাম রহমানের প্রিমিয়ার বুকস-এর মতোই খান মসলিশ ভাইয়ের নলেজ হোমও এখন আমাদের কাছে এক বিষাদময় স্মৃতিতে পরিণত হয়েছে।

নলেজ হোমের পাশেই ছিল মহিউদ্দিন এ্যান্ড সন্স এবং নওরোজ কিতাবিস্তান। মহিউদ্দিন বিশেষভাবে বিখ্যাত ছিল বিদেশী সাহিত্যের বইয়ের জন্য। নওরোজে দেশী বইয়ের পাশাপাশি বিদেশী বইও পাওয়া যেত। আমাদের মতো উপার্জনহীন তরুণ কবি-সাহিত্যিকদের অত্যাচারে ঐ তিনটি বইয়ের দোকানের ব্যবসা খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হতো। মাঝে মাঝে ঐ দোকানগুলো থেকে বই চুরিও যেত। ফলে আমরা যখন ঐ সব দোকানে ঢুকতাম তখন আমাদের চোখে চোখে রাখবার জন্য দোকানের মালিক ও কর্মচারীদের ওপর খুবই বাড়তি চাপ পড়ত। নওরোজ কিতাবিস্তান থেকে চুরি করা কয়েকটি বইয়ের কথা আমার এখনও স্পষ্ট মনে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পড়ে। পেঙ্গুইন মডার্ন পোয়েটস সিরিজের দু তিনটে সংখ্যা তার অন্তর্ভুক্ত। একদিন নওরোজের মালিক কাদের খান সাহেবের চোখে ধুলো দিয়ে ঐ কাজে আমি ও আবুল হাসান খুবই সফলকাম হয়েছিলাম। সেদিন সন্ধ্যায় আমি সংগ্রহ করেছিলাম পেঙ্গুইন মডার্ন পোয়েটাস সিরিজের ঐ সংকলনটি; যেখানে এ্যালেন গীনসবার্গ, গ্রেগরী করসো এবং লরেন্স ফার্লিংহেটি—এই তিন মার্কিন বীট-বংশীয় কবির কবিতা ছিল।

আবুল হাসান সংগ্রহ করেছিল ডিএইচ লরেন্সের 'সনস এ্যান্ড লাভারস' এবং ফ্রানজ কাফকার ডায়রী। তারপর বেশ কয়েকদিন আমরা আর নওরোজে যেতাম না, যদি কথা ওঠে। ঘটনাটি ভুলে যাবার জন্য কাদের ভাইকে আমরা কিছুটা সময় দিতাম। এটাই নিয়ম।

দিনের দিকে নওরোজে বসত কাদের খান সাহেবের ছোট ভাই কবির খান। কবির খান ছিল আমাদেরই বয়সী। নিজে কখনও কিছু লিখত না, কিন্তু আমাদের সবার লেখারই সমালোচনা করত। কবিদের সঙ্গে আমাদের বেশ বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছিল। লেখা প্রকাশের পর কবির খান আমাকে শুধরে দিয়ে জানিয়েছে, কাফকার ডায়রী ১৯৭২-এ ঢাকায় আসে। তার আগে নয়। সুতরাং স্বাধীনতার আগে আবুল হাসানের পক্ষে ঐ বই চুরি করাটা একেবারেই অসম্ভব। তা সময়ের হেরফের কিছুটা হলে হতেও পারে, কিন্তু চুরির ঘটনাটি সত্য।

মার্কিন বীট কবিরা তখন আমাদের মন জুড়ে ছিলেন। বুদ্ধদেব বসু বীট বংশের গুরু গীনসবার্গের ওপর একটি চমৎকার প্রবন্ধ রচনা করে আমাদের মনে আমেরিকার গ্রীনিচ ভিলেজ এবং বীট বংশের কবিদের সম্পর্কে প্রবল কৌতূহলের সৃষ্টি করেছিলেন। পরে ষাট দশকের গোড়ার দিকে গীনসবার্গ যখন ভারত সফরের এক-পর্যায়ে কিছুদিনের জন্য কলকাতায় আসেন, তখন কলকাতার কবিদের মধ্যে গীনসবার্গের কাব্যভাবনা ও বোহেমিয়ান জীবনযাপনের প্রভাব পড়ে।

কলকাতা হয়ে ঐ নবতরঙ্গের ঢেউ আচড়ে পড়ে ঢাকাতেও। আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ সম্পাদিত কণ্ঠস্বর পত্রিকার উদ্বোধনী সংখ্যাটিতে তাই কলকাতার রাগী জেনারেশনের অন্যতম পুরোধা-প্রবক্তা কবি মলয় রায় চৌধুরীর কবিতাও প্রকাশিত হতে দেখা যায়।

পূর্ব বাংলার কবি বেলাল চৌধুরী তখন কলকাতায় থাকতেন। শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, তারাপদ রায়, মলয় রায় চৌধুরীদের সঙ্গে মিলে তিনি 'কৃত্তিবাস' পত্রিকা প্রকাশ করতেন। তিনি ছিলেন সত্যিকারের জন্ম-বোহেমিয়ান। তবে বোহেমিয়ান হিসেবে যতটা, কবি হিসেবে তিনি ততটা শক্তিশালী ছিলেন না। তখন শক্তিমান কবি হিসেবে ওপার বাংলায় কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের আবির্ভাব ঘটে। শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের নেশাগ্রস্ত বোহেমিয়ান জীবনযাপনের মুখরোচক গল্প তখন আমাদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাছে এসে পৌঁছাত। তাঁরা তখন 'পোঁদের জ্বালায়' রাতভর কলকাতা নগরী শাসন করে বেড়াতেন। [কথাটা শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের রচনা।]

আমরাও কলকাতার বোহেমিয়ান কবিদের জীবনযাপন সম্পর্কে শোনা চমকপ্রদ গল্পের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এমনভাবে জীবনযাপন করতাম, যাতে আমাদের জীবনযাপনের গল্পগুলোও কলকাতার কবিদের চেয়ে পিছিয়ে না পড়ে।

দুই দেশের মধ্যে পত্র-পত্রিকা ও বইয়ের আদান-প্রদান বন্ধ থাকলেও কলকাতার কবিদের কবিতা ও তাদের জীবনযাপন-পদ্ধতি সম্পর্কে আমাদের মধ্যে যেমন জানবার কৌতূহল ছিল, আমাদের সম্পর্কেও ঠিক সে রকমই আগ্রহ ছিল কলকাতার কবিদেরও।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নেতৃত্বে ধর্মনিরপেক্ষ বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলন যতই দানা বাঁধতে থাকে, পূর্ব বাংলার সাহিত্য, বিশেষ করে পূর্ব বাংলার কবিতা সম্পর্কে কলকাতার পাঠক ও কবি-সাহিত্যিকদের আগ্রহও ততই বাড়তে থাকে। কলকাতা থেকে তাই পূর্ব বাংলার কবিতার বেশ ক'টি সংকলন তখন প্রকাশিত হয়। এর মধ্যে একটি সংকলন সম্পাদনা করেন শ্রী মিহির আচার্য, একটি কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়। কিছু পরে ১৯৭১-এ কবি বিষ্ণু দে-ও বাংলাদেশের কবিতার একটি সংকলন সম্পাদনা করেন।

সম্ভবত ১৯৬৮ সালে শক্তি চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত দুই বাংলার আধুনিক কবিতার একটি সংকলনে আবুল হাসানের একটি কবিতা স্থান পায়। কবিতাটির নাম ছিল 'প্রতিনির্জনের আলাপ'। শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের মতো গুরুত্বপূর্ণ কবি কর্তৃক সম্পাদিত ঐ সুমুদ্রিত কবিতা সংকলনটিতে আবুল হাসানের কবিতা দেখে আমার খুবই ঈর্ষা হয়। মনে মনে ভাবি— শামসুর রাহমান, আল মাহমুদ, শহীদ কাদরী— এঁরা অনেক আগেই কলকাতার পাঠকদের কাছে পৌঁছে বসে আছেন। এবার আবুল হাসানও গেল। আমিই শুধু পড়ে থাকলাম ঘাটে। আমার কবিতা কি ওপার বাংলার কবিতা পাঠকদের কাছে কোনোদিনই পৌঁছাবে না?

AMARBOI.COM

কিছুদিনের মধ্যেই আমার সকল ঈর্ষা ও অপেক্ষার অবসান ঘটে। আমি আমার অন্যতম প্রিয় কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের স্বহস্ত লিখিত একটি পোস্টকার্ড-পত্র পাই। কোন্ ঠিকানায় পত্রটি এসেছিল, আমার এখন আর মনে পড়ে না। ঐ সুলিখিতপত্রে তিনি জানান যে, আমার 'হুলিয়া' কবিতাটি তিনি তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিতব্য 'পূর্ব বাংলার শ্রেষ্ঠ কবিতা' সংকলনে ছাপতে চান,—সেজন্য আমার একটি লিখিত অনুমতি দরকার।

শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের চিঠি পেয়ে আমার খুব আনন্দ হয়। আমি কালবিলম্ব না

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করে কবিতা প্রকাশের অনুমতিসহ দ্রুতই তাঁর পত্রের জবাব দিই। পরে কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত ঐ কবিতা-সংকলনটিতে আমার হুলিয়া কবিতাটি প্রকাশিত হয় এবং একইসঙ্গে দুই বাংলাতেই কবিতাটি জনপ্রিয়তা লাভ করে।

পেঙ্গুইন মডার্ন পোয়েটস্ সিরিজের বইটি হাতে পাওয়াতে বীট জেনারেশনের তিন প্রধান কবির বেশকিছু কবিতা একসঙ্গে পাঠ করার সুযোগ হয়। পূর্ব বাংলার কাদা মাটির দেশে আমার জন্ম হলেও কী কারণে জানি না, আমার রক্তের মধ্যে লুকানো ছিল পশ্চিমের বীট বংশের বীজ। জীবনের বিধ্বংসী প্রবণতাকে প্রকাশ করার জন্য যেরূপ প্রস্তুতি থাকা প্রয়োজন, আমার চারপাশের বিবেচিত বড় কবিদের মধ্যে ছিল তার প্রচণ্ড অভাব। আমাদের অধিকাংশ কবির বেলাতেই কণ্ঠস্বর বর্ণিত 'গৃহপালিত' অভিধাটি প্রযোজ্য ছিল। এমতাবস্থায় মার্কিন বীট কবিদের কাছে মুক্ত, স্বাধীন ও বিধ্বংসী জীবনযাপনের পক্ষে সমর্থন পাওয়ায় আমি খুবই উপকৃত বোধ করেছিলাম।

শিশু-সাহিত্যিক গোলাম রহমান সাহেবের বইয়ের দোকানটির নাম ছিল প্রিমিয়ার বুকস্। সেখানে বর্ষীয়ান লেখকদের আগমন ঘটতো। যেমন কবি আবদুল কাদির, কবি মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ, কবি মনোমোহন বর্মণ, কবি আবদুস সাত্তার, কবি মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান প্রমুখ। কবি আবদুল কাদিরও ঐ দোকানে মাঝে মাঝে বসতেন।

প্রিমিয়ার বুকস্-এ বসেই কবি আবদুল কাদির একদিন 'কণ্ঠস্বর'-এর কবিতা সংখ্যায় প্রকাশিত কবি রফিক আজাদের লেখা 'বেশ্যার বিড়াল' কবিতাটি পাঠ করেন এবং কবিতা পাঠান্তে পাপ স্খলনের জন্য পুরো এক ঘটি পানি দিয়ে অজু করে পাকসাফ হয়ে মাগরিবের নামাজ আদায় করেছিলেন।

আমাদের মধ্যে কবি রফিক আজাদই প্রথম নিজেকে বেশ্যার বিড়ালের সঙ্গে তুলনা করে, মানবিক মমতার সঙ্গে কবিতায় গণিকার গৌরবগাথা রচনা করেছিলেন। লন্ডন প্রবাসী কবি সৈয়দ শামসুল হক—এর 'বৈশাখে রচিত পঙক্তিমালা' প্রকাশিত হয় আরও কিছু পরে।

'আলস্যে নেশায় বুঁদ—আমি এক বেশ্যার বিড়াল;
সারারাত শুয়ে থাকি অনাবৃত উষ্ণ তলপেটে
বিছিয়ে কোমল থাবা।—রিরংসায় কেঁপে ওঠে নারী
—আমি তার সর্বগ্রাসী উন্মুখর উরুর আস্বাদে।

....

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যখন শীতার্ত থাকি, আমি তার শরীরের ওমে
পুনর্বার অলৌকিক শিহরণপুঞ্জে জেগে উঠি॥
আমাদের খেলা জমে শীতগ্রীষ্মে, ব্যতিক্রমহীন—
প্রণয়রজ্জুতে বাঁধা আমি আর সেই যাদুকরী।'

[দ্রঃ কণ্ঠস্বর : কবিতা সংখ্যা : দ্বিতীয় বর্ষ, ষষ্ঠ সংখ্যা, এপ্রিল ১৯৬৭।]

গোলাম রহমান সাহেব আমাদের খুবই স্নেহের দৃষ্টিতে দেখতেন। এমন অমায়িক হাসিতে আমাদের বশ করে ফেলতেন যে, আমরা আর তাঁর দোকান থেকে বই চুরি করতাম না। তবে চুরি করার মতো বই ঐ দোকানে খুব একটা থাকতও না। গোলাম রহমান সাহেব ছিলেন খুবই সাদাসিধে ধরনের মানুষ। নির্জন প্রকৃতির। শিশুদের জন্য লিখতে লিখতে এবং শিশুদের কথা ভাবতে-ভাবতে তাঁর চেহারার মধ্যেও একটা শিশুসুলভ ভাব এসে গিয়েছিল। তাঁর শিশুর সারল্যমাখা হাসিমুখটির কথা আমার এখনও চোখে ভাসে। তিনি গল্পও লিখতেন। 'ক্যাফে দ্য খোরাসান' নামে তাঁর একটি গল্পগ্রন্থও প্রকাশিত হয়েছিল।

কী কারণে জানি না, ১৯৭২ সালে গোলাম রহমান সাহেব তাঁর পুরনো ঢাকার বাড়িতে এক নির্মম হত্যাকাণ্ডের শিকার হন।

এ কথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, ষাট দশকের গণজাগরণ-পর্বে রচিত আমাদের শিল্প-সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনটি নিউ মার্কেটের কাছে নানাভাবে ঋণী।

গোলটেবিল বৈঠকে আইয়ুবের মেনে নেয়া দাবি ফেডারেল পার্লামেন্টারি পদ্ধতির সরকার ও প্রাপ্ত-বয়স্কের সরাসরি ভোটে জন-প্রতিনিধি নির্বাচনের বিধানের সঙ্গে ইয়াহিয়ার দ্বিমত ছিল না। এর অতিরিক্ত, পশ্চিম পাকিস্তানে এক ইউনিট প্রথা ভেঙ্গে দেয়া সম্পর্কিত দাবির সঙ্গেও বরং তিনি একমত পোষণ করেন। সমস্যা দেখা দেয়, এসব দাবিদাওয়ার ভিত্তিতে নির্বাচন অনুষ্ঠানের আইনগত ভিত্তি নিয়ে। কারণ, প্রচলিত সংবিধানে জনসংখ্যার ভিত্তিতে নির্বাচনে 'এক ব্যক্তি এক ভোট' কিংবা ফেডারেল পদ্ধতির বিধান, এর কোনোটিই নেই।

১৯৫৬ সালের সংবিধানকে পুনর্বহাল করে নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যাপারে বিরোধী পক্ষের কারো কারো সম্মতি থাকলেও আওয়ামী লীগসহ মূল বিরোধীপক্ষ এর বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট অবস্থান নেয়। ফলে ১৯৫৬ এর সংবিধানকেও নির্বাচনী কাজে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পুনবর্হাল সম্ভব ছিল না। এমতাবস্থায় প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া একটি আইনগত কাঠামো (Legal framework Order, LFO) তৈরি করে তার ভিত্তিতে নির্বাচন করার সিদ্ধান্ত নেন। নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত জাতীয় সংসদ দেশকে একটি নতুন সংবিধান উপহার দেবে, এরূপ সিদ্ধান্ত হয়।

সিদ্ধান্ত মোতাবেক জনসংখ্যার ভিত্তিতে এক ব্যক্তি এক ভোটের বিধানসম্বলিত আইনগত কাঠামো আদেশ ঘোষিত হয় ১৯৭০-এর ৩০ মার্চ। সেই আদেশনামায় ৫ অক্টোবর ১৯৭০ জাতীয় পরিষদের (ন্যাশনাল এসেম্বলী) নির্বাচনের দিন ধার্য করা হয় এবং প্রাদেশিক পরিষদসমূহের (প্রভিনশিয়াল এসেম্বলী) নির্বাচন ২২ অক্টোবরের মধ্যে অনুষ্ঠিত হবে বলে জানানো হয়। পরবর্তীতে পূর্ব পাকিস্তানে ভয়াবহ বন্যার কারণে নির্বাচন পিছিয়ে যায়। ঐ বন্যায় ঢাকা শহর চারদিক থেকে ছুটে আসা প্লাবনের জলে ঢাকা পড়ে গিয়েছিল। আমার 'জলের সংসার' কবিতাটি তখনকার বন্যার পটভূমিতে রচিত। ঐ বন্যার কারণে স্থির হয়, অতঃপর জাতীয় পরিষদের নির্বাচন ৭ ডিসেম্বর এবং প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন ১৯ ডিসেম্বরের মধ্যে অনুষ্ঠিত হবে।

[তথ্যসূত্র : মুক্তিযুদ্ধ জনযুদ্ধ ও রাজনীতি : মজিবর রহমান]

AMARBOI.COM

দেশে নির্বাচনী জোয়ার ও জ্বর আসে।

৭ জুন ঐতিহাসিক ৬ দফা দিবসে প্রধান বিরোধী দল আওয়ামী লীগ রেসকোর্স ময়দানে জনসভা ডেকে নির্বাচনী প্রচার অভিযানের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করে। ঐ বিশাল জনসভায় বঙ্গবন্ধু আগামী নির্বাচনকে স্বায়ত্তশাসন তথা ৬-দফার প্রশ্নে গণভোট হিসেবে অভিহিত করেন। বসন্তের আগমনে কোকিলের ডাকে বাঙালির মন যেরকম সাড়া দেয়, বঙ্গবন্ধুর ডাকে পূর্ব বাংলার মানুষও সেরকমই সাড়া দিতে শুরু করে। তিনি যেখানেই যান সেখানেই স্মরণকালের বৃহত্তম জনসমাবেশ ঘটতে থাকে।

মাওলানা ভাসানীর দলে নির্বাচন প্রশ্নে বিভক্তি দেখা দেয়। নির্বাচনবিরোধীরা 'ভোটের আগে ভাত চাই' বলে নির্বাচন বানচাল করার ব্যর্থ চেষ্টা চালায়। ডানপন্থি দলগুলো বঙ্গবন্ধুকে ভারতের দালাল এবং ইসলামের দুশমন হিসেবে আখ্যায়িত করে ৬ দফার ষড়যন্ত্র সম্পর্কে দেশবাসীকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানায়। কিন্তু নির্বাচনের দিন যতই এগিয়ে আসতে থাকে নৌকার পালে হাওয়ার বেগ ততই বৃদ্ধি পায়। 'জয় বাংলা' স্লোগানটি নির্বাচনের রণধ্বনিতে পরিণত হয়। আমি বুঝতে পারি, নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুর বিপুল বিজয় এখন শুধুই সময়ের ব্যাপার। আসন্ন নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুকে যদি আমি ভোট না দিই, তাতেও তাঁর কোনো ক্ষতি হবে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইয়াহিয়া খান নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দলগুলোকে নির্বাচনী বক্তব্য প্রচারের জন্য রেডিও এবং টেলিভিশন উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন। ঐ সময় পশ্চিম পাকিস্তানের বিখ্যাত কার্টুনিস্ট আজিজ ঢাকায় আসেন। টিভি ভবনটি তখন ছিল ডিআইটিতে। আমি মাঝে মাঝে ওখানে যেতাম। টিভির অনুষ্ঠান প্রযোজক আবদুল্লাহ আল মামুন, মোমিনুল হক, মোস্তাফিজুর রহমান, জিয়া আনসারী... এঁদের সঙ্গে আমার ভালো সম্পর্ক ছিল। টিভিতে অনুষ্ঠান পাবার আশায় আমি তাঁদের পেছনে লাইন দিতাম।

মোস্তাফিজুর রহমানের একটি অনুষ্ঠানে, একসময় আমি কিছু গানও লিখেছিলাম বলে মনে পড়ে। আমি একটি সিনেমার জন্যও গান লিখেছিলাম। সম্ভবত মামুন বা রাজা হোসেন খানের মাধ্যমে আমার পরিচয় হয়েছিল চিত্রগ্রাহক আবদুস সামাদের সঙ্গে। সামাদ ভাই 'সূর্য সংগ্রাম' নামে একটি ছবি করার পরিকল্পনা করেছিলেন। ছবির সঙ্গীত পরিচালক হিসেবে আসেন রাজা হোসেন খান এবং সুজেয় শ্যাম। সামাদ ভাইয়ের স্ত্রী ছিলেন চিত্রাভিনেত্রী রোজী। তাঁরা তখন গ্রীন রোডে একটি একতলা বাসায় থাকতেন। ঐ পরিবারের সঙ্গে আমার বেশ ভালো সম্পর্ক গড়ে ওঠে। আমি গান লেখার নাম করে কত দিন ঐ পরিবারের অন্ন ধ্বংস করেছি। শুধু কি অন্ন? রোজী ভাবী আমাকে প্রায়ই দামি এরিনমুর তামাক কিনে দিতেন। তা ছাড়া অপরিশোধ্য পাঁচ-দশ টাকা তো ছিলই।

রাজা ভাই এবং সুজেয় শ্যামের সুরের সঙ্গে তাল মিলিয়ে আমি ঐ ছবির থিম সঙটি রচনা করেছিলাম। পরে সেটি তখনকার সবচেয়ে জনপ্রিয় গায়িকা ফেরদৌসী রহমানের কণ্ঠে ইন্দিরা রোডের একটি স্টুডিওতে রেকর্ড করা হয়। ঐ ছবির শুভ মহরতের ছবি চিত্রালীতে ছাপা হয়েছিল। অভিনেত্রী রোজী, চিত্রগ্রাহক সামাদ ভাই এবং দুই সঙ্গীত পরিচালক ও গায়িকা ফেরদৌসীর সঙ্গে আমিও ঐ ছবিতে ধরা পড়েছিলাম। চিত্রালী তখন খুব জনপ্রিয় সিনেমা পত্রিকা ছিল। অবজারভার হাউস থেকে মোহাম্মদ পারভেজের সম্পাদনায় প্রকাশিত হতো।

বঙ্গবন্ধুর নির্বাচনী ভাষণটি যেদিন রেকর্ড করা হয় সেদিন আমি টিভি ভবনে উপস্থিত ছিলাম। আমি রিসেপশন কক্ষে বসে গল্প করছিলাম করাচীর প্রখ্যাত কার্টুনিস্ট আজিজের সঙ্গে। আজিজ সাহেবের কার্টুন তখন খুবই জনপ্রিয় ছিল। আজিজ সাহেব ছিলেন খুবই নিরহংকারী এবং মিশুক ধরনের মানুষ। আমি তাঁর চেয়ে বয়সে অর্ধেক, কিন্তু তিনি আমাকে বন্ধুর মতো ভাবতেন। গল্প করতেন। বঙ্গবন্ধুর একটি কার্টুন আঁকবেন ভেবে তিনি রিসেপশন কক্ষে বসে বঙ্গবন্ধুর আগমনের অপেক্ষা করছিলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিছুক্ষণের মধ্যেই বঙ্গবন্ধু টিভি ভবনে এসে উপস্থিত হন। টিভির উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা বঙ্গবন্ধুকে স্বাগত জানান। বঙ্গবন্ধু যখন দ্রুত রিসেপশন কক্ষের দিকে ভিতর দিয়ে স্টুডিওতে প্রবেশ করার জন্য অগ্রসর হন, তখন ভিড় ঠেলে আজিজ সাহেব এগিয়ে যান বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে করমর্দন করার উদ্দেশ্যে। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর নিকটে পৌঁছার আগেই তিনি ভিড়ের ঠেলায় বঙ্গবন্ধুর সামনে হুমড়ি খেয়ে পড়ে যান। বঙ্গবন্ধু তখন বিব্রত, আহত ও লজ্জিত আজিজ সাহেবকে খুব আদরের সঙ্গে টেনে তুলে বুকে জড়িয়ে ধরেন।

বঙ্গবন্ধু স্টুডিওর ভিতরে চলে যান। আজিজ সাহেব বসেন তাঁর বিখ্যাত স্কেচ খাতাটি সামনে নিয়ে। আমাদের অনেকগুলো কৌতূহলী চোখের সামনে তিনি খুব দ্রুত একটি স্কেচ এঁকে ফেলেন। মাথায় কবিতার পঙক্তি এলে কবি যেমন দ্রুত ঐ পঙক্তিটি লিপিবদ্ধ করেন, অনেকটা সেভাবেই।

স্কেচটি ছিল এ রকম : একজন হাড্ডিসার ভূপাতিত মানুষকে বঙ্গবন্ধু টেনে তুলে বুকে জড়িয়ে ধরেছেন। অল্প কয়েকটি রেখার অব্যর্থ ব্যবহারে ঐ ছবিটি তিনি এমন চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তুলেছিলেন যে, আমি অবাক হয়ে ঐ স্কেচটির দিকে তাকিয়ে ছিলাম।

আজিজ সাহেব আমাকে বুঝিয়ে বলেন যে, এই স্কেচের ভিতর দিয়ে তিনি বঙ্গবন্ধুকে পতিত মানুষের উদ্ধারকর্তারূপে কল্পনা করেছেন।

নির্বাচনী ভাষণ রেকর্ড করার পর বঙ্গবন্ধু যখন স্টুডিও থেকে বেরিয়ে আসেন, তখন আজিজ সাহেব ঐ স্কেচে বঙ্গবন্ধুর স্বাক্ষর গ্রহণ করেন।

ঐ স্কেচটি পরে কোথায় কোন কাগজে ছাপা হয়েছিল জানি না। কিছুদিনের মধ্যেই আজিজ সাহেব করাচীতে ফিরে যান।

AMARBOI.COM

বহু প্রত্যাশিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মাসখানেক বাকি থাকতে ১২ নভেম্বর, ১৯৭০ গভীর রাতে পূর্ব বাংলার সমুদ্র-উপকূলবর্তী এলাকায় এক সর্বনাশা সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস আঘাত হানে। এই সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস সম্পর্কে সরকারের পক্ষ থেকে কোনোরূপ পূর্বাভাস প্রচার করা হয়নি। ফলে ঐ আকস্মিক সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসে উপকূলের লক্ষ লক্ষ নিদ্রিত মানুষ তাদের গৃহপালিত অন্যান্য প্রাণীর সঙ্গে খড়কুটোর মতো দশ থেকে বিশ ফুট উঁচু ঢেউয়ের টানে ভেসে যায়। তখন উপকূলবর্তী এলাকার সঙ্গে ঢাকার যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল এমনিতেই খুব নাজুক, বিধ্বংসী জলোচ্ছ্বাসের ফলে ঐ দুর্গম অঞ্চল আরও যোগাযোগহীন এবং অগম্য হয়ে পড়ে। ফলে ঐ জলোচ্ছ্বাসের ভয়াবহতা এবং মৃতের প্রকৃত সংখ্যা সম্পর্কে প্রথমে সঠিক ধারণা পাওয়া যায় না। পরে যখন ধ্বংসযজ্ঞের প্রকৃত চিত্রটি জানা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়, তখন পৃথিবী এই শতাব্দীর সবচেয়ে ভয়াবহ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সঙ্গে পরিচিত হয়। দশ লক্ষাধিক মানুষ ঐ জলোচ্ছ্বাসে প্রাণ হারিয়েছিল বলে অনুমিত।

ঘটনাটি পূর্ব-বাংলার মানুষের মনে প্রচণ্ড শোকের অনুভূতি সৃষ্টি করে। পাক সামরিক সরকার পরিস্থিতি মোকাবিলায় চরম ঔদাসীন্য এবং ব্যর্থতার পরিচয় দেয়। পশ্চিম পাকিস্তানী নেতৃবৃন্দ, উত্তরাধিকার সূত্রে যারা পূর্ব বাংলাকে শাসন করার জন্য অধীর আগ্রহে আসন্ন নির্বাচনের অপেক্ষায় ছিলেন, তারাও ঘটনার গভীরতা আঁচ করতে না পারার কারণে যথাসময়ে বাংলার দুর্গম মানুষের পাশে এসে দাঁড়াতে ব্যর্থ হন। পূর্ব বাংলার মানুষ ১৯৬৫-র পাক-ভারত যুদ্ধের সময় যেমন নিঃসঙ্গ ও বিচ্ছিন্ন বোধ করেছিল, পাঁচ বছর পর তার চেয়ে ভয়ংকর এক প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আবারও তেমনটি বোধ করে। বঙ্গবন্ধুর ৬ দফা দাবির বাস্তবতা সম্পর্কে মানুষের মনে নতুন করে আস্থার সৃষ্টি হয়।

নির্বাচনভীতু রাজনৈতিক দলগুলো ঐ জলোচ্ছ্বাসের ঘটনাটিকে ইস্যু করে নির্বাচন পিছিয়ে দেবার দাবি তোলে। কিন্তু বঙ্গবন্ধু তীব্রভাবে নির্বাচন পিছানোর দাবির বিরোধিতা করেন। তিনি নির্বাচন পিছানোর দাবিকে 'খারাপ ছাত্রের পরীক্ষা পিছানোর দাবি'র সঙ্গে তুলনা করে পূর্ব নির্ধারিত সময়ে (৭ ডিসেম্বর, ১৯৭০) জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবিতে অনড় থাকেন।

বঙ্গবন্ধু পূর্ব নির্ধারিত সময়ে নির্বাচন অনুষ্ঠানের পক্ষে সুদৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করায় নির্বাচন পিছানোর দাবি প্রয়োজনীয় জনসমর্থন লাভে ব্যর্থ হয়। পাকিস্তানের রাষ্ট্রক্ষমতা করায়ত্ত করার প্রশ্নে দেশের বিবদমান রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যকার শক্তির তারতম্য নিরূপক ঐ জাতীয় নির্বাচনে বিপুল বিজয় লাভের ব্যাপারটি অনেকটা নিশ্চিত ছিল বলেই কোনো ছুতোয় পাকিস্তানের সামরিক সরকার যেন ঐ নির্বাচনটি বানচাল করার সুযোগ না পায়, সেদিকে লক্ষ্য রেখেই বঙ্গবন্ধু অগ্রসর হন। কারণ সামরিক সরকারের ঘোষিত নির্বাচন তো অনেকটাই ঠকের বাড়িতে নিমন্ত্রণ খাওয়ার মতো ব্যাপার। বঙ্গবন্ধু বুঝতে পেরেছিলেন, এই নিমন্ত্রণ না খাওয়া পর্যন্ত বিশ্বাস নেই।

সারা দেশ যখন নির্বাচনী জ্বরে কম্পমান, অনভিজ্ঞ প্রসূতির মতো আমার প্রথম কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করতে গিয়ে আমি তখন ব্যগ্র এবং ব্যস্ত হয়ে পড়ি। প্রচণ্ড উত্তেজনার মধ্যে আমার সময় কাটতে থাকে। খান ব্রাদার্সের মালিক জনাব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মোসলেম খান সাহেব আমার বইটি সুন্দরভাবে প্রকাশ করার সকল দায়িত্ব আমার ওপর ছেড়ে দিয়েছিলেন। আমি দুর্লভ লাইনো টাইপে বইটি ছাপার জন্য নওয়াবপুর রোডে অবস্থিত আলেকজান্দ্রা স্টিম মেশিন প্রেসের মালিক জনাব নুরুল হক সাহেবের দুয়ারে ধর্ণা দিই। দৈনিক পাকিস্তান এবং সরকারী বিজি প্রেস ছাড়া বেসরকারীভাবে যখন টয়েনবি সার্কুলার রোডের বুক প্রমোশন প্রেস এবং ২৪৪ নওয়াবপুর রোডের আলেকজান্দ্রা প্রেসেই শুধু লাইনো মেশিন ছিল।

আমি স্থির করি ১২৫০ কপি বই ছাপব। এর আগে কবিতার বই পাঁচ শ' কপির বেশি ছাপা হতো না। আমার ধারণা হয়েছিল, আমার কবিতা সহজবোধ্য বলে আমার পাঠক বেশি, সুতরাং বেশি বই ছাপা যেতে পারে। জনাব মোসলেম খান সাহেব, তাঁর পুত্র ফারুক খান এবং ফিরোজ খানও তা বিশ্বাস করেন।

এত ছোট আকারের বই এবং এত কম ছাপা—নুরুল হক সাহেব প্রথমে বইটি ছাপার দায়িত্ব নিতে রাজি হননি। পরে আমি যখন শুধু প্রেসে নয়, তাঁর ওয়ারীর বাসায় গিয়েও তাঁকে বিরক্ত করতে শুরু করি, তখন এক-পর্যায়ে নিরুপায় হয়েই তিনি আমার বইটি ছেপে দিতে রাজি হন। শুরু হয় আলেকজান্দ্রা প্রেসে আমার সকাল-বিকাল-রাত্রির নিরবচ্ছিন্ন অত্যাচারের পালা। আবদুল মতিন এবং জেড আলম সাহেব ছিলেন ঐ প্রেসের লাইনো অপারেটর। চমৎকার লাইনো মেশিনের সামনে বসে টাইপ রাইটারের কী বোর্ডের চেয়ে অনেক বড় আকারের একটি কী বোর্ডে তাঁরা নিপুণ শিল্পীর মতো তাঁদের নরম আঙুল চালনা করতেন, আর শক্ত সীসার স্ল্যাবের আকারে এক-একটি কবিতার পঙক্তি ছিটকে বেরিয়ে আসত কোথা থেকে যেন। খুব মজাই লাগত দেখতে। হ্যান্ড-কম্পোজের সঙ্গে লাইনোর কী বিপুল পার্থক্যই না ছিল তখন। মাত্র পঁচিশ বছরের ব্যবধানে, কম্পিউটার এসে এই দুই মুদ্রণ মাধ্যমকেই একসঙ্গে পথে বসাবে,—তখন তা কেউ ভাবতেও পারেনি।

আমি রাতদিন প্রেসে পড়ে থাকতাম। কবিতা বদলাতাম। প্রুফে কাটাকাটির বহর দেখে প্রেসের অপারেটররা বিরক্ত হতো। নানা মিষ্ট কথায় আমি তখন তাদের তুষ্ট করতাম। পাশেই হ্যান্ড কম্পোজ সেকশন। সেখানে হ্যান্ড কম্পোজিটর বৃদ্ধ ক্ষেত্রবাবুর সঙ্গে বসে হুঁক্কায় তামাক সেবন করে তাদের বুঝাতাম, আমি তোমাদেরই লোক। তাতে কাজ হতো। আমার অত্যাচারের কথা প্রেসের লোকরা নূরুল হক সাহেবের কাছে গোপন করত।

হুলিয়া কবিতাটিকে আমি আমার বইয়ের প্রথম কবিতা হিসেবে নির্বাচন করি। নুরুল হক সাহেবও হুলিয়া কবিতাটি খুব পছন্দ করেন। তিনি অবশ্য কবিতাকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কবিতা বলতেন না, বলতেন গল্প। হুলিয়া পড়ার পর কবিতা যে মূলত গল্প, তাঁর ঐ ধারণা আরও বদ্ধমূল হয়। বই যখন ছাপার শেষ-পর্যায়ে, তখন প্রেসে যেতেই নুরুল হক সাহেব একদিন সকালে আমাকে বলেন, গুণ বাবু, আপনার গল্প কম পড়ে গেছে। তাড়াতাড়ি চট করে আরেকটা গল্প লিখে দেন। শেষের দিকে চার পৃষ্ঠা খালি আছে।

বইয়ের চরিত্রের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ কোনো কবিতা তখন আমার সংগ্রহে ছিল না। কী করা যায় ভাবছিলাম। কবিতা কম পড়ার খবরে আমাকে কিঞ্চিৎ বিপদাপন্ন দেখে হক সাহেবকে খুব খুশি বলে মনে হলো। তিনি আমার উদ্দেশ্যে একটি হাসির চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিলেন। আমি মনে মনে তাঁর চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলাম।

কী লিখব, ভাবছিলাম। তখনই হক সাহেবের টেবিলে রাখা দৈনিক পাকিস্তানের প্রথম পাতায় প্রকাশিত একটি ছবির ওপর আমার চোখ পড়ে। ছবিটি ছিল ১২ নভেম্বরের সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসে ভেসে-যাওয়া এক মৃতা নগ্নিকার ছবি। [কবি জিনাত আরা রফিক আমার 'লজ্জা' কবিতার আলোচনা করতে গিয়ে ঐ কবিতার মধ্যে বর্ণিত অপমৃতা রমণীটিকে 'নগ্নিকা' অভিধায় চিহ্নিত করেছিলেন।]

জলোচ্ছ্বাসে ভেসে যাওয়া ঐ মৃতার গর্ভ থেকে এক-পর্যায়ে তাঁর গর্ভের সন্তানটি বেরিয়ে এসেছিল, কিন্তু মায়ের সঙ্গে সন্তানের নাড়ীর বন্ধনটি ছিন্ন হয়নি। ঐ নবজাতক যেন তার মৃতা-জননীর লজ্জাস্থানটুকুকে আড়াল করার উদ্দেশ্যেই নগ্ন-জননীর নাভিমূলে আত্মাহুতি দিয়েছিল। ছবিটি দেখে আমি খুবই আলোড়িত বোধ করি। ছবিটি আমার মাথার মধ্যে একটি বেদনামথিত কবিতার জন্ম দেয়। ঐ ছবির মধ্যে বিধৃত বেদনাকে নিজের ভিতরে কল্পমথন করে, প্রেস-ম্যানেজার নরেশ বাবুর কাছ থেকে কিছু কাগজ চেয়ে নিয়ে, আমি খুব দ্রুত একটি কবিতা লিখে ফেলি। লেখার পর কবিতাটির নাম দিই 'লজ্জা'।

কবিতাটি নুরুল হক সাহেবকে পড়ে শোনাই। সাধারণত তিনি কবিতা নিয়ে রসিকতাই করতেন। এবার লক্ষ্য করি, লজ্জা শোনার পর তাঁর মুখ থেকে হাসি উধাও হয়েছে। তিনি যেন অনেক দূরে কোথায় হারিয়ে গেছেন। পঠিত কবিতাটি সম্পর্কে কোনো মন্তব্য না করে তিনি চুপ করে থাকলেন। বুঝলাম, আমার কবিতাটি যখন তাঁর মতো কবিতাবিমুখ মানুষের দুঃখবোধকেও জাগ্রত করতে সক্ষম হয়েছে, তখন কবিতাটি খুব একটা খারাপ হয়নি। তাই মতিন সাহেবকে কবিতাটি কম্পোজ করতে দিয়ে দিলাম।

হুলিয়া দিয়ে শুরু করেছিলাম, ভাবলাম লজ্জা দিয়েই বইটি সমাপ্ত হোক। শেষের দুই পৃষ্ঠা না হয় আপাতত খালিই থাক। পরের সংস্করণে দেখা যাবে। আমার বইটি যে খুব দ্রুতই বিক্রি হয়ে যাবে,—এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত ছিলাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বানান নিয়ে আমার কিছু বিভ্রান্তি ছিল। আমার বন্ধুদের মধ্যে প্রুফ দেখার ব্যাপারে সাযযাদ কাদির ছিল খুবই পারদর্শী। আমি তাঁর শরণাপন্ন হই। সাযযাদ আমাকে সাহায্য করে। সেই বন্ধুত্বপূর্ণ সাহায্যের স্মারক হিসেবে, আমি ঐ গ্রন্থের একটি কবিতা সাযযাদের নামে উৎসর্গ করি।

কবিতা উৎসর্গের ব্যাপারে আমি ছিলাম খুবই কৃপণ। আমার অজস্র বন্ধু এবং প্রিয়জন থাকা সত্ত্বেও আমি মাত্র পাঁচটি কবিতা পাঁচ জনের নামে উৎসর্গ করি।

১. এক একজন মানুষ (আবুল হাসানকে)
২. জাল নোট (মামুনুর রশীদকে)
৩. অসভ্য শয়ন (সাযযাদ কাদিরকে)
৪. অর্জুনের রাজ্য (পূরবী দত্তকে)
৫. যুদ্ধ (শহীদ কাদরীকে)

লেখার পর ক্ষুদ্রাকৃতির 'যুদ্ধ' কবিতাটি আমি রেক্স-এর আড্ডায় শহীদ কাদরীকে পড়ে শুনিয়েছিলাম। তখন তিনি কবিতাটি পছন্দ করেন এবং আমাকে বলেন, 'কবিতাটি আমাকে উৎসর্গ করবে।' আমি অগ্রজের ইচ্ছাকে মান্য করেই কবিতাটি তাঁকে উৎসর্গ করি। তা ছাড়া ঐ উৎসর্গের অন্য কোনো ব্যাখ্যা নেই।

আমার কাব্যগ্রন্থটি আমি উৎসর্গ করি আমার বাবার নামে।
উৎসর্গপত্রটি ছিল এ রকম : 'আমার বাবার মতো সবাই যদি আমাকে স্বাধীনতা দিত।'
'স্বাধীনতা' শব্দটি আমি সচেতনভাবেই বইয়ের উৎসর্গপত্রে ব্যবহার করি।

AMARBOI.COM

আমার বইটি শুধু আমারই প্রথম বই ছিল না, ছিল আমাদের জেনারেশনের প্রথম কবিতার বই। আমি স্থির করি আমার বইটিকে আমি নতুন আঙ্গিকে প্রকাশ করব। আমার শিল্পী বন্ধু কাওসার আহমদ চৌধুরীর সঙ্গে বইয়ের প্রচ্ছদ নিয়ে আলোচনা করি। একদিন আমরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে স্থির করি প্রচ্ছদে আমরা কবির শ্মশ্রুমণ্ডিত মুখচ্ছবিটি ব্যবহার করব। এক-সন্ধ্যায় কাওসার আমাকে নিউ মার্কেটের একটি স্টুডিওতে (ঐ স্টুডিওটি এখন আর নেই। স্টুডিওটির মালিক ছিলেন একজন বিহারী) নিয়ে যায় এবং বিভিন্ন পোজে আমার বেশকিছু ছবি তোলে। পরে ঐ সব ছবির ভিতর থেকে বেছে একটি চমৎকার অর্থবহ ছবি সে আমার কাব্যগ্রন্থের প্রচ্ছদের জন্য নির্বাচন করে। কাওসারের নির্ধারিত ছবিটি আমারও পছন্দ হয়।

বইটির জন্য আমি কয়েকটি নাম নিয়েই ভাবছিলাম। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারছিলাম না। তখন জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত আমার সাহায্যে এগিয়ে আসেন। তিনি বলেন, আপনি 'প্রেমাংশুর রক্ত চাই' শীর্ষক কবিতাটির ভিত্তিতেই কাব্যগ্রন্থটির নামকরণ করতে পারেন। ঐ নামটিই আপনার কাব্যগ্রন্থের জন্য মানানসই হবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নামের ব্যাপারে জ্যোতিপ্রকাশের সঙ্গে পূরবী বসুকে একমত হওয়াতে আমি আর দ্বিমত করিনি। আর যে-নামগুলো আমি বিবেচনায় রেখেছিলাম, সে-নামগুলো ছিল : হুলিয়া, দাঁড়ানো মহিষ এবং আগুন নিয়ে বসে আছি...।

আলেকজান্দ্রা প্রেসে বড় লাইনো টাইপ ছিল না, ছিল দৈনিক পাকিস্তানে। সেখান থেকে টাইপ সংগ্রহ করতে ব্যর্থ হয়ে আমি ছোটগল্প পত্রিকার সঙ্গে জড়িত শিল্পী গোপাল মণ্ডলের শরণাপন্ন হই। তিনি দৈনিক পাকিস্তানের ফাইল ঘেঁটে বিভিন্ন খবরের শিরোনাম থেকে একই মাপের টাইপ কেটে কেটে বইয়ের নাম এবং অপেক্ষাকৃত ছোট টাইপ কেটে কবির নামটি তৈরি করে দেন। বাংলাবাজারের চুন্নু মিয়ার ব্লক তৈরির কারখানা থেকে প্রচ্ছদের জিংক ব্লক তৈরি করা হয়। বাবুবাজারে 'অবলা পল্লী'র নিকটবর্তী খেয়ালী আর্ট প্রেস নামক একটি প্রেসে বইয়ের প্রচ্ছদটি ছাপা হয়। লাল রঙের রিভার্সে সাদা হরফে ছিল লেখক ও বইয়ের নাম— কালো রঙে হাফটোনে পুরো পাতাজুড়ে ছিল আমার শ্মশ্রুমণ্ডিত মুখাবয়ব। প্রচ্ছদটি ছিল খুবই এ্যাটাকিং।

১৯৭০-এর নভেম্বর মাসের দ্বিতীয় পক্ষে আমার বইটি বাজারে ছাড়া হয়।

৪২ পাউন্ড কার্টিস পেপারে (ঐ কাগজটা এখন খুবই দুর্লভ। কবিতার বইয়ের জন্য কর্ণফুলীর ঐ কাগজটা খুবই উপযোগী ছিল।) লাইনো টাইপে ছাপা, এক শ' গ্রাম আর্ট পেপারের জ্যাকেটে বন্দী চার-ফর্মার বইটির দাম রাখা হয় মাত্র তিন টাকা।

বইয়ের দোকানে কাচের আলমারিতে সাজিয়ে রাখা আমার কবিতার বইটিকে প্রথম দৃষ্টিতে অনেকেই ডিটেকটিভ বই বলে ভ্রম করতেন। পরে বই খুলে যখন দেখতেন যে, এটি একটি কবিতার বই—তখন কেউ নিরাশ হতেন, কেউবা খুশি হয়ে বইটি কিনে নিয়ে যেতেন।

কিছুদিনের মধ্যেই বাইরে ব্যতিক্রমধর্মী প্রচ্ছদ এবং ভিতরে উত্তপ্ত রাজনৈতিক কবিতা থাকার কারণে বইটি পাঠকমহলে সাড়া জাগায় এবং আশাতীত বিক্রি লাভ করে।

আমার প্রকাশক খুশি হন। তিনি বইয়ের জন্য ১২.৫% হারে রয়েলটি স্থির করে আমাকে এক শ' টাকার মতো অগ্রিম প্রদান করেন।

প্রকাশের অল্পকিছুদিনের মধ্যেই বইটির প্রশংসা করে লন্ডন থেকে ঢাকায় সদ্য ফিরে আসা সাংবাদিক-সমালোচক-চলচ্চিত্রকার আলমগীর কবির চিত্র-পরিচালক এবং ঔপন্যাসিক জহির রায়হান কর্তৃক সম্পাদিত সাপ্তাহিক EXPRESS পত্রিকায় একটি ছোট্ট আলোচনা লেখেন এবং একইসঙ্গে তিনি 'লজ্জা' কবিতাটি ইংরেজীতে অনুবাদ করে পত্রিকায় প্রকাশ করেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওটিই ছিল আমার প্রথম কাব্যগ্রন্থের প্রথম আলোচনা ও আমার লেখা কোনো কবিতার প্রথম ইংরেজী অনুবাদ। মরহুম আলমগীর কবির কৃত ঐ চমৎকার অনুবাদটি গ্রন্থভুক্ত করার খুব ইচ্ছে ছিল, কিন্তু কোথাও EXPRESS পত্রিকাটি খুঁজে না-পাওয়ার কারণে আমার সেই ইচ্ছা পূরণ করা সম্ভব হলো না।

প্রেমাংশুর রক্ত চাই প্রকাশিত হওয়ার পর আমি খুব ক্লান্ত বোধ করি। আমার নিজেকে ভারমুক্ত বলে মনে হতে থাকে। আমার মনে এইরূপ ধারণার সৃষ্টি হয় যে, এই কাব্যগ্রন্থটি রচনা করার জন্যই একদিন হুলিয়া মাথায় নিয়ে আমি এই নগরীতে পালিয়ে এসেছিলাম।

ঢাকা তার উষ্ণ-নিরাপদ পক্ষপুটে আমাকে ভালোবেসে আশ্রয় দিয়েছে।

আমার ওপর অর্পিত সময়ের দায়িত্ব আমি আমার সাধ্যমতো সম্পন্ন করার চেষ্টা করেছি।

দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থটির জন্য যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার আগে, গ্রামে ফিরে গিয়ে এখন আমার কিছুদিন বিশ্রাম নেওয়া দরকার। আমার বাবার কথা মনে পড়ে।

AMARBOI.COM

[ইতি সমাপ্ত আমার কণ্ঠস্বর পর্ব]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প রি শি ষ্ট : ক

আমার অকালপ্রয়াত কবিবন্ধুদের মধ্যে আবুল কাশেম এবং শশাংক পাল—এই দু'জনের কোনো কাব্যগ্রন্থ তাঁদের জীবদ্দশায় তো নয়ই,—মৃত্যুর দীর্ঘদিন পরও এ-পর্যন্ত প্রকাশিত হয়নি। ফলে তাদের রচনা হারিয়ে যেতে বসেছে। এ-কারণে তাঁদের দু'জনের দু'টি কবিতা আমার কণ্ঠস্বরে ধরে রাখার চেষ্টা করলাম।

আমার ঐ দুই বন্ধু তাদের স্ব-স্ব সৃষ্টি সম্পর্কে এত বেশি অহংকারী ছিলেন যে, তাদের জীবদ্দশায় তাঁরা অন্তত আমার মতো অক্ষমের হাত ধরে অমরত্বলাভের এরূপ প্রয়াসকে কখনই মেনে নিতেন না। তাঁরা বেঁচে থাকলে হয়তোবা তার কোনো প্রয়োজনও পড়ত না। আপন কৃতিতে উজ্জ্বল হওয়ার মতো শক্তি ও প্রস্তুতি নিয়েই তারা সাহিত্যে এসেছিল।

আমার বিবেচনায়, আবুল কাশেম ছিল সত্যিকারের জাত-কবি। কবি হিসেবে আমি কাশেমকে খুব মূল্য দিতাম। কবিতা ভিন্ন অন্য কোনো চিন্তা তাঁর মনকে আচ্ছন্ন করতে পারেনি। সে ছিল আনখশির কবিতানিমগ্ন প্রাণ।

একবার কাশেম ময়মনসিংহে যায়। যেখানে তাঁর এক বড় ভাই ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। ময়মনসিংহ যাবার সময় সে আমার কাছ থেকে একটি চিঠি নিয়ে যায়। চিঠিটি আমি লিখেছিলাম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক উদীচী-কর্মী নুরুল আনোয়ারের কাছে। নুরুল আনোয়ারের মাধ্যমে ময়মনসিংহের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের সঙ্গে তাঁর খুব ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। বিশেষ করে উদীচীর সঙ্গে। আবুল কাশেম একটানা বেশ কিছুদিন ময়মনসিংহে কাটিয়ে ঢাকায় ফিরে আমাকে জানায় যে, সে ময়মনসিংহে এমন এক সুন্দরী রমণীর প্রেমে পড়েছে, যা আমরা কোনোদিন কল্পনাও করতে পারব না। তখন ঐ রমণীকে নিয়ে আবুল কাশেম কিছু প্রেমের কবিতা রচনা করেছিল। আমার ধারণা 'সঞ্চিতা' কবিতাটি ঐ সিরিজেরই একটি হবে।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের কালরাতে, কবি অসীম সাহার অবর্তমানে আবুল কাশেম জগন্নাথ হলে অসীমের রুমে ছিল। সে হয়তো ভেবেছিল ছাত্র-শূন্য হলের নির্জন-কক্ষটি তাঁর কাব্য রচনার জন্য অনুকূল হবে। কিন্তু দুর্ভাগ্য কাশেমের, দুর্ভাগ্য আমাদের যে, পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর হাতে ঐ রাতেই কবি আবুল কাশেম অন্য অনেকের সঙ্গে নিহত হন। তাঁর মরদেহ শনাক্ত করা সম্ভব হয়নি। সম্ভবত জগন্নাথ হলের গণকবরে বা ঐ হলের পুকুরে ভাসমান লাশের সারিতেই তাঁরও স্থান হয়েছিল।

পক্ষান্তরে শশাংক ছিল বেশ কিছুটা অন্যরকম। সে মূলত কবি ছিল না। কবিতার চেয়ে গল্প এবং প্রবন্ধই বেশি লিখত। সাংবাদিকতাও করত। তা ছাড়া শশাংক ছিল সর্বহারা দলের একজন কট্টর অ্যাক্টিভিস্ট। মার্কসবাদী সাহিত্য আন্দোলনের একজন সংগঠক। 'শ্রাবন্তী' নামে একটি ছোটগল্প পত্রিকা সম্পাদনা করত এবং মাঝে মাঝে মাথায় হুলিয়া নিয়ে পালিয়ে বেড়াত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুক্তিযুদ্ধের শেষ-পর্যায়ে কবি শশাংক পাল তাঁর জন্মস্থান বরিশালের পিরোজপুর, তাঁর রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের সঙ্গে এক সশস্ত্র সংঘর্ষে গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হন।

আবুল কাশেমের কবিতা

সঙ্গিতা

তামার চেতনার কল্লোলে কী যেন এখনো অপ্রকাশিত
যে স্বপ্নের পাদপ্রদীপে তোমার আহ্বান শুনেছি
অরণ্যের নির্লিপ্ত বাসরে, রাত্রির শীতলতায়
ভোরের শিশিরে আর কুঞ্জবীথিকার আমন্ত্রণে।

সাগরের ঢেউ ছুঁই-ছুঁই করেও বিবর্ণ ঝিনুকের মতো
সত্তার চারিদেয়ালে অঙ্কিত সেই অপূর্ব সংমিশ্রণ
আমার ভাবনায় সাদা পাহাড়ের চিরন্তনী সম্ভাবনাকে
ক্রমশ ঝর্ণার গতিতে ভাষার সংলাপে ছড়িয়ে দেয়।

এখানে সকাল সন্ধ্যা আর রাত্রির দেহে নিমজ্জিত
কয়েকটি অশোক তরুর চকিত দৃষ্টি
কি এক আশ্চর্য সম্মোহনে আমাদের বিঁধে দিলো
নির্জন বালুবেলায় নামহীন কোনো নিবিড় আবেশে
যা আমার প্রথম প্রেমের সীমাহীন উদ্দামতা নিয়ে
নিমিষে মায়াকাননের উদ্দেশ্যে যায় হারিয়ে।

প্রত্যহ পোড়া হাত বাসনার স্তূপে শুধু ছাই তোলে
যন্ত্রণার শতাব্দীগুলো অতি সাংঘাতিক কোনো গুহাভ্যন্তরে
পাথরের দেয়াল পেরিয়ে নিঃশ্বাস নিতে চায়;
ঝিনুক মুক্তার সোহাগ মন্থনে জলছবি আঁকতে গিয়ে
যে নদীর স্রোত আমার মুহূর্তের আদিম সঞ্চয়,
তোমাকে নতুন করে দেখবো বলে
তার মৃত্যুঞ্জয়ী পথে লগ্নের ঠিকানা বিধৃত হয়!

কখনও দিগন্তের বিস্তারে সাধকের তপস্যার মন্ত্রে
মেঘনার ভাটিয়ালী, ধূলিতে শিল্পীর ক্যানভাসে
কখনও কবির কবিতা এবং জীবনের বন্দনায়
চলমান শক্তির একটি শীতল সোপানে
সেই অনুগামী বিস্ময়, যেন প্রান্তিক মনের বিস্মৃত ইতিহাস।

[*মাসিক মোহম্মদী* : ফাল্গুন ১৩৭৪, ৩৯ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হে অলীক প্রশান্তি প্রার্থনা

না-পাবার তীব্র পথ পার হয়ে এলুম এখানে, তাই
যন্ত্রণার প্রাসাদে বারংবার। হতাশার দড়িতে ঝুলতে
রাত্রিদিন যেমোন প্রতুল জলে ভাঁটা কিম্বা
তেলাপিয়া রানী
(যদিও জলজ আর পিতৃদত্ত তালুকের শাদা-অংশীদার)
যন্ত্রণায় লাশ-কাটা হয়ে প্রতিদিন
পাবার কি এক মোহে, অমল দরোজা নামে
প্রকাশ্য আলোকে
জলের রূপালী বুক চিবোয় নিয়ত।

আমিও তেমোনি আজ
যন্ত্রণার চাকু নিয়ে মধ্যরাতে খুঁজি ব্যর্থতাকে
কি চাই, কি ভাবি পেতে অথবা কি পাবার
প্রবল বাসনাগুলো
অস্থির প্রসন্নে জ্বলে কামুক কামনা গড়ে
যন্ত্রণার প্রদীপ্ত আগুনে
তেমোনো জানি না কিছু
(যেহেতু আমিই পুরুষ সেই যন্ত্রণার চকচকে বিম্বিত মুকুরে)
আমি কি তবুও তাই হে অলীক প্রশান্তি
প্রার্থনা, বিষয় অতীতব্যাপী
যন্ত্রণার প্রাসাদে ঢুকবো, অকল্যাণের ছুরি নিয়ে
অশুভ ইঙ্গিতে একদিন।

[বর্ষশুরু সংখ্যা : *বর্ণালী*, চতুর্থ বর্ষ ১ম সংখ্যা, জুলাই ১৯৬৭]

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প রি শি ষ্ট : খ

আমার পশ্চিমবঙ্গ নিবাসী অগ্রজ শ্রীপূর্ণেন্দু প্রকাশ গুণ চৌধুরী, আমার স্বর্গতা বৌদি ঝর্ণা গুণ চৌধুরানী ও আমার ছোট বোন সোনালি গুণ (বর্তমানে গুহঠাকুরতা)-র কাছে আমি বিভিন্ন সময়ে চিঠি লিখেছি। ঐ-সব চিঠির ভিতর থেকে কয়েকটি চিঠি, আমার গ্রন্থে বর্ণিত সময়ের সঙ্গে (১৯৬২-১৯৭০) প্রাসঙ্গিক হবে;—এই বিবেচনায় এখানে প্রকাশ করা হলো।

From : Nirmalendu Goon
A.M. College , Hindu Hostel, Myn., East Pakistan
13 Sept. 1962

শ্রীচরণেষু দাদামণি,

তোমার পত্র পাইলাম। খোকন ও দাদা পাস করিতে পারে নাই। প্রদীপ মামা ৩য় বিভাগে পাস করিয়াছে। নৃপেন্দ্র বিশ্বাসের ছেলে অলোকও পাস করিয়াছে ৩য় বিভাগে। আমার ফার্স্ট বয় মতি (মতিউর রহমান খান) ১ম বিভাগে পাস করিয়াছে। ময়মনসিংহের খোকন (অতুল্য প্রকাশ গুণ চৌধুরী) দুটো লেটারসহ প্রথম বিভাগে পাস করিয়াছে। আমি আনন্দমোহন কলেজেই ভর্তি হইলাম। বাড়ি হতে তোমার পত্রের উত্তর দিচ্ছি। আজ শুক্রবার ১৩-৯-৬২ তাং বেলা সকাল ৮.০০-১৫ মি.। রবিবারে চলে যাবো কলেজ বোর্ডিংয়ে। শুরু হবে আমার জীবনের এক নতুন অধ্যায়। তাই বাড়ীর ঠিকানায় আর পত্র দিও না। উপরের ঠিকানায় পত্র দিও। Science (Pre Engineering) পড়লে Combination হয় Physics, Chemistry ও Mathematic. আর Science (Pre-Medical) নিলে Math. এর বদলে Biology নিতে হয়। আমার ধারণা, ইঞ্জিনীয়ারদের চেয়ে ডাক্তারের দাম বেশি এবং বেশি জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারে ডাক্তাররা। তাই ভাবছি Engg. এ নিয়ে ডাক্তারী লাইন ধরবো। বাবার মত— ডাক্তারীতে খরচ পড়বে অনেক বেশি। তুমি যেটা ভালো মনে করো তাড়াতাড়ি লিখে জানাবে। বাবাকেও জানিও তোমার মতামত। Pre-Medical কোর্স খুব সোজা হইবে। তাই ফলও ভালো করতে পারবো বলে মনে হয়। যাক তাড়াতাড়ি জানাবে। ১৬ তারিখ থেকে কলেজ আরম্ভ হবে। প্রণাম জেনো। পূজ্যপদে প্রণাম রইল ও ছোটদের জন্য রইল অফুরন্ত ভালোবাসা।

ইতি। প্রণত রতু।

কাশবন
১২-৮-১৯৬৪

শ্রীচরণেষু দাদামণি!

প্রথমে তুমি আমার প্রণাম গ্রহণ করিও। আশা করি ভগবৎ কৃপায় মঙ্গলমতই দুর্গাপুরে পৌঁছিয়াছো। যাক, ৮-৮ তারিখের Written Test (B. Pharm-এর টেস্ট পরীক্ষার কথা বলা হচ্ছে) ভালোই হইয়াছে। Head of The Dept. of Biochemistry-র সঙ্গে দেখা করিয়াছিলাম। উনি বলিয়াছেন Chance পাবই। এবং ঢাকা হলে না থেকে J.N হলে থাকার জন্য উনি বল্লেন। তাই করব। আমার জন্য কোনো চিন্তা করিও না। চিঠি লিখতে একটু দেরী হইল।

কনট্রাক্টর মতি টাকা দেয় নাই। তাই টাকার খুব অভাব। আমি যদি সুরেশ ঘোষের কাছ হইতে ৪০.০০ টাকা নেই তবে তুমি দিয়া দিও। তোমাকে জানাইব। বাবুলদাকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার পাসের খবর দিও। মাসিমার চিঠি আজ পাইলাম। যাক তুমি আমার জন্য কোনো চিন্তা করিও না। ঢাকাতে জগন্নাথ হলে প্রায় চারশত হিন্দু ছাত্র আছে। বিশ্বাস হয় না। তাই না? আমি Chance পেয়ে গেছি বলে ধরে নিতে পার। সোনালির অসুখ এখন ভালো হইয়াছে। বাড়িতে আর সব ভালোই। ২/১ দিনের মধ্যে আবার লিখব।

ইতি। প্রণত রতু।

ময়মনসিংহ
২০-৯-১৯৬৪

শ্রীচরণেষু দাদামণি!

প্রণাম নিও। তোমার একটি চিঠি পাইয়াছি। গতকাল (১৯-৯-৬৪) স্টেটসম্যান পত্রিকায় দেখিলাম TATA ENGINEERING & LOCOMOTIVE LTD. JAMSHEDPUR-4 হইতে THERMAL ENGG. DEPT. (PLANT DIVISION) কর্তৃক I.Sc. পাস Supervisory Apprenticeship এর জন্য 3rd. Oct. এর আগে Application চাহিয়াছে। ২ বছরের কোর্স। প্রথম বর্ষে ২০০.০০ টাকা এবং দ্বিতীয় বর্ষে ২২৫.০০ টাকা করিয়া মাসে বৃত্তি দিবে। তবে কোম্পানিতে ৩ বৎসর পাশ করার পর চাকুরী করার বন্ড দিতে হইবে। ঐটা future ভালো বলে মনে হয়। আমি কাল পরশুর মধ্যেই একটা দরখাস্ত পাঠাচ্ছি। Indian Nationality-র কোনো উল্লেখ নাই। যদি দরকার পড়ে তবে তোমার তা বলতে হবে।

তোমার মতামত জানিয়ে তাড়াতাড়ি চিঠি দাও। সব ভালোই। পড়াতে আজও ভালো করে মন বসাতে পারিনি।

ইতি। প্রণত রতু।

20. Assembly
J.N Hall, Dacca-2
23-8-1965

শ্রীচরণেষু দাদামণি,

প্রণাম নিও। তোমার কাছে অনেকদিন যাবত লিখি না বলে খুব লজ্জিত। সুকোমল Engg. Test দিচ্ছে— আমিও। এটা তোমার ইচ্ছা ছিল না। তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধ বলেই চিঠি লেখার সাহস সঞ্চয় করতে পারিনি। লোক মারফত খবর পেয়ে তুমি দুঃখ পেতে পারো, তাই তোমাকে জানাচ্ছি। ১৩০০ ছেলে Test-এ Appear হবে। ২৮০টি সিট। Chance পেয়ে গেলে খুবই ভালো হবে। আশা করি পেয়ে যাব। সঙ্গে সঙ্গে B.Scটাও দিব। কোনো অসুবিধা হবে না। এবার ঢাকায় কোনো ভয় নেই। বহু হিন্দু ছেলে ভর্তি হচ্ছে। আশীর্বাদ করো যেন পাস করতে পারি।

ইতি। প্রণত রতু।

কাশবন
১৯ এপ্রিল ১৯৬৮

সোনালি,

গতকাল বাড়ি এসেই তোমার এবং দাদামণির দীর্ঘ পাঁচটি পত্র একাদিক্রমে গভীর আগ্রহ নিয়ে পড়ে গিয়েছিলাম। আজ আবার সকালে তোমার পত্র ডাকঘর থেকে পল্টু নিয়ে এসেছে। তাও পড়লাম। সবগুলো চিঠি পড়ার পরই তোমার কাছে

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লিখতে বসেছি। লিখতে বসেই আমার চোখের সামনে একটা ভিন্ন পরিবেশ খেলা করছে। আমার চোখের সামনে এখন অন্য বঙ্গের শিল্পশহর দুর্গাপুর, দুর্গাপুরের হাসপাতাল, দাদামণির ত্রিতল কোয়ার্টার, তাঁর আটজোড়া জুতা, পঁচিশটি শার্ট, তোমার সুন্দরতম চেহারা, একতলার ঐ সুন্দরী-মেয়েটির যার সঙ্গে তোমার খুব ভাব হয়েছে সম্প্রতি...। আমার চোখের সামনে ভাসছে সত্য ডাক্তারের চেয়ে চারগুণ ওজনের ডাক্তার ব্যানার্জি। ভোরের বাজার থেকে কিনে আনা সবুজ সাজনা, আট আনা হালির কমলা, এক কোটি পঁচিশ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্মিত রামমঙ্গল সিনেমা, ডিউটি শেষে ঘরে-ফেরা শ্রমিকের দল। বিশ্বাস করো, আমার অনুভবে, আমার সমগ্র অস্তিত্ব দিয়ে আমি অনুভব করছি এইসব। এই মুহূর্তে আমি তোমার খুব কাছে, দুর্গাপুরেই থাকতে চাই। কিন্তু যখন আমাকে এর বিনিময়ে এ-কথা মেনে নিতে হবে যে, আমি যাচ্ছি এমন এক জঘন্য প্রাচীর অতিক্রম করে যে সেখানে থেকে ফেরা আর সম্ভব নাও হতে পারে আমার, তখন আমার সমস্ত কল্পনা, আমার আকাঙ্ক্ষা আমার বুকের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ে। তোমার আনন্দে, তোমার সুখে, তোমার প্রাচুর্যে, তোমার বেদনায় আমিও ভাগ বসাতে চাই, হয়তো পারতামও—কিন্তু যারা আমাকে অন্তরঙ্গভাবে জানে, বোঝে, তারা জানে—স্বাভাবিক সুস্থ জীবনের প্রতি আমার বিমুখতা কত প্রখর। জলহস্তী যেমন জলকাদা ছাড়া বাঁচতে পারে না, জলকাদা যেমন তার জন্য অপরিহার্য, ঠিক তেমনি একটা অস্বাভাবিকতা, এক-ধরনের অর্থনৈতিক দারিদ্র্য, একটা নিরাশ্রিত যন্ত্রণার বোধ আমার শিল্পী-সত্তার জন্য অপরিহার্য প্রাণস্বরূপ। যার অবসানে তার মৃত্যু হবে বলেই আমার বিশ্বাস। লিও টলস্টয়ের মতোই অসুন্দরের মধ্যে সুন্দর, আর বালুর মধ্যে পদ্ম ফোটানোই আমার জীবনসাধনা। জানি, তোমরা আমার অগোছালো জীবন, আমার দারিদ্র্যের কথা ভেবে, স্বাভাবিকভাবেই আমি তোমাদের ভালোবাসি— কিন্তু আমি আরও বেশি ভালোবাসি তাকে, যে রক্তের দিক থেকে কিছু না হয়েও আমাকে বুঝতে পারে, এবং নিঃস্বার্থভাবেই আমাকে ভালোবাসে।

দাদামণির কণ্ঠের আড়ালে স্নেহের যে-ফল্গুনদীটি ক্রমে ক্রমে শুকিয়ে যাচ্ছে, আমি জানি, তা কোনোদিনই একেবারে নিঃশেষিত হয়ে যাবে না। আমার শৈল্পিক সাফল্যে আমার একদিন বর্ষার নদীর মতোই প্লাবিত হবে।

তোমাকে সীমান্তে রেখে আসার সময় আমার খুব খারাপ লেগেছিল। আমার তখন মনে পড়ছিল জার্মানীর কথা। রাজনীতির নিয়ন্ত্রণে জার্মানীও আজ এমনিভাবেই বিভক্ত। আমি জানি, সমস্যার সমাধানে সাধারণ মানুষ হচ্ছে ভাগ্যমুখী। কিন্তু আমি ইতিহাসের দর্শকমাত্র নই— আমি ইতিহাস সৃষ্টিতেই বেশি আনন্দ পাই।

দাদামণি আমার কবিতা নিয়ে যখন ব্যঙ্গ করে, তখন আমার খুব খারাপ লাগে। আমার কাছে আমার কবিতা আমার চোখের মতো। আমার কাছে আমার কবিতা আমার আত্মার মতো। আমার কবিতা আমার কাছে আমার রক্তের মতো প্রিয়। আর, কবিতাও আমাকে ভালোবাসে বলেই হয়তো ষাট-দশকের যেসব কবি পূর্ববঙ্গে জন্ম নিয়েছিল, তাদের মধ্যে যদি পাঁচ জনেরও নাম উল্লেখ করতে হয়—তবে আমার নাম অপরিহার্য। আর পূর্ববঙ্গের কবিরা পশ্চিমবঙ্গের কবিদের থেকে অনগ্রসর নয়, বিশেষ করে এই দশকে।

নিজের সম্পর্কে এই কথাগুলো লিখতে আমার লজ্জা করছে, তবুও আত্মরক্ষার জন্যই এই কথাগুলো আমাকে লিখতে হলো। আত্মরক্ষার চেষ্টা কে না করে?

ইতি। তোমার মেজদা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

Writer's Guild Office
Burdwan House
16-11-1969

শ্রীচরণেষু দাদামণি ও বৌদি,

বাড়িতে গিয়ে তোমাদের দু'জনের কাছেই চিঠি দিয়েছিলুম। ১৮-১১-৬৯-এ আমার একটা রেডিও Prog. এর কথা লিখেছিলাম। আসলে সেটা পরে আমার জন্যই এক সপ্তাহ পিছিয়ে নিতে হলো। আগামী 25th Nov. at 2.20 PM East.PK.time ঢাকা 'ক' থেকে প্রচারিত হবে। সুতরাং তোমাদের আবার জানালাম। শুনলে খুশি হব। অন্তত তোমরা শুনছ জেনে অনেক বিচ্ছিন্নতা সত্ত্বেও একটা অদৃশ্য যোগাযোগ অনুভব করব।

পাস সংবাদ অবশ্যই জেনেছ। M.A পড়ব ঠিক করেছি। উপরের ঠিকানায় চিঠি দিও—খুশি হব। পরে বিস্তারিত লিখছি। G.P.O তে দাঁড়িয়ে লিখলাম। দাদামণি, তুমি আমার প্রণাম নিও। বৌদি, অবশ্যই শুনবে। সোনালিকেও জানালাম।

ইতি। প্রণত রতু।

পুনঃ
Mrs. Nargis Jafar
C/O. Joytirmoy Sen
702 B & Block-P
New Alipore, Cal-33

এই ঠিকানায় *সমকাল* পত্রিকার সম্পাদক কবি সিকান্দার আবু জাফরের স্ত্রী কলকাতায় গিয়েছেন। তিনি আমার [illegible] তিন সপ্তাহ থাকার কথা। তুমি কলকাতায় গেলে তার সঙ্গে দেখা করতে পারো। একটা গরম চাদরের খুব দরকার ছিল।

২৫৫ মহসীন হল
নীলক্ষেত, ঢাকা-২
৩-৬-১৯৭০

বৌদি ও সোনালি,

বাড়িতে গিয়ে তোমাদের কাছে চিঠি দিয়েছিলাম। হয়তো পেয়েছ। যাক আমি 9th June যে প্রোগ্রামের কথা লিখেছিলাম সেটা হঠাৎ পিছিয়ে পরের সপ্তাহে অর্থাৎ 16th June হবে। দাদামণিকেও বলো। বাড়িতে সব ভালো। পল্টু ও ঝিল্লীর পরীক্ষা চলছে। হাসপাতালে রূপুকে প্রায়ই দেখতে যাই। ডাক্তারদের মধ্যে একজন আমার বন্ধু আছেন বলে তাকে অনেক সুবিধা দেয়া হয়। তোমরা Prog. শুনবে কিন্তু 16th June মঙ্গলবার, দুপুর সেই একই সময়ে। পূর্ব পাকিস্তান সময় দুপুর ২-১৫ মি.। কবিতার মধ্যে তোমাদের কথা আছে [দ্র : ইথারে নির্মিত পিয়ন : না প্রেমিক বা বিপ্লবী]। তাই তোমাদের ভালো লাগবার কথা। আমি ভালো আছি। খুব তাড়াতাড়ি লিখলাম বলে লেখা খুব খারাপ হলো। তোমরা খামে চিঠি দিও। ফটো পাঠিও।

ইতি রতু ঠাকুরপো ও মেজদা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

28 A Motaleb Road
Paribagh, Dhaka-2
1-9-70

শ্রীচরণেষু দাদামণি,

আমি একটি ইংরেজী দৈনিক পত্রিকায় (The Pepole) চাকরি করছি। টেলিপ্রিন্টারে খবর আসে— তোমাদের সব খবরাখবর পাই। দুর্গাপুরে সান্ধ্য আইন, হরতাল ইত্যাদি খবরগুলো Edit করতে গেলেই তোমাদের কথা মনে পড়ে। পত্রিকার চাকরি খুব ভালো লাগে। এ মাস থেকে বাবাকে সাহায্য করতে পারব। খামে বৌদির বাচ্চার নাম রেখে চিঠি দিয়েছিলাম—জানাবে পেয়েছ কি না। বাড়িতে গিয়ে সোনালির চিঠিতে জানলাম, বৌদি বেনারস চলে গেছে। তাকে আমার কথা লিখবে। দূরে আছি বলেই কি না জানি না, বৌদিকে আমার খুব ভালো লাগে। তোমাদের ঝগড়ার কথা শুনে খুব খারাপ লাগে। আগামী 13 Sept. রোববার সকাল দশটায় আমার কবিতার Prog. আছে Radio-তে। রোববার তো ছুটির দিন। শুনবে। সোনালি ও বৌদিকে জানিয়ে দিও। খোকন তারা কোথায় থাকে, আমি ঠিকানা জানি না। তাদেরকেও কথায় কথায় জানতে পারো। কবিতা লিখতাম বলে ওরা আমাকে খেপাত। কিন্তু আজকে ঢাকার সব পত্র-পত্রিকায় আমার ছবি ছাপা হয়। আমার কবিতা নিয়ে পত্রিকায় Post-Editorial (পূর্বদেশ-এ প্রকাশিত আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরীর 'তৃতীয় মত') লেখা হয়। তুমি নিশ্চয়ই খুশি হবে জেনে যে, আমি কবি এবং অবহেলিত বা লক্ষ্য না করার মতো কবিতা আমি লিখি না। যাক্, নিজের কথা লেখার জন্য লজ্জিত। উপরের ঠিকানায় চিঠি দিও।

ইতি। প্রণত রতু।

28 A Motaleb Road
Paribagh, Dhaka-2
1st Nov. 1970

শ্রীচরণেষু দাদামণি,

কী আশ্চর্য! তোমরা মাঝে মাঝে এমন যোগাযোগহীন হয়ে যাও কেন? দুর্গাপূজা শেষ হয়ে গেল। বাড়িতে গিয়েছিলাম। খুব আনন্দ হলো। তোমরাও নিশ্চয়ই খুব আনন্দ করেছ। বৌদি কি এখনও বেনারসেই আছে? তাঁকে অন্য পৃষ্ঠায় লিখলাম। আমার স্বাস্থ্য এখন আগের চাইতে ভালো হয়েছে। তার প্রমাণ, আগামী ১৫ই নভেম্বর ঢাকা টেলিভিশন থেকে আমার লেখা একটি নাটক প্রচারিত হবে— তাতে আমিই নায়কের চরিত্রে রূপদান করছি। তোমরা দেখতে পাবে না। খুব দুঃখ। মিমিকে (আমার দেয়া দাদামণির মেয়েটির নাম) আমার আদর দিও। তুমি আমার প্রণাম নিও। চাকরি ভালোই চলছে। উপরের ঠিকানাটা আমার নিজের বাসা।

ইতি। প্রণত রতু।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মার্চ-গাছের পাতাগুলো

পাকিস্তানের ললাটে চিরকালের জন্য অমোচনীয় কলঙ্কের তিলক এঁকে দেয়া পঁচিশে মার্চের কালরাতে আমি ঢাকায় ছিলাম। আমি তখন জনাব আবিদুর রহমান কর্তৃক সম্পাদিত ইংরেজি দৈনিক পিপল পত্রিকায় কাজ করি। সাব এডিটর। মাসিক বেতন ২৫০ টাকা। তখনকার টাকার মূল্যে বলতে হয় অনেক বেতন। আজিমপুর কবরস্থানের পশ্চিমে ও পরিত্যক্ত ইরাকি কবরস্থানের উত্তরে নিউ পল্টন লাইনের একটি মেসে থাকি। টিনের চাল, বাঁশের বেড়া, পাকা মেঝে। ঐ মেসে আমি অন্য একজনের সঙ্গে একটি রুম শেয়ার করতাম। আমার সিট ভাড়া ছিল মাসে কুড়ি টাকা। মেসের মালিক এলাহী সাহেব। তার নামানুসারে মেসের নাম এলাহী সাহেবের মেস। মেসের সামনের ছোট্ট রাস্তাটির নাম গ্রীন লেন। এত ছোটো রাস্তারও যে এত সুন্দর আর ভারিক্কি নাম থাকতে পারে, তা বিশ্বাস করা কঠিন।

আমি ঐ মেসে ১৯৬৯-১৯৭৫ সাল পর্যন্ত ছিলাম। আমার তিনটি কবিতায় (নৈশ প্রতিকৃতি, ভাড়া-বাড়ির গল্প ও গ্রীন লেনে। সূত্র : কবিতা, অমীমাংসিত রমণী, প্রকাশকাল ১৯৭৩) আমি জায়গাটাকে যথাসম্ভব অমরত্বদানের চেষ্টা করেছি।

আমাদের মেসের পাশের তিনতলা বাড়িটি শরিয়তউল্লাহ চেয়ারম্যানের। শরিয়তউল্লাহ চেয়ারম্যান আসলে কোথাকার চেয়ারম্যান ছিলেন, তা কখনও আমার জানা হয়ে ওঠেনি। তাঁর মুখের ভাষা শুনে জেনেছিলাম, তাঁর দেশের বাড়ি হচ্ছে নোয়াখালী। মনে হয়, ওখানকারই কোনো একটি ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ছিলেন তিনি। ঐ বাড়ির নিচতলায় থাকতেন পাকিস্তান টিভির প্রযোজক জনাব বেলাল বেগ। টিভিতে কবিতা পড়া আর নাটক করার কারণে বেলাল বেগের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল। তাঁর প্রযোজিত কোনো অনুষ্ঠানে আমি কখনও অংশ নেইনি বটে কিন্তু কাছাকাছি বয়সের ছিলেন বলেই তাঁর সঙ্গে আমার বেশ বন্ধুসুলভ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। তাঁর কথা পরে আবারও আসবে।

পঁচিশে মার্চের ৎকথাই যখন লিখছি, তখন পুরো মার্চ মাসটির ওপর একটু চোখ বুলিয়ে নেয়াটা অপ্রাসঙ্গিক হবে না বরং তাতে পাঠকের কিছু উপরি পাওয়া হবে। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার পাশাপাশি তখনকার রাজনৈতিক পরিস্থিতির একটা তথ্যনির্ভর চিত্রও পাওয়া যাবে। আমাদের জাতীয় জীবনে মার্চ মাসের একটা পৃথক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মূল্য আছে। ঐ মাসের প্রায় প্রতিটি দিনই গৌরবদীপ্ত। একসময় আমি 'মার্চ গাছ' নামে একটি কবিতা লিখেছিলাম, কবিতাটি হারিয়ে গেছে। কোন পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল কিছুতেই মনে করতে পারছি না। সম্ভবত ইত্তেফাকে। মার্চ মাসের প্রতিটি তারিখই কোনো না কোনো কারণে গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিটি তারিখই মার্চ গাছের এক একটি উজ্জ্বল পাতা। বাঙালির জাতীয় জীবনে এত গুরুত্ববহ মাস আর নেই। বিজয় দিবসসমৃদ্ধ ডিসেম্বর আর ভাষা দিবসসমৃদ্ধ ফেব্রুয়ারির কথা মনে রেখেই আমি বলছি।

মার্চ মাসের একটা উপরি পাওনা আছে, যা অন্য মাসগুলোর নেই। এই মার্চ মাসেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম। তাঁর জন্মদিন ১৭ মার্চ। ৭ মার্চ তিনি তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) সমবেত পাঁচ লক্ষাধিক ব্যাকুল বিদ্রোহী শ্রোতার সামনে দাঁড়িয়ে তাঁর ঐতিহাসিক কালজয়ী ভাষণ প্রদান করেন। আলোচনার মাধ্যমে সংকট সমাধানের সকল সম্ভাবনার পথ রুদ্ধ করে, অখণ্ড পাকিস্তানের কফিনে শেষ-পেরেকটি ঠুকে দিয়ে এই মার্চ মাসের ২৫ তারিখ রাত ১১টার দিকে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী নিজ দেশের স্বাধিকারকামী নিরস্ত্র নাগরিকের ওপর চালিয়েছিল ইতিহাসের জঘন্যতম বর্বর আক্রমণ। ঢাকা নগরীর নিদ্রিত নাগরিকদের ওপর চালিয়েছিল নির্বিচার গণহত্যা আর আমাদের ইপিআর, পুলিশ ও আনসার বাহিনীকে নিরস্ত্র করার জন্য আধুনিক মারণাস্ত্রে সজ্জিত হয়ে পিলখানা ও রাজারবাগ পুলিশ লাইনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল ক্রুদ্ধ-হিংস্র-ক্ষুধার্ত হায়েনার মতো। সেই বর্বর আক্রমণের পটভূমিতেই ইংরেজি ক্যালেন্ডার অনুসারে পরদিন ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরেই পাকিস্তান ভাঙার দায় পাকিস্তানের সামরিক জান্তা ও নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি পিপলস পার্টির নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টোর ওপর চাপিয়ে দিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করে একজন যথার্থ দূরদর্শী দেশনায়কের মতো পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর হাতে গ্রেফতার বরণ করেন।

তাঁর পাকবাহিনীর হাতে গ্রেফতার বরণের ঘটনাটিকে নিয়ে যারা তাঁর দূরদর্শী নেতৃত্বের ঔজ্জ্বল্যকে ম্লান করার চেষ্টা করেন, তাদের জন্য আমার বক্তব্য হচ্ছে এ রকম : তাঁর বিশ্বস্ত সহযোগী ও অনুসারীদের দেশ ত্যাগ করে ভারতে আশ্রয়গ্রহণের নির্দেশ দিয়ে তিনি নিজে পাকবাহিনীর হাতে গ্রেফতার বরণের যে সিদ্ধান্তটি নিয়েছিলেন, পুরোটা সময় পাকিস্তানের কারাগারে কাটিয়ে ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি স্বাধীন বাংলার মাটিতে ফিরে এসে প্রমাণ করেছেন যে তাঁর সিদ্ধান্তটি সঠিক ছিল। তাঁর অবর্তমানে কিছুই থেমে থাকেনি। তাঁর অবিসংবাদিত নেতৃত্ব মুহূর্তের জন্যও প্রশ্নবিদ্ধ হয়নি। রামের অবর্তমানে রামানুজ ভরত যেমন সিংহাসনে অগ্রজ রামের পাদুকা রেখে ভারত শাসন করেছিলেন, বঙ্গবন্ধুর বেলাতেও তেমনটিই ঘটেছিল। তাঁর অনুপস্থিতিতে আমাদের প্রবাসী সরকারের নেতৃত্বদানকারী শহীদ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাজউদ্দীন আহমদ বা সৈয়দ নজরুল ইসলাম বঙ্গবন্ধুর মুক্তির প্রশ্নটিকে বাংলাদেশের স্বাধীনতার সমার্থক বা সমান গুরুত্বপূর্ণ বলেই জ্ঞান করেছিলেন। একইসঙ্গে গাছেরটা ও তলেরটা খাওয়ার প্রয়াস চালিয়েছিলেন খন্দকার মোশতাক আহমদ। কিন্তু তিনি হালে পানি পাননি।

বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করে পাকিস্তানিরা কোনো ফায়দা লুটতে পারেনি। তারা তাঁর কাছ থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা বিঘ্নকারী বা মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী প্রবাসী সরকারের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে পারে, এমন কোনো বিবৃতি আদায় করতে পারেনি। তাঁর কারাগারের পাশে তাঁর জন্য কবর খোঁড়া হচ্ছে দেখেও তিনি আত্মসমর্পণ করেননি ইয়াহিয়া ও ভুট্টোর চাপের কাছে। জেলের ভিতরে কবর খোঁড়ার দৃশ্য দেখিয়ে তাঁকে ভয় দেখাতে আসা সামরিক কর্মকর্তাদের তিনি বলেছিলেন— 'আমার শেষ-ইচ্ছের প্রতি যদি সত্যিই তোমরা সম্মান প্রদর্শন করতে চাও তো আমার মৃতদেহটিকে বাংলাদেশে পৌঁছে দিও। আমাকে যেন আমার জন্মভূমিতে কবর দেয়া হয়।'

এমন একজন নির্ভয়চিত্ত দেশনায়কের দেশপ্রেমকে যারা কটাক্ষ করেন, 'সেসব কাহার জন্ম নির্ণয় ন জানি।'

মার্চ আমাদের স্বাধীনতা দিয়েছে, দিয়েছে জাতীয় পতাকা, দিয়েছে জাতীয় সংগীত ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মতো নির্ভয়চিত্ত এক জাতীয় নেতা। মার্চ আমাদের দিয়েছে মেজর জিয়াউর রহমানের মতো একজন সৈনিককে, যিনি ২৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর পক্ষে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাটি 'স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র' থেকে পুনঃপ্রচার করে বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে এক ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করেছিলেন।

শেখ মুজিবের ৬ দফা : পাকিস্তানের দফারফা

অনেকেই বলেন, বাংলাদেশের স্বাধীনতার বীজমন্ত্র নিহিত ছিল আমাদের ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলনের ভিতরে। কথাটা আমিও অস্বীকার করি না। খুবই সত্য কথা। বীজ না থাকলে প্রাণের উদ্ভব হবে কোথা থেকে? আমি মনে করি, কবি হিসেবে আমি একুশের জাতক। আমার জন্ম-রাশি একুশ। ঢাকার কাগজে প্রকাশিত আমার প্রথম কবিতাটি ছিল আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারিকে নিয়ে রচিত। একুশ নিয়ে আমি অনেক ক'টি কবিতা রচনা করেছি। কম করেও দশটি তো হবেই। আবৃত্তিকারদের কণ্ঠকৃপায় একটি কবিতা (আমাকে কী মাল্য দেবে দাও : কবিতা অমীমাংসিত রমণী : ১৯৭৩) বেশ জনপ্রিয় হয়েছে। ছোটো ও একটি প্রত্যন্ত গ্রামে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শৈশব কাটানোর কারণে একুশে ফেব্রুয়ারির সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত না থাকতে পারলেও, আমার ঐ কবিতাটি সময়কে অতিক্রম করে একুশের সঙ্গে যুক্ত-কবিদের লেখা কবিতার সারিতে যুক্ত হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছে। 'তোমার পায়ের নিচে আমিও অমর হব, আমাকে কী মাল্য দেবে দাও...।' আমার অন্য একটি কবিতায় আমি বলেছি :

'না, আমি নির্মিত নই বাল্মীকির কাল্পনিক কুশে–,
আমাকে দিয়েছে জন্ম রক্তঝরা অমর একুশে।'

(আমার জন্ম : পৃথিবীজোড়া গান)

আমরা জানি, আটাশ দিনেতে সবে ফেব্রুয়ারি ধরে। ইংরেজি বর্ষের সবচেয়ে ছোটো মাস হচ্ছে ফেব্রুয়ারি। কিন্তু মহান একুশে ফেব্রুয়ারির মতো একটি উজ্জ্বল দিনকে বুকে ধারণ করে ইংরেজি বর্ষের সবচেয়ে ছোটো মাসটিই আমাদের কাছে হয়ে উঠেছে সবচেয়ে বড় মাস। স্বাধিকারের স্বপ্নাঞ্জনমাখা ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি আমাদের সাংস্কৃতিক স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার দিন। ঐ সাংস্কৃতিক স্বাধীনতাকেই রাজনৈতিক স্বাধীনতায় উন্নীত করেছে আমাদের পরবর্তীকালের দীর্ঘ সংগ্রাম। লক্ষ লক্ষ প্রাণের মূল্যে, বীরের রক্তধারায়, মায়ের অশ্রুজলে সেই সংগ্রামের শ্রেষ্ঠ ফসল ফলেছে ১৯৭১-এ। আমরা অর্জন করেছি ২৬ মার্চ। আমাদের প্রিয় স্বাধীনতা দিবস। তারপর নয় মাসের সশস্ত্র যুদ্ধের ভিতর দিয়ে ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানি দখলদার বাহিনীর আত্মসমর্পণের মাধ্যমে অর্জিত হয়েছে আমাদের বিজয় দিবস, দখলদারমুক্ত একটি নিজস্ব মুক্ত ভূমণ্ডল— বাংলাদেশ।

বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন ও একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের মাঝখানে উজ্জ্বল হাইফেনের মতো বিদ্যমান বা সংযোগ রক্ষাকারী যে অধ্যায়টির প্রতি আমরা কিছুটা উদাসীন, আমার বিবেচনায় সেটি হচ্ছে বঙ্গবন্ধু কর্তৃক প্রণীত ঐতিহাসিক ৬ দফা কর্মসূচি। আমি মনে করি, ভাষা আন্দোলনকে এক দফার স্বাধীনতা আন্দোলনে পরিণত করার পেছনে একটি উজ্জ্বল সিঁড়ির ভূমিকা পালন করেছে ৬ দফা কর্মসূচি। ঐ সিঁড়িটি না থাকলে আমরা এত দ্রুত আমাদের কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতার রক্ত-সরোবরে নামতে পারতাম না। তাই বঙ্গবন্ধু-প্রণীত ৬ দফা কর্মসূচিটি কী ছিল, কীভাবে ঐ কর্মসূচিটি আমাদের চেতনায় ধীরে ধীরে স্বাধিকারের আকাঙ্ক্ষাকে জাগ্রত করেছিল, তা আমাদের সবারই জানা দরকার। কিন্তু আমার মনে হয়, আমাদের ইতিহাস প্রণেতারা সেখানে খুব কার্যকরভাবে আলো ফেলতে পারেননি। বাংলাদেশের ইতিহাস বিকৃতকারীদের দোষ দিয়ে লাভ নেই। তারা তো লুকাবেই। যেখানে তাদের কোনো কৃতী নেই, সেখানে তারা ইতিহাসের আলো ফেলবে কেন? আমি মনে করি, আওয়ামী লীগের শাসনামলেও ৬ দফার ঐতিহাসিক গুরুত্বকে যতটা আমলে নেয়া দরকার ছিল, বাস্তবে ততটা আমলে নেয়া হয়নি। ৭ জুনকে ৬ দফা দিবস হিসেবে আওয়ামী লীগ পালন করে বটে কিন্তু শুধু ঐটুকুর ভিতর দিয়ে ৭

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জুনের প্রতি যথার্থ মর্যাদা প্রদর্শন করা হয় না। আমি মনে করি, ঐদিনটিকে সরকারি ছুটির আওতায় আনা দরকার এবং নতুন প্রজন্মের ছাত্রছাত্রীদের বিশদভাবে জানবার জন্য স্কুল-কলেজের পাঠ্যসূচিতে ঐদিনটির ওপর তাৎপর্যপূর্ণ নিবন্ধ প্রকাশ করা দরকার।

পাঠকের জ্ঞাতার্থে ঐতিহাসিক ৬ দফা কর্মসূচিটি এখানে তুলে দিচ্ছি

১৯৬৫ সালের ৭ সেপ্টেম্বর থেকে ১৭ দিন স্থায়ী যে পাক-ভারত যুদ্ধটি হয়, তার পটভূমিতে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পূর্ব বাংলার বিচ্ছিন্নতা, নিরাপত্তাহীনতা এবং স্বাধিকারের প্রশ্নটি তীক্ষ্ণভাবে সামনে চলে আসে। সতেরো দিনের পাক-ভারত যুদ্ধের সময় পূর্ব বাংলা ছিল সম্পূর্ণভাবে অরক্ষিত। ভারত ইচ্ছে করলেই তখন পূর্ব পাকিস্তানকে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই দখল করে নিতে পারত। পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের মনে সেই ভয়টা জেঁকে বসেছিল। শেখ মুজিব (তিনি তখনও বঙ্গবন্ধু উপাধি পাননি) পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের মধ্যে জাগ্রত ভারত-ভীতিকে অত্যন্ত সুকৌশলে পুঁজি করে তাঁর ঐতিহাসিক ৬-দফা কর্মসূচিটি প্রণয়ন করেন। পাকিস্তানের আংশিক পরাজয়ের মধ্য দিয়ে ১৭ দিনের পাক-ভারত যুদ্ধের অবসান হয়। ১৯৬৬ সালের ১০ জানুয়ারি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী লাল বাহাদুর শাস্ত্রী সোভিয়েট ইউনিয়নের মধ্যস্থতায় তাসখন্দে একটি শান্তি চুক্তি স্বাক্ষর করেন। শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরের পরদিনই তাসখন্দে লাল বাহাদুর শাস্ত্রী কোল্ড স্ট্রোকে মারা যান। শান্তি চুক্তির চেয়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রী লাল বাহাদুর শাস্ত্রীর আকস্মিক মৃত্যুর কারণেই তাসখন্দ দ্রুত বিশ্বখ্যাতি লাভ করে। তাসখন্দ শান্তি চুক্তির বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করে আইয়ুবের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টো দ্রুত ভারত-বিরোধীদের সমর্থন লাভ করেন। রাশিয়ার মধ্যস্থতায় ভারতের সঙ্গে শান্তি চুক্তি করে এমনিতেই প্রশ্নের মুখে পড়েছিলেন প্রেসিডেন্ট আইয়ুব, ভুট্টোর বিরোধিতার কারণে আইয়ুবের অবস্থান আরও দুর্বল হয়ে পড়ে। ঐরকমের যুদ্ধোত্তর পরিস্থিতিতে পাকিস্তানের লৌহমানব বলে খ্যাত প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের ক্ষমতার মসনদ যখন কিছুটা দুলে উঠেছে, তখন তৎকালীন পাকিস্তানের বিরোধী দলগুলো লাহোরে একটি রাজনৈতিক কনভেনশন বা গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজন করে। শেখ মুজিব ঐ সময়টাকেই তাঁর কর্মসূচি 'বাঙালির মুক্তি-সনদ' পেশ করার মাহেন্দ্রক্ষণ বলে মনে করে, ঐ কনভেনশনে তাঁর ঐতিহাসিক ৬ দফা কর্মসূচি উত্থাপন করেন। তিনি তাঁর কর্মসূচির নাম দেন 'বাঁচার দাবি ৬ দফা'।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাঁচার দাবি ৬ দফা

প্রস্তাব-১

শাসনতান্ত্রিক কাঠামো ও রাষ্ট্রীয় পদ্ধতি :

দেশের শাসনতান্ত্রিক কাঠামো এমন হতে হবে যেখানে পাকিস্তান হবে ফেডারেশনভিত্তিক রাষ্ট্রসংঘ এবং তার ভিত্তি হবে লাহোর প্রস্তাব। সরকার হবে পার্লামেন্টারি পদ্ধতির। সর্বজনীন ভোটে নির্বাচিত পার্লামেন্ট হবে সার্বভৌম।

প্রস্তাব-২

শাসনতান্ত্রিক কাঠামো ও রাষ্ট্রীয় পদ্ধতি :

কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা কেবলমাত্র দুটি ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকবে, যথা দেশরক্ষা ও বৈদেশিক নীতি। অবশিষ্ট সকল বিষয়ে রাষ্ট্রগুলোর ক্ষমতা থাকবে নিরঙ্কুশ।

প্রস্তাব-৩

মুদ্রা বা অর্থ সম্পর্কীয় ক্ষমতা :

মুদ্রার ব্যাপারে নিম্নলিখিত দুটির যে কোনো একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা যেতে পারে—

(ক) সমগ্র দেশের জন্য দুটি পৃথক অথচ অবাধ বিনিময়যোগ্য মুদ্রা চালু থাকবে।

(খ) সমগ্র দেশের জন্য কেবল একটি মুদ্রা চালু থাকতে পারে। তবে সেক্ষেত্রে শাসনতন্ত্রে ব্যবস্থা থাকতে হবে যে, পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে অর্থ পাচার বন্ধ করতে হবে। এক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানে পৃথক ব্যাংকিং রিজার্ভের ব্যবস্থা করতে হবে এবং পূর্ব পাকিস্তানের জন্য আর্থিক বা অর্থনৈতিক নীতি প্রবর্তন করতে হবে।

AMARBOI.COM

প্রস্তাব-৪

রাজস্ব, কর বা শুল্ক সম্বন্ধীয় ক্ষমতা :

ফেডারেশনের অঙ্গরাষ্ট্রগুলোর কর বা শুল্ক ধার্যের ব্যাপারে সার্বভৌম ক্ষমতা থাকবে। কেন্দ্রীয় সরকারের কর ধার্যের ক্ষমতা থাকবে না। তার প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহের জন্য অঙ্গরাষ্ট্রের রাজস্বের একটা অংশ কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাপ্য হবে। অঙ্গরাষ্ট্রগুলোর সকল করের শতকরা একই হারে আদায়কৃত অংশ দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের তহবিল গঠিত হবে।

প্রস্তাব-৫

বৈদেশিক বাণিজ্য বিষয়ক ক্ষমতা :

(ক) ফেডারেশনভুক্ত প্রতিটি রাষ্ট্রের বহিঃবাণিজ্যিক পৃথক হিসাব করতে হবে।

(খ) বহিঃবাণিজ্যের মাধ্যমে অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা অঙ্গরাষ্ট্রগুলোর এখতিয়ারে থাকবে।

(গ) কেন্দ্রের জন্য প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রার চাহিদা সমান হারে অথবা সর্বসম্মত কোনো হারে অঙ্গরাষ্ট্রগুলো মিটাবে।

(ঘ) অঙ্গরাষ্ট্রগুলোর মধ্যে দেশজ দ্রব্যাদির চলাচলের ক্ষেত্রে শুল্ক বা কর জাতীয় কোনো বাধানিষেধ থাকবে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

(ঙ) শাসনতন্ত্রে অঙ্গরাষ্ট্রগুলোকে বিদেশে নিজ নিজ বাণিজ্য প্রতিনিধি প্রেরণ এবং স্ব-স্বার্থে বাণিজ্যিক চুক্তি সম্পাদনের ক্ষমতা দিতে হবে।

প্রস্তাব-৬

আঞ্চলিক সেনাবাহিনী গঠনের ক্ষমতা :

আঞ্চলিক সংহতি ও শাসনতন্ত্র রক্ষার জন্য শাসনতন্ত্রে অঙ্গরাষ্ট্রগুলোকে স্বীয় কর্তৃত্বাধীন আধা সামরিক বা আঞ্চলিক সেনাবাহিনী গঠন ও রাখার ক্ষমতা দিতে হবে।

শেখ মুজিবুর রহমান
সাধারণ সম্পাদক
পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ

লাহোর, ৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৬

৬ দফায় বর্ণিত পৃথক অথচ অবাধ বিনিময়যোগ্য মুদ্রার ধারণাটি আমার খুব পছন্দ হয়। পৃথক মুদ্রার মানে যে পৃথক দেশ, তা আমার বুঝতে দেরি হয় না।

শেখ মুজিব ভেবেছিলেন, পশ্চিম পাকিস্তানের বঞ্চিত প্রদেশগুলোর নেতারা তাঁর ৬ দফা সমর্থন করবে, কিন্তু বাস্তবে তা হলো না। পরদিনের কাগজে তাঁর ৬ দফার কঠোর সমালোচনা ছাপা হলে তিনি পাকিস্তান থেকে পালিয়ে ঢাকায় ফিরে আসেন। তিনি স্মরণ করলেন কবিগুরুর কবিতা— 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলো রে।'

পূর্ব বাংলাতেও ৬ দফার সমালোচনা নেহায়েত কম হয়নি। মওলানা ভাসানী বললেন, ওটা আসলে আর কারোরই নয়, ওটা সিআইএ-র দলিল। তিনি এ ব্যাপারে তার কাছে দলিল আছে বলে জানালেন। কিন্তু সাংবাদিকদের চাপের মুখে তিনি প্রমাণ দাখিল করতে ব্যর্থ হন। তিনি জানান যে, ঐ দলিলটি তিনি তার দলের সাধারণ সম্পাদক তোয়াহাকে দিয়েছিলেন। কিন্তু তোয়াহা জানান, মওলানা ভাসানী কোনোদিনই ওরকম কোনো দলিল তাঁকে দেননি।

শেখ মুজিবের ৬ দফা কর্মসূচিটি পুস্তিকাকারে ছাপিয়ে সারা দেশে বিলি করা হয় এবং তা দ্রুত জনপ্রিয়তা লাভে সক্ষম হয়। ২০ মার্চ থেকে শেখ মুজিব দেশব্যাপী জনসংযোগ শুরু করেন। ৩৫ দিনে তিনি ৩২টি জনসভায় ৬ দফার পক্ষে বক্তব্য দেন।

৬ দফা নিয়ে দেশের মানুষকে ক্ষেপিয়ে তোলার অভিযোগে শেখ মুজিবকে ১৯৬৬ সালের ৮ মে গ্রেফতার করে জেলে পাঠানো হয়। তাজউদ্দীনসহ আরও বহু আওয়ামী লীগের নেতা ও কর্মীকে পাঠানো হলো জেলে। আওয়ামী লীগের ওপর নেমে আসে জেল-জুলুম আর নিপীড়ন। সারাদেশে আওয়ামী লীগের ৩ হাজার ৫শ' নেতাকর্মী গ্রেফতার হন। কিন্তু ৬ দফার আন্দোলনকে স্তব্ধ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে।

আমি তখন ময়মনসিংহের আনন্দমোহন কলেজে বিএসসি পড়ি। '৬৪-র

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কারণে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন খোলা ফার্মেসি বিভাগে ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েও ভর্তি হতে না পারার কারণে আমার মন খুব খারাপ। ইসলামিক রিপাবলিক অব পাকিস্তানের প্রতি আমি ভীষণভাবে ক্ষুব্ধ। আমি ছাড়া ঐ বছর প্রথম বিভাগ পাওয়া আর কেউ পাস কোর্সে ডিগ্রী পড়তে বাধ্য হয়েছিল বলে আমার মনে হয় না। পরের বছর ১৯৬৫ সালে আমি বুয়েটে ভর্তি হওয়ার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হই। রিটেনে পাস করলেও আমাকে ভাইভাতে আটকে দেয়া হয়। ভাইভা বোর্ডে একজন শিক্ষকের প্রশ্নের উত্তরে আমি বলে ফেলেছিলাম যে আমার বড় ভাই ভারতে বসবাস করেন। আমার মনে হয় সে-কারণেই আমার হয়নি। পাস করে আমি যদি ভারতে চলে যাই! ভারত তখন নবঘোষিত এনিমি স্টেট আর পূর্ব বাংলার হিন্দুরা পাকিস্তানের অঘোষিত এনিমি।

এ রকম পরিস্থিতিতে আমি শেখ মুজিবের ৬ দফা কর্মসূচিটি ভালো করে পড়লাম। পড়ে আমার মনে হলো, পাকিস্তান নিধনের ওষুধ পাওয়া গেছে।

'বারবার ঘুঘু তুমি খেয়ে যাও ধান,
এইবার ঘুঘু তোমার বধিব পরান।'

শেখ মুজিব এই প্রবচনতুল্য কবিতাটি পাকিস্তানের সামরিক জান্তার উদ্দেশ্যে প্রায়ই জনসভায় আওড়াতেন। আমিও তাঁর কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাই।

শেখ মুজিবসহ আওয়ামী লীগের নেতা ও কর্মীদের মুক্তির দাবিতে ১৯৬৬ সালের ৭ জুন দেশব্যাপী হরতাল ডাকে আওয়ামী লীগ। সেই হরতালের ডাকে অভাবিতভাবে সাড়া দেয় পূর্ব বাংলার মানুষ। হরতাল সফল করতে গিয়ে পুলিশ-জনতা সংঘর্ষে মারা যায় তেজগাঁর শ্রমিক মনু মিয়াসহ মোট ১১ জন। নিহত শ্রমিকদের অধিকাংশই ছিল নারায়ণগঞ্জের আদমজী জুট মিলের শ্রমিক। সেদিন সন্ধ্যার দিকে ময়মনসিংহ রেলস্টেশনে প্রবেশ করে ঢাকা থেকে ছেড়ে আসা একটি ট্রেন। ট্রেনটি প্রায় যাত্রীশূন্য। আমি সেই যাত্রীশূন্য ট্রেনের ভিতরে তাকিয়ে আমার ভবিষ্যতের বাংলাদেশকে দেখতে পাই। সেদিনই আনন্দমোহন কলেজের হোস্টেলে ফিরে গিয়ে রাত জেগে আমি লিখি শেখ মুজিবের ৬ দফার পক্ষে আমার প্রথম কবিতা– 'সুবর্ণ গোলাপের জন্য'।

'শীতের রোগীর মত জবুথবু নয়,
গঞ্জের জনতার মত নির্ভীক হতে হবে।
রক্তের রঙ দেখে ভয় নেই,
স্বাধীন দেশের মুক্ত জনতা উল্লাস করো সবে।'

(প্রকাশ ১৯৬৬ : প্রথম দিনের সূর্য)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

AMARBOI.COM

উনিশ শ'একাত্তর হচ্ছে, আমি আগেই বলেছি, সমুদ্রের মতো উত্তাল এবং হিমালয়ের মতো বিস্তৃত-বিশাল একটা সময়খ। এই বছরের প্রতিটি দিনই কোনো না কোনো কারণে গুরুত্বপূর্ণ। এমন একটি গুরুত্ববহ বছর, পৃথিবীর আর কোনো জাতির জীবনে আছে বলে আমার মনে পড়ছে না। রুশ বিপ্লবের বছর ১৯১৭ বা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অন্তিম বছর ১৯৪৫ সালের সঙ্গেই হয়তো তার তুলনা চলে। আমি একাত্তর নিয়ে লিখতে বসে বড় বিপদে পড়েছি। পড়ব যে তা আমি বিলক্ষণ জানতাম। আমার কণ্ঠস্বর লিখেই তাই আমি আমার আত্মজীবনীর ইতি টানতে চেয়েছিলাম। লিখতে চাইনি। আমার যুক্তি ছিল, জীবন থাকলেই জীবনী লিখতে হবে, এই কথা কে বলেছে? আমার অনুরাগী পাঠক বা আমার প্রকাশকরা যখন আমাকে আরও লেখার জন্য অনুরোধ করত, আমি তাদের সে কথাই বলতাম। বলতাম আমার পক্ষে আর লেখা সম্ভব নয়। বলতাম বটে লিখব না, কিন্তু মনে মনে ঠিকই লিখতাম। না লিখে পারতাম না। মনে মনে লেখার বড় সুবিধা হলো এই যে, সেখানে পাঠকের প্রবেশাধিকার থাকে না। সেখানে ভাষার দুর্বলতা বা তথ্যের বিভ্রাট নিয়ে বিচলিত বোধ করার কিছু নেই। আমাদের চিন্তাজগতে প্রতিনিয়ত কত কিছুই না ঘটে চলেছে। তার খোঁজ কে রাখে? মানবমনের সেই গহীন অরণ্যে প্রবেশ করার সাধ্য নেই কারও। সেখানে বানান ভুল বলে কিছু নেই। চিন্তার জন্য কি শব্দের নির্ভুল বানান জানবার দরকার পড়ে? এক মানুষের অলিখিত-অব্যক্ত চিন্তাভাবনার বিচিত্র-বর্ণিল জগতের ওপর অন্য মানুষের মালিকানা থাকে না; অধিকার থাকে না। অজাত শিশুর মতো অলিখিত রচনাও থাকে আমাদের সকল সমালোচনার ঊর্ধ্বে। সমস্যা দেখা দেয় তখনই, যখন একজন তার মনের ভিতরের চিন্তাভাবনাকে ভাষার মাধ্যমে প্রকাশ করে বসে। মানুষের মনের অপ্রকাশিত ভাবনারাশিকে আমি তুলনা করি পৃথিবীর আলো দেখার আগেই, ভূপৃষ্ঠে অবতরণের অধিকারবঞ্চিত, অ-ভূমিষ্ঠ শিশুদের সঙ্গে। নিজেদের সীমাবদ্ধতার কারণে, নিজেদের জীবনকে নিষ্কণ্টক ও নিরাপদ রাখার জন্য অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রস্বার্থে যাদের আমরা এই সুন্দর পৃথিবীতে জন্ম নিতে দেইনি। আমি খুব বেদনার সঙ্গে লক্ষ করেছি এই নির্মম সত্য যে, প্রকৃতির রাজ্যে মানুষ যতটা নিষ্ঠুর হতে পারে, অন্য কোনো প্রাণীর পক্ষেই তা সম্ভব নয়। মানুষের যেখানে দুর্বলতা, সেখানেই প্রাণিজগতের অন্য সদস্যদের শক্তি। কে জানে, শেষ পর্যন্ত মানুষ হয়তো থাকবে না, এই সুন্দর পৃথিবীতে টিকে থাকবে মানবেতর প্রাণীরাই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি আত্মজৈবনিক ধারার লেখক। আমার সমস্ত রচনাই এক অর্থে আমার আত্মজীবনীরই খণ্ডিত অংশ। তা গদ্যেই হোক বা পদ্যেই হোক। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'কবিকে পাবে না তুমি জীবন-চরিতে'। আমি কবিগুরুর এই কথাটাকে সত্য বলে মনে করি না। আমি ভাবি, এ কথা বলে রবীন্দ্রনাথ হয়তো তাঁর রচিত সাহিত্যের অনুসন্ধিৎসু ও কৌতূহলী পাঠকের দৃষ্টি থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখতে চেয়েছিলেন। রক্ষণশীল বাঙালির চরিত্র বিবেচনা করেই হয়তো তিনি তাঁর পাঠককে বিভ্রান্ত করাটা জরুরি বলে ভেবেছিলেন। আত্মজৈবনিক ধারার একজন দীন খাদেম বা স্বঘোষিত প্রবক্তা হওয়ার পরও, মাঝে মাঝে আমিও তা করি। মাঝে মাঝে আমিও রণে ভঙ্গ দেই। বলি, না আর পারি না। কবি হিসেবে আমি আমার আর্টফর্মের মধ্যে যে বেনিফিট অব ডাউট এনজয় করি, গদ্য রচয়িতা হিসেবে আমি তা করতে পারি না। ভেবেছিলাম, অনাগত সন্তানের জন্ম নিয়ন্ত্রণ করে আমরা যে অন্যায় করি, অন্তরে জাগ্রত ভাবনাগুলোকে অপ্রকাশিত রেখে নিজেকে শাস্তি দিলে মন্দ হয় না। তাই আমার কণ্ঠস্বর-এর কিঞ্চিৎ সফল পরিসমাপ্তির পর, যার মধ্যে বর্ণিত হয়েছে ১৯৬২-১৯৭০ সাল পর্যন্ত সময়খণ্ড, আত্মজীবনীর পরবর্তী অধ্যায় অলিখিত রেখেই আমার ধরাধাম ত্যাগ করার গোপন বাসনা ছিল। কিন্তু বিধি বাম। তাঁর ইচ্ছা অন্য। আমার ইচ্ছাই তো আর শেষ কথা নয়। যিনি আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন, নানা ছুতায় যিনি আমাকে লেখালি লিখিয়ে আসছেন; খেলতে খেলতে যিনি আমাকে লেখক বানিয়েছেন, তিনিই বা আমাকে দিয়ে তাঁর ইচ্ছা পূরণ না করে ছাড়বেন কেন? আমার ভেতর দিয়ে তাঁর দাবি তিনি মিটিয়ে নেবেন বৈকি।

প্রথম আলো-র সাহিত্য সম্পাদক তরুণ কবি জাফর আহমদ রাশেদের উপর্যুপরি তাড়ায় উক্ত পত্রিকার বিজয় দিবস সংখ্যার জন্য আমার শরণার্থী জীবনের অভিজ্ঞতা নিয়ে ছোটো একটি লেখা লিখতে বসেছিলাম। তখনও ঠিক বুঝতে পারিনি, মাস্টার পড়াচ্ছে। বুঝতে পারিনি, ঐ রচনা আমাকে কোথায় নিয়ে যাবে। মনে পড়ছে, ছেলেবেলায় আমার খুব শীতের ভয় ছিল। যে আমি গরমের দিনে পুকুর ছেড়ে উঠতেই চাইতাম না, সেই আমি শীতের দিনে ছিলাম একেবারে উল্টো। স্নান করতে চাইতাম না। পুকুরের জলে সহজে নামতে চাইতাম না। যেন আমি জলাতঙ্ক রোগী। শীতের দিনে গায়ে তেল মেখে অনেকক্ষণ পুকুরের পাড়ে রোদে বসে থাকতাম। রোদ পোহাতাম। আমার মা-বাবা বা ভাই-বোনরা পেছন থেকে এসে আমাকে ধাক্কা দিয়ে পুকুরের জলে ফেলে দিত। বা আচমকা আমার মাথায় এক ঘড়া জল ঢেলে দিত। প্রথমে রাগ করলেও জলে গা ভিজে যাওয়ার পর আমার শীতের ভয়টা যেত কেটে। দেহ আরাম পেতে শুরু করত। তখন আর আমাকে পায় কে? পুকুরের ধোঁয়া ওঠা জলেও দিব্যি ডুব বা সাঁতার কাটতে পারতাম প্রাণভরে। স্নান শেষে যখন পুকুর ছেড়ে উঠতাম, বেশ ভালো লাগত। শুধু যে শরীরে ভালো লাগত তাই নয়, একটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পবিত্র ভাবও জাগত মনে। মনে পড়ত বেদমন্ত্র— 'অপবিত্র পবিত্রবা'। মনে হতো পুণ্য জলের স্পর্শে আমি পবিত্র হয়ে উঠেছি।

বড় লেখায় হাত দেয়ার জন্য আমার একটা ধাক্কা দরকার পড়ে। বড় কিছু লেখায় হাত দেবার জন্য মনকে রাজি করাতে আমার অনেক সময় চলে যায়। আসলে আমি হচ্ছি অলস পৃথিবী। মহাশূন্যে তার যে পথপরিক্রমা আজ আমরা দেখছি, তা তো আর আদিতে ছিল না। দীর্ঘদিন সে স্থির ছিল। স্থির থেকেই সে অস্থির হয়েছে। কীভাবে হয়েছে? মহাশূন্যের গ্রহ-তারকা ও নক্ষত্রপুঞ্জের ভিতরে গতি সঞ্চারের পেছনে আইনস্টাইনও একটা প্রচ ধাক্কার অস্তিত্ব কল্পনা করেছেন। আমি কোন ছার যে ধাক্কা ছাড়া চলি? তাই আমার আত্মজীবনীর পরবর্তী খণ্ড, যার অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে ১৯৭১ নিয়ে লেখার জন্য যারা আমাকে দীর্ঘদিন ধরে নানাভাবে ঠেলা-ধাক্কা দিয়েছেন, তাদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ধাক্কায় বিশাল মুক্তিযুদ্ধের অতল সমুদ্রজলে পড়ে হাবুডুবু খেলেও আমি তাদের কথা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি।

এই ধারাবাহিকের কয়েকটি অধ্যায় রচনার পর লক্ষ্য করছি যে, আমার রচনাটি সময়-ক্ষণ বা দিন তারিখের ধারাবাহিকতা মেনে পূর্বের গ্রন্থটির মতো অগ্রসর হচ্ছে না। তার রকমসকম ও প্রকৃতি যেন অনেকটাই আলাদা ঠেকছে। তার গতি-প্রকৃতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে গিয়ে আমি রীতিমতো হিমশিম খাচ্ছি। তাই স্থির করেছি বা নিরিখ বেঁধেছি এই মর্মে যে, প্রচণ্ড প্লাবনের তোড়ে ভেসে যাওয়া খড়কুটো যেমন নিজেকে তরঙ্গের কাছে সমর্পণ করে, আমিও তেমনি নিজেকে সঁপে দেব একাত্তরের সেই সময়ের হাতে, যা একই সঙ্গে উত্তাল ও উন্মাদ; সুন্দর ও ভয়ংকর। একই সময়ে সে একার এবং অনেকের। ধরেছি স্মৃতির কালো ধূসর নৌকায় পাল তুলে দিয়ে নাও ছেড়ে দেয়ার কৌশল। স্মরণ করি প্রয়াত সুরস্রষ্টা সমর দাশের অমর সৃষ্টি— 'নোঙর তোল তোল/ সময় যে হলো হলো।' আমার নোঙর তোলা ভালোবাসার এই নৌকাটি আমাকে যেভাবে, যে পথে নিয়ে যাবে, আমি সেভাবেই সেই পথ ধরে অগ্রসর হব বেহুলার মতো। আমি জানি, আমার নৌকায় আমি যে স্বপ্নের শবকে বহন করে নিয়ে চলেছি, বেহুলার স্বামী লখিন্দরের মতোই আমার কাছে সে প্রিয় বাংলাদেশ।

AMARBOI.COM

লেখাটি যেভাবে অগ্রসর হচ্ছে, তাতে বাংলাদেশের জন্মকথা থেকে আমি আমার জীবনকথাকে পৃথক করতে পারব বলে মনে হয় না। আমি সে চেষ্টা করবও না। মিলছে মিলুক। যার আত্মকথা তার দেশের জন্মকথার সঙ্গে মিলে যায়, তার চেয়ে সৌভাগ্যবান আর কে?

দি পিপল পত্রিকায় আমার ইমিডিয়েট বস ছিলেন আমাদের সকলের প্রিয় নিউজ এডিটর জনাব আবদুস সোবহান। চমৎকার আমুদে মানুষ। তাঁকে বলে আমি নাইট শিফটের ডিউটি চেয়ে নিয়েছি। তিনি আমাকে সেই সুযোগ দিয়েছেন। ফলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অন্যদের শিফট বদল হলেও আমার কখনও শিফট বদল হতো না। তরুণ কবি হিসেবে তিনি আমাকে খুব খাতির করতেন; স্নেহ করতেন। সোবহান সাহেব ভাল ইংরেজি জানতেন। তাঁর টেবিলে একটি অক্সফোর্ডের ইংরেজি ডিকশনারি থাকত বটে, কিন্তু পারতপক্ষে তিনি সেটা ব্যবহার করতেন না। নিউজ এডিটর হিসেবে পিপল পত্রিকায় যোগদানের আগে তিনি পশ্চিম পাকিস্তানে ছিলেন। করাচি থেকে প্রকাশিত বিখ্যাত ডন পত্রিকায় কাজ করতেন। আমাদের ইংরেজি শিখতে খুব সাহায্য করতেন। আমার ইংরেজি শেখার পেছনে তাঁর ভাল অবদান ছিল। নাইট শিফটে আমি কাজ করতাম বলে সারাদিন আমার কোনো কাজ থাকত না। নিউ মার্কেটের রেস্টুরেন্টে বা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শরীফের ক্যান্টিনে চুটিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিতে পারতাম আর টো টো করে ঘুরে বেড়াতে পারতাম ঢাকার বিভিন্ন পত্রিকা অফিসে। আমি ইংরেজি দৈনিক পত্রিকা পিপলে কাজ করতাম, সেখানে আমার বাংলা লেখা ছাপার কোনো সুযোগ ছিল না। আমার কবিতা বা সামান্য গদ্য যা লিখতাম, সেগুলো ছাপা হতো দৈনিক পাকিস্তান, সংবাদ, আজাদ বা পূর্বদেশ পত্রিকায়। আমার লেখা ছাপা হতো কথাশিল্পী হুমায়ুন কাদির সম্পাদিত 'পাক জমহুরিয়াত' ও সুশোভন আনোয়ার আলী সম্পাদিত 'পাকিস্তানী খবর' পত্রিকায়। ঐ পত্রিকাগুলোকে হাতে রাখার জন্য ঐসব পত্রিকার সাহিত্য-সম্পাদকদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলতে হতো। তাঁদের মেজাজের ওপর চাপ রাখতে হতো। দিনে ঐ কাজটা আমি সারতাম। তারপর সন্ধ্যাবসানে ছুটতাম পরীবাগে পিপলের অফিসে। রাত আটটা থেকে দুটো পর্যন্ত চলত আমাদের নাইট শিফটের কাজ।

একাত্তরের একুশে ফেব্রুয়ারি পিপল পত্রিকা গ্রুপ থেকে 'গণবাংলা' নামে একটি বাংলা সাপ্তাহিক কাগজ প্রকাশিত হয়। ঐ পত্রিকার নির্বাহী সম্পাদক হিসেবে যোগদান করেন প্রখ্যাত সাংবাদিক জনাব আনোয়ার জাহিদ। তিনি ভাসানী ন্যাপের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। মওলানা ভাসানীর খুব ঘনিষ্ঠজন। জাহিদ ভাইয়ের কল্যাণে গণবাংলায় আমার কবিবন্ধু আবুল হাসানও কাজ পায়। জাহিদ ভাইও ছিলেন কবিতামোদী মানুষ। আমাদের পত্রিকার সম্পাদক-প্রকাশক জনাব আবিদুর রহমান ছিলেন একজন বেশ ভাল গীতিকার। উভয় বাংলার বেশকিছু শিল্পী তাঁর লেখা গান গেয়েছেন। পিপল হাউস থেকে বাংলা সাপ্তাহিক গণবাংলা প্রকাশিত হওয়ার ফলে আমার লেখা প্রকাশের একটা নিজস্ব জায়গা তৈরি হয়। একুশে ফেব্রুয়ারি উপলক্ষে গণবাংলা একটি চমৎকার বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করে। ঐ বিশেষ সংখ্যাটির জন্য আমি আর হুমায়ুন কবির দুজনে মিলে প্রখ্যাত নাট্যকার অধ্যাপক মুনীর চৌধুরীর একটি দীর্ঘ সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছিলাম। গণবাংলার একুশে সংখ্যার একটি পাতাজুড়ে আমাদের নেয়া সেই সাক্ষাৎকারটি প্রকাশিত হয়। মনে হয়, ওটিই ছিল শহীদ মুনীর চৌধুরীর শেষ সাক্ষাৎকার। গণবাংলা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পত্রিকার ঐ সংখ্যাটি আমি সংগ্রহ করতে পারিনি। পারলে মুনীর স্যারের শেষ সাক্ষাৎকারটি আমরা আবার পড়তে পারতাম। আমার নিজেরও মনে নেই তিনি আমাদের কোন প্রশ্নের উত্তরে কী বলেছিলেন। অল্পদিনের ব্যবধানে, পাক-বাহিনীর আত্মসমর্পণের দু'দিন আগে ১৪ ডিসেম্বর তিনি আল বদরের জল্লাদের হাতে নির্মমভাবে নিহত হন। দেশ শত্রুমুক্ত হওয়ার পর রায়েরবাজারের বধ্যভূমিতে আরও অনেকের সঙ্গে তাঁর ক্ষতবিক্ষত লাশ পাওয়া যায়। হায় কী করুণ!

মুনীর স্যারের কথা যখনই আমি ভাবি, আমার মনে পড়ে একটি সুখস্মৃতি। আমার প্রথম কবিতার বই 'প্রেমাংশুর রক্ত চাই' প্রকাশিত হয় ১৯৭০ সালের নভেম্বর মাসের শেষ দিকে। মুনীর চৌধুরী খুব চমৎকার কবিতা আবৃত্তি করতেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি মিলনায়তনে তিনি একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে শামসুর রাহমানের 'দুঃখ' কবিতাটি আবৃত্তি করেছিলেন। সেই সন্ধ্যায় মিলনায়তন ভর্তি শ্রোতার পিনপতন নীরবতার মধ্যে বসে আমি তাঁর দরাজ কণ্ঠের আবৃত্তি শুনে মুগ্ধ হই। শামসুর রাহমানের দুঃখ কবিতাটি যে এতটাই ভাল, তা আমি মুনীর চৌধুরীর আবৃত্তি শুনে নিশ্চিত হই। মনে মনে ভাবি, আহা তিনি কি কখনও কোনোদিন আমার কোনো কবিতা আবৃত্তি করবেন? আমি কি তাঁর আবৃত্তিযোগ্য কোনো কবিতা কখনও লিখতে পারব?

বেশিদিন অপেক্ষা করতে হয়নি। একদিন বিকেলে নিউ মার্কেটের নওরোজ কিতাবিস্তানে গেলে ঐ দোকানের মালিক কাদির খান সাহেব আমাকে সহাস্যবদনে জানান যে, মুনীর চৌধুরী আমার কবিতার বইটির একটি কপি খুব আগ্রহসহকারে কিনে নিয়ে গেছেন। আমি দাম ছাড়াই আপনার বইটি তাঁকে দিতে চেয়েছিলাম কিন্তু তিনি রাজি হননি। বলেছেন, না আমি ওর বইটি কিনব বলেই এসেছি। শুনে আমি আনন্দে লাফিয়ে উঠি। সবাই জানে, মুনীর চৌধুরী যার কবিতার বই গাঁটের পয়সা খরচ করে কেনেন, সে কবি না হয়ে পারে না! কবি হিসেবে আমার কনফিডেন্স বেড়ে যায়। আমি মনিকোতে আমার বন্ধুদের চা পানে আপ্যায়িত করি। পরে কেন করেছি, তা বলি রসিয়ে রসিয়ে।

সেই থেকে দু'দিনও যায়নি, বন্ধুদের সঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরির সামনে বসে আছি। বিকেলের দিকে মুনীর স্যার তাঁর টয়োটা গাড়িটিতে চড়ে লাইব্রেরিতে আসেন। গাড়ি থেকে নেমে, গাড়ি লক করতে করতে তিনি আমাদের দিকে দূর থেকে তাকান। আমার বুক কেঁপে ওঠে, ভাবি তিনি আমাকে ডেকে খারাপ কবিতা লেখার জন্য সুন্দরী মেয়েদের সামনে বকঝকা করবেন না তো? তাঁর সঙ্গে গাড়ি থেকে নেমেছেন তাঁর বোন। উনি ইংরেজি বিভাগে পড়েন। বেশ সুন্দরী। তখন সত্যি সত্যিই তিনি আমাকে নাম ধরে ডাকেন। আমি দুরুদুরু বুকে তাঁর দিকে এগিয়ে যাই। তখন মুনীর স্যার আমাকে অবাক করে দিয়ে জানান যে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার কবিতার বইটি তিনি নওরোজ থেকে সংগ্রহ করে পড়েছেন। আমি আমার স্বপ্নপূরণের লজ্জায় মাথা নত করে থাকি। তিনি তখন আমাকে আরও অবাক করে দিয়ে জানান যে, আমার 'লজ্জা' কবিতাটি একটি অত্যন্ত ভাল কবিতা হয়েছে। তিনি বলেন, আমি তোমার লজ্জা কবিতাটি আমার বাসার সবাইকে আবৃত্তি করে শুনিয়েছি। তাঁর সুন্দরী ভগিনীটি, যিনি আমার দিকে আগে কোনোদিন ফিরেও তাকাননি, সলজ্জ হাসিতে তিনি স্যারের কথা সমর্থন করেন। স্যার জানান যে সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাসে ভেসে যাওয়া মৃতা-নগ্নিকার মর্মস্পর্শী বর্ণনা পাঠ করে তাঁর চোখ অশ্রুসজল হয়েছে। তিনি জানান যে আমার কবিতা নিয়ে তিনি সহসাই লিখবেন। আমি প্রশংসার লজ্জায় তাঁর সামনে আর দাঁড়াতে পারছিলাম না। স্যারও সেটা বুঝলেন। বললেন, ঠিক আছে যাও। পরে দেখা হবে। আমার বাসায় এসো।

কিছুদিনের মধ্যেই গণবাংলার একুশে সংখ্যার জন্য আমি আর আমার কবিবন্ধু হুমায়ুন কবির তাঁর বাসায় যাই এবং তাঁর একটি দীর্ঘ সাক্ষাৎকার গ্রহণ করি। ভেবে আশ্চর্য হই যে, মাত্র দশ মাসের ব্যবধানে আমার 'লজ্জা' কবিতায় বর্ণিত সন্তানসম্ভবা নগ্নিকার মতোই মুনীর স্যারের মৃতদেহও আবিষ্কৃত হয় রায়েরবাজারের বধ্যভূমিতে। তিনি কি তাঁর চোখে জল আনার মতো ভাল লাগা আমার ঐ 'লজ্জা' কবিতাটির মধ্যে তাঁর নিজ জীবনের সমকরুণ মৃত্যুর প্রচ্ছায়া প্রত্যক্ষ করেছিলেন?

আনোয়ার জাহিদ ভাই গভীর রাতে প্রায়ই আমাদের নিয়ে যেতেন রাস্তার ওপারে অবস্থিত হোটেল ইন্টার কন্টিনেন্টালে, যার বর্তমান নাম হোটেল শেরাটন। ঐ হোটেলে সবকিছুরই দাম ছিল আকাশ ছোঁয়া। আমরা সেখানে কিছু খাওয়ার কথা ভাবতেই পারতাম না। জাহিদ ভাই সেখানে আমাদের কফি খাওয়াতেন। হোটেলের কর্মচারীরা জাহিদ ভাইকে খুব সম্মান করত। তাঁর সঙ্গে যেতাম বলে ক্রমশ আমরাও সেই সম্মানের ভাগ পেতে শুরু করি। তখন ওটাই ছিল ঢাকার একমাত্র পাঁচ তারা হোটেল। প্যান প্যাসিফিক সোনারগাঁও হোটেলটি তখনও হয়নি। ইন্টারকনের ক্যাফেতে বসে কফি খেতে খেতে আমরা সাংবাদিকতা, কবিতা ও রাজনীতি নিয়ে উত্তপ্ত আলাপ-আলোচনা করতাম। আমার চেয়ে আবুল হাসানের সঙ্গেই জাহিদ ভাইয়ের চিন্তা-ভাবনার মিল ছিল বেশি। আমি ছিলাম বঙ্গবন্ধুর অন্ধ-ভক্ত। জাহিদ ভাইয়ের প্রিয় নেতা ছিলেন ভাসানী, আবুল হাসানেরও কিছুটা। জাহিদ ভাইয়ের স্ত্রী কামরুন নাহার লাইলী ছিলেন পূর্ব পাকিস্তানের প্রথম মহিলা এডভোকেট। স্মার্ট, সুন্দরী ও বিদুষী। মনে পড়ে, জাহিদ ভাইয়ের পুরানা পল্টনের বাসায় আমরা তাঁর হাতের চা খেয়েছি। তিনি আজ নেই। অল্পবয়সে মারা গেছেন।

একাত্তরের মার্চে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আলোচনা করার জন্য পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খান যখন ঢাকায় আসেন, তখন সদলবলে জুলফিকার আলী ভুট্টো এসে এই হোটেল ইন্টারকনে ওঠেন। ২৩ মার্চ আমি আর আমার কবিবন্ধু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হুমায়ুন কবির যে ভুট্টোর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে 'জয় বাংলা' স্লোগান দিয়ে ব্যাটাকে কিছুটা হলেও ভয় পাইয়ে দিতে পেরেছিলাম, তার পেছনে জাহিদ ভাইয়ের পরোক্ষ ভূমিকা কার্যকর ছিল। তাঁর কারণেই ঐ হোটেলের কর্মচারীরা আমাকে চিনত এবং ২৩ মার্চের দুপুরে আমাদের দুজনকে ঐ হোটেলে প্রবেশ করতে দিয়েছিল।

এক নয় সাত এক সালের মার্চ মাসে প্রায় রাতেই ঢাকায় কার্ফু বলবৎ থাকত। কার্ফুর ভিতরে নগরীতে চলাচলের সুবিধার জন্য তখন পত্রিকা অফিস থেকে আমাদের প্রত্যেককে পরিচয়পত্র দেয়া হয়, যা কার্ফু পাস হিসেবে বিবেচিত হতো। পাক-আর্মির ভাষায় ঐ কার্ফু-পাসের নাম ছিল 'ডান্ডি কার্ড'। আমার নিজের হাতে বিশেষ যত্নসহকারে তৈরি করা ডান্ডি কার্ডটি ছিল একটু অন্যরকম। মার্কার পেনের লাল কালি দিয়ে আমি আমার পরিচয়পত্রটির ওপর একটি মোটা ক্রসচিহ্ন আঁকি এবং বড় বড় কালো হরফে লিখি নিজের নাম। প্রথমে লিখি আমার পদবী, পরে নাম। অর্থাৎ গুণ নির্মলেন্দু। গুণ বানানটা আমি ইংরেজিতে লিখি GUN। এমনিতে আমি গুণের বানান লিখি goon; কিন্তু পাক-আর্মির সঙ্গে শয়তানি করার উদ্দেশ্যে আমি আমার পদবীর ইংরেজি বানানটা পাল্টে দেই। আমার নামের ভিতরে যে একটি আগ্নেয়াস্ত্র লুকিয়ে রয়েছে, সেটা ঐরূপ বানানে সাড়ম্বরে প্রকাশিত হয়। নগরীতে টহলরত পাক-সেনাদের ডান্ডি কার্ড দেখিয়ে কিছুটা ভড়কে দেয়াই আমার উদ্দেশ্য। বিশ্বখ্যাত পেশাদার পাক-আর্মির সঙ্গে মস্করা করার ফল যে ভয়াবহ হতে পারে, তা তখন আমি ভাবিনি।

সঠিক তারিখটা মনে পড়ছে না। মনে হয় ২৫ মার্চের কাছাকাছি কোনো দিনই হবে। রাতের ডিউটি সেরে আমরা পত্রিকা অফিসের গাড়িতে করে যার যার আস্তানায় ফিরছি। আমাকে আজিমপুর কবরস্থানের পশ্চিম পাশে নিউপল্টনে নামিয়ে দিয়ে জাহিদ ভাই যাবেন পুরানা পল্টন। আমাদের গাড়িতে সেই রাতে আর কে কে ছিলেন ঠিক মনে পড়ছে না।

আমাদের গাড়িটি যখন নিউ মার্কেটের উত্তর দিকের চার পথের মোড়ে পৌঁছেছে, তখন উদ্ধত অটোমেটিক রাইফেল উঁচিয়ে একদল পাকসেনা আমাদের গাড়ি থামিয়ে আমাদের কাছে এগিয়ে এল। নিয়ম হলো না চাইতেই মিলিটারিদের দিকে যার যার ডান্ডি কার্ডটি বাড়িয়ে ধরা। আমরাও তাই করলাম। সবার ডান্ডি কার্ড দ্রুত ফিরিয়ে দিয়ে আমারটি নিয়ে সৈনিকটি চলে গেল একটু দূরে পেট্রোল পাম্পের সামনে দাঁড়ানো জিপে বসে থাকা তার অফিসারের কাছে। আমার বুক একটু কেঁপে উঠল। বুঝলাম বিপদ আসছে। জাহিদ ভাই বললেন, খাইছে। এইবার ঠেলা সামলাও। সৈনিকটি তাঁর অফিসারকে নিয়ে দ্রুত ফিরে এল আমাদের গাড়ির কাছে। অফিসারটি আমাদের গাড়ির কাছে এসেই দরজায় মারল একটা লাথি। বলল, বাহার নিকলাও সব। গাড়ি সার্চ করে গা। আপকা সাথ গান হায়?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমরা গাড়ি থেকে দ্রুত নেমে গিয়ে বিনীত ভঙ্গিতে বাইরে দাঁড়ালাম। সৈনিকরা টর্চ লাইটের আলো ফেলে আমাদের গাড়িটার ভিতরে তন্নতন্ন করে খুঁজল। তারপর কিছু না পেয়ে আমার কাছে এসে বলল, আপকা গান কিধার রাক্‌খা? আমি প্রাণভয়ে কোনোমতে ভাঙা ভাঙা উর্দুতে বললাম, মেরা সাথ কুই গান ফান নেহি ভাইয়া, গান মেরা ফেমিলি টাইটেল হ্যায়। ক্ষুদ্রবুদ্ধির ঐ অফিসারটি তখন আমার চোখে টর্চের আলো ফেলে আমার ছবির সঙ্গে আমাকে মিলিয়ে নিয়ে বলল, তুম জার্নালিস্ট হো? আমি সম্মতিসূচক মাথা নাড়িয়ে বললাম, জ্বি স্যার। অফিসারটি তখনও আমাকে ছাড়ছে না দেখে, আমার পরিত্রাণার্থে জাহিদ ভাই গাড়ি থেকে নেমে অফিসারটির কাছে এগিয়ে এলেন। আমি বললাম, স্যার, হি ইজ মাই বস। জাহিদ ভাই ভাল উর্দু বলতে পারতেন। তিনি বিষয়টা বুঝিয়ে বললেন। বললেন এই মুলুকে এ রকম খতরা টাইটেলও হয়। দিস ইজ নট এ গান লাইসেন্স। তাঁর কথায় কাজ হলো। সৈনিকটি আমার হাতে আমার ডান্ডি কার্ডটি ফিরিয়ে দিয়ে, আমাদের গাড়িতে ঢুকিয়ে, গাড়ির দরোজাটি পা দিয়ে সজোরে বন্ধ করতে করতে বলল— ওকে, গো। ভাগো হিয়াসে।

আমাকে আমার বাসার কাছে নামিয়ে দিয়ে জাহিদ ভাই বললেন, কালকেই আপনার গান লাইসেন্সটি ফেলে দিয়ে নতুন একটা ডান্ডি কার্ড তৈরি করে নেবেন।

আমি বললাম, আর বলতে হবে না জাহিদ ভাই। আমি কালকেই...

পুনশ্চ গণবাংলা : দুটি কঙ্কাল ও একটি চুড়িপরা হাত

বছরের শুরু থেকে নয়, সাপ্তাহিক গণবাংলা পত্রিকাটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৭১ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি। বড় কলেবরের ঐ বিশেষ সংখ্যাটিতেই আমার ও কবি হুমায়ুন কবিরের নেয়া শহীদ মুনীর চৌধুরীর শেষ-সাক্ষাৎকারটি প্রকাশিত হয়েছিল। ঐ সংখ্যায় আমার কবিতা ছিল কি না, মনে পড়ছে না। পঁয়ত্রিশ বছর পর, আমি গণবাংলা পত্রিকাটির সন্ধানে প্রথমে গণবাংলার নির্বাহী সম্পাদক জনাব আনোয়ার জাহিদ ও পরে তাঁর কাছ থেকে পাওয়া ফোন নম্বর নিয়ে পত্রিকার মালিক-সম্পাদক-সাহিত্যিক জনাব আবিদুর রহমানের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করি। দীর্ঘ বিরতির পর আবিদ ভাইয়ের সঙ্গে নতুন করে যুক্ত হতে পেরে আমার খুব ভাল লাগে। আমি যখন একাত্তরের স্মৃতিসমুদ্রে হাতড়ে বেড়াচ্ছি, তখন আবিদ ভাইয়ের সন্ধান পেয়ে মনে হলো আমার সামনে দিয়ে একটা গাছের ডাল ভেসে যাচ্ছে। আমেরিকা আবিষ্কারের দীর্ঘ সমুদ্রপথে কলম্বাসের ক্ষেত্রে যেমনটি ঘটেছিল। আমার কাছে আবিদ ভাই হচ্ছেন সমুদ্রতীরের বাতিঘরের মতো। আমি সেই ডাল আঁকড়ে ধরলাম। কিন্তু যতটা আশা করেছিলাম, তার পুরোটা পূর্ণ হলো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না। জানলাম, তাঁর কাছে গণবাংলা পত্রিকার কোনো কপি নেই। তবে পত্রিকার কোনো কপি না থাকলেও দেখলাম বয়সে আমার চেয়ে বেশ বড় হলেও তাঁর স্মৃতি এখনও খুব প্রখর। তিনি তাঁর অতিক্রান্ত জীবন নিয়ে আগেও লিখেছেন, এখনও লিখে চলেছেন। তাঁর লেখা গান যে গেয়েছেন হেমন্ত আর লতার মতো বিখ্যাত শিল্পীরা সে কথা পূর্বে বলেছি। বাংলার চেয়ে ইংরেজি ভাষাতেই তিনি বেশি লিখেছেন। তাঁর ইংরেজি কবিতা অতি উচ্চমানের। তাঁর সঙ্গে কথা বলে আমি আমার বর্তমান রচনাকর্মে প্রভূত সাহায্য পেয়েছি।

গণবাংলার সন্ধানে বাংলা একাডেমী লাইব্রেরী, পাবলিক লাইব্রেরী ও ইত্তেফাক পত্রিকার সংগ্রহশালায় অনুসন্ধান চালিয়ে আমি ব্যর্থ হয়েছি। কোথাও পত্রিকাটি নেই। বাকি আছে ন্যাশনাল আর্কাইভ। যদি সেখানে গণবাংলার হদিস পাওয়া যায়, তবে পরবর্তী অধ্যায়ে মুনীর চৌধুরীর সেই সাক্ষাৎকারটি লিপিবদ্ধ করার বাসনা থাকল। গণবাংলা পত্রিকাটি আমি সন্ধান করছিলাম আরও একটি কারণে। ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণের পর গণবাংলা সন্ধ্যায় একটি টেলিগ্রাম প্রকাশ করেছিল। ঐ বিশেষ টেলিগ্রাম-সংখ্যাটিতে আমার তাৎক্ষণিকভাবে লেখা একটি কবিতা ছাপা হয়। আমি কী লিখেছিলাম ঐ কবিতাটিতে, আমার একটুও মনে পড়ছে না। একটি বর্ণও না। একাত্তর নিয়ে আত্মকথা লিখতে বসে আমার কবিতাটির কথা হঠাৎ মনে পড়ল। মনে পড়ল সাংবাদিকদের জন্য সংরক্ষিত আসনে বসে আমি বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ শুনেছিলাম। সেদিনের ঐ তিল ঠাঁই নাই মাঠে, মঞ্চের কাছাকাছি সাংবাদিকদের জন্য সংরক্ষিত আসনে আমার মতো তরুণ কবি ও নবিস সাংবাদিকের বসবার কথা নয়। জাহিদ ভাইয়ের কল্যাণে আমি সেই সুযোগ পাই। তিনি আমাকে সঙ্গে নিয়ে রেসকোর্সে যান এবং বঙ্গবন্ধুর ভাষণের ওপর রিপোর্ট তৈরি করতে বলেন। পূর্বেই স্থির হয়েছিল যে, আমরা বঙ্গবন্ধুর ভাষণের ওপর একটি টেলিগ্রাম সংখ্যা প্রকাশ করব। বঙ্গবন্ধু রেসকোর্সের ভাষণ-মঞ্চে আসতে বেশ দেরি করছিলেন। লক্ষ লক্ষ ব্যাকুল বিদ্রোহী শ্রোতা অধীর আগ্রহে তাকিয়েছিল তাঁর সম্ভাব্য আগমন পথের দিকে। ঐ বিলম্বের ফাঁকে আনোয়ার জাহিদ ছাত্রনেতা আসম রবকে কাছে ডাকেন।

'কী রব সাহেব, আপনার নেতা কি আজ স্বাধীনতা ঘোষণা করবেন?'

জাহিদ ভাইয়ের সূক্ষ্ম উস্কানির ফাঁদে পা দিয়ে বঙ্গবন্ধুর মতো পাজামা-পাঞ্জাবি পরা রব হাসতে হাসতে বললেন, 'তিনি যদি আজ স্বাধীনতা ঘোষণা না দেন, তবে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে আমরা আজই স্বাধীনতা ঘোষণা করব।'

রবের কথা শুনে বিদ্রূপের হাসি হেসে আনোয়ার জাহিদ বললেন, 'হুম, নেতা আসলে আপনেরা তো ভিজা বিড়াল হইয়া যাবেন। দেখব।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জাহিদ-রব সংলাপ চলার মধ্যে বঙ্গবন্ধু রেসকোর্স মাঠে প্রবেশ করলেন। রব দৌড়ে চলে গেলেন মঞ্চের দিকে। আমরা কাগজকলম নিয়ে আমাদের যার যার আসনে বসলাম। রেসকোর্সে সমবেত লক্ষ জনতার উদ্দেশ্যে নেতার ভাষণ শুরু হলো। আমি মন্ত্রমুগ্ধের মতো বসে তাঁর ভাষণ শুনলাম। অপূর্ব। এমন হৃদয়কাড়া যাদুকরী ভাষণ আমি আগে কখনও শুনিনি। ইহজনমে আবার কখনও শুনব বলেও মনে হয় না। পাঁচ লক্ষাধিক মানুষ পিনপতন নীরবতার মধ্যে তাঁদের প্রিয় নেতার ভাষণ শুনছে। আর গগনবিদারী শ্লোগান তুলছে– 'বীর বাঙালি অস্ত্র ধরো, বাংলাদেশ স্বাধীন করো।' 'জয়য়য়য়য় বাংলা'। 'জয়য়য়য়য় বঙ্গবন্ধু।' আমাকে প্রচণ্ড ঘোরের ভিতরে নিক্ষেপ করে তিনি তাঁর ভাষণ শেষ করলেন এই বলে– 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। জয় বাংলা।'

অফিসে ফিরে গিয়ে তাঁর ভাষণের সেই অন্তিম চরণ দুটিকে হেড লাইন করে আমি আমার রিপোর্ট তৈরি করলাম। আমার রিপোর্ট পড়ে জাহিদ ভাই হাসলেন। বললেন, কবি আপনি কি লক্ষ্য করেননি যে শেখ সাহেব চারটি শর্ত দিয়েছেন? বললাম, কোথায়? কখন? তখন জাহিদ ভাই বললেন– যান, আপনি বরং একটি কবিতা লেখেন টেলিগ্রামের জন্য। আমি রিপোর্ট লিখছি।

তখন আমি রিপোর্ট লেখা বাদ দিয়ে বসে গেলাম কবিতা লিখতে। আমি সেই কবিতাটির কথাই বলছি। কী ছিল সেই কবিতায়? আমার কিছুই মনে পড়ছে না। ৭ মার্চ সন্ধ্যায় প্রকাশিত গণবাংলা পত্রিকার ঐ টেলিগ্রাম সংখ্যাটি কি কারও সংগ্রহে আছে?

আবিদ ভাইও আমার ঐ কবিতাটির কথা স্মরণ করতে পারলেন না। তবে তাঁর কাছ থেকে একটি মর্মস্পর্শী তথ্য জানা হলো। তিনি বললেন, ২৫ মার্চের রাতে পিপল ও গণবাংলা অফিসটি ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দেবার পর তিনি আর সেখানে যাননি। রাত সাড়ে এগারোটা পর্যন্ত তিনি সেই রাতে পিপল অফিসে ছিলেন। তারপর গ্রেফতার হতে পারেন এমন ভয়ে তিনি বাসায় ফিরে যান। রাত বারোটার দিকে পিপলের সাংবাদিক আবু তাহের তাঁকে ফোন করে জানায় যে, পিপল পত্রিকার দিকে পাক বাহিনীর একটি ট্যাঙ্কবহর এগিয়ে আসছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই পিপল পত্রিকার অফিসটি আক্রান্ত হয়। অফিসের টিন শেডগুলোতে গান পাউডার ছিটিয়ে আগুন ধরিয়ে দেয়া হয় এবং ঐ কালরাতে পিপল ও গণবাংলার চার-পাঁচজন কর্মচারী পাকসেনাদের নির্বিচার গুলিবর্ষণ ও শেলের আঘাতে নিহত হয়। কেউ কেউ ঘরের ভিতরে জীবন্ত দগ্ধ হয়ে মারা যায়। তিনি তাঁর বাসায় বসে পুবাকাশে তাকিয়ে দীর্ঘসময় ধরে আগুনের শিখা জ্বলতে দেখেন, কিন্তু তিনি তখনও বুঝতে পারেননি যে ঐ আগুনের লেলিহান শিখার উৎস ছিল তাঁরই প্রিয় পত্রিকা পিপল ও গণবাংলার অফিস। ঐ অফিসে সেই রাতে যারা মারা গিয়েছিলেন, তাদের কারও কারও মরদেহ কিছুদিন পর তাদের পরিজনরা নিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যান। দুটো মৃতদেহ অফিসেই পড়ে ছিল। মৃতদেহগুলো সেখানে পড়ে থাকতে থাকতে ক্রমশ পচে গলে শুকিয়ে শেষে নরকংকালে পরিণত হয়। ১৬ ডিসেম্বর পাকসেনাদের আত্মসমর্পণের পর, ১৯৭১ সালের ২২ ডিসেম্বর আবিদ ভাই কলকাতা থেকে ঢাকায় ফিরে আসেন এবং পিপল অফিসে তিনি যে ঘরটিতে বসতেন সেখানে প্রবেশ করে ঐ দুটো কংকাল দেখতে পান। তাঁর মতে, ঐ দুটো কংকাল ছিল তাঁর পিয়ন ফজলু ও তাঁর পাচক এষার।

২৭ মার্চ ২ ঘণ্টার জন্য কার্ফু তুলে নিলে আমি ২৫ মার্চের রাতে আমার প্রাণ-বাঁচানো বন্ধু নজরুল ইসলাম শাহ ও ২৭ মার্চে ইকবাল হল (সার্জেন্ট জহুরুল হক হল) থেকে উদ্ধারকৃত তরুণ কবি হেলাল হাফিজকে নিয়ে পিপল অফিসের দিকে রওয়ানা দিয়েছিলাম বটে, কিন্তু অফিস পর্যন্ত যেতে পারিনি। আর্ট ইনস্টিটিউটের কাছে দেখা হয় আমাদের পত্রিকা অফিসের একজন পিয়নের সঙ্গে। কর্মচারীটি ঐ রাতে পাক হায়েনাদের বর্বর আক্রমণ থেকে কোনোক্রমে প্রাণে বেঁচে গিয়েছিল। তার কাছেই আমি আমাদের পত্রিকার বেশ ক'জনের করুণ মৃত্যুর খবর জানতে পারি। তাদের সবাই ছিল পিয়ন ও প্রেসের কর্মচারী। সাংবাদিক বা কর্মকর্তারা সেই রাতে কেউ অফিসে যাননি বা গেলেও অফিসে থাকেননি। আমি আমার বন্ধু নজরুলের দিকে তাকাই। নজরুলই ২৫ মার্চের রাতে আমাকে জোর করে অফিসের পথ থেকে ফিরিয়ে নিয়ে এসেছিল। বলেছিল আমি জানি, তোদের পত্রিকাটি আর্মির প্রথম টার্গেট হবে। শেরাটন হোটেলে ওর কিছু বন্ধুবান্ধব ছিল, তাদের কাছেই সে এই তথ্য জেনেছে। শেরাটন হোটেলে ভুট্টোর পাহারায় নিয়োজিত পাক-আর্মিরা পিপল পত্রিকা পড়ত আর তাদের পবিত্র উর্দু ভাষায় আমাদের গালাগাল করত। ২৫ মার্চ দুপুরে লাঞ্চ করতে শেরাটনে ফিরে আসা ভুট্টোর সামনে দাঁড়িয়ে আমি ও আমার বন্ধু কবি হুমায়ুন কবির জয় বাংলা স্লোগান দিয়েছিলাম, ঐ ঘটনাটিও পাক-আর্মির মনে প্রচণ্ড ক্রোধের সৃষ্টি করেছিল। দু'দিনের মধ্যেই ভুট্টোর চোখের সামনে, পিপল পত্রিকার অফিস আক্রমণের ভিতর দিয়েই অপারেশন সার্চলাইট তার শুভ-মহরত সম্পন্ন করে।

সন্ধ্যার দিকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের সঙ্গে আলোচনা-আলোচনা খেলা ভঙ্গ হয়ে যাওয়ার কোনো আনুষ্ঠানিক ঘোষণা না দিয়েই পাক-প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খান একটি বিশেষ বিমানে করে করাচীর উদ্দেশে তাঁর জীবনের শেষবারের মতো ঢাকা ত্যাগ করেন। ইয়াহিয়া খান ইচ্ছা করলে ভুট্টোকেও সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পারতেন। তাতে পাকিস্তানের তেল খরচ কিছুটা হলেও বাঁচত। কিন্তু তিনি ভুট্টোকে নিয়ে যাননি। কেন নিয়ে যাননি?

'ইয়াহিয়াকাল' পালাকাব্যে আমি সেই রাতের বর্ণনা দিয়েছি এভাবে—

'২৫ মার্চের রাতে ভুট্টো কোথায় ছিলেন ভাইজান?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'২৫ মার্চের গণহত্যার ঐ কালরাতে
ইয়াহিয়া বিদায় নিয়া চইল্যা গেলেও,
নিজের চোখে গণহত্যা দেখার জন্য
ভুট্টো থাইক্যা গেছিলেন ঢাকাতেই।
সবসময় তো আর গণহত্যা দেখার
এইরকম সুযোগ আসে না!'

(ইয়াহিয়াকাল)

সেই বিবেচনা থেকে বলা যায়, পাক প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খান কর্তৃক অনুমোদিত, জেনারেল টিক্কা খানের নেতৃত্বে পরিচালিত ও পাক-সেনাবাহিনী কর্তৃক অভিনীত 'অপারেশন সার্চলাইট' নামক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানটির সম্মানিত প্রধান অতিথি ছিলেন পিপিপি নেতা, লারকানার নবাব, চরমপত্রখ্যাত এমআর আখতার মুকুল ভাইয়ের ভাষায় শাহনওয়াজ ভুট্টোর 'ডাউটফুল পোলা' জুলফিকার আলী ভুট্টো। তিনি রাত জেগে, শেরাটন হোটেলের ভারী পর্দা সরিয়ে, দূরবীন নিয়ে, আরাম কেদারায় বসে, ইয়াহিয়া খানের রেখে যাওয়া 'ব্ল্যাক ডগের লেফ্‌টওভার অন রকস' পান করতে করতে ঢাকার বুকে লেলিয়ে দেয়া তার পেয়ারে পাক-সেনাদের উলঙ্গ-উন্মাদ-উদ্বাহু নৃত্য প্রাণভরে প্রত্যক্ষ করেন। অনেকটা ফ্রন্ট স্টলে বসে নাটক দেখার মতো। জেনারেল ইয়াহিয়া খানের মতো জেনারেল ভুট্টোও ২৫ মার্চের সেই কালরাতে বুঝতে পারেননি যে, ওটাই ছিল অখণ্ড পাকিস্তানের শেষ-রজনী। আখতার মুকুল ভাইয়ের ভাষায় 'পাকিস্তানের খতম তারাবি'।

আমাদের পত্রিকা অফিসটি শেরাটন হোটেলের নিকটবর্তী ছিল বলে ২৫ মার্চ রাতের বর্বর হত্যাযজ্ঞ চালানোর পরও বর্বর পাকসেনারা বিশেষ নজর রেখেছিল তাদের পিতৃপুরুষের ঐ ভিটেবাড়িটির ওপর। তারা লক্ষ্য রাখছিল, ২৭ মার্চ পত্রিকা অফিসে কারা প্রবেশ করে তা দেখতে। তারা চাইছিল, যারা নিহত হয়েছে তাদের আত্মীয় পরিজনরা আসুক। তাদের প্রিয়জনের মৃতদেহ নিয়ে যাবার চেষ্টা করুক। প্রিয়জনরা মৃতের জন্য কাঁদুক। তাহলে পাকিস্তানের অনিষ্টকামী আরও কিছু চুতিয়া-বাঙালিকে পরমানন্দে নিধন করার সুযোগ পাওয়া যাবে।

নাম ভুলে যাওয়া পিপল পত্রিকার ঐ পিয়নের কথা শুনে, ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও আমরা আর পিপল পত্রিকা অফিসের দিকে এগোতে সাহস করিনি। রোকেয়া হলের সামনে দিয়ে, নীলক্ষেত-নিউমার্কেট হয়ে আমরা নিউপল্টনে আমার মেসে ফিরে আসি।

আসার পথে ত্রিপল দিয়ে ঢাকা বাঙালি নারী-পুরুষের লাশ বহনকারী একাধিক মিলিটারি ট্রাক আমাদের চোখে পড়ে। ঐ ট্রাকগুলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসির ভিতর থেকে বেরিয়ে ময়মনসিংহ সড়ক ধরে সম্ভবত ক্যান্টনমেন্টের দিকে যাচ্ছিল। মনে হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও তৎসংলগ্ন এলাকার নিহত নারী-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পুরুষের বহু লাশ জড়ো করা হয়েছিল টিএসসির ভিতরে। ২৭ মার্চ সেই লাশগুলো পাচার করা হচ্ছিল দূরে কোথাও গণকবর দেবার জন্য। জগন্নাথ হলের ভিতরে একটি গণকবর থাকার পরও কিছু লাশকে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা থেকে দূরে কবর দেবার চিন্তাটা পাকসেনাদের মাথায় হয়তো এসেছিল এইরূপ বিবেচনা থেকে, যেন কোনো একটি গণকবরে খুব বেশিসংখ্যক লাশের সন্ধান কখনও পাওয়া না যায়।

সেদিন মিলিটারি ট্রাক ঢেকে দেয়া ভারী ত্রিপলের ফাঁক গলিয়ে বেরিয়ে আসা লাল চুড়িপরা একটি ফর্সা হাত আমি দেখেছিলাম। সেই দৃশ্যটি আজও আমার চোখে ভাসে। আমার স্মৃতিশক্তি ভাল নয়, কত কিছু আমি ভুলে যাই। ভুলে গেছি। কিন্তু আমার মর্মের গভীরে গেঁথে যাওয়া সেই হাতটিকে চোখ বুজলেই আমি আজও স্পষ্ট দেখতে পাই। মনে হয়, নিকটবর্তী রোকেয়া বা শামসুন্নাহার হলের কোনো অসহায় ছাত্রীর ডান হাত ছিল সেটি।

জগন্নাথ হল : ২৭ মার্চ ১৯৭১

মাত্র কয়েক ঘন্টার জন্য কার্ফ্যু তুলে নেয়া হলো।
দেড় দিন, দেড় রাত্রি গৃহবন্দী থেকে আমরা দু'জন
নগরীর রূপ দেখতে বাইরে বেরুলাম।
আজিমপুরের মোড়ে বেয়নেটবিদ্ধ এক তরুণের লাশ
স্বাগত জানালো আমাদের। তারপর বৃদ্ধ একজন।
অগ্নিদগ্ধ, মর্টারবিধ্বস্ত এই প্রাচ্য নগরীকে
মনে হলো প্রাণস্পন্দনহীন এক মৃত প্রেতপুরী।

অপসৃত অদম্য প্রাণের গর্ব, ডানে-বাঁয়ে
সর্বত্র মৃত্যুর হাতছানি। যুবতী কন্যাকে নিয়ে
পালাচ্ছেন পিতা, মা'র কোলে দুগ্ধপোষ্য শিশু।
প্রিয়জনদের খোঁজে উদ্বিগ্ন মানুষ ছুটছে সতর্ক,
যেমন সন্ত্রাসবিদ্ধ বনের হরিণ
হিংস্র নেকড়ের তাড়া খেয়ে ছোটে।

কারো পুত্র, কারো বন্ধু, কারো পিতা, কারো ভাই হয়ে
পথে পথে শুয়ে আছে ছিন্নভিন্ন মানুষের লাশ।
নগরীতে কারা বেশি? যারা মরে গেছে, তারা?
নাকি মেশিনগানের গুলি থেকে বেঁচে গেছে যারা?
সাতাশে মার্চের ভোরে এ-প্রশ্নের মেলেনি উত্তর।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হত্যাক্লান্ত পাকসেনা বাঙালির রক্তে স্নান করে
সহাস্যে নগরপথে বেরিয়েছে প্রমোদ টহলে।
সাথে তাক করা নির্দয়, নিষ্ঠুর স্টেনগান।
জহুর হলের মাঠে শুয়ে আছে একদল সারিবদ্ধ যুবা,
যন্ত্রণাবিকৃত মুখ, তবু দেশমাতৃকার গর্বে অমলিন।

জগন্নাথ হলের চত্বরে সবুজ ঘাসের বুকে
আক্রোশে খামচে ধরা ট্যাংকের দাঁতের কামড়।
গোবিন্দ দেবের রক্তে ভাসমান লাল শিববাড়ি।
আহা, কী হৃদয় বিদারক! হায়, কী করুণ!

পুকুরে ভাসছে এক যুবকের লাশ, যেন মরা মাছ।
এ কি কবি আবুল কাসেম? তুমি কে গো ভাই?

জগন্নাথ হল আজও সেই দৃশ্যে স্থির হয়ে আছে।

আমরা যখন ২৭ মার্চ সকাল দশটার দিকে পাকসেনাদের বর্বর আক্রমণে ধ্বংসপ্রাপ্ত আমাদের প্রিয় নগরী ঢাকা-দর্শনে বেরোই, তখন আমাদের হাতে কোনো ক্যামেরা ছিল না। ক্যামেরা ছিল লন্ডনের ডেইলি টেলিগ্রাফ পত্রিকার দুঃসাহসী সাংবাদিক, পাকসেনাদের চোখ ফাঁকি দিয়ে শেরাটন হোটেল থেকে বেরিয়ে পড়া সায়মন ড্রিং-এর কাছে। সায়মন ড্রিং যখন মরহুম এএস মাহমুদের সঙ্গে মিলে ঢাকায় একুশে টিভি চালু করেন, তখন একদিন আমি তাঁর মুখ থেকেই ২৭ মার্চে দেখা ঢাকা নগরীর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার রোমহর্ষক বর্ণনা শুনেছি। রোমহর্ষক শব্দটি পাকসেনাদের 'অপারেশন সার্চলাইট' অভিযানের মাধ্যমে ঢাকা নগরীর বুকে সংঘটিত বর্বরতার ব্যাপকতা বোঝানোর জন্য যথেষ্ট পারঙ্গম নয়, জানি। কিন্তু কী আর করা যাবে? বাংলাভাষার শব্দের সীমাবদ্ধতা আমাদের মানতেই হবে। শুধু বাংলাভাষা নয়, পৃথিবীর সকল ভাষার জন্যই তা সত্য। মানুষের সুকৃতির একটা সীমা হয়তো আছে, কিন্তু মানুষের দুষ্কৃতি সীমাহীন। জন্মের অনন্য পথ, মৃত্যু শতভাবে। মানুষের সবচেয়ে বড় বন্ধু কে? এই প্রশ্নে আমাদের ভিন্ন মত থাকতে পারে, তবে তার সবচেয়ে বড় শত্রুটি যে মানুষ, তাতে কারও ভিন্ন মত নেই। রামায়ণ মহাভারত থেকে শুরু করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাম্প্রতিক ইরাক আগ্রাসন পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত বিশ্বের ইতিহাস থেকে বর্বরতার এমন বহু দৃষ্টান্ত আমরা স্মরণ করতে পারি। স্মরণ করা যেতে পারে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তির মুখে জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকি নগরীতে আমেরিকার পরমাণু বোমাবর্ষণের ঘটনাটি।

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রোমহর্ষক শব্দটি দিয়ে আমরা আমেরিকা কর্তৃক সাধিত ১৯৪৫ সালের ৬ ও ৯ আগস্টের পারমাণবিক-বর্বরতার ব্যাপকতাকে অতি সামান্যই বোঝাতে পারি। আমাদের জীবনে এক নয় সাত এক সালে উন্মাদপ্রায় পাকসেনাদের দ্বারা সাধিত বর্বরতাও ছিল সমগোত্রের। আমাদের ভাগ্য ভালো যে, তখনও পর্যন্ত পাকিস্তানের হাতে পরমাণু বোমা ছিল না। থাকলে আমি নিশ্চিত, সেই পরমাণু-বোমা ওরা বাঙালির ওপর বর্ষণ করত। পরমাণু বোমা ব্যবহারের পূর্ব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন পরাশক্তি আমেরিকা তো পাকিস্তানের পক্ষে ছিলই।

সায়মন ড্রিং ২৫ মার্চের রাতে শেরাটন হোটেলে ছিলেন। ভুট্টোর মতো সেই রাতে তিনিও নিজের চোখে দেখেছেন ঢাকার বুকে পরিচালিত পাক সেনাবাহিনীর ধ্বংসযজ্ঞ। দেখেছেন আগুনের লেলিহান শিখা। শুনেছেন পাকসেনাদের নিক্ষিপ্ত অগণিত গুলির গর্জন, আর নিরস্ত্র মানুষের মৃত্যুচিৎকার। আর্তের গোঙানি। ঢাকার সংবাদ সংগ্রহ করে ড্রিং ব্যাংকক চলে যেতে সক্ষম হন এবং সেখান থেকে তাঁর পত্রিকায় রিপোর্ট পাঠান। তাঁর প্রদত্ত রিপোর্টের মাধ্যমে তিনিই প্রথম বিশ্ববাসীকে জানান...

> 'In a despatch from Bankok, published in the Daily Telegraph on March 29, Mr Dring described Dacca as a crushed and frightened city after 24 hours of ruthless shelling by the Pakistan Army, saying that as many as 7000 people were dead and that large areas had been levelled.'

AMARBOI.COM

ধন্যবাদ সায়মন। আমার হাতে ক্যামেরা না থাকলেও, ক্যামেরা ছিল আমার চোখে। কবি বলে সেই ক্যামেরাটি কিছুটা সেনসেটিভ ছিল বলেই ধরে নিতে পারি। কে যেন আক্ষেপ করে বলেছিলেন (রবীন্দ্রনাথ, অমিয় চক্র বা সুনীতি চট্ট হবেন), লেখকদের বড় দুর্ভাগ্য হচ্ছে এই যে, আমরা আমাদের দুই চোখ দিয়ে যা দেখি, এক হাত দিয়ে তা লিখতে হয়। ইতিহাস বা ভ্রমণ সাহিত্য রচনা করতে বসে আমি ঐ মহাজনবাক্যের যথার্থতা উপলব্ধি করেছি। অনেক দৃশ্যকে আমি বন্দি করে নিয়েছিলাম আমার স্মৃতির মণিকোঠায়। তাই বেশকিছুকাল পরে আমি যখন উপরে উদ্ধৃত কবিতাটি রচনা করি, তখন সাতাশে মার্চে প্রত্যক্ষ করা ঢাকা নগরীর একটি ক্ষুদ্র এলাকার লোমহর্ষক চিত্র আমার স্মৃতিভাণ্ড থেকে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছিলাম। সায়মন ড্রিং আমার এই কবিতাটি খুব পছন্দ করেছিলেন এবং একুশে টিভির ২৫ মার্চের রাতে প্রচারিত একটি বিশেষ অনুষ্ঠানে ঐ কবিতাটি বহুবার প্রচার করেছিলেন।

আমার কবিতায় আমি যে এলাকার বর্ণনা দিয়েছি, ঐ এলাকার মধ্যে পড়ে আজিমপুর, জহুরুল হক হল ও জগন্নাথ হল। কবিতায় আছে, আমরা দুজন...। আমরা দুজন বলতে একজন ছিলাম আমি, দ্বিতীয়জন ছিল আমার বন্ধু নজরুল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইসলাম শাহ। পঁচিশের রাতে যে আমাকে গাওছিয়া মার্কেটের সামনের রাস্তা থেকে জোর করে ধরে আমার নিউ পল্টনের মেসে ফিরিয়ে নিয়ে এসেছিল। রাত নয়টার দিকে বঙ্গবন্ধুর বাড়ি থেকে বেরিয়ে তাজউদ্দীন সাহেবের স্ত্রী জোহরা তাজউদ্দীনের বড় ভাই ক্যাপ্টেন কিবরিয়া সাহেবের বাসায় কিছুক্ষণ কাটিয়ে, ঢাকা কলেজের সামনের চিটাগাং হোটেলে ভাত খেয়ে সর্বশেষ খবর জানবার জন্য আমি আমার পত্রিকা অফিসের দিকে যাচ্ছিলাম। আমার হাতে ঘড়ি না থাকলেও অনুমান করি, তখন রাত সাড়ে দশটার মতো হবে। পথে নজরুলের সঙ্গে আমার দেখা হয়। আমি নিশ্চিত যে, ঐ রাতে নজরুল আমাকে মাঝপথ থেকে ফিরিয়ে না আনলে, আমি আমার পত্রিকা অফিসে যেতাম এবং পাকসেনাদের আক্রমণে পত্রিকা অফিসের আরও অনেকের সঙ্গে আমারও নির্ঘাত অপঘাতে মরণ হতো।

ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার কথিত আসামী সার্জেন্ট জহুরুল হক সেনাবাহিনীর ক্রসফায়ারে নিহত হওয়ার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র রাজনীতির ক্যান্টনমেন্ট বলে বিবেচিত ইকবাল হলের নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় সার্জেন্ট জহুরুল হক হল। অপারেশন সার্চলাইট শুরুর কিছুক্ষণের মধ্যেই পাকসেনারা জহুর হলে প্রচণ্ড আক্রমণ চালায়। তারা ধারণা করেছিল জগন্নাথ হল ও জহুর হল থেকে সশস্ত্র প্রতিরোধ আসতে পারে। বঙ্গবন্ধুর ডাকে মার্চের অসহযোগ আন্দোলন চলাকালে ঐ দুই হলের মাঠে ছাত্রদের সামরিক ট্রেনিং দেয়া হতো। ফলে ঐ হল দুটিতে পাকসেনাদের আক্রমণের ভয়াবহতা ছিল প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশি। আমরা আমাদের নিউ পল্টনের মেসে বসে ঐ হলে পাকসেনাদের আক্রমণের খবর পাচ্ছিলাম। প্রচণ্ড শব্দে কেঁপে উঠছিল পুরো হল এলাকাটি। আমরা ঐসব রক্তমারি প্রাণ কাঁপানো শব্দের সঙ্গে পরিচিত ছিলাম না। হলের আগুনও আমরা দেখতে পাচ্ছিলাম। আমার অনুজপ্রতিম তরুণ কবি হেলাল হাফিজ তখন ঐ হলে থাকত। আমি, নজরুল আর আবুল হাসান বহুদিন হেলালের রুমে রাত্রি যাপন করেছি। আমরা হেলালের জন্য খুব চিন্তিত বোধ করি। হলে থাকলে তার পক্ষে মরণ এড়ানো কঠিন হওয়ারই কথা। হেলাল কি বেঁচে আছে? রাস্তায় টহলরত পাকসেনাদের যথাসম্ভব এড়িয়ে ২৭ মার্চ সকাল সাড়ে দশটার দিকে আমরা হেলালের সন্ধানে জহুর হলের ভিতরে প্রবেশ করি। অনেকেই প্রাণের ভয়ে সেখানে প্রবেশ করার সাহস পাচ্ছিল না। সামান্য কিছু লোক তখন সেখানে জড়ো হয়েছিল। আমরা এগিয়ে যাই। গিয়ে দেখি মাঠের একপাশে বেশ ক'টি মৃতদেহ সাজিয়ে রাখা হয়েছে। তাদের দেহ রক্তাক্ত। মুখ যন্ত্রণাবিকৃত ও আগুনে ঝলসানো। ভাল করে চেনা যায় না। দেখলাম মৃতদের মধ্যে আমাদের প্রত্যাশিত কবি হেলাল হাফিজ নেই কিন্তু আমাদের আরেক বন্ধু আছে, তার নামও হেলাল। সে ছিল ছাত্রলীগের সাহিত্য সম্পাদক চিশতি শাহ হেলালুর রহমান। চিশতিও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কবিতা লিখত। দুদিন আগেও কবিতা নিয়ে ওর সঙ্গে আমার কথা কাটাকাটি হয়েছিল শরীফের ক্যান্টিনে। আজ আমি ওর মৃতদেহের সামনে দাঁড়িয়ে। হলের সবুজ ঘাসের ওপর মোট বারোটি লাশ ছিল পাশাপাশি শায়িত। আমি গুনেছিলাম। অন্যদের মধ্যে হলের ছাত্র ছাড়াও ছিল হলের কিছু কর্মচারী। মনে পড়ছিল ১৯৬৯ সালের ২৪ জানুয়ারি আবদুল গনি রোডে পুলিশের গুলিতে নিহত কিশোর শহীদ মতিউরের কথা। মতিউরের নামাজে জানাজা হয়েছিল এই হলের মাঠে। সেদিন ছিল মাঠভর্তি মানুষ। আজ ঐ একই মাঠের সবুজ ঘাসের ওপর শুয়ে আছে এক ডজন যুবকের লাশ কিন্তু সেখানে কেউ আসছে না। সেখানে আজ আর নামাজে জানাজার কোনো আয়োজন নেই। ওদের নামও কেউ জানবে না কোনোদিন। ওই মৃতের সারিতে হেলাল হাফিজকে না দেখে আমরা খুশি। ওর বেঁচে যাবার সম্ভাবনা বাড়ল। তখনই হঠাৎ হল গেটের দিকে তাকিয়ে দেখি হলের ভিতর থেকে হেলাল হাফিজ একটি ছোট্ট ব্যাগ হাতে বেরিয়ে আসছে। হ্যাঁ, হেলাল হাফিজই তো! আমরা দুজন ছুটে গিয়ে হেলাল হাফিজকে আনন্দে বুকে জড়িয়ে ধরি। আমাদের তিনজনের চোখেই যমের চোখে ধুলো দিয়ে বেঁচে যাওয়ার আনন্দাশ্রু।

পাকসেনাদের টহলগাড়ি হলের ভিতরে যেকোনো সময় চলে আসতে পারে। কিছুক্ষণ আগে একটি মিলিটারি ভ্যান গেছে পলাশীর রাস্তা ধরে। আমরা তিনজন দ্রুত হল ছেড়ে বেরিয়ে পড়লাম জগন্নাথ হলের উদ্দেশ্যে। জগন্নাথ হলের মাঠে কবর খুঁড়ে নিহতদের গণকবর দেয়া হয়েছে বলে শুনেছি। ঐ হলের পাশে শিববাড়ি সংলগ্ন একটি একতলা বাড়িতে থাকতেন দার্শনিক গোবিন্দচন্দ্র দেব। তাঁর পালকপুত্র সাহিত্যিক জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত ও তৎপত্নী পূরবীর সঙ্গে আমার বিশেষ বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের কারণে আমাকে তিনি কিছুটা অনিচ্ছা সত্ত্বেও স্নেহ করতেন। অনিচ্ছার কথাটা বললাম এজন্য যে, আমার বেপরোয়া জীবনযাপনের কারণে তিনি বলতেন, তোমার পেছনে সিআইডির লোক ঘোরে। তুমি বিপজ্জনক। আমরা একসঙ্গে টেবিলে বসে খেতাম। অকৃতদার এই দার্শনিক ছিলেন একজন সত্যিকারের ধর্মনিরপেক্ষ মানবতাবাদী মানুষ। তাঁর একজন পালিতা কন্যাও ছিল। আমি তাঁকে দেখেছি। তাঁর নাম সম্ভবত জাহানারা। তিনি অখণ্ড পাকিস্তানে বিশ্বাস করতেন। তাঁর ঘরের দেয়ালে তিনি কায়দে আজমের একটি ছবি টানিয়ে রেখেছিলেন। এই নিয়ে তাঁকে আমরা একদিন খাবার টেবিলে খুব হেনস্থা করেছিলাম। বহুদিন আমি তাঁর গৃহে অন্ননাশ করেছি। আমি তাঁর বাড়িতে বেশি গেলে তিনি আমাকে ভয় পেতেন আবার বেশিদিন না গেলেও আমার খোঁজ করতেন। তাঁর অপত্য স্নেহ আমিও ভোগ করেছি। জহুর হল থেকে বেরিয়ে যখন শুনলাম যে জি সি দেবকে পাকসেনারা মেরে ফেলেছে, তখন আমি তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন করার দায়িত্ববোধ করলাম। জ্যোতিপ্রকাশ ও পূরবী তখন আমেরিকায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাড়িতে তিনি দীর্ঘদিন ধরে ছিলেন একা। আমরা ছুটলাম তাঁর বাড়িতে। গিয়ে দেখি তাঁর বাড়িটি জনশূন্য। খোলা বাড়ি পড়ে আছে। আমাকে বাড়িতে ঢুকতে দেখে বাড়ি ছেড়ে যারা পালিয়ে গিয়েছিল তারা ফিরে এল। আমি তাঁর শোবার ঘরে প্রবেশ করেই দেখতে পেলাম তাঁর রক্তাক্ত শয্যা। মেঝেতে নীল হয়ে পড়ে আছে জমাটবাঁধা রক্ত। টেলিফোনের রিসিভারটি শূন্যে ঝুলছে। তারের গায়ে লেগে আছে রক্তের ফোঁটা। অন্তিম মুহূর্তে সরল বিশ্বাসে হয়তো কাউকে ফোন করার চেষ্টা করেছিলেন। আমি যখন তাঁর মরদেহ সন্ধান করছি তখন বাড়ির পরিচারকদের মধ্যে একজন, আমি তার নামটা ভুলে গেছি, আমাকে কাঁদতে কাঁদতে জানালেন যে জগন্নাথ হলের মাঠে খোঁড়া গণকবরে জগন্নাথ হলের ছাত্র-কর্মচারীদের সঙ্গে তাঁকেও সমাহিত করা হয়েছে। মধুর ক্যান্টিনের মালিক আমাদের প্রিয় মধুদাকেও হত্যা করেছে পাকসেনারা। গুলিবিদ্ধ হয়ে হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে লড়ছেন হলের প্রোভোস্ট ডক্টর জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতা। আমরা জগন্নাথ হলের দিকে তাকালাম। দেখলাম পূর্ব দিকের দেয়ালটি ভাঙা। বুঝলাম ঐ দেয়ালটি ভেঙেই পাকসেনাদের ট্যাংকগুলো ঢুকেছিল হলের মাঠে গণকবর তৈরি করে নিহতদের কবর দিতে। হলের ভিতরে ঢুকে দেখি হলের পুকুরে বেশ কটি লাশ ভাসছে। পরে জেনেছি আমাদের কবিবন্ধু আবুল কাসেম ঐ রাতে জগন্নাথ হলে কবি অসীম সাহার রুমে ছিল। সম্ভাব্য আক্রমণের ভয়ে অসীম পালিয়ে গেলেও কাসেম ভেবেছিল, নির্জন হয়ে আসা জগন্নাথ হলো তাঁর কবিতা লেখার জন্য অনুকূল হবে। তার হিসেব মেলেনি। হেলাল হাফিজকে আমরা পেয়ে গেলেও আবুল কাসেম সেই রাতে নিহত হন। আমার মনে হয়েছিল জগন্নাথ হলের পুকুরে আমি সেদিন যে লাশগুলো ভাসতে দেখেছিলাম, তাদের মধ্যে একজন ছিল কবি আবুল কাসেম।

বুড়িগঙ্গার ওপারে, স্বাধীন বাংলায়

ডক্টর গোবিন্দ দেবের বাসা থেকে বেরিয়ে আমরা জগন্নাথ হলের প্রোভোস্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের জনপ্রিয় শিক্ষক ডক্টর জ্যোতির্ময় গুহঠাকুরতাকে দেখতে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে যাবার কথা ভাবছিলাম। আমি তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে জানতাম। তিনি ছিলেন প্রখ্যাত মানবতাবাদী দার্শনিক মানবেন্দ্র রায়ের শিষ্য। আমার পিসেমশাই স্বর্গীয় যতীন্দ্র বল মানবেন্দ্র রায়ের শিষ্য ছিলেন। তাঁর রেফারেন্সেই আমি একদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর কক্ষে গিয়ে তাঁর সঙ্গে পরিচিত হই। আমি যে কবিতা লিখি, তিনি জানতেন। সেদিন তিনি আমাকে সাদরে গ্রহণ করেছিলেন এবং আমাকে তাঁর বাসায় যেতে বলেছিলেন। আজ যাব কাল যাব করে আমার আর তাঁর বাসায় যাওয়া হয়নি। ডক্টর দেব রিটায়ার করার পর তিনি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জগন্নাথ হলের প্রোভোস্ট হন। শহীদ মিনার সংলগ্ন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কোয়ার্টারে তিনি থাকতেন। জানতাম তাঁর পুত্র নেই, আছে একমাত্র কন্যা মেঘনা আর স্ত্রী বাসন্তী গুহঠাকুরতা। বাসন্তী দেবী মনিজা রহমান গার্লস স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা ছিলেন। ২৬ মার্চের সকালে জ্যোতির্ময়বাবু পাকসেনাদের হাতে গুলিবিদ্ধ হন। পাকসেনারা ভেবেছিল তিনি মারা গেছেন। কিন্তু তিনি তখনও মারা যাননি। ডক্টর দেবের বাসায় গিয়ে একজনের কাছে জানলাম, কোনোক্রমে প্রাণে বেঁচে গিয়ে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় ঢাকা মেডিকেল কলেজের হাসপাতালে তিনি মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছেন। এই খবরটি জানার পর আমার খুব ইচ্ছে হলো হাসপাতালে গিয়ে স্যারকে দেখে আসি। আমার প্রস্তাবে হেলাল ও নজরুল হাসপাতালে যেতে রাজি হয়। শেষ পর্যন্ত আমাদের সেই সিদ্ধান্তটি কার্যকর করা সম্ভব হয়নি।

আমরা তিনজন যখন ডক্টর গোবিন্দ দেবের বাসা থেকে বেরিয়ে আসছিলাম, তখন একটা রোমহর্ষক ঘটনা ঘটে। ডক্টর দেবের বাসা থেকে বেরিয়ে আমরা যেই পথে নেমেছি, তখনই দেখতে পাই একটি মিলিটারি কনভয় টিএসসির দিক থেকে আমাদের অর্থাৎ উত্তরের দিকে আসছে। আমরা ভীষণ ভয় পেয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ি। ততক্ষণে আমরা মিলিটারিদের দৃষ্টিসীমার ভিতরে পড়ে গেছি। এখন আমাদের পক্ষে তাদের দৃষ্টিসীমার বাইরে পালিয়ে যাবার উপায় নেই। সে চেষ্টা আমাদের জন্য আরও ক্ষতির কারণ হতে পারে। তখন ক্ষীণকণ্ঠে নজরুল বলল, আমরা ঐ মিলিটারি কনভয়ের প্রতি সম্মান দেখিয়ে পথের পাশে দাঁড়াই, লেট দি কনভয় গো। নজরুলের সঙ্গে একমত হয়ে আমরা তিনজন তখন ঐ পথের পাশে জমিয়ে রাখা নুড়িপাথরের ওপর দাঁড়িয়ে যাই। মিলিটারি কনভয়টি আমাদের দিকে যতই এগিয়ে আসে, আমাদের ভয় ততই বাড়ে। আমি আমার লম্বা গোঁফ নিয়ে পড়ি মহাবিপদে। ২৩ মার্চ দাড়ি কেটে ফেলার সময় আমার গোঁফগুলো কেন যে আমি কেটে ফেলিনি! দীর্ঘদিন দাড়ির সঙ্গে মিশে ছিল বলে আমার গোঁফের ঘনত্ব ও দৈর্ঘ্যটা টের পাওয়া যায়নি। মুখমণ্ডল থেকে ঘনকৃষ্ণ দাড়ির আড়াল অপসৃত হওয়ার পর আমার গোঁফের ঔদ্ধত্য প্রকাশ্যে চলে আসে। তাই দেখে ২৫ মার্চের রাতে ক্যাপ্টেন কিবরিয়া আমাকে সতর্ক করে দিয়ে বলেছিলেন, আপনি অবশ্যই আপনার গোঁফগুলো ছেঁটে ফেলবেন। মিলিটারিরা সিভিলিয়ানদের বড় গোঁফ একেবারেই টলারেট করতে পারে না। ওদের সামনে পড়লে আপনার কিন্তু খুব বিপদ হবে। যিনি কথাটা বলেছেন, তিনি নিজে একজন প্রাক্তন সেনা কর্মকর্তা। আমার মনে হলো, তিনি যথার্থ বলেছেন। আরও আগেই তাঁর নির্দেশ আমার পালন করা উচিত ছিল। মনে হলো, বেটার লেট দেন নেভার। আমি দ্রুত সিদ্ধান্ত নিলাম, আমি আমার গোঁফ যতটা পারি আমার ধারাল দাঁত দিয়ে কেটে ফেলার চেষ্টা করব। দাঁত দিয়ে পুরো গোঁফটা কাটা হয়তো সম্ভব হবে না, কিন্তু সেও হবে আমার জন্য মন্দের ভাল। পাকসেনাদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুখোমুখি হওয়ার আগে আমি যে আমার গোঁফগুলো দাঁত দিয়ে কেটে ফেলার চেষ্টা করেছি, পাকসেনারা হয়তো আমার সেই ভয়ার্ত-উদ্যোগটাকে তাদের ক্ষমতার প্রতি আমার আনুগত্যের প্রমাণ হিসেবে বিবেচনা করলে করতেও পারে। কথায় বলে জান বাঁচানো ফরজ। জান বাঁচলে তো গোঁফ। আগে তো জানটা বাঁচাই। আমি দ্রুত আমার গোঁফগুলো মুখের ভিতরে ঢুকিয়ে দাঁত দিয়ে কাটতে শুরু করলাম। বুঝলাম, আমার বাঁচামরার প্রশ্নটি এখন আমার গোঁফের ওপর নির্ভর করছে। মানুষ যে কী পারে আর কী পারে না, তা মৃত্যুর মুখোমুখি না হওয়া পর্যন্ত জানা যায় না। স্বাভাবিক অবস্থায় দাঁতকে ক্ষুর বা কাঁচির মতো বানিয়ে নিজের গোঁফ কাটার কথা, জানি কারও পক্ষে কোনোদিন ভাবাও সম্ভব হতো না। কিন্তু একটা অস্বাভাবিক অবস্থার মুখে পড়ে, যমসদৃশ পাকসেনাদের ভয়ে আমার পক্ষে সেই অভাবিত ও অসম্ভব-বিবেচিত কর্মটি কত অনায়াসেই না সম্পন্ন করা সম্ভব হলো। মুহূর্তের মধ্যে আমি আমার দীর্ঘ ঘনকৃষ্ণ গোঁফের অনেকটাই ছেঁটে ফেলতে সক্ষম হলাম।

ততক্ষণে নিঃশব্দে এগিয়ে এসে মিলিটারি কনভয়টি আমাদের পাশে দাঁড়িয়ে গেল। মুখে-চোখে, হাতে-পায়ে, গায়ে-গতরে যতটা সম্ভব বিনয়ের ভাব ফুটিয়ে আমরা তাঁদের এমনভাবে সেলাম ঠুকলাম, যাতে মনে হয় যে পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষায় কর্তব্য পালনরত বীর পাকসেনাদের দেখা পেয়ে আমাদের জীবন সত্যিই ধন্য হয়েছে। আকস্মিকভাবে নয়, বহু পুণ্যবলেই আমরা আজ এত কাছে থেকে তাঁদের দর্শন পেয়েছি। সামনের জিপটিতে ছিল একজন বালুচ কাপ্তান। খুব সুদর্শন। তাঁকে দেখে মনে হলো তিনি স্বর্গ থেকে কার্তিকের চেহারাটা কেড়ে নিয়ে এসেছেন। আমি পৌত্তলিক। চিরকুমার হলেও কার্তিক আমার অন্যতম প্রিয় দেবতা। আমি করজোড়ে নিজেকে সমর্পণ করে ভক্তবৎ তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে থাকলাম। কোনো কারণে যদি আমার লিঙ্গপরিচয় প্রকাশিত হয়ে পড়ে, তখন যেন গর্বের সঙ্গে বলতে পারি— প্রভু, আপনাকে আমি হত্যাক্লান্ত পাকসেনারূপে মোটেও বিবেচনা করছি না। আপনি আমার কার্তিক ঠাকুর। আমি আপনার পূজারী। একজন সাচ্চা পাকিস্তানি হিসেবে আমি আপনার কাছে আর কিছুই চাই না। শুধু আমাকে আপনার পূজা করার সুযোগ দিন।

নজরুল আর হেলাল তখন কী করেছিল আজ আর তা মনে করতে পারছি না। আমার মনে হচ্ছিল, আমি একা। ভক্তের পরীক্ষা নেবার জন্য আমার সামনে আপাতত বালুচসন্তানরূপে আবির্ভূত হয়েছেন পার্বতীপুত্র কার্তিক। যদিও কার্তিকের বাহন ময়ূর, কিন্তু সেদিন তাঁর বাহন হিসেবে তাঁকে অনুসরণ করা ট্রাকে কোনো ময়ূর ছিল না, ছিল সিভিল পোশাক পরা ময়ূরপুচ্ছধারী কিছু বিহারি। তাদের হাতে ছিল গুলিভর্তি রাইফেল। তারা আমাদের দিকে সেই রাইফেল তাক করে আমাদের সঙ্গে রঙ্গতামাসা করছিল। তারা ছিল তাদের ক্যাপ্টেনের অর্ডারের অপেক্ষায়। আদেশ পাওয়ামাত্র তারা আমাদের ওপর গুলি চালাবে— এমন ভাবই ছিল তাদের চোখে মুখে। নজরুল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করাচিতে অনেকদিন হোটেলের ফ্রন্ট-ম্যানেজার হিসেবে কাজ করে এসেছে। উর্দু তো ভাল জানতই, কিছুটা বালুচও জানত। মনে হয়, আমার পৌত্তলিক বিনয়ভঙ্গিটি নয়, নজরুলের বালুচ ভাষা জানাটাই সেদিন আমাদের জীবন বাঁচিয়েছিল। উর্দু মেশানো বালুচ ভাষায় নজরুল বলল, আমরা হাসপাতালে যাচ্ছিলাম আমাদের একজন নিকট আত্মীয়ের খোঁজ নিতে। ঐ মিথ্যা কথাটা বালুচ ভাষায় উচ্চারিত হয়েছিল বলেই সত্যের মতো মনে হলো। ফলে বিহারিরা আমাদের ওপর গুলি চালানোর নির্দেশ আর পেল না। ক্যাপ্টেন সাহেব তাদের নির্দেশ দিলেন, পথের ওপর পড়ে থাকা রেনট্রি গাছের বেরিকেডটিকে সরানোর জন্য। অগত্যা আমাদের মত তিন তিনজন জোয়ান মর্দ বাঙালিকে বাগে পেয়েও বধ করতে না পারার বেদনা নিয়ে অধস্তন জোয়ান ও 'অপারেশন সার্চলাইট মিশন' বাস্তবায়নের জন্য রিক্রুটকৃত সিভিল বিহারিরা মিলিটারি ট্রাক থেকে নেমে পথের বেরিকেড সরাতে হাত লাগাল। আমরাও ক্যাপ্টেনের কাছে ঐ বেরিকেড সরানোর রাজকাজে হাত লাগানোর অনুমতি চাইলাম।

তখনই একটি পরিবার ঢাকা ছেড়ে পালাচ্ছিল ঐ পথ দিয়ে। ঐ পরিবারে ছিল একজন মধ্যবয়সী মহিলা, একটি কিশোরী ও একটি কিশোর। যে কিশোর ছেলেটি তাঁর ওজনের চেয়ে বেশি ওজনের একটি পুঁটলা মাথায় নিয়ে পথ চলছিল, আকস্মিকভাবে পাকসেনাদের সামনে পড়ে তার চলচ্ছক্তি হারিয়ে মাথার পুঁটলাপুঁটলিসহ রাস্তার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে যায়। তখন ঐ পুঁটলার ভিতর থেকে বেরিয়ে আসা কাঁসার থালা-বাটি, আদা-মরিচ আর কাঁথা-বালিশ পথের ওপর গড়াতে থাকে। পলায়নপর পরিবারের সদস্যরা এভাবে হঠাৎ যমসদৃশ পাকসেনাদের সামনে পড়ে যাওয়ার ভয় কিছুতেই লুকাতে পারে না। পথের ওপর আছড়ে পড়া কাঁসার থালা-বাসন আর ঘটিবাটি সংগ্রহ করতে গিয়ে ছেলেটি মৃগী রোগীর মতো কাঁপতে কাঁপতে জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। পাকসেনাদের দৃষ্টি তখন ঐ পরিবারটির ওপর স্থানান্তরিত হয়। তারা একটি সন্ত্রস্ত বাঙালি-পরিবার কর্তৃক সৃষ্ট দৃশ্যটিকে সানন্দে উপভোগ করে। আমরাও তাদের সঙ্গে যোগ দেই। আমাদের উদগত চোখের জল সাত হাত মাটির নিচে চাপা দিয়ে আমরাও হাসি। তাতে খুব ভাল ফল পাওয়া যায়। অখণ্ড পাকিস্তানের প্রতি আনুগত্যের শেষ-পরীক্ষায় আমরা তিনজনই উত্তীর্ণ বলে বিবেচিত হই। ঐ বালুচ ক্যাপ্টেনটি তখন আমাদের পিঠে তাঁর হাতের বেতটি দিয়ে মৃদু প্রহার করে বলেন, '—ভাগো হিয়াসে।'

আত্মীয় দর্শনে হাসপাতালে যাওয়ার পূর্বকথা ভুলে গিয়ে, ক্যাপ্টেনকে একটা দীর্ঘ স্যালুট জানিয়ে আমরা টিএসসির দিকে পা বাড়াই। পা বাড়াই বটে কিন্তু আমাদের পা চলে না। ভয়ে আমাদের গায়ের রক্ত হিম হয়ে আসে। পিঠ শিরশির করে, এই বুঝি গুলি আসে। ভাবি, ওরা হয়তো ভিন্ন রকমের মজা পাওয়ার জন্য সামনে দিয়ে না মেরে আমাদের তিন বন্ধুকে পেছন দিক দিয়ে মারবে। কিন্তু না, শেষ পর্যন্ত ঐ ক্যাপ্টেন কী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এক অজানা খেয়ালে আমাদের প্রাণ ভিক্ষা দেয়। জন্মসূত্রে বালুচ বলেই মনে হয়, পাঞ্জাবিদের মতো নির্বিচারে বাঙালি নিধন করার ব্যাপারে তার ততটা আগ্রহ ছিল না। শেষ পর্যন্ত আমরা পাকসেনা ও বিহারিদের শ্যূটিং রেঞ্জের বাইরে চলে আসি।

পাকসেনারা ঐদিনই সলিমুল্লাহ হলের সামনে দিয়ে হেঁটে যাওয়া তিনজন বাঙালিকে গুলি করে হত্যা করে। আমার ধারণা, যে মিলিটারি কনভয়টির সঙ্গে জগন্নাথ হলের পূর্বদিকের বকশীবাজারমুখী রাস্তায় আমাদের দেখা হয়েছিল, ওরাই ওই হত্যাকাণ্ডটি ঘটিয়ে থাকবে। যে সেনাবাহিনীর সদস্যরা নির্বিচার গণহত্যার ছাড়পত্র নিয়ে নিজ দেশের নিরস্ত্র নাগরিকের বিরুদ্ধে মাঠে নামে, দায়বদ্ধতাহীন সেই সৈনিকদের যমের সঙ্গে তুলনা করলে যমেরও মর্যাদা হানি হবে। ১৯৭১ সালে প্রখ্যাত পটুয়া কামরুল হাসান ইয়াহিয়া খানের একটি বীভৎস প্রতিকৃতি এঁকে ঐ ছবির নিচের ক্যাপশনে লিখেছিলেন, 'এই জানোয়ারটি মানুষ হত্যা করছে, আসুন আমরা এই জানোয়ারটিকে হত্যা করি।' আমার মনে হয় না, ইয়াহিয়া খানের বর্বর-নিষ্ঠুরতার সঙ্গে তুলনা করার মতো সত্যিই কোনো বিশেষ জানোয়ারের ধারণা কামরুল হাসানের মাথায় ছিল না। কী করে থাকবে? বর্বর ইয়াহিয়া খানের মতো কোনো জানোয়ার তো ঈশ্বর সৃষ্টি করেননি। আমার মনে হয়, তুলনা করার মতো আর কিছু না পেয়ে, অনন্যোপায় হয়েই তিনি সেদিন ইয়াহিয়ার উদ্দেশ্যে 'জানোয়ার' শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন।

পলায়নপর ঐ পরিবারটির ভাগ্যে সেদিন শেষ পর্যন্ত কী ঘটেছিল, আমরা জানি না। আমরা স্থির করি, আর ঢাকায় নয়। সময় থাকতেই ঢাকা ছেড়ে আমাদের পালাতে হবে। আমরা দ্রুত আমাদের মেসে ফিরে যাই। কামরাঙ্গীরচর তখনও আজকের মতো পরিচিতি লাভ করেনি। ঢাকার মানুষজন নবাবগঞ্জ হয়ে নদী পেরিয়ে ঐ পথে ঢাকা ত্যাগ করছিল। আমরাও তাদের অনুসরণ করি। ঢাকা ছেড়ে যাবার আগে আমি চায়না বিল্ডিংয়ের সামনের একটি দোকান থেকে আড়াই টাকা দিয়ে এক প্যাকেট থ্রি ক্যাসেল সিগারেট কিনি। সামর্থ্য না থাকলেও আমি মাঝে মাঝে ঐ সিগারেটটি খেতাম। ভাবি, কী আছে জীবনে? মরার আগে ভাল সিগারেট খেয়ে নেই।

নবাবগঞ্জ বাজার পেছনে ফেলে, খোলামোড়া হয়ে বুড়িগঙ্গা পাড়ি দিয়ে আমরা নদীর ওপারে চলে যাই। নদী পার হয়ে দেখি ওপারে হাজার হাজার লোক গিজগিজ করছে। সেখানে আমরা আমাদের কিছু পরিচিত মানুষজনকেও দেখতে পাই। সবাই ছুটে চলেছে অজানার পথে। কারও কোনো নির্দিষ্ট গন্তব্য নেই। নদীর ওপারের মানুষরা এপারের মানুষদের সাদরে বরণ করে নেবার জন্য প্রস্তুত হয়ে ছিল। ফলে ঢাকা ছেড়ে ওপারে চলে যাওয়া লোকজনের কোনো অসুবিধা হলো না। অনেক পরিবারই অপরিচিত মানুষদের ঘরবাড়িতে আশ্রয় নিল। দেখলাম ওপারের ছেলেরা দল বেঁধে ঢাকা থেকে জীবন বাঁচাতে পালিয়ে আসা পথক্লান্ত মানুষজনকে সাগ্রহে পানি খাওয়াচ্ছে। যেন

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বেদনাকে পাশে ঠেলে প্রধান হয়ে উঠেছে একটা উৎসবের ভাব। বাঙালি যেখানে একত্রিত হয়, সেখানেই বসে তার প্রাণের মেলা। 'নদীর ওপারে সুখ আমার বিশ্বাস'— কবির এই কাব্যকথার সত্যতার প্রমাণ পাওয়া গেল। আমরা তিনজনই ঝাড়া হাত-পা। আমাদের সঙ্গে পরিবারের বোঝা নেই। আমাদের যেখানে রাত সেখানেই কাত।

বেবী নামে আমাদের একজন বন্ধু ছিল। সে তার পরিবারের বেশ ক'জন সদস্যকে নিয়ে আশ্রয়ের খোঁজে যাচ্ছিল। তাদের সঙ্গে ছিল একটি ব্যাটারিচালিত রেডিও। সন্ধ্যার দিকে ঐ রেডিওর নব ঘুরাতে গিয়েই আমরা স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র নামে একটি নতুন বেতার কেন্দ্রের সন্ধান পাই। সেই বেতার কেন্দ্র থেকেই মেজর জিয়া নামে একজন বাঙালি-সৈনিক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের পক্ষে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা প্রদান করেন। মেজর জিয়া নামটি মুহূর্তের মধ্যে আমাদের প্রাণে গেঁথে যায়। প্রলম্বিত জয়য়য় বাংলা ধ্বনিতে আমরা তাঁর সেই ঘোষণাকে চিৎকার করে স্বাগত জানাই। বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে কোনো তথ্য না পেয়ে আমরা খুব দুশ্চিন্তার মধ্যে কাল কাটাচ্ছিলাম। তিনি কি বেঁচে আছেন? পাকসেনারা কি তাঁকে গ্রেফতার করেছে? আমরা কিছুই জানতে পারছিলাম না। মেজর জিয়ার সংক্ষিপ্ত ঘোষণাটি শুনে আমরা জানতে পারলাম যে, মুজিব বেঁচে থাকুন আর নাই থাকুন, তাঁর পক্ষ থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষিত হয়ে গেছে এবং স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র নামে আমাদের একটি নিজস্ব বেতার কেন্দ্রও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সেটি কোথায়, তখন তা জানার উপায় ছিল না।

স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র থেকে মেজর জিয়া কর্তৃক বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করার বিষয়টি নিয়ে পরবর্তীকালে আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসকে বিকৃত করা হয়েছে বলে আমি এ-ব্যাপারে একটু বিস্তৃত করে ঘটনাটির ব্যাখ্যা প্রদান করা জরুরি মনে করছি। বিএনপি দাবি করে চলেছে যে, জিয়াই বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষক। তাদের স্লোগান—'স্বাধীনতার ঘোষক জিয়া— লও লও লও সালাম।' অন্যদিকে স্বাধীনতা যুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী আওয়ামী লীগ বলছে, জিয়া হচ্ছেন বঙ্গবন্ধু কর্তৃক 'যথাযথভাবে' ঘোষিত বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার পাঠকমাত্র। ঘোষক আর পাঠক— এ দুয়ের মধ্যে বিস্তর ফারাক। প্রকৃত সত্য হচ্ছে, জিয়া বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষকও নন, আবার পাঠকমাত্রও নন। বঙ্গবন্ধু ২৫ মার্চের রাতে বাংলাদেশের স্বাধীনতার যে ঘোষণা প্রদান করেন, তা ঐদিনই গভীর রাতে চট্টগ্রামে পৌঁছায় এবং স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র (পরবর্তীকালে 'বিপ্লবী' শব্দটা বর্জন করা হয়) থেকে বহুবার পাঠ করা হয়।

সম্প্রতি (২৭-২৯ জানুয়ারি ২০০৭) আমি কলকাতায় অনুষ্ঠিত 'আন্তর্জাতিক বাংলা কবিতা উৎসব'-এ গিয়ে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অন্যতম প্রধান সংগঠক বেলাল মোহাম্মদের সাক্ষাৎ লাভ করি। তিনিও অনুষ্ঠানে কবিতা পড়তে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এসেছিলেন। আমি একাত্তরের ওপর লিখছি জেনে তিনি মেজর জিয়ার স্বাধীনতা ঘোষণার বিষয়টি নিয়ে আলোকপাত করেন। তিনি জানান যে, বঙ্গবন্ধু কর্তৃক প্রেরিত স্বাধীনতার ঘোষণাটি তিনি নিজেই বহুবার পাঠ করেছেন। পাঠ করেছেন আবদুল্লাহ আল ফারুকও। ফারুক এখন জার্মান বেতারে কাজ করেন। পরে পাকপক্ষত্যাগী বাঙালি সৈনিকদের নিয়ে কালুরঘাটে আসা জিয়ার সঙ্গে পরিচয় হলে তিনিই জিয়াকে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণাটি পাঠ করার অনুরোধ জানান। জিয়াকে তিনি বলেন, আমরা হলাম মাইনর, আপনি মেজর, আপনি যদি ঐ ঘোষণাটি পাঠ করেন তাহলে তার একটা আলাদা প্রভাব পড়বে। বেলাল মোহাম্মদের প্রস্তাবে জিয়া রাজি হন কিন্তু বঙ্গবন্ধুর প্রেরিত স্বাধীনতার ঘোষণাটি হুবহু পাঠ না করে নিজেই একটি ঘোষণা তৈরি করেন এবং ঐ বেতার কেন্দ্র থেকে তা পাঠ করেন। ইংরেজিতে লেখা সেই ঘোষণাটি ছিল এ রকম :

> "I, Major Zia, Provisional Comander in Chief of the Bangladesh Liberation Army, hereby proclaim, on behalf of Sheikh Mujibur Rahman, the independence of Bangladesh.
>
> I also declare, we have already framed a sovereign, legal government under Sheikh Mujibur Rahman which pledges to function as per law and constitution. The new democratic government is committed to a policy of non-alignment in international relations. It will seek friendship with all nations and strive for international peace. I appeal to all government to mobilize public opinion in their respective countries against the brutal genocide in Bangladesh.
>
> The government under Sheikh Mujibur Rahman is the sovereign legal Government of Bangladesh and is entitled to recognition from all democratic nations of the world."

AMARBOI.COM

লক্ষণীয় যে, মেজর জিয়া কর্তৃক প্রণীত ঘোষণাপত্রটিতে তিনবার শেখ মুজিবের নাম এসেছে। মুজিবের নামে স্বাধীনতার ঘোষণা না দিলে তা যে হালে পানি পাবে না, একাত্তরের বাস্তবতায় জিয়ার তা অজানা ছিল না। মেজর জিয়া তখন শুধু একটি সৈনিক-নাম বৈ কিছু নয়। জিয়ার জায়গায় মেজর রফিক বা মেজর অলি বা মেজর শওকত হলেও সেই ঘোষণাটির তাৎপর্য একই হতো। যে কোনো বাঙালি মেজরই তখন জিয়ার বিকল্প হতে পারতেন, কিন্তু শেখ মুজিবের বিকল্প সন্ধান ছিল অচিন্তনীয়। তাঁর নামটি ছিল সূর্যের মতো স্থির এবং আকাশের মতো অলঙ্ঘনীয়।

আমি নিজ কানে বিশ্ববাসীর জ্ঞাতার্থে প্রচারিত ইংরেজি ভাষায় রচিত জিয়ার সেই ঘোষণাটি শুনিনি। আমরা বুড়িগঙ্গা নদী পেরিয়ে ২৭ মার্চ অপরাহ্নের দিকে জিয়ার যে-ঘোষণাটি শুনি, তা ছিল বাংলায় প্রদত্ত। তাতে তিনি বলেন :

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আমি, মেজর জিয়া, মহান জাতীয় নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষ থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করছি। দেশের সর্বত্র পাকিস্তানী দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা হয়েছে। প্রিয় দেশবাসী, আপনারাও যে যেখানে আছেন হাতের কাছে যা কিছু পান তাই দিয়ে প্রতিরোধ গড়ে তুলুন। ইনশাল্লাহ, জয় আমাদের সুনিশ্চিত। এই সাথে আমরা বিশ্বের সকল মুক্তিকামী দেশ থেকে আন্তরিক সাহায্য ও সহযোগিতা কামনা করছি। জয় বাংলা।'

(সূত্র : বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র : তৃতীয় খণ্ড, পৃ-২)

আর বঙ্গবন্ধু কর্তৃক পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলস-এর ট্রান্সমিটারের মাধ্যমে প্রেরিত বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাটি ছিল এ রকম :

'এটাই হয়তো আমার শেষ-বার্তা। আজ থেকে বাংলাদেশ স্বাধীন। বাংলাদেশের মানুষ যে যেখানে আছেন, আপনাদের যা কিছু আছে, তা দিয়ে সেনাবাহিনীর দখলদারীর মোকাবিলা করার জন্য আমি আহ্বান জানাচ্ছি। পাকিস্তানী দখলদার বাহিনীর শেষ সৈন্যটিকে বাংলাদেশের মাটি থেকে উৎখাত করা এবং চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত আপনাদেরকে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে।'

— শেখ মুজিবুর রহমান।

(সূত্র : বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র : তৃতীয় খণ্ড, পৃ-১)

একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যায় যে, মেজর জিয়ার ড্রাফটে বঙ্গবন্ধুর ঘোষণাটির সুস্পষ্ট প্রভাব রয়েছে। বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণাবাণীটি চোখের সামনে রেখেই মেজর জিয়া তাঁর ঘোষণাটি লিখেছিলেন। অনস্বীকার্য যে, মেজর জিয়ার ড্রাফটটি ছিল সুলিখিত। কিন্তু কোনোভাবেই তা বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণার সমার্থক ছিল না। মেজর জিয়ার সেই অধিকারও ছিল না। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে একমাত্র বঙ্গবন্ধুরই সেই অধিকার ছিল। তাঁর ঘোষণাটিই আমাদের স্বাধীনতা ও সংবিধানের ভিত্তি। সঙ্গতকারণেই তাই, পরবর্তীকালে ১৭ এপ্রিল ১৯৭১ তারিখে ১৯৭০ সালের ঐতিহাসিক সাধারণ নির্বাচনে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের সমন্বয়ে মুজিবনগরে গঠিত প্রবাসী সরকার 'স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র'-এ [পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য] বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক প্রদত্ত স্বাধীনতার ঘোষণাটিকেই 'যথাযথভাবে প্রদত্ত' বলে সন্নিবেশিত করে।

বঙ্গবন্ধুর অবর্তমানে মেজর জিয়া সৌভাগ্যক্রমে বঙ্গবন্ধুর পক্ষে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করার যে সুযোগ লাভ করেন, তার ঐতিহাসিক মূল্য রয়েছে। জাতি সে-কথা সানন্দে স্মরণ করবে। আমি মনে করি, স্বাধীনতার ঘোষক হিসেবে নয়, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের পক্ষে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রচারকারী হিসেবেই তিনি আমাদের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। জিয়া যে জয় বাংলা বলে তাঁর ঘোষণাটি শেষ করেছিলেন এবং তিনবার শেখ মুজিবের নাম নিয়েছিলেন, সে কথা আমরা যেন ভুলে না যাই। যেন ভুলে না যাই এই কথাটি যে, শেখ মুজিবের পক্ষে মেজর জিয়ার স্বাধীনতার ঘোষণাটি প্রচারিত হওয়ার আগেই, অর্থাৎ ২৬ মার্চই বাংলাদেশের বিশ্বস্বীকৃত নেতা হিসেবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব যথাযথভাবেই বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন ও স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র থেকে তা ২৬ মার্চ বহুবার প্রচার করা হয়। শুধু তাই নয়– শেখ মুজিবের স্বাধীনতা ঘোষণার ট্রু কপিটি সাইক্লোস্টাইল করে চট্টগ্রামসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়েও দেয়া হয়। এ-ব্যাপারে আমাদের স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সাহসী-কর্মীদের সাক্ষ্যকে অবশ্যই আমলে নিতে হবে। স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্রের অন্যতম প্রধান সংগঠক ও কবি বেলাল মোহাম্মদকে জিরো বানিয়ে মেজর জিয়াকে হিরো বানানো যাবে না। সুখের বিষয় যে, জীবদ্দশায় জিয়া নিজে কখনও তা করেননি। বরং 'অন বিহাফ অব শেখ মুজিবুর রহমান' কথাটা টেপ থেকে ইরেজ করে দেয়ার জন্য উদ্যোগ নেয়া হলে, জেনারেল জিয়া তা বাতিল করে দিয়েছিলেন বলেই আমি জানি।

হিটলারের প্রচারমন্ত্রী জোসেফ পল গোয়েবলস বলতেন, একটি মিথ্যা যদি বারবার উচ্চারিত হয়, তাহলে একসময় সে সত্যের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠে ও মানুষের মন থেকে সত্যকে সরিয়ে দেয়। তাঁর এই যুদ্ধকালীন প্রচার-তত্ত্বকেই গোয়েবলসীয় তত্ত্ব বলা হয়। সেই গোয়েবলসই তাঁর মৃত্যুর কিছুদিন আগে, যখন জার্মানির পরাজয় প্রায় নিশ্চিত হয়ে আসছিল, তখন তিনি তাঁর সৎপুত্রকে (স্টেপ সান) লেখা একটি পত্রে বলেছিলেন :

"Do not let yourself be disconcerted by the worldwide clamor that will now begin," he urged in a letter written to his stepson just days before his death. "There will come a day, when all the lies will collapse under their own weight, and truth will again triumph."

গোয়েবলসের এই কথা আমরা অনেকেই জানি না।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ সম্পর্কে জিয়াউর রহমানের ভাষ্য

পৃথিবী নামক এই ক্ষুদ্র গ্রহপৃষ্ঠে তিরিশ লক্ষ প্রাণের মূল্যে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ নামের এই দেশটি যতদিন তার প্রায় ৫৬ হাজার বর্গমাইলের বর্তমান অবয়ব নিয়ে টিকে থাকবে, ততদিন এই ভূখণ্ডের মানুষ পরম শ্রদ্ধা ও গর্বের সঙ্গে ১৯৭১ সালের ৭ মার্চে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে দেয়া শেখ মুজিবের ঐতিহাসিক ভাষণটিকে স্মরণ করবে। ক্ষমতায় আসার কিছুদিনের মধ্যেই খালেদা-নিজামীর জোট সরকার স্কুলের পাঠ্যসূচি থেকে আমার নির্দোষ কবিতাটিকে বাদ দিলেও, হয়তোবা দেবী দুর্গার সঙ্গে মহিষাসুরের মতো, ঐ ভাষণ নিয়ে রচিত আমার 'স্বাধীনতা, এই শব্দটি কীভাবে আমাদের হলো'— কবিতাটি টিকে যেতে পারে। তা আমার কবিতাটি টিকুক আর নাই টিকুক, বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণটি যে টিকে থাকবে, সে ব্যাপারে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। আমার কাছে ঐ ভাষণটিকে একটি রাজনৈতিক কবিতার মতো মনে হয়, যা কমপ্লিট ইন ইটসেল্ফ। ঐ ভাষণটিকে আমি বাঙালি জাতির অন্যতম শ্রেষ্ঠ মেধাসম্পদ (ইনটিলেকচুয়াল প্রপার্টি) বলে মনে করি।

৭ মার্চের ভাষণটিকে কেউ কেউ আব্রাহাম লিঙ্কনের গেটিসবার্গ ভাষণের সঙ্গে তুলনা করেছেন। আমি মনে করি, বঙ্গবন্ধুর ঐ ভাষণটি গেটিসবার্গ এ্যাড্রেসের চাইতেও এগিয়ে। বিশ্বের বিভিন্ন কালজয়ী নেতাপ্রদত্ত ঐতিহাসিক ভাষণসমূহ শ্রবণের অভিজ্ঞতা বিবেচনায় রেখেই আমি বলি, বঙ্গবন্ধুর ঐ ভাষণের চেয়ে সুভাষণ আমি শুনিনি।

আমাদের নতুন ও অনাগত প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের জ্ঞাতার্থে ঐ ভাষণটি এখানে লিপিবদ্ধ করছি।

১৯৭১-এর ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণ

"আজ দুঃখ ভারাক্রান্ত মন নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। আপনারা সবই জানেন এবং বোঝেন। আমরা আমাদের জীবন দিয়ে চেষ্টা করেছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, রংপুরে আমার ভাইয়ের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত হয়েছে। আজ বাংলার মানুষ মুক্তি চায়, বাংলার মানুষ বাঁচতে চায়, বাংলার মানুষ তার অধিকার চায়। কী অন্যায় করেছিলাম? নির্বাচনের পর বাংলাদেশের মানুষ সম্পূর্ণভাবে আমাকে ও আওয়ামী লীগকে ভোট দেন। আমাদের ন্যাশনাল অ্যাসেমব্লি বসবে, আমরা সেখানে শাসনতন্ত্র তৈরি করব এবং

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এ দেশকে আমরা গড়ে তুলব। এ দেশের মানুষ অর্থনীতি, রাজনীতি ও সাংস্কৃতিক মুক্তি পাবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজ দুঃখের সঙ্গে বলতে হয় ২৩ বছরের ইতিহাস মুমূর্ষু নর-নারীর আর্তনাদের ইতিহাস। বাংলার ইতিহাস এ দেশের মানুষের রক্ত দিয়ে রাজপথ রঞ্জিত করার ইতিহাস। ১৯৫২ সালে রক্ত দিয়েছি। ১৯৫৪ সালে নির্বাচনে জয়লাভ করেও আমরা গদিতে বসতে পারি নাই। ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খান মার্শাল ল' জারি করে ১০ বছর পর্যন্ত আমাদের গোলাম করে রেখেছেন। ১৯৬৬ সালের ৬-দফা আন্দোলনে ৭ জুনে আমার ছেলেদের গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। ১৯৬৯ সালের আন্দোলনে আইয়ুব খানের পতন হওয়ার পরে যখন ইয়াহিয়া খান সাহেব সরকার নিলেন, তিনি বললেন, দেশে শাসনতন্ত্র দেবেন, গণতন্ত্র দেবেন, আমরা মেনে নিলাম। তারপর অনেক ইতিহাস হয়ে গেল, নির্বাচন হলো। আমি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান সাহেবের সঙ্গে দেখা করেছি। আমি, শুধু বাংলার নয়, পাকিস্তানের মেজরিটি পার্টির নেতা হিসেবে তাঁকে অনুরোধ করলাম, ১৫ ফেব্রুয়ারি তারিখে আপনি জাতীয় পরিষদের অধিবেশন দেন। তিনি আমার কথা রাখলেন না, তিনি রাখলেন ভুট্টো সাহেবের কথা। তিনি বললেন, প্রথম সপ্তাহে মার্চ মাসে হবে। আমি বললাম ঠিক আছে, আমরা অ্যাসেমব্লি-তে বসব। আমি বললাম, অ্যাসেমব্লির মধ্যে আলোচনা করব— এমনকি এ পর্যন্তও বললাম, যদি কেউ ন্যায্য কথা বলে, আমরা সংখ্যায় বেশি হলেও— একজনও যদি সে হয়, তার ন্যায্য কথা আমরা মেনে নেবো।

ভুট্টো সাহেব এখানে এসেছিলেন, আলোচনা করলেন। বলে গেলেন যে, আলোচনার দরজা বন্ধ নয়, আরো আলোচনা হবে। তারপর অন্যান্য নেতাদের সঙ্গে আমরা আলোচনা করলাম, আপনারা আসুন, বসুন, আমরা আলাপ করে শাসনতন্ত্র তৈরি করব। তিনি বললেন, পশ্চিম পাকিস্তানের মেম্বাররা যদি এখানে আসে, তাহলে কসাইখানা হবে অ্যাসেমব্লি। তিনি বললেন, যে যাবে তাকে মেরে ফেলে দেয়া হবে, যদি কেউ অ্যাসেমব্লিতে আসে তাহলে পেশোয়ার থেকে করাচি পর্যন্ত দোকান জোর করে বন্ধ করা হবে। আমি বললাম, অ্যাসেমব্লি চলবে। তারপর হঠাৎ অ্যাসেমব্লি বন্ধ করে দেওয়া হলো, দোষ দেওয়া হলো বাংলার মানুষকে, দোষ দেওয়া হলো আমাকে। ইয়াহিয়া খান সাহেব প্রেসিডেন্ট হিসাবে অ্যাসেমব্লি ডেকেছিলেন। আমি বললাম যে আমি যাব। ভুট্টো সাহেব বললেন, তিনি যাবেন না। তারপরে হঠাৎ বন্ধ করে দেয়া হলো, বন্ধ করার পর এ দেশের মানুষ প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠল।

আমি বললাম, শান্তিপূর্ণভাবে আপনারা হরতাল পালন করুন। আমি বললাম, আপনারা কল-কারখানা সবকিছু বন্ধ করে দেন। জনগণ সাড়া দিল। আপনার ইচ্ছায় জনগণ রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল, তারা শান্তি পূর্ণভাবে সংগ্রাম চালিয়ে যাবার জন্য স্থির প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলো। কী পেলাম

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমরা? আমার পয়সা দিয়ে অস্ত্র কিনেছি বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য, আজ সেই অস্ত্র ব্যবহার হচ্ছে আমার দেশের গরিব-দুঃখী নিরস্ত্র মানুষের বিরুদ্ধে। তার বুকের ওপর হচ্ছে গুলি। আমরা পাকিস্তানে সংখ্যাগুরু, আমরা বাঙালিরা যখনই ক্ষমতায় যাবার চেষ্টা করেছি তখনই তারা আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

টেলিফোনে আমার সঙ্গে তাঁর কথা হয়। তাঁকে আমি বলেছিলাম, জেনারেল ইয়াহিয়া খান সাহেব, আপনি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট, দেখে যান কীভাবে আমার গরিবের ওপর, আমার বাংলার মানুষের বুকের ওপর গুলি করা হয়েছে। কী করে আমার মায়ের কোল খালি করা হয়েছে, কী করে মানুষকে হত্যা করা হয়েছে, আপনি আসুন, দেখুন, বিচার করুন।

তিনি বললেন, আমি নাকি স্বীকার করেছি ১০ তারিখে রাউন্ড টেবিল কনফারেন্স হবে। আমি তো অনেক আগেই বলে দিয়েছি, কিসের রাউন্ড টেবিল, কার সঙ্গে বসব? যারা আমার মানুষের বুকের রক্ত নিয়েছে, তাদের সঙ্গে বসব? হঠাৎ আমার সঙ্গে পরামর্শ না করে পাঁচ ঘণ্টার গোপন বৈঠক করে যে বক্তৃতা তিনি করেছেন, তাতে সমস্ত দোষ তিনি আমার ওপর দিয়েছেন, বাংলার মানুষের ওপর দিয়েছেন।

ভায়েরা আমার, ২৫ তারিখে অ্যাসেমব্লি কল করেছেন। রক্তের দাগ শুকায় নাই। আমি ১০ তারিখে সিদ্ধান্ত নিয়েছি, ওই শহীদের রক্তের উপর পাড়া দিয়ে আরটিসি-তে মুজিবুর রহমান যোগদান করতে পারে না। অ্যাসেমব্লি কল করেছেন, আমার দাবি মানতে হবে। প্রথম, সামরিক আইন 'মার্শাল ল' withdraw করতে হবে। সমস্ত সামরিক বাহিনীর লোকদের ব্যারাকে ফেরত যেতে হবে। যেভাবে হত্যা করা হয়েছে তার তদন্ত করতে হবে। আর জনগণের প্রতিনিধির হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। তারপর বিবেচনা করে দেখব, আমরা অ্যাসেমব্লিতে বসতে পারব কি পারব না। এর পূর্বে অ্যাসেমব্লিতে বসতে আমরা পারি না।

আমি প্রধানমন্ত্রিত্ব চাই না। আমার এ দেশের মানুষের অধিকার চাই। আমি পরিষ্কার অক্ষরে বলে দেবার চাই, আজ থেকে এই বাংলাদেশে কোর্ট-কাছারি, আদালত-ফৌজদারি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ থাকবে। গরিবের যাতে কষ্ট না হয়, যাতে আমার মানুষ কষ্ট না করে সেজন্য সমস্ত অন্যান্য যে জিনিসগুলো আছে, সেগুলোর হরতাল কাল থেকে চলবে না। রিকশা, গরুর গাড়ি, রেল চলবে, লঞ্চ চলবে; শুধু সেক্রেটারিয়েট, সুপ্রিমকোর্ট, হাইকোর্ট, জজকোর্ট, সেমি-গভর্নমেন্ট দপ্তর, ওয়াপদা কোনো কিছু চলবে না। ২৮ তারিখে কর্মচারীরা গিয়ে বেতন নিয়ে আসবেন। এরপর যদি বেতন দেয়া না হয়, আর যদি একটা গুলি চলে, আর যদি আমার লোকের ওপর হত্যা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করা হয়, তোমাদের কাছে অনুরোধ রইল, প্রত্যেক ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোল। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে এবং জীবনের তরে রাস্তাঘাট যা যা আছে সবকিছুই,—আমি যদি হুকুম দিবার নাও পারি, তোমরা বন্ধ করে দেবে। আমরা ভাতে মারব, আমরা পানিতে মারব। তোমরা আমার ভাই, তোমরা ব্যারাকে থাকো, কেউ তোমাদের কিছু বলবে না। কিন্তু আর আমার বুকের ওপর গুলি চালাবার চেষ্টা করো না। ৭ কোটি মানুষকে দাবায়ে রাখতে পারবা না। আমরা যখন মরতে শিখেছি তখন কেউ আমাদের দাবাতে পারবে না।

আর যে সমস্ত লোক শহীদ হয়েছে, আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে, আমরা আওয়ামী লীগের থেকে যদ্দূর পারি তাদের সাহায্য করতে চেষ্টা করব। যারা পারেন আমার রিলিফ কমিটিকে সামান্য টাকা-পয়সা পৌঁছে দেবেন। আর এই ৭ দিনের হরতালে যে সমস্ত শ্রমিক ভাইয়েরা যোগদান করেছে, প্রত্যেক শিল্পের মালিক তাদের বেতন পৌঁছে দেবেন। সরকারি কর্মচারীদের বলি, আমি যা বলি তা মানতে হবে। যে পর্যন্ত আমার এই দেশের মুক্তি না হচ্ছে, ততদিন খাজনা ট্যাক্স বন্ধ করে দেওয়া হলো— কেউ দেবে না। শুনুন, মনে রাখবেন, শত্রুবাহিনী ঢুকেছে নিজেদের মধ্যে আত্মকলহ সৃষ্টি করবে, লুটতরাজ করবে। এই বাংলায়-হিন্দু-মুসলমান, বাঙালি-অবাঙালি যারা আছে, তারা আমাদের ভাই। তাদের রক্ষার দায়িত্ব আপনাদের ওপরে, আমাদের যেন বদনাম না হয়। মনে রাখবেন, রেডিও-টেলিভিশনের কর্মচারীরা যদি রেডিওতে আমাদের কথা না শোনে তাহলে কোনো বাঙালি রেডিও স্টেশনে যাবেন না। যদি টেলিভিশনে আমাদের নিউজ না দেয়, কোনো বাঙালি টেলিভিশনে যাবেন না। ২ ঘণ্টা ব্যাংক খোলা থাকবে, যাতে মানুষ তাদের মাইনে-পত্র নিতে পারে। পূর্ববাংলা থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে এক পয়সাও চালান হতে পারবে না। টেলিফোন, টেলিগ্রাম আমাদের এই পূর্ববাংলায় চলবে এবং বাংলাদেশের নিউজ বাইরে পাঠানো চলবে। কিন্তু যদি এই দেশের মানুষকে খতম করার চেষ্টা করা হয়, বাঙালিরা বুঝেসুঝে কাজ করবেন। প্রত্যেক গ্রামে, প্রত্যেক মহল্লায় আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে সংগ্রাম পরিষদ গড়ে তোল। তোমাদের যা কিছু আছে, তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকো। মনে রাখবা, রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দেব। এই দেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব ইনশাল্লাহ্‌। এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। জয় বাংলা।"

এটিই হচ্ছে বঙ্গবন্ধু-প্রদত্ত সেই ঐতিহাসিক কালজয়ী ভাষণ। বজ্রকণ্ঠের ঐ ভাষণটির অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য ও শৌর্যের প্রতি কৃত্রিম উদাসীনতা প্রদর্শনকারী মহলের জ্ঞাতার্থে এবার আমি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে বাংলাদেশের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্বাধীনতার ঘোষণা-প্রদানকারী জিয়াউর রহমানের নিষ্কলুষ মূল্যায়ন কেমন ছিল, সে বিষয়ে আমাদের নবপ্রজন্মের সন্তানদের অবহিত করা প্রয়োজন বোধ করছি।

১৯৭২ সালে বাংলাদেশের সেনাবাহিনীর ডেপুটি কমান্ডার ইন চিফ লে. জেনারেল জিয়াউর রহমান তৎকালীন সাপ্তাহিক বিচিত্রা পত্রিকায় 'একটি জাতির জন্ম' শিরোনামে একটি নিবন্ধ প্রকাশ করেন। সেই সুলিখিত নিবন্ধে তিনি বলেন :

একটি জাতির জন্ম

জিয়াউর রহমান

ফেব্রুয়ারির (১৯৭১) শেষ দিকে বাংলাদেশে যখন রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিস্ফোরণোন্মুখ হয়ে উঠেছিল, তখন আমি একদিন খবর পেলাম, তৃতীয় কমান্ডো ব্যাটেলিয়নের সৈনিকেরা চট্টগ্রাম শহরের বিভিন্ন এলাকায় ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে বিহারীদের বাড়িতে বাস করতে শুরু করেছে। খবর নিয়ে আমি আরো জানলাম, কমান্ডোরা বিপুল পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র আর গোলাবারুদ নিয়ে বিহারী বাড়িগুলোতে জমা করেছে এবং রাতের অন্ধকারে বিপুল সংখ্যায় তরুণ বিহারীদের সামরিক ট্রেনিং দিচ্ছে। এসব কিছু থেকে এরা যে ভয়ানক রকমের অশুভ একটা কিছু করবে, তার সুস্পষ্ট আভাসই আমরা পেলাম। তারপর এল ১ মার্চ। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উদাত্ত আহ্বানে সারাদেশে শুরু হলো ব্যাপক অসহযোগ আন্দোলন। এর পরদিন দাঙ্গা হলো। বিহারীরা হামলা করেছিল এক শান্তিপূর্ণ মিছিলে। এর থেকে আরো গোলযোগের সূচনা হলো। এই সময়ে আমার ব্যাটেলিয়নের নিরাপত্তা এনসিওরা আমাকে জানাল প্রতিদিন সন্ধ্যায় বিংশতিতম বালুচ রেজিমেন্টের জোয়ানরা বেসামরিক পোশাক পরে বেসামরিক ট্রাকে কোথায় যেন যায়। তারা ফিরে আসে আবার শেষ রাতের দিকে। আমি উৎসুক হলাম। লোক লাগালাম খবর নিতে। খবর নিয়ে জানলাম প্রতিরাতেই তারা যায় কতকগুলো নির্দিষ্ট বাঙালী পাড়ায়। নির্বিচারে হত্যা করে সেখানে বাঙালীদের। এই সময় প্রতিদিনই ছুরিকাহত বাঙালীদের হাসপাতালে ভর্তি হতেও শোনা যায়। এই সময়ে আমাদের কমান্ডিং অফিসার লেফটেন্যান্ট কর্নেল জানযুয়া আমার গতিবিধির ওপর লক্ষ্য রাখার জন্যেও লোক লাগায়। মাঝে মাঝেই তার লোকেরা গিয়ে আমার সম্পর্কে খোঁজখবর নিতে শুরু করে। আমরা তখন আশংকা করছিলাম, আমাদের হয়তো নিরস্ত্র করা হবে। আমি আমার মনোভাব দমন করে কাজ করে যাই এবং নিরস্ত্র করার উদ্যোগ ব্যর্থ করে দেয়ার সম্ভাব্য সব ব্যবস্থা গ্রহণ করি। বাঙালী হত্যা ও বাঙালী দোকানপাটে অগ্নিসংযোগের ঘটনা ক্রমেই বাড়তে থাকে। আমাদের নিরস্ত্র করার চেষ্টা করা হলে আমি কী ব্যবস্থা গ্রহণ করব কর্নেল (তখন মেজর)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শওকত আমার কাছে তা জানতে চান। ক্যাপ্টেন শমসের মবিন এবং মেজর খালেকুজ্জামান আমাকে জানান যে, স্বাধীনতার জন্য আমি যদি অস্ত্র তুলে নিই, তাহলে তারাও দেশের মুক্তির জন্য প্রাণ দিতে কুণ্ঠাবোধ করবেন না, ক্যাপ্টেন ওলি আহমদ আমাদের মাঝে খবর আদান-প্রদান করতেন। জেসিও এবং এনসিওরাও দলে দলে বিভক্ত হয়ে আমার কাছে আসতে থাকে। তারাও আমাকে জানায় যে, কিছু একটা না করলে বাঙালী জাতি চিরদিনের জন্য দাসে পরিণত হবে। আমি নীরবে তাদের কথা শুনলাম। কিন্তু আমি ঠিক করেছিলাম, উপযুক্ত সময় এলেই আমি মুখ ঘুরাব। সম্ভবত ৪ মার্চ আমি ক্যাপ্টেন ওলি আহমদকে ডেকে নেই। আমাদের ছিল সেটা প্রথম বৈঠক। আমি তাকে সোজাসুজি বললাম, সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু করার সময় দ্রুত একমত হন। আমরা পরিকল্পনা তৈরি করি এবং প্রতিদিনই আলোচনা বৈঠকে মিলিত হতে শুরু করি।

৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ঘোষণা আমাদের কাছে এক গ্রীন সিগন্যাল বলে মনে হলো। আমরা আমাদের পরিকল্পনাকে চূড়ান্ত রূপ দিলাম। কিন্তু তৃতীয় কোনো ব্যক্তিকে তা জানালাম না। বাঙালী ও পাকিস্তানী সৈনিকদের মাঝেও উত্তেজনা ক্রমেই চরমে উঠছিল। ১৩ মার্চ শুরু হলো বঙ্গবন্ধুর সাথে ইয়াহিয়ার আলোচনা। আমরা সবাই ক্ষণিকের জন্য স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। আমরা আশা করলাম পাকিস্তানী নেতারা যুক্তি মানবে এবং পরিস্থিতির উন্নতি হবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে পাকিস্তানীদের সামরিক প্রস্তুতি হ্রাস না পেয়ে দিন দিনই বৃদ্ধি পেতে শুরু করল। প্রতিদিনই পাকিস্তান থেকে সৈন্য আমদানী করা হলো। বিভিন্ন স্থানে জমা হতে থাকল অস্ত্রশস্ত্র আর গোলাবারুদ। সিনিয়র পাকিস্তানী সামরিক অফিসাররা সন্দেহজনকভাবে বিভিন্ন গ্যারিসনে আসা-যাওয়া শুরু করল। চট্টগ্রামে নৌ-বাহিনীতে শক্তি বৃদ্ধি করা হলো। ১৭ মার্চ স্টেডিয়ামে ইবিআরসির লেফটেন্যান্ট কর্নেল এমআর চৌধুরী, আমি, ক্যাপ্টেন ওলি আহমদ ও মেজর আমিন চৌধুরী এক গোপন বৈঠকে মিলিত হলাম। এক চূড়ান্ত পরিকল্পনা গ্রহণ করলাম। লেঃ কর্নেল চৌধুরীকে অনুরোধ করলাম নেতৃত্ব দিতে। দুদিন পর ইপিআরের ক্যাপ্টেন (এখন মেজর) রফিক আমার বাসায় গেলেন এবং ইপিআর বাহিনীকে সঙ্গে নেয়ার প্রস্তাব দিলেন। আমরা ইপিআর বাহিনীকেও পরিকল্পনাভুক্ত করলাম। এর মধ্যে পাকিস্তানী বাহিনীও সামরিক তৎপরতা শুরু করার চূড়ান্ত প্রস্তুতি গ্রহণ করল। ২১ মার্চ জেনারেল আবদুল হামিদ খান গেল চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্টে। চট্টগ্রামে সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণের চূড়ান্ত পরিকল্পনা প্রণয়নই তার এই সফরের উদ্দেশ্য। সেদিন ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট সেন্টারের ভোজসভায় জেনারেল হামিদ ২০তম বালুচ রেজিমেন্টের কমান্ডিং অফিসার লেফটেন্যান্ট কর্নেল ফাতমীকে বলল– ফাতী, সংক্ষেপে, ক্ষিপ্রগতিতে আর যত কম সম্ভব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লোক ক্ষয় করে কাজ সারতে হবে। আমি এই কথাগুলো শুনেছিলাম। ২৪ মার্চ ব্রিগেডিয়ার মজুমদার ঢাকা চলে গেলেন। সন্ধ্যায় পাকিস্তানী বাহিনী শক্তি প্রয়োগে চট্টগ্রাম বন্দরে যাওয়ার পথ করে নিল। জাহাজ সোয়াত থেকে অস্ত্র নামানোর জন্যেই বন্দরের দিকে ছিল তাদের এই অভিযান। পথে জনতার সাথে ঘটল তাদের কয়েক দফা সংঘর্ষ। এতে নিহত হলো বিপুল সংখ্যায় বাঙালী। দীর্ঘ প্রতীক্ষিত সশস্ত্র সংগ্রাম যে কোনো মুহূর্তে শুরু হতে পারে এ আমরা ধরেই নিয়েছিলাম। মানসিক দিক দিয়ে আমরা ছিলাম প্রস্তুত। পরদিন আমরা পথের ব্যারিকেড অপসারণের কাজে ব্যস্ত ছিলাম। তারপর এল সেই কালো রাত। ২৫ ও ২৬ মার্চের মধ্যবর্তী কালো রাত। রাত ১১টায় আমার কমান্ডিং অফিসার আমাকে নির্দেশ দিল নৌ-বাহিনীর ট্রাকে করে চট্টগ্রাম বন্দরে যেয়ে জেনারেল আনসারীর কাছে রিপোর্ট করতে। আমার সাথে নৌ-বাহিনীর পাকিস্তানী প্রহরী থাকবে তাও জানানো হলো। আমি ইচ্ছা করলে আমার সাথে আমার তিনজন লোক নিয়ে যেতে পারি। তবে আমার সাথে আমারই ব্যাটেলিয়নের একজন পাকিস্তানী অফিসারও থাকবে। অবশ্য কমান্ডিং অফিসারের মতে সে যাবে আমাকে গার্ড দিতেই। এ আদেশ পালন করা আমার পক্ষে ছিল অসম্ভব। আমি বন্দরে যাচ্ছি কিনা তা দেখার জন্য একজন লোক ছিল। আর বন্দরে আমার প্রতীক্ষায় ছিল জেনারেল আনসারী। হয়তো বা আমাকে চিরকালের মতই স্বাগত জানাতে। আমরা বন্দরের পথে বেরুলাম। আগ্রাবাদে আমাদের থামতে হলো। পথে ছিল ব্যারিকেড। এই সময়ে সেখানে এল মেজর খালেকুজ্জামান চৌধুরী। ক্যাপ্টেন অলি আহমদের কাছ থেকে এক বার্তা নিয়ে এসেছে। আমি রাস্তায় হাঁটছিলাম। খালেক আমাকে একটু দূরে নিয়ে গেল। কানে কানে বলল, তারা ক্যান্টনমেন্ট ও শহরে সামরিক তৎপরতা শুরু করেছে। বহু বাঙালিকে তারা হত্যা করেছে। এটা ছিল একটা সিদ্ধান্ত গ্রহণের চূড়ান্ত সময়।

কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে আমি বললাম— আমরা বিদ্রোহ করলাম। তুমি ষোলশহর বাজারে যাও। পাকিস্তানী অফিসারদের গ্রেফতার করো। অলি আহমদকে বল ব্যাটেলিয়ান তৈরি রাখতে, আমি আসছি। আমি নৌ-বাহিনীর ট্রাকের নিকট ফিরে গেলাম। পাকিস্তানী অফিসার, নৌ-বাহিনীর চীফ পোর্ট অফিসার ও ড্রাইভারকে জানালাম যে, আমাদের আর বন্দরে যাওয়ার দরকার নেই। এতে তাদের মনে কোনো প্রতিক্রিয়া হলো না দেখে আমি পাঞ্জাবী ড্রাইভারকে ট্রাক ঘুরাতে বললাম। ভাগ্য ভাল, সে আমার আদেশ মানল। আমরা আবার ফিরে চললাম।

ষোলশহর বাজারে পৌছেই আমি গাড়ি থেকে লাফিয়ে নেমে একটা রাইফেল তুলে নিলাম। পাকিস্তানী অফিসারটির দিকে তাক করে বললাম, হাত তোলো, আমি তোমাকে গ্রেফতার করলাম। নৌ-বাহিনীর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লোকেরা এতে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ল। পরমুহূর্তেই আমি নৌবাহিনীর অফিসারের দিকে রাইফেল তাক করলাম। তারা ছিল আট জন। সবাই আমার নির্দেশ মানল এবং অস্ত্র ফেলে দিল। আমি কমান্ডিং অফিসারের জীপ নিয়ে তার বাসার দিকে রওনা দিলাম। তার বাসায় পৌঁছে হাত রাখলাম কলিং বেলে। কমান্ডিং অফিসার পাজামা পরেই বেরিয়ে এল। খুলে দিল দরজা। ক্ষিপ্রগতিতে আমি ঘরে ঢুকে পড়লাম এবং গলাসুদ্ধ তার কলার টেনে ধরলাম। দ্রুতগতিতে আবার দরজা খুলে কর্নেলকে আমি বাইরে টেনে আনলাম। বললাম, বন্দরে পাঠিয়ে আমাকে মারতে চেয়েছিলে? এই আমি তোমাকে গ্রেফতার করলাম। এখন লক্ষ্মীসোনার মত আমার সঙ্গে এসো। সে আমার কথা মানল। আমি তাকে ব্যাটেলিয়নে নিয়ে এলাম। অফিসারদের মেসে যাওয়ার পথে আমি কর্নেল শওকতকে (তখন মেজর) ডাকলাম। তাকে জানালাম আমরা বিদ্রোহ করেছি। শওকত আমার হাতে হাত মিলাল।

ব্যাটেলিয়নে ফিরে দেখলাম, সমস্ত প্যাকিস্তানী অফিসারকে বন্দী করে একটা ঘরে রাখা হয়েছে। আমি অফিসে গেলাম। চেষ্টা করলাম লেফটেন্যান্ট কর্নেল এমআর চৌধুরীর সাথে আর মেজর রফিকের সাথে যোগাযোগ করতে। কিন্তু পারলাম না। সব চেষ্টা ব্যর্থ হলো। তারপর রিং করলাম বেসামরিক বিভাগের টেলিফোন অপারেটরকে। তাকে অনুরোধ জানালাম ডেপুটি কমিশনার, পুলিশ সুপারেনটেনডেন্ট, কমিশনার, ডিআইজি ও আওয়ামী লীগ নেতাদের জানাতে যে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের অষ্টম ব্যাটেলিয়ন বিদ্রোহ করেছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করবে তারা।

এদের সবার সাথেই আমি টেলিফোনে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছি। কিন্তু কাউকেই পাইনি। তাই টেলিফোন অপারেটরের মাধ্যমেই আমি তাদের খবর দিতে চেয়েছিলাম। অপারেটর সানন্দে আমার অনুরোধ রক্ষা করতে রাজি হলো। সময় ছিল অতি মূল্যবান। আমি ব্যাটেলিয়নের অফিসার, জেসিও, আর জওয়ানদের ডাকলাম, তাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলাম। তারা সবাই জানত। আমি সংক্ষেপে সব বললাম এবং তাদের নির্দেশ দিলাম সশস্ত্র সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে। তারা সর্বসম্মতিক্রমে হৃষ্টচিত্তে এ আদেশ মেনে নিল। আমি তাদের একটা সামরিক পরিকল্পনা দিলাম। তখন রাত ২টা বেজে ১৫ মিনিট। ২৬ মার্চ ১৯৭১ সাল। রক্ত আখরে বাঙালির হৃদয়ে লেখা একটা দিন। বাংলাদেশের জনগণ চিরদিন স্মরণ রাখবে এই দিনটিকে। স্মরণ রাখতে ভালোবাসবে। এই দিনটিকে তারা কোনোদিন ভুলবে না, কো-ন-দি-ন না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাংলাদেশের স্বাধীনতা-ঘোষণা সম্পর্কে মার্কিন দলিল

জেনারেল জিয়া তাঁর লেখায় বেশ ক'টি জিনিস স্পষ্ট করতে পেরেছেন, যা আমরা ভাল করে জানতাম না। ১. বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণটি তাঁর কাছে স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু করার গ্রীন সিগন্যাল বলে মনে হয়েছিল। লক্ষণীয় যে, জিয়াউর রহমান তাঁর লেখায় শেখ মুজিবকে বঙ্গবন্ধু বলে দুবারই অভিহিত করেছেন। ২. তিনি নিজেও তাঁর সহকর্মী এবং অধীনস্থ সৈনিকদের আসন্ন স্বাধীনতা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করতে শুরু করেছিলেন। ৩. পাকসেনারা যে বাংলাদেশে অবস্থানরত বিহারিদের নির্বিচারে বাঙালি নিধন করার জন্য ব্যবহার করতে শুরু করেছিলেন, তাঁর লেখা থেকে সেই সত্যটাও বেরিয়ে এসেছে। আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে আমি সে কথা বলেছি। ২৭ মার্চ আমরা নিহত দার্শনিক জি সি দেবের বাসা থেকে বেরিয়ে যে সেনা কনভয়টির সম্মুখীন হয়েছিলাম, সেখানে পাকবাহিনীর সঙ্গে রাইফেল হাতে সিভিল বিহারিরাও ছিল। শুধু ঢাকায় নয়, এটা যে চট্টগ্রামেও ছিল তা জানা গেল জিয়ার লেখা পড়ে।

কিন্তু খুব বড় রকমের একটা অস্পষ্টতা রয়ে গেছে তাঁর লেখায়। সেটি হচ্ছে, তিনি তাঁর রচনার শেষে স্পষ্ট করে বলেননি, ২৬ মার্চ ১৯৭১ সালের ২টা ১৫ মিনিটে বাংলাদেশে কী এমন ঘটনা ঘটে গিয়েছিল যে, বাংলাদেশের মানুষ চিরদিন ঐ দিনটিকে স্মরণ রাখবে এবং কেনইবা তারা ঐ দিনটিকে কোনোদিন ভুলবে না। তাঁর ভাষায়... কো-নো-দি-নো না। আমরা জানি ২৬ মার্চ হচ্ছে আমাদের স্বাধীনতা দিবস। ১৯৭৪ সালে জিয়া যখন তাঁর স্মৃতিকথামূলক এই লেখাটি তৈরি করেছেন, তখন তিনিও তা জানতেন। প্রশ্ন জাগে, তাহলে তাঁর লেখাটিতে তিনি সে কথা অস্পষ্ট রাখলেন কেন? বঙ্গবন্ধু কর্তৃক বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার সংবাদটি কি তবে তিনি ঐ রাতের ২টা ১৫ মিনিটে জেনে গিয়েছিলেন? নাকি তাঁর অধীনস্থ সৈনিকদের বিদ্রোহ করার জন্য তিনি ঐ রাতে যে আহ্বান জানিয়েছিলেন, সেই আহ্বানক্ষণটাকেই ইঙ্গিত করলেন? তাঁর রচনার ঐ অস্পষ্টতা শুধু যে বিভ্রান্তির জন্ম দেয় তা নয়, স্বাধীনতার ঘোষক হিসেবে বঙ্গবন্ধুর বিপরীতে যারা জিয়াকে প্রতিষ্ঠিত করার কথা ভাবেন, তাদের দাবিকেও দুর্বল করে।

মার্কিন সরকারের ডিফেন্স ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি সম্প্রতি ১৯৭১ সালের কিছু গোপন দলিল প্রকাশ করেছে। সেখানে স্পষ্ট করে মার্কিন সরকারকে ঢাকা অফিস থেকে জানানো হয়েছে যে, ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ ২টা ৩০ মিনিটে শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন। হোয়াইট হাউস সেই বার্তাটি পেয়েছে ৩টা ৫৫ মিনিটে। সুতরাং মার্কিন সরকারের প্রকাশিত গোপন দলিলের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সঙ্গে জিয়া বর্ণিত সময়ের কিছুটা মিল পাওয়া যাচ্ছে।

নিচে মার্কিন সরকারের বাংলাদেশ সম্পর্কিত ১৯৭১ সালের গোপন দলিলটির অনুলিপি দেয়া হলো।

THE GOVERNMENT OF USA

DEFENCE INTELLIGENCE AGENCY

OPERATIONAL INTELLIGENCE DIVISION

DL-2

DIA REPORT

WHITE HOUSE SITUATION ROOM

MAR 26 PM 3:55

Date : 26 March, 1971

Time : 1430 EST

SUBJECT : Civil War in Pakistan

Reference :

1. Pakistan was thrust into civil war today when Sheikh Mujibur Rahman proclaimed the east wing of the two-part country to be 'the sovereign independent People's Republic of Bangladesh'. Fighting is reported heavy in Dhaka and other eastern cities where the 10,000-men paramilitary East Pakistan Rifels has joined police and private citizens in conflict with an estimated 23,000 West Pakistani regular army troops. Continuing reinforcements by sea and air combined with the government's stringest martial law regulations illustrate Islamabad's commitment to preserve the union by force. Because of logistical difficulties, the attempt will probably fail, but not before heavy loss of life results.
2. Indian officials have indicated that they would not be drawn into a Pakistani civil war, even if the east should ask for help. Their intentions might be overruled, however, if the fever of Bengali nationalism spills across the border.
3. Seikh Mujibur Rahman is little interested in foreign affairs and would co-operate with the United States if he could. The West's violent suppression, however, threatens to radicalize the East to the detirment of US interests. The crisis has exhibited anti-American facets from the begining and both sides will find the United States a convinient scapegoat.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

AMARBOI.COM

DISTRIBUTION
White House Sit Room (LDX)
Depertment of State RCI (LDX)
Director of CIA Opns Cen (LDX)
Released by Jhon J. Pavelle, JR
Captain, USN
DI-4/71564
Prepared by Jhon B Hunt
Major, USA
D1-4A3/25009

The above despatch entitled 'Civil war in East Pakistan' was sent by US defence Intelligence Agency in Dhaka on 26 March, 1971 at 3:55 pm EST.

The document mentions about the proclamation of independence by Sheikh Mujibur Rahman in which he, apart from declaring East Pakistan as sovereign and independent state, named the state as People's Republic of Bangladesh.

আশা করি, অতঃপর বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা নিয়ে সৃষ্ট বিতর্কের অবসান হবে। মনে রাখতে হবে যে একটি জাতির স্বাধীনতার ঘোষক দুই জন হতে পারে না। এবং তা পারে না বলে নয়, বাস্তবেও তেমনটি হয়নি বলেই। ২৭ মার্চ অপরাহ্নে চট্টগ্রামের কালুরঘাটস্থ স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র থেকে শেখ মুজিবের পক্ষে তৎকালীন মেজর জিয়াউর রহমান যে 'স্বরচিত স্বাধীনতার ঘোষণাটি' প্রচার করেছিলেন, সেটি ছিল বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণারই পুনরাবৃত্তি। মহান জাতীয় নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামের সঙ্গে সংযুক্তিসূত্রেই জিয়া মুহূর্তে মূল্যবান হয়ে উঠেছিলেন। অন্যথায় নহে। তবে পুনরাবৃত্তি হলেও, প্রিয়-গানের মতোই জিয়ার ঐ ঘোষণাটিও একাত্তরের মুক্তিকামী বাঙালির কাছে যথেষ্ট উদ্দীপক ও মূল্যবান বলেই মনে হয়েছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুক্তিযুদ্ধের-ঘোষক বিতর্ক : অবসানপর্ব

আমার চলমান রচনায় 'মুক্তিযুদ্ধের-ঘোষক বিতর্ক' নিয়ে আমি সময়ের যে অপচয় করেছি, তার জন্য আমার খুব খারাপ লাগছে। কিন্তু তা না করে আমার উপায়ও ছিল না। ইতিহাস বিকৃতির যাঁতাকলে পিষ্ট হয়ে আমাদের নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা যে বিভ্রান্তিতে ভুগছে, তা থেকে তাদের চিত্তকে মুক্ত করা প্রয়োজন। আমার পাঠক আমার ওপর সত্যনিষ্ঠ ইতিহাস জানবার যে প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছেন, আমি তাদের সে-প্রত্যাশা পূরণ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের গৌরবময় ইতিহাসের পাতা থেকে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করার এই বিরক্তিকর কাজটি যে আমাকে করতে হবে, তা জানতাম বলেই এতদিন সেই দায় এড়িয়ে চলার চেষ্টা করেছি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পারা গেল না। কী আর করা যাবে, বিধাতার ইচ্ছা বলে কথা। মাতৃকুলরক্তসূত্রে মনসামঙ্গলের আদি কবি কানাহরি দত্ত-র মতো বাঙালির ইতিহাস রচয়িতা নীহার রায়-অসীম রায়ের সঙ্গে যে সংযুক্ত তার পক্ষে কাব্য বা ইতিহাস কোনোটাই এড়ানোর উপায় থাকে না। মনে হয় আমার রক্ত পরীক্ষা করলে কাব্য ও ইতিহাস— এই দুই ব্যাধির জীবাণুই কমবেশি পাওয়া যাবে। রক্তের দোষই যদি না হবে, তবে ইতিহাসনিষ্ঠ আত্মজীবনী লিখতে যাব কোন আক্কেলে?

'আমার কণ্ঠস্বর' পাঠ করে প্রয়াত শিশিরময় ঘোষ ও অন্নদাশংকর রায় আমাকে এমন উস্কানি দিয়ে গেছেন, যে তাঁদের মৃত্যুর পরও আমি ভাবতে পারছি না যে তাঁরা আজ আর বেঁচে নেই। আমার কেবলই মনে হচ্ছে আমার এই রচনাটি তাঁরা দুজনই পড়বেন। ওঁরা দুজনই আমাকে আমার আত্মজীবনীর পরবর্তী খণ্ড লেখার জন্য বলেছিলেন। আমি বিলক্ষণ জানি, আমার জীবনকথা নয়, তিরিশ লক্ষ প্রাণের মূল্যে মুক্ত বাংলাদেশের মানুষের জীবনবেদ জানাটাই ছিল তাঁদের অন্বিষ্ট। তাঁরা বেঁচে থাকলে আমি খুব খুশি হতাম। আলস্যহেতু বিলম্বে লেখাটি শুরু করার কারণে আমার এই দুই প্রিয় মনস্বী পাঠককে আমি হারিয়েছি। হারিয়েছি আমার আরেক প্রিয়জন, কবি শামসুর রাহমানকে। তিনিও আমাকে লিখতে বলেছিলেন। আত্মজীবনী আর লিখব না, তাঁকে এমন ধারণাই আমি দিয়েছিলাম। আজ তাঁদের কথা আমার খুব মনে পড়ছে।

আপাতত মুক্তিযুদ্ধের ঘোষক বিতর্কের ইতি টানছি আমার প্রিয় শিক্ষক যতীন সরকারের লেখা 'প্রথম আলো' পত্রিকা কর্তৃক বিবেচিত ১৪১১ সালের বর্ষসেরা গ্রন্থ 'পাকিস্তানের জন্মমৃত্যু-দর্শন' গ্রন্থ থেকে বিবেচ্য বিষয়টি নিয়ে লেখা তাঁর বক্তব্য উদ্ধৃত করে। ১৯৭১ সালের আন্দোলন-উত্তাল মার্চ মাসে অধ্যাপক যতীন সরকার ময়মনসিংহে ছিলেন। তিনি তখন নাসিরাবাদ কলেজে অধ্যাপনা করতেন। তখনকার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে তিনি তাঁর বর্ষসেরা-বিবেচিত ঐ গ্রন্থটিতে লিখেছেন :

> ছাত্রকর্মিরা ট্রাকে করে সারাদিন ধরে মাইকে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণার বার্তাটি প্রচার করে চলল। পঁচিশে মার্চের রাতে গ্রেফতার হওয়ার আগে বঙ্গবন্ধু যে-বার্তাটি ইপিআর-এর ওয়্যারলেসযোগে চট্টগ্রামে পাঠিয়েছিলেন, সেটি ছাব্বিশ তারিখেই ময়মনসিংহে পৌঁছে গিয়েছিল। সেদিন ছাত্রলীগের পাশাপাশি সেই বার্তা প্রচার করতে দেখলাম এনএসএফ কর্মিদেরও। ...
>
> সাতাশ তারিখেই সন্ধ্যায় চট্টগ্রাম বেতার থেকে মেজর জিয়ার কণ্ঠে স্বাধীনতার কথা শুনলাম। যারা নিজের কানে জিয়ার কথাগুলো শোনেনি তাদের কাছেও প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই অন্যের মুখ থেকে সে কথাগুলো পৌঁছে গেল। সকলের উৎসাহের পালে লাগল নতুন হাওয়া। নিরস্ত্র বাঙালির মুক্তিযুদ্ধে একজন সশস্ত্র বাঙালির যোগদানের ঘটনাটির গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। আর তার কণ্ঠের ধ্বনি তো সেদিন বাঙালির কানে ধ্বনিত হয়েছিল মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্রের মতো।
>
> জিয়ার ঐ ভাষণটি নিয়ে পরে অনেক ধূম্রজাল ছড়ানো হয়েছে। তাঁকে 'স্বাধীনতার ঘোষক' প্রতিষ্ঠিত করার প্রাণপণ প্রয়াস চালানো হয়েছে। অথচ এ-রকম করার কোনো প্রয়োজন ছিল না। তাঁর আপন কৃতিই তাঁকে ইতিহাসে যথাযোগ্য আসনে প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য যথেষ্ট ছিল। বেতারের ক্ষীণ তরঙ্গে ভেসে আসা কণ্ঠধ্বনি বাঙালির অন্তরে মুক্তি সৈনিক জিয়ার জন্যে প্রীতি ও কৃতজ্ঞতার আসন বিছিয়ে দিয়েছিল মুক্তি সংগ্রামের শুরুতেই। কিন্তু জিয়ার অতিভক্তের দল চাইল তাঁকে এমন একটি আসনে বসাতে যেটি তাঁর কোনোমতেই প্রাপ্য নয়। বঙ্গবন্ধুকে স্থানচ্যুত করে জিয়াকে প্রতিষ্ঠিত করার স্পর্ধাও তারা দেখাল। আর এ-রকমটি করে তারা জিয়াউর রহমানের আসল ভূমিকাটিকেও আড়াল করে দিল, তাঁর প্রাপ্য আসনটি থেকেও তাঁকে টেনে নামাল, তাঁর তর্কাতীত মর্যাদাকে বিতর্কিত করে ফেলল।
>
> (পৃ: ৩৬২-৩৬৩)

পবিত্র ধর্মগ্রন্থে সীমা লংঘনকারীদের কঠোর ভাষায় সতর্ক করা হয়েছে।

নদীর এপার কহে ছাড়িয়া নিশ্বাস, ওপারেতে যত সুখ আমার বিশ্বাস। এপারের মৃত্যুপুরী পেছনে ফেলে বুড়িগঙ্গা নদীর ওপারে পৌঁছেই ঐ কাব্যকথাগুলো নতুন করে মনে পড়ল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র কাজী শাহাবুদ্দিন শাজাহান, ওর ডাক নাম ছিল বেবী, বেবী নামেই ওকে আমরা জানতাম। ওর আসল নামটি জেনেছি বর্তমান লেখার সূত্রে বাচ্চুর কাছ থেকে, নাসিরউদ্দিন ইউসুফ বাচ্চু (নাট্যকার, মুক্তিযোদ্ধা ও সাংস্কৃতিক সংগঠক) রাইসুল ইসলাম আসাদ (মুক্তিযোদ্ধা ও প্রখ্যাত অভিনেতা) – ওরা সপরিবারে ঢাকা থেকে পালাচ্ছিল। বাচ্চু বলল, ওরা আরও ভিতরের দিকে চলে যাবে। সেখানে সাংবাদিক, প্রখ্যাত রবীন্দ্রসংগীতে বিশেষজ্ঞ ওয়াহিদুল হকদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাড়ি। পরে জেনেছি, ওদের মাথায় বহন করা লেপ-তোষকের ভিতরে রাজারবাগ পুলিশ লাইন থেকে পালিয়ে যাওয়া পুলিশের দেয়া ৭টি রাইফেল ছিল।

পিলপিল করে পিঁপড়ার মতো সারি বেঁধে চষাক্ষেতের আল ও ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের সড়কপথ ধরে মানুষ ছুটছে অজানা গন্তব্যের দিকে। কেউ একটু জিরিয়ে নিচ্ছে পথের পাশে। অনেকেই জানে না তাদের গন্তব্য। জানে না কোথায় তাদের একটু নিরাপদ আশ্রয় মিলবে শেষ পর্যন্ত। তবু তাদের চোখে মুখে ঢাকা নামক হাবিয়া দোজখ থেকে প্রাণ নিয়ে নদীর ওপারে পালিয়ে আসতে পারার অপার আনন্দ ও স্বস্তি। এখানে যত কষ্টই হোক, বিশ্ববর্বর পাকসেনারা তো আর নেই!

সন্ধ্যার দিকে একটা ছোট্ট বাজারের মধ্যে আমাদের দেখা হয় খসরু-মন্টুর সঙ্গে। ছাত্রলীগের এই দুজন জঙ্গী নেতা তখন পরস্পরের হরিহর আত্মা। তারা দল বেঁধে চলেছে। দলে আরও যারা ছিলেন তারা হলেন মোস্তফা মহসীন মন্টুর বড় ভাই সেলিম, ছাত্রলীগ নেতা আফতাব (জাসদ-নেতা, ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির প্রাক্তন ভিসি, যিনি কিছুদিন আগে তাঁর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কোয়ার্টারে রহস্যজনকভাবে নিহত হন) ও রায়হান ফেরদৌস মধু। আরও বেশ ক'জন ছিলেন, কিন্তু তাদের কারও নাম আমার মনে নেই। আদের সঙ্গে কিছু হালকা ও ভারী অস্ত্রও ছিল। খসরুর হাতে একটি এলএমজি। তাঁরা আমাদের জানালেন যে, তাঁরা মুক্তিযুদ্ধে যাচ্ছেন। বাংলাদেশকে স্বাধীন করার জন্য তারা পাকসেনাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন। আমি তাদের জানাই যে, কিছুক্ষণ আগে আমরা স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র নামে একটি বেতার কেন্দ্র থেকে শুনেছি, জনৈক মেজর জিয়া শেখ মুজিবের নামে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন। শুনে সবাই জয় বাংলা বলে চিৎকার করে সন্ধ্যার আকাশ কাঁপিয়ে আনন্দ-উল্লাস প্রকাশ করে রেডিওর নব ঘোরাতে শুরু করে, কিন্তু ইথার তরঙ্গে হঠাৎ ভেসে এসে মুহূর্তে হারিয়ে যাওয়া স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্রটিকে আর কিছুতেই খুঁজে পাওয়া যায় না।

ছাত্রলীগের ঐ সশস্ত্র দলটি মুস্তফা মহসীন মন্টুর মামার বাড়ি নারকেলবাগে যাবে। আমরাও তাদের সঙ্গে যাই। ঐ বাড়িতে আমাদের জন্য নৈশকালীন গণখাবারের আয়োজন করা হয়। সারাদিন আমাদের পেটে ভাত পড়েনি। পথে-পথে জল, বিস্কিট, চরের ক্ষেত থেকে তুলে আনা খিরা-শশা আর থ্রি ক্যাসেল সিগারেট খেয়ে কাটিয়েছি। রাতে তারাজ্বলা আকাশের নিচে, সবুজ ঘাসের গালিচায় গোল হয়ে বসে আমরা পেটপুরে ডাল-ভাত-মাছ দিয়ে রাতের আহার সম্পন্ন করি। প্রচণ্ড ক্ষুধার মধ্যে আমরা যা খাই, তাই আমাদের মুখে অমৃতের মতো স্বাদু বলে মনে হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মার্চের বিরুদ্ধে মার্চ

আমার প্রিয় শিক্ষক অধ্যাপক যতীন সরকারের আত্মজৈবনিক গ্রন্থ 'পাকিস্তানের জন্ম-মৃত্যু-দর্শন' থেকে উদ্ধৃত করে, তাঁকে সাক্ষ্য মেনে গত সংখ্যায় 'স্বাধীনতার ঘোষক বিতর্কে'র ইতি টানতে চেয়েছিলাম। কিন্তু হলো না। পারলাম না। অধ্যাপক যতীন সরকারের লেখা পড়ার পর আমার হাতে এল বাংলাদেশের আরেকজন স্বনামধন্য বর্ষীয়ান সাংবাদিক ও বামপন্থী রাজনীতিক শ্রীনির্মল সেনের মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচারণমূলক একটি লেখা। শ্রীনির্মল সেন আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের একজন বিশ্বস্ত সাক্ষী। ২৫ মার্চের মধ্যরাত গতে, অর্থাৎ ইংরেজি ক্যালেন্ডার অনুসারে ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে পাক-বাহিনীর হাতে গ্রেফতার হওয়ার আগে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন কিনা, এ নিয়ে সংশয় প্রকাশ ও ধূম্রজাল প্রচারকারী সাক্ষীগোপালদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে শ্রীনির্মল সেন আমাদের জানাচ্ছেন তাঁর অভিজ্ঞতা :

> "আমি মনে করি, একটি বিশেষ পরিস্থিতিতে ১৯৭১ সালের ২৭ মার্চ স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে মেজর জিয়াউর রহমান একটি ঘোষণা দিয়েছিলেন। ঘোষণাটি তাৎপর্যপূর্ণ এবং সাহসিকতাপূর্ণ। মরহুম জিয়াউর রহমান নিঃসন্দেহে সে জন্য কৃতিত্বের দাবিদার। একটি নির্দিষ্ট সময়ে এবং একটি নির্দিষ্ট প্রেক্ষিতেই এই ঘটনাটি বিবেচ্য। কিন্তু এর বেশি কিছু নয়। প্রকৃতপক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণা হয়েছিল ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ। আজকের সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে। যদিও এই ঘোষণার আনুষ্ঠানিকতা ছিল না। এ ছাড়াও একটি ঘোষণা ২৬ মার্চ রাতে শেখ সাহেব পাঠিয়েছিলেন বেতার মারফত। ঘোষণাটি আমাদের থানার ডাকঘরে এসেছিল। আহ্বান এসেছিল শেখ মুজিবুর রহমানের নামেই। আমি নিজের চোখে সে ঘোষণা দেখেছি। এ ব্যাপারে কারও ধার করা কথা বা তত্ত্ব শুনতে বা বুঝতে আমি রাজি নই। আমি জিয়াউর রহমানের অমর্যাদা করতে চাই না। কিন্তু তাঁর সমর্থকদের তাঁর সীমাবদ্ধতা ও ভূমিকার সঠিক মূল্যায়ন করতে হবে। একটি কথা স্বীকার করতে হবেই যে, স্বাধীনতা সংগ্রাম হয়েছিল শেখ মুজিবুর রহমান ও আওয়ামী লীগের নামে। এ আন্দোলনে মওলানা ভাসানীর গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল। অবদান ছিল বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও কোটি কোটি সাধারণ মানুষের। কিন্তু এ রাজনৈতিক দল বা তাদের নেতাদের নামে কোটি কোটি মানুষ সংগ্রামে নামেনি। তাদের দলীয় সদস্যরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এ সংগ্রামে যোগ দিয়েছে, প্রাণও দিয়েছে অকাতরে। কিন্তু বাংলার মানুষের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাছে প্রথমে দু'টি নামই ছিল উল্লেখযোগ্য। তা হচ্ছে শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগ। ১৯৭১ সালে আমি বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় ঘুরেছি। ঢাকা শহরে পাঁচবার ঢুকেছি। ফরিদপুর, ঢাকা, কুমিল্লার বিভিন্ন এলাকায় গিয়েছি। একাধিকবার সীমান্ত পারাপার করেছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলার মাঠে গিয়ে রাজাকারদের প্যারেড দেখেছি। প্রেসক্লাবের সামনে গিয়ে দেখেছি সত্যি সত্যি প্রেসক্লাব ভবন ধুলিসাৎ হয়েছে কি না। কাছে গিয়ে দেখেছি ভাঙা শহীদ মিনার। গ্রামে গিয়ে দেখেছি মুক্তিবাহিনীতে যাবার প্রতিযোগিতা। কান্না দেখেছি অসংখ্য তরুণের। পিতা-মাতা ছেড়ে যাবার দুঃখ নয়, মুক্তিবাহিনীতে যেতে না পেরে দুঃখ। ওদের কাছে পরিচিত ছিল শেখ মুজিবুর রহমান ও আওয়ামী লীগ। অন্য বিশেষ ব্যক্তি বা রাজনৈতিক সংগঠন নয়। তবে সংগ্রামের একপর্যায়ে সকল সংগঠন ছাড়িয়ে উঠেছিল মুক্তিবাহিনী। কোনো দল নয়, মুক্তিবাহিনীই হয়ে উঠেছিল সকলের আদরের ধন। এর সঙ্গে শেখ মুজিবুর রহমানের নামটিও ছিল অচ্ছেদ্য।" (সূত্র : মা জন্মভূমি : পৃ: ৫২-৫৩)

নির্মল সেন তাঁর লেখায় 'অচ্ছেদ্য' শব্দটি চমৎকার কুশলতার সঙ্গে ব্যবহার করেছেন। মায়ের সঙ্গে নাভিযোগে যুক্ত নবজাতকের নাড়ীবন্ধনের অচ্ছেদ্য চিত্রকল্পটি আমাদের মনের পর্দায় ভেসে ওঠে। জানি, বঙ্গবন্ধু ও তাঁর চার ঘনিষ্ঠ সহচরহীন বাংলাদেশে সৃষ্ট রাজনৈতিক শূন্যতা ও অনিশ্চয়তার পটভূমিতে জিয়াউর রহমান যদি ১৯৭৫ সালে রাষ্ট্রক্ষমতায় আসীন না হতেন, বা ঘটনাপ্রবাহে তাঁর ওপর বাংলাদেশের রাষ্ট্রক্ষমতা 'অর্পিত' না হতো,– তাহলে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টির কোনো সুযোগই কখনও তৈরি হতো না।

বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে নয়, জিয়ার নির্দেশে বা আহ্বানে মুক্তিযুদ্ধ হয়েছে বা তারা মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন বলে যারা দাবি করেন, তারা ভুলে থাকতে ভালোবাসেন এই নিন্দনীয় সত্যটি যে, নিজেকে 'স্বাধীন বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকারপ্রধান' নিযুক্ত করে মেজর জিয়া যে-ঘোষণাটি স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচার করেছিলেন, তার পরমায়ু ছিল খুব বড়জোর ১২ ঘণ্টা। তার বেশি নয়। 'বহির্বিশ্বে ঘোষণাটির গ্রহণযোগ্যতা ও গুরুত্ব বাড়বে'– এই খোঁড়া যুক্তিতে মেজর জিয়া তাঁর ঘোষণাটিকে খরস্রোতা কর্ণফুলীর ওপারে নিয়ে যেতে পারেননি। চট্টগ্রামের আওয়ামী লীগের নেতাদের (আওয়ামী লীগ নেতা একে খান ও ড. এআর মল্লিক) চাপের মুখে বারো ঘণ্টার মধ্যেই 'মহান নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের পক্ষে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা' করে মেজর জিয়া সেদিন তাঁর ঐতিহাসিক ভ্রান্তি মোচন করেছিলেন এবং তাঁর পরবর্তী আচরণ হয়ে উঠেছিল আত্মরক্ষামূলক। তাই সেদিনের বাস্তবতায় ঐ ঘোষণা প্রচারের গৌরবকে পুঁজি করে বঙ্গবন্ধুর বিকল্প নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা করার মতো সুযোগ জিয়া নিজেও তৈরি করতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পারেননি। তাই ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল মুজিবনগরে বাংলাদেশের প্রবাসী সরকার গঠিত হলে, মুজিবনগর সরকারের অধীনে একজন সেক্টর কমান্ডার হিসেবে নিয়োগ লাভ করেই তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন। বঙ্গবন্ধুকে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপ্রধান ও সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক করে গঠিত মুজিবনগর অস্থায়ী প্রবাসী সরকারের সঙ্গে মেজর জিয়ার কোনোরকমের মতবিরোধের কথাও আমরা কখনও শুনিনি।

লক্ষণীয় যে, ২৬ মার্চ জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান যে ভাষণ প্রদান করেন, সেখানেও মেজর জিয়া কর্তৃক বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার ব্যাপারটিকে আমলে নেয়া হয়নি বরং আওয়ামী লীগ ও শেখ মুজিবকেই বাংলাদেশকে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন করার অভিযোগে শাস্তি প্রদানের হুমকি দেয়া হয়।

> "President Yahya Khan, broadcasting on the same day, announced the outlawing of the Awami League, a ban on political activity throughout Pakistan, and the imposition of non-cooperation movement as "act of treason", desuaibed Sheikh Mujibur Rahman and his party as "enimies of Pakistan" who wished to break away completely from the country and said that "this crime will not go unpunished".
>
> (KCA, PP 24567)
>
> Among political leaders in West Pakistan, Mr Bhutto accused Sheikh Mujibur Rahman of wanting to establish an independent facist and racist regime in East Pakistan while Khan Abdul Wali Khan described the Awami League's six-point programme as an act of secession and an open act of treason.
>
> (KCA, PP 24568)

তাদের বক্তব্য শুনে মনে হয়, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান বা জুলফিকার আলী ভুট্টো বা ওয়ালী খানরা তখনও বুঝতে পারেননি যে পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রটির খতম তারাবি (চরমপত্রের রচয়িতা এম আর আখতার মুকুলের ভাষায়) হয়ে গেছে। তাঁরা ভেবেছিলেন, ২৫ মার্চের অপারেশন সার্চলাইট অখণ্ড পাকিস্তানকে বাঁচিয়ে রাখতে সক্ষম হবে। পাকনেতারা তখনও বুঝতে পারেননি যে, অন্ধ হলেই প্রলয় বন্ধ থাকে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুবেদার মেজর শওকত আলীকে 'বীরশ্রেষ্ঠ'র মর্যাদা দেওয়া হোক

যেহেতু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্ট কর্তৃক প্রকাশিত বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা সম্পর্কিত গোপন দলিল, ২৬ মার্চ সন্ধ্যায় জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত পাক-প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খানের ভাষণ, জুলফিকার আলী ভুট্টো ও খান আবদুল ওয়ালী খানের বক্তব্য ও আমাদের দেশের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ মানুষের সাক্ষ্য থেকে সন্দেহাতীতভাবে এই সত্য প্রমাণিত হয়েছে যে, ২৫ মার্চের কালরাতে ঢাকায় বর্বর পাকবাহিনী কর্তৃক পরিচালিত 'অপারেশন সার্চলাইট' নামে চিহ্নিত নির্বিচার বাঙালি নিধনের পটভূমিতে বাঙালির সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যথাযথভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা প্রদান করেছিলেন এবং চট্টগ্রামস্থ স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র ছাড়াও বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণাসম্বলিত ঐ বেতার-বার্তাটি ইংরেজি ক্যালেন্ডার অনুযায়ী ২৬ মার্চ-এর বিভিন্ন প্রহরে বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলা শহরে পৌঁছেছিল; — সেহেতু বঙ্গবন্ধু তাঁর ঐ বার্তাটি কীভাবে, কাদের সাহায্যে প্রেরণ করেছিলেন সে-সম্পর্কে কিছু প্রাসঙ্গিক তথ্য বর্তমান রচনার সঙ্গে সন্নিবেশিত করাটা প্রয়োজনীয় বলে মনে করছি। প্রয়োজনীয় মনে করছি, ঐ ঘটনার সাক্ষীসংখ্যা বাড়ানোর জন্য নয়, দরকার বোধ করছি এজন্য যে, বঙ্গবন্ধু কর্তৃক নির্দেশিত হয়ে তাঁর স্বাধীনতার ঘোষণাটি প্রচারের সুমহান দায়িত্ব সম্পাদন করতে গিয়ে পাকবাহিনীর হাতে ধরা পড়ে যাঁরা জীবন দিয়েছেন এবং যাঁরা অমানুষিক অত্যাচার ও নিগ্রহ সয়েছেন, আমাদের রক্তরঞ্জিত পবিত্র ইতিহাসের পাতায় তাঁদের নাম যথাযথ মর্যাদায় লিপিবদ্ধ থাকা বাঞ্ছনীয় বলে মনে করি। চট্টগ্রামের কালুরঘাটস্থ স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত কলাকুশলী ও বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা প্রচারকারী চট্টগ্রামের আওয়ামী লীগ নেতা এমএ হান্নান ও মেজর জিয়াসহ সংশ্লিষ্টদের জাতীয় বীরের মর্যাদা প্রদানের জন্য আমি আমার লেখায় ইতোপূর্বে যে দাবি জানিয়েছি, সেই দাবির সঙ্গে আমি ইপিআরের সেইসব বীর সদস্যদের নামও যুক্ত করতে চাই, যারা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কুশলতার সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণাটি সেদিন বাংলাদেশের বিভিন্ন শহরে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। এক্ষেত্রে যাঁর নাম বাংলাদেশের মানুষ চিরদিন পরম শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে সর্বাগ্রে স্মরণ করবে, করতে হবে, তিনি হলেন সুবেদার মেজর শওকত আলী। আমেরিকার কানসাস ইনস্টিটিউট থেকে ইলেকট্রনিক্সে বিশেষ ট্রেনিংপ্রাপ্ত সিগন্যাল কোরে কর্মরত সর্বোচ্চ পদে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আসীন অত্যন্ত মেধাবী ও দেশপ্রেমিক বীর বাঙালি সুবেদার মেজর শওকত আলী ঐ রাতেই স্বাধীনতার ঘোষণাটি ট্রান্সমিটরত অবস্থায় রাত সোয়া দুইটার দিকে পাকসেনাদের হাতে তাঁর পিলখানাস্থ নিজ গৃহে ধরা পড়েন এবং মোহাম্মদপুরের শরীর চর্চাকেন্দ্রের টর্চার সেন্টারে নিয়ে গিয়ে অকথ্য নির্যাতন করার পর তাঁকে গুলি করে হত্যা করা হয়। মেজর শওকতের সহযোগী হিসেবে পিলখানা থেকে সেদিন আরও যাঁরা ধৃত হয়েছিলেন এবং রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে যাদের হত্যা করা হয়েছিল তাঁরা হলেন– শহীদ সুবেদার মোল্লা, সুবেদার জহুর, সুবেদার আবদুল হাই ও সুবেদার মুন্সি। অলৌকিকভাবে বেঁচে গিয়েছিলেন সুবেদার আইয়ুব।

আমি দাবি করছি, ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু কর্তৃক বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার বার্তাটি প্রচার করতে গিয়ে যাঁরা সেদিন দেশমাতৃকার স্বাধীনতার জন্য প্রাণ দিয়েছেন, তাঁদের মধ্য থেকে শহীদ সুবেদার মেজর শওকত আলীকে 'বীরশ্রেষ্ঠ'র মর্যাদা প্রদান করা হোক। আমাদের উদাসীনতা ও ইতিহাস বিকৃতির কারণে আমাদের জাতীয় বীর সন্তানরা যেন কখনও কবি শামসুর রাহমান কথিত 'কালের ধুলোয়' ঢাকা পড়ে না যান। 'মুক্তির-মন্দির সোপানতলে' আত্মদানকারী বীরদের বীরত্বগাথা আমাদের ভবিষ্যত বংশধরদের সামনে তুলে ধরাটা আমাদের কবি-সাহিত্যিক ও ইতিহাস রচয়িতাদের পবিত্র কর্তব্য বলে আমি মনে করি।

ইতিসমাপ্ত বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাপর্ব।

AMARBOI.COM

বুড়িগঙ্গার ওপারে : মোস্তফা মহসীন মন্টুর মুক্তিযুদ্ধ

প্রিয় পাঠক, আসুন আমরা আবার বুড়িগঙ্গা নদীর ওপারে ফিরে যাই। ওপারে আমরা ২৭ মার্চ থেকে ১ এপ্রিল পর্যন্ত মোট ছয়দিন কাটিয়েছি। সপ্তম দিবসে, রাতের অন্ধকারে পজিশন নিয়ে ২ এপ্রিল শুক্রবারের কাকডাকা ভোরে অখণ্ড পাকিস্তান ও পবিত্র ইসলামের হেফাজতকারী পাকসেনারা ঐ এলাকায় গণহত্যা চালায়, যা জিঞ্জিরা অপারেশন নামে পরিচিত। ঐদিন পাকসেনারা বুড়িগঙ্গা নদীর ওপারে ২৫ মার্চের ঢাকার গণহত্যার পুনরাবৃত্তি ঘটায়। ঢাকা থেকে পালিয়ে গিয়ে বুড়িগঙ্গার ওপারের বিভিন্ন গ্রামে ও হাটবাজারে আশ্রয়গ্রহণকারী এবং স্থানীয় লোকজন মিলিয়ে প্রায় সহস্রাধিক মানুষ ঐ নির্বিচার হত্যাযজ্ঞে পাকসেনাদের হাতে সেদিন নিহত হয়। আহত হয় আরও কয়েক হাজার। ভোর ৫টা থেকে শুরু করে দুপুর ১২টা পর্যন্ত চলে ঐ নিধনযজ্ঞ। তারপর হত্যাক্লান্ত পাকসেনারা তাদের অপারেশন শেষ করে ঢাকায় ফিরে গেলে, পথে-ঘাটে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে থাকা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনেক নারী-পুরুষ, বৃদ্ধ ও শিশুর মৃতদেহ ডিঙিয়ে দুপুরের দিকে আমরা কোনোমতে প্রাণ নিয়ে ঢাকায় ফিরে আসি। সেই জিঞ্জিরা অপারেশনের রোমহর্ষক বর্ণনা আমি পরে বিস্তৃত লিখব।

পূর্বে বলেছি, কোন পটভূমিতে, কীভাবে আমরা ২৭ মার্চ তিন বন্ধু ঢাকা ত্যাগ করে বুড়িগঙ্গা নদীর ওপারে কেরানীগঞ্জ থানার অন্তর্গত জিঞ্জিরায় গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিলাম। নদীর ওপারে আমাদের প্রথম রজনীটি কেটেছিল তৎকালীন ছাত্রলীগ নেতা, বঙ্গবন্ধুর অন্যতম বিশ্বস্ত সহচর, সাহসী মুজিবসেনা মোস্তফা মহসীন মন্টুর মামাবাড়ি নেকরোজবাগে। নেকরোজবাগ নয়, আমার কেন জানি নারকেলবাগ নামটাই স্মরণে আছে। সম্প্রতি (১০ মার্চ ২০০৭) আমি মোস্তফা মহসীন মন্টুর সঙ্গে তাঁর এলিফ্যান্ট রোডের বাড়িতে সাক্ষাৎ করে তাঁর কাছ থেকে ঐ সময়ের অনেক অজানা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানতে পেরেছি, যা আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশ। তিনি জানিয়েছেন, আমরা ২৭ মার্চ যে বাড়িটিতে আশ্রয় নিয়েছিলাম সেটি নেকরোজবাগ গ্রাম, তাঁর মামার বাড়ি। তাঁর নিজের বাড়ি কেরানীগঞ্জের ব্রাহ্মণকীর্তা গ্রামে। তিনি জানিয়েছেন, নেকরোজবাগ নামটা এসেছে নেকরোজ নামের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তির নাম অনুসারে। বুড়িগঙ্গা নদীর ওপারে খুব সুন্দর সুন্দর নামের গ্রাম আছে। বাংলাদেশের কোথায় তা নেই? আমাদের নদ-নদী, হাওড়-বাঁওড়, হাট-বাজার ও গ্রাম-গঞ্জের নামগুলো যেমন অর্থপূর্ণ, তেমনি শ্রুতিমধুর। বুড়িগঙ্গা নদীর ওপারের বেশ কয়েকটি গ্রামের নাম আমার আজও মনে আছে। কিছু নাম আমি ঐ এলাকার মানুষদের কাছ থেকে এবং সম্প্রতি মোস্তফা মহসীন মন্টুর কাছ থেকে জেনেছি। রসুলপুর, জাওলাহাটি, শুভাড্ডা, আসাননগর, নবীনগর, কুইস্যারবাগ, গুলজারবাগ, পটকা-জোর, কালিন্দি, ব্রাহ্মণকীর্তা, খোলামোড়া, কলাতিয়া, সুলতানগঞ্জ। ২৫ মার্চের অকল্পনীয় ও অভাবিত গণহত্যার পর জীবন বাঁচাতে বুড়িগঙ্গার ওপারের এইসব গ্রামেই ঢাকার মানুষজন পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল।

দীর্ঘদিন পর মন্টুর সঙ্গে দেখা হলে আমরা উভয়েই বেশ আবেগকাতর হয়ে পরস্পরকে বুকে জড়িয়ে ধরি। আমরা আমাদের অনেক প্রিয় বন্ধুদের কথা স্মরণ করি, যাদের অনেকেই আজ আর নেই আমাদের মাঝে। মন্টুর বড় ভাই সেলিম তাঁদেরই একজন। তিনি মন্টুর মত ভয়ঙ্কর ছিলেন না, কিছুটা নরম মনের মানুষ ছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র না হলেও ইকবাল হলেই থাকতেন। আমার সঙ্গে খুব ভাল বন্ধুত্ব ছিল তাঁর। তিনি বয়সে আমার চেয়ে একটু বড় ছিলেন, কিন্তু একটা বিশেষ কারণে আমাকে তিনি গুরু বলে সম্বোধন করতেন। তিনি মারা গেছেন ১৯৮৫ সালে। মন্টুর ছোট ভাই হোসেনও মারা গেছে। আমি তাঁদের কথা শ্রদ্ধা ও বেদনার সঙ্গে স্মরণ করি।

আমি যখন মন্টুকে জানাই যে আমি সাপ্তাহিক ২০০০ পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস লিখছি, তখন মন্টু খুব খুশি হন। মুক্তিযুদ্ধের সেই গৌরবময় দিনগুলো স্মরণ করতে গিয়ে তিনি সঙ্গতকারণেই খুব আবেগাপ্লুত হন। তা হওয়ারই কথা। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে রয়েছে তাঁর অত্যন্ত গৌরবজনক ভূমিকা। তাঁর সেই বীরোচিত ভূমিকার কথা আমাদের ইতিহাসে আজও লিপিবদ্ধ হয়নি। ক্রমশ আমাদের আলাপ জমে ওঠে। বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করে তাঁর কাছ থেকে আমি বেশ কিছু অজানা তথ্য জানতে পারি।

আমি প্রথমেই তাঁর কাছে জানতে চাই, ২৫ মার্চের রাতে তিনি কোথায় ছিলেন, কীভাবে কেটেছে তাঁর ঐ রাত্রিটি। আমরা জানতাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের সামরিক প্রশিক্ষণ প্রদানের কাজটি তিনি ও খসরু তদারকি করতেন। তাঁদের সাহস, স্বভাব ও দৃঢ়চিত্ততার কারণে তখন মন্টু-খসরু হয়ে উঠেছিলেন আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের সামরিকায়নের প্রতীক। ১৯৭০ সালের ঐতিহাসিক নির্বাচনে জয়ী বঙ্গবন্ধুর হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর না করে পাক প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান আহূত সংসদ অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করার ঘোষণা দিলে, বলা যায় ১৯৭১ সালের ১ মার্চ থেকেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইকবাল হল ও জগন্নাথ হলের মাঠে ছাত্র-ছাত্রীদের সামরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণের কার্যক্রম শুরু হয়ে গিয়েছিল। রোকেয়া হল ও শামসুন্নাহার হলের মেয়েরাও তখন সশস্ত্র সামরিক প্রশিক্ষণ নিচ্ছিল। মন্টু জানালেন, আসলে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে একটি সশস্ত্র যুদ্ধের জন্য আমরা কিন্তু ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের সময় থেকেই প্রস্তুতি নিতে শুরু করে দিয়েছিলাম।

কীভাবে? আমি জানতে চাইলে মন্টু বলেন, ২০ জানুয়ারি আসাদ শহীদ হয়। ২৪ জানুয়ারি সচিবালয়ের সামনের সড়কে আবদুল গনি রোডে পুলিশের গুলিতে শহীদ হয় কিশোর মতিউর। সেদিনই মিছিলের উত্তেজিত জনতা তৎকালীন প্রাদেশিক রেলমন্ত্রী সুলতান আহমদ ও স্বাস্থ্যমন্ত্রী মং শ প্রু চৌধুরীর বাড়িতে অগ্নিসংযোগ করে এবং ঐ বাড়িগুলোতে প্রহরারত গার্ডদের হাত থেকে তাদের রাইফেলগুলো কেড়ে নেয়। মন্টু দাবি করেন, ঐ রাইফেলগুলোই ছিল আমাদের হাতে আসা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রথম অস্ত্র।

নিরস্ত্র বাঙালি যে সশস্ত্র হয়ে উঠেছিল সেদিনই, তা আমি জানতাম না। জেনে আমি বেশ উত্তেজিত বোধ করি। আমি নিজেও সেই মিছিলে ছিলাম। আমার একটি কবিতায় সেই ঘটনাটি বর্ণিত হয়েছে এভাবে :

'তুমি বললে তাই, আমরা এগিয়ে গেলাম,
নিষ্পাপ কিশোর মরল আবদুল গনি রোডে।
তুমি বললে রাজপথ মুক্তি এনে দেবে,
আমরা ভীষণ দুঃখী, নিপীড়িত শত-অত্যাচারে
গীতাঞ্জলি অকর্মণ্য হবে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমরা তাই রঙিন প্ল্যাকার্ড সাজিয়েছি
মাও সেতুং, গোর্কি-নজরুলে।'

(জনাকীর্ণ মাঠে জিন্দাবাদ : প্রেমাংশুর রক্ত চাই)

আবদুল গনি রোডে পুলিশের গুলিতে নিহত ঐ নিষ্পাপ কিশোরটিই ছিল বকশীবাজারস্থ নবকুমার ইনস্টিটিউটের নবম শ্রেণীর ছাত্র শহীদ মতিউর। মতিউর রহমান মল্লিক। ঐ দিনটি আমাদের ইতিহাসে ছাত্র গণঅভ্যুত্থান দিবস বলে পরিচিত। এর কিছুদিনের মধ্যেই পাকিস্তানের লৌহমানব বলে কথিত প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানকে হটিয়ে দিয়ে জেনারেল ইয়াহিয়া খান পাকিস্তানের রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করেন, যদিও শান্তি পূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হয়েছে বলে তখন দাবি করা হয়। আমি এর সবই জানতাম। কেননা, তখন আমি ছিলাম আক্ষরিক অর্থেই রাজপথের কবি। কিন্তু ঐদিন যে পুলিশের অস্ত্র কেড়ে নেয়া হয়েছিল, এই ঘটনাটি আমার জানা ছিল না। মন্টু বলেন, তারপর নানাভাবে, নানাপথে আমাদের হাতে আরও অস্ত্র আসে। অস্ত্রই অস্ত্র আনে। তখন ক্রমশ ইকবাল হল হয়ে ওঠে আমাদের গোপন অস্ত্রাগার। আমাদের ক্যান্টনমেন্ট। ২৫ মার্চের দিকে আমাদের অস্ত্রাগারে প্রচুর অস্ত্র ও গোলাবারুদ এসে গিয়েছিল। ঐদিন আমি বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে ছিলাম রাত ৯টা পর্যন্ত।

কী আশ্চর্য! আমিও সেদিন বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে রাত ৯টা পর্যন্ত কাটিয়েছি। ২৫ মার্চের রাতে বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে আমাদের অবস্থানের সময়টা মিলে যাওয়ার কারণে হাসতে হাসতে আমি জানতে চাই— সেদিন নেতার সঙ্গে আপনার শেষ কথা কী হয়েছিল, মনে পড়ে? আমার প্রশ্নের উত্তরে মন্টু যা জানান, তা আমি কখনও পূর্বে শুনিনি। বঙ্গবন্ধু মন্টুকে বলেন, তোরা ইকবাল হল থেকে অস্ত্রশস্ত্রগুলো নিয়ে নদীর ওপারে চলে যা, আমি যদি কোনো কারণে সরে যাবার সিদ্ধান্ত নেই, তো আমি হামিদের বাড়িতে যাব। হামিদ? কে তিনি? আমি তো তাঁর নাম কখনও শুনিনি। মন্টু বলেন, এই হামিদ হচ্ছেন হামিদুর রহমান। আওয়ামী লীগের একজন নেতা। উনি সত্তরের নির্বাচনে প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচিত সদস্য ছিলেন। পুরনো ঢাকায় তাঁর বাড়ি। বুড়িগঙ্গা নদীর তীর ঘেঁষে। উনার কয়েকটি লঞ্চ ছিল। তার মানে, বঙ্গবন্ধু ২৫ মার্চের রাতে হামিদ সাহেবের লঞ্চ ব্যবহার করে বুড়িগঙ্গা নদীপথ ধরে কোথাও পালানোর কথাও ভেবেছিলেন? মন্টু বললেন, হ্যাঁ, সে জন্য আমি তারপর থেকে হামিদ সাহেবের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলতাম।

শুনে আমার কেন জানি বাংলার শেষ নবাব সিরাজউদ্দৌলার কথা মনে পড়ে যায়। মীরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতায় এই নদীপথে পালাতে গিয়েই তো ভগবানগোলায় ধরা পড়ে ছিলেন নবাব সিরাজ। কে জানে সেই ঘটনাটির পুনরাবৃত্তির সম্ভাবনার কথা ভেবেই সেই রাতে বঙ্গবন্ধু তাঁর পালানোর, তাঁর নিজের ভাষায় 'সরে যাবার' সিদ্ধান্তটি বাতিল করেছিলেন কি না!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুক্তিযুদ্ধ ও নারী

একাত্তরের মার্চে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের সামরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণের বিষয়টি নিয়ে আমি যখন লিখছিলাম, তখন আকস্মিকভাবেই আমার সঙ্গে রোকেয়া কবীরের কথা হয়। রোকেয়া কবীর আমার নিজ জেলা নেত্রকোনার একটি প্রগতিশীল রাজনৈতিক পরিবারের মেয়ে। একাত্তরে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তেন এবং ছাত্র ইউনিয়নের একজন জঙ্গী সাহসী নেত্রী হিসেবে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর নেতৃত্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেয়েরা সামরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছিল। রোকেয়া কবীর ছিলেন সেই ছাত্রী ব্রিগেডের কমান্ডার। আমি তাঁর কাছ থেকে ছাত্রী ব্রিগেড সম্পর্কে কিছু তথ্য জানতে চাইলে তিনি আমাকে কুরিয়ারযোগে একটি গ্রন্থ পাঠিয়ে দেন। বইটির নাম – 'মুক্তিযুদ্ধ ও নারী'। চমৎকার তথ্যসমৃদ্ধ বই। আমাদের মুক্তিযুদ্ধে নারীদের ভূমিকা কতটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল, বইটিতে তার অকাট্য প্রমাণ পাওয়া যায়। ঐ গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ থেকে আমরা জানতে পারি বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণের পর বাংলার নারী সমাজ কীভাবে একটি অবশ্যম্ভাবী মুক্তিযুদ্ধের জন্য নিজেদের প্রস্তুত করতে শুরু করে দিয়েছিল। আমি ঐ বই থেকে সামান্য অংশ উদ্ধৃত করছি :

> ১ মার্চ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করলে গুলিস্তানের কামানের সামনে দাঁড়িয়ে শেখ মুজিবের প্রতি আবেদন জানিয়ে তৎকালীন ছাত্র ইউনিয়ন নেত্রী অগ্নিকন্যা বেগম মতিয়া চৌধুরী বলেন– 'আজ আর কোনো দল নয়, কোনো মত নয়, নেই কোনো ভেদাভেদ। শেখ সাহেব, আপনার কাছে আমাদের আবেদন, আপনি সিদ্ধান্ত নিন। বাংলার প্রতিটি মানুষ আপনার সে সিদ্ধান্ত মেনে নিয়ে আপনার নেতৃত্বে এগিয়ে যাবে।'
>
> ১৫ মার্চ টেলিভিশনের নাট্যশিল্পীরা সিদ্ধান্ত নেন যে, গণ-অন্দোলনের পরিপন্থী কোনো অনুষ্ঠান প্রচার করা যাবে না। এ সভায় নারীদের মধ্যে বক্তৃতা করেন রওশন জামিল ও আলেয়া ফেরদৌসী।
>
> ১৬ মার্চ বায়তুল মোকাররমে অনুষ্ঠিত মহিলা পরিষদের এক সভায় মালেকা বেগম বলেন, শোষণমুক্ত স্বাধীন বাংলা প্রতিষ্ঠার জন্য দলমত নির্বিশেষে নারী-পুরুষ সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে। সেদিনের সভায় আরও বক্তৃতা করেন ডা. মাখদুমা নার্গিস রত্না ও আয়েশা খানম।
>
> ১৮ মার্চ ঢাকা নার্সিং স্কুলের ছাত্র সংসদের উদ্যোগে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সমিতির সভানেত্রী বেগম শাহজাদী হারুনের সভানেত্রীত্বে অনুষ্ঠিত এক সভায় শেখ মুজিবের নেতৃত্বের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানানো হয় ও স্বাধিকার আন্দোলনে নিহতদের হত্যার বিচার দাবি করা হয়। এ সভায় বক্তৃতা করেন ট্রেনিংপ্রাপ্ত নার্সিং সমিতির সভানেত্রী হোসনে আরা রশিদ, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের জনাব খায়রুল আলম খান, রিজিয়া তরফদার, সুশীলা মহল দাস, মায়া বেগম, কণিকা ভট্টাচার্য প্রমুখ।

১৯ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলার মাঠে ছাত্র ইউনিয়ন (মতিয়া গ্রুপ)-এর তত্ত্বাবধানে গঠিত ও পরিচালিত গণবাহিনীর একটি সমাপনী কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠিত হয়। এতে ১২টি প্লাটুনে বিভক্ত হয়ে ৩৫০ জন ছাত্র-ছাত্রী প্যারেড, শরীর চর্চা ও রাইফেল কৌশলাদি প্রদর্শন করেন। বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলনের পর গণবাহিনীর সদস্য-সদস্যাগণ নুরুল ইসলামের কাছে শপথ বাক্য পাঠ করেন। দেশের এ সংকটময় মুহূর্তে নিজের জীবন বাজি রেখে হলেও দেশ ও জনগণের স্বার্থে সংগ্রামে লিপ্ত থাকার শপথ পাঠ শেষে গণবাহিনী রাইফেল (কিছু আসল ও কিছু কাঠের তৈরি ডামি রাইফেল) কাঁধে রাজপথে মার্চপাস্টে বের হয়। ছাত্র ইউনিয়নের ব্যানারে প্রশিক্ষণ ও মার্চপাস্টে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ছিলেন আয়েশা খানম, রীনা খান, মনিরা আখতার, কাজী রোকেয়া সুলতানা, নাসিমুন আরা হক মিনু, হোসনে আরা, নাজমুন আরা মিনু, রাখীদাশ পুরকায়স্থ, নেলী চৌধুরী, রোকেয়া খাতুন রেখা, নাসিমুন নাহার নিনি, সালেহা বেগম প্রমুখ। ছাত্রী ব্রিগেডের কমান্ডার হিসেবে এতে নেতৃত্ব দেন রোকেয়া কবীর।

এছাড়া ছাত্রলীগের উদ্যোগেও ছাত্রী ব্রিগেড গঠিত হয়। এ ব্রিগেডের নেতৃত্বে ছিলেন মমতাজ বেগম, সালমা বেগম সুরাইয়া, রাফেয়া আখতার ডলি, রাশেদা আমিন, মমতাজ শেফালী প্রমুখ। প্রশিক্ষণ ছাড়াও মার্চ মাসে মুক্তিযুদ্ধের সূচনাপর্বে এসব নারী এলাকাভিত্তিক নারী ব্রিগেড তৈরিতেও ভূমিকা রাখেন।' (মুক্তিযুদ্ধ ও নারী : পৃঃ ৫৩-৫৪)

রাইফেল কাঁধে, দৃপ্ত পায়ে বাংলার নারীদের ঢাকা নগরী প্রদক্ষিণ করার সেই অভূতপূর্ব দৃশ্যটি এখনও আমার চোখে লেগে আছে। রোকেয়া কবীরকে ধন্যবাদ। তাঁর সহযোগিতার কারণে আমার রচনাটি প্রয়োজনের তুলনায় কম হলেও অপূর্ণতার দায় থেকে কিছুটা মুক্তি পেয়েছে।

প্রিয় পাঠক, এবার আমার সঙ্গে পুনরায় বুড়িগঙ্গার ওপারে চলুন। দেখা যাক নদীর ওপারে কী ঘটছে।

চোখ বন্ধ করে স্মৃতিসমুদ্র মন্থন করে মন্টু বললেন, বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে আমি দ্রুত ইকবাল হলে ফিরে আসি এবং হল থেকে আমাদের অবশিষ্ট মালগুলো নদীর ওপারে নিয়ে যাবার উদ্যোগ গ্রহণ করি। তার আগেও বেশকিছু মাল আমি বুড়িগঙ্গা নদীর ওপারে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। সেই মালগুলো দিয়ে কেরানীগঞ্জের স্থানীয় লোকজনকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তখন সামরিক প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছিল। মন্টুর মুখে বারবার 'মাল' শব্দটি শুনে আমার মজা লাগছিল বলে শব্দটির অর্থ জানতে চেয়ে তাকে মাঝপথে থামিয়ে দেইনি। বুঝতে পারছিলাম, 'মাল' কথাটার মানে এখানে কী? লোভনীয় নারী এবং মদের প্রতিশব্দ হিসেবে মাল শব্দটির ব্যবহার আমি বিলক্ষণ জানতাম। কাউকে কাউকে ইঙ্গিত করে কখনও কখনও এই শব্দটি বলেছিও। কিন্তু আগ্নেয়াস্ত্রের প্রতিশব্দ হিসেবে 'মাল' শব্দটির ব্যবহার আমি আগে শুনিনি। হয়তো এই অস্ত্রজগতের সঙ্গে আমার বাস্তব সম্পর্ক ছিল না বলেই। আমার মুচকি হাসি দেখে মন্টু ব্যাপারটা বুঝে নিয়ে নিজেও মুচকি হাসলেন। তারপর নিজেকে শুধরে নিয়ে তিনি যখন অস্ত্র শব্দটি ব্যবহার করলেন, আমি তাকে শুধরে দিয়ে বললাম —'মাল'। তাতে আমাদের খোলামেলা আলোচনার টেবিলে উপস্থিত শ্রোতারাও বেশ মজা পাচ্ছিল। অতিক্রান্ত বেদনার ভার বহন করতে হয় না বলে পঁচিশে মার্চের নির্বিচার গণহত্যার স্মৃতিচারণ করতে বসেও আমরা বেশ মজাই পাচ্ছিলাম। মনে পড়ছিল অনেক পেছনে ফেল আসা আমাদের অখণ্ড অতীতের নানা অম্লমধুর স্মৃতির কথা। যদিও শেষ পর্যন্ত অন্যসব স্মৃতির প্রতি সুবিচার না করে আমরা আলোচনার জন্য বেছে নিচ্ছিলাম শুধুই মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে প্রাসঙ্গিকভাবে যুক্ত স্মৃতিগুলোকেই। কিন্তু মাঝে মাঝে আমার মনে হচ্ছিলই বটে, জাহান্নামে যাক মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিকথা, মন্টুকে উদ্দেশ্য করে রবীন্দ্রনাথের গানের ভাষায় বলি, 'দেখা যদি পেলাই সখা, প্রাণের মাঝে আয়...'।

আমি খুব বেশিক্ষণ সিরিয়াস হয়ে থাকতে পারি না। তা আলোচ্য বিষয় যত গম্ভীরই হোক না কেন। আমি লক্ষ্য করে দেখেছি, হালকা চটুল (মাঝে মাঝে সূক্ষ্ম ও ভারীও যে হয় না, তা নয়) রসের চাটনি না হলে আমি কিছুই আমার মনের ভিতরে নিতে পারি না। আমি নিজে নিতে পারি না বলে আমার পাঠককে সেরকম করে কিছু দিতেও পারি না। মনে হয় পাঠকের প্রাণের ওপর অত্যাচার করার কোনো অধিকার আমার নেই। শোকসভায় গম্ভীর মুখে বসে থেকে মৃতের প্রতি শ্রদ্ধা ও শোক প্রকাশের যে-রীতিটা চালু আছে, আমি অনেক সময়ই তার গাম্ভীর্য বজায় রেখে বসে থাকার ভার সইতে পারিনে। আমার মনে হয়, কান্না জিনিসটা বড়দের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য ছোটদের হয়তো মানায়, কিন্তু বড়দের ক্ষেত্রে এর চেয়ে কদর্য ও বেমানান আর কিছুই হয় না। বড়রা কাঁদবে কেন? প্রকৃতি যাদের ওপর মানুষের কান্না থামানোর ভার দিয়েছে, তারাই যদি সভা করে কাঁদতে বসে– তো আমাদের এই মরজগত চলবে কীভাবে? আমার মতো অতটা স্পষ্ট করে না হলেও, রবীন্দ্রনাথ ঐ বিষয়টা খুব ভাল করে বুঝেছিলেন বলেই তাঁকে আমার এত ভাল লাগে। তাঁর সঙ্গে আমার এই হিসেবটা মিলেছে যে, বেদনা নয়, আনন্দই হচ্ছে জীবনের বড় সত্য। প্রাণের সহস্র বেদনার মধ্যেও আমি তাই মানুষকে জগতের আনন্দযজ্ঞের সন্ধান দিতে ভালোবাসি। বুকের ভিতরে এমন একটা আনন্দসন্ধানী মন গুঁজে দিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঈশ্বরই বা আমাকে পৃথিবীতে কেন পাঠালেন, তা তিনিই ভাল জানেন। নিশ্চয়ই তার প্রয়োজন আছে। আমি আপাত নিষ্ঠুর বলে মনে হওয়া আমার উৎফুল্ল স্বভাবের মধ্যে মহাপ্রকৃতির নীরব গোপন ইচ্ছার প্রতিফলনই যেন দেখতে পাই।

লক্ষ প্রাণের আত্মদানকে ছোট না করেও আমি ভাবি, লক্ষ প্রাণের মূল্যে পাওয়া আমাদের বাংলাদেশই আমাদের কাছে বড় সত্য। একটি জাতির জীবনে একটি স্বাধীন দেশের তুল্য বড় পাওয়া আর কিছু নয়।

ভেবে দেখলাম, একাডেমিক পদ্ধতি ও কানুন মেনে টীকা-টিপ্পনিযুক্ত করে বাংলাদেশের একটি রসকষহীন ইতিহাস রচনা করা আমার পক্ষে সম্ভবও নয়, সে আমার অভীষ্টও নহে।

বুড়িগঙ্গার ওপারে : আমাদের মুক্তিযুদ্ধ

২৫ মার্চের সেই ঐতিহাসিক রজনীর তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করতে আমাদের ইতিহাসবিদ-কবি যখন আপনার কাছে গিয়েছিলেন, তখন আপনি আমাদের কথা কবিকে বলেননি কেন? এমন সম্ভাব্য প্রশ্নের হাত থেকে নিজের অবস্থানকে স্পষ্ট করার জন্য মমম অর্থাৎ মোস্তফা মহসীন মন্টু আমাকে জানালেন যে, ঐ রাতে বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে নেতার পাশে আরও যারা ছিলেন, তাঁরা হলেন শেখ ফজলুল হক মণি, সিরাজুল আলম খান, তোফায়েল আহমদ, খসরু, বঙ্গবন্ধুর দেহরক্ষী মহিউদ্দিন আহমদ প্রমুখ। জনাব তাজউদ্দিন আহমদসহ ঐসব তুখোড় ছাত্রনেতারা যখন সমবেতভাবে বঙ্গবন্ধুকে তাঁর ৩২ নম্বরের বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যাবার জন্য অনুরোধ করছিল, তখনই বঙ্গবন্ধু তাঁর বিশ্বস্ত অনুসারীদের আশ্বস্ত করে বলেছিলেন, ...'যদি আমি শেষ পর্যন্ত এই বাড়ি থেকে অন্য কোথাও 'সরে যাবার' সিদ্ধান্ত নেই, তবে আমি পাগলায় হামিদের বাড়িতে যাবো। সেখান থেকে হামিদের লঞ্চ নিয়ে পরে নদীপথে অন্য কোথাও...'। এখানে লক্ষণীয় যে, বঙ্গবন্ধু মৃত্যুর ঝুঁকির মুখে বসেও 'পলায়ন' ক্রিয়াপদটি ব্যবহার করেননি, ঐ অমর্যাদাকর শব্দটি পরিহার করে তিনি তাঁর মত বাংলার সর্বকালের শ্রেষ্ঠ নেতার জন্য সম্মানসূচক হয়, এমন ক্রিয়াপদটিই যথার্থ কবির মতো খুঁজে নিয়ে, বর্তমান অবস্থান থেকে অন্যত্র 'সরে যাবার' কথাটা বলেছিলেন। এখানে আমরা বঙ্গবন্ধুর মতো ক্ষণজন্মা জননেতার আত্মসম্মানবোধের উচ্চতা সম্পর্কে যেমন একটা ধারণা পাই, তেমনি যথার্থ শব্দচয়নে তাঁর দক্ষতাদৃষ্টে বিস্মিত হই। পালিয়ে যাবার পরিবর্তে পূর্ব অবস্থান থেকে অন্য কোনো অবস্থানে সরে যাবার চিন্তাটাই যে তাঁর মতো নেতার জন্য সম্মানজনক হয়, কবি হয়েও আমার মাথায় তা আসেনি। কেন যে আসেনি?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মন্টুর সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ না করলে, আজও হয়তো বাংলা অভিধানের ঐ শব্দজোড়ার দিকে আমাদের চোখ পড়ত না। শব্দ ও ভাষার ওপর বঙ্গবন্ধুর অসাধারণ দখলের অকাট্য প্রমাণ আমরা পেয়েছিলাম তাঁর ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণের মধ্যে। আমরা অনেকেই যখন বলছি, সেই রাতে তিনি পালিয়ে গেলেন না কেন? ভাবতে চেষ্টা করেছি, তিনি পালিয়ে গেলে কী হতে পারত, তাঁর পক্ষে কোথায় পালালে ভাল হতো, ইত্যাদি; তখন স্বাধীনতা লাভের ৩৬ বছর পার হয়ে যাবার পরও আমাদের কারও মগজেই আসেনি যে, 'পালানো' শব্দটা তাঁর চিন্তাজগতের সঙ্গে যাবার নয়। পালানো কথাটা আমারও খারাপ লাগছিল, মনে পড়ছিল বাংলার দুই নৃপতির কথা। লক্ষ্মণ সেন ও নবাব সিরাজ। লক্ষ্মণ সেন পালিয়ে প্রাণ বাঁচিয়েছিলেন বটে, কিন্তু সিরাজ পারেননি। পালানো কথাটা তাই, আমাদের অতীত ইতিহাস বিচারে বাঙালি জীবনে অনেকটাই বিদ্রূপাত্মক অভিধারূপে বিবেচ্য। 'য পলায়তি স জীবতি', এই প্রাচীন সংস্কৃত প্রবচনটির উৎস সম্পর্কে আমার সঠিক ধারণা নেই। জতুগৃহ থেকে পলায়নের সময় এই কথাটা মহাবীর অর্জুন বলেছিলেন, না সোনারগাঁ থেকে পালানোর সময় লক্ষ্মণ সেন বলেছিলেন, জানি না। তবে বঙ্গবন্ধু যদি সেদিন ঐ প্রবাদ বাক্যে প্ররোচিত হতেন, পরবর্তীকালে জানা তথ্যমতে সেদিন তাঁর মৃত্যু ছিল অনিবার্য। বঙ্গবন্ধু তাঁর ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের স্বজ্ঞাশক্তির সহযোগিতায় বুঝতে পেরে গিয়েছিলেন যে, তিনি যদি বাড়ি ছেড়ে অন্য কোথাও যাবার জন্য পা বাড়ান— তবে তাঁর বাড়ির পাশে অবস্থান গ্রহণকারী পাকিস্তানের গোয়েন্দারা তাঁকে গুলি করে হত্যা করবে এবং সেই হত্যাকাণ্ডের দায় চাপাবে বাঙালির কাঁধে। আলোচনার খেলা শেষ করে ঢাকা থেকে লুকিয়ে পাকিস্তানে পালিয়ে যাবার আগে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান তাঁর সেনা অফিসারদের নির্দেশ দিয়ে গিয়েছিলেন, মুজিবকে যদি তাঁর বাড়িতে পাও তবে তাঁকে গ্রেফতার করবে। আর যদি তাঁকে পলায়নরত অবস্থায় বাইরে কোথাও পাও, তো তাঁকে গুলি করে মারবে। বঙ্গবন্ধুর কাছে এই গোপন বার্তাটি কেউ পৌঁছে দিয়েছিল কি? মনে হয় না। আমার ধারণা, প্রচণ্ড ইনস্টিকটিভ পাওয়ার ছিল তাঁর। ভেতর থেকে সাড়া পাওয়ার একটা ব্যাপার ছিল তাঁর চরিত্রে। কবিদের যেমন থাকে। শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের একটি কবিতার পঙক্তি এ রকম : 'ভিতরে যদি নেই, সাড়া দিচ্ছো না কেন?' যাকে বলে নরের ভিতরে নারায়ণ। অর্থাৎ আমি একা নই, আমার ভিতরে আরও একজন আছেন। এই দেহতাত্ত্বিক ধারণার বাউল-ভাষ্যটি হচ্ছে এ রকম : 'আমার ভিতর বাস করে মোট কয়জনা, ও মন জানো না।' আমরা তো তাঁর বংশবৃক্ষ থেকে জানি যে, মিস্টিক সুফির রক্ত ছিল তাঁর দেহে।

তাঁর কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার কাছ থেকে পাওয়া একটি ঘটনা আমার বক্তব্যকে সমর্থন করে। ১৯৭০ সালের কথা। সন্তানসম্ভবা হাসিনা প্রথম মা হতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চলেছেন। সন্তানের জন্য বাবার কাছ থেকে তিনি কিছু পছন্দসই নাম চাইলেন। প্রতিদিন রাতে খাবার টেবিলে বসে হাসিনা তাঁর সন্তানের নাম চান। দেশের নাম নিরূপণ করা নিয়ে ব্যস্ত বঙ্গবন্ধু 'এই যা আজও ভুলে গেছি, কাল পাবি' বলে দিনের পর দিন চালিয়ে দেন। হাসিনা একপর্যায়ে খুব মন খারাপ করেন। তাই দেখে একদিন বাবার মন নরম হয়। তিনি তাঁর নিজের কক্ষে গিয়ে তাঁর প্রথম নাতির নামের সন্ধানে ধ্যানে বসেন এবং তাঁর প্রত্যাশিত প্রিয় নামটি দ্রুত পেয়েও যান। নাম পেয়ে উত্তেজিত হয়ে কন্যা হাসুকে ডাকতে ডাকতে তিনি সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে আসেন। তারপর বাড়ির সবাইকে উদ্দেশ্য করে উচ্চকণ্ঠে জানান যে, অবশেষে হাসিনার ছেলের নাম পাওয়া গেছে। ছেলের নাম হবে জয়। তিনি বারকয়েক প্রাণভরে মহানন্দে উচ্চারণ করেন তাঁর পেয়ে যাওয়া প্রিয় নামটি- জয় জয় জয়...। হাসিনা মুগ্ধ হাতে কলম দিয়ে কাগজে ছেলের নাম লেখেন, জয়। তারপর পিতার দিকে মুখ তুলে প্রশ্ন করেন, আর যদি মেয়ে হয়? মুহূর্তে বঙ্গবন্ধুর মুখ শুকিয়ে চুন। ঠিকই তো, হতেই তো পারে। কিন্তু এই কথাটি তাঁর উর্বর মস্তিষ্কে কেন যে এল না, তিনি তা ভেবে পান না। তাঁর লজ্জিত গম্ভীর ও বিব্রত মুখের দিকে তাকিয়ে হাসিনার মায়া হয়। তিনি পিতাকে উদ্দেশ্য করে বলেন, 'ঠিক আছে, পরে দিয়েন।' বঙ্গবন্ধু মুখ ঘুরিয়ে নিজ কক্ষে ফিরে যাচ্ছিলেন। কিন্তু দু'সিঁড়ি উপরে উঠেই আবার ফিরে দাঁড়ালেন, এবার তাঁর মুখে অট্টহাসি। বললেন— 'বুঝেছি, বুঝেছি, দেখিস তোর মেয়ে হবে না, ছেলেই হবে। মেয়ে হলে আমার মনে ঠিকই মেয়ের নাম আসত। হা-হা।'

মনে হয়, অব্যাখ্যাত অলৌকিক শক্তির ওপর বঙ্গবন্ধু কিছুটা আস্থাশীল ছিলেন। তাঁর ৭ মার্চের অলিখিত ভাষণটি শুনেও আমার সে কথাই মনে হয়েছিল। মনে হচ্ছিল ভিতর থেকে যেন কেউ শব্দের পর শব্দ, বাক্যের পর বাক্য, বেস্ট ওয়ার্ড ইন বেস্ট অর্ডার-এ তাঁর কণ্ঠে যুগিয়ে দিচ্ছিল। আর জলপ্রপাতের মতো তাঁর কণ্ঠ থেকে নেমে আসছিল অনর্গল শব্দঝর্ণা। ১০৩ পঙক্তির কাব্যগুণান্বিত ঐ ভাষণের রচয়িতাকে যদি আমরা কবি স্বীকৃতি দিতে কার্পণ্য করি, তাহলে তা খুবই অন্যায় হবে। তাঁর ঐ ভাষণ নিয়ে লেখা আমার বহুশ্রুত 'স্বাধীনতা, এই শব্দটি কীভাবে আমাদের হলো' — নামক কবিতায় বঙ্গবন্ধুকে আমি কবি হিসেবেই বর্ণনা করেছি। জনসমুদ্রের উদ্যান সৈকতে অধীর আগ্রহে ব্যাকুল বিদ্রোহী শ্রোতা সেদিন ভোর থেকে যাঁর অপেক্ষায় বসেছিল, তিনি কবি। কখন আসবে কবি?

প্রখ্যাত নাট্যকার সেলিম আলদীন সম্প্রতি একটি টিভি টকশোতে বলেছেন, বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ আমাদের ভাষা-প্যাটার্নকে প্রভাবিত করেছে এবং ভবিষ্যতে আরও করবে। শুধু বাংলাদেশের নয়, ১৯৭১ সালে আমি কলকাতায় থেকে জেনেছি, বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণটি সেখানকার ছেলেমেয়েদের কণ্ঠে কীভাবে উঠে এসেছিল।

১৯৭২ সালে আমাকে তিনি একবার 'আপনি' বলে সম্বোধন করেছিলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বঙ্গবন্ধু সহজে কাউকে আপনি বলতেন না। সেখানে আমাকে তিনি আপনি বললেন কেন? এ রকম প্রশ্নের উত্তরে তিনি যুক্তি দেখিয়েছিলেন এই বলে যে, আমি কবি বলেই তিনি আমাকে আপনি বলে সম্বোধন করেছেন। তাই ১৯৭১ সালের মার্চ মাসে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে আমেরিকার নিউজউইক পত্রিকার প্রচ্ছদে তাঁর ওপর যে সচিত্র নিবন্ধ প্রকাশিত হয়, সেখানে তাঁকে 'পোয়েট অব পলিটিকস' বা রাজনীতির কবি হিসেবেই চিহ্নিত করা হয়েছিল।

২

মীর্জা আসাদুল্লাহ খান গালিব খুব একটা নামাজ পড়তেন না। দীর্ঘ বিরতিতে মাঝে মাঝে পড়তেন। এ নিয়ে তাঁকে অনেক গঞ্জনা সইতে হতো। একদিন সেই গালিবের সাধ হলো তিনি শুধু নামাজই পড়বেন না, মসজিদের মোয়াজ্জিনের মতো উচ্চকণ্ঠে আজানও দেবেন। দিল্লীর ঘুমন্ত মুসলমানদের তিনি জানাবেন যে, নিদ্রার চেয়ে আরাধনা শ্রেয়। তাই নিদ্রা ও আলস্য পরিত্যাগ করে আল্লাহর পথে আসো। উর্দু ভাষার শ্রেষ্ঠ কবি তিনি। খুব খেয়ালি মানুষ। আজান দিয়ে তাঁর খুব আনন্দ হলো। মনে হলো, এমন মধুর আজান তিনি এর আগে কারো কণ্ঠে কখনও শোনেননি। কিন্তু এ হলো তাঁর আজান সম্পর্কে তাঁর নিজের ধারণা। তাঁর আজান সম্পর্কে অন্যদের মত কী? সেটা জানা দরকার। কীভাবে জানা যায়? কাছে কোনো মানুষজনকে পাওয়া গেল না। তখন গালিবের মাথায় একটা সাংঘাতিক বুদ্ধি খেলে গেল। তিনি আজান দিতে দিতে গলির পথ ধরে দৌড়াতে শুরু করলেন। আজান দিচ্ছেন, আর দৌড়াচ্ছেন। যতটা দ্রুত তাঁর পক্ষে দৌড়ানো সম্ভব। নিদ্রা ত্যাগ করে ফজরের নামাজ পড়তে আসা দিল্লীর মুসল্লিরা গালিবকে আজান দিতে দেখেই অবাক হয়েছিলেন, এবার তাঁকে আজান দানরত অবস্থায় প্রাণপণে দৌড়াতে দেখে আরও অবাক হলেন। ভাবলেন, গালিব নিশ্চয়ই পাগল হয়ে গেছেন। সাহস করে ধাবমান গালিবকে একজন বললেন, 'কবি গালিব, আপনি এভাবে পাগলের মতো দৌড়াচ্ছেন কেন?' শুনেও প্রথম কয়েকবার গালিব ঐ বালখিল্য প্রশ্নের জবাব দিলেন না। আজান শেষ করে, হাঁফাতে হাঁফাতে গালিব বললেন, 'আমার আজানটা কেমন হচ্ছে, তা নিজ কানে শোনার জন্যই আমি দৌড়াচ্ছিলাম। আমি যে এত চমৎকার আজান দিতে পারি, তা তো আগে জানতাম না। আজ আমার খুব ভাল লাগছে।'

ধর্মের পথে গালিব ফিরে আসছেন। তাঁকে উৎসাহিত করা দরকার। মুসল্লিরা বললেন, ভাল, আপনার আজান সত্যিই খুব ভাল। আপনার আজান শুনে আমরা সবাই খুব খুশি হয়েছি।

মনে পড়ছে আজান নিয়ে লেখা মহাকবি কায়কোবাদের আজান কবিতার কিছু পঙক্তি। তিনি কি গালিবের কণ্ঠের আজান শুনেই ঐ কবিতাটি লিখেছিলেন?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'কে ঐ শোনাল মোরে আজানের ধ্বনি?
মর্মে মর্মে সেই সুর বাজিল কী সুমধুর,
আকুল হইল প্রাণ, নাচিল ধমনী।
কে ঐ শোনাল মোরে আজানের ধ্বনি?'

মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসনির্ভর আমার আত্মকথা লিখতে গিয়ে আমারও মাঝে মাঝে ইচ্ছে হয়, গালিবকেই অনুসরণ করি। স্মৃতির ভিতর দিয়ে, অতিক্রান্ত সময়ের পথরেখা ধরে গালিবের মতো দৌড়াই। ছাপার পর, পাঠক হয়ে বারবার পাঠ করে বুঝার চেষ্টা করি, কেমন হচ্ছে আমার রচনাটি? লেখাটি কি খুব অগোছালো মনে হচ্ছে? ইতিহাসনির্ভর আত্মকথা রচনার জন্য অপ্রস্তুত মনে হচ্ছে আমাকে? আমার গতির সঙ্গে তাল মিলাতে গিয়ে খুব কি হিমশিম খাচ্ছেন আমার পাঠক? তা রচয়িতা নিজে যা অনবরত খাচ্ছেন, তার পাঠকরা তার কিছু তো খাবেনই। তবু আমি বলব, অন্যদের কেমন লাগছে জানি না, আমি বড় আনন্দ পাচ্ছি। ক্লান্তিও যে আসছে না, তা নয়। কিন্তু সেটা শারীরিক। আমার আনন্দটা মানসিক। সেই আনন্দ হচ্ছে আমাদের পেছনে ফেলে-আসা গৌরবময় অতীতের সত্য প্রকাশের আনন্দ। সত্যই সুন্দর। সত্যই ঈশ্বর। সদাপ্রভু। আল্লাহ। ভগবান। ট্রুথ ইজ বিউটি, বিউটি ইজ ট্রুথ।

বঙ্গবন্ধুর ওপর সাপ্তাহিক নিউজউইকের প্রচ্ছদ নিবন্ধটি প্রকাশিত হয় ৫ এপ্রিল ১৯৭১ তারিখে। বিশ্বসভায় বঙ্গবন্ধুর ভাবমূর্তি তখন কেমন ছিল, সে সম্পর্কে কিছুটা ধারণা প্রদানের জন্য ঐ প্রচ্ছদ রচনাটি এখানে পরিবেশিত হলো।

AMARBOI.COM

রাজনীতির কবি

শেখ মুজিবুর রহমান যখন গত সপ্তাহে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন, তখন তাঁর কিছু সমালোচক বলেছিলেন যে, তিনি শুধু তাঁর কিছু চরমপন্থী সমর্থকদের চাপের কাছে নতিস্বীকার করছেন এবং ঢেউয়ের ধাক্কায় যাতে তলিয়ে না যেতে হয় তাই ঢেউয়ের ওপরে চড়ার চেষ্টা করছেন। তবে এক অর্থে, এক নতুন বাঙালি জাতির যোদ্ধা-নেতারূপে মুজিবের আবির্ভাব বাঙালি জাতীয়তাবাদের জন্য তাঁর আজীবন সংগ্রামেরই যুক্তিযুক্ত পরিণতি। মুজিব হয়তো এখন ঢেউয়ের চূড়ায় সওয়ার হয়েছেন, কিন্তু ওখানে তাঁর থাকাটা কোনো আকস্মিক ব্যাপার নয়।

একান্ন বছর আগে, ঢাকার নিকটবর্তী এক গ্রামে, সম্পন্ন ভূম্যধিকারী পরিবারে মুজিবের জন্ম। শিক্ষাজীবনের গোড়ায় বুদ্ধিবৃত্তিক কোনো কৃতিত্বের পরিচয় তিনি দেননি। বালক হিসেবে তিনি ছিলেন বহির্গামী ও জনপ্রিয় মানুষ, খেলাধুলা, গল্পগুজব তিনি পছন্দ করতেন। কলা বিষয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ডিগ্রিলাভের জন্য তিনি যখন কলকাতার ইসলামিয়া কলেজে পড়তে যান, ততদিনে মুসলিম লীগের সক্রিয় কর্মী হিসেবে তিনি বয়োজ্যেষ্ঠদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তখন তাঁর অগ্রণী ছিলেন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, ব্রিটিশরাজের অধীনে বঙ্গের প্রধানমন্ত্রী এবং পরে বছরখানেকের জন্য পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন। মুজিব আইন পড়েছিলেন। তবে সোহরাওয়ার্দীর মতো নরমপন্থার সঙ্গে তাঁর মিল ছিল না। খুব অল্পকালেই প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ঝোঁক দেখা গিয়েছিল তাঁর মধ্যে। চল্লিশের শেষ দিকে এঁরা দুজনই বুঝতে পেরেছিলেন যে, নবগঠিত পাকিস্তান রাষ্ট্রে তাঁদের মাতৃভূমি বাংলা প্রাপ্যের তুলনায় কম পাচ্ছে। মুজিব নামলেন আন্দোলনে এবং বেআইনী ধর্মঘট ও বিক্ষোভে নেতৃত্বদানের জন্য বার দুই গ্রেপ্তার হন।

কারাগার থেকে বেরোবার পর আওয়ামী লীগে মুজিব হয়ে উঠলেন সোহরাওয়ার্দীর ডান হাত। কিন্তু আপোস করে অন্যান্য দলের সঙ্গে কোয়ালিশন সরকার গঠনের ক্ষেত্রে তাঁর নেতার প্রয়াস ধূলিসাৎ করে দিলেন। মুজিবের প্রয়াসের সাফল্যে আওয়ামী লীগ ১৯৫৬ সালে পূর্ব পাকিস্তানে নতুন প্রাদেশিক সরকার গঠন করতে সমর্থ হলো। শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী হিসেবে তিনি সাত মাস দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৬৩ সালে সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুর পরে আপাতদৃষ্টিতে মুজিব আর বয়স্ক নেতার নরমপন্থী নীতির বাধা তেমন করে অনুভব করলেন না। তিনি আওয়ামী লীগ পুনরুজ্জীবিত করলেন। নিজের সহজাত রীতির রাজনীতি অনুসরণ করলেন এবং আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসনের দাবি করলেন। পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাধীন করার ষড়যন্ত্রের অভিযোগে যখন আইয়ুব খান তাঁকে আবার গ্রেফতার করলেন, তখন পূর্ব পাকিস্তানে প্রায় প্রকাশ্য বিদ্রোহ দেখা দিল এবং সেই আন্দোলনে আইয়ুব মুজিবকে মুক্তি দিতে এবং নিজে পদত্যাগ করতে বাধ্য হলেন। নিজের জনগণের কাছে মুজিব আত্মপ্রকাশ করলেন বীরপুরুষ হিসেবে।

বাঙালিদের তুলনায় মুজিব লম্বা (উচ্চতায় ৫ ফুট ১১ ইঞ্চি), চুলের একগুচ্ছে পাক ধরেছে, ঘন গোঁফ, সতর্ক দুটি কালো চোখ। লক্ষ লক্ষ মানুষকে আকর্ষণ করতে পারেন সমাবেশে এবং আবেগময় বাগ্মিতার তরঙ্গের পর তরঙ্গে তাদের সম্মোহিত করে রাখতে পারেন। একজন কূটনীতিক বলেন : 'একাকী তাঁর সঙ্গে কথা বলার সময়ও মনে হয় তিনি যেন ৬০,০০০ লোককে সম্বোধন করে বক্তৃতা দিচ্ছেন।'

উর্দু, বাংলা ও ইংরেজী পাকিস্তানের তিনটি ভাষায় তাঁর পটুত্ব আছে। নিজেকে মৌলিক চিন্তাবিদ বলে ভান করেন না মুজিব। তিনি রাজনীতির কবি-প্রকৌশলী নন; তবে বাঙালিরা যত না প্রায়োগিক, তার চেয়ে

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শৈল্পিক বেশি। কাজেই, এই অঞ্চলের সকল শ্রেণী ও মতাদর্শকে ঐক্যবদ্ধ করতে যা প্রয়োজন, তাঁর রীতিতে হয়তো ঠিক তাই আছে।

এক মাস আগে, মুজিব যখন প্রকাশ্যে স্বাধীনতা ঘোষণা প্রদান করা থেকে বিরত থাকছিলেন, তখন নিউজ উইকের লোরেন জেনকিনসকে একান্তে তিনি বলেছিলেন, পরিস্থিতি বাঁচানোর আশা তাঁর নেই। আমরা যেভাবে দেশটাকে জানি, তা শেষ হয়ে গেছে। তবে ভাঙার কাজটা যাতে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানই করেন, তিনি তার অপেক্ষায় ছিলেন।

'আমরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ, সুতরাং আমরা বেরিয়ে যেতে পারি না। ওরা, পশ্চিমারা সংখ্যালঘু, বিচ্ছিন্ন হওয়াটা তাদের ইচ্ছাধীন।'

সংকট ঘনীভূত হলে দু'সপ্তাহ পর শত শত বাঙালি ঢাকার প্রত্যন্তে মুজিবের বাড়ির প্রাঙ্গণে ও বারান্দায় সমবেত হতে থাকে। পাইপ (বিদেশী এই একটা জিনিসই আমি ব্যবহার করি) টানতে টানতে তিনি তাদের সঙ্গে কথা বলেন প্রফুল্লচিত্তে। এ রকম এক উৎসাহী জনসমাবেশের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা দেওয়ার সময় পাশ্চাত্য সাংবাদিকের দিকে ফিরে শেখ মুজিবুর রহমান বললেন : 'ভোর পাঁচটা থেকে ক্রমাগত এমনটাই চলতে থাকে। আপনারা কি মনে করেন, মেশিনগান দিয়ে এই তেজ দমন করা যাবে?'

কয়েকদিন পরে একজন সেই চেষ্টাই করলেন।

প্রকাশিত : নিউজ উইক, ৫ এপ্রিল ১৯৭১
অনুবাদ : ডক্টর আনিসুজ্জামান।

AMARBOI.COM

আমেরিকার সাপ্তাহিক নিউজউইক পত্রিকায় প্রকাশিত ঐ দুর্লভ প্রচ্ছদ নিবন্ধটি বঙ্গবন্ধু যাদুঘরের সংগ্রহ থেকে আমার বন্ধু বেবী মওদুদ সূত্রে প্রাপ্ত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিউইয়র্ক টাইমসের চোখে একাত্তরের মার্চ

মুক্তিযুদ্ধে আমেরিকা আমাদের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের পক্ষে সুদৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করেছিল। কিন্তু আমেরিকার পত্র-পত্রিকা তখন আমাদের দেশের চলমান উত্তাল গণ-আন্দোলনের সংবাদ অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে প্রকাশ করে। বিশেষ করে আমেরিকার সবচেয়ে জনপ্রিয় দৈনিক পত্রিকা 'নিউইয়র্ক টাইমস'-এর পাতায় একাত্তরের মার্চ মাসের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাপ্রবাহের সংবাদ প্রতিবেদন প্রথম পাতায় প্রকাশিত হয়। ঐ সংবাদগুলো আমাদের মুক্তিযুদ্ধের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দলিল হয়ে আছে। ১৯৭৫ সালে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে ও কিছুদিন পর ঢাকার কেন্দ্রীয় কারাগারের ভিতরে প্রবেশ করে মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী মজিবানুগত চার অন্তরীণ জাতীয় নেতাকে হত্যা করে, আমাদের মহান সংবিধানের মৌলিক পরিবর্তন ঘটিয়ে, অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের গৌরবময় ইতিহাসকে বিকৃত করার যে নবধারা চালু করা হয়, সেই ইতিহাস বিকৃতির পরিকল্পিত নবধারাটি দীর্ঘদিনের অপপ্রচারে বেগবান না হলে, মার্কিন পত্রিকায় প্রকাশিত ঐ সংবাদগুলো আমাদের কাছে হয়তো ততটা প্রয়োজনীয় বলে মনে হতো না, কিন্তু এখন প্রয়োজনীয় উপাদানে সমৃদ্ধ, ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষ্য বলে মনে হচ্ছে। নিজ অভিভাবকদের ওপর আস্থা হারানো সন্তানরা সুবিচারের আশায় অনেক সময় প্রতিবেশীর দ্বারস্থ হয়। আমাদের হয়েছে সেই দশা। আমরা মুক্তিযুদ্ধের নায়কদের ওপর আস্থা না রেখে, পঁচিশে মার্চের জল্লাদ জেনারেল টিক্কা খানের সচিব সিদ্দিক সালিকের রচিত গ্রন্থ বা মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্ট থেকে প্রকাশিত বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার তথ্যসংবলিত দলিল খুঁজে বের করেছি। আলোচনার টেবিলে বসে অলোচনা করে নয়, যুদ্ধের রক্তাক্ত প্রান্তরে লক্ষ প্রাণের মূল্যে অর্জিত একটি স্বাধীন জাতির জন্য এ আমাদের বড় দুর্ভাগ্যের বিষয়।

নিউইয়র্ক টাইমস পত্রিকায় প্রকাশিত আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ উপাদানে সমৃদ্ধ দুটি সংবাদ নিবন্ধ এখানে সংযুক্ত করা হলো।

Hero of the East Pakistanis

Tiliman Durdin

The New York Times

16 March 1971

Dacca, Pakistan, March 14 :

Most busy officials display a certain amount of tension and

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

preoccupation, but not Sheikh Mujibur Rahman, the Bengali nationalist who has emerged in recent months as the undisputed leader of the people of East Pakistan.

In person-to-person dealings, Mujib, as he is familiarly called by practically everyone, always seems relaxed and cheerful. He even delivers denunciations with a twinkle in his eyes.

The easy aplomb that makes Sheikh Mujib a winning personality in private doubtless also contributes to his extraordinary crowd appeal. But before the masses his diffidence disappears and he becomes a vehement orator wit power to stir his people to cheering enthusiasm.

Sheikh Mujib's position of leadership at the age of 50 is the culmination of almost a lifetime of political struggle, usually against vested interests and governments. Born March 17, 1920, in the East Bengal village of Tongipara into a modestly well-to-do Moslem family, Mujib grew up as an extroverted open-handed, sports-loving country boy, not especially good in school but fond of people and well-liked by teachers and fellow students.

AMARBOI.COM

A student Activist

At 22, when he went to Calcutta to get a liberal-arts degree at Islamia College, he was prominent student leader and an activist in newly formed All India Moslem League.

After graduation from Islamia, Mujib returned to East Bengal to enter Dacca University to become a lawyer.

By 1947 he discovered that his native East Bengal, now the province of East Pakistan in a nation of two parts seperated by 1,000 miles of Indian territory, was being kept in a subordinate position.

He resigned from the Moslem League and became an advocate of Bengali rights, a role that quickly got him in trouble with the ruling authorities.

He went to jail briefly in 1948, and in 1949 was sentenced to three years in prison for having participated in illegal demonstrations and strikes.

By the time he left prison, he settled for a few years into a less conspicuous role.

He became key member of the newly organized East Pakistan

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

Party, the Awami (People's) League, and was elected to the Provincial Assembly.

But when Field Marshal Mohammad Ayub Khan established a military dictatorship in 1958, Sheik Mujib again assumed a prominent opposition role.

His new activity resulted in jail terms in 1958 and 1962.

Six-Point Program

In 1966, Sheikh Mujib and his associates advanced a six-point program that would give the provinces internal self-rule, control over their own foreign aid and leave to the central Government only defense and some aspects of foreign relations.

Marshal Ayub had Sheikh Mujib arrested in May, 1966 on charges of participation in a plot to make East Pakistan independent. By 1968, East Pakistan was in a state of virtual revolt.

Widespread opposition to the Ayub Government led to termoil in the West, causing Marshal Ayub to release Sheikh Mujib and to resign.

Sheikh Mujib's popularity was translated into an overwhelming vote for candidates of the Awami League, of which he had become head.

Today Sheikh Mujib is riding on wave of popularity that amounts to mass worship. His word as literally become law.

The 'Sheikh' in his name is not a title, but simply an honorific meaning that his father is a land owner.

Tall for a Bengali, 5 feet 11 inches— he has a heavy shock of graying hair, alert expressive black eyes, and a well-groomed upturned mustache. He usually wears a loose black vest over the billowing white cotton pantaloons and long-sleeved pajama-style shirt that is traditional Moslem dress here.

Sheikh Mujib has weak eyes as a result of glaucoma that kept him out of school for three years when he was a teen-ager. An inveterate pipe-smoker, he likes foreign makes but insists that his pipes are about the only non-Bengali thing he uses. He lives in a fashionable quarter of Dacca with his wife, Fojilatun, three sons and two daughters.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

He thinks the proper political system for Pakistan at this stage is democratic socialism. His program calls for nationalization of major banks, and insurance companies, a procedure roughly along the lines now being persuaded by the Prime Minister Indira Gandhi in India.

Friends do not rate him as an intellectual. He readily concedes that he needs expert advice in many fields.

East Pakistan unveil New Flag

By Sydney H. Schanberg

Special in .

The New York Times

Published on March 24, 1971

President Heavily Guarded, Takes Ride in Hostile City

AMARBOI.COM

Dacca, Pakistan, March 23

The President of Pakistan, who has spent eight days in the eastern wing of his country under heavy protection, came out of his own compound for the first time today for a heavy protected drive to the military cantonment on the edge of the city.

Elsewhere in Dacca and the province of East Pakistan the Bengali population celebrated 'resistance day'— resistance to the martial law regime imposed by the West Pakistan dominated central government and unveiled the new flag of Bangla Desh, the socalled Bengal nation.

Those scenes— a president unable to travel in what is supposed to be his own country without a cordon of weapons, 70 million of his people virtually declaring secession on their own- put into focus the strangeness of the crisis that has threatened to split this Moslem country into two.

The mood, the slogans and the talk in the streets are all for independence, while at the bargaining table the three participants are still talking about trying to hold the two wings together, by however tenuous a link.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

> **No Sings of Real Progress**
>
> The tortuous negotiations over East Pakistan's demand for self-rule continued, and all sides kept repeating that some progress was being made. What is going outside the talks makes it difficult to believe, however, that any compromise agreement will alter what has already happened the takeover of the province, in effect by the Bengali people lead by Sheikh Mujibur Rahman and his Awami League party.
>
> High Awami League sources said the talks were at a delicate stage. The party will wait a few days more, they added and if an agreement cannot be reached by then on its demand for ending the Western wing's long domination of the East, they will go their own way. The phrase was not further explained.

The other participants in the talk are the President Agha Mohammad Yahya Khan representing the army, which has ruled under martial law for two years, and Zulfikar Ali Bhutto, dominant political leader in West Pakistan, who heads the Pakistan People's Party.

চিশতী শাহ হেলালুর রহমান

চিশতী শাহ হেলালুর রহমান। ১৯৭১ সালে চিশতী ছিল পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের সংস্কৃতিবিষয়ক সম্পাদক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের ছাত্র। বঙ্গবন্ধুর মতই সাদা কাপড়ের পাজামা-পাঞ্জাবি পরত। বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে ওর আরও একটা মিল ছিল। মোটা কালো ফ্রেমের এবং খুব ভারী কাঁচের লেন্সের চশমা পরত সে। বঙ্গবন্ধুর মতোই চিশতীও ছিল গ্লুকোমার রোগী। চুলের মাঝখান দিয়ে সিঁথি কাটত বলে খুব সহজেই চিশতীকে আলাদা করে চেনা যেত। হাসিখুশি মুখ। আমরা অনেক সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তখনকার বিখ্যাত শরীফ মিঞার ক্যান্টিনে দীর্ঘ আড্ডা দিতাম। তখন মধুর ক্যান্টিন ছাত্রনেতাদের দখলে ছিল। আর আমরা যারা সাহিত্য-সংস্কৃতির চর্চা করতাম, তাদের মিলনস্থল ছিল শরীফ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়াও আর্ট কলেজ, ঢাকা মেডিকেল কলেজ এবং বুয়েট থেকেও তরুণ কবি-সাহিত্যিক ও সংস্কৃতিকর্মীরা আড্ডার লোভে অনেক সময় ক্লাস ফাঁকি দিয়েও এসে জড়ো হতো শরীফে। ঐ শরীফের ক্যান্টিনেই চিশতীর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। চিশতী মাঝে মাঝে কবিতা লিখত। আমার কাছে ওর লেখা মানসম্পন্ন বলে মনে হতো না। সে কথা প্রকাশ্যে বলাতে চিশতী রেগে গিয়ে আমার সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করে দেয়। কবিত্ব শক্তির জোরে আমার সঙ্গে কুলিয়ে উঠতে না পেরে একপর্যায়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সে আমার ওপর রাজনৈতিক শক্তির জোর খাটাতেও চেষ্টা করেছিল। আমি সরাসরি কোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে কখনও যুক্ত ছিলাম না। আমার কবিতায় কমিউনিস্ট ভাবাদর্শের প্রভাব থাকা সত্ত্বেও আমার বোহেমিয়ান জীবনযাত্রার কারণে ছাত্র ইউনিয়ন আমাকে তাদের কবি বলে ভাবত না। বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে কবিতা লেখার পরও ছাত্রলীগও তখন আমাকে তাদের কবি বলে মানত না। আমার অবস্থান ছিল ঐ দুয়ের মাঝখানে। 'দুলে বান্দা কলমা চোর, না পায় বেহেশত না পায় গোর' বলে যে প্রবাদটি আছে– আমার বেলায় সেটি প্রযোজ্য ছিল। আমি ছিলাম আমার আপন কবিত্বের শক্তিতে আত্মলীন। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের দেয়া ১১ দফা কর্মসূচী বঙ্গবন্ধুর ৬ দফা কর্মসূচীর সঙ্গে সমান্তরালে গৃহীত হলে আমি আমার অন্তরে স্বস্তি বোধ করেছিলাম এই ভেবে যে, আমার স্বপ্নের দেশটি স্বাধীন হওয়ার পর পাঞ্জাবীদের পরিবর্তে বাঙালি-বুর্জোয়া শ্রেণীর শোষণের মৃগয়াভূমিতে পরিণত হবে না। কেননা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের (সেখানে পূর্ব পাকিস্তান মস্কোপন্থী এবং পিকিংপন্থী ছাত্র ইউনিয়নেরও যথেষ্ট নিয়ামক ভূমিকা ছিল) দেয়া ১১ দফা কর্মসূচীতে শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক বাংলাদেশ গঠনের অঙ্গীকার ছিল।

২৭ মার্চ সকালে সার্জেন্ট জহুরুল হক হলের মাঠের সবুজ ঘাসের ওপর শায়িত লাশের সারিতে আমার চোখ যখন হঠাৎ করে চিশতী শাহ্ হেলালুর রহমানের বিকৃত লাশের ওপর স্থির হয়, তখন আমার বড় কষ্ট হয় ওর জন্য। মনে পড়ে যায় আমার সঙ্গে চিশতীর চলতি বিরোধের কথা। ২৭ মার্চের অভিজ্ঞতা নিয়ে লেখা আমার কবিতায় চিশতীর বর্ণনা আছে।

'জহুর হলের মাঠে শুয়ে আছে একদল সারিবদ্ধ যুবা,
যন্ত্রণাবিকৃত মুখ তবু দেশমাতৃকার গর্বে অমলিন।'
(জগন্নাথ হল, ২৭ মার্চ ১৯৭১ : পৃথিবীজোড়া গান)

২৫ মার্চের রাতে পাক-বাহিনীর নির্বিচার বর্বর আক্রমণে আরও অনেকের সঙ্গে নিহত আমার বন্ধু চিশতী শাহ্ হেলালুর রহমানের যন্ত্রণাবিকৃত মুখটিকে স্মরণে রেখেই আমার কবিতার ঐ মর্মস্পর্শী পঙ্‌ক্তিযুগল আমি রচনা করেছিলাম। চিশতী, আমি তোমার কথা ভুলিনি, বন্ধু। যে স্বাধীন দেশের স্বপ্ন বুকে নিয়ে তোমার প্রিয় ছাত্রাবাসে তুমি তোমার অমূল্য জীবন বিসর্জন দিয়েছিলে, তোমার সেই স্বপ্নভূমি আমরা পেয়েছি।

সম্প্রতি মোস্তফা মহসীন মন্টুর সঙ্গে ঐ রাত্রির স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে আমি চিশতী সম্পর্কে এমন কিছু অজানা কথা জানতে পেরেছি, যা শুনে আমার মন একধরনের অপরাধবোধে আক্রান্ত হয়েছে। ২৫ মার্চের রাতে বঙ্গবন্ধুর বাড়ি থেকে ফিরে নেতার নির্দেশক্রমে মমম মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য যখন সার্জেন্ট জহুরুল হক হলে রাখা অস্ত্রগুলো বুড়িগঙ্গার ওপারে কেরানীগঞ্জে পাচার করছিলেন, তখন ঐ দুঃসাহসিক দায়িত্ব সম্পাদনে চিশতী ছিলেন তাঁর সর্বক্ষণের বিশ্বস্ত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সহযোগী। রাত সাড়ে এগারোটার দিকে মমম যখন জহুরুল হক হল ত্যাগ করে নদীর ওপারে চলে যান তখন চিশতীকেও তাঁর সঙ্গে নদীর ওপারে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু চিশতী যেতে রাজি হয়নি। সে বলেছিল, রাত্রে তার কিছু বন্ধু ও ছাত্রলীগ কর্মী হলে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসবে। তাদের সবাইকে নিয়ে পরদিন ২৬ মার্চ সে নদীর ওপারে মমম-র বাড়িতে যাবে। ওটাই ছিল চিশতীর সঙ্গে মন্টুর শেষকথা। চিশতী জানত না যে ওটাই হবে তাঁর প্রিয় ছাত্রাবাসে তাঁর জীবনের শেষরাত্রি।

ঢাকার নিরস্ত্র বাঙালির ওপর, বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যান্টনমেন্ট হিসেবে পরিচিত জগন্নাথ হল ও জহুরুল হক হলে পাক-বাহিনীর বর্বর আক্রমণের খবর রাতের মধ্যেই নদীর ওপারে পৌঁছে যায়। ভোরের দিকে কোনোক্রমে প্রাণে বেঁচে যাওয়া বেশ কিছু আহত পুলিশ ও ইপিআর-সদস্য বুড়িগঙ্গা নদী পেরিয়ে জিঞ্জিরায় আশ্রয় নেয়। তখন কালবিলম্ব না করে ২৬ মার্চ সকাল দশটার দিকে আচমকা আক্রমণ চালিয়ে মমম কেরানীগঞ্জ থানাটি দখল করে নেয়। ঐ থানা দখলের যুদ্ধে নেতৃত্ব দেন মমম। তাঁর সঙ্গে ছিলেন সুবেদার রফিক, মমম-র সেকেন্ড ইন কমান্ড (তাঁর ভাষায় টু-ইনসি) জগন্নাথ হলের ছাত্রলীগ নেতা কেরানীগঞ্জের ছেলে রহিম, আলিম হাজী, মদিনা, রফিক হাজী, ভুলু, কামাল, বুলবুল, ইকবালসহ আরও বেশ ক'জন, যাদের নাম মমম সেই মুহূর্তে স্মরণ করতে পারেননি। থানার দারোগা জনৈক তালুকদার তখন থানাতে ছিলেন না। তিনি তার বাড়িতে ছিলেন। প্রাণের ভয়ে তিনি বাড়ির পেছনের গভীর জঙ্গলে লুকিয়ে ছিলেন। কিন্তু যখন খবর পেলেন যে, অনেক চেষ্টা করেও থানার অস্ত্রভাণ্ডটি ভাঙতে পারা যাচ্ছে না, তখন সেই খবর পেয়ে 'এই যে চাবি, এই যে চাবি' বলে অস্ত্রাগারের মূল চাবিটি নিয়ে দৌড়ে আসেন থানার ওসি তালুকদার। তারপর অস্ত্রাগার খোলা হয় এবং সেখানে রাখা ২০টি থ্রি নট থ্রি রাইফেল ও বেশ কিছু গোলাবারুদ লুট করা হয়। পাকিস্তানের পতাকা নামিয়ে সেখানে মমম-র নেতৃত্বে বাংলাদেশের প্রস্তাবিত জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয় এবং পতাকার উদ্দেশ্যে গার্ড অব অনার প্রদান করা হয়। সেখানে জাতীয় সঙ্গীত গাওয়ার মতো পারঙ্গম কাউকে না পাওয়ায় সেদিন জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন করা হয়নি। ঐ খণ্ডযুদ্ধে প্রাণহানি হয়েছিল কিনা— এই প্রশ্নের জবাবে মমম একটু বিব্রত বোধ করে বলেন, 'ওটা ছিল আমাদের মুক্তিযুদ্ধের শুরু। দ্যাট ওয়াজ ওয়ার। যুদ্ধ। যুদ্ধের মাঠে পেছনে শত্রুকে বাঁচিয়ে রেখে যাওয়াটা বিপজ্জনক। তাই বুঝতেই পারেন।' আমি তাঁর ইঙ্গিতটা বুঝতে পারলাম। বললাম, ওরা সংখ্যায় কতজন ছিল? মমম বললেন, পাঁচজন। ঐ অজানা অচেনা পাঁচজনের জন্য আমার মন কেমন করে।

সে কথা লুকিয়ে রেখে বলি, আপনার এই রফিক সুবেদারটি কে? মমম জানান, তাঁর বাড়ি ছিল চট্টগ্রামে। বেঙ্গল রেজিমেন্টে ছিলেন। পশ্চিম পাকিস্তানে তাঁর পোস্টিং ছিল। ছুটিতে বাড়ি এসেছিলেন। আর যাওয়া হয়নি। সুবেদার রফিক, কী করবেন জানবার জন্য একদিন বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে তাঁর বাড়িতে গিয়ে দেখা করেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তখন আগুন লেগেছে রক্তে মাটির গ্লোবে। মার্চ শুরু হয়ে গেছে। একটি অনিবার্য সংঘর্ষের দিকে ধাবিত হচ্ছে দেশ। বঙ্গবন্ধু সুবেদার রফিককে বললেন, 'পাকিস্তানে আর তোমাকে ফিরে যেতে হবে না। তোমার দরকার আছে। তুমি নদীর ওপারে চলে যাও। সেখানে গিয়ে আমার ছেলেদের অস্ত্র প্রশিক্ষণ দাও।'

নেতার নির্দেশ মাথা পেতে নিয়ে সুবেদার রফিক বললেন,– 'তথাস্তু'।

সেই থেকে সুবেদার রফিক কেরানীগঞ্জে আগামীদিনের মুক্তিযোদ্ধাদের যুদ্ধবিদ্যা প্রশিক্ষণ দিচ্ছিলেন। মমম তাঁকে যুগিয়ে যাচ্ছিলেন অস্ত্র। ১৯ মার্চ মেজর শফিউল্লাহর নেতৃত্বে বিদ্রোহ ঘোষণা করে জয়দেবপুর ক্যান্টনমেন্টের বাঙালি সেনারা। সেখানে ক্ষুব্ধ জনতাও সেই বিদ্রোহের সঙ্গে যুক্ত হয়। তারা সেখান থেকে বেশকিছু অস্ত্র লুট করে। সেই অস্ত্রও মন্টুর মাধ্যমে কেরানীগঞ্জে পৌঁছেছিল।

মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে কমান্ডার মোয়াজ্জেম বললেন 'জয় বাংলা'

AMARBOI.COM

ঢাকা থেকে নদীর ওপারে পালিয়ে যাওয়া মানুষগুলোকে আশ্রয়, খাদ্য ও প্রয়োজনীয় চিকিৎসা প্রদানের উদ্দেশ্যে কেরানীগঞ্জে তিনটি আশ্রয়শিবির বা শরণার্থী ক্যাম্প প্রতিষ্ঠা করা হয়। এর একটি ছিল ব্রাহ্মণকীর্তা গ্রামের হাজী দীন মোহাম্মদের বাড়িতে। গ্রামের নাম থেকে মনে হয় একসময় ব্রাহ্মণকর্তাদের দাপট ছিল ঐ গ্রামে। কীর্তা শব্দটি কর্তা বা কীর্তি শব্দের খণ্ডিতরূপ হবে হয়তো। দ্বিতীয় ক্যাম্পটি ছিল ব্রাহ্মণকীর্তা থেকে মাইল সাতেক পশ্চিমে মমম-র মামাবাড়ি নেকরোজবাগে। ঢাকা থেকে পালিয়ে আমরা তিন বন্ধু– আমি, হেলাল হাফিজ ও নজরুল ইসলাম শাহ ২৭ মার্চ রাতে নেকরোজবাগের ঐ দ্বিতীয় ক্যাম্পেই উঠেছিলাম। তৃতীয় ক্যাম্পটি ছিল আওয়ামী লীগের নেতা বোরহানউদ্দিন আহমদের গ্রামের বাড়ি কলাতিয়ায়। বোরহান সাহেব গগন নামেই এলাকায় অধিক পরিচিত ছিলেন।

কেরানীগঞ্জ থানা দখলের যুদ্ধে জড়িত যোদ্ধাদের নামের তালিকায় 'হাজী'র প্রাধান্য দেখে আমি জানতে চাইলাম, এই হাজীরা কীভাবে আপনার সঙ্গে জুটলেন? উনারা কারা? তাঁদের বাড়ি কোথায়? মমম জানালেন – আলীম হাজী, মদিনা ও রফিক হাজী ছিল আপন তিন ভাই। তাদের বাড়ি ছিল জিঞ্জিরার ইমামবাড়ি গ্রামে। ওরা অল্পবয়সে হজ্ব পালন করে হাজী হয়েছিলেন। ঐ হাজী ভ্রাতারা এখন কোথায়? কী করছেন? কেমন আছেন? আমার এই প্রশ্নের সামনে মমম থমকে দাঁড়ালেন। কিছুক্ষণ কোনো কথা বললেন না। কী যেন ভাবলেন। হাজী ভ্রাতাদের সম্পর্কে প্রশ্ন করে আমি যে তাঁকে কিছুটা বিব্রত করেছি, তাঁর নীরবতা দেখে আমার সে রকমই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মনে হলো। ভাবলাম মুক্তিযুদ্ধের শুরুতে যে হাজীরা পাকসেনাদের বিরুদ্ধে হাতে অস্ত্র তুলে নিয়েছিল, মুক্তিযুদ্ধের শেষ পর্যায়ে তাঁরা হয়তো তাঁদের ভূমিকা পরিবর্তন করে থাকবেন। এমন ঘটনা খুব বেশি না ঘটলেও ঘটেছে। মাঝপথে রণে ভঙ্গ দিয়ে মুজিবনগর থেকে ঢাকায় ফিরে এসে পাকসেনাদের দোসরের তালিকায় নাম লিখিয়েছেন কেউ কেউ। আমি যখন ঐ হাজীভ্রাতাদের সম্পর্কে ঐ রকমের নেগেটিভ ভাবনা ভাবছি, তখন আমাকে প্রচণ্ড লজ্জার মধ্যে ডুবিয়ে দিয়ে বুকের ভিতরে পুষে রাখা একটা পুরনো দীর্ঘশ্বাসকে মুক্তি দিয়ে মমম জানালেন, পাক হানাদার বাহিনীর হাত থেকে দেশ মুক্ত হওয়ার আগের দিন, ১৯৭১ সালের ১৫ ডিসেম্বর ঐ হাজীভ্রাতারা (তিন ভাইয়ের মধ্যে একজন, মদিনা অবশ্য হাজী ছিলেন না) আলবদরের হাতে ধৃত হন এবং তিন ভাইকে নির্মমভাবে হত্যা করে বুড়িগঙ্গার জলে ভাসিয়ে দেয়া হয়।

আমার স্মৃতির ভিতরে আমাদের প্রিয় মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের অনেক তথ্যই আছে বটে, কিন্তু তার চেয়ে বড় সত্য হচ্ছে, সেখানে অনেক তথ্যই নেই। অনেক জানা কথা ভুলে গেছি। অনেকের কথা আবছা মনে পড়ে। অনেকের নাম মনে আসে, তো মুখ মনে আসে না। মুখ মনে পড়ে তো নাম মনে আসে না। অথচ সেই সময় তাদের অনেকেই অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। তাদের হাতে একটু একটু করে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস নির্মিত হয়েছে। একটি শব্দের পর আরেকটি শব্দ যোগ হয়ে একটি বাক্য গঠিত হয়। অনেকগুলো বাক্য একত্রিত হয়ে তৈরি হয় একটি রচনা। এক ইটে দালান হয় না। অনেক ইট পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তবেই নির্মিত হয় একটি দালান। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের দালানটিও সেভাবেই অনেক ইট দিয়ে গাঁথা হয়েছে। সেই দালান নির্মিত হয়েছে লক্ষ লক্ষ ইটের অংশগ্রহণে। তাদের সবার পরিচয় আমাদের ইতিহাসের পাতায় খুঁজে পাওয়া যাবে না। সেটা সম্ভবও নয়। শেষ পর্যন্ত প্রতিটি জাতির ইতিহাসই তাই সময়ের কিছু প্রতীক চরিত্রকেই তার বুকে ধারণ করে। কোনো মা কি তার সব সন্তানকে একসঙ্গে তাঁর বুকে টেনে নিতে পারেন? পারেন না। টেনে নেনও যদি, তখন এক সন্তানের মুখের আড়ালে অন্য অনেক সন্তানের মুখ ঢাকা পড়ে যায়। ইতিহাসের সীমাবদ্ধতার এই দিকটা স্মরণে রেখে সেজন্যেই আমরা গানের ভাষায় বলি, মুক্তির মন্দির সোপানতলে কত প্রাণ হলো বলিদান, লেখা আছে অশ্রুজলে। ঐ অশ্রুজলের ভিতরে আত্মপরিচয় লুপ্ত হয়ে যাওয়া কিছু কিছু মুখকে ইতিহাসের পাতায় তুলে আনতে পারলেই আমাদের মুক্তিযুদ্ধের গৌরবময় ইতিহাস ধীরে ধীরে আরও সমৃদ্ধ হবে। আরও পূর্ণ হয়ে উঠবে। মনে করি সেটাই ইতিহাস রচয়িতার একটা বড় দায়িত্ব। আমরা যদি আমাদের নিজ নিজ অভিজ্ঞতালব্ধ জগতটাকে লিপিবদ্ধ করতে পারি, তাহলে খণ্ড খণ্ড হয়েও তা একসময় আমাদের অখণ্ড ইতিহাস নির্মাণে সহায়ক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হবে। চৌদ্দখণ্ডে রচিত আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের দলিলও যেখানে আমাদের ইতিহাসের কুশীলবদের অবদানকে ধারণে অক্ষম, সেখানে আমার একার পক্ষে সেই মহাজীবনের মহাজাগরণের কাহিনী কতটুকুই বা লিপিবদ্ধ করা সম্ভব! আমি সে চেষ্টাও করব না, আর সে রকম দাবি নিয়েও আমি পাঠকের সামনে হাজির হইনি।

আমি আমার অক্ষমতার কথা জানি। সেজন্য আমি যখন আমাদের মুক্তিযুদ্ধের কথা লিখি, তখন যারা ঐ সময়ে আমাদের জাতীয় জীবনে নানাভাবে সক্রিয় ছিলেন, তাদের মধ্যে যারা এখনও বেঁচে আছেন, আমার সেই সময়ের বন্ধুদের সঙ্গে সুযোগ পেলেই আমি কথা বলি। তাতে অনেক ভুলে যাওয়া তথ্য পাওয়া যায়। ভুলে যাওয়া নাম মনে আসে। চিশতী শাহ হেলালুর রহমান সম্পর্কে লিখতে গিয়ে আমি আমার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের বন্ধু ফরিদের সঙ্গে কথা বলি। ফরিদ তখন সার্জেন্ট জহুরুল হক হলে থাকত। আইন বিভাগের ছাত্র ছিল। ফরিদ ছিল ছাত্রনেতা আসম আবদুর রবের সহপাঠী। চিশতীকে সে খুব ভাল চিনত। কথা প্রসঙ্গে আমাদের আলোচনায় ভুলতে বসা অনেকের নাম উঠে আসে। ফরিদের চেহারার সঙ্গে কিছুটা মিল আছে বলে আমি জানতে চাই বাবলার কথা। বাবলার আসল নাম আবু সায়ীদ মাসুদ। ডাক নাম বাবলা। বাবলা জহুরুল হক হলে থাকত। ফরিদ বাবলাকে আমার চেয়েও ভাল করে চেনে এবং ফরিদের কাছ থেকেই জানি যে অভিনেত্রী জয়া হাসান হচ্ছে বাবলার মেয়ে। শুনে আমি মুহূর্তের মধ্যে পিতার সঙ্গে কন্যার মিষ্টি হাসিটির মিল খুঁজে পাই। পরে ফরিদের কাছ থেকে জয়ার ফোন নাম্বার নিয়ে আমি জয়ার মাধ্যমে বাবলার সঙ্গে কথা বলি। দীর্ঘদিন পর বাবলার সঙ্গে আমার টেলিফোনে কথা হয়। বাবলার কাছ থেকে ২৫ মার্চের রাত সম্পর্কে আমি কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাই। বাবলা মমম, খসরুসহ ছাত্রলীগ ও আওয়ামী লীগের নেতাদের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠ ছিল। বঙ্গবন্ধুর বাড়িতেও তার যাতায়াত ছিল। ওর প্রাণখোলা মিষ্টি হাসিটির জন্য আমিও বাবলাকে খুব পছন্দ করতাম। ২৫ মার্চ সম্পর্কে তার কাছে জানতে চাইলে বাবলা আমাকে জানায় যে, ২৫ মার্চ রাতে সে যখন খসরুর সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসে, তখন সশস্ত্র খসরুর নেতৃত্বে ধানমণ্ডি ব্রিজসংলগ্ন মার্কিন দূতাবাসের একজন সচিবের বাসায় পাহারারত সৈনিকদের নিরস্ত্র করে তাদের হাতের অস্ত্রগুলো কেড়ে নেয়া হয়েছিল। সেই অভিযানে বাবলা ছাড়াও ছিল মমম-র ছোট ভাই হোসেন, নাজিম ও হাদী। তখন রাত আনুমানিক ৯টার মতো হবে। রাত সাড়ে আটটার দিকে মুক্তিযুদ্ধের জন্য তৈরি হবার নির্দেশ দিয়ে বঙ্গবন্ধু তাদের বিদায় দিয়েছিলেন। তাদের সঙ্গী হাদী ঐ রাতেই ১২টার দিকে নীলক্ষেতে পাকবাহিনীর ব্রাশফায়ারে নিহত হয়। বাবলার কাছে আমি কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন সম্পর্কে জানতে চাই। কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন ২৫ মার্চের রাতে নিহত হন। মমম আমাকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সে কথা বলেছিলেন। তিনি জানিয়েছিলেন যে বাবলা ঐ ঘটনা সম্পর্কে ভাল বলতে পারবে। বাবলা জানায় যে, তাদের সঙ্গে যোগ দেবার জন্য গোলাগুলির ভিতরেই রাত বারোটার দিকে হাতিরপুল এলাকা থেকে ক্রল করে আসছিল ওদের তিন সহযোদ্ধা বেনু, টুলু আর বাচ্চু। সেই রাতে বাচ্চুর পায়ে গুলি লেগেছিল। ঐ বাচ্চু হলো আমাদের প্রাক্তন প্রধান নির্বাচন কমিশনার জনাব আবু হেনার শ্যালক। ওরা ছিল কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন হত্যাকাণ্ডের প্রত্যক্ষ দর্শক। পাকসেনারা আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম আসামী কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেনকে তাঁর এলিফ্যান্ট রোডের বাড়ি থেকে হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে পথের ওপর নিয়ে আসে। পাকসেনারা তাঁকে অস্ত্রের মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়ে পাকিস্তান জিন্দাবাদ বলতে বললে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার দুই নম্বর আসামী মোয়াজ্জেম হোসেন চিৎকার করে জয় বাংলা বলে মুষ্টিবদ্ধ হাত আকাশে উত্তোলন করেন। তখন পাকসেনাদের গুলিতে মুহূর্তের মধ্যে তার বুক ঝাঁঝরা হয়ে যায়। তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন।

বাচ্চু, টুলু আর বেনু নিরাপদ দূরত্বে থেকে পুরো ঘটনাটি প্রত্যক্ষ করে। ২৫ মার্চের অপারেশন সার্চ লাইটের প্রথম শহীদ বোধ হয় কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেনই হবেন। পাকসেনাদের সঙ্গে স্থানীয় ইনফরমাররাও যে জড়িত ছিল ঐ ঘটনা থেকে তাই প্রমাণিত হয়। তা না হলে মোয়াজ্জেম হোসেনের বাসা তো পাকসেনাদের চেনার কথা নয়। মনে হয় আমাদের মুক্তিযুদ্ধের মহাসঙ্গীতের লয়টি কমান্ডার মোয়াজ্জেম হোসেন যে ধ্রুবপদে বেঁধে দিয়ে গিয়েছিলেন, পরবর্তীকালে বিজয় অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত বাংলাদেশের মুক্তিকামী বাঙালিরা তাকেই অনুসরণ করেছিল।

AMARBOI.COM

বঙ্গবন্ধুর সন্ধানে শেখ মণি

১৯৭১ সালের মার্চে মহাদেব সাহা থাকতেন আজিমপুরের একটি বাড়িতে। আমার নিউপল্টনের মেসবাড়ি থেকে পাঁচ সাত মিনিটের পথ। আমার মেস ছিল আজিমপুর কবরস্থানের পশ্চিমে আর মহাদেব থাকত কবরস্থানের পূর্ব-উত্তর দিকটায়, আজিমপুর রোডের একটি দ্বিতল ভবনে। ঐ ভবনের নিচতলায় মহাদেব ছাড়াও আরও কয়েকজন একসঙ্গে বাস করত। অন্যদের কথা আমার মনে নেই। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার প্রাক্তন প্রেস-সচিব তাজুল ইসলাম মনে হয় তখন মহাদেবের সঙ্গে থাকত। আমি সকাল দশটার দিকে পাকসেনাদের চোখ ফাঁকি দিয়ে অত্যন্ত সন্তর্পণে মহাদেবের ঐ মেসবাড়িতে গিয়েছিলাম ওর কুশল জানতে। মহাদেব তখন দৈনিক পূর্বদেশ পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সহকারী সম্পাদক। আমাকে বেশ কিছুটা বিপজ্জনক পথ অতিক্রম করে সেখানে যেতে দেখে মহাদেবসহ মেসের সবাই খুব অবাক হয়েছিল। পিলখানা কাছে বলে ইপিআর ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাকসেনাদের সতত চলাচল ছিল ঐ পথে। আমি আজিমপুর কবরস্থানের ভিতর দিয়ে গিয়েছিলাম। মহাদেবের মেসে সেদিন আমি রুটি ও ভাজি খেয়েছিলাম। পাকসেনাদের বর্বর আক্রমণের ভয়াবহতা নিয়ে আমরা আলোচনা করেছিলাম। যদিও পাকসেনাদের বর্বরতার ভয়াবহতা সম্পর্কে তখনও পর্যন্ত আমাদের খুব স্পষ্ট ধারণা ছিল না। সার্জেন্ট জহুরুল হক হলে রাতভর চলা পাকসেনাদের তাণ্ডব আমরা কাছে থেকে দেখেই অনুমান করেছিলাম যে পাকসেনারা ঢাকায় পোড়ামাটি নীতিই অনুসরণ করেছে। তাদের হাতে নিশ্চয়ই মারা পড়েছে শত শত নয়, ঢাকা নগরীর হাজার হাজার নিরস্ত্র মানুষ। শহরজুড়ে গোলাগুলির শব্দকে অতিক্রম করে আমাদের চোখে পড়েছে আকাশে কুণ্ডুলি পাকিয়ে ওঠা আগুনের ধোঁয়া।

বঙ্গবন্ধুর ভাগ্যে কী ঘটেছে, তিনি পাকসেনাদের হাতে বন্দী হয়েছেন, নাকি নিহত হয়েছেন, তখন আমরা কিছুই জানতে পারিনি। খবর নেয়ার কোনো সুযোগও ছিল না। টেলিফোন তখন কাজ করছিল না। মিলিটারি অপারেশন শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে পাকসেনারা বাংলাদেশের টেলিফোন সিস্টেম পুরোপুরি অকার্যকর করে দিয়েছিল। নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ রাখার জন্য পাকসেনারা চালু রেখেছিল তাদের নিজেদের ওয়ারলেসগুলো। অর্থ বুঝতে না পারলেও রেডিও খুলে আমরা সেইসব ওয়ারলেসের ভয়াবহ সাংকেতিক বার্তার কর্কশ আওয়াজ ও কিছু কিছু কথোপকথন শুনতে পাচ্ছিলাম। মহাদেব আমাকে আর মেস থেকে না বেরোনার পরামর্শ দিল। মহাদেবের পরামর্শ শিরোধার্য করে কিছুক্ষণ সেখানে থাকার পর আমি আমার মেসে ফিরে আসি।

AMARBOI.COM

ঢাকার যখন এই অবস্থা, তখন বুড়িগঙ্গা নদীর ওপারে চলছিল মমম-র নেতৃত্বে কেরানীগঞ্জ থানা দখলান্তে পাকসেনাদের বিরুদ্ধে সার্বিক মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতিপর্ব। সে কথা মোস্তফা মহসীন মন্টুর মুখ থেকেই শোনা যাক। মন্টু জানিয়েছেন, তারা যখন কেরানীগঞ্জ থানা দখল করে সেখানে বাংলাদেশের পতাকা উড়িয়ে দিয়ে নেকরোজবাগে ফিরেছেন, তখন সেখানে এসে উপস্থিত হন যুবলীগ নেতা, বঙ্গবন্ধুর ভাগনে শেখ ফজলুল হক মণি। বঙ্গবন্ধু সম্পর্কে কোনো সঠিক খবর জানতে না পেরে তিনি সঙ্গত কারণেই খুব অস্থির ও চিন্তিত ছিলেন। তিনি জানতেন যে বঙ্গবন্ধু সঠিক মনে করলে, আমার বিবেচনায় ভিতর থেকে সাড়া পেলে, আওয়ামী লীগের তৎকালীন ট্রেজারার জনাব আবদুল হামিদের বাড়িতে 'সরে যাবার' কথা বলেছিলেন। সে কথা আমি পূর্বে বলেছি। ঐ হামিদ সাহেবের বাড়ি ছিল ফতুল্লায়। আর নদীর ওপারে তাঁর গ্রামের বাড়ি ছিল জিঞ্জিরার নিকটবর্তী দোলেশ্বরে। হামিদ সাহেবের একাধিক লঞ্চ ছিল, ছিল কোল্ড স্টোরেজ ও দোলেশ্বরে ইটের ভাঁটা। ২৬ মার্চ সকালে শেখ মণি নদীর ওপারে ছুটে গিয়েছিলেন হামিদ সাহেবের সন্ধানে। যদি বঙ্গবন্ধু সেখানে গিয়ে থাকেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বঙ্গবন্ধু যে খুব নিকটজনের কাছেও তাঁর গৃহীত অনেক গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের কথা খুলে বলতেন না, এই ঘটনাটি সে কথা প্রমাণ করে। পঁচিশে মার্চের গণহত্যার পর বঙ্গবন্ধুর সন্ধানে ২৬ মার্চ শেখ মণির দোলেশ্বর যাওয়ার ঘটনা থেকে মনে হয়, খুব নিকটজনরাও বঙ্গবন্ধুর এই বিশেষ-স্বভাবের কথাটা জানতেন। তাই শেখ মণি ধরে নিতে পেরেছিলেন যে তাদের কারও সাহায্য না নিয়েও বত্রিশ নম্বর ধানমণ্ডির বাড়ি থেকে সরে গিয়ে বঙ্গবন্ধু বুড়িগঙ্গা নদীর ওপারে, দোলেশ্বরে পৌছতে পারেন। ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণের ব্যাপারেও দেখা গেছে, বঙ্গবন্ধু সেদিন কী বলবেন, তা কারও জানা ছিল না। ভাষণের বিষয়বস্তু নিয়ে আওয়ামী লীগের হাই কমান্ডের নেতাদের সঙ্গে দিনরাতভর বিস্তর আলোচনা করার পরও শেষ পর্যন্ত তিনি লিখিত ভাষণ দেননি। বেগম মুজিবের কথামতো জনতার সমুদ্রতীরে দাঁড়িয়ে সেদিন যা তাঁর মনে এসেছিল, তাই বলেছিলেন।

শেখ মণি বঙ্গবন্ধুর সন্ধানে দোলেশ্বরে হামিদ সাহেবের বাড়িতে যেতে চাইলে শেখ মণিকে পেছনের সিটে বসিয়ে বেশ কয়েক মাইল দুর্গম মেঠো পথ পাড়ি দিয়ে মমম একটি হোন্ডায় চড়ে দুপুরের দিকে দোলেশ্বরে হামিদ সাহেবের বাড়িতে পৌছান। হামিদ সাহেব তখন বাড়িতে ছিলেন না। তাঁর স্ত্রী মমম ও শেখ মণিকে জানান যে, হামিদ সাহেব বাড়িতে নেই, তিনি ইটের ভাঁটায় গেছেন। সেখানে গিয়ে অনেক কষ্টে হামিদ সাহেবকে খুঁজে পাওয়া যায়। হামিদ সাহেব অভ্যাগতদের নিয়ে যান ঐ ইটের ভাঁটার মধ্যিখানে বঙ্গবন্ধুর লুকিয়ে থাকার জন্য তৈরি করা গোপন আস্তানায়। কিন্তু সেই আস্তানাটি ছিল শূন্য। বঙ্গবন্ধু যাননি।

শেখ মণিকে নিয়ে ফেরার পথে মমম দেখতে পান একটি যাত্রীবাহী বিমান কেরানীগঞ্জের ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে। বিমানটি ছিল পিআইয়ের। পাক প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া যে আগের দিনই বিশেষ বিমানে করে পশ্চিম পাকিস্তানে ফিরে গেছেন, তা তখন তাদের জানা ছিল না। জুলফিকার আলী ভুট্টোর সর্বশেষ অবস্থান সম্পর্কেও কোনো সঠিক তথ্য তখন পাওয়া যায়নি। মমম-র ধারণা হলো পিআইয়ের ঐ বোয়িং বিমানে হয়তোবা প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান বা ভুট্টো থাকলে থাকতেও পারেন। দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়ে মন্টু তাঁর পিঠে ঝোলানো থ্রি নট থ্রি থেকে বেশ কয়েক রাউন্ড গুলি ছোড়েন ঐ বিমান লক্ষ্য করে। কিন্তু গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হলে বিমানটি অক্ষত অবস্থায় কেরানীগঞ্জের আকাশ পাড়ি দিতে সক্ষম হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করাচি বিমানবন্দরে তোলা বন্দী মুজিবের সেই ঐতিহাসিক ছবি

কেরানীগঞ্জ থানার ইমামবাড়ি গ্রামের তিন ভাই (আলিম হাজী, রউফ হাজী ও মদিনা) দেশ শত্রুমুক্ত হওয়ার পূর্বমুহূর্তে আল বদরের হাতে নিহত হন। সেই তথ্যটি আমার লেখায় প্রকাশিত হওয়ার পর মমম আমাকে জানিয়েছেন যে, তাঁর আপন তিন খালাত ভাই, যথাক্রমে ইকবাল হোসেন, নাজমুল হাসান ভুলু ও ফুয়াদ হাসান বাবুলও একই দিনে আল বদরের হাতে নিহত হয়েছিলেন। তাঁদের পিতা সাদেক আহমদ ছিলেন একজন অধ্যাপক। নিহত তিন ভাইয়েরই বয়স ছিল ষোল থেকে বিশ বছরের মধ্যে। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে ঐ তিন ভাই গেরিলা বাহিনীর সদস্য হিসেবে কাজ করছিল। তাদের হত্যা করা হয় ১৯৭১ সালের ১৩ ডিসেম্বর এবং তাদের মৃতদেহ আবিষ্কৃত হয় ১৫ ডিসেম্বর।

আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের শহীদের তালিকায় এই ছয় তরুণের নাম যুক্ত করতে পেরে আমার খুব ভাল লাগছে। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের পাতায় যাদের আত্মবলিদানের স্বীকৃতি লিপিবদ্ধ হয়নি, সেইসব ভুলে যাওয়া অজস্র নামের ভিতর থেকে কিছুসংখ্যক নামকেও যদি আমি আমার লেখায় তুলে আনতে পারি, তাহলে আমার এই রচনার একটা মূল্য দাঁড়ায় বলেই মনে করছি। কবিগুরু বলছেন— 'উদয়ের পথে শুনি কার বাণী ভয় নাই ওরে ভয় নাই। নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান, ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই।' আমাদের সাভারস্থ স্মৃতিসৌধের বক্ষপুটে কবিগুরুর সেই বাণী উৎকীর্ণ রয়েছে। বাংলাদেশকে পাকসেনাদের দখল থেকে মুক্ত করার জন্য যারা তাদের অমূল্য প্রাণ দিয়ে গেছেন, যতদিন না তাদের পূর্ণ তালিকাটি আমরা প্রকাশ করতে পারব, ততদিন সাভার স্মৃতিসৌধের বুকে উৎকীর্ণ কবিগুরুর ঐ কাব্যবাণীর প্রতি সুবিচার নিশ্চিত করা হয়েছে, এমন দাবি করা যাবে না। ততদিন পর্যন্ত বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদবে। আসুন আমরা আমাদের দেশমাতৃকার মুক্তির জন্য প্রাণদানকারী প্রিয় শহীদদের একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রণয়নের জন্য যথার্থ কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করি। মুক্তিযুদ্ধ মন্ত্রণালয় নামে যে মন্ত্রণালয়টি সৃষ্টি করা হয়েছে, তাকে এই মহৎ কর্ম সম্পাদনে কাজে লাগান যেতে পারে। আমাদের প্রতিটি থানাকে কাজে লাগিয়ে সেই উদ্যোগ বাস্তবায়িত করা, আমি মনে করি এখনও সম্ভব। ভিয়েতনামের মতো একটি অন্যায় যুদ্ধে নিহত লক্ষাধিক মার্কিন সৈনিকের নির্ভুল তালিকা যদি আমেরিকানরা হোয়াইট হাউসের কাছে ভিয়েতনাম ওয়ার মেমোরিয়েল মাঠে কালো গ্রানাইট পাথরে লিপিবদ্ধ করতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পারে, তো আমরা কাগজ কলমেও তা লিপিবদ্ধ করতে পারব না কেন? পারব। কিন্তু তার জন্য চাই কৃতজ্ঞচিত্তের গ্রানাইটপাথর সংকল্প। চাই অকৃত্রিম নিষ্ঠা, চাই অনিবৃত্ত দেশপ্রেম, চাই অফুরন্ত ভালোবাসা।

২৬ মার্চের দ্বিপ্রহরে কেরানীগঞ্জের ওপর দিয়ে বেশ নিচু হয়ে উড়ে যাওয়া পিআইয়ের যাত্রীবাহী বিমানকে ভূপাতিত করার লক্ষ্যে মমম-র গুলি ছোড়ার বিষয়টি জানার পর পরবর্তীকালে বঙ্গবন্ধু হাস্যোচ্ছলে বলেছিলেন, 'কী সর্বনাশ! ঐ বিমানের মধ্যে তো আমিও থাকতে পারতাম। তবে তো তোদের হাতেই আমার মরণ হতো রে!'

না, বঙ্গবন্ধু সেদিন পিআইয়ের ঐ বিমানের যাত্রী ছিলেন না। মমম যখন বিমান লক্ষ্য করে গুলি ছুড়ছিলেন এবং হামিদ সাহেবের ইটের ভাঁটায় বঙ্গবন্ধুর সন্ধান না পেয়ে শেখ মণি যখন মমম সঙ্গে ব্রাহ্মণকীর্তা থেকে নেকরোজবাগে ফিরছিলেন, ঐ সময়টাতে বঙ্গবন্ধু ঢাকা সেনানিবাসের ভিতরে আদমজী ক্যান্টনমেন্ট স্কুলের কোনো একটি নির্জন কক্ষে বন্দী ছিলেন। রক্তচক্ষু পাকসেনারা তখন বঙ্গবন্ধুকে পালাক্রমে পাহারা দিচ্ছিল আর পাকসেনাদের চরম ঔদ্ধত্যপূর্ণ নির্দেশ অগ্রাহ্য করে বঙ্গবন্ধু তাঁর প্রিয় পাইপে এরিনমুর তামাক খাচ্ছিলেন। আমি বঙ্গবন্ধুকন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে একান্তে কথা বলে নিশ্চিত হয়েছি যে, ২৫ মার্চ রাত ১-০০টা থেকে ১-৩০মিঃ অর্থাৎ ইংরেজি ক্যালেন্ডারের সময়পঞ্জি হিসেবে ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু তাঁর বাড়িতে পাকসেনাদের হাতে গ্রেফতার হন। পাকসেনারা আকাশে গুলি ছুড়ে উল্লাস প্রকাশ করতে করতে তাঁকে সামরিক জিপে উঠিয়ে প্রথমে ঢাকা সেনানিবাসে নিয়ে যায় এবং পরে জল্লাদ জেনারেল টিক্কা খানের নির্দেশে তাঁকে আদমজী ক্যান্টনমেন্ট স্কুলের একটি নির্জন কক্ষে স্থানান্তর করা হয়। সেখানে দু'দিন দু'রাত আটকে রাখার পর ২৭ মার্চের মধ্যরাতে পিআইয়ের একটি বিশেষ বিমানে করে তাঁকে করাচিতে নেয়া হয়। ঐ বিমানে বঙ্গবন্ধু একাই যাত্রী ছিলেন।

করাচি বিমানবন্দরে তোলা বঙ্গবন্ধুর সেই ঐতিহাসিক ছবিটি এখন আমাদের জাতীয় সম্পদ। ছবিতে দেখা যাচ্ছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব একটি বড়সড়ো সোফায় বাম পায়ের ওপর তাঁর ডান পা-টি তুলে দিয়ে অত্যন্ত ক্ষুব্ধমুখে বসে আছেন। তাঁর পরনে সাদা ধবধবে পাঞ্জাবি আর সাদা পাজামা। পাঞ্জাবির ওপরে কালো মুজিব কোট। তাঁর চোখে কালো মোটা ফ্রেমের চশমা। মুখ বিষণ্ন। চোখের দৃষ্টি স্থির। প্রতিজ্ঞাপ্রস্তর মুখের চোয়াল। ঘনকালো গোঁফে ঢাকা পড়েছে তাঁর দুই ঠোঁট। তাঁর অধর ও ঔষ্ঠ্যের মাঝে সামান্যতম ফাঁকও নেই। বোঝা যাচ্ছে যে তিনি দাঁতে দাঁত চেপে অসহ যন্ত্রণাকে সহ্য করার আপ্রাণ প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন। গ্রানাইট পাথরে নির্মিত মাইকেল এঞ্জেলোর সদ্যসমাপ্ত কোনো ভাস্কর্যের মতো তিনি বসে আছেন নির্বাক, নিশ্চল। তাঁর দুই পাশে দাঁড়িয়ে থেকে তাঁকে পাহারা দিচ্ছে দুজন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাকসেনা। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচার করা হচ্ছিল যে, বঙ্গবন্ধু মুক্ত আছেন এবং তিনি অন্তরালে থেকে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করছেন। পাক-সামরিক জান্তা স্বাধীন বাংলা বেতারের ঐ প্রচারণার ফাঁদে পা দিয়ে করাচি বিমানবন্দরে তোলা বঙ্গবন্ধুর গ্রেফতার হওয়ার ছবিটি বিভিন্ন প্রিন্ট মিডিয়ায় প্রকাশ করে শেখ মুজিবকে গ্রেফতার করার কৃতিত্ব দাবি করে। দেশ-বিদেশের বিভিন্ন পত্রিকায় ঐ ছবিটি প্রকাশিত হয় ৪ এপ্রিল তারিখে। ফলে বিশ্ববাসী জেনে যায় যে, পূর্ব পাকিস্তানের অবিসংবাদিত নেতা শেখ মুজিব পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর হেফাজতেই রয়েছেন। তিনি বেঁচে আছেন। সুতরাং তাঁর নিরাপত্তার সমস্ত দায় এখন পাকিস্তান সরকারের ওপরই বর্তায়। বিশ্ব জনমত শেখ মুজিবের অনুকূলে চলে গেলে, গোপনে বিচার করে তাঁকে হত্যা করার সুযোগ অনেকটাই পাকিস্তানিদের হাতছাড়া হয়ে যায়। মোটা মাথার পাকসেনানায়করা সেদিন যা বুঝতে পারেনি তা হলো, ঐ ছবিটি শেখ মুজিবের গ্রেফতার হওয়ার সত্যকেই শুধু প্রকাশ ও প্রমাণ করে না— তিনি যে বেঁচে আছেন সেই কথাটাও প্রমাণ করে। তাঁকে ক্রসফায়ারে মৃত ঘোষণা করার আর সুযোগ থাকে না।

পাকসেনাবাহিনীর গাড়িতে চড়ে অজানার পথে পা বাড়ানোর সময় বহুদিনের অভ্যাসমতো রবীন্দ্রনাথের কবিতার বই 'সঞ্চয়িতা' তিনি তাঁর সঙ্গে করে নিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু পাকসেনারা তাদেরই তত্ত্বাবধানে অনুষ্ঠিত বিগত সাধারণ নির্বাচনে বিজয়ী নেতাকে তা নিতে দেয়নি। পাকসেনাদের হাতে গ্রেফতার হওয়ার আগে আনুষ্ঠানিকভাবে তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন, সেই কথা সাধারণ জোয়ানদের অজানা থাকলেও, লে. জেনারেল টিক্কা খানসহ সেনাবাহিনীর পদস্থ অফিসাররা তা বিলক্ষণ জানতেন। পাকসেনারা বঙ্গবন্ধুর বাড়ি থেকে কিছু জিনিসপত্র লুট করল বটে কিন্তু বঙ্গবন্ধুকে তারা অসম্মান করেনি। পাকসেনারা ভেবেছিল, শেখ মুজিব প্রাণের ভয়ে বাড়ি ছেড়ে পালাবেন। কিন্তু তাঁকে বাড়িতে পেয়ে পাকসেনারা খুবই অবাক হয়। শেখ মুজিবের সাহসের কাছে তাদের পরাভব মানতে হয়। আমি পেশাদার পাকসেনাবাহিনীর চেইন অব কমান্ডের প্রশংশা করি এজন্য যে, তারা পাক প্রেসিডেন্ট ও পাকসেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল ইয়াহিয়া খানের নির্দেশ অমান্য করে উত্তেজনার বশবর্তী হয়ে বঙ্গবন্ধুকে গুলি করে বসেনি। পাকসেনাধ্যক্ষের স্পষ্ট নির্দেশ ছিল, শেখকে যদি তাঁর নিজের বাড়িতে পাওয়া যায় তবে যেন তাঁকে কোনো অবস্থাতেই হত্যা করা না হয়। কিন্তু যদি পলায়নরত অবস্থায় পাওয়া যায় তবে তাঁকে প্রয়োজনে হত্যা করা যাবে। অনেক দুঃখের মধ্যেও সুখের বিষয় যে, পাকসেনারা তাদের চিফ বসের নির্দেশ সেদিন মান্য করেছিলেন। ২৫ মার্চের রাত্রিতে মানসিক উন্মত্ততার যে স্তরে পৌঁছেছিল পাকসেনারা, সেখানে তাদের পক্ষে চেইন অব কমান্ড মেনে চলাটা কম কঠিন কাজ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছিল না। পাকসেনারা দেখিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছে যে, ২৫ মার্চের সেই ভয়াল কালরাত্রিতেও তাদের মাথা ঠিকই ছিল। অর্থাৎ ঠাণ্ডা মাথায় একটি পরিকল্পিত গণহত্যা পরিচালনা করার মতো উপযুক্ত ট্রেনিং ও পারঙ্গমতা তাদের রয়েছে। মনে হয় এসব কারণেই পাকসেনাদের পেশাদারিত্ব নিয়ে পাকিস্তানি ও তাদের সমর্থকরা সুযোগ পেলেই গর্ব করে থাকেন।

বঙ্গবন্ধুর ধারণা ছিল, তাঁকে গ্রেফতার করতে পারলে পাকসেনারা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। তাঁকে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করাবে এবং পাকিস্তান থেকে পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা চালানোর অভিযোগে হয়তো তাঁকে ফাঁসিতেও ঝুলিয়ে দিতে পারে। আর পাকসেনারা যদি তাঁকে গ্রেফতার করতে না পারে, তাহলে ক্ষিপ্ত হিংস্র পাকসেনারা তাঁর সন্ধানে ঢাকা নগরীর ঘরে ঘরে হানা দিয়ে নিরীহ বাঙালিদের নির্বিচারে হত্যা করবে। কিন্তু তাঁর ধারণা ভুল বলে প্রমাণিত হলো। বঙ্গবন্ধুকে হাতের মুঠোর মধ্যে পেয়ে যাবার পরও তাদের পূর্ব-প্রণীত নীলনকশা অনুযায়ী পাকসেনারা নির্বিচারে বাঙালি নিধনযজ্ঞটি অব্যাহতই রাখল। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে পরিচালিত পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিদের বিদ্রোহ দমনার্থে প্রণীত পাকসেনাবাহিনীর স্ট্রাটেজিদৃষ্টে মনে হয়, তারা খুব ভাল করেই জানত যে, শেখ মুজিবকে গ্রেফতার করতে পারলেই বাঙালির বিদ্রোহ থেমে যাবে না। কেননা বিগত দিনের বিভিন্ন আন্দোলনের ভিতর দিয়ে (বিশেষ করে ৬ দফা আন্দোলনের) শেখ মুজিব তার স্বাধীনতাকামী অনুসারীদের চূড়ান্ত যুদ্ধের জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত করে ফেলেছিলেন। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছিল যে, সেখানে শেখ মুজিবের মুক্ত থাকা আর বন্দী হওয়ার মধ্যে সৃষ্ট রাজনৈতিক অচলাবস্থার খুব একটা রকমফের হতে পারবে বলে মনে হয়নি। ফলে একই সঙ্গে মুজিবকে গ্রেফতার করাটা যেমন জরুরি তেমনি জরুরি হচ্ছে মুজিবের অনুসারীদের নির্বিচারে বধ করার মাধ্যমে অকুতোভয় হয়ে ওঠা ভেতো বাঙালির মনের ভিতরে নতুন করে ভয় ঢুকিয়ে দেয়া। তাতে যদি কাজ না হয়, তখন শেখ মুজিবকে মৃত্যুদণ্ড প্রদানের ভয় দেখিয়ে তাঁর মুক্তির বিনিময়ে তার অনুসারীদের সঙ্গে দরকষাকষি করার সুযোগ হাতে রাখা। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন পাকিস্তানিদের সেই প্রয়াস সর্বদা অব্যাহত ছিল। কিন্তু দুটো কারণে সেই পথে পাকসেনানায়করা তাদের প্রত্যাশিত ফল লাভ করতে ব্যর্থ হয়।

প্রথমত জেলখানার পাশে শেখ মুজিবের জন্য কবর খুঁড়েও পাকসেনারা মুক্তিযুদ্ধ-বিরোধী বা মুক্তিযুদ্ধে কিছুটা হলেও বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে পারে, এমন কোনো বিবৃতি তাঁর কাছ থেকে কখনও আদায় করতে পারেনি। তাঁর অন্তিম ইচ্ছা কী, জানতে চাওয়া হলে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, 'আমার মৃত্যুর পর আমার মৃতদেহটি যেন বাংলার মাটিতে পাঠিয়ে দেয়া হয়।' শোন কথা? এমন সাংঘাতিক কথা ক্ষুদিরামের পর আর কে কবে শুনেছে? এমন মৃতের মতো নির্ভীক মানুষের সঙ্গে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কি রাজনৈতিক দরকষাকষি করা চলে? চলে না যে তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ হচ্ছে যে, চলেনি। দীর্ঘ নয় মাস ধরে চেষ্টা চালিয়েও মৃত্যুর ভয় দেখিয়ে পাকসেনারা তাঁর কাছ থেকে কিছুই আদায় করতে পারেনি। দ্বিতীয়ত যৌথ-বাহিনীর প্রচণ্ড আক্রমণের মুখে পর্যুদস্ত পাকসেনাবাহিনীর আত্মসমর্পণের আকস্মিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের কারণে শেখ মুজিবকে দ্রুত বিচার করে ফাঁসিতে ঝোলানোর পরিকল্পনাটিও শেষ পর্যন্ত কার্যকর হয়নি। বরং জেনেভা কনভেনশনের ট্রেনটি ছেড়ে দেয়ার আগেই ভারতীয় সেনাধ্যক্ষ জেনারেল মানেক শ'র আহ্বানে তড়িঘড়ি করে পাকিস্তানের সামরিক জান্তার আত্মসমর্পণের সিদ্ধান্ত গ্রহণের কারণে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের প্রাণ রক্ষা পায় এবং মৃত্যুঞ্জয় বীরের বেশে তিনি তাঁর মুক্ত স্বদেশভূমিতে ফিরে আসতে সক্ষম হন।

প্রফেসর সেলিনা পারভীনের লেখায় তাঁর শহীদ পিতার স্মৃতি

ক'দিন আগে আমার সহপাঠী ও সহকর্মী, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিবিদ্যা বিভাগের প্রফেসর আব্দুল মান্নান আমাকে সাপ্তাহিক ২০০০-এর ১৬ মার্চের সংখ্যাটি হাতে ধরিয়ে দিয়ে রহস্য করে বললেন, পড়ে দেখবেন। সংখ্যাটি পুরানো। আমি গত ৫ এপ্রিল যুক্তরাজ্য থেকে কমনওয়েলথ পোস্ট ডক্টরাল কোর্স শেষ করে দেশে ফিরেছি। স্বাভাবিকভাবেই এই সংখ্যাটি দেখা হয়ে ওঠেনি। পাতা উল্টাতে উল্টাতে ২৮ পৃষ্ঠায় চোখ পড়তেই আমার লোমে লোমে শিহরণ জাগল, রক্তে লাগল মাতাল করা সুর। দেখলাম, আমার ছাত্রী-জীবনের সচেতন সময়ে আমার প্রিয় লেখক কবি নির্মলেন্দু গুণের একটি লেখা। লেখাটি আর কাউকে নিয়ে নয়, আমার জীবনের সবচেয়ে প্রিয় আর অনুকরণযোগ্য ব্যক্তিত্ব আমার বাবা শহীদ মোঃ শওকত আলীকে নিয়ে। তিনি তাঁকে নিয়ে লিখেছেন : 'ইতিহাসের বিকৃতিরোধ এবং ইতিহাসকে তার স্বমর্যাদায় প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে শহীদ সুবেদার মেজর শওকত আলীকে বীরশ্রেষ্ঠের মর্যাদা প্রদান করা হোক।' স্বাভাবিকভাবেই আমার খুব ভাল লেগেছে, আরও ভাল লেগেছে আমার মায়ের যিনি '৮০-র দশকের প্রথম থেকেই অসুস্থ হয়ে ইনভ্যালিড রিটায়ারমেন্ট নিয়েছেন সরকারি কলেজের অধ্যাপনা থেকে। কবি গুণের লেখাটিতে একটি ছোট ভুল ছিল। বাবার মৃত্যু দিন লেখা ছিল ২৮ মার্চ; ওটা হবে ২৯ এপ্রিল। এই কথাটি কবি নির্মলেন্দু গুণ মহোদয়কে জানাতে যেয়ে অনেক কষ্টে তাঁর মোবাইল নম্বর পেয়ে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করি। কবি জানতে পেরে খুশি হলেন। অনেক কথা হলো। আমাকে বললেন সব কথা লিখে পাঠাতে। তাই এই লেখার অবতারণা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"আমার বাবা এই দেশের জন্যে তাঁর জীবনটা স্রেফ বিলিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি জানতেন, তিনি যা করতে যাচ্ছেন তা নিশ্চিত মৃত্যুর পথ। কিন্তু তিনি ভাবনায় আর কোনো কিছু আনেননি, ভাবনায় আনেননি তাঁর প্রিয়তমা স্ত্রী আর একমাত্র কন্যার কী হতে পারে, সেই কথাটিও। যখন আমার ছেলেমেয়ে দুটিকে তাদের নানার, তাদের দাদার মুক্তিযুদ্ধে গর্বিত অবদানের কথা বলি, তখন মাঝে মাঝেই আমার চোখে জল নামে, হৃদয়ে আসে বাঁধভাঙা অশ্রুর জোয়ার। তখন মনকে গ্লানিমুক্ত লাগে, আর অশ্রুসিক্ত মনোজগতকে মনে হয় সূচিশুভ্র। শুধু মনে হয় আমার সন্তানদের তাঁরা এক উজ্জ্বল অতীত দান করে গিয়েছেন, যা তাদের পদচারণাকে কলুষমুক্ত করবে, আর তাদেরকে দিবে যথার্থ প্রতিষ্ঠা।

আমার বাবা সুবেদার মেজর শওকত আলী ছিলেন তৎকালীন ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস সিগন্যাল কোরের একজন সৈনিক। ইপিআরের সিগন্যাল কোরে বাঙালিদের মধ্যে তিনিই ছিলেন সবচেয়ে সিনিয়র অফিসার এবং ইপিআরের নিজস্ব সৈনিকদের একজন। তার উপরে যেসব অফিসার ছিলেন, তারা সবাই এসেছিলেন সেনাবাহিনী থেকে প্রেষণে। সিগন্যাল কোরের কমান্ডার ছিলেন অবাঙালি অফিসার কর্নেল আওয়ান। তার টু আই সি বা সেকেন্ড ইন কমান্ড ছিলেন আরেকজন পাঞ্জাবি মেজর। ওই সময় পিলখানায় সব বাঙালি সৈনিকের একান্ত কাছের লোক ছিলেন সুবেদার মেজর শওকত। সাধারণ এবং বাঙালি সৈনিকদের হয়ে তিনি প্রায়ই দরকষাকষি করতেন ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে। এজন্যে তাদের সুনজর থেকে বঞ্চিতও হয়েছিলেন তিনি। এমনকি একবার সাসপেন্ডও হতে হয়েছিল তাঁকে।

AMARBOI.COM

বাবার পোস্টিং তখন পিলখানায় হলেও আমি ও মা রাজশাহী থাকতাম। সে সময় মা ছিলেন রাজশাহী সরকারী মহিলা কলেজের বাংলার অধ্যাপক। ১৯৭১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বাবা সুবেদার মেজর শওকত আলীর কাছে ঢাকায় বেড়াতে যাই আমি। সেবার আমি বাবাকে বেশ চিন্তিত দেখতে পাই। একরাশ উদ্বেগ যেমন তাঁকে ঘিরে ছিল, তেমনি প্রচণ্ড কর্মব্যস্তও ছিলেন তিনি। অন্যান্য বার বাবা আমাকে নিয়ে মোটরসাইকেলে সারা ঢাকা চক্কর মেরে বেড়াতেন। কিন্তু সেবার আর সে রকম বেড়ানো হয়ে ওঠেনি। কার্যত তিনি তখনই নজরবন্দী ছিলেন। মাত্র একদিন ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে তিনি আমাকে সঙ্গে করে বেড়াতে বেরোনোর সুযোগ পেয়েছিলেন। সাতদিন বাবার সাথে থাকার পর আমাকে তিনি রাজশাহীতে মায়ের কাছে ফেরত পাঠিয়ে দেন। পিলখানায় ওই সময়ে আমি বাবাকে নিজের কোয়ার্টারে বসে একাধিক ট্রান্সমিটার বানাতে দেখেছিলাম। ট্রান্সমিটারগুলোকে বসানো হয়েছিল নাবিস্কো বিস্কুটের চারকোণা টিনের ভেতর, যাতে কেউ বুঝতে না পারে ওর ভেতর কি আছে? বাবাকে প্রশ্ন করায় তিনি বলেছিলেন ওগুলো পোর্টেবল ট্রান্সমিটার।

যুক্তরাষ্ট্র থেকে ট্রেনিং সেরে ফিরে আসার পর সুবেদার মেজর শওকত অমানুষিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরিশ্রম করে গড়ে তুলেছিলেন ইপিআরের সিগনাল ওয়ার্কশপ। ওই সময় তিনি কাজপাগল বলে পরিচিতি পেয়ে যাওয়ায় তিনি কখন কোন পার্টস নিয়ে কি করছেন, কি বানাচ্ছেন সেটা নিয়ে কেউ মাথা ঘামাত না। আর সেই সুযোগটাই তিনি কাজে লাগিয়েছিলেন। একদিন আমি বাবাকে ওই ট্রান্সমিটারগুলো বানানোর কারণ জিজ্ঞেস করেছিলাম। তাতে মৃদু বকুনি খেতে হয়েছিল আমাকে। তখন কারণ জানা না হলেও পরে আর বুঝতে বাকি থাকেনি, কেন বানানো হয়েছিল ওইসব ট্রান্সমিটার।

২৫ মার্চ ১৯৭১ সন্ধ্যা হবার কিছুক্ষণের মধ্যেই ইপিআর সিগন্যাল সেন্টার বন্ধ করে দেয়া হয় অস্বাভাবিকভাবে। অথচ স্বাভাবিক সময়ে, এমনকি ঈদের দিনও অপারেটররা পালা করে সিগন্যাল সেন্টারে ডিউটি করতেন। তখন ঢাকা শহরে থমথমে অবস্থা। সিগন্যালের পাঞ্জাবি সেকেন্ড ইন কমান্ড এসে সবাইকে ব্যারাকে যেতে বলে নিজে সেন্টারে তালা লাগিয়ে দেয়। অপারেটররা এ কথা ত্বড়িৎগতিতে গিয়ে জানান সুবেদার মেজর শওকত আলীকে। তিনি তখন সবাইকে ব্যারাকের ঘরে শুতে নিষেধ করলেন এবং ছাদে গিয়ে ঘুমাতে বললেন। এর আগে কয়েকদিন থেকেই পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর অবাঙালি সৈনিকদের হেলিকপ্টারে করে ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট থেকে পিলখানায় নামানো হচ্ছিল। প্রতিটি ব্যারাকের পিছনে সারি করে ট্রেঞ্চ কেটে তাতে অবস্থান নিয়েছিল পাকবাহিনী। এ নিয়ে পিলখানার বাঙালি সৈনিকদের মধ্যে তীব্র বিরূপভাব বিরাজ করছিল। ২৫ মার্চের আগেই অধিকাংশ বাঙালি সৈনিককে কৌশলে নিরস্ত্র করা হয়েছিল। আর ২৪ মার্চ ওরা সুবেদার মেজর শওকতের কাছ থেকে সিগন্যাল সেন্টারের চাবি নিয়ে নিয়েছিল। তখন ইপিআরের সৈনিকেরা খালি হাতে গেটে পাহারা দিত। তাদের বলা হয়েছিল অস্ত্র হাতে সৈনিক দেখলে বাঙালিরা উত্তেজিত হবে।

২৫ মার্চ রাত ১১টার কাছাকাছি সময়ে ইপিআরের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার নেসার আহমেদের বাড়ির দিক থেকে একটা ট্রেসার শেল আকাশে ফাটার সঙ্গে সঙ্গেই পাকবাহিনী গোটা ইপিআর ব্যারাক, কোয়ার্টার গার্ড দখলে নিয়ে নেয়। নিহত হয় হতচকিত অনেক বাঙালি সৈনিক। তবে প্রাথমিক হতাহতের মধ্যে সিগন্যাল কোরের লোক ছিল কম। কারণ, তারা সবাই গিয়ে ঘুমিয়েছিলেন ছাদে। এদিকে সুবেদার মেজর শওকত আলী তার কোয়ার্টারে সক্রিয় হয়ে উঠেছেন। সচল হয়ে উঠেছে তাঁর ট্রান্সমিটার। স্বাধীনতার ঘোষণা তিনি ট্রান্সমিট করতে শুরু করে দিয়েছেন ততক্ষণে। তার সহকর্মীরা তার বিধবা স্ত্রীকে অনেক কথা পরে জানালেও বঙ্গবন্ধুর ওই স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র তাঁর কাছে কি করে এসেছিল, সে কথা কেউই নিশ্চিত করে বলতে পারেননি। তাঁর সাথে সে রাতে আরো দু'একজন জড়িত ছিলেন। সে রাতে সে কথা পরে মিসেস শওকত জানতে পারেন কর্নেল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আওয়ানের কাছ থেকেই। অন্যরা বোধহয় বাকি সব ট্রান্সমিটার নিয়ে অন্য কোথাও থেকে সেই একই মেসেজ ট্রান্সমিট করবার চেষ্টা করছিলেন। যতটুকু খবর পেয়েছিলাম তাতে জানা যায়, রাত সোয়া বারোটা বা তার কাছাকাছি কিছু সময় পরেই অয়্যারলেস মেসেজ ট্রান্সমিটরত অবস্থায়ই তিনি পাকবাহিনীর হাতে ধরা পড়েন। একটি সূত্র থেকে পরে জেনেছিলাম আজিমপুর গেটে প্রহরারত সৈনিকের মারফত রাত ১০টার কিছু পরে তাঁর কাছে মেসেজ পৌঁছে যায়।

প্রথমে তাঁকে রাত একটার দিকে নিয়ে যাওয়া হয় ১১ নম্বর ব্যারাকে। তারপর নেয়া হয় মোহাম্মদপুর শরীরচর্চা কলেজের টরচার সেন্টারে। অবশ্য ইপিআর সৈনিকদের অধিকাংশকেই মেরে ফেলা হয় পিলখানাতেই। আর বাকিদের নেয়া হয় মোহাম্মদপুরে টরচার করে তথ্য আদায় করবার উদ্দেশ্যে। পিলখানা থেকে শওকতের সাথে আরও বন্দী করে যাদের আনা হয় ওই টরচার সেন্টারে, তাদের মধ্যে ছিলেন সুবেদার মোল্লা, সুবেদার জহুর মুন্সি, সুবেদার আবদুল হাই, সুবেদার আইউব প্রমুখ। এদের মধ্যে দুইজন সুবেদার মোল্লা ও মুন্সি পরিবার নিয়ে থাকতেন পিলখানার বাইরে। তাই তাঁদের পক্ষে বাইরের সঙ্গে পিলখানার ভেতরের যোগাযোগ রক্ষা করা সম্ভব ছিল। সন্দেহের কারণে এই দুজনকে সেজন্য পাকবাহিনীর অমানুষিক অত্যাচারও সহ্য করতে হয়েছিল।

আব্বার শহীদ হবার কথা আমরা সুনিশ্চিতভাবে জানতে পারি ১০ সেপ্টেম্বর ১৯৭১। এর আগে বাবার কোনো খোঁজ না পেয়ে আমার মা আমাকে নিয়ে সোজা পিলখানায় হাজির হন। সিগন্যাল কোরের কর্নেল আওয়ান মাকে চিনতেন অনেক আগে থেকেই এবং কলেজের শিক্ষক হিসেবে তাঁকে সম্মানও করতেন। তিনি মা'কে বলেন, তাকে কি করে বাঁচাব বলুন? তিনি কোয়ার্টার থেকে ধরা পড়েছেন ট্রান্সমিটারসহ। তার কাছে মুজিবের মেসেজ পাওয়া গেছে। এই কথাগুলো বলবার সময়ে কর্নেল আওয়ান বিব্রতবোধ করছিলেন। কারণ তিনি বাবাকে ব্যক্তিগতভাবে খুবই পছন্দ করতেন। মা সেদিন ঢাকা সেনানিবাসে ক্যাপ্টেন আখতার ও মেজর এজাজ মাসুদের সাথেও দেখা করেছিলেন, বাবার কোনো খোঁজ পাওয়া যায় কিনা সেটা দেখবার জন্যে। তারাও মাকে একই কথা জানিয়েছিলেন। তারা দুজন ছিলেন আমার ছোট চাচা তৎকালীন মেজর সাখাওয়াত আলীর বন্ধু। চাচা তখন পাকিস্তানে বন্দী। কর্নেল আওয়ান বাবার লুট হয়ে যাওয়া টেলিভিশন, মোটরসাইকেল ইত্যাদি ফেরত দিলেও, তাঁর ডায়েরি এবং বই খাতা ফেরত দেননি।

এরপর অনেক চেষ্টা করে আমরা সুবেদার মেজর শওকতের ভাগ্যে কী ঘটেছিল তার আবছা কিছু চিত্র জানতে পেরেছিলাম। প্রথমে তাঁর সামনেই সুবেদার আবদুল হাই ও সুবেদার জহুর মুন্সির ওপর অকথ্য অত্যাচার করা হয়। বাবার

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সামনের একটি দেয়ালে পাক হায়েনারা পেরেক দিয়ে গেঁথে দেয় হাই ও মুন্সিকে। তারপরও তাঁদের শরীরের ওপর অত্যাচার অব্যাহত থাকে। ওইভাবে পেরেক গাঁথা অবস্থায়ই তাঁদের মৃত্যু ঘটে। এ সবই ঘটেছিল তাঁর সামনে সরাসরিভাবে তাঁকে মানসিকভাবে নত করার জন্যেই।

সুবেদার মেজর শওকতের প্রতিটি নখ তুলে ফেলেছিল ওরা। তারপর দুই চোখে লোহার শিক ঢুকিয়ে দিয়েছিল। সারা শরীরে জ্বলন্ত সিগারেটের দগদগে আগুন ঘা তৈরি করে দিয়েছিল। মাথার চুলও সব উপড়ে নিয়েছিল। এত অত্যাচারেও তিনি প্রাণ হারাননি, জ্ঞানও হারাননি। পাকবাহিনী তার কাছ থেকে তাদের সুবিধেজনক স্বীকারোক্তিও নিতে পারেনি। অবশেষে ২৮ এপ্রিল গভীর রাতে তাকে আরো ২৫ জনসহ ট্রাকে করে নিয়ে যাওয়া হয় নারায়ণগঞ্জের পাগলা ঘাটে। ওই ছাব্বিশ জনকে লাইন ধরে দাঁড় করানো হয়। তারপর তাদের দেশদ্রোহিতার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয় এবং গুলি চালিয়ে দেয়া হয় সঙ্গে সঙ্গে। এদের মধ্যে সুবেদার আইয়ুব একরকম অলৌকিকভাবেই বেঁচে যান। গুলি হবার ঠিক আগের মুহূর্তেই প্রচণ্ড শারীরিক ব্যথায় তিনি কুঁকড়ে গিয়েছিলেন, আর ঠিক ঐ সময়ই গুলি চলে যায় তাঁর মাথার ওপর দিয়ে। তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাওয়ায় পাকসেনারা তাঁকেও মৃত মনে করে এবং অন্যদের সাথে তাঁকেও ঠেলে ফেলে দেয় নদীতে। পরদিন সকালে গ্রামের মানুষ তাঁকে উদ্ধার করে অজ্ঞান অবস্থায়ই। পরে তিনি সীমান্ত পেরিয়ে পশ্চিমবঙ্গের কল্যাণীতে গিয়ে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন। সেখানেই তাঁর সাথে দেখা হয়েছিল রাজশাহী থেকে পালিয়ে যাওয়া সিগন্যাল কোরের আরেক সুবেদার নাসিম আলীর। তিনি সুবেদার আইয়ুবের কাছ থেকে জানতে পেরেছিলেন ওইসব ঘটনা। আমরা জেনেছিলাম ওইসব মর্মন্তুদ ঘটনা সুবেদার নাসিমের কাছ থেকে। এছাড়াও মিসেস শওকত তার শহীদ স্বামীর পেনশন আনবার জন্যে ১৯৭২ সালে পিলখানায় গেলে, তাঁর স্বামীর অনেক সহকর্মীর সাথে দেখা হয় এবং তাঁরা ওই সব বন্দী দিনের কথা আবারও জানান তাঁকে।

সুবেদার আইয়ুব ক'বছর আগে মারা গেছেন। ইপিআরের জিডি ব্রাঞ্চের একজন স্টেনোগ্রাফার মোঃ নুরুল ইসলাম দীর্ঘদিন ধরে চরমভাবে অত্যাচারিত হবার পর মুক্তিযোদ্ধাদের দ্বারা মুক্তি পান মোহাম্মদপুরের সেই টরচার ক্যাম্প থেকে। তিনিও ওইসব ভয়াবহ ঘটনার সাক্ষী এবং এখনো জীবিত রয়েছেন। আরো দুইজন সৈনিক মিসেস শওকতকে জানিয়েছিলেন তাঁর স্বামীর বন্দী দিনগুলোর কথা এবং তাঁর ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া চরম অত্যাচারের কথা। তাঁদের একজনের নাম আবদুল মজিদ। তাঁরা জানিয়েছিল, পাঞ্জাবীরা সুবেদার মেজর শওকতকে মেরে ফেলার পর ওদের ওপর অত্যাচার চালাবার সময় টিটকারি দিয়ে বলত, 'কিধার তেরা সুবেদার মেজর? আব তেরা সুবেদার মেজর মুজিবকা ব্রিগেডিয়ার বন গ্যায়া।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পিলখানা থেকে দুইজন সুইপার এবং একজন কার্পেন্টার আবদুর রউফকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল মোহাম্মদপুর শরীরচর্চা কলেজে, সবকিছু পরিষ্কার রাখা এবং বন্দীদের একবেলা করে খাবার দেয়ার জন্যে। তারাও ওইসব ঘটনার সাক্ষী। তারা দেখেছেন, পাক হায়েনারা ট্রান্সমিশন সংক্রান্ত তথ্য জানবার জন্যে কি অমানুষিক অত্যাচারই না করেছে সুবেদার মেজর শওকতসহ অন্যদের ওপর।

সুবেদার মেজর শওকত ছিলেন বংশানুক্রমে বিপ্লবী রক্তের উত্তরাধিকারী। তাঁর পূর্বপুরুষ মোঃ সাফদার আলী সাওতাঁল বিদ্রোহে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে লড়েছিলেন। তাঁর সন্তান মোঃ লাবদার আলীকে ব্রিটিশদের অত্যাচার এড়াতে নিজভূমি ছেড়ে বীরভূমের নলহাটিতে এসে আস্তানা গাড়তে হয়। সুবেদার মেজর শওকত আলী দুঃসাহসিক নেশায় কম বয়সেই ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন। দেশ বিভাজনের পর তিনি অপশন দিয়ে পাকিস্তানে চলে আসেন, পুলিশে যোগ দেন এবং পরবর্তীতে ইপিআর গঠন হলে সেই বাহিনীতে যোগ দেন। সিগন্যাল কোরের একজন সৈনিক হিসেবে দক্ষতার সাথে গড়ে তুলতে থাকেন সিগন্যাল কোরের বিভিন্ন সুবিধাদি। দক্ষতার কারণে তিনি ধীরে ধীরে পদোন্নতি পান। শেষ পর্যন্ত তিনি সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে ইপিআর সিগন্যাল কোরের একমাত্র সুবেদার মেজর পদটি অধিকার করেন। দক্ষতার কারণে তাঁকে তদানীন্তন পাকিস্তান সরকার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দীর্ঘ ট্রেনিংয়ে পাঠায়, তবে '৬৫-র যুদ্ধের কারণে তাঁকে দেড় বছর পর জরুরি ভিত্তিতে ফেরত আনা হয়।

পরিশেষে আমি শুধু বলতে চাই এখন তো আমাদের কিছুই চাওয়ার নেই। আমার মা তীব্র সংগ্রাম করে আমাকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। আমি এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রফেসর। এখন আমার মায়ের মনে একটিই বাসনা। এদেশের সরকারের কাছে তাঁর আবেদন দেশমাতৃকার ডাকে প্রাণ বিসর্জন দেয়া এই মহান ব্যক্তিত্বের জন্যে এমন কিছু করা হোক, যা তাঁর প্রতি যথার্থভাবে প্রযোজ্য। যা অনাগত কালের ভবিষ্যৎ নাগরিকদের প্রেরণা যোগাবে।"

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুক্তির মন্দির সোপানতলে
লুৎফর রহমানের ভাষ্যে পিতা শহীদ খলিলুর রহমানের কথা

"বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ একটি জনযুদ্ধ। বাঙালির হাজার বছর ধরে বুকে পুষে রাখা স্বপ্নের সফল বাস্তবায়ন এই মুক্তিযুদ্ধ। তাই জাতি ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর বাঙালির প্রত্যক্ষ ভূমিকার কারণে আমাদের ইতিবাচক প্রাপ্তি এই স্বাধীনতা। সেদিন ইতিহাসের বাঁকে ২৬ মার্চ বঙ্গবন্ধু যখন স্বাধীনতার ডাক দেন, তখন বাঙালি ঝাঁপিয়ে পড়ে মুক্তিযুদ্ধে। তাদের কেউ কেউ আগে থেকেই মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিল, স্বাধীনতার লক্ষ্যে কাজ করে গেছে নিজস্ব অঙ্গনে নিরলসভাবে। আর অন্যরা সময়ের ডাকে যথার্থ সাড়াটি দিয়েছেন অকুতোভয়ে।

আমার বাবা শহীদ মোঃ খলিলুর রহমান ছিলেন সেই সব অগ্রসর ব্যক্তিত্বদের একজন, যিনি দীর্ঘদিন ধরে বাঙালির লালিত স্বপ্নকে বুকে ধারণ করে তার পক্ষে কাজ করে আসছিলেন। ১৯৭১ সালের ২৯ এপ্রিল তিনি নির্মমভাবে নিহত হন ঘৃণ্য পাকবাহিনীর হাতে। মৃত্যুকালে তিনি ছিলেন সিআইবি, রাজশাহী বিভাগের ভারপ্রাপ্ত অফিসার (এডিসিআইবি) রাজশাহী। সিআইবি ছিল তৎকালীন সময়ে পাকিস্তানি প্রেসিডেন্টের সরাসরি ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চ, যা বর্তমানে এনএসআই নামে পরিচিত। তিনি ছিলেন ঐ সময়ে সিআইবিতে কর্মরত জ্যেষ্ঠতম বাঙালি কর্মকর্তা।

পুলিশের চাকরি করলেও বাবা ছিলেন এক অন্য ধরনের আলোকিত মানুষ। তাঁর কর্মদক্ষতা, স্বাধীনচেতা মনোভাব, সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে পদচারণা তাঁকে দিয়েছিল এক অনন্য চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। তাঁর এই গুণাবলি তিনি সঞ্চারিত করেছিলেন তাঁর স্ত্রী ও আট সন্তানের মাঝে। তাই আমি জোর দিয়ে বলব, আমরা সব ভাইবোনেরা দুই ছাপা অক্ষরের লাইনের মধ্যে সাদা জায়গার লেখাটিও পড়তে পারি। তিনি ছিলেন কবি, নাট্যকার এবং রাজনৈতিকভাবে সচেতন একজন নাগরিক। যখন ছোট ছিলাম, স্কুলে পড়তাম, তখন আমরা সিলেট শহরে। কুমিল্লা থেকে এসে ইত্তেফাকের স্টাফ রিপোর্টার মোস্তফা ভাই কেন জানি কেমন করে খুঁজে বের করলেন আব্বাকে। সিলেট শহরে জল্লার পাড়ে আমাদের বাসায় প্রতিষ্ঠিত হলো কচি-কাঁচার মেলা আর শিল্পবিতান।

ঢাকা থেকে কচি-কাঁচার মেলার দাদাভাই, কবি সুফিয়া কামাল, শিল্পী হাশেম খান, মাহবুব তালুকদার, আবুল বারক আলভী, সুফিয়া কামালের মেয়ে রুনু আপা (বর্তমানে এ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল) প্রমুখ সবাই এসেছিলেন এই বাসায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনুশীলনে। তখন ইত্তেফাক ছিল বাঙালির অধিকার আদায়ের প্রথম সারির শব্দসৈনিক। কচি-কাঁচার মেলার সদস্যপদ দিয়ে শুরু করে পত্রিকার মানসিকতার ছত্রছায়ায় বড় হওয়া অগ্রসর পাঠকরা স্বভাবতই বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলনে উৎসাহিত হতো। যেমন হয়েছিলাম আমরা। আর এ ব্যাপারে আমার বাবার ছিল অগ্রণী ভূমিকা।

সিলেট থেকে ১৯৬২ সালের শেষ দিকে বদলি হয়ে এলাম ফরিদপুরে। ফরিদপুরে আমার বড়বোন ভর্তি হলো রাজেন্দ্র কলেজে আর আমি ফরিদপুর জেলা স্কুলে। তখন 'শরীফ শিক্ষা কমিশন' রিপোর্ট বাতিল আন্দোলনের জের চলছে। ১৯৬৩ সালের প্রথমে ফরিদপুর রাজেন্দ্র কলেজে ছাত্রলীগের গোড়াপত্তন ঘটল আমাদের বাসা থেকেই। ঝিলটুলি মহল্লার শরৎ কামিনী আলয়ে তখন থাকতাম আমরা। আমার বড় বোন লাইজু (পরবর্তীতে বাংলাদেশে প্রথম পার্লামেন্টের এমপি), কে এম ওবায়দুর রহমানের ছোট ভাই মামুন, টিপু ভাই প্রমুখ ছিলেন কলেজে ছাত্রলীগ প্রতিষ্ঠার অগ্রবর্তী সৈনিক। সেবার কলেজ ইলেকশনে ছাত্রলীগ একটি আসন দখল করে, বাকি সব পায় স্থানীয় দল পিএসএফ। এনএসএফের ঘাঁটি ধূলিসাৎ হয়। ক'দিন পরে পুলিশের তাড়া খাওয়া ছাত্রনেতা দুজন কে এম ওবায়দুর রহমান ও শেখ মণি ফরিদপুরে আসেন এবং আমাদের বাসায় আত্মগোপন করেন। যদিও আব্বার হাতেই ছিল তাদের ধরবার ভার। আব্বা তখন ফরিদপুর ডিএসবির ডিএসপি।

বিভিন্ন শহরে বদলি হয়ে অবশেষে আমরা আসি রাজশাহী। আব্বা বদলি হলেও '৬৫ সাল থেকে আর রাজশাহী ছাড়িনি আমরা। লেখাপড়া আর ছাত্র রাজনীতিতে তখন আমাদের কয়েক ভাইবোনের উত্তাল পদচারণা। পরিশেষে আব্বা রাজশাহীর সিআইবিতে এসে যোগ দেন ১৯৬৯ সালে।

রাজশাহী কলেজে '৬২ শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট বাতিল আন্দোলনের পর থেকে প্রিন্সিপাল আব্দুল হাই স্যারের প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় এনএসএফ প্রতিষ্ঠা পায়। কলেজে তাদের ছিল একচেটিয়া দুর্বৃত্তপনা। ১৯৬৫ সালে রাজশাহী কলেজে ভর্তি হয়ে দেখি তাদের বিরুদ্ধে চাপা একটি ক্ষোভ বিরাজ করছে সর্বত্র। ঠিক ওই সময়ে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগ ছাত্র সংসদ নির্বাচনে বিপুলভাবে বিজয় লাভ করে। ভিপি হন ছাত্রনেতা আবু সাইদ (পরবর্তীতে আওয়ামী সরকারের তথ্য প্রতিমন্ত্রী) আর জিএস হন সরদার আমজাদ হোসেন। তার ঢেউ আছড়ে পড়ে রাজশাহী কলেজে। অনেক সংকট কাটিয়ে অত্যাচার সহ্য করে কলেজ থেকে এনএসএফ বিতাড়িত করে ছাত্রলীগ জয়লাভ করে। আর এর প্রতিটি স্তরে গোপনে আব্বার সক্রিয় সহযোগিতা ছিল। তৎকালীন ছাত্র নেতাগণ (পরবর্তীতে যাদের অনেকেই মন্ত্রী হয়েছেন) সবাই তা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করবেন।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বঙ্গবন্ধু সব সময়ই সরকারের বিভিন্ন স্তরের গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ রাখতেন। আমার আর আমার বড়বোনের সাথে তাঁর প্রথম পরিচয় হয় ১৯৬৪ সালে ফরিদপুরে। তার পর থেকেই যোগাযোগ ছিল তাঁর শাহাদৎ-বরণ অবধি। স্বাভাবিকভাবে ছাত্র রাজনীতিতে আমাদের সক্রিয় পদক্ষেপ তৎকালীন পাকিস্তান সরকার ভালোভাবে নেয়নি। যা বলছিলাম, বঙ্গবন্ধুকে মাঝে মাঝেই প্রয়োজন অনুযায়ী তথ্য প্রদান করতেন আব্বা। নানা কথার মাঝে আজও মনে আছে একদিনের কথা। তখন ১৯৭০-এর নির্বাচনের বিষয় সামনে রেখে মনোনয়নের পালা চলছে। মোজাফ্ফর ন্যাপ নেতৃবৃন্দ দেখা করে বঙ্গবন্ধুকে একসাথে নির্বাচনের সম্ভাবনা বিচার করে ২৫টির মতো আসন দাবি করেন। বঙ্গবন্ধু প্রাথমিকভাবে ৭টি আসন দিতে রাজি ছিলেন। তখন বেগম মতিয়া চৌধুরী (তৎকালীন ন্যাপ নেত্রী, বর্তমানে আওয়ামী লীগের নেত্রী) একটি প্রস্তাব দেন। প্রস্তাব ছিল ন্যাপ একটি আসনও নেবে না, তবে সব প্রার্থীকে আওয়ামী লীগ ও ন্যাপের যৌথ প্রার্থী বলে ঘোষণা থাকতে হবে। বঙ্গবন্ধু আলোচনায় সাময়িক বিরতি দিয়ে আব্বাকে ফোন করে সিআইবি ইলেকশন রিপোর্ট জানতে চান। আব্বা তাঁকে জানান যে, তারা এই মাত্র সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট পাঠিয়েছেন প্রেসিডেন্টকে, "ল্যান্ডস্লাইড ভিক্টরি ফর আওয়ামী লীগ।" এমতাবস্থায় চাইলে আওয়ামী লীগ একলা নির্বাচনে যেতে পারে। তবে ঐ সময়ে ডিএমআই রিপোর্টে জেনারেল উমর ও জেনারেল মিঠ্ঠাখানের মন্তব্য ছিল পর্যাপ্ত অর্থ দিতে পারলে আওয়ামীবিরোধীরা অন্তত ৪০টি আসন পাবে। সেই অনুযায়ী প্রাক্তন গভর্নর মোনায়েম খান ও খান সবুরের হাতে প্রায় ২২ লক্ষ টাকা দেওয়াও হয়েছিল। কাজ হয়নি। এই সব কথা আব্বার কাছ থেকে শোনা।

সময় দ্রুত এগিয়ে চলল। "ল্যান্ডস্লাইড ভিক্টরি ফর আওয়ামী লীগ" যথার্থই ফলল। কিন্তু সামরিক বাহিনী তার চিরাচরিত ভূমিকা পালন করল। ব্যর্থ হলো শান্তিপূর্ণ ক্ষমতা হস্তান্তর। যাদের মনে তিলমাত্র দ্বিধা ছিল তারাও বুঝল স্বাধীনতা সংগ্রামের কোনো বিকল্প নেই। দ্রুত মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে হচ্ছিল। আমি তখন শহর শাখা ছাত্রলীগের দায়িত্বে। স্বাভাবিকভাবেই স্বাভাবিক জীবন ছিল না। রাজশাহীতে পাকবাহিনী ঢুকলে আমার পিঠাপিঠি দুই ভাইকে নিয়ে রাজশাহী ছাড়ি ১৩ এপ্রিলের দিকে। চৌদ্দ এপ্রিল রাজশাহী সিআইবি অফিসে ঢুকে পাকবাহিনী গুলি করে হত্যা করে দুই জন অফিসারকে, আরও কয়েকজন গুলিবিদ্ধ হয়। আব্বাকে গুলি করতে যেয়ে লাথি মেরে ফেলে দেয়, শুধুমাত্র আব্বার কাছ থেকে ব্যাংক থেকে তুলে আনা টাকা লুট করার সুবাদে। আব্বা সিনিয়র অফিসার হিসেবে দপ্তরের দায়িত্বে থেকে যান। তার পালিয়ে যাওয়ার মূল বাধা হয়ে দাঁড়ায় শহীদদের পরিত্যক্ত পরিবারবর্গ আর আমার বৃদ্ধ নানা-নানী। কিন্তু যে আবু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আখতারের পরিবারকে দেখভালের জন্য তিনি থেকে গেলেন, তারাই আর্মির কাছে আব্বার বিরুদ্ধে আমাদের দুই ভাইবোনের কথা লাগাল। তাদের ঈর্ষা তাদের স্বামী/ পিতা মারা গেছে, আমাদের আব্বা কেন বেঁচে থাকবে। তারই ফলশ্রুতিতে পাকবাহিনী ২৫ এপ্রিল আব্বাকে ধরে নিয়ে যায় এবং ২৯ এপ্রিল তাঁকে ক্যান্টনমেন্টে গুলি করে মারে।

১৩ এপ্রিলের পর আমার সাথে তাঁর আর দেখা হয়নি। মুক্তিযুদ্ধে আমি ৭নং সেক্টরে ৩নং সাব সেক্টরে ছিলাম। রাজশাহীর উত্তরাঞ্চল দিয়ে ঢেকে রাজশাহী আসতে পারি ১৭ ডিসেম্বর। গ্রামের বাড়ি থেকে আম্মা ও আমার ভাইবোনেরা আগেই পৌঁছেছিল। তথ্য তল্লাশি করে আব্বার মৃত্যুর বিষয়ে কেস ফাইল করেছিলাম। অনেক প্রমাণও যোগাড় করেছিলাম। ১৯৫ জন যুদ্ধাপরাধীর তালিকায় আব্বার হত্যাকারী মেজর সালমান মামুদ এফআইইউ ৬১২ ইউনিট আর একই ইউনিটের নায়েক সুবাদার হায়াত মাহমুদের নাম অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। কিন্তু আন্তর্জাতিক রাজনীতির টানাপোড়েনে বিচার হয়নি। বঙ্গবন্ধুর কাছে সরাসরি অভিযোগ করেছিলাম। তিনি মাথায় হাত দিয়ে করুণভাবে চেয়েছিলেন আমার দিকে। কিছু বলেননি। আমার বড় বোন নাজমা শাহীন লাইজু, প্রথম পার্লামেন্টের সদস্য হয়েছিল (রাজশাহী-দিনাজপুর জেলা থেকে)। তিনি তাঁকে বাংলাদেশের প্রথম পার্লামেন্টারি ডেলিগেশনের সদস্য করে রাশিয়াতেও পাঠিয়েছিলেন।

কোনো চাওয়া বা পাওয়ার প্রত্যাশা নিয়ে আমি এই লেখাটি লিখছি না। কালের আবর্তনে স্মরণের আড়ালে চলে যাওয়া স্মৃতিকে দীর্ঘায়িত করতে শুধু কলমের আঁচড়ে ধরে রাখতে চাইলাম। আমার পিতা শহীদ মোঃ খলিলুর রহমান, আমার শ্বশুর শহীদ সুবেদার মেজর শওকত আলী দুজনেই কাকতালীয়ভাবে ২৯ এপ্রিল মুক্তিযুদ্ধে প্রাণ দিয়াছেন। তবে দুজন দুই জায়গায়। আমার স্ত্রী একদিন দুঃখ করে তাঁর বিভাগের সহকর্মীদের বলছিল, আমাদের দুর্ভাগ্য আমরা কেউই আমাদের পিতার মরদেহ দেখতে পাইনি; পারিনি উপযুক্ত মর্যাদায় দাফন করতে। কোথাও এতটুকু চিহ্ন নেই যে, দু'দণ্ড দাঁড়িয়ে মন ভরে দেখি বাবার শেষ বিশ্রামগৃহ। এই দুঃখ কোথায় রাখি? তখন তাঁর সহকর্মী ও শিক্ষক প্রফেসর আতাউর রহমান খান সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলেন "তুমি কি বলছো? তাঁরা সারা বাংলাদেশের প্রতিটি ধূলিকণায় বিরাজ করছেন। তুমি মনের চোখ খুললেই সব দেখতে পাবে। অবিনশ্বর তাঁদের অস্তিত্ব, শুধু তোমাদেরই অনুভবের অপেক্ষা।"

'বীরশ্রেষ্ঠ' শহীদ শওকত আলীর ওপর লেখা শহীদকন্যা প্রফেসর সেলিনা পারভীন ও সেলিনার স্বামী আমাদের মুক্তিযুদ্ধের আরেক মহান শহীদ মোহম্মদ খলিলুর রহমানের পুত্র জনাব লুৎফর রহমানের স্মৃতিলেখা পাঠ করে আমার অন্তর আনন্দ বেদনায় উদ্বেলিত হয়েছে। তাঁদের শহীদ পিতার প্রতি পরম শ্রদ্ধায় নত

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়েছে আমার অন্তর। যাঁরা লিখেছেন তাঁদের পিতৃস্মৃতিকথা, তাঁদের দুজনের কেউই আমাদের লেখককুলের কেউ নন। কিন্তু আমাদের মুক্তিযুদ্ধে তাঁদের স্ব স্ব আপনজনের আত্মদানের কথা তাঁরা সাবলীল ভাষায় যে রকম মুন্সিয়ানার সঙ্গে বর্ণনা করেছেন, তাতে মনে হয় আমার চলমান রচনার সঙ্গে তাদের রচনা দুটিও মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। মনে হয়েছে তাঁদের রচনা গুপ্তধনে সমৃদ্ধ করেছে আমার রচনাটিকে। সেখানে ঘটনার পরম্পরা বর্ণনায় ছন্দচ্যুতি যেমন ঘটেনি, ভাষাশৈলীতে ভাঙনের কোনো চিহ্নও তেমনি চোখে পড়ে না। তাঁদের লেখা পড়ে মনে হয়, তাঁদের দীর্ঘদিনের অন্তরলালিত বেদনা ও গৌরববোধই আড়াল থেকে তাঁদের লেখার ভাষা যুগিয়েছে; যেখানে দুঃখ আছে, দ্রোহ আছে, আছে মৃত্যু, আছে গর্ব–, কিন্তু কোথাও মালিন্যের স্পর্শমাত্র নেই। এই তো আমাদের মুক্তিযুদ্ধের যথার্থ ইতিহাস, তার উপযুক্ত ভাষা। এখানেই আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের শ্রেষ্ঠতম গৌরব।

গত কিস্তিতে একটি মারাত্মক ভুল হয়ে গেছে। সেখানে প্রকাশিত ছবিটি শহীদ খলিলুর রহমানের নয়, ঐ ছবিটিও ছিল শহীদ শওকত আলীর। তার মানে কিছুদিন আগেও যে 'বীরশ্রেষ্ঠ' (এখনও পর্যন্ত সরকারিভাবে ঘোষিত না হলেও, আমার বিবেচনায় তিনি আমাদের অন্যতম বীরশ্রেষ্ঠ হিসেবে বিবেচিত হওয়ার যোগ্য) শহীদ শওকত আলীর ছবি কোথাও খুঁজে পাচ্ছিলাম না, আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতারাও যার ছবি আমাকে সরবরাহ করতে পারেননি, সেই শহীদ শওকত আলীর একটির পরিবর্তে দুটি ছবি আমার ভুলের কারণে সাপ্তাহিক ২০০০ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়ে গেল। আমার অনুরোধে শহীদ শওকত আলীর কন্যা প্রফেসর সেলিনা পারভীন ও শহীদ খলিলুর রহমানের পুত্র জনাব লুৎফর রহমান তাঁদের নিজ নিজ পিতৃস্মৃতি লিখে পাঠানোর পাশাপাশি আমাকে দুটি ছবিও স্ক্যান করে পাঠিয়েছিলেন। আমি ধরে নিয়েছিলাম ভিন্ন পোজে তোলা ঐ ছবি দুটি যথাক্রমে শহীদ শওকত আলী ও শহীদ খলিলুর রহমানেরই হবে। কিন্তু ঘটনা তা নয়। যাই হোক, এরকমের একটি মধুর ভুলের জন্য আমি দুঃখিত বোধ করার পরিবর্তে বরং বেশ আনন্দিতই বোধ করছি। আমার মনে হচ্ছে, এই মধুর ভুলের ভিতর দিয়ে প্রমাণিত হলো গভীরতর এই সত্যটি যে, শওকত আলী আর খলিলুর রহমানের মধ্যে কোনো ভেদ নেই। একই দিনে (২৯ এপ্রিল ১৯৭১) তাঁরা শহীদ হয়েছেন, একই কারণে তাঁরা তাঁদের মূল্যবান জীবন বিসর্জন করে গেছেন। মৃত্যুঅন্তে পরস্পরের মধ্যে মিলেমিশে তাঁদের তো একাকার হওয়ারই কথা। যিনি শওকত আলী, তিনি শুধু শওকত আলীই নন, তিনি তো কিছুটা খলিলুর রহমানও। যিনি খলিলুর রহমান তিনি তো কিছুটা শওকত আলীও বটে। তাই এই দুই বীর শহীদের পুত্র-কন্যার বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার মধ্যে, আমি যেন তাঁদের নিজ নিজ শহীদ পিতার অপ্রকাশিত ইচ্ছার প্রতিফলনই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেখতে পাচ্ছি। মনে পড়ছে রবীন্দ্রনাথের গানের কথা।

'আমায় নিয়ে মেলেছ এই মেলা,
আমার হিয়ায় চলছে রসের খেলা,
মোর জীবনে বিচিত্ররূপ ধরে
তোমার ইচ্ছা তরঙ্গিছে।
তাই তো, প্রভু, যেথায় এল নেমে
তোমার প্রেম ভক্ত প্রাণের প্রেমে
মূর্তি তোমার যুগল সম্মিলনে সেথায় পূর্ণ প্রকাশিছে।'

(গীতবিতান : পূজা : ২৯৪)

দীর্ঘদিন ধরে 'বীরশ্রেষ্ঠ'র মর্যাদা পাওয়ার যোগ্য শহীদ শওকত আলীর প্রতি যে অবহেলা প্রদর্শিত হয়েছে, পরপর দুই সংখ্যায় তাঁর ছবি প্রকাশের ভিতর দিয়ে আমাদের কৃত-অপরাধের অন্তত কিছুটা হলেও লাঘব হলো। তাই ওটাকে ঠিক ভুল না বলে ভুল-সংশোধনই বলতে পারি।

নেকরোজবাগে খসরু, তার হাতে এলএমজি

২৭ মার্চের রাতে বুড়িগঙ্গা নদীর ওপারে নেকরোজবাগে, মমমর মামাবাড়িতে স্থাপিত আশ্রয়শিবিরে অনেকদিন পর খসরুর সঙ্গে আমার দেখা হলো। মধ্য ষাট দশকের শুরু থেকেই, মুসলিম লীগের ছাত্র শাখা এনএসএফের দুর্বৃত্তপনার বিরুদ্ধে বীরদর্পে লড়াই করার কারণে খসরুর নামটি তখন মন্টুর নামের সঙ্গে এমনভাবে জড়িয়ে গিয়েছিল যে সবাই বলত- মন্টুখসরু বা খসরুমন্টু। যেন তারা একই আত্মা দুই দেহ। সম্ভবত ১৯৬৮ সালের শেষ দিকে বা ১৯৬৯ সালের শুরুতে কোনো একদিন ঢাকার নিউ মার্কেটে পাক গোয়েন্দা সংস্থার একজন কর্মকর্তাকে হত্যা করার মধ্য দিয়ে তারা মুক্তিকামী বাঙালি যুবমহলে বীরের মর্যাদা লাভ করেছিল। নিউ মার্কেটের মোনিকো রেস্টুরেন্টে পাকসেনাদের আনন্দ দেবার জন্য প্রচারিত ফওজি অনুষ্ঠান শোনার সময় প্রকাশ্য দিবালোকে ঐ পাকসেনা হত্যার ঘটনাটি ঘটে। ঐ মোনিকো রেস্টুরেন্টটি ছিল আমাদের খুবই প্রিয়। আমরা ষাট দশকের রাগী তরুণ কবি-লেখকরা সেখানে প্রচুর আড্ডা দিতাম। সেই ঘটনার সঙ্গে মন্টু বা তার ভাই সেলিম সরাসরি জড়িত ছিল না। যারা জড়িত ছিল তারা হলো– খসরু, বাবলা, নাজিম, বাচ্চু, মওলা, হুদা ও মিলন।

[তথ্যসূত্র : আবু সায়েদ মাসুদ বাবলা]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘটনার দিনই গভীর রাতে ইকবাল হল ঘেরাও করে পাকিস্তানের যৌথবাহিনী হল থেকে মন্টু ও তার বড় ভাই সেলিমকে গ্রেফতার করতে পারলেও ঘটনার মূল আসামী খসরুকে গ্রেফতার করতে ব্যর্থ হয়। হলের ছাদে ট্যাঙ্কভর্তি পানির ভিতরে সারারাত লুকিয়ে থেকে খসরু অলৌকিকভাবে গ্রেফতার এড়াতে সক্ষম হয়। সারারাত পানির নিচে লুকিয়ে থাকার কারণে তার দেহের চামড়া মরা মাছের মতো সাদা ও শরীর হিম হয়ে গিয়েছিল। ঐ দুঃসাহসিক ঘটনাটির কথা তখন বাংলাদেশের সকল ছাত্রছাত্রীর মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ে।

পাক সামরিক বাহিনীর গোয়েন্দা কর্মকর্তাকে হত্যার অভিযোগে দ্রুত বিচারে মমমর অগ্রজ সেলিমের মৃত্যুদণ্ড ও মন্টুর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়। ড. কামাল হোসেন ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের ভিতরে অনুষ্ঠিত সেই মামলা পরিচালনা করেছিলেন। সেই রায় কার্যকর হওয়ার আগেই কারাগার ভেঙে মন্টু ও সেলিম বেরিয়ে আসে। ঐ কারাগার ভেঙে বেরিয়ে আসার দিন পুলিশের গুলিতে ঢাকার কেন্দ্রীয় কারাগারের বেশ ক'জন কয়েদির মৃত্যু হয়। মুক্তিকামী বাঙালির স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিয়ে নিজেদের জীবন বিপন্ন হওয়ার ঝুঁকি নিয়েই কারাগার ভেঙে পলায়ন করার অভিযানে ঐ কয়েদিরা সেদিন তাদের সাহায্য করেছিলেন। সেলিম মন্টুকে বাঁচানোর জন্য বিভিন্ন অপরাধে দণ্ডভোগরত কয়েদিদের আত্মদানের ঘটনাটিকে আমি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ মনে করি এ কারণে যে, মন্টু বা সেলিম তাদের বিবেচনায় সেদিন শুধু দুই সহোদরই ছিলেন না, বিভিন্ন অপরাধে দ প্রাপ্ত ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের দুর্ধর্ষ কয়েদিদের কাছে তাঁরা হয়ে উঠেছিলেন বাঙালির মুক্তির প্রতীক। কারাগার ভেঙে বেরিয়ে আসার সেই দুর্ধর্ষ কাহিনীর কিছুটা আমি মন্টুর মুখে শুনেছি। কিছুটা শুনেছি আবু সায়েদ মাসুদ ওরফে বাবলার মুখে।

নেকরোজবাগে খসরুকে একটি লাইট মেশিনগান গলায় ঝুলিয়ে নিয়ে ঘোরাফিরা করতে দেখে আমার সেইসব ঘটনার স্মৃতি মনে পড়ল। মনে পড়ল, আমাকে সিআইডির তথ্য পাচারকারী হিসেবে সন্দেহ করে একদিন রাতে খসরু আমার বুকে রিভলভার ঠেকিয়ে দিয়েছিল। আমরা ক'জন বন্ধু ইকবাল হলের সামনের সিঁড়িতে বসে সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে গল্প করছিলাম। দলবল নিয়ে খসরু তখন হলে প্রবেশ করে। হলে প্রবেশ করার মুখে অন্য সকলকে ছাপিয়ে কেন জানি, হয়তো আমার মুখের খোঁচা খোঁচা দাড়ির জন্য, আমার ওপর তার চোখ পড়ে। সে ছুটে এসে আমার পাঞ্জাবির কলার গলার সঙ্গে সজোরে চেপে ধরে আমাকে হেচকা টানে দাঁড় করিয়ে ফেলে এবং মস্তানরা সাধারণ মানুষের সঙ্গে যেরকম পোকামাকড়ের মতো আচরণ করে, সেভাবেই অকথ্য ভাষায় আমাকে গালাগাল করে জানতে চায় –আমি আসলে কে এবং কী আমার আসল কাজ। আমি যত বলি, 'এ-কী করছেন? ছাড়ুন। আমার দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খসরু ততই ক্ষিপ্ত হয়ে আমার গলা আরও জোরে চেপে ধরছিল। বলছিল, 'চল, মাঠে চল।'

তখন আমার ময়মনসিংহ আনন্দমোহন কলেজ জীবনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু মাসুদ পারভেজ (ইকবাল হলের প্রাক্তন ভিপি) ও চলমান ভিপি জিনাত আলী ছুটে এসে খসরুর রুদ্র হাত থেকে আমাকে উদ্ধার করে। ওরা খসরুকে জানায় যে আমি একজন কবি। তাঁদের ভাষায়, ভাল কবি। তারা রুদ্রক্ষিপ্ত খসরুকে আমার হয়ে সাক্ষ্য দেয় যে, পাকিস্তানের পক্ষে গোয়েন্দাগিরি করার জন্য এটা আমার কোনো ছদ্মবেশ নয়।

ও নাইয়া, ধীরে চালাও তরণী

প্রিয় গুণদা

নির্মলেন্দু গুণ

কবিতার মতোই আপনার অসাধারণ গদ্যেরও একজন মুগ্ধ পাঠক আমি। সাপ্তাহিক ২০০০-এ প্রকাশিত আপনার আত্মজৈবনিক ধারাবাহিক 'আত্মকথা ১৯৭১' আমার প্রবাসে জীবনের প্রবল যান্ত্রিকতার ভেতরেও একটি অবশ্যপাঠ্য রচনা। সাধারণত কোনো ধারাবাহিক রচনা নিয়মিত পড়তে পারি না আমি। ধৈর্য হারিয়ে ফেলি কিংবা ভুলে যাই কী ঘটেছিল আগের পর্বে। বিস্ময়কর ঘটনা– এই প্রথম ধৈর্য এবং স্মৃতি দুটোই আন্ডার কন্ট্রোল। নিজের স্মৃতিকথার ভেতর অন্যের স্মৃতিকথার মিশেলে এ এক অভিনব ক্রনিক স্টাইল।

আপনার উচ্ছল গদ্যে ইতিহাসের মতো একটি খটোমটো বিষয়ও হয়ে উঠেছে উপন্যাস এবং ভ্রমণকাহিনীর মতোই চিত্তাকর্ষক। অসংখ্য চরিত্র আর শ্বাসরুদ্ধকর ঘটনাবলি আপনি অবলোকন করছেন কখনও কবির দৃষ্টিতে, কখনও সাংবাদিকের দৃষ্টিতে, আবার কখনও বা নৈর্ব্যক্তিক বিশ্লেষকের নিস্পৃহ তৃতীয় নয়নে। ইতিহাস বিকৃতির বিপন্ন ও বিষণ্ন সময়ে আপনার রচনাটি একটি উল্লেখযোগ্য ও অতিপ্রয়োজনীয় উদ্যোগ। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হলে রেফারেন্স বই হিসেবে এই বইটির দিকে আমাদের ফিরে তাকাতে হবে বারবার।

আপনার ২৪তম কিস্তি "খসরুর সঙ্গে দেখা" পর্বে বর্ণিত আপনার আনন্দমোহন কলেজ জীবনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ইকবাল হলের প্রাক্তন ভিপি মাসুদ পারভেজই যে পরবর্তীতে আমাদের চলচ্চিত্রের বিখ্যাত নায়ক (এপার ওপার, দোস্ত দুশমন) সোহেল রানা, আপনার রচনায় সেটার উল্লেখ থাকলে ভাল হতো।

বাংলায় কম্পোজ নতুন শিখেছি, এখনো পুরোপুরি রপ্ত করতে পারিনি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বানান ত্রুটি মার্জনীয়। মৃত্তিকা কেমন আছে? ওকে আমার শুভেচ্ছা। আপনি ভাল থাকবেন নির্মলদা।

লুৎফর রহমান রিটন
অটোয়া, কানাডা
৩০ মে, ২০০৭

Goon Da,
I am a Probashi Bangalee in Sweden. I am reading your autobiography of 1971. It reminds us of the golden era of our great liberation war. It became another EKATTORER DINGULI of Jahanara Imam. Unfortunately I missed first 10 parts. How can I get those?

I believe in the fundamental values of the creation of Bangladesh. And that is democracy, socialism, nationalism and secularism. Through these four points we have achieved our MUKTI SANAD, the constitution of '72. I still believe that BAKSAL is the only possible way to reach our cherished goal the SONAR BANGLA.

I would love to get your reply. Joy Bangla. Regards

AMARBOI.COM

Mustafa Jamil
Banglar Mukh
Råda Portar 96
435 32 Mölnlycke
Sweden

Dear Goon uncle,
My name is Omlan. I am a regular reader of your article in 2000 thou I am only 14 years old. I just love your article because I am really interested in 1971, Muktijuddho. I know a lot of true story of 1971. And I know the real story and behind story of Muktijuddho. Because my parents (esp. my dad) are very "Srijonshil". My moms choto chacha died in 1971. My grandfather and my boro mama was almost caught by the Pak hanadar army. etc... I know the 7th march historical speech of Bangabondhu. I know the real 27th March's Ziaur Rahman's speech. (My father is not an Awami Leager or BNP). I don't think you'll read this mail besides so much big big writer but I am hoping a reply from you.

Omlan
Mohammadpur, Dhaka.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাপ্তাহিক ২০০০ পত্রিকার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক প্রীতিভাজন গোলাম মোর্তোজা (ওর নাম শুদ্ধ করে লিখতে গিয়ে আমি বারবার হিমশিম খাই) গত সংখ্যায় প্রকাশিত (অধ্যায় ২৪) আমার ধারাবাহিক রচনাটির তলদেশে খুব ছোট ফন্টে আমার ইমেইল এ্যাড্রেসটি (আন্তর্জাল ঠিকানা) দিয়ে দিয়েছিল, যাতে পাঠকরা প্রয়োজনবোধে আমার লেখাটি নিয়ে তাদের মতামত সরাসরি আমাকে জানাতে পারে। বলা বাহুল্য, আমার অনুমোদন নিয়েই সে ঐ কাজটি করেছে। তাতে ভাল ফল ফলেছে। লেখাটি প্রকাশিত হওয়ার দিনই তিন রকমের পাঠকের কাছ থেকে আমি তিন রকমের তিনটি চিঠি পেয়েছি। রকম শব্দটির মধ্যে আমাদের জনপ্রিয় প্রবাসী ছড়াকার ও শিশুসাহিত্যিক লুৎফর রহমান রিটনকেও যুক্ত করাটা হয়তো ঠিক হলো না। বিষয়টাকে সে কীভাবে নেবে জানি না। রিটন কিছু মনে করো না, ভাই। আমি কবি, তোমার দীর্ঘদিনের চেনা-জানা নির্মলদা– এই সহজ কথাটা ভুলে যাও। আমি লিখছি ইতিহাস। আমি এখন রচনাসূত্রে ঐতিহাসিক, ইতিহাসবেত্তা, ইতিহাস লেখক বা ইতিবৃত্তকার। 'হিস্টোরিয়ান' কথাটার অনূদিত চারটি বাংলা প্রতিশব্দের মধ্যে ইতিবৃত্তকার শব্দটাই আমার ভাল লাগছে। এই লাগসই শব্দটির সঙ্গে আগে কখনও আমার দেখা হয়েছে বলে মনে পড়ে না। ভারি সুন্দর শব্দ। একইসঙ্গে শ্রুতিমধুর এবং অর্থবহ। রচনার রকমটা বিবেচনায় মনে হচ্ছে ঐতিহাসিক বা ইতিহাসবিদ নয়, ইতিবৃত্তকার অভিধাটাই আমার সম্পর্কে যথার্থ হবে। ঐতিহাসিক নয়, নিজেকে ইতিবৃত্তকার ভেবে এখন অন্তরে বড় স্বস্তি পাচ্ছি।

১৯৯৬ সালে প্রকাশিত 'রক্তঝরা নভেম্বর ১৯৭৫' গ্রন্থের ভূমিকায় আমি বলেছিলাম, 'বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের সবচেয়ে বড়-ট্যাজেডিগুলোর সঙ্গে আমার কবিজীবন অনতিক্রম্য ঘটনার আবর্তে কীভাবে ক্রমশ জড়িয়ে পড়েছিল–, 'রক্তঝরা নভেম্বর ১৯৭৫'-এ আমি সে-কথাই ইতিহাসের আদলে বলবার চেষ্টা করেছি। এই আত্মজৈবনিক গ্রন্থটি আমার ব্যক্তিজীবনকে অতিক্রম করে অনুসন্ধিৎসু ইতিহাস পাঠকের দাবিপূরণে যদি সক্ষম হয়, তাহলেই আমার শ্রম সার্থক বলে গণ্য করব। কবিতার পরিবর্তে, সময় যে আমাকে দিয়ে আমার দেশের ইতিহাস লিখিয়ে নিচ্ছে, এ এক রহস্যজনক ঘটনাই বটে!'

২০ ডিসেম্বর ১৯৯৬, পলাশী ব্যারাক, ঢাকা

সেই অজানা রহস্যের দুর্বিনীত পালে এবার মনে হচ্ছে পাগলা হাওয়ার দোলা লেগেছে। প্রীতিভাজন ছড়াকার লুৎফর রহমান রিটন যেহেতু নিজেও একজন ইতিহাসসচেতন লেখক, তাই প্রবাস থেকে লেখা তাঁর চিঠিটির একটা আলাদা গুরুত্ব আছে আমার কাছে। চিঠিটি পড়ে অনেকদিন পর রিটনের সঙ্গে মুখোমুখি দেখা হওয়ার আনন্দ পেলাম। প্রবাসজীবনের অকহতব্য কর্মব্যস্ততার মধ্যেও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার লেখাটি তুমি যথেষ্ট গুরুত্বসহকারে পাঠ করছ এবং তোমার ভাল লাগছে– জেনে আমি অন্তরে প্রচুর আনন্দবোধ করেছি। ধন্যবাদ রিটন। আমার নিজ ক্ষণকালীন প্রবাসজীবনের অভিজ্ঞতা থেকে আমি জানি, দূর দেশে বসে স্বদেশকে যতটা ফিল করা যায়, অনুভব করা যায়, স্বদেশে বসে ততটা যায় না। হাওয়ার ভিতরে থাকলে হাওয়াকে যেমন। হাঁপানিতে যখন আমাদের দম বন্ধ হয়ে আসে তখনই না আমরা বলি– 'আবার একটা ফুঁ দিয়ে দাও, ফুসফুসে পাই হাওয়া।' মাতৃগর্ভ থেকে বেরিয়ে আসার পর থেকেই না শিশু তার প্রিয় মাতৃদেহটিকে ধীরে ধীরে চিনতে শুরু করে। মস্তিষ্কের চোরাকুঠুরি থেকে হঠাৎ মুক্তি পাওয়া আমার এই কাব্যকথা তোমার ও তোমার মতো স্পর্শকাতর চিত্তের অধিকারী প্রবাসী বাঙালির স্বদেশবিরহব্যথা প্রশমনে কিছুটা সহায়ক হবে বলেই মনে করি।

আজকের মতো হাতে হাতে মুঠোফোন থাকলে মহাকবি কালিদাস কি তাঁর 'মেঘদূত' লিখতে পারতেন? অসম্ভব। অবদমিত কামতৃষ্ণা আর অনতিক্রম্য বিরহযন্ত্রণার মধ্যেই তো লুক্কায়িত ছিল মেঘদূতের প্রণয়বিদ্যুত।

'...ইতিহাস বিকৃতির বিপন্ন ও বিষণ্ন সময়ে আপনার রচনাটি একটি উল্লেখযোগ্য ও অতিপ্রয়োজনীয় উদ্যোগ। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হলে রেফারেন্স বই হিসেবে এই বইটির দিকে আমাদের ফিরে তাকাতে হবে বারবার।'

আমার বর্তমান রচনাটির প্রতি লুৎফর রহমান রিটনের এই সদয় ভাবটি সদয়-নির্দয় নির্বিশেষে বাংলাদেশের সকল পাঠকের মধ্যেই সংক্রামিত হোক– এটা আমারও একান্ত গোপন প্রার্থনা। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের 'তীরহারা এই ঢেউয়ের সাগর' আমি শেষ পর্যন্ত পাড়ি দিতে পারব তো? মাঝে মাঝে রণে ভঙ্গ দেবার সাধ জাগে। ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াতে আর কাঁহাতক ভাল লাগে? আত্মঘাতী বাঙালির (নীরদ চৌধুরীর কথা) ইতিহাস রচনা কি সহজ কাজ? বিশেষ করে রিটনের ভাষায়, ...ইতিহাস বিকৃতির এই বিপন্ন ও বিষণ্ন সময়ে...?

রিটনের পাশাপাশি, অন্য দুই পত্রলেখক সুইডেন প্রবাসী মুস্তফা জামিল ও ঢাকার কিশোর অম্লানকেও আমার লেখাটি পাঠ করার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

প্রতিপক্ষের মাথা ফাটিয়ে দিতে সক্ষম কোনো বিশালাকার গ্রন্থ রচনার অভিজ্ঞতা আমার নেই। ইতোপূর্বে 'আমার কণ্ঠস্বর' লিখেছিলাম এক বছর ধরে একটি দৈনিক পত্রিকার সাহিত্য পাতায়। ইনারের আট পৃষ্ঠা ও গ্রন্থশেষে যুক্ত আট পৃষ্ঠার নির্ঘণ্টসহ গ্রন্থের মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৬৬। এখন পর্যন্ত এর চেয়ে বড় কোনো বই রচনার অভিজ্ঞতা আমার নেই। তাই অভিজ্ঞতার অভাবহেতু আমার অবস্থা হয়েছে অনেকটা সেই মারকুটে চঞ্চলমতি ব্যাটসম্যানের মতো, ওয়ান ডে টিমের জন্য লাগসই খেলোয়াড় হলেও টেস্ট ক্রিকেটে যে নিতান্তই বেমানান। টেস্ট

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্রিকেটে সাফল্য লাভের জন্য যা দরকার, তা হলো স্কিল ও টেম্পারমেন্ট। পেশেন্স বা ধৈর্য। আর আমার ঠিক ঐ জিনিসটারই বড় অভাব। আমার কবিতার সতর্ক পাঠকরা কি লক্ষ্য করে দেখেননি যে, আমার রচিত সনেট সংখ্যায় খুবই কম। শুধু ভাব হলেই চলে না, সনেট লিখতে গেলে ধৈর্যের দরকার হয়। যারা দেদারসে সনেট লিখতে পারেন, ভাব ও বিষয়ের প্রশংসা সর্বদা করতে না পারলেও— তাদের সংযম ও ধৈর্যের প্রশংসা আমি সর্বদাই করি।

একজন ঐতিহাসিক বা ইতিবৃত্তকারের যেসব গুণাবলি থাকা দরকার, তার মধ্যে অন্যতম প্রধান একটি গুণ হচ্ছে ধৈর্য। শুধুই ধৈর্য বললে কম বলা হবে, বলতে হয় অন্তহীন ধৈর্য। ছুটন্ত জীবন্ত সময়কে অভিধানের পাতায় ঘুমিয়ে থাকা শব্দের শিকলে বাঁধা কি এতই সহজ কাজ? চাই পর্বতগুহাগাত্রে প্রার্থনারত সংসারত্যাগী নাঙা-সন্ন্যাসীদের মতো ধৈর্য, কিংবদন্তি ক্রিকেটার মোহাম্মদ হানিফ বা সুনীল গাভাস্কার বা চার্লস ব্রায়ান লারার মতো ধৈর্য।

ইতিহাস বিষয়ে নিজের ধারণা কইতে গিয়ে হঠাৎই আমার মনে পড়ে গেল রুশ-সাহিত্যিক ও ইতিবৃত্তকার কারামজিনের কথা। ১৯৮২ সালে আমি যখন লেনিনের জন্মস্থান উলিয়ানাভোস্ক ভ্রমণে গিয়েছিলাম, তখন ঐ শহরে কারামজিনের একটি চমৎকার ম্যুরাল দেখেছিলাম। আমার ইন্টারপ্রিটর লেনা দোবরাভস্কায়া আমাকে কারামজিন সম্পর্কে তখন কিছু তথ্য দিয়েছিলেন। কারামজিন রাশিয়ার ইতিহাস রচনার জন্য বিশেষভাবে স্মরণীয় হয়ে আছেন। তিনি যখন দিবারাত্রি পরিশ্রম করে রাশিয়ার ইতিহাস রচনা করছিলেন, তখন রচনার এক পর্যায়ে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লে তৎকালীন জার তাঁকে চিকিৎসার জন্য কিছু অর্থ প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেন— কিন্তু ঐ প্রতিশ্রুত অর্থ কারামজিনের কাছে খুব বিলম্বে পৌঁছায়। কারামজিন তখন মৃত্যুশয্যায়। জারের দূত জারের ঐ প্রতিশ্রুত অর্থ নিয়ে কারামজিনের কাছে যেদিন পৌঁছায়, সেদিনই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। জারের অর্থ তাঁর কোনো কাজে আসে না। পাথরে খোদাই করা ম্যুরাল চিত্রের মাধ্যমে সেই বেদনাবিধুর ঘটনাটিকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। সেখানে কারামজিনকে দেখা যাচ্ছে তাঁর অন্তিমশয্যায়, মৃত অবস্থায়; আর তাঁর শয্যাপাশে টাকার থলে হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে জারের একজন রাজদূত। আমার খুব মায়া হয়েছিল কারামজিনের স্মৃতিরক্ষার্থে নির্মিত ম্যুরালকর্মটি দেখে।

কারামজিন সম্পর্কে লিখতে বসে অভ্যাসবশত কারামজিন সম্পর্কে আরও কিছু তথ্য জানার জন্য আমি 'প্রথম আলো' কাগজে কর্মরত সহকারী সম্পাদক জাহিদ রেজা নূরের সঙ্গে যোগাযোগ করি। জাহিদ রেজা নূর আমাকে কারামজিন সম্পর্কে আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দেন। নূর সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে রুশ সাহিত্য বিষয়ে পড়াশোনা করে এসেছেন। ফলে তিনি কারামজিন সম্পর্কে আমার

WWW.AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইন্টারপ্রিটর লেনার চেয়ে অনেক বেশি জানেন। নূর জানালেন যে, কারামজিন শুধু একজন ঐতিহাসিকই নন, তিনি রাশিয়ার একজন বড়মাপের কবিও ছিলেন। পুশকিনের আগের খুব উল্লেখযোগ্য কবি তিনি। তাঁর জন্ম ১৭৬৬ এবং মৃত্যু ১৮২৬। কবি হয়েও তিনি শেষ জীবনে রাশিয়ার ইতিহাস রচনায় মনোনিবেশ করেছিলেন। তিনি বারো খণ্ডে রাশিয়ার যে ইতিহাস লিখে রেখে গেছেন, সেটাই রাশিয়ার শ্রেষ্ঠ ইতিহাস গ্রন্থ হিসেবে অদ্যাবধি গণ্য হয়। কারামজিন যে কবি ছিলেন, জাহিদ রেজা নূরের কাছ থেকে সেই কথাটি জানার পর আমি কিছুটা ভয় পেয়ে গেছি। যদিও বাংলাদেশের জারদের কাছ থেকে আমি কখনও কোনো অর্থ সাহায্যের প্রত্যাশাকে আমার অন্তরে ঠাঁই দিইনি, তবু কবির ইতিহাস চর্চা বলে কথা। এটা তো আর কবির কাজ নয়। কিছুটা অনধিকার চর্চাই বটে। ভয় পাচ্ছি, রুশ কবি কারামজিনের জীবনের অন্তিম অধ্যায়টা না আবার আমার বেলায় সত্য হয়ে ওঠে।

পাঠক 'শাহানামা'র রচয়িতা মহাকবি ফেরদৌসীর কথাও এখানে স্মরণ করতে পারেন। কারামজিনের মতোই বাদশার প্রতিশ্রুত স্বর্ণমুদ্রা তাঁর জীবদ্দশায় তিনিও পাননি। প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে বাদশা কবিকে স্বর্ণমুদ্রার পরিবর্তে রৌপ্যমুদ্রা পাঠালে কবি তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। কিছুদিন পরে কবি ফেরদৌসী অসুস্থ হয়ে পড়লে প্রতিশ্রুতিমতো স্বর্ণমুদ্রা নিয়ে বাদশার দূত ফেরদৌসীর বাড়িতে যান, কিন্তু ফেরদৌসী ততক্ষণে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে পৃথিবী থেকে চিরবিদায় নিয়েছেন।

আমাদের ভাগ্য ভাল যে, চলমান বিশ্ববাস্তবতায় আজকালকার কবিদের মুখ্য ও দৃশ্যমান পৃষ্ঠপোষক হচ্ছেন তাঁর পাঠকশ্রেণী, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া। সরকারি পাঠাগারের জন্য বাৎসরিক বরাদ্দে যৎসামান্যসংখ্যক পুস্তক ক্রয়ের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে রাষ্ট্রও কিছুটা।

প্রায় একযুগ আগে 'আমার কণ্ঠস্বর' লিখতে গিয়ে বাংলা একাডেমীসহ ঢাকার বিভিন্ন গ্রন্থাগারে পুরনো পত্রপত্রিকার পাতায় জমা ধুলোর আক্রমণে আমি খুবই অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম। সেই কথা নতুন করে মনে পড়ল। তাই স্থির করেছি, আমার জীবনী বা বাংলাদেশের ইতিহাসের তৃতীয় খণ্ডটি রচনা করতে গিয়ে আমি তত পরিশ্রম আর করব না যাতে আমি আবারও অসুস্থ হয়ে পড়তে পারি। তখন আমার কী হবে? আমার বহুকষ্টে অর্জিত কবি পরিচয়টা আমার ইতিবৃত্তকার পরিচয়ের আড়ালে রুশ-কবি কারামজিনের মতো ঢাকা পড়ে যাক, সেটাও আমি চাইব না। সো, আই উইল গো স্লো। ভাল ব্যাটসম্যানরা অফ স্টাম্পের বাইরের লুজ বলও যেমন মাঝে মাঝে ছেড়ে দেয়, আমিও তাই করব।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাড়াতে তাড়াতে তুমি কতদূর নেবে?

'নদীর এপার কহে ছাড়িয়া নিশ্বাস,
ওপারেতে যত সুখ আমার বিশ্বাস।'

আশ্চর্য হইবার কিছু নাই, —আমাদের জীবনের সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে থাকা অধিকাংশ সুন্দর ও সূক্ষ্ম অনুভবের মতোই উপরে উদ্ধৃত প্রবাদতুল্য চরণদ্বয়ও অবিস্মরণীয় রবীন্দ্রবচনই বটে। পাকবাহিনীর ২৫ মার্চের নির্বিচার নরবলিযজ্ঞের পর ২৭ মার্চ যখন দুই ঘণ্টার জন্য সান্ধ্য-আইন শিথিল করা হয়, তখন ঢাকার মানুষ যে যে-দিক দিয়ে পারে বুড়িগঙ্গা নদীর ওপারে পালিয়ে যাচ্ছিল। আমিও ছিলাম তাদেরই একজন। পিঁপড়ের সারির মতো দল বেঁধে বুড়িগঙ্গা নদী পেরুনোর জন্য ধাবমান মানুষের ঐ সন্ত্রস্ত-দৃশ্যটি যারা সেদিন দেখেছেন, যারা নিজেরাই ছিলেন ঐ করুণ দৃশ্যের কুশীলব, তারা কোনোদিনই তা ভুলতে পারবেন না। আমি চোখ বন্ধ করলে এখনও ঐ দৃশ্যটি স্পষ্ট দেখতে পাই। পরবর্তীকালে দেশত্যাগী শরণার্থীদের ভারতসীমান্তমুখী আরও দীর্ঘ, আরও ভয়াবহ মিছিলের দৃশ্য এসে ঐ ছবিটাকে আড়াল করে দাঁড়িয়েছিল বটে কিন্তু ২৭ মার্চের ঢাকা ছেড়ে পালানো মানুষের মিছিলের দৃশ্য দিয়েই শুরু হয়েছিল একাত্তরের সেই ট্রাজেডির। এর আগে ঢাকার মানুষ কখনও এভাবে শত্রুর তাড়া খেয়ে তাদের প্রিয় নগরী ছেড়ে দল বেঁধে পালিয়েছে— আমাদের ইতিহাসে তেমন নজির নেই।

AMARBOI.COM

'তাড়াতে তাড়াতে তুমি কতদূর নেবে?
এইতো আবার আমি ফিরে দাঁড়িয়েছি।'

আমার প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'প্রেমাংশুর রক্ত চাই' তখন (নভেম্বর ১৯৭০) বেরিয়ে গেছে। আমার পরবর্তী কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলো লেখার জন্য আমি যখন মনে মনে তৈরি হচ্ছিলাম, তখন পাকসেনাদের তাড়া খেয়ে ঢাকা ছেড়ে পালানো মানুষের সন্ত্রস্ত মিছিলের ভিতরে নিজেকে আবিষ্কার করে, উপরে বর্ণিত পঙক্তি দুটো হঠাৎ করেই আমার কণ্ঠ থেকে উচ্চারিত হলো। আমার দুই সঙ্গী বন্ধু নজরুল ইসলাম শাহ ও অনুজপ্রতিম হেলাল হাফিজ (হেলাল তখনও কবিতা লিখতে শুরু করেনি, লিখব লিখব বলে ভাব করছে) আমার কবিতার পঙক্তি দুটি শুনে বলল, বাহ বেশ চমৎকার। এই সময়ের জন্য এর চেয়ে সঙ্গত উচ্চারণ আর কিছুই হতে পারে না। নজরুল বলল, কবিতাটা লিখে ফেল দোস্ত। হেলালও নজরুলের কথায় সায় দিলে কবিতাটি লেখা হয়ে গেল, মনে মনে। আমার দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'না প্রেমিক না

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিপ্লবী'-তে বুড়িগঙ্গার তীরে জন্মগ্রহণ করা ঐ কবিতাটি রয়েছে– নাম 'মুখোমুখি'। পাকসেনাদের তাড়া খেয়ে আমাদের নিজেদের নগরী ছেড়ে আমরা সাময়িকভাবে পালাচ্ছি বটে, কিন্তু ঐ পালানোটাই আমাদের জীবনের বড় সত্য নয়, পালাতে পালাতে শত্রুর মুখোমুখি ফিরে দাঁড়ানোর প্রত্যয় ঘোষণাটাই হচ্ছে আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের সূচনালগ্নের মুখ্য চেতনা বা স্পিরিট। ঐ দুটো কাব্যপঙক্তি আমার বুকে জমে ওঠা অপমান ও ক্ষোভের ভার কিছুটা হলেও লাঘব করে। বুঝি মুক্তিযুদ্ধের কবিতা লেখার এই তো শুরু। এতদিন আমরা যে মুক্ত ভূমণ্ডলের স্বপ্ন দেখেছি, সেই দেশমাতৃকাকে শত্রুর দখল থেকে মুক্ত করার এই তো সময়।

ঢাকা তখন আজকের মতো এত বড় শহর ছিল না বলে নগরীকে ছাপিয়ে উঠত ধাবমান মানুষের ছবি। নগরীর আকাশ ছোঁয়া দালানকোঠার আড়ালে মানুষ তখন ঢাকা পড়ে যেত না। ফলে জেনারেল ইয়াহিয়া খানের লেলিয়ে দেওয়া হায়েনাদের পরবর্তী আক্রমণের হাত থেকে জীবন বাঁচানোর আশায় ২৭ মার্চের সকালে ঢাকা ছেড়ে পালিয়ে যাওয়া অসহায় মানুষের মিছিলের মুখগুলো ছিল ক্ষিপ্ত হিংস্র ক্ষুধার্ত বাঘের তাড়া খাওয়া সন্ত্রস্ত হরিণের মতো। বুড়িগঙ্গায় তখন প্রয়োজনের তুলনায় নৌকার সংখ্যা ছিল কম। কে জানত যে একদিন ঢাকার মানুষকে এইভাবে ঢাকা ছেড়ে নদীর ওপারে পালাতে হবে? তারা এসে হুমড়ি খেয়ে পড়বে নদীর ঘাটে। ডুবে যাবার ভয়কে বিবেচনায় না নিয়ে তারা লাফিয়ে উঠবে ছোট ছোট ডিঙি নৌকোর মধ্যে। আমরা তিন বন্ধু ছিলাম ঝাড়া হাত-পা। আমাদের সঙ্গে পরিবারের সদস্যরা, নারী-শিশু বা বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা ছিল না। আমরা নদীর ওপারে যাওয়ার ব্যাপারটিতে যতটা সম্ভব শৃঙ্খলা বজায় রাখার চেষ্টা করেছি। যাকে বলে ভলান্টিয়ারের দায়িত্ব পালন করা। লক্ষ্য রেখেছি যাতে অতিরিক্ত যাত্রীর ভারে নৌকাডুবিতে সন্ত্রস্ত মানুষের সলিল সমাধি না ঘটে। তাতে কিছুটা লাভ হয়েছিল, অন্তত আমাদের চোখের সামনে কোনো নৌকাডুবির ঘটনা ঘটেনি। কিন্তু ঐ দিন নৌকাডুবিতে ক'জন প্রাণ হারিয়েছিল বলে লোকমুখে শুনেছি। 'ওপারেতে যত সুখ আমার বিশ্বাস', ঢাকার মানুষের কাছে ঐ কথাটার চেয়ে বড় সংশয়মুক্ত সত্যভাষ্য সেদিন আর কিছুই ছিল না। সেদিন মনে হচ্ছিল বুড়িগঙ্গা নদীর এপারে পাকিস্তান, ওপারে মুক্ত স্বাধীন বাংলাদেশ।

কান্নাকাটি আর হাহুতাশ সে যতই প্রকাশ করুক না কেন, নিকট প্রিয়জন হারানো মানুষও নিজের বেঁচে থাকার আনন্দকে খুব বেশিক্ষণ লুকিয়ে রাখতে পারে না। বেদনার চেয়ে আনন্দই যে জীবনের বড় সত্য, সেই সত্যকেই সে নানাভাবে, নানারূপে প্রকাশ করে। বুড়িগঙ্গার ওপারে আমরা যে ক'দিন (২৭ মার্চ বিকেল থেকে ২ এপ্রিল বিকেল) কাটিয়েছিলাম, এই গভীরতর জীবনসত্যটাকে আমি প্রতিদিনই নানাভাবে নানারূপে প্রত্যক্ষ করেছি। মুক্তিযুদ্ধের পরবর্তী দিনগুলোতে আমরা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাংলাদেশের মানুষকে আরও সহজভাবে এই অলঙ্ঘনীয় জীবনসত্যের মুখোমুখি হতে দেখেছি। অনেকের জীবন যখন বিপন্ন, তখন পাকসেনাদের কাছ থেকে নিজেদের অস্তিত্ব গোপন করার জন্য পলায়নপর পিতামাতা তাদের ক্রন্দনরত শিশুকে গলা টিপে হত্যা করেছে – এ রকম অবিশ্বাস্য ঘটনার কথাও আমরা জানি। হায়রে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, বিপন্ন মানবচিত্তের অনুদঘাটিত কত অবিশ্বাস্য সত্যকেই না প্রকাশ করেছ তুমি। এত সত্য, এত সুন্দর, এত কঠিন, এত নিষ্ঠুর ছিলে তুমি? জীবন দিয়ে না জানলে এসব অলক্ষুণে কথা জানতই বা কে, মানতই বা কে?

নেকরোজবাগে মমম-র মামাবাড়িতে ঢাকা থেকে যারাই এসে উপস্থিত হচ্ছিল, দেখলাম, তাদের সবার হাতেই কোনো না কোনো অস্ত্র। মনে হচ্ছিল সবাই মুক্তিযুদ্ধে যোগদানের জন্য জীবন পণ করে এসেছে। যাকে বলে মন্ত্রের সাধন, নয় শরীর পাতন। সবার চোখেমুখেই বন্দি-দেশমাতৃকাকে পাকসেনাদের দখল থেকে মুক্ত করার প্রত্যয়। মার্চ মাসের শুরু থেকেই পাকসেনারা হচ্ছে হানাদার বা দখলদার বাহিনী। বন্দুকের জোরে পূর্ব পাকিস্তান যার বর্তমান নাম বাংলাদেশ, তাকে পাকিস্তানের অংশ বলে তারা যতই দাবি করুক না কেন, তাদের সেই দাবি মানছেটা কে? পাকিস্তানের চাঁদতারা খচিত পতাকাটি তো ২৩ মার্চের পর থেকেই পাকিস্তানের পূর্ব ভূখণ্ড থেকে পুরোপুরি বিদায় নিয়েছে। সর্বত্রই পতপত করে উড়েছে বাংলাদেশের নতুন পতাকা। পাকিস্তানের চাঁদতারা খচিত সাদা-সবুজ পতাকাটি উড়েছে শুধু ঢাকার সেনানিবাসে, পিলখানায় আর প্রেসিডেন্ট হাউসে। পাকিস্তানের সর্বশেষ সৈন্যটিকে বাংলাদেশের মাটি থেকে না হটানো পর্যন্ত চলবে আমাদের মুক্তির জন্য যুদ্ধ, মুক্তিযুদ্ধ। বঙ্গবন্ধু নিজে বন্দি হলে কী হবে, তাঁর নির্দেশেই শুরু হয়ে গেছে আমাদের মুক্তিযুদ্ধ। মেজর শফিউল্লাহ, মেজর ওসমানের নেতৃত্বে বাঙালি সৈনিকরা পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল ২৬ মার্চের অনেক আগেই। ২৭ মার্চ সন্ধ্যায় চট্টগ্রামে প্রতিষ্ঠিত 'স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র' থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে বালাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা প্রচার করে দেশবাসীকে দলে দলে মুক্তিযুদ্ধে যোগদানের আহ্বান জানিয়েছেন মেজর জিয়াউর রহমান।

যদিও আনুষ্ঠানিক স্বাধীনতা ঘোষণার অপেক্ষায় কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে ঘরে বসে ছিল না কেউ, তবু চট্টগ্রামের স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতারে মেজর জিয়ার স্বাধীনতা ঘোষণা প্রচারিত হতে শুনে গলায় এলএমজি ঝোলানো উজ্জীবিত খসরুও ঘোষণা করে দিল, বুড়িগঙ্গা নদীপথ ধরে পাকসেনারা একবার এখানে এসেই দেখুক না?

ভাবটা এমন যেন দেশপ্রেম, একটি এলএমজি আর কিছু সংখ্যক থ্রি নট থ্রি দিয়েই তারা পাকসেনাদের সম্মুখযুদ্ধে পরাভূত করবে। তাদের মুখে মুখে আকাশ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাঁপানো জয় বাংলার রণধ্বনি। সবার চোখেমুখে একটা যুদ্ধংদেহী ভাব। ঐ বাড়ির পাশ দিয়ে বয়ে গেছে বুড়িগঙ্গা নদী। চাঁদের আলো পড়ে সেই তরঙ্গিত নদীর জল অজানা আশংকায় কাঁপছে।

ঢাকা থেকে পালিয়ে বুড়িগঙ্গার এপারে এসে আশ্রয় নিয়েছেন ছাত্র লীগ ও আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন জনাব সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, আবদুল মালেক উকিল, মনসুর আলী, সিরাজুল আলম খান, আবদুর র‍্যাজ্জাক, তোফায়েল আহমদ, শেখ মণি, আসম আবদুর রব, নূরে আলম সিদ্দিকী, শাজাহান সিরাজ প্রমুখ। পাক সেনাবাহিনীর এই সংবাদ অজানা থাকার কথা নয়। তারা এখানে যে কোনো সময় আমাদের স্বাধীন বাংলায় আক্রমণ চালাতে পারে। আমাদের হাতে অস্ত্র নেই। জীবনে কখনও কোনো আগ্নেয়াস্ত্রে হাত দেইনি। হাতে অস্ত্র তুলে দিলেও আমরা তা চালাতে পারব বলে মনে হয় না। নজরুল ও হেলাল– দুজনই বলল, এখানে থাকাটা আমাদের মতো নিরস্ত্রদের জন্য নিরাপদ নয়। এখানে থাকলে হয়তো বেঘোরে প্রাণ দিতে হতে পারে। তার চেয়ে চল অন্য কোথাও, অন্য কোনোখানে। ইকবাল হলে আমার বুকে খসরুর পিস্তল চেপে ধরার তিক্ত ঘটনাটিও আমাকে ভাবিত করে। আমরা তিনজন সকাল হওয়ার আগেই আধো আলো ও আধো অন্ধকারে নেকরোজবাগ ছেড়ে শুভাড্যার পথে পা বাড়াই। ঐ গ্রামে মহসীন নামে আমার একজন পরিচিত বন্ধু ছিল। সে ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটির গণসংযোগ বিভাগে কাজ করত। খুব দিলদরিয়া ও বন্ধুপ্রিয় মানুষ। হেলালও মহসীনকে চিনত। মহসীনকে খুঁজে বের করতে পারলে সে নিশ্চয়ই আমাদের জন্য একটি নিরাপদ আশ্রয় খুঁজে দেবে। আমার কবিবন্ধু আবুল হাসানের কথা খুব মনে পড়ে। বন্ধু মহাদেবের কথা মনে পড়ে। ওরা এখন কোথায় কেমন আছে– আমরা কিছুই জানি না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নেকরোজবাগ ছেড়ে শুভাড্যায়

"বীরত্ব জিনিসটা কোথাও বা সুবিধাকর কোথাও-বা অসুবিধাকর হইতেও পারে, কিন্তু ওটার প্রতি মানুষের একটা গভীর শ্রদ্ধা আছে। সেই শ্রদ্ধাকে জাগাইয়া রাখিবার জন্য সকল দেশের সাহিত্যেই প্রচুর আয়োজন দেখিতে পাই। কাজেই যে-অবস্থাতেই মানুষ থাক না কেন, মনের মধ্যে তাহার ধাক্কা না লাগিয়া তো নিষ্কৃতি নাই। আমরা সভা করিয়া, কল্পনা করিয়া, বাক্যালাপ করিয়া, গান গাহিয়া সেই ধাক্কাটা সামলাইবার চেষ্টা করিয়াছি। মানুষের যাহা প্রকৃতিগত এবং মানুষের কাছে যাহা চিরদিন আদরণীয়, তাহার সকল প্রকার রাস্তা মারিয়া, তাহার সকল প্রকার ছিদ্র বন্ধ করিয়া দিলে একটা যে বিষম বিকারের সৃষ্টি করা হয় সে সম্বন্ধে কোনো সন্দেহই থাকিতে পারে না। একটা বৃহৎ রাজ্যব্যবস্থার মধ্যে কেবল কেরানিগিরির রাস্তা খোলা রাখিলে মানবচরিত্রের বিচিত্র শক্তিকে তাহার স্বাভাবিক স্বাস্থ্যকর চালনার ক্ষেত্র দেওয়া হয় না। রাজ্যের মধ্যে বীরধর্মেরও পথ রাখা চাই, নইলে মানবধর্মকে পীড়া দেওয়া হয়। তাহার অভাবে কেবলই গুপ্ত উত্তেজনা অন্তঃশীলা হইয়া বহিতে থাকে— সেখানে তাহার গতি অত্যন্ত অদ্ভুত এবং পরিণাম অভাবনীয়।"

(স্বাদেশিকতা : জীবনস্মৃতি : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ ছিল সমরবাদী পাকিস্তানের বিকারগ্রস্ত রাজনীতির 'অসুবিধাকর বীরত্বের' বিরুদ্ধে বাঙালির অবদমিত 'সুবিধাকর' বীরধর্মের অনিবার্য বিরোধ। রবীন্দ্র-জীবনস্মৃতিতে সেই বিরোধের অন্তর্নিহিত সত্যের দার্শনিক ব্যাখ্যা পাঠ করে আমি এতই মুগ্ধবোধ করেছি যে, তা আমার বর্তমান রচনার পাঠকদের গোচরে আনার লোভ সম্বরণ করতে পারিনি। শুধু লোভই বা বলছি কেন, মনে হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধের মতো একটি বিশাল ঘটনার অন্তর্নিহিত সত্য অনুধাবনে পাঠককে সহায়তা করাটা ইতিবৃত্তকার হিসেবে আমার দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। আর সেক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের চেয়ে বিশ্বস্ত শিক্ষক, এমন বিশ্ববিহারী জ্ঞানযোগী আর কে হতে পারেন? মার্কসবাদী পণ্ডিত, আমার প্রিয় শিক্ষক যতীন সরকারকেও তো দেখেছি প্রায়শ তাঁরই শরণ নিতে।

'হিন্দুমেলা'র স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলা রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর অভিজ্ঞানসমৃদ্ধ রবীন্দ্রনাথের এই দার্শনিক উপলব্ধি কিশোর-রবীন্দ্রনাথের সময়কার ঔপনিবেশিক ব্রিটিশদের জন্য যতটা সত্য ছিল; তাঁর মৃত্যুর তিরিশ বছর পর, ১৯৭১ সালেও তা ঠিক ততটাই, বা তার চেয়েও অনেক বেশি সত্য হয়ে উঠেছিল পাকিস্তানী সামরিক শাসকদের বেলায়। আমাদের মুক্তিযুদ্ধ ছিল রবীন্দ্রবর্ণিত বীরধর্মের অনিবার্য দ্বন্দ্বের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রকাশ। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে স্বাধিকারকামী বাঙালির ব্যাঘ্র-জাগরণকে তার নিজের ভিতর থেকে জাগা ন্যায়সঙ্গত বীরধর্মের প্রকাশ হিসেবে বিবেচনা না করে, তাকে বাইরে থেকে চাপিয়ে দেওয়া 'ভারতীয় ষড়যন্ত্র' বলে অপপ্রচার চালিয়ে পাকিস্তান শুধু যে আমাদের বীরধর্মের প্রতিই অবিচার করেছিল তা নয়, শেষ-বিচারে, নিজেদের কৃতকর্মের ভিতর দিয়ে তারা নিজেদেরই অপমান ও ক্ষতিগ্রস্ত করেছে বেশি।

রবীন্দ্ররচনা যে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের মনস্তাত্ত্বিক পটভূমি ব্যাখ্যায় এতটাই প্রাসঙ্গিক, তাঁর জীবনস্মৃতি পাঠের মধ্য দিয়ে সে-বিষয়টি বুঝতে পেরে আমার খুব আনন্দ হলো। বাঙালির হাজার বছরের সংগ্রামী ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় তার সর্বকালের সেরা নেতা হিসেবে শেখ মুজিবের বীরোচিত উত্থানকে তাই আকস্মিক নয়, মানবপ্রকৃতি বিচারে অনিবার্য বলেই মনে হয়। মনে হয়, পাকিস্তানের অবদমনমূলক আচরণের কারণে যে বাঙালিরা তাদের বীরধর্ম পালনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়ে নিষ্ফল পাথরে মাথা কুটে মরছিল,– সেই পাথরচাপা অবস্থার ভিতর থেকে বেরিয়ে আসার সম্ভাবনা প্রত্যক্ষ করেই আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যরা পাকিস্তানের পক্ষ ত্যাগ করে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেয়। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বাঙালি ইপিআর, বাঙালি পুলিশ ও বাঙালি সেনাসদস্যদের অংশগ্রহণ তাই কোনো আকস্মিক ঘটনা ছিল না, ছিল বাঙালির অবদমিত বীরধর্মের স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ। সুযোগ থাকার পরও যারা আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সেই মিছিলে সামিল হয়নি, বীরধর্মচ্যুত হয়ে তারা ইতিহাসের গৌরব থেকেই বঞ্চিত হয়েছে।

> 'কী পেলাম আমরা? আমরা পয়সা দিয়ে অস্ত্র কিনেছি বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য, – আজ সেই অস্ত্র ব্যবহার হচ্ছে আমার দেশের গরিব-দুঃখী মানুষের ওপর, তার বুকের ওপরে হচ্ছে গুলি। আমরা বাঙ্গালীরা যখনই ক্ষমতায় যাওয়ার চেষ্টা করেছি, তখনই তারা আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছেন।'
>
> '... রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরও দেব, তবু এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাল্লাহ..। এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। জয় বাংলা।'

পদব্রজে অজানা অচেনা গ্রামের পথে চলতে চলতে, ক্ষুধায়, রাতে ভাল ঘুমাতে না পারার দোষে যখন ক্লান্ত দেহকে আর বইতে পারতাম না, নতুন করে দেহমনকে চাঙ্গা করার জন্য তখন কখনও জোর গলায়, কখনও-বা মনে-মনে আবৃত্তি করতাম বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের প্রায় মুখস্থ হয়ে যাওয়া বজ্রকণ্ঠভাষণ, কখনও-বা আমাদের বুকের ভিতর থেকে গুনগুনিয়ে উঠত রবীন্দ্র-নজরুল, জীবনানন্দ-সুকান্তর কবিতা বা কোনো জনপ্রিয় দেশাত্মবোধক গানের চরণ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'মুক্তির মন্দির সোপানতলে
কত প্রাণ হলো বলিদান-
লেখা আছে অশ্রুজলে।'

এই গানটির রচয়িতা মোহিনী চৌধুরী। এই জনপ্রিয় প্রাণছোঁয়া গানটির রচয়িতা কে, তা আমি জানতাম না। আমার ধারণা ছিল, এর রচয়িতা নিশ্চয়ই বিখ্যাত কোনো কবি হবেন। কিন্তু গানটির রচয়িতা মোহিনী চৌধুরীর মতো অখ্যাত একজন কেউ, জেনে খুবই বিস্মিত হয়েছি। তবে এই গানের সুরকার ও গায়ক বিখ্যাতই বটে। তিনি হচ্ছেন কৃষ্ণচন্দ্র দে। জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী মান্না দে'র শিক্ষাগুরু ও আপন খুল্লতাত। তিনিই গানটিকে জনপ্রিয়তার তুঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন।

(সংস্কৃতি : জাতীয় মুখশ্রী : মাহবুব্বব উল আলম চৌধুরী)

আমি ঢাকা থেকে বেরোবার সময় সঙ্গে করে সঙ্গোপনে আমার প্রথম কাব্যগ্রন্থটি ঝোলায় পুরে নিয়েছিলাম। সদ্য-প্রকাশিতই বলা যায়, আমার কাব্যগ্রন্থটি বেরিয়েছে ১৯৭০ এর নভেম্বরের শেষ সপ্তাহে, আর আমাদের মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়েছে মার্চের শেষ সপ্তাহে। সময় বিচারে আমার কাব্যগ্রন্থটি তখন মাত্র চার মাসে পা রেখেছে। তার সারা গায়ে তখনও নববধূর মধুর গন্ধ। নববধূর মতোই আমি তাকে আমার চলার পথের সকল বিপর্যয়ের মধ্যেও যতটা সম্ভব চোখে-চোখে, বুকে-বুকে, হাতে-হাতে রাখি। মাঝে মাঝে ঝোলার ভিতরে হাত ঢুকিয়ে বইটিকে আলতো আঙুলে স্পর্শ করি। মনে হয় আবেগ থরথর প্রথম পরশ কুমারীর। কখনও বা আমার কাঁধের ঝোলা থেকে বের করে আপন প্রতিকৃতি সম্বলিত বইয়ের রুদ্র প্রচ্ছদটি চকিতে দেখে নিই। আমার ভাবতে খুব ভাল লাগে, পূর্ব পাকিস্তানের শেষ ও বাংলাদেশের প্রথম কবিতার বই এটি। খুব সম্ভবত এরপর বাংলাবাজার থেকে আর কোনো কবির কোনো কবিতার বই বেরোয়নি। তাই আবেগের আতিশয্যে রবীন্দ্র-নজরুলের পাশাপাশি নিজের কবিতা থেকেও দু'একটা পঙক্তি যে কখনও আওড়াইনি, এমন কথাও হলফ করে বলতে পারব না। সময় পেলে, হয়তো কোনো চায়ের স্টলে বসেছি চা খেতে, তখন ঝোলায় ঘুমিয়ে পড়া বইটির ঘুম ভাঙিয়ে, তার পাতা উল্টিয়ে পাঠও করেছি কোনো কোনো কবিতার কিছু প্রিয় ছত্র।

'পুরোভাগে হাঁটে মুক্ত-ভূমণ্ডল,
আগুন লেগেছে রক্তে মাটির গ্লোবে...'

পাকসেনাদের তাড়া খেয়ে নিজেদের ঘরবাড়ি ফেলে নিরাপদ আশ্রয়সন্ধানে ছুটে চলা মানুষের অনিঃশেষ মিছিলের দিকে তাকিয়ে আমি যেন আমার স্বপ্নের 'মুক্ত ভূমণ্ডল' বা বাংলাদেশকে স্পষ্ট দেখতে পাই। বুঝি বইটির অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য নামকরণ আমাদের অজস্র প্রিয়জনের রক্তদানের ভিতর দিয়ে ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠছে। মুক্তির জন্য আমাদের আরও কত প্রিয়জনকে যে তাদের বুকের তাজা রক্ত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঢেলে দিতে হবে, কে জানে? পঁচিশে মার্চ তো শেষ নয়, মনে হয় এ হচ্ছে এক দীর্ঘস্থায়ী জনযুদ্ধের শুরু। আমাদের জয়ের ভিতর দিয়েই যে এই যুদ্ধের শেষ হবে, সে ব্যাপারে আমার মনে বিন্দুমাত্র সংশয় ছিল না, কিন্তু এই যুদ্ধে আরও কত মানুষের প্রাণবলি যাবে, কতদিন লাগবে হানাদার পাকসেনাদের হাত থেকে দেশকে মুক্ত করতে– সে বিষয়ে আমার কোনো ধারণা ছিল না। আমার বারবার ভিয়েতনামের কথা মনে পড়ছিল। মনে পড়ছিল আমার নিজের লেখা একটি দীর্ঘ কবিতায় ব্যবহৃত একটি চিত্রকল্প 'দখিনপূর্ব এশিয়াবাসীর বিস্ফোরণ'।

নেকরোজবাগ থেকে মন্টু, খসরু, আফতাব, মধু ও বাবলাসহ কাউকে কিচ্ছুটি না জানিয়ে দূরে কোথাও পালিয়ে যাচ্ছি ভেবে আমার মনের ভিতরে যে অপরাধবোধ তৈরি হচ্ছিল, আমার নিজের লেখা কবিতা পড়ে সেই অপরাধবোধ থেকে আমার মনের জট খুলে যেতে থাকে। আমি বুঝতে পারি–, অস্ত্র হাতে মুক্তিযুদ্ধে সরাসরি অংশগ্রহণ করাটা আমার পক্ষে সম্ভব হবে না, কিন্তু কলম হাতে আমি আমাদের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে নিশ্চয়ই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারব। যুদ্ধের মাঠে অসির চেয়ে মসি বড় না হলেও, মসিরও যে একটা জোর আছে, তার প্রয়োজনও আছে– সে কথাটাও আমি বিশ্বাস করার মতো যথেষ্ট যুক্তি খুঁজে পাই।

শুভাড্যা গ্রামে পৌঁছে পথের পাশের একটি চায়ের স্টলে বসে আমরা চা খাচ্ছিলাম আর চায়ের স্টলে ঐ এলাকার মানুষজনের মধ্যে যারা বসেছিল, তাদের কাছে খোঁজ করছিলাম আমাদের বন্ধু মহসীনকে তারা কেউ চেনে কি না? দেখলাম অনেকেই মহসীনকে খুব ভাল করে চেনে। এলাকায় মহসীন বেশ জনপ্রিয়। চায়ের স্টলের মালিক, তরুণ বয়সী ছেলেটি বলল, আপনারা এখানে বসেন, মহসীন ভাই এখানে আসবেন। তিনি আমার চায়ের স্টলে বসেই আড্ডা দেন। শুনে আমরা আশ্বস্ত হই।

কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখি মহসীন এসে ঐ চায়ের স্টলে হাজির। দীর্ঘদিন পর মহসীনকে কাছে পেয়ে আমি তাকে আমার বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলাম। আমরা যে পাকবাহিনীর ২৫ মার্চের বর্বর হত্যাযজ্ঞ থেকে বেঁচে গেছি, এটিই ছিল মহসীনের জন্য পরম আনন্দের বিষয়। তাই তাকে আমাদের কিছুই বুঝিয়ে বলতে হলো না। নিজে থেকেই মহসীন বলল, 'পাকসেনাদের তাড়া না খেলে আপনারা কি আমাদের মতো গণ্ডগ্রামে কখনও আসতেন? আপনাদের কোথাও যেতে হবে না, এখানেই আমি আপনাদের থাকার ব্যবস্থা করে দিব। জামগাছের তলায় এই যে মনোহারি দোকানঘরটা দেখছেন, এটি আমার এক আত্মীয়ের, এখানেই আপনারা থাকবেন। পাকসেনারা বুড়িগঙ্গা নদী পেরিয়ে এখানে সহজে আসবে বলে মনে হয় না।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাকিস্তানের জন্মমৃত্যু-দর্শন

'নিঠুর গরজি, তুই মানসমুকুল ভাজবি আগুনে,
তুই ফুল ফুটাবি, বাস ছুটাবি সবুর বিহনে?
দেখ না আমার পরমগুরু সাঁই,
সে যুগযুগান্তে ফুটায় মুকুল, তাঁর তাড়াহুড়া নাই।
তোর লোভ প্রচণ্ড, ভরসা দণ্ড,
তোর কী হবে উপায়?'

(মদন বাউল রচিত একটি গানের অংশ)

'দণ্ড' শব্দটার অনেক অর্থের মধ্যে একটা যে সৈন্য, তা আমার জানা ছিল না। অভিধান দেখে আজই তা জানলাম এবং জেনে মনে প্রচণ্ড আনন্দ পেলাম। পদকর্তার বিরচিত গানের কথার মধ্যে একটা তাৎপর্যপূর্ণ নবজ্ঞানের সন্ধান পাওয়া গেল। এই আশ্চর্য দর্শনসমৃদ্ধ গানটির সঙ্গে আমাকে পরিচিত করিয়েছিলেন আমার স্কুলজীবনের শিক্ষক ও পরবর্তীকালে আমার সাহিত্যজীবনের অঘোষিত গুরু বা সাঁই (আমি তো কবি হিসেবে কিছুটা বাউল-ঘরানারও বটে), মনস্বী মার্কসবাদী লেখক শ্রীজ্ঞান যতীন সরকার।

তাঁর রচিত আত্মকথা 'পাকিস্তানের জন্মমৃত্যু-দর্শন' পাঠ করার পর, আমি অদ্য সম্পূর্ণ সজ্ঞানে, সুস্থ-মস্তিষ্কে, কারও প্ররোচনা দ্বারা প্রভাবিত বা কারো ভয়ে ভীত না হয়ে তাঁকে এই বিশেষ বিশেষণে ভূষিত করেছি।

> জানি, প্রায় হাজার বছর আগে, বাংলার বৌদ্ধধর্ম প্রচারক পণ্ডিত অতীশ দীপঙ্করের নামের সঙ্গে শ্রীজ্ঞান পদবীটি যুক্ত হয়েছিল। অতীশের পিতৃদত্ত নাম ছিল আদিনাথ চন্দ্রগর্ভ। উনিশ বছর বয়সে দণ্ড পুরীর মহাসঙ্ঘিকাচার্য শীলরক্ষিতের কাছে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হলে তাঁর নতুন নাম হয় অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান। পরে বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে গুহ্য মন্ত্রে দীক্ষিত হলে তিনি 'গুহ্যজ্ঞানবজ্র' উপাধিও লাভ করেছিলেন।

(তথ্য : বাংলা একাডেমী চরিতাভিধান)

সেই থেকে প্রায় হাজার বছর পর, আজ আমি যখন যতীন সরকারের মতো একজন মানবতাবাদী কমিউনিস্ট লেখককে শ্রীজ্ঞান উপাধিতে ভূষিত করছি, তখন আমি মনে করি তাতে ধর্মগুরু শ্রীজ্ঞান অতীশের এতটুকু অবমূল্যায়ন হয়নি, একজন যথার্থ যোগ্যপাত্রের সঙ্গে 'শ্রীজ্ঞান' উপাধিটি পুনর্যুক্ত হওয়ায় বরং অতীশ দীপঙ্করেরই পুনর্জন্ম হয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অন্য কেউ তাঁর জ্ঞানের অধীন কি না, জানি না– কিন্তু আমি জানি, আমি আকৈশোর তাঁর প্রজ্ঞা, মেধা, বুদ্ধি, সর্বধর্ম সমন্বয়বাদী অসাম্প্রদায়িক চেতনা ও জ্ঞানের অধীন। তাই তাঁর সম্পর্কে আমার এবম্বিধ বিবেচনার মধ্যে অতিভক্তির প্রাবল্য থাকলেও থাকতে পারে, কিন্তু আমার পাঠককে এ ব্যাপারে আমি শতকরা একশত ভাগ নিশ্চিত করতে পারি যে, তাতে কোনো চোরের লক্ষণ নেই। তবে হ্যাঁ, তাঁর কাছ থেকে জ্ঞান চুরি করার বাসনা আমার পূর্বেও বিলক্ষণ ছিল, এখনও আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে।

শ্রীজ্ঞান যতীন সরকারের লেখা 'পাকিস্তানের জন্মমৃত্যু-দর্শন' গ্রন্থটিকে 'প্রথম আলো' পত্রিকা যখন ১৪১১ সালে রচিত সেরা-গ্রন্থের পুরস্কার দিয়েছিল, শেরাটনে অনুষ্ঠিত সেই পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট সুধীজনদের মধ্যে আমিও উপস্থিত ছিলাম। তখন পর্যন্ত আমার স্কুলজীবনের প্রিয় শিক্ষক রচিত ঐ বইটি আমি পড়িনি। ভেবেছিলাম, এটা বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি ও তার আদর্শ থেকে ক্রমাগত দূরে সরে যাওয়া প্রথম আলো পত্রিকার সম্পাদক, প্রাক্তন কমরেড মতিউর রহমানের 'সূক্ষ্ম কারসাজি'। কমিউনিস্ট পার্টি ও তার আদর্শের পতাকাটিকে বজ্রমুঠিতে ধরে রাখা যতীন সরকারকে পুরস্কৃত করে তিনি হয়তো নিজেকে অপরাধবোধের হাত থেকে মুক্ত করার চেষ্টা করেছেন। প্রথম আলো বছরের সেরা গ্রন্থ নির্বাচনে কী নীতিমালা অনুসরণ করে, প্রতি বছর প্রকাশিত সহস্র বইয়ের ভিতর থেকে কীভাবে বছরের সেরা গ্রন্থটিকে নির্বাচন করা হয়, আমি জানি না। কবে থেকে এই পুরস্কারটি চালু হয়েছে, তাও সঠিক জানি না। পুরস্কার বিষয়টা সারা বিশ্বেই সন্দেহযুক্ত। নোবেল পুরস্কারও তার আওতামুক্ত নয়। উন্নত বিশ্বেরই যখন এই অবস্থা, তখন পুরস্কার পাওয়া নিয়ে সন্দেহের পরিমাণটা দুর্নীতিদক্ষ বাংলাদেশে বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হয় বলে ধরে নেওয়াটা খুব অস্বাভাবিক কিছু নয়। তাকে বিপদসীমার নিচে নামিয়ে আনাটা খুবই কঠিন। আমরা আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি, যারাই রাষ্ট্রক্ষমতার হাল ধরেন, তারাই তাদের প্রিয়জনদের রাষ্ট্রীয় পুরস্কারে ভূষিত করেন। জেনারেল জিয়ার আমলে স্বাধীনতা-বিরোধী শর্ষিণার পীরের স্বাধীনতা পদক পাওয়ার ঘটনাটির কথা এখানে স্মরণ করা যেতে পারে। বিগত জোট সরকারের আমলে বহু দুর্বল লেখক ও বুদ্ধিজীবীদের বাংলা একাডেমী ও একুশে পদক বা স্বাধীনতা পদক বাগিয়ে নিতে আমরা দেখেছি। স্মরণ করা যেতে পারে, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী থাকাকালে শেখ হাসিনার বিশেষ আগ্রহে আমার নিজের একুশে পদক পাওয়ার ঘটনাটির কথাও। মন্ত্রিপরিষদের সভায় আমার নাম প্রস্তাবাকারে উত্থাপিত হয়নি– শেখ হাসিনা একুশে পদক প্রাপকের তালিকায় নিজের হাতে আমার নাম লিখে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন বলে শুনেছি।

আমি আচমকা বাংলা একাডেমী পুরস্কার পেয়েছিলাম ১৯৮২ সালে। তখন আমার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বয়স মাত্র ৩৭ বছর। বাংলা একাডেমীর মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ পুরস্কার পাওয়ার কথা আমি তখন ভাবতেও পারিনি। পরের বছর থেকে বাংলা একাডেমী পুরস্কারের অর্থমূল্য যখন পাঁচ হাজার থেকে বাড়িয়ে পঁচিশ হাজারে উন্নীত করা হয়, তখন আমি আমার আচমকা পুরস্কার লাভের কারণ কিছুটা অনুমান করতে পারি। বুঝতে পারি, এ ছিল আমার শত্রুপক্ষের এক বুদ্ধিদীপ্ত ষড়যন্ত্র। কিন্তু ঐ পুরস্কার পাওয়ার কারণে আমার লাভ হয়েছিল অন্যভাবে, পুরস্কার প্রাপক হিসেবে আমি বাংলা একাডেমীর ফেলো নির্বাচিত হই, তাতে আমি অর্ধেক মূল্যে বাংলা একাডেমীর বই কিনতে পারি আর পরবর্তী বছর থেকে আমি বাংলা একাডেমী পুরস্কারের জন্য বাংলাদেশের যোগ্য লেখকদের নাম প্রস্তাব করার অধিকারও অর্জন করি। সুযোগ পেয়েই আমি বাংলা একাডেমী পুরস্কার প্রদানের জন্য আমার শিক্ষাগুরু শ্রীজ্ঞান যতীন সরকার ও আমার সাহিত্যগুরু খালেকদাদ চৌধুরীকে বাংলা একাডেমী পুরস্কারের জন্য মনোনীত করি। আমার মনে হয়, আমি উদ্যোগ না নিলে মফস্বলবাসী এই নিবেদিতপ্রাণ সাহিত্যিকদের পক্ষে বাংলা একাডেমীর দেয়াল টপকানো সহজ হবে না। কিছুটা লবিংও করি। শেষে মনীষী কবীর চৌধুরী ও সাহিত্যিক-সাংবাদিক মরহুম আবু জাফর শামসুদ্দীনের যৌথ উদ্যোগের কারণে অশীতিপর প্রবীণ সাহিত্যিক, নেত্রকোনায় নিভৃতে বসবাসকারী খালেকদাদ চৌধুরী তাঁর মৃত্যুর কয়েক বছর আগে বাংলা একাডেমী পুরস্কার লাভ করেছিলেন। তাতে আমার মনে কিছুটা স্বস্তি আসে। কিন্তু শ্রীজ্ঞান যতীন সরকার পূর্বের মতোই আমার অন্তরে গোপন-অস্বস্তির কাঁটা হয়ে অদ্যাবধি থেকে গেছেন। যদিও তাঁর নিজের রচিত সাহিত্যকর্মের জন্য কোনোপ্রকার পুরস্কারের আশা বা লোভ তাঁর মধ্যে বিন্দুমাত্র রয়েছে বলে আমার কখনোও মনে হয়নি। 'কর্মৈব অধিকারস্তে, মা ফলেষু কদাচন'-তত্ত্বে বিশ্বাসী সদাহাস্যময় মানুষ তিনি। তাঁর লেখা পাঠ করার সংবাদেই তিনি অন্তরে প্রীত হন। আর তাঁর লেখাকে সত্য বলে মানলে তো কথাই নেই। ওটাকেই তিনি তাঁর লেখক জীবনের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার বলে ভাবেন। তা পুরস্কার নিয়ে তিনি নিজে যাই ভাবুন না কেন, ছাত্র হিসেবে আমার শিক্ষাগুরুর প্রতি তো একটা কর্তব্য আছে। যোগ্য হওয়ার পরও বাংলা একাডেমী পুরস্কার না পাওয়ার জন্য তিনি যে অস্বস্তি বোধ করেন না, সেটা তাঁর মহত্ত্ব, কিন্তু এটা তো আমার স্বস্তির কারণ হতে পারে না। নিজেকে অস্বস্তির ভার থেকে মুক্ত করার জন্যই আমি গোপনে তাঁকে বাংলা একাডেমী পুরস্কার পাইয়ে দেওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকি। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও আমি এই মার্কসবাদী পণ্ডিতকে বাংলা একাডেমীর পিচ্ছিল পুলসিরাতের পুলটি পার করাতে ব্যর্থ হই। এসব কথা তাঁর জানবার কথা নয়। তিনিও আমার পাঠকের সঙ্গে এ-তথ্যটি জানবেন। তাঁর সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে গেলে তাঁকে পা ছুঁয়ে প্রণাম করি, আর মনে-মনে বলি, আপাতত আমার প্রণাম নিয়েই তুষ্ট থাকেন স্যার। এবারও হলো না। এভাবেই চলছিল। ড. এনামুল হক স্বর্ণপদক, খালেকদাদ চৌধুরী সাহিত্য পুরস্কার,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মনিরুদ্দীন ইউসুফ সাহিত্য পুরস্কার, নারায়ণগঞ্জের শ্রুতি স্বর্ণপদক ও ময়মনসিংহ প্রেসক্লাব সাহিত্য পুরস্কারের মতো ছোটো ছোটো পুরস্কারগুলোই তাঁর ভাগ্যে জুটবে বলে আমি যখন প্রায় ধরেই নিয়েছিলাম, তখন একটি বর্ষসেরা গ্রন্থের রচয়িতা হিসেবে তিনি যখন প্রথম আলো প্রবর্তিত অত্যন্ত সম্মানজনক ও কিছুটা মোটা অংকের অর্থযুক্ত পুরস্কারে ভূষিত হন, তখন আমি একইসঙ্গে খুব অবাক ও খুশি হই। স্বীকার করি, তাঁকে পাদপ্রদীপের আলোয় নিয়ে এসে কমরেড মতিউর রহমান দীর্ঘদিন পর একটি খুব ভাল কাজ করেছেন।

পুরস্কৃত গ্রন্থটি আগে আমার পড়া হয়নি। পুরস্কার প্রদান-অনুষ্ঠানের দিন শেরাটনে বইটি হাতে নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখেছিলাম মাত্র। ঐ বইটিতে যে বেশ কয়েক স্থানে আমার কথাও আছে, তা আমার স্যারও আমাকে বলেননি, আমিও কখনও খুঁজে দেখিনি। সম্প্রতি সাপ্তাহিক ২০০০ পত্রিকায় ১৯৭১ সম্পর্কে স্মৃতিকথা লিখতে বসে, আমি তাঁর গ্রন্থটি সংগ্রহ করে পড়তে শুরু করি। সাড়ে চার শ' পৃষ্ঠার বই। দীর্ঘ রচনা পাঠের শক্তি ও ধৈর্য আমার নেই। আমার হচ্ছে ছোটো গরুর স্বভাব। পথ চলতে চলতে খাই। আমি খুব অস্থিরচিত্ত। বড় বই আমার চোখের বালি। একবার কিছুদিন জন্ডিসের কারণে আমাকে শয্যাশায়ী থাকতে হয়েছিল। তখন আমি সময় কাটাতে দস্তয়ভস্কির 'ক্রাইম এ্যান্ড পানিসমেন্ট' বইটি পড়েছিলাম। ওটাই আমার পড়ে শেষ করা আমার জীবনের সবচেয়ে বড় গ্রন্থ। তারপর দীর্ঘ বিরতি শেষে আমি আবার একটি চোখের বালি পড়তে শুরু করেছি। 'পাকিস্তানের জন্মমৃত্যু-দর্শন' বইটি আমি যতই পড়ছি, রচয়িতার প্রতি শ্রদ্ধায় ও বিস্ময়ে আমার চিত্ত অবনত হচ্ছে। প্রতিটি অধ্যায় পাঠ শেষে আমার জ্ঞানভাণ্ড সমৃদ্ধ হচ্ছে।

আমার নিজের লেখা আত্মজীবনী নিয়ে আমার মনে একটা গোপন গর্ববোধ ছিল। কলকাতার দেশ পত্রিকা 'আমার কণ্ঠস্বর'-এর ওপর একটি দীর্ঘ আলোচনা ছেপে (প্রায় ৬ পৃষ্ঠা) আমাকে কিছুটা বিভ্রান্তির মধ্যে ফেলে দিয়েছিল। সেই দীর্ঘ আলোচনার উপসংহারে ইতিহাসবিদ শ্রীসুরজিৎ দাশগুপ্ত লিখেছিলেন :

> 'বহু দিক থেকেই নির্মলেন্দু গুণের 'আমার কণ্ঠস্বর' অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসি দার্শনিক জাঁ জাক রুশোর লেখা 'স্বীকারোক্তি' নামক বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থের সাথে তুলনীয়। স্বাধীনতার স্বপ্নে উদ্বেলিত, কিন্তু প্রবৃত্তির নাগপাশে জর্জরিত। এ-গ্রন্থ মানবিক অস্তিত্বে এমন এক বহুমাত্রিক প্রকাশ, যা একাধারে নাটকীয় ও মর্মস্পর্শী।'

(দেশ : ৪ নভেম্বর ১৯৯৫)

আলোচক সুরজিৎ দাশগুপ্তই শুধু নন, দেশ-সম্পাদক সাগরময় ঘোষ ও মনীষী অন্নদাশঙ্কর রায় মহাশয়ও আমার আত্মজীবনীমূলক রচনাটির জন্য তখন সাক্ষাতে আমাকে ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন। সাগরময় ঘোষ আমাকে বলেছিলেন, সুরজিৎ-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এর আলোচনাটি পড়ার পর, ওর কাছ থেকে নিয়ে তোমার বইটি আমি এক নিঃশ্বাসে পড়েছি। এ রকম আগ্রহ নিয়ে বহুদিন কোনো বই আমি পড়িনি। সুরজিৎ আরও বড় আলোচনা করেছিল, আমি তো ওর লেখা পুরোটা ছাপিনি। পাকিস্তানের ভিতর থেকে বাংলাদেশের হয়ে ওঠাটা বোঝার জন্য এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বই। দীর্ঘ আলোচনার জন্য তোমার লজ্জা পাওয়ার কিছু নেই। অন্নদাশঙ্কর স্মরণ করেছিলেন কর্মসূত্রে ময়মনসিংহ, নেত্রকোণা-মোহনগঞ্জ এলাকায় তাঁর ভ্রমণের স্মৃতি।

এখন সেই সাগরময় ঘোষ বা অন্নদাশঙ্কর– দুজনের কেউই বেঁচে নেই। বেঁচে থাকলে আমি কলকাতায় গিয়ে তাঁদের দুজনের হাতে শ্রীজ্ঞান যতীন সরকার বিরচিত 'পাকিস্তানের জন্মমৃত্যু-দর্শন' বইটি তুলে দিয়ে বলতাম, 'আমার কণ্ঠস্বর' নয়, বাংলাদেশকে আরও গভীরভাবে বোঝার জন্য যে বইটি অনেক বেশি সহায়ক; অনেক বেশি তথ্য দ্বারা সমর্থিত এবং ভালোমন্দ প্রতিটি ঘটনার কার্যকারণ সম্পর্ক মার্কসবাদী ও পাভলভীয় মনস্তত্ত্ব দ্বারা বিশ্লেষিত– সেটি হলো এটি। 'পাকিস্তানের জন্মমৃত্যু-দর্শন' আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের কালজয়ী দলিল মাত্র নয়, নয় শুধু ঘনিষ্ঠভাবে ইতিহাসসংলগ্ন একটি আত্মজীবনীমাত্র– এটি বাংলাদেশের হিন্দু-মুসলমানের মধ্যকার দীর্ঘদিনের সংঘর্ষ ও মিলনের এক রসঘন গাথাকাব্য বা এপিক ব্যালাড। সাবহেডিং বা অধ্যায়ের আল দিয়ে গ্রন্থটিকে খণ্ডিত না করলে পাঠক একটি মহাজীবনের উপাখ্যান পাঠের আনন্দ লাভ করতেন বলেই আমার মনে হয়। অবশ্য ছোটো ছোটো অধ্যায়ে বিভক্ত বলে খুব দীর্ঘ রচনাও পাঠক পছন্দমতো পড়ে নিতে পারেন। সাইটেশন বা সংসাবচনে বইটি সম্পর্কে প্রথম আলোর পক্ষ থেকে যথার্থই মন্তব্য করা হয়েছে... 'জাতির জীবনে উল্লেখযোগ্য ঘটনা-পরম্পরার বিবরণ ও বিশ্লেষণ একদিকে যেমন উপন্যাস পাঠের মোহনীয়তা সৃষ্টি করে, অন্যদিকে পাঠকের ভাবনাকে অনবরত জাগ্রত রাখে। পাঠক শুধু একজন রুচিশীল যুক্তিবাদী অসাম্প্রদায়িক ব্যক্তির পরিচয় নয়, একই সঙ্গে পাকিস্তানের জন্মপূর্বকাল থেকে বাংলাদেশের অভ্যুদয় পর্যন্ত একটি ঐতিহাসিক সময়ের পরিচয় ও তাৎপর্য-সমন্বিত উচ্চমানের সাহিত্যকর্মের স্বাদ গ্রহণ করেন।'

গ্রন্থের ভূমিকায় লেখক জানিয়েছেন, সাপ্তাহিক খবরের কাগজ-এ ১৯৯৪ এর আগস্ট থেকে ১৯৯৬ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত দু'বছরের চেয়েও বেশি সময় ধরে তিনি এই গ্রন্থটি রচনা করেছেন। ভেবে কিছুটা বিস্মিতই হচ্ছি যে, আমি 'আমার কণ্ঠস্বর' গ্রন্থটিও রচনা করেছিলাম প্রায় একই সময়ে, ১৯৯৪ সালে। প্রায় এক বছর ধরে আমার লেখাটিও ধারাবাহিকভাবে বাংলাবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। রচনাকাল নির্বাচনে ছাত্রের সঙ্গে শিক্ষকের মিলটিকে আমি কিছুটা বিস্ময়কর ও কাকতালীয় বলেই মনে করছি। দীর্ঘদিন পর, এবার একই পত্রিকায় আমরা দুজন লিখতে বসেছি আমাদের নিজ নিজ অতিক্রান্ত জীবনের কথা। তুলনায় সময়বিচারে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এগিয়ে রয়েছেন শ্রীজ্ঞান যতীন সরকার। ১৯৯৪ সালে আমি যখন ১৯৬২-১৯৭০ পর্যন্ত সময়খণ্ড নিয়ে লিখেছিলাম, তখন শ্রীজ্ঞান লিখেছিলেন তাঁর জন্মসাল ১৯৩৬ থেকে ১৯৭১-এর ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়খণ্ডকে নিয়ে। এবার আমি যখন ১৯৭১ নিয়ে লিখতে শুরু করেছি, তখন –পাকিস্তানের ভূতদর্শন, এই শিরোনামে ১৯৭২ সাল থেকে তিনি শুরু করেছেন তাঁর লেখা। এটি হবে তাঁর আত্মজীবনীর দ্বিতীয় খণ্ড। আমার বেলায় তৃতীয়। গুরু-শিষ্যের দ্বৈতরাগিণী নিয়ে ইতোমধ্যেই একজন রসিক পাঠক আমাদের শুভেচ্ছা ও সমর্থন জানিয়ে একটি পত্র লিখেছেন।

শুরুতে উদ্ধৃত মদন বাউলের গানটি, আমার চঞ্চলচিত্তকে কিছুটা হলেও শান্ত করতে পেরেছে বলেই মনে হচ্ছে। দেখা যাক ক্রিজ আগলে রেখে সে কতক্ষণ শান্ত হয়ে ব্যাট চালাতে পারে। আপাতত পুরনো বটবৃক্ষের মতো অজস্র শিকড়-বন্ধনে মাটির সঙ্গে নিজেকে বেঁধে রাখা ছাড়া আমার আর কোনো কাজ নেই। আমার কোনো তাড়াহুড়া নেই।

ইতিহাস কী লিখবো মাগো

'ইতিহাস কী লিখবো মাগো আমি তো আর সব জানি না।
এই-যে মহাকালের ধ্বজায়, রাজার কথা লিখছে প্রজায়—
আমি সে ইতিহাস মানি না।
তোর মাঝে মা অনন্তকাল ফেলেছে মনমোহিনীজাল।
সবাই যে-জাল ফেলতে জানে, সময় কি আর সে জাল টানে?
আমিও সেই জাল টানি না।

তোর প্রেমের ঐ সিংহাসনে সবাই কি আর বসতে জানে?
কাব্যেসাহিত্যেগানে আমি যমের বুকে বজ্র হানি,
কমের বুকে শেল হানি না।
কালের ইতিহাসের পাতা সবাইকে কি দেন বিধাতা?
আমি লিখি সত্য যা তা, রাজার ভয়ে গীত ভানি না।

(রামপ্রসাদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনাপূর্বক-১ : ও বন্ধু আমার: ১৯৭৫)

আমার 'ও বন্ধু আমার' কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৭৫ সালের অন্তিম মাস, ডিসেম্বরে। বইটির প্রকাশক ছিল মুক্তধারা। ঐ বছরটি সবচেয়ে বেদনাবহ ও শোকের বছর হিসেবে বাংলাদেশের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে। 'ও বন্ধু আমার' কথাটা আমাদের জানা অধিকাংশ ভাল ও সুন্দর কথার মতোই, রবীন্দ্রনাথের। ঐ বছরে আমরা আমাদের অনেক গুণী-প্রিয়জনকে হারিয়েছি। ১৫ আগস্ট সপরিবারে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বঙ্গবন্ধু নিহত হয়েছেন। ৩ নভেম্বর কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দি থাকা অবস্থায় নিহত হয়েছেন মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী চার জাতীয় নেতা তাজউদ্দীন আহমেদ, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, ক্যাপ্টেন মনসুর অলী ও এএইচএম কামরুজ্জামান। তার আগে ৫ আগস্ট মারা যান কবি সিকানদার আবু জাফর। ৭ নভেম্বরের সিপাহি বিপ্লবে নিহত হন খালেদ মোশারফসহ বেশ ক'জন বীর মুক্তিযোদ্ধা। ২৬ নভেম্বর মারা যান আমার প্রিয় বন্ধু তরুণ কবি আবুল হাসান। তাঁদের সবার স্মরণে আমি রবীন্দ্রনাথের গান থেকে আমার কাব্যগ্রন্থের নামটি চয়ন করি– ও বন্ধু আমার। ঐ নামের ভিতরে বঙ্গবন্ধু ও আবুল হাসান একাকার হয়ে মিশে যায়। আমি নিজেই গ্রন্থের প্রচ্ছদটি আঁকি। কালো রঙের মধ্যে রিভার্সে একটি পাখির মুখ। পাখির মুখের সঙ্গে মিশিয়ে দিই মানুষের মুখের আদল। পাখির চোখ থেকে গড়িয়ে পড়ছে কয়েক ফোঁটা অশ্রু। কাঁচা হাতের আঁকা হলেও ঐ প্রচ্ছদটি আমার বেশ লাগে। মনে হয় আমাদের ঐ সময়ের সকল প্রকাশিত-অপ্রকাশিত শোক কিছুটা ভাষা পায় আমার ঐ গ্রন্থের কবিতাগুলোতে ও কিছুটা গ্রন্থের প্রচ্ছদে। তখন এর বেশি স্পষ্ট করে কিছু বলা বা করাটা সম্ভব ছিল না। আমাকে প্রতীকের আশ্রয় নিতে হয়েছিল।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা আমাদের রাষ্ট্রপিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যা করার ভিতর দিয়ে আমাদের ললাটে যে কলঙ্ককালিমা লেপন করা হয়, যুগ যুগ ধরে আমরা সেই কলঙ্কতিলক আমাদের কপালে বহন করব; ভারতের জনগণ যেমন বহন করে তাদের রাষ্ট্রপিতা গান্ধী হত্যার কলঙ্কতিলক। আমেরিকানরা যেমন তাদের ললাটে বহন করে চলেছে আব্রাহাম লিঙ্কন হত্যার কলঙ্কতিলক। আমাদের কপাল থেকে সেই কলঙ্কচিহ্ন মুছবার যত চেষ্টাই আমরা করি না কেন, আমরা পারব না। অন্যরা পারলেও আমরা কোনোদিনই পারব না এজন্য যে, নিষ্ঠুরতা-নির্মমতা বিচারে ঐ হত্যাকাণ্ডের চেয়ে মর্মঘাতী প্রতিহিংসাবিদ্ধ রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড এই পৃথিবীতে আর একটিও ঘটেনি। এই হত্যাকাণ্ডের মমতাহীনতার সঙ্গে তুলনীয় কোনো ঘটনা পৃথিবীর আদিকাব্য রামায়ণ বা মহাভারতসহ অন্য কোনো কালজয়ী কাব্যেও আমরা দেখতে পাই না। 'আত্মঘাতী বাঙালি' লিখেছিলেন কিশোরগঞ্জজাতক হয়েও বিশিষ্ট ইংরেজি-সাহিত্যিক হিসেবে বিশ্ব-বিবেচিত নীরদ সি চৌধুরী। তাঁর গ্রন্থটির রচনাকাল ১৯৭৫-এর আগে। তাঁর দূরদৃষ্টির প্রশংসা না করে আর উপায় কী? জাতি হিসেবে বাঙালির পারঙ্গমতা যে মানবিকতার বদলে নিষ্ঠুর দানবিকতার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হলো, —এ সত্য বাংলাদেশের মানুষের জন্য চির বেদনার, চির লজ্জার।

সবুজ বৃক্ষরাজি, নদীনালা-খালবিল ও অজস্র সুগন্ধি ফুলের ভিতরে বেড়ে ওঠা, নরম পলিমাটি দিয়ে গড়া একটি সমতল দেশের মানুষদের পক্ষে কীভাবে এমন অবিশ্বাস্যরকমের নিষ্ঠুর একটি হত্যাকাণ্ড ঘটানো সেদিন সম্ভব হয়েছিল, ভেবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিশ্বের মানুষ চিরদিন আঁতকে উঠবে। বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করার পাশাপাশি সেই কালরাতে হত্যাকারীরা কেন মুজিব-পরিবারের রক্তধারায় যুক্ত থাকার অভিযোগে গর্ভবতী নারী, প্রায় দুগ্ধপোষ্য শিশু-কিশোরকেও হত্যা করেছিল — আমরা হয়তো বা কোনোদিন সেই প্রশ্নের সদুত্তর খুঁজে পাব না। যদি না ঐ হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে যুক্তদের মধ্যে কেউ কনফেশনাল স্টেটমেন্ট করে আমাদের তা জানতে সাহায্য করেন।

ঐ ঘটনা ঘটানোর পর থেকেই, ঐ হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত কুশীলব বা পরবর্তীকালের সুফলভোগকারীরা খুব সঙ্গতকারণেই আমাদের মুক্তিযুদ্ধের গৌরবদীপ্ত ইতিহাসকে বিকৃত করার লক্ষ্যে তাদের সুপরিকল্পিত কার্যক্রম শুরু করে। রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করার পাশপাশি ইতিহাস দখলের সেই যাত্রাশুরুর পর্বটা আমি খুব কাছে থেকে দেখেছি। সেনাবাহিনী কর্তৃক গ্রেফতার হয়ে কিছুদিন প্রবল ভীতির ভিতরে কাটানোর কারণে দেখতে বাধ্য হয়েছি। মানসিকভাবে অত্যন্ত পর্যুদস্ত হয়ে আমি আমার গ্রামের বাড়িতে ফিরে গিয়ে নির্বাসিত জীবনযাপন করছিলাম। আমাদের গ্রামের নদীতীরস্থ শ্মশানঘাটে ছিল ব্রজেন সাধুর আশ্রম। শান্তি-সন্ধানে আমি সেই আশ্রমে যেতাম। বসতাম। গান শুনতাম। ব্রজেন সাধু খুব ভাল রামপ্রসাদী গাইতেন। স্পষ্ট মনে পড়ে, একদিন এক নির্জন দুপুরে ঐ আশ্রমে বসেই আমি রামপ্রসাদী সুরে বেঁধেছিলাম উপরের উদ্ধৃত গানটি। গানটি লিখে আমি মনে বড় আনন্দ পেয়েছিলাম। ভবিষ্যতে বাংলাদেশের ইতিহাস কখনও আমার রচনার বিষয় হবে, সচেতনভাবে তখন পর্যন্ত আমি তা ভাবিনি। ভেবেছি কবিতা দিয়ে শুরু করা আমার জীবন কবিতা দিয়েই শেষ হবে। ইতিহাস আমার বিষয় হতে যাবে কোন দুঃখে? আমি কি ইতিহাবিদ বা ইতিবৃত্তকার নাকি? আমার ইতিহাসচর্চা সীমাবদ্ধ থাকবে আমার কবিতায়। হয়তো কখনও ইতিহাসনির্ভর কাব্য লিখব, নির্ভেজাল ইতিহাস লিখতে বসব, এমনটি আমি ভাবিনি। কিন্তু আমি না ভাবলে কী হবে, যার ভাববার কথা তিনি নিশ্চয়ই আমার জন্য স্থির করে রেখেছিলেন বাংলাদেশের ইতিহাস রচনার শাস্তি। তা না হলে ইতিহাসের জালে আমি নিজেকে জড়াতে যাব কেন?

আজ 'আত্মকথা ১৯৭১'-এর ২৯তম পর্বটি লিখতে বসে, হঠাৎ করেই কেন জানি নিজের লেখা ঐ গানটির কথা মনে পড়ে গেল। অনেক বছর পর আজ আবার নতুন করে কবিতাটি পড়লাম। সুর করা যখন হয়নি, যখন কারও কণ্ঠে গীতও হয়নি, এমনকি আমার অসুর কণ্ঠেও না, তখন আর তাকে গানই বা বলি কেন, কবিতাই বলি। বত্রিশ বছর আগের লেখা কবিতাটিকে যে আমার নতুন পর্ব শুরু করার ভণিতা হিসেবে বেশ লাগসই বলে মনে হলো তা নয়, আমার বিবেচনায় কবিতাটিকে খুব প্রাসঙ্গিক ও অর্থবহ বলেও মনে হলো। বিশ্বজননী হিসেবে কালীমাতার গৌরবগাথা প্রচারের জন্য কালীভক্ত কবি হিসেবে রামপ্রসাদ যে ভক্তিবাদী লোকসুর সৃষ্টি করে গিয়েছিলেন, সত্যনিষ্ঠ ইতিহাসের গৌরবরক্ষার জন্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেই জনপ্রিয় সুরটিকে আমি কিছুটা নৈপুণ্যের সঙ্গে ব্যবহার করতে পেরেছিলাম বলেই আমার প্রত্যয় হলো। রামপ্রসাদের সুরে বর্ণিত হলেও অত্যন্ত সঙ্গত কারণেই আমার কবিতায় স্থান করে নিয়েছিল ভক্তির বদলে অশুভশক্তির অক্টোপাসবন্ধন থেকে মুক্তির আকুলতা, ইতিহাস-বিকৃতির বিরুদ্ধে বিদ্রূপ ও বিষোদগার। ঐ কবিতার ভিতর দিয়ে দেয়ালের পাশে মিটমিট করে জ্বলা মাটির প্রদীপের মতোই আমি সেদিন দেশবাসীকে সতর্ক করে দিতে চেয়েছিলাম, সাবধান হও, সতর্ক হও, মুক্তিযুদ্ধের স্থপতিকে সপরিবারে হত্যা করার পর, এবার শুরু হবে মেঘনাদবধ কাব্য বা ইতিহাসবধ পালা। 'হি হু কিলস দি কিং মেরিজ দি কুইন' —ঐ গ্রীক-প্রবাদের মতোই এটি ছিল পূর্ব নির্ধারিত ও অনিবার্য। যারা ইতিহাসের নায়ককে হত্যা করে, নিজেদের প্রতিষ্ঠার জন্যই তারা ইতিহাসকে বিকৃত না করে পারে না। সুতরাং নবাগত রাজার কথায় ইতিহাস লেখার জন্য স্বাধীনতাবিরোধী বুদ্ধিজীবী প্রজাবৃন্দ যে মুজিব-শূন্য মাঠে গোল দিতে নামবেন, সে আমি দিব্যদৃষ্টিতে দেখতে পেয়েছিলাম। তাই আমার কণ্ঠ থেকে মূর্ত হয়েছিল...'এই যে মহাকালের ধ্বজায়/ রাজার কথা লিখছে প্রজায়/ আমি সে ইতিহাস মানি না।' মানি না যখন, তখন ধরে নিতে পারি যে, বাংলাদেশের ইতিহাসটা আমি জানি বলেই মানি না।

আমার লেখা ইতিহাসের পাতায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার জন্য আমার পাঠকদের মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টি হতে দেখলে আমি বেশ আনন্দ পাই। আমাদের দীর্ঘ মুক্তি সংগ্রামের বিভিন্ন পর্যায়ে তাদের পালিত অবদানের কথা আমি সযত্নে আমার রচনায় অন্তর্ভুক্ত করি। আমি জানি, অনুল্লিখিত, অনুচ্চারিত অজস্র উজ্জ্বল চরিত্র ছড়িয়েছিটিয়ে রয়েছে আমাদের দেশের এখানে সেখানে। দেশমাতৃকার মুক্তির জন্য তাদের মহামূল্যবান জীবন দান করেও আমাদের ইতিহাসের পাতায় যাঁরা তাঁদের নাম লেখাতে পারেননি, আমি ভালোবেসেই তাদের কথা লিখি। লিখব।

সম্প্রতি বিশিষ্ট রবীন্দ্রসঙ্গীতশিল্পী, আমার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সতীর্থা জাহানারা নিশির কলাবাগানের বাসায় একটি গানের আসরে অনেকদিন পর দেখা হলো লায়লা বখশের সঙ্গে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সেও আমার সতীর্থা ছিল। ছিল শেখ হাসিনার খুব নিকটজন। ওরা দুজনই তখন ছাত্রলীগ করত। ছাত্রলীগের নেত্রী। আমি ওদের দল করতাম না বলে ওরা আমাকে খুব একটা পাত্তা দিত না। আমি আসলে কোনো দলই করতাম না, কিন্তু ওরা ভাবত আমি ছাত্র ইউনিয়ন করি। আর ছাত্র ইউনিয়নের মেয়েরা ভাবত আমি ছাত্রলীগ। তাই কিছুটা হাসিনা-কাজী রোজী-লায়লা-সালমা-কণা ঘেঁষা। আসলে কোনো দল ঘেঁষা নয়, আমি ছিলাম মেয়ে ঘেঁষা। কিন্তু অতটা বোঝার ক্ষমতা বিধাতা বোধহয় কোনো অজ্ঞাতকারণে মেয়েদের দেননি। তাই আমি চিরদিন উনাদের ভুল বোঝার শিকার হয়েছি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি যে ইতিহাস লিখছি লায়লা তা জানে। মাঝে মাঝে পড়েও। আমাকে মুখের কাছে পেয়ে বলল, 'তুমি খসরু মন্টুর কথা লিখলা, আর পুরান ঢাকার রুচিরা গ্রুপের কথা ভুইল্যা গেলা? ষাট দশকের আইয়ুববিরোধী ছাত্র আন্দোলনে ওদের ভূমিকা কি এদের চেয়ে এতই কম ছিল? এলাহী মারা গেল, তুমি একবার ফোন কইরাও খবর নিলা না। আউয়াল তোমারে খবর দিছে। তারপরও তুমি সময় পাইলা না।'

তখন আমার মনে পড়ল এবং ওর হাত ধরে বললাম- মাফ করে দাও, লায়লা। ভুলে গিয়েছিলাম। আমি না আজকাল সত্যি সত্যি ভুলে যাই। তার জন্য আমাকে চেষ্টা করতে হয় না।

আইয়ুব-মোনায়েম খানের পোষা গুণ্ডা পাঁচপাত্তু-খোকাদের হাত থেকে নতুন ঢাকা সামলাত খসরু-মন্টু আর পুরনো ঢাকা সামাল দিত লক্ষ্মীবাজারের রুচিরা গ্রুপ। রুচিরা নামে পাকিস্তান পর্যটন কেন্দ্রের একটি সুন্দর রেস্তোরাঁ ছিল। ঐ রেস্তোরাঁর পেছনে ছিল একটি জিমনিসিয়াম। ঐ রেস্তোরাঁ ও জিমনিসিয়ামটিকে কেন্দ্র করেই সেখানে গড়ে উঠেছিল একটা তারুণ্যের আড্ডা। কেউ কেউ অন্য দল করলেও ওদের মধ্যে অধিকাংশই ছিল বঙ্গবন্ধুর অনুসারী ছাত্রলীগের ত্রাস জাগানো ক্যাডার। পার্শ্ববর্তী জগন্নাথ কলেজ, কায়দে আজম কলেজসহ পুরনো ঢাকার সব শিক্ষালয়েই ছিল রুচিরা গ্রুপের দাপট। এদের কারণে এনএসএফ নওয়াবপুর রেলক্রসিং পার হয়ে কোনোদিন পুরনো ঢাকায় প্রবেশ করতে পারেনি। রুচিরা গ্রুপের সদস্যদের মধ্যে মুখ্য ছিল এই এলাহী– এলাহী বখশ। এলাহী বখশ ছিল পার্শ্ববর্তী কায়দে আজম কলেজের জিএস ও পরে ভিপি। ছাত্রছাত্রী মহলে জনপ্রিয়। রুচিরা গ্রুপে আর যারা ছিল, তারা হলো ফ্যান্টোমাস, হাশেম, তারণ, রাশেদ, আমান, গাজী, ইব্রাহিম, সুলতান, লম্বা কাশেম, বশির প্রমুখ। এলাহীর বাসা ছিল রুচিরার পেছনে। ৫৮ নবদ্বীপ বসাক লেন। পার্টির জন্য প্রচুর খরচ করত নিজের পকেট থেকে। এলাহী পড়ত জগন্নাথে, কিন্তু আড্ডা মারতে প্রায়ই ছুটে আসত নীলক্ষেতে। কলাভবনে। পরে জেনেছিলাম, বঙ্গবন্ধুর ৬ দফা নয়, এলাহীর ছিল আরও এক দফা। সেই এক দফা মানে– লায়লা। শেষ পর্যন্ত ১৯৬৯ সালে লায়লার সঙ্গে এলাহীর দফারফা হয় বিবাহের মাধ্যমে।

প্রিয় পত্নী, দুই কন্যা ও এক পুত্রকে রেখে গত ২৯ মার্চ এলাহী মারা যায়। ওদের পুত্র কন্যারা সবাই থাকে বিদেশে। স্বামীর বাড়ি ও দীর্ঘদিনের জমানো স্মৃতির পাহাড় বুকে আগলে নিয়ে লায়লা এখন একা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একাত্তরের দশ মাস

শ্রীজ্ঞান যতীন সরকার রচিত 'পাকিস্তানের জন্মমৃত্যু-দর্শন' বইটি সম্পর্কে পূর্বে আমি একটি অধ্যায় লিখেছি। ঐ বইটি বলা যায়, এখন আমার নিত্যপাঠ্য। আত্মজীবনীর আদলে রচিত শ্রীজ্ঞানের গ্রন্থটি আমার 'আত্মকথা ১৯৭১' রচনায় খুবই সহায়ক হয়েছে। আমি যে সময় নিয়ে লিখছি, তিনি সেই সময় নিয়ে তাঁর অভিজ্ঞতার কথা লিখেছেন। অবস্থানগত কারণে আমার একাত্তরের অর্জিত অভিজ্ঞতার সঙ্গে তাঁর একাত্তরের অর্জিত অভিজ্ঞতার পার্থক্য যেমন আছে, তেমনি মিলও আছে অনেক। আমাদের গুরু-শিষ্যের মধ্যকার অনতিক্রম্য জন্মসূত্রটি আমাদের জীবনকে কতকগুলো অভিন্ন অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ করেছে। সে কারণে 'পাকিস্তানের জন্মমৃত্যু-দর্শন' গ্রন্থটি আমার জন্য আরও বিশেষভাবে সহায়ক হচ্ছে। আমি ঐ গ্রন্থটি থেকে হয়তো খুব বেশি উপাত্ত বা তথ্য আমার রচনায় ব্যবহার করছি না, কিন্তু মহাসমুদ্রে পথ হারানো নাবিককে সমুদ্রতীরবর্তী বাতিঘর যেভাবে সাহায্য করে, আমার মুক্তিযুদ্ধের সমুদ্রযাত্রায় ঐ গ্রন্থটি সেইরূপ বাতিঘরের মতোই আমাকে সাহায্য করে চলেছে। রাষ্ট্রবিপ্লবে একটি দেশের মানুষ হয়তো অনেক অভিন্ন অভিজ্ঞতাই অর্জন করে, কিন্তু সেটি হচ্ছে ঘটনার উপরিস্তরের আলেখ্য, তার ভিতর-স্তরে থাকে যোজন যোজন পার্থক্য। অভিন্ন ঘটনার মধ্যেও মানুষের আচরণে প্রচুর ভিন্নতা দৃষ্ট হয়। তাই দেখা যায়, কেউ হয়তো তার বন্ধুকে বাঁচাতে গিয়ে নিজের জীবনকে বিপন্ন করেছে, আবার কেউ নিজেকে বাঁচাতে গিয়ে বন্ধুকে নিধন করেছে। সেই কারণেই প্রতিটি আত্মজৈবনিক রচনাই বাইরে থেকে একরকম বলে মনে হলেও ভিতর থেকে সে বিচিত্ররূপে আলাদা। আত্মজীবনীমূলক রচনার মধ্যে আমরা অতিক্রান্ত সময়ের ইতিহাসটা যত অবিকৃতভাবে পাই, ইতিহাস-গ্রন্থে অনেক সময়ই সেভাবে পাই না। মনে হয় সেই বিবেচনা থেকেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ওপর আত্মজৈবনিক রচনার জন্য ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী মরহুম চার্চিলকে নোবেল সাহিত্য পুরস্কারে ভূষিত করা হয়েছিল। আমার ধারণা, বাংলাদেশের কোনো লেখক যদি কখনও নোবেল সাহিত্য পুরস্কার পান— তবে তিনি তা পাবেন আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ওপর রচিত সাহিত্যগুণসমৃদ্ধ আত্মজীবনীমূলক কোনো রচনার জন্য। সেক্ষেত্রে শ্রীজ্ঞান যতীন সরকার রচিত 'পাকিস্তানের জন্মমৃত্যু-দর্শন' গ্রন্থটিকে আমি এগিয়ে রাখব। চার্চিল রচিত গ্রন্থের তুলনায় এই গ্রন্থটি আকারে ছোটো হলেও প্রকারে, বিষয়গুরুত্বে, বর্ণনানৈপুণ্যে বা ভাষাশৈলী বিচারে মোটেও ঊণ নয়; বরং ইতিহাসনির্ভর গ্রন্থে উপন্যাস পাঠের

WWW.AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আনন্দরসে সমৃদ্ধ 'পাকিস্তানের জন্মমৃত্যু-দর্শন' আরও বেশি হৃদয়সংবেদী।

আজ আমি মুক্তিযুদ্ধের বাতিঘরতুল্য আরও একটি সুসম্পাদিত গ্রন্থের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করব। বইটির নাম 'একাত্তরের দশ মাস'। বইটির লেখক রবীন্দ্রনাথ ত্রিবেদী। মোট পৃষ্ঠা ৮০০। প্রকাশক কাকলী প্রকাশনী। প্রকাশকাল ১৯৯৭-র একুশের বইমেলা। যারা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস জানতে চান, বা ঐ সময়ের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাসমূহ বা ঐসব ঘটনার অভিঘাত থেকে জন্ম নেওয়া তাদের নিজ-জীবনের অভিজ্ঞতার কথা দিন-ক্ষণ সহযোগে গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করতে চান– তাদের জন্য সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য সহায়ক দলিল-গ্রন্থ হচ্ছে এটি। এটি মুক্তিযুদ্ধের দশ মাসের একটি নির্ভরযোগ্য দিনপঞ্জি। সেখানে একাত্তরের ১ মার্চ থেকে শুরু করে ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি পর্যন্ত দশ মাসের প্রতিটি দিনের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলো সংক্ষিপ্ত আকারে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত কবি হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত 'স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিল-পত্র'-র ভূমিকায় বলা হয়েছে– 'স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়সীমা হচ্ছে ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ থেকে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত'। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ত্রিবেদী 'একাত্তরের দশ মাস' বলতে ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ থেকে শুরু করে ১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়কে বোঝাননি। তিনি পাকিস্তানি কারাগার থেকে মুক্তি লাভ করে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্ত-বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত অর্থাৎ ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি পর্যন্ত সময়কে তাঁর বিপুলাকার গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এর ফলে বছর বা মাস-বিচারে না হলেও সর্বমোট দিনের হিসেবে গ্রন্থের নামকরণের প্রতি সুবিচার করা হয়েছে বলেই আমি মনে করি। বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ-প্রত্যাবর্তনের নাটকীয় আনন্দ ও স্বস্তির মধ্য দিয়ে তাঁর প্রায় ৮০০ পৃষ্ঠার গ্রন্থটির সমাপ্তি টেনে ত্রিবেদী তাঁর পাঠকদের এই ধারণা দিতে সক্ষম হয়েছেন যে, বনবাস থেকে রামের প্রত্যাবর্তনপর্বটি সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত রামায়ণ সম্পন্ন হয় না। গ্রন্থটিকে ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি পর্যন্ত প্রলম্বিত করে ত্রিবেদী 'একাত্তর সাল' কথাটার একটা নতুন তাৎপর্যপূর্ণ ব্যাখ্যাও দাঁড় করালেন আমাদের সামনে। তিনি যেন বলতে চাইছেন যে, আমাদের জীবনে এই একাত্তর কথাটার একটা ভিন্ন অর্থ আছে। আমাদের এই একাত্তর খ্রিস্টবর্ষের সেই একাত্তর নয়। তারও বেশি কিছু। আলাদা কিছু। এটা হচ্ছে সেই মাতৃগর্ভকাল, যার ভিতর থেকে জন্মগ্রহণ করেছে বাংলাদেশ।

রবীন্দ্রনাথ ত্রিবেদী আমার বন্ধু। তিনি আমাদের কবি-সাহিত্যিকদের কেউ নন। কর্মসূত্রে তিনি ছিলেন একজন আমলা। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে মুজিবনগরে প্রবাসী সরকারের গুরুত্বপূর্ণ পদে তিনি দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি ছিলেন প্রবাসী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুজিবনগর সরকারের স্বরাষ্ট্র ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী এএইচএম কামরুজ্জামানের জনসংযোগ কর্মকর্তা। তা ছাড়াও কেন্দ্রীয় সাহায্য ও পুনর্বাসন কমিটির ওএসডি হিসেবে তিনি তখন শরণার্থী ও যুব প্রশিক্ষণ শিবিরগুলোর দেখভাল করার গুরুদায়িত্বও পালন করেছিলেন। তখনই মুজিবনগরে রবীন্দ্রনাথ ত্রিবেদীর সঙ্গে আমার পরিচয় হয় এবং সে-পরিচয় ক্রমশ বন্ধুতার পর্যায়ে উন্নীত হয়। বাংলাদেশ সরকারের সচিব হিসেবে কিছুদিন আগে তিনি অবসর নিয়েছেন।

তাঁর গ্রন্থের ভূমিকায় প্রাসঙ্গিক কারণেই ত্রিবেদী আমার কথা উল্লেখ করেছেন। সেখানে বইটির অন্যতম মুদ্রাক্ষরিক হিসেবে আমার নিরলস পরিশ্রমের জন্য গ্রন্থকার আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। তার সঙ্গত কারণ আছে। আমার ক্ষণস্থায়ী (১৯৮৭-১৯৯২) ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান আজিমপুর সুপার মার্কেটস্থ শতাব্দী কম্পিউটারে তাঁর বইটির অনেকখানি কম্পোজ হয়েছিল। আমার অনুজ নীহারেন্দু গুণ চৌধুরীই প্রধানত কম্পোজের কাজটা করত। আসল মুদ্রাক্ষরিক ছিল সেই। ত্রিবেদীর ভূমিকায় নীহারেন্দুর কথাও আছে। আমার দায়িত্ব ছিল প্রুফ দেখা। সেটা ১৯৯০ সালের কথা। ঐ বইয়ের কাজ করতে গিয়ে বাংলা ইংরেজির মিশেল আর টীকা-টিপ্পনির অত্যাচারে আমাদের দুই ভাইয়ের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিল। আমার তখন ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি অবস্থা। ভাগ্যিস ১৯৯১ সালের সংসদ নির্বাচনে বীরদর্পে লড়াই করে আমি জামানত হারিয়ে সগৌরবে পরাজিত হয়েছিলাম। তাই ত্রিবেদীর গ্রন্থের পুরো কাজ সম্পন্ন হওয়ার আগেই আমার প্রতিষ্ঠানটি লাল বাতি জ্বালায়। আমার ঐ ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানটির অকাল মৃত্যু ঘটে। ফলে ঐ গ্রন্থের বাকি অংশ অন্যত্র (গতিধারা প্রকাশনী) কম্পোজ করা হয় এবং দীর্ঘ বিরতিতে শেষে কাকলী প্রকাশনী থেকে বইটি প্রকাশিত হয় ১৯৯৭ সালের বইমেলায়। স্বীকার করতেই হবে, নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণপুত্র শ্রীরবীন্দ্রনাথ ত্রিবেদীর ধৈর্য তুলনাহীন। শ্রীশ্রীভগবান তাঁর মঙ্গল করুন।

ভবিষ্যতে কখনও তাঁর ঐ গ্রন্থটি আমার কাজে লাগবে, এমনটি তখন আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি। তবে আমার কাজে না লাগলেও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস-সন্ধানী সত্যনিষ্ঠ পাঠক ও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস রচয়িতাদের যে খুব কাজে লাগবে, মুদ্রাক্ষরিক হিসেবে আমার জন্য বিরক্তিকর হলেও তাঁর এই বহুকষ্টরচিত গ্রন্থটি যে তাঁকে অমরত্ব দেবে, সে কথা তখন আমিই তাঁকে বলেছিলাম। ঐ গ্রন্থ সম্পর্কে আমার ভবিষ্যদ্বাণী অনেকটাই ফলেছে। ১৯৭১-এর ধারাবাহিক স্মৃতিবৃত্ত রচনা করতে বসে আমি বারবার হাত বাড়াচ্ছি ঐ গ্রন্থটির দিকে। ঐ গ্রন্থটি আমার হাতের কাছে না থাকলে বাংলাদেশ সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয় থেকে প্রকাশিত হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত মুক্তিযুদ্ধের ১৪ খণ্ড দলিলসমুদ্র আমাকে হাতড়ে বেড়াতে হতো। রবীন্দ্রনাথ ত্রিবেদী শেষ পর্যন্ত অন্য কাউকে না হলেও আমাকে অন্তত সেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অভাবিত পণ্ডশ্রমের হাত থেকে মুক্তি দিয়েছে। ফলে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করাটা আমার জন্য ফরজ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

গ্রন্থটি দশ মাসে বিভক্ত। প্রতিটি মাসের জন্য একটি করে শিরোনাম রাখা হয়েছে গ্রন্থটিতে। ঐ শিরোনামগুলো গৃহীত হয়েছে বাংলাভাষার কালোত্তীর্ণ কবিতা ও গানের চরণ থেকে। তাঁর গ্রন্থের ভূমিকায় আমাকে সে মুদ্রাক্ষরিকের মর্যাদা দিলেও, শিরোনাম নির্বাচনে সে আমার কবিত্বের প্রতি যে সম্মান প্রদর্শন করেছে, তাকে আমি বন্ধুকৃত্যের নিদর্শন হিসেবেই গ্রহণ করেছি। মুক্তিযুদ্ধে দশ মাস গ্রন্থে আমার জন্য বরাদ্দকৃত মাসটি হচ্ছে অক্টোবর মাস। ঐ মাসের শিরোনামে ব্যবহৃত আমার কাব্য-পঙক্তিটি হচ্ছে– 'মানুষের মৃত হাড়ে সে এখন সশস্ত্র সন্ত্রাস...'

এই কাব্য-পঙক্তিটি আমার দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'না প্রেমিক না বিপ্লবী'র অন্তর্গত 'মুখোমুখি' কবিতায় আছে। পাঠকের খেয়াল থাকতে পারে যে ২৭ মার্চের দ্বিপ্রহরে ঢাকা থেকে বুড়িগঙ্গা নদীর ওপারে পালিয়ে যাবার সময় ঐ কবিতার প্রথম দুটি লাইন আমার মনে এসেছিল।

'তাড়াতে তাড়াতে তুমি কতদূর নেবে?
এই তো আবার আমি ফিরে দাঁড়িয়েছি।'

পাকসেনাদের হাত থেকে জীবন বাঁচাতে ঢাকা ছেড়ে নদীর ওপারে পালিয়ে যাওয়া ভয়ার্ত মানুষের মিছিলে দাঁড়িয়ে পাওয়া কবিতাটি নদীর ওপারে, শুভাড্যায় থাকাকালে ২৮ মার্চ থেকে ২ এপ্রিল তারিখের মধ্যে কোনো একসময় আমি লিখে শেষ করেছিলাম। আমাদের মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়ে যাওয়ার অব্যবহিত পরে রচিত আমার প্রথম কবিতা ছিল এটি। দ্বিতীয় কবিতা 'আগ্নেয়াস্ত্র'। সেই কবিতা রচনার পটভূমি আমি পরে বলব। তার আগে বলব পাকসেনাবাহিনীর 'জিঞ্জিরা অপারেশন' সম্পর্কে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জিঞ্জিরা জেনোসাইড

আজ দীর্ঘ ছত্রিশ বছর পর মস্তিষ্কের স্মৃতিকোষে লুকিয়ে রাখা পাকসেনাবাহিনী দ্বারা সংঘটিত একটি নির্মম ও অবিশ্বাস্য গণহত্যার প্রত্যক্ষ বিবরণ লিখতে বসেছি। বুড়িগঙ্গা নদীর ওপারে, কেরানীগঞ্জ থানার অন্তর্গত জিঞ্জিরা, কালিন্দি ও শুভাড্যা– এই তিন ইউনিয়নব্যাপী রোমহর্ষক গণহত্যাটি সংঘটিত হয় ১৯৭১ সালের ২ এপ্রিল, শুক্রবার। সূর্য ওঠার কিছু আগে, ভোর পাঁচটা থেকে শুরু করে দুপুর বারোটা পর্যন্ত পরিচালিত ঐ বর্বর অভিযানে সেদিন কত প্রাণ ঝরেছিল, তার সঠিক হিসাব কোনোদিনই আমাদের পক্ষে জানা সম্ভব হবে না। তবে আমার নিজের ধারণা, কম করেও এক হাজার নর-নারী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা ও শিশু-কিশোর ঐ অভিযানে সেদিন নিহত হয়েছিল। যাদের মধ্যে অধিকাংশই ছিল ২৫ মার্চের পর প্রাণ বাঁচাতে ঢাকা থেকে পালিয়ে বুড়িগঙ্গা নদীর ওপারের বিভিন্ন গ্রামে আশ্রয়গ্রহণকারী বিভিন্ন বয়সের, বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার অসহায় মানুষ। পরম করুণাময় মহান স্রষ্টার অসীম করুণায় আমি সেদিন পাকসেনাদের নির্বিচার নিধনযজ্ঞের হাত থেকে অলৌকিকভাবে বেঁচে গিয়েছিলাম।

পবিত্র ইসলামের বিশ্বস্ত খাদেম, পাকিস্তানের দেশপ্রেমিক ও প্রফেশনাল সেনাবাহিনী ঢাকা নগরীতে তাদের 'অপারেশন সার্চ লাইট' অভিযান শুরু করেছিল পঁচিশে মার্চের মধ্যরাতে, অন্ধকারে। পাছে পাকসেনাদের কাপুরুষ ও নৈশশিকারি বলে বাঙালিরা ভ্রম করে; বিশ্বের সামরিক-ইতিহাসে পাছে তাদের পৌরুষের ওজন হ্রাস পায়, শুধু রাতের অন্ধকারে নয়, নির্বিচার গণহত্যায় তারা যে দিনের আলোতেও সমান দক্ষ, মনে হয় এইটে প্রমাণ করার জন্যই 'জিঞ্জিরা অপারেশন'টির শুভসূচনা করা হয়েছিল কাকডাকা ভোরে, দিনের শুরুতে। ঐ দুটো গণহত্যাই শুক্রবারকে সামনে নিয়ে কেন শুরু করা হয়েছিল– আমার মনে হয় এই প্রশ্নের উত্তরটি হবে এরকম– শুক্রবার নিয়ে আমাদের ধারণা যাই হোক না কেন, পাকিস্তানিদের যুক্তি এরকম ছিল– যাহা পাকিস্তান তাহাই ইসলাম। ইসলাম রক্ষা করার জন্যই তো পাকিস্তানের শত্রুদের অর্থাৎ ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে তাদের মিলিটারি অপারেশন চালাতে হচ্ছে। এটি ধর্মরক্ষার পবিত্র দায়িত্ব পালন করারই সামিল। এই পবিত্র কর্মটি তো পবিত্র দিনেই করা উচিত। সুতরাং পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর যুক্তি ঠিকই আছে। তারা কোনো অন্যায়ও করেনি, ভুলও করেনি। তাদের আরও একটি যুক্তি ছিল। সেই যুক্তিটির কথা আমরা অনেকেই ভাল জানি না। মার্চ মাসে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পূর্ব পাকিস্তানে পাকসেনাদের যখন গোপনে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাঠানো হচ্ছিল, তখন পাকসেনাবাহিনীর কর্মকর্তারা তাদের এমন ধারণা দিয়েছিল যে, যাদের বিরুদ্ধে তাদের লড়াই করতে পূর্ব পাকিস্তানে পাঠানো হচ্ছে তাদের অধিকাংশই হচ্ছে কাফের বা মালাউন। বিধর্মী। তারা পবিত্র ইসলাম ও অখণ্ড পাকিস্তানের শত্রু। ভারতের চর। সুতরাং মাথামোটা পাকসেনারা তাদের বসদের কথা বিশ্বাস করে ধরেই নিয়েছিল যে, তাদের নির্বিচার হত্যাযজ্ঞের শিকার সাচ্চা মুসলমানরা খুব বেশি একটা হবে না, হবে ঐ কাফের মোনাফেক হিন্দুরাই। কাফের নিধনের জন্য শুক্রবারের চেয়ে ভাল দিন আর কোথায়?

আমার খুব আনন্দ হচ্ছে এই ভেবে যে, দীর্ঘ ছত্রিশ বছর ধরে আমার বুকের ভিতরে লুকিয়ে রাখা পাকসেনাবাহিনীর সেই বর্বর-গণনিধনের কাহিনীটি আমি আমার আত্মকথায় বিলম্বে হলেও এখন লিপিবদ্ধ করতে পারছি। ২৫ মার্চের গণহত্যার ভয়াল বিভীষিকার আড়ালে ঢাকা পড়ে যাওয়া ২ এপ্রিলের জিঞ্জিরা অপারেশনের ক্ষতচিহ্নটির ওপর খুব আলো ফেলা হয়েছে বলে আমার মনে হয় না। হলে ঐ গণহত্যার তথ্য সংগ্রহের জন্য আমাকে এত হিমশিম খেতে হতো না। অনেকের লেখাতেই আমি তার নিদর্শন পেতে পারতাম। আমাকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্রের অষ্টম খণ্ডের দুই পৃষ্ঠা ফটোস্ট্যাট করে আনতে হতো না।

আমার তো মনে হয় পঁচিশে মার্চ আমরা যেমন ছোটো আকারে (একুশে টিভির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সাংবাদিক সায়মন ড্রিং যার প্রবর্তক) হলেও পালন করি, ২ এপ্রিল তারিখটিকে 'জিঞ্জিরা ডে' হিসেবে আমাদের তেমনি প্রতিবছর পালন করা উচিত। সাত ঘণ্টা স্থায়ী (স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলপত্রে অবশ্য সকাল পাঁচটা থেকে দুপুর দুইটা পর্যন্ত অর্থাৎ নয় ঘণ্টার কথা বলা হয়েছে) মিলিটারি অপারেশনে বুড়িগঙ্গা নদীর ওপারের গ্রামগুলোতে সেদিন যারা শহীদ হয়েছিলেন, তাঁদের জন্য সেখানে একটি স্মৃতিফলকও নির্মাণ করা দরকার। মার্কিন সেনাদের বর্বরতার নিদর্শন ভিয়েতনামের মাইলাই জেনোসাইডের কথা আমরা জানি, বিশ্ববাসীও জানে— কিন্তু জিঞ্জিরা গণহত্যার কথা বিশ্ববাসী দূরে থাক, আমরা নিজেরাও খুব ভাল করে জানি না। আমাদের মায়েদের গর্ভভূমি খুব উর্বর বলে আমাদের কাছে জীবনের মূল্য কি এতই তুচ্ছ? এতই কম?

মহান স্রষ্টার প্রতি আমার কৃতজ্ঞচিত্তের প্রণতি, ইতোমধ্যে কোটি-কোটি প্রাণের বিলুপ্তি ঘটলেও, তিনি আমাকে আজও তাঁর সুন্দর পৃথিবীতে সহিসালামতে বাঁচিয়ে রেখেছেন। মনে হয় আমার জন্য তাঁর করুণার কোনো শেষ নেই। হে মহান দয়ালু প্রভু, তোমাকে প্রণাম। তোমাকে সালাম।

প্রস্তাবনার সমাপ্তিশেষে, পাঠক আসুন, এবার আমরা আবার সেই শুভাড্যায় ফিরে যাই।

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শুভাড্যা একটা বিরাট বড় গ্রাম। এত বড় গ্রাম পৃথিবীতে খুব বেশি আছে বলে মনে হয় না। ঐ গ্রামটি পাঁচ ভাগে বিভক্ত। উত্তর শুভাড্যা, দক্ষিণ শুভাড্যা, পূর্ব শুভাড্যা, পশ্চিম শুভাড্যা ও মধ্য শুভাড্যা। শুভাড্যা গ্রাম ও তার আশপাশের আরও কয়েকটি গ্রাম নিয়ে তৈরি হয়েছে কেরানীগঞ্জ থানার সবচেয়ে বড় ইউনিয়ন, শুভাড্যা ইউনিয়ন। ১৯৭০ সালের নির্বাচনের সময় ঐ ইউনিয়নের ভোটার সংখ্যা ছিল প্রায় ৪০ হাজারের কাছাকাছি। প্রচুর হিন্দুর বাস ছিল সেখানে। মোস্তফা মহসীন মন্টুর মতে তখন শুভাড্যা ছিল একটা হিন্দুপ্রধান এলাকা। আওয়ামী লীগের শক্ত ঘাঁটি। নেকরোজবাগ থেকে সরে এসে আমরা যে একটি হিন্দুপ্রধান গ্রামে আশ্রয় নিয়েছি, সেই বিষয়টা শুরুতে আমাদের জানা ছিল না। জানলাম কয়েকদিন সেখানে বাস করার পর। দেখলাম পথে-ঘাটে প্রচুর হিন্দুর চলাচল। মেয়েদের সিঁথিতে সিঁদুর, কপালে গোল টিপ, হাতে সাদা ধবধবে শঙ্খের শাঁখা, পুরুষদের পরনে কোচামারা ধুতি। গলায় রুদ্রাক্ষের কণ্ঠিমালা। সান্ধ্য আজানের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাজছে হিন্দু মেয়েদের উলুধ্বনি আর কাঁসর ঘণ্টার আওয়াজ। দুই প্রবল ধর্মের ঐরূপ শান্তিময় সহাবস্থান পূর্ব পাকিস্তানে খুব সহজদৃষ্ট নয়। দেখলাম ঢাকার শাঁখারিপট্টি, বাংলাবাজার, লক্ষ্মীবাজার ও সূত্রাপুর অঞ্চল থেকে দল বেঁধে পালিয়ে আসা হিন্দুরা তো রয়েছেই, ঢাকা থেকে পালিয়ে আসা অনেক মুসলমানও আশ্রয় নিয়েছে ঐ সব হিন্দুদের বাড়িঘরে। মনে হলো বর্বর পাকসেনাদের তাড়া খেয়ে, অভিন্ন শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করার মানসিকতা নিয়ে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে কেমন যেন একটা অভাবিত সখ্যভাব গড়ে উঠেছে। কিন্তু ঐ সখ্যভাবটা কতদূর স্থায়ী হবে, পাকসেনারা যখন হিন্দুদের পৃথকভাবে হত্যা করতে শুরু করবে, যখন ইংরেজদের মতো তারা অনুসরণ করবে ডিভাইড এ্যান্ড রুল পলিসি, তখনও কি এই সখ্যভাবটা বজায় থাকবে? এ নিয়ে আমার মনের ভিতরে সংশয় দেখা দিল। ভাবলাম আরও ভিতরের দিকে চলে গেলে ভাল হয়। কিন্তু তখন আর আমাদের পক্ষে অন্যত্র সরে যাবার সময় ছিল না। সরে যাবার বাস্তব প্রয়োজন তখনও পর্যন্ত হয়তো ছিলও না, কিন্তু আমার মন বলছিল, জায়গাটা খুব নিরাপদ নয়। আমার মনে হচ্ছিল, পাকসেনারা তাদের অপারেশনের শুরুতে নির্বিচার বাঙালি নিধনে মত্ত হলেও, অচিরেই পূর্ব পাকিস্তানের (বাংলাদেশ) হিন্দুরা তাদের বিশেষ টার্গেট হবেই। সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র পাকিস্তান রণক্ষেত্রে তার পাকিস্তানত্ব প্রমাণ না করে পারে না। আজ হোক, কাল হোক, পাকিস্তানি সামরিক জান্তা সাম্প্রদায়িক বিভাজনের পরীক্ষিত পথেই অগ্রসর হবে। হতে বাধ্য।

বিগত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে শেখ মুজিবের প্রতি সংখ্যালঘু হিন্দুদের এককাট্টা অবস্থান গ্রহণের বিষয়টি হাড়েমজ্জায় হিন্দুবিদ্বেষী পাকসেনাদের দৃষ্টি

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এড়িয়ে যাবার মতো কোনো অস্পষ্ট বিষয় ছিল না। তাই মুজিবানুসারী সংখ্যাগুরুদের মধ্যে মিশে থাকলেও একটি আলাদা ভীতিবোধ আমাকে ক্রমশ গ্রাস করতে শুরু করেছিল। পিঁপড়ে যেমন আসন্ন প্লাবনের আগাম আভাস পায়, আমিও তেমনি একটি বিপদের আভাস পাচ্ছিলাম। কিন্তু শুভাড্যায় থাকার মতো একটা নিরাপদ আশ্রয় পেয়ে যাওয়ার ফলে সেটা ছেড়ে দিয়ে আবার অনিশ্চয়তার পথে পা বাড়াতে মন চাইছিল না। পাকসেনারা সহসাই বুড়িগঙ্গা নদী পাড়ি দিয়ে এখানে এসে আক্রমণ চালাবে, চালাতে পারে– এমন ধারণাও আমরা তখন করিনি। ফলে আমরা যেখানে আশ্রয় পেয়েছি, সেখানেই থেকে যেতে থাকি।

ঐ জায়গাটার ওপর আমাদের মনের মধ্যে কিছু মায়াও সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। মনে হচ্ছিল, এ যেন আমার নিজ গ্রামই। আমরা পথের পাশের যে দোকান ঘরটিতে থাকতাম, সেই দোকান ঘরের ছবিটা আজও আমার কল্পনার মধ্যে কিছুটা রয়ে গেছে। চোখ বন্ধ করলে আমি আজও সেই দোকান ঘরটা দেখতে পাই। ভাল আঁকিয়ে হলে আমার পক্ষে সেই ঘরটির একটা ছবি হয়তো আঁকা সম্ভব হতো। দোকান ঘরটার পাশেই ছিল একটা বিরাট জাম গাছ। নিজে বিরাট বলে তার শাখা প্রশাখাও ছিল বিরাট ও বিস্তর। অজস্র সবুজ পত্রপল্লব বিশিষ্ট ঐ জামগাছটা তার চারপাশের এলাকাটাকে শীতল ছায়া দিয়ে আগলে রেখেছিল। চৈত্রের উত্তপ্ত দুপুরে শরীর জুড়িয়ে নিতে সেই গাছের ছায়ায় জিরিয়ে নিত পথিকদল। গাছের নিচের চায়ের স্টলটিতে দিনরাত চলত রাজা-উজির মারা রাজনৈতিক আড্ডা। আমার গ্রামের বাড়িতে ঠিক এরকমই একটা বিরাট জামগাছ আছে। প্রতিটি জামের মৌসুমে আমার শৈশবে আমি ঐ জামগাছের জাম খেয়ে, পাকা জামের মধুর রসে আমার মুখ বহুদিন রঙিন করেছি। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিয়েছি ঐ ফলভারনত জামগাছের ডালে ডালে, শাখা-প্রশাখায়। ঐ জামগাছটির নিচে বসলেই আমার নিজের গ্রামের কথা মনে পড়ত। মনে পড়ত আমার বাবা-মা, ভাইবোনদের কথা। কতদিন তাদের কোনো খবর রাখি না। তারা জানেও না আমি আদৌ বেঁচে আছি, না পাকসেনাদের নির্বিচার হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছি। আমার পরিবারের প্রিয়জনরা যে তখনও বেঁচে আছে, তা আমি অনুমান করতে পারছিলাম, কেননা পাকসেনারা তখনও পর্যন্ত বড় শহরগুলো দখলে নিয়ে গ্রামের দিকে ছড়িয়ে পড়তে পারেনি। কিন্তু আমার সম্পর্কে তাদের দুর্ভাবনার সঙ্গত কারণ ছিল। কথায় বলে দুঃসংবাদ দাবানলের মতো দ্রুত ছড়ায়। ২৫ মার্চের রাতে ঢাকায় যে গণহত্যা সংঘটিত হয়েছে, তাতে যে কয়েক হাজার নিরস্ত্র মানুষের প্রাণ গেছে, আমার কর্মস্থল 'দি পিপল' পত্রিকার অফিসটি যে ডিনামাইট দিয়ে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে– ভারতের আকাশবাণী, বিবিসি ও ভয়েস অব আমেরিকার মাধ্যমে সেইসব সংবাদ সারা বিশ্বে তখন ছড়িয়ে পড়েছিল। ঐ গণহত্যার সংবাদ শোনার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পর আমাকে নিয়ে তাদের তো চিন্তিত হওয়ারই কথা। তাই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমি আমার গ্রামে ফিরে যাবার কথাই ভাবছিলাম। ভাবছিলাম কোনোভাবে আমার বেঁচে থাকার অবিশ্বাস্য শুভসংবাদটি তাদের কাছে যদি পৌঁছানো যেত। কিন্তু সেই দুর্ভাবনার হাত থেকে আমার পরিবারকে মুক্ত করার কোনো উপায়ই তখন ছিল না। পোস্ট অফিসগুলো ছিল বন্ধ। ঢাকা শহর সারা দেশ থেকে কার্যত বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। ট্রেন চলছে না। বাস চলছে না। পাকদানবদের ভয়ে পথের পাশে ও গ্যারেজে মুখ থুবড়ে পড়েছে যন্ত্রযানদানব। মানুষের ভরসা হয়ে দাঁড়িয়েছে মনুষ্যচালিত রিকশা, ভ্যান আর ঠেলাগাড়ি। সত্তরের নির্বাচনে মুসলিম লীগ ও পশ্চিম পাকিস্তানের হুংকারপ্রিয় নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টোকে চুপসে দিয়ে নিরঙ্কুশ বিজয়লাভের জন্য পাকিস্তানের বিশ্বসেরা সেনাবাহিনী শেখ মুজিব ও তার অনুসারীদের এমন মার দিয়েছে, যে তারা এখন আক্ষরিক অর্থেই ফিরে গেছে পায়ে হেঁটে পথ চলার সেই আদিম প্রস্তর যুগে। মূঢ় দানবের অপশাসনের চাকা যখন সচল হয়, শান্তিকামী গণমানবের চাকা তখন কি আর অচল না হয়ে পারে? অজানা ভবিষ্যতের হাতে ভাগ্যকে সঁপে দিয়ে আমরা আমাদের দিনরাত্রিগুলো পাড়ি দিচ্ছিলাম। আমাদের জীবন থেকে দিনরাত্রির পার্থক্য তখন অনেকটাই ঘুচে গিয়েছিল।

আমাদের সময় কাটত সংবাদের সন্ধানে ঐ দোকানের একটি ছোট্ট ওয়ান ব্যান্ড রেডিওর নব ঘোরাতে ঘোরাতে। আকাশবাণী ও স্বাধীন বাংলা বেতারের অনুষ্ঠান শুনতে শুনতে। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও ৩০ মার্চ দুপুরের পর থেকে আমরা যখন আর স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রটি কোথাও খুঁজে পেলাম না, তখন আমাদের দুশ্চিন্তা বেড়ে গেল। আমাদের আনন্দ উধাও। কোথায় কোনো বৈরী হাওয়ায় মিলিয়ে গেল আমাদের স্বপ্নের স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রটি? না জানি কী ঘটেছে তার ভাগ্যে! গত ক'দিনে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রটি হয়ে উঠেছিল আমাদের সকল আশা-ভরসার স্থল। অন্ধের যষ্টি। তখন তো আর আমরা জানতাম না যে, ৩০ মার্চ দ্বিপ্রহরে ২টা ১০ মিনিটে পাক-বোমারুবিমান থেকে ১০টি শক্তিশালী বোমা নিক্ষেপ করে কালুরঘাটের স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রটিকে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। ১০ কিলোওয়াট প্রচার শক্তিসম্পন্ন ট্রান্সমিটারটি বোমার আঘাতে অকেজো হয়ে গেলে, পরদিন ৩১ মার্চ ১ কিলোওয়াটের একটি ট্রান্সমিটার নিকটবর্তী পটিয়ায় নিয়ে যাওয়া হয় ও পরে সেটি নিয়ে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের বিপ্লবী কলাকুশলীরা ভারতীয় সীমান্ত অতিক্রম করে আগরতলায় চলে যান।

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রটি আমাদের হাতছাড়া হওয়ার পর আকাশবাণী কলকাতা আমাদের ভরসাস্থলে পরিণত হয়। আকাশবাণীর ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমরা দিনরাত খবর শুনি। সেখান থেকে এই গুরুত্বপূর্ণ সংবাদটি জেনে আমরা নিশ্চিন্ত হই যে, জিঞ্জিরা-কলাতিয়া হয়ে দীর্ঘ কষ্টকর পথ পাড়ি দিয়ে আওয়ামী লীগের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ নেতা জনাব তাজউদ্দীন আহমদ কুষ্টিয়া সীমান্ত দিয়ে ভারতে নিরাপদে প্রবেশ করেছেন। ঐ আকাশবাণীর সংবাদেই আমরা জানতে পারি যে, ৩১ মার্চ ভারতীয় পার্লামেন্টে সর্বসম্মতিক্রমে বাংলাদেশের মানুষের সংগ্রামের প্রতি সমর্থন জানিয়ে একটি সিদ্ধান্ত প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। লোকসভা ও রাজ্যসভায় ভারতের প্রধানমন্ত্রী মিসেস ইন্দিরা গান্ধী কর্তৃক আনীত ঐ প্রস্তাবের উপসংহারে বলা হয় :

> 'The House records its profound conviction that historic upsurge of the 75 million of people of East Bengal will triumph. The House wishes to assure them that their struggle and sacrifices will receive the wholehearted sympathy and support of the people of India.'

পাকসেনারা বুড়িগঙ্গা নদীপথে টহল দিচ্ছে বলে সন্ধ্যায় লোকমুখে খবর পেয়ে মনের ভিতরে যে ভয়টা জেগেছিল, রাতে দেবদুলালের জনপ্রিয় সুরেলা কণ্ঠে আকাশবাণী থেকে প্রচারিত ঐ আনন্দ-সংবাদটি শুনে আমাদের আর খুশির অন্ত থাকে না। আমাদের ভয় কিছুটা কেটে যায়। মিসেস ইন্দিরা গান্ধীর প্রস্তাবে বাংলাদেশ নামটি ব্যবহার করা না হলেও পূর্ব পাকিস্তানের পরিবর্তে ইস্ট বেঙ্গল নাম ব্যবহার করাটাকেই আমরা তখন খুব তাৎপর্যপূর্ণ বলে ভাবতে শুরু করি। তাজউদ্দীনসহ আওয়ামী লীগের অনেক নেতা বিভিন্ন সীমান্তপথে ভারতে পৌঁছেছেন এবং ভারতীয় পার্লামেন্টে আমাদের প্রতি সহানুভূতি ও সমর্থন জানিয়ে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে—এই দুটি খবর জানার কারণে অনেক দিন পর রাতে আমাদের খুব ভাল ঘুম হয়। এমন আনন্দে মানুষের সুন্দর স্বপ্ন দেখারই কথা। কিন্তু আমি কোনো স্বপ্ন দেখি না।

ভোর পাঁচটার দিকে আমাদের ঘুম ভাঙে দরোজায় সজোরে কড়া নাড়ার শব্দে। মসজিদ থেকে তখন সবে আজানের ধ্বনি ভেসে আসতে শুরু করেছে। হঠাৎ কড়া নাড়ার কর্কশ শব্দে আমরা তিনজন প্রায় একইসঙ্গে ঘুম ভেঙে জেগে উঠি। দরোজা খুলতে দেরি হচ্ছে দেখে রফিক (আমাদের আশ্রয়দানকারীর পুত্র, পরম শ্রদ্ধাভরে যে আমাদের দেখভাল করত) দরোজার ফাঁক দিয়ে চাপাস্বরে ফিসফিস করে বলে, 'আপনারা তাড়াতাড়ি পালান, তাড়াতাড়ি... দেরি করবেন না.. আর্মি আসছে...।'

দরোজা খুলতে না খুলতেই আমাদের জাগিয়ে দিয়ে শ্রীমান রফিক উধাও। আমরা রফিকের নাম ধরে ডাকি। কিন্তু সাড়া পাই না। বাতাসে কান পেতে আমি হঠাৎ নিদ্রা ভাঙা মানুষের চাপা গোঙানির শব্দ শুনতে পাই। আমার কর্ণকুহরে ঘরছাড়া দিশেহারা মানুষের পায়ের আওয়াজ ও দীর্ঘশ্বাসের শব্দ ভেসে আসে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জামগাছে আশ্রয় নেওয়া কাক-পাখিগুলো বিপন্ন-মানুষদের অসহায়ত্বের কথা ভেবে আর্তনাদ করে ওঠে। কা-কা-কা...।

ভোরের পবিত্র নীরবতা ছিন্ন করে তখন শুরু হয় মর্টারের শেল আর মেশিনগানের গুলিবৃষ্টি।

২

মেশিনগানের ঝাঁকঝাঁক গুলির শব্দ আর মর্টার-নিক্ষিপ্ত শেলের আকাশ কাঁপানো প্রলয় ডঙ্কা শুনে মনে হলো আমরা এবার আরেকটি ২৫ মার্চের মুখোমুখি হতে চলেছি। পূর্ব আকাশে তখনও সূর্য ওঠেনি। সবে উঠি উঠি করছে। আর পশ্চিম আকাশে তখন কালো মেঘের মতো কুণ্ডুলি পাকিয়ে উঠছে ধোঁয়া। ২৫ মার্চে আমরা ঢাকায় দেখেছি ঐ রকমের কুণ্ডুলি পাকানো ধোঁয়ার উৎস কী? আমাদের দোকানঘরের সামনের রাস্তা ধরে ছুটতে থাকা মানুষজনের কাছ থেকে জানলাম, গানবোট থেকে নেমে পাকসেনারা গান পাউডার ছিটিয়ে জিঞ্জিরা ও বড়িশুর বাজার দুটি আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে। তারা যাকে পাচ্ছে তাকেই নির্বিচারে গুলি করে হত্যা করছে। দৌড়ে ছুটে যেতে যেতে একজন চিৎকার করে বলল, 'আপনারা যেখানে পারেন মেয়েদের লুকিয়ে রাখেন। ওরা মেয়েদের ধরে ওদের গাড়িতে উঠিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। সাবধান। আপনারা ওঠেন। জাগেন। পালান। পানাপুকুরে লুকিয়ে থাকেন।' উদ্বিগ্ন মধ্যবয়সী ঐ লোকটিকে দেখে মনে হলো, তিনি স্থানীয় আওয়ামী লীগের নেতা হবেন।

হেলাল হাফিজকে নিয়ে হলো আমাদের বিপদ। আমি আর নজরুল পথের ওপর দাঁড়িয়ে হেলালের জন্য অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছি। কিন্তু হেলাল কিছুতেই দোকানঘর থেকে বেরিয়ে আসে না। অগত্যা দোকানঘরের ভিতরে ফিরে যাই। গিয়ে দেখি, দেয়ালে ঝুলানো একটা ছোট্ট আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে অত্যন্ত যত্নসহকারে হেলাল চুল আঁচড়াচ্ছে। ওর কাণ্ড দেখে রাগে আমার পিত্তি জ্বলে যায়। আমি চিৎকার করে ওকে ধমক দিয়ে বলি, 'এই বুঝি তোমার চুল আঁচড়ানোর সময়? আগে মাথা বাঁচাও, মাথাই যদি না থাকে, তো চুল দিয়ে করবেটা কি?'

আমার অপর সঙ্গী নজরুল ইসলাম শাহ্-র চুলের পরিচর্যার কোনো দরকার পড়ে না। তার গোল মাথায় শুভ্র-সুমসৃণ টাক। টাক থাকাতে ওকে দেখতে আরও সুন্দর লাগে। মাথায় চুল থাকলে ওকে এত সুন্দর লাগত বলে মনে হয় না। আমার মনে হলো চিরুনি আবিষ্কার না হলেও তার কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি ছিল না। আর আমি? আমার মাথাভর্তি অযত্নলালিত বাবরি দোলানো ঘনকৃষ্ণ কেশদাম। হাতের পাঁচ আঙুল দিয়েই আমি চিরুনির কাজ সারি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার ধমক খেয়ে হেলাল চুলের পরিচর্যা অসম্পন্ন রেখেই বাইরে বেরিয়ে আসে। তখন নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে আমরা ত্বরিত সিদ্ধান্ত নেই, আমাদের নিকটবর্তী মসজিদটিতে গিয়ে আমরা আপাতত আশ্রয় নেব। মনে হলো মানুষজন ঐ মসজিদের দিকেই ছুটছে। আমরাও ধারণা করি, আল্লাহর ঘর মসজিদে হয়তো ধর্মপ্রাণ পাকসেনারা আক্রমণ করবে না। করে যদি তো করবে। একা তো আর মরব না, সেখানে অনেকের সঙ্গে মরা যাবে। একা একা মরার চেয়ে অনেকে মিলে একসঙ্গে মরার মধ্যে একটা আনন্দ আছে। মৃত্যুর ভয়টা সেখানে তুলনামূলকভাবে কম হবে। মৃত্যুকে আমরা অনেকে মিলে ভাগ করে নিতে পারব। ১৯৭১ সালে আমরা যে লাখে লাখে মরতে পেরেছিলাম, সে তো এজন্যই যে ওটা ছিল অনেকে মিলে মরা। মরতে মরতে মৃত্যুর ভয়কে জয় করে ফেলা। বঙ্গবন্ধু মানুষের সমবেত-মৃত্যুর ঐ অপরিমেয় শক্তিটাকে শনাক্ত করতে পেরেছিলেন বলেই তাঁর ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণে তিনি বলতে পেরেছিলেন, ...'আমরা যখন মরতে শিখেছি, তখন কেউ আমাদের দাবায়ে রাখতে পারবে না।'

আমরা যখন এ রকম ভাবছি, তখন আগুনের ফুলকি ছড়াতে ছড়াতে আমাদের দোকানঘরের ওপর দিয়ে ছুটে গেল ঝাঁক ঝাঁক গুলি। গুলির পেছনে পেছনে মশালের মতো জ্বলতে জ্বলতে ছুটে আসে কামানের গোলা আর মর্টারের শেল। সামান্য নিচে দিয়ে গেলে সেইসব গুলি-গোলা ও শেলের আঘাতে আমাদের যে-কারও মস্তক মুহূর্তে ছিন্ন হতে পারত। বিশেষ করে আমার। বাহাদুরি দেখাবার জন্য নয়, বাস্তব কারণেই আমার মাথাটি অনেকের উপরে থাকে। ফলে আমার মাথাটি নিয়ে আমার হয়েছে ভারি বিপদ। বিধাতা কেন যে আমার মস্তকটিকে এমন একটি অনাবশ্যক দীর্ঘ দেহকাঠামোর ওপর স্থাপন করে তাকে পৃথিবীর সবচেয়ে সাম্প্রদায়িক ও অগণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ইসলামিক রিপাবলিক অব পাকিস্তানের নাগরিক করে পাঠিয়েছিলেন, তা তিনিই ভাল জানেন। তিনি কি জানতেন না আমার এই 'চির-উন্নত-শির'টি ছড়রা গুলির সামনে কত বিপজ্জনক হতে পারে?

অবশ্য পাকিস্তানে নয়, আমার জন্ম হয়েছিল অখণ্ড ভারতবর্ষেই। সেই ভারত হিন্দু-মুসলমানে ভাগ হয়ে পাকিস্তানের জন্ম হয়েছে আমার জন্মের দু'বছর পর। দীর্ঘদেহী করে পাকিস্তানে জন্ম দেওয়ার জন্য ভগবানকে যে দুষবো, তারও আর উপায় থাকে না। যুক্তিতর্কে শেষ পর্যন্ত ভগবানেরই জয় হয়। মনে হয়, আমার জন্মের পরপরই বহু ভাষা, বহু সংস্কৃতি ও বহু ধর্মের লালনভূমি ভারত যে তুচ্ছ দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে এভাবে ভাগ হয়ে যাবে, তা তিনিও জানতেন না। জানতেন চুরট চার্চিল, রেডক্লিফ, নেহেরু, মহাত্মা গান্ধী আর মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ।

২৫ মার্চের মিলিটারি অপারেশনের পর ঢাকা থেকে পালিয়ে এসে আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাকর্মী ও ঢাকার মানুষ যে এখানে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এসে আশ্রয় নিয়েছে, পাকসেনাদের তা অজানা থাকার কথা নয়। বিশেষ করে মুস্তফা মহসীন মন্টুর বাড়ি এখানে। খসরুও তার দলবল নিয়ে এখানে এসেছে। ওরা দুজনই পাক আর্মি মার্ডার কেসের পলাতক দাগী আসামী। মন্টু তো ঢাকা সেন্ট্রাল জেল ভেঙে সদলবলে পালিয়েছে। ২৬ মার্চ সকালে কিছুসংখ্যক অবাঙালি পুলিশকে হত্যা করে তাঁরই নেতৃত্বে দখল করা হয়েছে কেরানীগঞ্জ থানা। তাজউদ্দীন আহমদসহ প্রথম সারির আওয়ামী নেতারা এই পথেই ঢাকা থেকে পালিয়ে ফরিদপুর-কুষ্টিয়াসহ বিভিন্ন সীমান্ত দিয়ে পাকিস্তানের চিরশত্রুরাষ্ট্র ভারতে প্রবেশ করেছেন। বুঝলাম, মন্টু-খসরুকে গ্রেফতার করা ও এই ভারতমুখী রুটটা বন্ধ করতেই আজকের এই মিলিটারি অপারেশন। ২৫ মার্চের পর ঢাকা ছেড়ে বুড়িগঙ্গা নদীর এপারে পালিয়ে আসা লক্ষাধিক মানুষকে পুনরায় ঢাকায় ফিরিয়ে নেওয়াটাও পাকসেনাদের আক্রমণের আরেকটি উদ্দেশ্য ছিল। 'মন্টু কিধার হ্যায়?' 'খসরু কাহা হ্যায়?' পাকসেনারা নদী থেকে জিঞ্জিরার মাটিতে পা দিয়েই লোকজনকে ঐ রকম প্রশ্নও করছিল। বুঝলাম নেকরোজবাগ থেকে শুভাড্যায় সরে এসে আমরা ভুল করিনি।

যতই সময় যায়, পাকসেনাদের তাড়ায় প্রিয়জন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া মানুষের আর্তচিৎকারের শব্দ বাড়তে থাকে। শিকারি ব্যাঘ্রদলের তাড়া খাওয়া বনপোড়া হরিণদলের মতো মানুষ ছুটছে দিগ্বিদিক। অমুক কই, তমুক কই– বলে পলায়নপর মানুষ তাদের প্রিয়জনদের নাম ধরে ডাকছে। সন্তানকে কেউ কাঁখে করে, কেউবা বুকে আগলে নিয়ে রুদ্ধশ্বাসে ছুটছেন। প্রাণ ও সম্ভ্রম হারানোর আতঙ্ক বুকে নিয়ে সোমত্ত মেয়েরা দৌড়াচ্ছে অজানা নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে। কোথায় লুকালে যে তাদের প্রাণ বাঁচবে, তাদের সম্ভ্রম রক্ষা পাবে–, কেউ ভেবে পায় না। মনে হয় পাখা থাকলে তারা এই মুহূর্তে কাক-পাখিদের মতো আকাশে উড়ে যেত। পিঁপড়ে বা ইঁদুর হলে মাটি খুঁড়ে গর্তে লুকাত।

আমি উঁচু মাথা নিচু করে ছুটন্ত মানুষজনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দৌড়াতে থাকি ঐ মসজিদটিকে লক্ষ্য করে। গুলি আর শেলের লক্ষ্য থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে চলার সতর্কতাহেতু সামান্য দূরের পথকেও আমাদের কাছে অনেক দূরের পথ বলে মনে হয়। একসময় আমরা পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ি। উত্তরের দিক থেকেই শুধু নয়, দক্ষিণ দিক থেকেও যখন এলোপাতাড়ি গুলি আসতে থাকে– তখন আমরা বুঝতে পারি, শুধু নদী থেকে নয়, শুভাড্যার দক্ষিণ দিক দিয়ে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের যে সড়কটি নবাবগঞ্জের দিকে গেছে, সেই সড়ক থেকেও পাকসেনারা আমাদের ওপর আক্রমণ চালাচ্ছে। আমরা একটা ঘেরাটোপের ভিতরে বন্দি হয়ে পড়েছি। রাতের অন্ধকারে এপারের মানুষ যখন নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে ছিল, পাকসেনারা তখন চুপিসারে গানবোটে এসে বুড়িগঙ্গা নদীর এপারে নেমে নদীতীরবর্তী গ্রামগুলোতে পজিশন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিয়েছে এই মুক্তাঞ্চলটিকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছাড়খার করে দেবার জন্যই। সুকান্তর 'জ্বলে পুড়ে মরে ছাড়খার' কথাটা নতুন করে মনে পড়ল। মনে হলো, ২৫ মার্চে যা হোক কোনোভাবে প্রাণে বেঁচে গিয়েছিলাম, আজ বোধ হয় আর বাঁচা হবে না। তবুও প্রাণ বলে কথা। সে তার নিজের ধর্ম মেনে চলে। যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণই তার আশ। ক্রল করতে করতে মূল সড়ক থেকে নেমে, পথের পাশের খানাখন্দকে মাটির ঢালের মতো ব্যবহার করে আমি মসজিদের দিকে এগোতে থাকি। গুলিবৃষ্টি বেড়ে গেলে থামি।

একটি ডোবার ভিতরে মাথা গুঁজে বসে আমি তখন এমন একটি করুণ মৃত্যুর দৃশ্য প্রত্যক্ষ করি, যা আমি কোনোদিন ভুলতে পারব না। পারিনি। আমি দেখি, শেলের আঘাতে একজন ধাবমান মানুষের দেহ থেকে তার মস্তকটি বিচ্ছিন্ন হয়ে ছিটকে পড়েছে আমি যে ডোবায় লুকিয়ে ছিলাম সেই ডোবার জলে, কিন্তু ঐ মানুষটি তারপরও দৌড়াচ্ছে। শেলের আঘাতে তার মাথাটি যে দেহ থেকে উড়ে গেছে, সেদিকে তার খেয়ালই নেই। মস্তকচ্ছিন্ন দেহটিকে নিয়ে কিছুটা দূরত্ব অতিক্রম করার পর লোকটা আর পারল না। তার কবন্ধ দেহটা লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। মস্তকহীন দেহ থেকে ফিনকি দিয়ে ছোটা রক্ত স্রোতে ভিজে গেল শুভাড্যার মাটি।

ঐরকমের একটি ভয়াবহ দৃশ্য দেখে ভয়ে আমি আমার দুচোখ বন্ধ করে ফেললাম। তারপর কী আশ্চর্য নিজের প্রাণ বাঁচানোর জন্য ঐ লোকটার নিষ্প্রাণ নিথর দেহটিকে পাশ কাটিয়ে আমি দ্রুত ছুটে গেলাম ঐ মসজিদের দিকে। যাবার সময় হঠাৎ দেখি একটি ছোট্ট শিশু তার মার কাঁখ থেকে সটকে পড়েছে পথের উপর। শিশুটির ভীতসন্ত্রস্ত মা একটুও টের পাননি। সন্তান তার কাঁখেই আছে ভেবে তখনও ভয়ার্ত হরিণের মতো তিনি প্রাণপণ দৌড়াচ্ছেন। কিছুক্ষণ পর যখন তার খেয়াল হলো যে তার শিশুটি আর তার কাঁখে নেই, তখন পেছন ফিরে তার সে কী কান্না! ভাগ্য ভাল শিশুটির যে সে মায়ের কাঁখ থেকে পিছলে পড়ে গড়িয়ে গড়িয়ে ডোবার জলে গিয়ে পড়েনি। পথের উপর বসে সে কাঁদছিল আর তুলতুলে পায়ে উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করছিল। তখন মা এসে তার প্রাণের ধনকে বুকে কুড়িয়ে নিয়ে দিলেন আবারও ভোঁ দৌড়। অনেক দুঃখের মধ্যেও আমার খুব ভাল লাগল ঐ দৃশ্যটি দেখে। ওর মা ফিরে এসে পথ থেকে কুড়িয়ে না নিলে আমি কি পারতাম ওকেও পেছনে ফেলে রেখে মসজিদে চলে যেতে? কে জানে, হয়তো পারতাম। ঈশ্বর আমাকে সেই অগ্নি-পরীক্ষার হাত থেকে বাঁচিয়ে দিলেন।

আমি যখন মসজিদ প্রাঙ্গণে পৌঁছলাম, ততক্ষণে সেই মসজিদটি লোকে লোকারণ্য। মসজিদের সামনের পাকা উঠানের ওপর বেশ ক'টি মৃত ও অর্ধমৃত পুরুষের দেহ পড়ে আছে। কেউ চিত হয়ে, কেউ-বা উবু হয়ে আছে। কারও দিকে কেউ তাকাচ্ছে না। ঐ সব মৃত বা অর্ধমৃতরা যেন জীবিতদের কেউ নয়। তাদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেহ থেকে রক্ত বেরুচ্ছে অঝোরে। হেলাল আর নজরুলকে দেখলাম মসজিদের ভিতরে বসে কোরান শরীফ পড়ছে। আমিও মহান আল্লাহর কাছে মনে মনে ক্ষমা চেয়ে ঐ মসজিদের ভিতরে প্রবেশ করলাম।

৩

আমার মসজিদে পৌঁছুতে বিলম্ব হওয়ায় হেলাল ও নজরুল যে আমাকে নিয়ে খুব দুশ্চিন্তার মধ্যে ছিল, ওদের সন্ত্রাসবিদ্ধ বিস্ফারিত চোখের দিকে তাকিয়ে তা বেশ বুঝতে পারলাম। আমি আমার গায়ের কাদামাখা পাঞ্জাবির প্রতি ওদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম। দেখে ওরা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছে, আমি কীভাবে কঠিন সংগ্রাম করে শেষ পর্যন্ত জান বাঁচিয়ে ঐ মসজিদ পর্যন্ত এসে পৌঁছেছি। ঐ জান বাঁচিয়ে রাখতে পারাটা সেদিন কম কঠিন কাজ ছিল না। শুধু ভাগ্যের হাতে নিজেকে সঁপে দিয়ে তো বাঁচিনি, পাকসেনাদের পাতা মৃত্যুকূপ থেকে বাঁচার জন্য সেদিন আমাকে যথেষ্ট বুদ্ধিও খরচ করতে হয়েছিল। তবে কি বুদ্ধিমানরা সেদিন মারা পড়েনি? পড়েছে, যাদের ভাগ্য ছিল অপ্রসন্ন। আর ভাগ্যবানদের মধ্যে যারা মারা পড়েছিল, তাদের বেলায় হয়তো বুদ্ধিদেবী প্রসন্ন ছিলেন না। ভাগ্য ও বুদ্ধি এই দুই দেবীর দয়া যারা পেয়েছিল, একাত্তর সালে পাকহানাদার বাহিনীর মরণবাণ থেকে তারাই শুধু বেঁচেছে।

ঐ মসজিদটির কথা আমার বেশ মনে আছে। মসজিদটির মেঝেটা ছিল পাকা কিন্তু তার দেয়াল আর চালা ছিল টিনের। আমি নজরুল বা হেলালের কাছে না বসে ওদের থেকে বেশ কিছুটা দূরে, দক্ষিণ দিকের একটা জানালার পাশে বসলাম। জানালাসংলগ্ন ছোট্ট কাঠের টুলের উপর রেহেলে রাখা একটি কাপড়মোড়া কোরান শরীফও পেয়ে গেলাম হাতের কাছেই। আশ্চর্য, এটি কি কারও চোখে পড়েনি? একটা ছোট্ট মসজিদে আর ক'টা কোরান শরীফই বা থাকে! নিজেকে খুব ভাগ্যবান বলে মনে হলো।

স্কুলে পড়ার সময় মুহাম্মদ (সঃ)-এর জীবনী লিখে আমি আমার জীবনের প্রথম পুরস্কারটি পেয়েছিলাম। কোরান শরীফে লিপিবদ্ধ সুরাগুলো শেষ-নবী হজরত মুহাম্মদ(সঃ)-এর মাধ্যমে আল্লাহর ওহি হিসেবে নাজেল হয়েছিল। আমি ঐ কোরানটি দ্রুত লুফে নিলাম। ভাবলাম, আরবি না জানার কারণে সুরাগুলো পড়তে না পারলেও দুচোখ দিয়ে দেখতে তো পারব। মানুষ যে দুর্গম পথ পাড়ি দিয়ে তাদের প্রিয় ধর্মস্থান দর্শনে যায়, সে তো দুচোখ ভরে দেখার জন্যই। সেখানে তো পাঠের বালাই থাকে না। চোখের দেখাটাকেই সেখানে পুণ্যজ্ঞান করা হয়। তো পড়তে না পারলেও কোরান শরীফের পাতায় চোখ বুলিয়ে দেখার পুণ্য থেকে আমিই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বা বঞ্চিত হব কেন? অমুসলমান বলে? আমার তা মনে হয় না। আমার মনে হয়, মানুষ কোনো একটি বিশেষ ধর্মে জন্ম গ্রহণ করলেও কমবেশি সকল ধর্মের আবহের মধ্যেই সে বাস করে। বিপন্ন মানুষকে আশ্রয় দান করাটা সকল ধর্মেরই মর্মকথা। অপবিত্র হওয়ার আশংকায় তাড়িয়ে দেওয়ার মধ্যে নয়, ধর্মগৃহে আশ্রয় সন্ধানে যারা আসে, তাদের বুকে টেনে নিতে পারার মধ্যেই নিহিত রয়েছে ধর্মের প্রকৃত গৌরব।

চারদিক থেকে পাকসেনাদের তাড়া খাওয়া অসহায় মানুষের আর্তচিৎকার আমাদের কানে ভেসে এলেও, মসজিদের ভিতরে আশ্রিত মানুষজনের মধ্যে তখন বিরাজ করছিল রাজ্যের নিস্তব্ধতা। কারও মুখে কোনো কথা নেই। দেখলাম, মসজিদের ভিড়ের ভিতরে সবাই বসে ইষ্টনাম জপ করছে। সেখানে কতজন মুসলমান আর কতজন হিন্দু— তা বোঝার কোনো উপায় নেই। মাথাভর্তি বাবরি চুল আর মুখের খোঁচা খোঁচা দাড়ির জন্য আমাকেই বরং তরুণ মুসলমান বলে বাইরে থেকে ভ্রম হয়। আমার তখন মনে পড়ল নজরুলের সেই মোক্ষম কবিতার চরণ :

'হিন্দু না ওরা মুসলিম? ঐ জিজ্ঞাসে কোন জন?
কাণ্ডারী, বল ডুবিছে মানুষ, সন্তান মোর মা'র।'

মনে হলো, মসজিদে আশ্রয়গ্রহণকারীরা সবাই যদি মুসলমান হতো, তাহলে আমার ভাগে কোরান শরীফ জুটবার কথা নয়। তবে কি মসজিদে আশ্রয়গ্রহণকারীরা অধিকাংশই হিন্দু? কে জানে? মনে হলো হিন্দু হয়ে প্রাণ বাঁচাতে মুসলমানদের পবিত্রস্থান হিসেবে বিবেচিত মসজিদের ভিতরে আশ্রয়গ্রহণকারী হিন্দুরা হয়তো এক ধরনের নীরব অপরাধবোধে ভুগছে। কলেমা পাঠরত মুসলমানদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে তারা কলেমা পাঠ করতে পারছে না। তারা নিশ্চুপ হয়ে বসে আছে।

মনে হলো এখানে কেউ কাউকে চেনে না। সবাই ভবিতব্যের ওপর নিজেদের সম্পূর্ণভাবে সঁপে দিয়ে ক্রমঅগ্রসরমান একটা ভয়ংকর মুহূর্তের প্রতীক্ষা করছে। আমার মনে হলো, মসজিদের ভিতরে বসে হিন্দুরা নিশ্চয়ই আল্লাহকে নয়, অভ্যাসবশত তাদের ইষ্টদেব ভগবানকেই স্মরণ করছে। যদিও আমাকে আমার ধর্ম নিয়ে কেউ প্রশ্ন করছিল না, কেউ বলেনি যে আপনি এখানে কেন? তবু পবিত্র কোরান শরীফের ওপর কিছুটা অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যই আমি তখন মনে মনে স্মরণ করলাম ভাই গিরিশচন্দ্র সেনের (১৮৩৫-১৯১০) কথা। 'কেবল মুসলমানের জন্য আসেনি কো ইসলাম'— নজরুলের এই কথাটাও মনে পড়ল। ভাই গিরিশচন্দ্র নিশ্চয়ই ঐ রূপ বিবেচনা থেকেই মুসলমানদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ কোরানকে আপনার বলে বিবেচনা করেছিলেন। বাংলা ভাষায় কোরান শরীফের প্রথম অনুবাদক হওয়ার বাহাদুরি দেখাবার জন্য নিশ্চয়ই এই স্পর্শকাতর বিশাল পবিত্র গ্রন্থ অনুবাদের মতো কঠিন কাজটি তিনি করেননি। ব্রাহ্মধর্মের অন্যতম প্রবর্তক কেশবচন্দ্র সেনের পরামর্শক্রমে ১৮৮১-১৮৮৬ পর্যন্ত ছয় বছরের দীর্ঘ সাধনা ও পরিশ্রমে তিনি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

টীকাসহ কোরান শরীফের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত করেছিলেন। তার জন্য তাঁকে বিরূপ পরিস্থিতির মোকাবিলাও করতে হয়েছিল। কোনো একদিন পূর্ববঙ্গের কিছু হিন্দু পাকসেনাদের আক্রমণ থেকে তাদের প্রাণ বাঁচানোর জন্য শুভাড্যার মসজিদে গিয়ে আশ্রয়গ্রহণ করবে, এ কথা ভেবে গিরিশবাবু সুদূর লক্ষ্ণৌয় গিয়ে পরম নিষ্ঠার সঙ্গে আরবি ভাষা শিখে এসে বাংলা ভাষায় কোরান শরীফের অনুবাদ করেননি। মুসলমান ও তাদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থের প্রতি পর্যাপ্ত ভালোবাসা ও সঙ্গত শ্রদ্ধাবোধ ছিল বলেই এই দুরূহ কর্ম তাঁর পক্ষে সম্পাদন করা সম্ভব হয়েছিল। মনে মনে বললাম, ধন্য গিরিশ! আপনি আমার কৃতজ্ঞচিত্তের শ্রদ্ধা গ্রহণ করুন।

বেশ কাকতালীয় ঘটনাই বটে, কোরান শরীফ সামনে নিয়ে শুভাড্যার যে মসজিদটিতে বসে আমি গিরিশচন্দ্রের কথা ভাবছিলাম, সেখান থেকে গিরিশচন্দ্রের জন্মগ্রাম নারায়ণগঞ্জের পাঁচদোনা খুব বেশি দূরে নয়। কর্মসূত্রে গিরিশচন্দ্র আমার নিজ জেলা ময়মনসিংহে দীর্ঘদিন কাটিয়েছেন, জানতাম। বর্তমান রচনার সূত্রে গিরিশচন্দ্রের জীবনী পাঠ করে আরও বিস্ময়কর কিছু তথ্য আমার জানা হলো, যা আমি পূর্বে জানতাম না। রবীন্দ্রনাথসহ যুক্তবাংলার বহু মনীষী যখন লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করছিলেন, তখন গিরিশচন্দ্র ছিলেন লর্ড কার্জনের তথা বঙ্গভঙ্গের (১৯০৫-১৯১০) একজন দৃঢ় সমর্থক। এই ব্যবস্থা পূর্ববঙ্গের অধিবাসীদের জন্য কল্যাণকর হবে বলেই তিনি তখন মত প্রকাশ করেছিলেন। হিন্দু ভদ্রলোকরা সবাই বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করেছিলেন বলে যারা ঢালাও মন্তব্য করেন, ভাই গিরিশচন্দ্রের ভূমিকা তাঁদের সেই ধারণার পরিপন্থী। পূর্ববঙ্গের অধিবাসী বলতে ভাই গিরিশচন্দ্র নিশ্চয়ই পূর্ববঙ্গের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের কথা বোঝাননি। পূর্ববঙ্গের আদিবাসী অমুসলমানদের কথাও তিনি নিশ্চয়ই স্মরণে রেখেছিলেন। তাঁর মুক্ত-উদার জীবনবেদ পাঠে এই প্রত্যয় হয় যে, তিনি একটি যথার্থ ধর্মনিরপেক্ষ পূর্ববঙ্গের (বাংলাদেশ) স্বপ্ন দেখেছিলেন। তখনকার পরিস্থিতিতে অনেক শিক্ষিত মুসলমান ও হিন্দুর পক্ষে ভাবা সম্ভব না হলেও, তিনি ভাবতে পেরেছিলেন যে মুসলমানদের নেতৃত্বেও পূর্ববঙ্গে একটি ধর্মনিরপেক্ষ সমাজ গড়ে উঠতে পারে। তবে তো ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা হিসেবে আমাদের পক্ষে তাঁকে অমান্য করা চলে না।

তাঁর সম্পর্কে অন্য যে তথ্যটি জেনেছি সেটিও চাঞ্চল্যকর বটে। ময়মনসিংহে বসবাসকালীন সময়ে তিনি দুটি পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। এর একটির নাম ছিল 'সুলভ সমাচার' ও অন্যটির নাম ছিল 'বঙ্গবন্ধু'। স্বাধীন পূর্ববঙ্গের (বাংলাদেশ) স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মের অনেক আগেই যে পূর্ববঙ্গে 'বঙ্গবন্ধু' কথাটা চালু ছিল, এই নামে একটি পত্রিকা পর্যন্ত ছিল, তা আমি জানতাম না। রামের জন্মের আগেই রামায়ণ রচিত হয়েছিল বলে অনেকে বলেন। বঙ্গবন্ধুর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জন্মের আগেই 'বঙ্গবন্ধু'র ধারণাটি যে পূর্ববঙ্গে প্রচলিত ছিল, তার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেল। ('বাংলা একাডেমী চরিতাভিধান' দ্রষ্টব্য)। ধন্য গিরিশচন্দ্র, ধন্য।

আগে খেয়াল করিনি। মসজিদের ডানদিকের জানালার পাশে বসেছি। বাঁদিকে তাকিয়ে দেখিনি। হঠাৎ বাঁদিকের খোলা জানালায় চোখ পড়তেই আমার চক্ষু চড়কগাছ। মনে হলো এর চেয়ে দান্তের ইনফারনো বা নরকদর্শনও হতো কম ভয়ংকর। দেখার সঙ্গে সঙ্গে ভয়ে আমি আমার দু'চোখ বন্ধ করে ফেললাম। হা ঈশ্বর! মসজিদের সামান্য দূরেই দেখছি জলভরা বুড়িগঙ্গা নদী। সকালের নবজাগ্রত সূর্যের আলো পড়ে সেই জল চিকচিক করছে। স্বাভাবিক অবস্থায় যা হতে পারত একটি চমৎকার দৃষ্টিনন্দন দৃশ্য— সেই ভোরে ঐ দৃশ্যটির মধ্যেই আমি বহু মানুষের মৃত্যুকে প্রত্যক্ষ করলাম। দেখলাম বুড়িগঙ্গা নদীর জলে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে পাকসেনাদের একটি বিরাট গানবোট। মারাত্মক অস্ত্রসজ্জিত পাকসেনারা তীরের কাছে নোঙর করা সেই গানবোট থেকে এপারের মাটিতে নামবার প্রস্তুতি নিচ্ছে। তারা তাদের গানবোট থেকে বিরাটাকৃতির তক্তা মাটিতে নামাচ্ছে। তক্তার মাধ্যমে নদীর এপারের মাটির সঙ্গে তাদের গানবোটটি যুক্ত হলেই পাকসেনারা দল বেঁধে এপারে নেমে আসবে। তারা গানবোট থেকে নামতেই তাদের সামনে পড়বে এই মানুষঠাসা মসজিদটি। হায়, এত পথ পাড়ি দিয়ে শেষে আমরা এ কোথায় এলাম? যেখানে বাঘের ভয়, সেখানেই রাত্রি হলো আমাদের?

২৫ মার্চের পর পাকসেনাদর্শন ছিল যমদর্শনের চেয়েও ভয়াবহ। বুঝলাম এই ভয়ংকর দৃশ্যটি অন্যরা আগেই দেখেছে, আমি দেখলাম সবে। মসজিদের ভিতরে ছড়িয়ে পড়া নীরবতার আসল কারণটি এবার আমার কাছে আরও স্পষ্ট হলো। পাকসেনাদের শ্যেনদৃষ্টি আর মেশিনগানগুলো আমাদের আশ্রয়স্থলের দিকে তাক করা। কিছুক্ষণের মধ্যেই শুভাড্যার মাটিতে তাদের চরণ পড়বে। হয়তো গুলি ছুড়তে ছুড়তে তারা এসে আমাদের এই মসজিদটিকে ঘিরে ফেলবে। কিছুক্ষণের মধ্যেই তাদের হাতে নির্ধারিত হবে আমাদের ভাগ্য।

আমি কি এই মসজিদে থাকব, নাকি অন্য কোথাও চলে যাব? আমি যখন এ রকম দ্বিধার ভিতরে, তখন এক তরুণ আমার কাছে এগিয়ে এসে আমার কানে কানে ফিসফিস করে বলল, 'কবি সাহেব, আমি আপনাকে চিনি। আপনি মসজিদ ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যান। এই জায়গাটা আপনার জন্য নিরাপদ নয়। বলা তো যায় না, অন্য কেউ হয়তো আপনাকে পাকসেনাদের হাতে ধরিয়ে দিয়ে নিজে বাঁচার চেষ্টা করতে পারে। আর এক মুহূর্ত দেরি করবেন না। চলে যান।' এই প্রয়োজনীয় কথাগুলো বলে তরুণটি আমার কাছ থেকে দ্রুত দূরে সরে গেল। কে ছিল ঐ তরুণ, আমি আজও জানি না। তার মুখটিও আমার স্মরণে নেই। আমি আর দেরি করলাম না, আমার পাশের খোলা জানালা দিয়ে দ্রুত মসজিদ থেকে নিষ্ক্রান্ত হলাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মসজিদের পাশ দিয়েই গেছে একটি এক চিলতে মাটির সড়ক। পাকসেনাদের দৃষ্টির আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে আমি ঐ পথটা পেরুলাম। সড়কের ওপারে পাশাপাশি অনেক গৃহস্থ বাড়ি। আমি ঢুকে গেলাম ঐসব বাড়ির মধ্যে যেটিকে কাছে পেলাম তার একটির ভিতরে। বাড়ির ভিতরে ঢুকে দেখি বাড়িতে কোনো মানুষজনের সাড়াশব্দ নেই। মোটামুটি সম্পন্ন গৃহস্থের বাড়ি। প্রশস্ত উঠান। বেশ পরিচ্ছন্ন। গোবর দিয়ে লেপানো তুলসীতলাটি দেখে বুঝতে পারলাম, বাড়িটি হিন্দুর। চারদিকে সুনসান নীরবতা। কিছু বুঝে উঠতে না পারা একটি ছোট্ট অবুঝ কুকুরছানা দৌড়ে এসে আমাকে স্বাগত জানাল। সে আগন্তুকের দিকে তাকিয়ে থাকল ফ্যাল ফ্যাল করে। বাড়িতে লোকজন নেই কেন, তারা কোথায় গেছে? মনে হলো এ প্রশ্ন শুধু আমার নয়, তারও। ঘরের ভিতরে প্রবেশ করতে আমি বারান্দায় উঠলাম। আমার চোখ পড়ল কপাট খোলা রান্নাঘরটির দিকে। দেখলাম রান্নাঘরের চুলায় বসানো ভাতের ডেকচি থেকে ভাতের ফেনা চুলার আগুনে উপচে পড়ছে। চুলার পাশে কাঁসার থালায় হলুদ-মরিচের বাটনা। বুঝলাম, আর্মি আসার খবর শুনে বাড়ি ছেড়ে পালাবার সময় ঐ বাড়িতে সকালের রান্নার আয়োজন চলছিল।

ততক্ষণে পুলসিরাতের পুল পাড়ি দিয়ে পাকসেনারা গানবোট থেকে নেমে গেছে। এলোপাতাড়ি ঝাঁক ঝাঁক গুলি ফাটিয়ে পাকসেনারা শুভাড্যার মানুষজনকে সে কথা জানিয়ে দিল। একটি প্রাণ হরণের জন্য একটি গুলিই যেখানে যথেষ্ট, সেখানে বেশ কিছুক্ষণ ধরে চলল স্বদেশজয়ী পাকবাহিনীর গুলি ফাটানোর মহোৎসব।

আমি দেখলাম রান্নাঘরের পাশেই একটি ছোট্ট মাচান। সেই মাচানটি প্রচুর লাকড়ি দিয়ে ঠাসা। আমি দ্রুত মাচানের লাকড়িগুলো দুহাতে সরিয়ে লাকড়ির মাঝখানে একটি দুর্ভেদ্য দুর্গ তৈরি করে তার ভিতরে প্রবেশ করলাম। দুর্গটি দেখতে অনেকটাই হলো চিতার মতো। চারপাশে লাকড়ির দেয়াল থাকায় আমার গুলিবিদ্ধ হয়ে মরার ভয় দূর হলো। কেননা, গুলি যে সরল রেখায় চলতে অভ্যস্ত, লাকড়ি দিয়ে তৈরি করা ব্যূহের ভিতরে সেই সরল রেখাটি পাওয়া দুষ্কর। পক্ষান্তরে হাওয়া অতি সামান্য ছিদ্রপথ দিয়েও চলতে পারে বলে সেই দুর্গের ভিতরে হাওয়ার কোনো অভাব ছিল না। তবে পাকসেনারা যদি গান পাউডার ছিটিয়ে দিয়ে বাড়িটিতে আগুন ধরিয়ে দেয়, তবে ভিন্ন কথা। সেক্ষেত্রে হিন্দুধর্মমতেই আমার শবদেহের সৎকার বা অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া নিশ্চিত হবে।

কাষ্ঠনির্মিত দুর্গের ভিতরে আমি আরাম করে হেলান দিয়ে বসলাম। আমার মনে হলো শেষ পর্যন্ত আমি আমার গন্তব্যে পৌঁছেছি। আমার আশ্রয়স্থলটি নির্ভরযোগ্য। এটি যদি আমার অন্তিম আশ্রয়ও হয়, হবে। আমার আপত্তি নেই। প্রাণ বাঁচানোর জন্য আমি আর কোনো নতুন উদ্যোগ গ্রহণ করব না। আমি যখন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মরতে রাজি হলাম, দেখলাম আমার বুকের ভিতর থেকে একটা বিশাল বোঝা নেমে গেছে। আমি খুব নির্ভার বোধ করলাম। বুঝলাম, ওটা ছিল জীবনের বোঝা।

দৈহিক ক্লান্তিহেতু কখন আমার দুচোখের পাতা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, বুঝতেও পারিনি। আমার চেতনা ফিরল বাড়িতে ফিরে আসা মানুষের কান্নার শব্দে। সে কী কান্না! মানুষের সমবেত-কান্না যে কী ভয়ংকর ভয়ার্ত শোনায়, তা আমি বুড়িগঙ্গা নদীর ওপারে, ১৯৭১ সালের ২ এপ্রিলের সকালে পূর্ব-শুভাড্ড্যায় শুনেছি। হিরোশিমার মানুষ শুনেছিল ১৯৪৫ সালে, ৬ নভেম্বর সকাল ৮টা ১৫ মিনিটে। সেদিন আমেরিকা পরমাণু বোমা ফেলেছিল জাপানের ঘুমন্ত হিরোশিমা নগরীতে। পঁচিশে মার্চের রাতে ঢাকায় আমি আক্রান্ত মানুষের ক্রন্দন এভাবে কাছে থেকে শুনিনি। সেই রাতে পাকসেনাদের গোলাগুলির আওয়াজের নিচে চাপা পড়ে গিয়েছিল মানুষের কান্না। শুভাড্ড্যায় মনে হলো গোলাগুলির আওয়াজকে ছাপিয়ে উঠেছে মানুষের আর্তচিৎকারের আওয়াজ।

ঐ বাড়ি ছেড়ে যারা পালিয়ে গিয়েছিল, তাদের সবাই তখনও ফিরে আসেনি। যারা ফিরে এসেছে তারা যারা ফিরে আসেনি তাদের জন্য কাঁদছে। কে কোথায় কোন ডোবার জলে মরে পড়ে আছে, কে জানে? ওদের মরণ-চিৎকার শুনে আমার ভারি লজ্জা হলো। ওদের অজ্ঞাতসারে বাড়ি থেকে পালিয়ে যেতে পারলেই ভাল হতো। ঘুমিয়ে না পড়লে হয়তো তাই করতাম। কিন্তু ঘুম বলে কথা। ঘুমের মানুষের সঙ্গে মৃত মানুষের পার্থক্য তো খুব বেশি নয়। ঘুম থেকে জাগা ও না জাগার ব্যাপার।

লজ্জার মাথা খেয়ে লাকড়ি নির্মিত দুর্গের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসার মুখে আমি পড়লাম ঐ বাড়ির গৃহকর্ত্রীর আর্তচিৎকারের মুখে। আমাকে কাঠের মাচান থেকে নামতে দেখে, ভয় পেয়ে 'ও মা গো' বলে ঐ মহিলা রান্নাঘর ছেড়ে এমনভাবে দৌড়ে বেরিয়ে গেলেন যে, মনে হলো আমি বুঝি কোনো দলছুট পাকসেনা। আরও অনিষ্ট করার জন্যই আমি ওদের রান্নাঘরে লুকিয়ে ছিলাম। আমি অপরাধীর মতো করজোড়ে উঠানে দাঁড়িয়ে বললাম, 'আমাকে মাফ করে দিন। আমি খুব বিপদে পড়ে পাকসেনাদের ভয়ে আপনাদের পাকঘরে আশ্রয় নিয়েছিলাম। আমি আপনাদের মতোই একজন খাঁটি বাঙালি এবং ধর্মে হিন্দু, বর্ণে কায়স্থ।' মর্মে মানবিক কথাটাও মনে এসেছিল কিন্তু সে কথা মুখ ফুটে আর বললাম না। জানি, বিপন্ন মানুষ রসিকতা জিনিসটাকে সর্বদা সহজে গ্রহণ করতে পারে না।

ঐ বাড়ির একটি মেয়ে, মনে হলো আমাকে বিশেষভাবে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে। মেয়েটি অষ্টাদশী। বেশ সুন্দরী। টানা ডাগর চোখ। পিঠের ওপর লম্বা কালো চুলের বিনুনি। আমাকে নিয়ে বাড়ির অন্যদের মধ্যে কিছুটা শংকাভাব থাকলেও, মেয়েটির চোখেমুখে সেরকম কিছু নেই। ওর চোখে-মুখে আনন্দের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছটা। কবি বলেই সেই আনন্দের দ্যুতিটা আমার চোখে পড়ল বেশি। সুন্দরের সামনে দাঁড়িয়ে লজ্জা পাওয়াটা আমার দীর্ঘদিনের অভ্যাস। বিষয়টা মৌলিক বলে, ঐরকমের দুর্দিনেও তার ব্যতিক্রম হলো না।

আমার দিকে তাকিয়ে মেয়েটি বলল, 'আচ্ছা আপনি কি কবি?' শুনে আমার তো ভয়ে-আনন্দে ভিড়মি খাওয়ার দশা। বললাম, 'হ্যাঁ'। মেয়েটি কেঁপে উঠল। ইতোমধ্যে বাড়ির কর্তাটিও ফিরে এসেছেন। মেয়েটি তাঁর বাবার সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলল, 'উনি কবি নির্মলেন্দু গুণ। আমার খুব প্রিয় কবি। উনি আমাদের পাকঘরের লাকড়ির ভিতরে লুকিয়ে ছিলেন।'

ভদ্রলোক আমাকে আপাদমস্তক ভাল করে দেখলেন। তারপর বললেন, 'হ্যাঁ আমি তো উনাকে দেখেছি। আপনি ঐ মসজিদের ভিতরে ছিলেন না?'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ ছিলাম, কিন্তু শেষ পর্যন্ত থাকিনি। চলে এসেছিলাম। ওখান থেকে ফিরে এসে আপনার বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলাম।'

প্রিয়জন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া মানুষের আর্তচিৎকার এমন করুণতা নিয়ে আমাদের আলাপের মধ্যে আছড়ে পড়ছিল যে, ইচ্ছে থাকলেও সেখানে বেশিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভব ছিল না এবং তা শোভনও নয়। এই ভেবে, আমি চলে যাবার জন্য পা বাড়াতেই, মেয়েটি বলল, 'আমার নাম শুভা।'

কানের ভিতর দিয়ে নামটি আমার মর্মে পৌঁছুলো।

'শুভা? ভারী সুন্দর নাম তো। আপনার নাম থেকেই বুঝি শুভাড্যার নামকরণ হয়েছে।'

মেয়েটির বাবা বললেন, 'হ্যাঁ, শুভাড্যার মেয়ে তো, তাই আমি ওর নাম রেখেছিলাম শুভা। শুভা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলায় অনার্স নিয়ে এবারই ভর্তি হয়েছে। রোকেয়া হলে ছিল। মার্চের মাঝামাঝি হলো ছেড়ে বাড়ি চলে এসেছিল। না এলে কী যে হতো।'

শংকিত পিতা কন্যার মাথায় তার আদুরে হাত বুলালেন। আমি পঁচিশে মার্চের সেই ভয়াবহ রাত্রির কথা স্মরণ করলাম। ভাবলাম, ঐরকমের কত শুভার যে বাড়ি ফেরা হয়নি, তার হিসাব কে রাখে?

শুভা বলল 'আপনি থাকেন। আমাদের বাড়িতে দুপুরের ভাত খেয়ে যাবেন।'

আমি হাসলাম। বললাম, 'আমার সঙ্গে দুজন বন্ধু আছে, তাদের খুঁজতে হবে। আমাকে বরং এক গ্লাস জল দিন। খুব তেষ্টা পেয়েছে। ভুলে গিয়েছিলাম।'

আমাকে কিছু একটা দিতে পারার সুযোগ পেয়ে শুভার মুখটা প্রসন্নতায় পূর্ণ হয়ে উঠল। এক দৌড়ে রান্নাঘর থেকে এক গ্লাস জল নিয়ে সে দ্রুত ফিরে এল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি জলপূর্ণ গ্লাসটি একটানে নিঃশেষ করে ঐ বাড়ির মাধ্যাকর্ষণ ছিন্ন করে দ্রুত পথে বেরিয়ে এলাম।

জানি না শুভা আমার গমনপথের দিকে তাকিয়ে ছিল কি না। হয়তো ছিল। হয়তো ছিল না। মনে হলো, চৈত্রের উত্তপ্ত দুপুরে হঠাৎ-হাওয়ার মতো ভেসে আসা ঐ মেয়েটি পাকসেনাদের কৃত অপরাধকে কিছুটা লঘু করে দিয়ে গেল। কিছুক্ষণের জন্য হলেও আমার মনে হলো, পাকসেনাবাহিনীর এইসব বর্বরতা সত্য নয়, ২৫ মার্চের 'অপারেশন সার্চ লাইট' সত্য নয়, ২ এপ্রিলের জিঞ্জিরা-শুভাড্যা-কালিন্দির জেনোসাইড সত্য নয়; ইয়াহিয়া-টিক্কা খান সত্য নয়, বঙ্গবন্ধুর গ্রেফতার হওয়ার সংবাদ সত্য নয়; সত্য শুধু শুভা।

৪

শেলীর মরদেহ বিলম্বে হলেও ইতালির সমুদ্র সৈকতে খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল। আমার কবিবন্ধু আবুল কাসেমের মরদেহ কেউ কোথাও কখনও খুঁজে পায়নি। আমার ধারণা, জগন্নাথ হলের খেলার মাঠের গণকবরে, বা ঐ হলের পুকুরের জলে তার শেষ-ঠাঁই হয়ে থাকবে। পাকসেনারা সেদিন যদি শুভাড্যার ঐ হিন্দুবাড়িটিতে আগুন ধরিয়ে দিত, তাহলে আমার মরদেহটিও কেউ কখনও খুঁজে পেত না। পুড়ে ছাই হয়ে যেত। কিন্তু হয়নি। অগ্নিতে যার আপত্তি নেই, মাটিতে তার ভয় কী? ঢাকা থেকে পালিয়ে বুড়িগঙ্গা নদীর ওপারে জিঞ্জিরা, শুভাড্যা ও কালিন্দিসহ কেরানীগঞ্জের বিভিন্ন গ্রামে আশ্রয়গ্রহণকারী আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ, নবগঠিত মুক্তিবাহিনীর সদস্য ও পাকসেনা হত্যাকারী খসরু-মন্টুর সন্ধানে জিঞ্জিরা, শুভাড্যা ও কালিন্দি ইউনিয়নের অনেক বাড়িঘরে আগুন ধরিয়ে দিলেও ঐ বাড়িটি সেদিন অজানা কারণে পাকসেনাদের চোখ এড়িয়ে গিয়েছিল। কেন গিয়েছিল,— সে এক রহস্য। আমি মাঝে মাঝে ভাবি, যে অদৃশ্যশক্তির ইঙ্গিতে রামায়ণ রচনা করার জন্য রত্নাকর-দস্যু মহাকবিতে পরিণত হয়েছিলেন, পাকসেনাদের বর্বরতার ইতিবৃত্ত রচনা করার জন্য সম্ভবত তিনিই সেদিন আমাকেও বাঁচিয়ে রেখেছিলেন। তা না হলে এমন ঘটনা ঘটে যাবার ছত্রিশ বছর পর 'জিঞ্জিরা জেনোসাইড' কে লিখত? ২৫ মার্চের ঢাকার গণহত্যা নিয়ে অনেক লেখা হয়েছে। অনেকে লিখেছেন। আমাদের লেখক ও সাংবাদিকদের পাশাপাশি অনেক বিদেশী সাংবাদিকও লিখেছেন। কিন্তু বুড়িগঙ্গা নদীর ওপারে সংঘটিত ২ এপ্রিলের জিঞ্জিরা জেনোসাইড সম্পর্কে তেমন উল্লেখযোগ্য কিছুই লেখা হয়নি। তবে কি ঐ ঘটনাটি আমার লেখায় বর্ণিত হওয়ার জন্যই এতকাল ধরে অহল্যার মতো অপেক্ষায় পাথর হয়ে ছিল? তাই তো মনে হচ্ছে। চলমান রচনাটি লিখতে গিয়ে আমিও আমার বেঁচে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থাকার একটা বিশেষ অর্থ খুঁজে পাচ্ছি। মনে হচ্ছে, আমার এই বেঁচে থাকাটা শুধুই অকারণ পুলকে বাঁচা নয়। এর পেছনে কারণের জোরও রয়েছে।

আগেই স্বীকার করেছি, লাকড়ি দিয়ে তৈরি করা চিতার ভিতর থেকে প্রাণ নিয়ে ফিরে আসার আনন্দের সঙ্গে শুভা-দর্শনের আনন্দ যুক্ত হওয়ার পর আমি একটি পরাবাস্তব কল্পজগতের ঘোরের মধ্যে হারিয়ে গিয়েছিলাম। মনে হয়েছিল সাত ঘণ্টাস্থায়ী সামরিক অভিযানে স্বদেশজয়ী বীর পাকসেনাদের হাতে অগুনতি নারী-পুরুষ ও শিশু-বৃদ্ধের অপঘাতমৃত্যু হলেও শুভাড্যায় আমার পুনর্জন্ম সাধিত হয়েছে। আমি মরতে মরতে অলৌকিকভাবে বেঁচে গেছি। জগন্নাথ হলের গণকবর থেকে বেঁচে যাওয়া কালীকৃষ্ণ শীলের মতো আমার বাঁচাটা অতটা অলৌকিক হয়তো নয়, তবু কিছুটা অলৌকিক তো বটেই। তার মূল্যকেই বা খাটো করে দেখব কেন?

আমার বাবার কথা খুব মনে পড়ল। বাড়ি থেকে ঢাকার উদ্দেশে রওয়ানা হওয়ার আগে আমি যখন তাঁকে প্রণাম করতাম, তিনি আমার মাথায় হাত রেখে বলতেন— 'কৃষ্ণ কৃপাহি কেবলম'। পাছে সংস্কৃত ভাষায় বলা শ্লোকটি তাঁর বাঙালি ভগবান ঠিক বুঝতে না পারেন, তাই প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বাংলায়ও বলতেন, 'তোর ওপর শ্রীকৃষ্ণের কৃপা হোক। তিনিই তোকে রক্ষা করবেন।'

আমি নিজের অস্তিত্বে যতটা বিশ্বাসী, ঈশ্বরের অস্তিত্বে ঠিক ততটা বিশ্বাসী না হলেও আমার মনে হলো, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আমার কৃষ্ণ-ভক্ত পিতার প্রার্থনা মঞ্জুর করেছেন। তা না হলে ২৫ মার্চের পর ২ এপ্রিলেও আমার পক্ষে বাঁচা সম্ভব হতো না। পাকসেনাদের ছোড়া গুলি বা শেলের আঘাতে অন্য অনেকের মতো আমার মাথাটিও যে কোনো মুহূর্তেই উড়ে যেতে পারত। আমি পরম আদরে আমার মাথার চুলে হাত বুলিয়ে মাথাটির অস্তিত্ব নতুন করে পরখ করলাম। না, আমার মাথাটি যথাস্থানেই আছে। আমি তাহলে সত্যিই বেঁচে আছি। আহা, কী চমৎকার এই বেঁচে থাকা। শত দুঃখের ভিতরেও কী আনন্দময়, কী দুর্লভ এই মনুষ্য জীবন।

মনে মনে স্থির করলাম, শুভাড্যায় আর নয়। আজই ঢাকায় ফিরে যাব। কিন্তু ঢাকায় থাকব না। আজিমপুরের নিউ পল্টনে আমার মেসের পাশে আমার অনেক বন্ধুর বাড়ি আছে, তাদের কারও বাড়িতে রাত কাটিয়ে, যদি প্রাণে বাঁচি তো কাল সকালের দিকে আমার গ্রামের বাড়ির উদ্দেশে রওয়ানা দিব। নজরুল হয়তো ওর গ্রামের বাড়ি কুমিল্লায় যাবে। ওর এক প্রেমিকা আছে নারায়ণগঞ্জে। কুমিল্লা যাবার পথে হয়তো তার সাথে দেখা করে যেতে পারে। আমার মতোই হেলাল হাফিজের বাড়িও নেত্রকোনায়। সে যদি আমার সঙ্গে যায় তো ভাল, দুঃসময়ে পথের বিশ্বস্ত সঙ্গী পাওয়া যাবে। না হলে আমি একাই চলে যাব। হেলালের বড় ভাই দুলাল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাফিজ সরকারি আমলা। হেলাল হয়তো ওর বড় ভাইয়ের বাসায় থেকে যেতেও পারে। দেখা যাক।

মানুষ ভাবে এক, হয় আর এক। এ কথা জানার পরও, পরবর্তী করণীয় নিয়ে আপন মনে ভাবতে ভাবতে আমি আমার আস্তানার দিকে পা বাড়ালাম।

সকালে মসজিদে যাবার পথে যে লোকটির মস্তক তার দেহ থেকে ছিন্ন হয়ে পাশের ডোবায় ছিটকে পড়তে দেখেছিলাম, ফেরার পথে দেখলাম, বেশ কিছু কৌতূহলী মানুষ ঐ মস্তকহীন মানবদেহটিকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। মস্তক ছিল না বলে তখনও পর্যন্ত ঐ মানবদেহটিকে কেউ শনাক্ত করতে পারেনি। ফলে ঐ দেহটিকে ঘিরে জড়ো হওয়া মানুষজনের ভিড় থেকে কোনো ক্রন্দনধ্বনি ভেসে আসছিল না। আমি ঐ ভিড়ের জটলার মধ্যে প্রবেশ না করে মরদেহটিকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেলাম আমার অস্থায়ী বাসস্থানের দিকে। মনে হলো ঐরকমের একটি নির্মম দৃশ্য আমার মতো দুর্বলচিত্তের মানুষের পক্ষে প্রত্যক্ষ করা উচিত নয়।

ছোটবেলায় আমাদের বাড়িতে যখন মাঝে মাঝে পাঁঠাবলি হতো, সেই দৃশ্য কখনও নিজ-চোখে আমি প্রত্যক্ষ করতে পারতাম না। পাঁঠাবলির সময় আমি আমাদের বাড়ির পেছনের গভীর জঙ্গলে ঢুকে লুকিয়ে বসে থাকতাম। আঙুল দিয়ে দুই কান বন্ধ করে রাখতাম, যাতে ঐ অসহায়-প্রাণীর অন্তিম চিৎকারটি আমার কর্ণকুহরে প্রবেশ করতে না পারে। একবার আমাদের বারহাট্টায় একটি দুর্গাপূজায় মহিষ বলি দেওয়া হয়েছিল। এলাকার বহু পুণ্যার্থী সেই মহিষবলির দৃশ্য দেখতে পুজোমণ্ডপে ভিড় করে, কিন্তু আমি যাইনি।

মান্য করে চলতে না পারলেও ভগবান বুদ্ধের 'প্রাণীহত্যা মহাপাপ' কথাটা আমি সত্য বলে মানি। পাকসেনাদের কল্যাণে সেই আমাকেই কিনা একটি নরবলির দৃশ্য প্রত্যক্ষ করতে হলো। একাত্তরের পাকসেনাদের চেয়ে পাপী পৃথিবীতে আর একটি সেনাবাহিনীই আছে, হিটলার-বাহিনী নয়, সেটি হচ্ছে আমেরিকান সেনাবাহিনী। ইহকালের বিচার এড়িয়ে গেলেও পরকালের বিচারে এই পাপীরা এড়াতে পারবে না। পরকাল বলে কিছু আছে কি না জানি না; আমি চাই থাকুক। এইসব যুদ্ধাপরাধীর বিচার করবার জন্য পরকাল থাকুক।

আমাদের অস্থায়ী বাসস্থানটির কাছে পৌঁছে দেখি, দোকানঘরটির সামনে বেশ কিছু মানুষ ভিড় করে আছে। পাকসেনারা গানবোটে উঠে শুভাড্যা ত্যাগ করেছে– এই খবরটি পেয়ে মসজিদ থেকে বেরিয়ে হেলাল আর নজরুল আমার আগেই দোকানঘরে পৌঁছে গিয়েছিল। আমার জন্য পথের দিকে তাকিয়ে ছিল বলে দূর থেকেই ওরা আমাকে দেখতে পেল। ওরা দুজনই ভিড়ের ভিতর থেকে আমার দিকে ছুটে এল। আমরা পরস্পরকে আমাদের বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলাম। আমি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভয় পাচ্ছিলাম ওদের দুজনকে নিয়ে, আর ওরা ভয় পাচ্ছিল আমাকে নিয়ে।

ওখানে কিসের ভিড়? প্রশ্ন করে জানার আগেই ওরা জানাল, জানিস, বুকে গুলি লেগে রফিক ছেলেটি মারা গেছে। ওর মৃতদেহ ঘিরেই দোকানঘরের সামনের এই জটলা। রফিক? রফিকের নাম শুনে আমার মাথাটা ঘুরে গেল। মাথায় হাত দিয়ে আমি পথের উপর বসে পড়লাম। হা ভগবান। কিছুক্ষণ বসে থাকার পর আমি উঠলাম। হেলাল আর নজরুলের কাঁধে ভর দিয়ে এগিয়ে গেলাম ঐ ভিড়ের দিকে। ভিড় ঠেলে ভিতরে ঢুকে দেখি, বৃত্তের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ভিড়ের ঠিক মাঝখানটায় রক্তাক্ত দেহ নিয়ে রফিক শুয়ে আছে। মনে হলো প্রাণ ভরে ঘুমাচ্ছে। ওর নিস্প্রাণ দেহটিকে ঘিরে মাতম করছে তার আপনজনেরা। রক্তে ভেজা বুকের দিকে চেয়ে বুঝলাম, ওর বুকের মাঝখান দিয়ে গুলি ঢুকে পিঠ দিয়ে বেরিয়ে গেছে। মাটিতে শায়িত রফিকের নিথর নিস্প্রাণ দেহটিকে দেখে নিজেকে খুব অপরাধী মনে হলো। ভোরে আর্মি আসার সংবাদ জানিয়ে আমাদের সে ঘুম থেকে ডেকে তুলেছিল। বলেছিল, তাড়াতাড়ি পালান। সেই আমরা ঠিকই বেঁচে গেলাম, আর পাকসেনাদের গুলিতে প্রাণ দিল রফিক?

রফিক যদি সেই সকালে আমাদের ঘুম থেকে ডেকে না তুলত? তবে তো আমরা ঘুমিয়েই থাকতাম। আমরা ঘুমের মধ্যে নিশ্চিত মারা পড়তাম পাকসেনাদের হাতে। রফিকের বাবা আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে কাঁদলেন। বললেন, আপনারা দোকান ছেড়ে চলে যাবার পর রফিক দোকানে গিয়ে বসেছিল। ভেবেছিল, দোকানে বহিরাগত কেউ না থাকলে পাকসেনারা তাকে কিছু বলবে না। কিন্তু ওরা যখন শিলাবৃষ্টির মতো গুলি ছুড়তে ছুড়তে দোকানের দিকে এগিয়ে আসছিল, তখন রফিক ভয় পেয়ে দোকানের আলমারির পেছনে লুকিয়ে পড়ে। পাকসেনারা—'মুক্তি কাঁহা? মন্টু-খসরু কিধার হায়', বলতে বলতে দোকানের সামনে পজিশন নিয়ে দোকানের ভিতরে এলপাতাড়ি গুলি ছুড়তে থাকে। ঐসব ঝাঁক ঝাঁক গুলির দুটো গুলি আলমিরার পাতলা কাঠ ফুঁড়ে আলমিরার পেছনে লুকানো রফিকের বক্ষ ভেদ করে চলে যায়।

AMARBOI.COM

আমার দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'না প্রেমিক না বিপ্লবী'র অন্তর্গত 'শহীদ' কবিতাটিতে রফিকের ছায়া রয়েছে। যতদূর মনে পড়ে কবিতাটি আমি পরবর্তীকালে কলকাতায় বসে লিখেছিলাম। মনে হয়, আমার অবচেতনে থেকে ঐ ছেলেটিই আমাকে দিয়ে ঐ কবিতাটি লিখিয়ে নিয়েছিল।

শহীদ

তুমি এখন শুয়ে আছো, মুষ্টিবদ্ধ দু'হাতে ঘুম।
পথের মধ্যে উবু হয়ে তুমি এখন স্বপ্নরত,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মধ্যরাতে আকাশভরা তারার মেলায় স্বপ্নবিভোর,
বুকে তোমার এফোঁড়-ওফোঁড় অনেক ছিদ্র,
স্বাধীনতার অনেক আলোর আসা-যাওয়া।

তুমি এখন শুয়ে আছো ঘাসের মধ্যে টকটকে ফুল।
পৃথিবীকে বালিশ ভেবে বাংলাদেশের সবটা মাটি
আঁকড়ে আছো, তোমার বিশাল বুকের নিচে এতটুকু
কাঁপছে না আর, এক বছরের শিশুর মতো থমকে আছে।
তোমার বুকে দুটো সূর্য, চোখের মধ্যে অনেক নদী,
চুলের মধ্যে আগুনরঙা সাতসকালের হুহু বাতাস,
মাটির মধ্যে মাথা রেখে তুমি এখন শুয়ে আছো
তোমাকে আর শহীদ ছাড়া অন্য কিছু ভাবাই যায় না।

(শহীদ : না প্রেমিক না বিপ্লবী)

গত ক'দিনে এই রফিক ছেলেটি আমাদের কী প্রিয়ই না হয়ে উঠেছিল। আমার কবিতার বইটি আমার কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে পড়েছিল। বলেছিল, আমার কবিতাগুলো তার খুব ভাল লেগেছে। দেখলাম কিছু কিছু কবিতার লাইন তার মুখস্থও হয়ে গেছে। ছেলেটির সঙ্গে কথা বলে আমার মনে হয়েছিল ছেলেটি কবিতা বোঝে। ভাল কবিতা শনাক্ত করতে পারে। দুপুরে ক্যারাম খেলার ফাঁকে আমি একবার ওকে বলেছিলাম, কী ব্যাপার, তুমিও কবিতা লিখবে নাকি? লজ্জা পেয়ে লাল হয়ে গিয়েছিল রফিকের মুখ। বলেছিল, ইচ্ছে তো আছে। আপনি দোয়া করবেন আমাকে। আমার কবিতার বইটির নাম নিয়ে ওর মনে প্রশ্ন ছিল। আমার কাছে জানতে চেয়েছিল, প্রেমাংশুর রক্ত চাই কথাটার মানে কী? আমি হাসতে হাসতে বলেছিলাম, আমাদের দেশকে স্বাধীন করার জন্য আমাদের অনেক প্রিয়জনকেই তাদের বুকের রক্ত দিতে হবে। বঙ্গবন্ধু তাঁর ৭ মার্চের ভাষণে তো সে কথাটাই বলেছেন, ...'রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরও দিব, এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব ইনশাল্লাহ।' কথাটার অর্থ বুঝতে পারনি?

তখন মাথা দুলিয়ে রফিক বলেছিল, 'ও তাই, এবার বুঝতে পারলাম। আপনার কবিতার বইটির নাম খুব সুন্দর হয়েছে তো। প্রেমাংশুর রক্ত চাই কথাটার মানে তাহলে প্রেমাংশুর জন্য রক্ত চাই? কথাটা এখানে উহ্য রেখেছেন? আর ঐ প্রেমাংশু হলো আমাদের দেশ। আমাদের মাতৃভূমি। —তাই না?'

আমি খুব খুশি হয়েছিলাম কবিতা নিয়ে ওর সত্যিকারের আগ্রহ রয়েছে দেখে। সেই রফিক নিজেই প্রেমাংশু হয়ে এখন আমাদের সবার চোখের সামনে শুয়ে আছে। শুভাড্যার মাটি ভিজে যাচ্ছে ওর কিশোর বুকের টকটকে লাল তাজা রক্তে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওর নিমীলিত অক্ষিযুগলে খেলা করছে চৈত্র-দুপুরের রৌদ্র।

রফিক, তোমার মৃত্যুর ছত্রিশ বছর পর, আমি আজ তোমার মৃত্যুকথা লিখতে বসেছি। ১৯৭১ সালের ২ এপ্রিল ভোর পাঁচটায় আমাদের ঘুম থেকে তুলে দিয়ে পাকসেনাদের আক্রমণের হাত থেকে তুমি আমাদের জীবন বাঁচিয়েছিলে, কিন্তু তোমাকে আমরা বাঁচাতে পারিনি। তুমি আমাদের ক্ষমা কর ভাই।

২৫ মার্চের রাতে বঙ্গবন্ধুর সর্বশেষ সাক্ষাৎপ্রার্থী ছিল ছাত্রনেতা নূরে আলম সিদ্দিকী, আবদুল কদ্দুস মাখন, কাজী ফিরোজ রশিদ ও অভিনেতা এসএম মহসীন। তাঁরা রাত দশটার কিছু পর বত্রিশ নম্বরে যান। তাঁরা যখন গেট দিয়ে বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে প্রবেশ করেন, তখন বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন ক্যাপ্টেন মনসুর আলী। তাকে খুব বিমর্ষ দেখা যায়। 'খবর কী স্যার?' ছাত্রনেতাদের প্রশ্ন শুনে ক্যাপ্টেন মনসুর আলী কিছুটা ক্ষিপ্ত হয়ে বলেন, 'খবর আমি কী জানি? আমাকে জিজ্ঞেস করছ কেন, নেতাকে জিজ্ঞেস কর।' বলে তিনি হন হন করে বেরিয়ে যান। বঙ্গবন্ধু তখন বাড়ির সামনের লনের সবুজ ঘাসের উপর খালি পায়ে পায়চারি করছিলেন। বঙ্গবন্ধু নূরে আলম সিদ্দিকী ও মাখনকে নিয়ে ঘরের ভিতরে চলে যান। তাদের সঙ্গে তাঁর কিছু গোপন কথা হয়। তারপর তিনি তাদের নিয়ে ফিরে আসেন বাইরে। সবাইকে উদ্দেশ্য করে বলেন, '২৭ তারিখ দেশব্যাপী হরতাল। তবে এর আগে যদি কিছু হয়ে যায় তো আমি তোদের যেভাবে যা-যা করতে বলেছি, তাই করবি। যা চলে যা।' তারপর তিনি হঠাৎ ফিরোজকে কাছে ডেকে তার কাঁধে হাত রেখে বলেন, 'শোন ঝন্টু (কাজী ফিরোজ রশিদের ডাক নাম) আমি আইজিপিকে বলেছি। তারপরও মন্টু (ফিরোজ রশিদের ভাই) যদি মুক্তি না পায়, তো আমাকে মাফ করে দিস।'

উদগত ক্রন্দনভারে বঙ্গবন্ধুর বজ্রকণ্ঠ বড় করুণ সুরে বাজে। সামান্য একজন শিষ্যের কাছে এভাবে মাফ চাইছেন বঙ্গবন্ধু? কেন চাইছেন? কেন চাইলেন? তবে কি বঙ্গবন্ধু ভেবেছিলেন, তাঁর ভক্ত অনুসারীদের কাছে মাফ চাওয়ার সুযোগ তিনি আর নাও পেতে পারেন? বঙ্গবন্ধু দ্রুত বাড়ির ভিতরে চলে যান। ছাত্রনেতারা বঙ্গবন্ধুর বাড়ি ছেড়ে পথে বেরিয়ে আসে। তখন রাত সাড়ে দশটার মতো হবে। পথে বেরিয়েই তারা দেখতে পান, বেশ কিছু পাক-আর্মির গাড়ি বঙ্গবন্ধুর বাড়ির দিকে অগ্রসর হচ্ছে। (তথ্য : এসএম মহসীন)

বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যাবার জন্য তাঁর ঘনিষ্ঠজনেরা বঙ্গবন্ধুকে পরামর্শ দিয়েছিলেন, তার হাত-পা জড়িয়ে ধরে নেতাদের কেউ কেউ কান্নাকাটিও করেছিলেন বলে শুনেছি। বঙ্গবন্ধু সেদিন কারও পরামর্শ গ্রহণ করেননি। তিনি কারও কথা শুনতে রাজি ছিলেন না। তিনি ছিলেন তাঁর সিদ্ধান্তে অনড়-অটল-অবিচল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বঙ্গবন্ধুর কথা ছিল, পাকসেনারা যদি আমাকে আমার বাড়িতে না পায়, ওরা যদি আমাকে গ্রেফতার করতে ব্যর্থ হয়, তো ওরা উন্মত্ত হায়েনার মতো এই নগরবাসীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে–, ঘরে ঘরে ঢুকে তারা আমার সন্ধান করবে, আর আমাকে না পেয়ে নির্বিচারে বাঙালিদের হত্যা করবে। আমি তা হতে দিতে পারি না।

'আমাকে মাফ করে দিস'– বঙ্গবন্ধু এই অসহায় আর্ত-উচ্চারণের মধ্যে তাঁর গ্রেফতার বরণ করার সিদ্ধান্তটির সম্ভাব্য পরিণতি সম্পর্কে তাঁর মানসিক প্রস্তুতির পরিচয় যেমন পাওয়া যায়, তেমনি অনুসারীদের জন্য তাঁর বুকভরা ভালোবাসা ও দায়িত্ববোধেরও পরিচয় মেলে। ভাবতে আশ্চর্য লাগে, ২৫ মার্চের রাত দশটার সময়ও তিনি ভুলতে পারেননি যে, কাজী মন্টু নামে তাঁর একজন কর্মী জেলে আটক আছে। তিনি তাঁর মুক্তির জন্য আইজিকে অনুরোধও করেছেন; কিন্তু হঠাৎ তাঁর মনে আশংকা জাগল যে, তাঁর সেই অনুরোধ রক্ষিত নাও হতে পারে। কেননা তিনি বুঝতে পারছিলেন, এই রাত্রির অবসানে কাল একটি ভিন্ন সকাল আসবে। তাঁর নির্দেশে এই দেশ হয়তো আর চলবে না। পূর্ব পাকিস্তানের অঘোষিত শাসক হিসেবে যেভাবে দেশটি তাঁর নির্দেশে চলছিল, কাল থেকে হয়তো বা তার ব্যত্যয় ঘটতে পারে।

বঙ্গবন্ধুর গ্রেফতার বরণের সিদ্ধান্তের সঙ্গে যারা একমত হতে পারেননি, তারা যখন দেখল যে, পাকসেনাদের হাতে গ্রেফতার বরণ করেও ২৫ মার্চের নির্বিচার গণহত্যা তিনি ঠেকাতে পারেননি, তখন তারা বঙ্গবন্ধুর সিদ্ধান্তের সারবত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন। শুরুতে বঙ্গবন্ধুর ঐরূপ নীলকণ্ঠ-সিদ্ধান্তের ব্যাপারে আমার মনেও কিছুটা সংশয় দেখা দিয়েছিল। কিন্তু ২ এপ্রিলের 'জিঞ্জিরা জেনোসাইড'টি ভিতর থেকে প্রত্যক্ষ করার পর আমার ধারণা পাল্টে যায়। মন্টু-খসরুর মতো সামান্য আর্মড-ক্যাডারদের গ্রেফতার করতে না পারার ক্ষোভে পাকসেনারা সেদিন কেরানীগঞ্জ থানার জিঞ্জিরা, কালিন্দি বা শুভাড্যা– এই তিন ইউনিয়নের বাড়ি বাড়ি অনুসন্ধান চালিয়ে যেভাবে নির্বিচারে নিরীহ-নিরস্ত্র মানুষজনকে হত্যা করেছে, তাতে আমি এই বিশ্বাসে উপনীত হয়েছি যে, ২৫ মার্চে মিলিটারি অপারেশনের শুরুতেই যদি ওরা বঙ্গবন্ধুকে (তাদের ভাষায় দি বিগ ফিস) তাঁর বাড়ি থেকে গ্রেফতার করতে না পারত, তাহলে তাদের অক্ষম রোষের আগুনে ঢাকা নগরীর আরও অনেক বেশি সংখ্যক মানুষকে সেদিন প্রাণ দিতে হতো। নিজে গ্রেফতার বরণ করে বঙ্গবন্ধু যে সেদিন আমাদের অনেকের প্রাণ বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন, সপ্তাহান্তে পাকবাহিনী পরিচালিত সামরিক অভিযানের লক্ষ্য ও চরিত্র পর্যালোচনা করলে তার সত্যতাই অনুভূত হয়।

সেদিন না জেনে, না বুঝে যারা নিজেদের নাম মন্টু বা খসরু বলে পরিচয় দিয়েছিল, তারা কেউই পাকসেনাদের হাত থেকে রেহাই পায়নি। মোস্তফা মহসীন মন্টু জানিয়েছেন, তার একজন ঘনিষ্ঠ আত্মীয়, তিনি পেশায় ডাক্তার ছিলেন, তাঁরও নাম ছিল'মন্টু। পাকসেনারা জিঞ্জিরায় নেমে তাঁর বাড়িতে প্রবেশ করে এবং তাঁর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরিচয় জানতে চায়। জানতে চায় সে হিন্দু না মুসলমান। তিনি বলেন, আমি মুসলমান। যখন নামের প্রশ্ন আসে, তখন ঐ ভদ্রলোক ভাবতেও পারেননি যে মন্টু নামটি পাকসেনাদের কাছে এত ঘৃণিত ও তাঁর জন্য এতটাই বিপজ্জনক হতে পারে। আওয়ামী নেতাদের ভারতমুখী একজিট রুট হিসেবে ব্যবহৃত এই পথটি ব্লক করা, রাজধানী খালি করে বুড়িগঙ্গা নদীর এপারে আশ্রয়গ্রহণকারী নগরবাসীদের ওপর সামরিক চাপ সৃষ্টি করে তাদের ঢাকায় ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া ছাড়াও পাকসেনাদের আরও উদ্দেশ্য থাকতে পারে তা তিনি ভাবতেও পারেননি। তিনি ভাবতেও পারেননি যে, পাকসেনারা খসরু-মন্টুর মতো কিছু সংখ্যক সশস্ত্র ক্যাডারকে ধরার জন্য এ রকম একটি বিরাট সামরিক অভিযানে নামতে পারে। তাই তিনি স্বচ্ছন্দে, খুব স্পষ্ট উচ্চারণেই তার নিজের নাম বললেন, বললেন— 'আমার নাম মন্টু ডাক্তার।'

'মন্টু? তুম মন্টু হ্যায়?'

মুহূর্তমাত্র চিন্তা না করেই পাকসেনারা গুলি করে মন্টু ডাক্তারকে হত্যা করে। শোনা যায়, বেশ কিছু মন্টু সেদিন পাকসেনাদের অসহায় শিকারে পরিণত হয়েছিল। খসরু-মন্টু যে পাকসেনাদের কাছে এতটাই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল, তা খুব কম সংখ্যক মানুষই তখন জানতেন। নব্বই ভাগ মানুষই জানতেন না। ফলে না জেনে, না বুঝে তারা সেদিন জীবনের শেষ ভুলটি করে বসেছিলেন।

প্রশ্ন উঠতে পারে, পাকসেনারা কি জানত না যে এরা আসল মন্টু বা আসল খসরু নয়? আসল হলে নিশ্চয়ই তারা তাদের নিজ নাম-পরিচয় গোপন করত। পাকসেনারা এত আহাম্মক ছিল না যে, তারা তা জানত না, বা বুঝত না। ওরা সিদ্ধান্ত নিয়েই রেখেছিল যে, ঐ নামের কাউকেই তারা রেহাই দেবে না। পারলে পুরো দেশটাকেই তারা মন্টু ও খসরুশূন্য করে দিত।

তো, খসরু-মন্টুকে না পাওয়ার রোষেই যদি পাকসেনারা সেদিন এত নিরপরাধ মানুষের প্রাণনাশ করে থাকতে পারে, তাহলে ২৫ মার্চের রাতে পূর্ব-পাকিস্তানের কবর রচনা করে সেই কবরের ওপর বাংলাদেশের স্বপ্নবীজ বপনকারী বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করতে ব্যর্থ হলে ক্রোধোন্মত্ত পাকসেনারা সেদিন রাতে ঢাকা নগরীর আরও কত বাড়িতে ঢুকত, আরও কত মানুষের প্রাণ হরণ করত, তা হয়তো আমরা আজ কল্পনাও করতে পারি না। কিন্তু অন্যরা না পারলেও আমি পারি, ২ এপ্রিলের জিঞ্জিরা অপারেশনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার আলোকে আমি কিছুটা অনুমান করতে পারি। তাই শুরুতে সন্দেহ থাকলেও, পাকসেনাদের জিঞ্জিরা অভিযানের উদ্দেশ্য ও ভয়াবহতা নিজ চোখে প্রত্যক্ষ করার পর আমি বঙ্গবন্ধুর দূরদর্শী সিদ্ধান্তের প্রশংসা না করে পারিনি। নিজের জীবনের ওপর ঝুঁকি নিয়েই তিনি সেদিন অনেক জীবন বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন। অপারেশন সার্চ লাইটের দায়িত্বে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিয়োজিত পাকসেনারা নিশ্চয়ই আমার এই বক্তব্যকে সমর্থন করবেন।

২ এপ্রিল পাকবাহিনীর সামরিক অভিযান থেকে মন্টু-খসরুরা সেদিন কীভাবে আত্মরক্ষা করেছিলেন, আমি মোস্তফা মহসীন মন্টুর কাছে সে বিষয়ে জানতে চেয়েছিলাম। তিনি জানান, নদীপথে পাকসেনাদের গতিবিধি লক্ষ্য রাখার জন্য তারা কিছু লোকজনকে নিয়োজিত রেখেছিল। কিন্তু দীর্ঘ নদীপথ পাহারা দেবার ক্ষমতা তাদের ছিল না। ফলে তাদের চোখে ধুলো দিয়ে পাকসেনারা গভীর রাতের দিকে জিঞ্জিরায় অবতরণ করে। কালিন্দি ইউনিয়নের নেকরোজবাগ গ্রামে অবস্থানকারী মন্টু-খসরুরা পাকসেনাদের অবতরণের সংবাদটি সঙ্গে সঙ্গে না পেলেও অপারেশন শুরু হওয়ার কিছু আগে পেয়ে গিয়েছিলেন। তখন অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তারা পটকাজোর-নেকরোজবাগ খালপথ দিয়ে নৌকা বেয়ে ৬ কিলোমিটার দক্ষিণে ধলেশ্বরী তীরসংলগ্ন আবদুল্লাহপুরে চলে গিয়েছিলেন। পাকসেনারা সেদিন মন্টু-খসরুসহ সদ্যগঠিত মুক্তিবাহিনীর সশস্ত্র সদস্যদের খোঁজে আবদুল্লাহপুর পর্যন্ত যেতে পারেনি।

সন্ধ্যার দিকে তারা আবদুল্লাপুর থেকে নেকরোজবাগে ফিরে আসেন এবং পথ-ঘাটে, ক্ষেতে ও ডোবায় পড়ে থাকা বহু মানুষের লাশ গণকবরে দাফন করার ব্যবস্থা করেন। পরবর্তী কয়েকদিন ধরে চলেছিল ঐ লাশ দাফনের কাজ। আনুমানিক কত লোক সেদিন মারা গিয়েছিল? এই প্রশ্নের উত্তরে মন্টু বলেন, সংখ্যাটা সঠিকভাবে বলা কঠিন। আমরা কালিন্দি, জিঞ্জিরা ও শুভাড্যা ইউনিয়নের লোকজনদের মধ্যে তদন্ত করে মৃতদের একটা তালিকা তৈরি করেছিলাম। তালিকাটি সম্পূর্ণ হয়নি। তবে ঐ সংখ্যাটা ছিল প্রায় শ পাঁচেকের মতো। কিন্তু পাকসেনাদের হাতে নিহতের প্রকৃত সংখ্যা ছিল তার চেয়ে অনেক বেশি। আসলে ২৫ মার্চের পর ঢাকা থেকে পালিয়ে যে প্রায় লাখখানেক লোক এপারের বুড়িগঙ্গা নদীতীরবর্তী গ্রামগুলোতে এসে আশ্রয় নিয়েছিল, পাকবাহিনীর আচমকা আক্রমণে তারাই সেদিন মারা পড়েছিল বেশি। স্থানীয় লোকজন তো জানত কোথায় লুকাতে হবে। কীভাবে লুকাতে হবে। কিন্তু ঢাকা থেকে আসা মানুষজন এলাকার কিছুই চিনত না। জানত না। তাই আচমকা আক্রমণের মুখে তারা সেদিন পাকসেনাদের অগম্য বিবরে নিজেদের লুকাতে পারেনি। দিশেহারা হয়ে তারা ছুটছিল খোলা মাঠ ও সড়কপথ ধরে। তারাই সেদিন পাকসেনাদের সহজ শিকারে পরিণত হয়েছিল। অনেকের সঙ্গে কথা বলে আমার নিজের ধারণা হয়েছে, ঐদিনের সাত ঘণ্টা স্থায়ী মিলিটারি অপারেশনে তিনটি ইউনিয়নের মোট মৃতের সংখ্যা হাজার ছড়িয়ে যাবে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের দলিলের অষ্টম খণ্ডে (৩৭৬-৭৮ পৃ:) পাক-বাহিনীর জিঞ্জিরা আক্রমণের দুটি অন্তর্ভুক্তি রয়েছে। একটি বাংলায়, একটি ইংরেজিতে। বাংলা অন্তর্ভুক্তিটি গৃহীত হয়েছে ৩ এপ্রিল ১৯৭২ সালের দৈনিক বাংলা পত্রিকা থেকে। রচনার নাম— 'জিঞ্জিরায় নারকীয় তাণ্ডব', লেখক মোঃ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাইফুল ইসলাম। ইংরেজি রচনাটি (The Jinjira Massacare And After/ Experiences of an Exile At Home, Dec 1972) লিখেছেন জনাব মফিজুল্লাহ কবীর। আমি বাংলা রচনাটি থেকে কিছু চুম্বক অংশ উদ্ধৃত করছি।

> '২ এপ্রিলের আগের রাতে কেরানীগঞ্জের অনেক স্থানে শোনা গেল এক চাপা কণ্ঠস্বর– মিলিটারি আসতে পারে। ... অবশেষে ভোর হলো। কেরানীগঞ্জবাসী তখন ঘুমে অচেতন। সহসা শোনা গেল কামান আর মর্টারের শব্দ। অনেকে লাফিয়ে উঠল ঘুম থেকে। যে যেখানে পারল ছোটাছুটি করতে লাগল। শুরু হলো নৃশংস হত্যাযজ্ঞ। চারদিকে কেবল চিৎকার, শুধু প্রাণ বাঁচানোর আকুল প্রচেষ্টা। পশুরা রাত্রিভর প্রস্তুতি নিয়েছিল। কেরানীগঞ্জ ঘিরে ফেলেছিল। ক্ষেতের মধ্যে নালা কেটে তারা যখন প্রস্তুতি নেয় কেরানীগঞ্জবাসী তখন ঘুমে অচেতন। ঝোপঝাড়, পুকুর, ঘরের ছাদ যে যেখানে পারল আত্মগোপন করল। কিন্তু খুনী টিক্কার কুখ্যাত ব্রিগেডিয়ার রশীদ রেহাই দেয়নি কাউকে। গ্রামের পর গ্রাম তারা জ্বালিয়ে দিল। সমানে চলল জিঞ্জিরা, শুভাড্যা ও কালিন্দি ইউনিয়নের লোকদের ওপর গুলি, অগ্নিসংযোগ, লুণ্ঠন; ধর্ষিতা হলো কেরানীগঞ্জের মা-বোনেরা। ... প্রতি গ্রামেই বর্বর বাহিনী বাড়িঘর পুড়িয়েছে। হিন্দু এলাকাগুলো পুড়িয়েছে বেশি। ... মান্দাইল ডাকের সড়কের সামনের পুকুরের পাড়ে দস্যুরা ষাটজন লোককে দাঁড় করিয়ে হত্যা করে। কালিন্দির এক বাড়িতে বর্বর বাহিনী পাশবিক অত্যাচার করতে গিয়ে এগারোজন মহিলাকে হত্যা করে। খোলা মাঠ ও গ্রাম দিয়ে যখন গ্রামবাসী ছোটাছুটি করছিল তখন খানসেনারা উপহাস ভরে চালিয়েছে ব্রাশ ফায়ার। বহু অপরিচিত লাশ এখানে-ওখানে বিক্ষিপ্তভাবে পড়েছিল।'

AMARBOI.COM

রবীন্দ্রনাথ ত্রিবেদীর 'একাত্তরের দশ মাস' গ্রন্থে 'জিঞ্জিরা জেনোসাইড'-এর অন্তর্ভুক্তিটি ছোট হলেও মর্মস্পর্শী।

> 'পাক সেনাবাহিনীর জিঞ্জিরা অপারেশনের কোনো তুলনা নেই সমকালীন বিশ্বে। মিলিটারিরা সেদিন জিঞ্জিরা ও বড়িশুর বাজারটি জ্বালিয়ে দেয়। চুনকুটিয়া-শুভাড্যা ধরে বড়িশুর পর্যন্ত পাঁচ থেকে সাত মাইল এলাকা মিলিটারি ঘিরে ফেলে এবং নারী শিশু নির্বিশেষে যাকে হাতের কাছে পেয়েছে তাকেই গুলি করে মেরেছে। নারীদের চরমভাবে লাঞ্ছিত করেছে। ক'জন কলেজ ছাত্রীকে অপহরণ করেছে। সকাল সাড়ে পাঁচটা থেকে দুপুর দুটা পর্যন্ত চলে এই হত্যা, লুণ্ঠন, ধর্ষণ ও অগ্নিসংযোগের মতো চরম বর্বরতা।'

(দৈনিক বাংলা, ১৩ নভেম্বর ১৯৭২)

বিচারপতি হাবিবুর রহমান কর্তৃক সম্পাদিত মাওলা ব্রাদার্স কর্তৃক প্রকাশিত 'বাংলাদেশের তারিখ' গ্রন্থটিতে ২ এপ্রিলের জিঞ্জিরা গণহত্যার কোনো অন্তর্ভুক্তি নেই।

আফসান চৌধুরী সম্পাদিত মাওলা ব্রাদার্স থেকে প্রকাশিত 'বাংলাদেশ ১৯৭১'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

(চার খণ্ড) গ্রন্থেও আমি পাকসেনাদের জিঞ্জিরা অপারেশনের কোনো তথ্য পাইনি। আশ্চর্য বটে।

শহীদ জননী জাহানারা ইমামকে ধন্যবাদ। তিনি তাঁর 'একাত্তরের দিনগুলি' গ্রন্থে পাকবাহিনীর জিঞ্জিরা জেনোসাইড সম্পর্কে কিছু তথ্য ও কিছু ঘটনার প্রাণস্পর্শী বর্ণনা দিয়েছেন।

৩ এপ্রিল শনিবার ১৯৭১

মর্নিং নিউজ-র একটা হেডলাইনের দিকে তাকিয়ে স্তব্ধ হয়ে বসেছিলাম : এ্যাকশন এগেইনস্ট মিসক্রিয়ান্টস অ্যাট জিঞ্জিরা— জিঞ্জিরায় দুষ্কৃতকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থাগ্রহণ।

গতকাল থেকে লোকের মুখে মুখে যে আশংকার কথাটা ছড়াচ্ছিল, সেটা তাহলে সত্যি? ক'দিন থেকে ঢাকার লোক পালিয়ে জিঞ্জিরায় গিয়ে আশ্রয় নিচ্ছিল। গতকাল সেখানে কামান নিয়ে পাকিস্তান আর্মি গোলাবর্ষণ করেছে। বহু লোক মারা গেছে।

গতকাল খবরটা আমি প্রথম শুনি রফিকের কাছে। ধানমণ্ডি তিন নম্বর রাস্তায় ওয়াহিদের বাসা থেকে রফিক প্রায়ই হাঁটতে হাঁটতে আমাদের বাসায় বেড়াতে আসে। নিউ মার্কেটে বাজার করতে এলেও মাঝে মাঝে ঢুঁ মারে। শরীফের সঙ্গে বসে বসে নিচু গলায় পরস্পরের শোনা খবর বিনিময় করে।

রফিকের মুখে শোনার পর যাকেই ফোন করি বা যার সঙ্গেই দেখা হয়— তার মুখেই জিঞ্জিরার কথা। সবার মুখ শুকনো। কিন্তু কেউই খবরের কোনো সমর্থন দিতে পারে না। আজ মর্নিং নিউজ অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে সেটার সমর্থন দিয়েছে। খবরে লেখা হয়েছে, দুষ্কৃতিকারীরা দেশের ভিতরে নির্দোষ ও শান্তিপ্রিয় নাগরিকদের হয়রান করছে। বুড়িগঙ্গার দক্ষিণে জিঞ্জিরায় সম্মিলিত এরকম একদল দুষ্কৃতকারীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এরা শান্তিপ্রিয় নাগরিকদের স্বাভাবিক জীবনযাপনের প্রক্রিয়ায় বাধা সৃষ্টি করছিল। এলাকাটি দুষ্কৃতকারীমুক্ত করা হয়েছে।

দুপুরের পর রঞ্জু এলো বিষণ্ন গম্ভীর মুখে। এমনিতে হাসিখুশি, টগবগে তরুণ। আজ সে-ও স্তব্ধ, স্তম্ভিত। সোফাতে বসেই বলল, 'উফ ফুফু আম্মা। কী যে সাংঘাতিক ব্যাপার ঘটেছে জিঞ্জিরায়। কচি বাচ্চা, থুরথুরে বুড়ো— কাউকে রেহাই দেয়নি জল্লাদরা। কী করে পারল?'

আমি বললাম, 'কেন পারবে না? গত ক'দিনে ঢাকায় যা করেছে, তা থেকেই বুঝতে পারো না যে ওরা সব পারে?'

'ফুফু আম্মা, আমার এক কলিগ ওখানে পালিয়েছিল সবাইকে নিয়ে। সে আজ একা ফিরে এসেছে— একেবারে বদ্ধ পাগল হয়ে গেছে। তার বুড়ো মা, বউ, তিন বাচ্চা, ছোটো একটা ভাই— স-ব মারা গেছে। সে

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সকালবেলা নাশতা কিনতে একটু দূরে গিয়েছিল বলে নিজে বেঁচে গেছে। কিন্তু সে এখন বুক মাথা চাপড়ে কেঁদে গড়াগড়ি যাচ্ছে, আর বলছে, সে কেন বাঁচল? উঃ ফুফু আম্মা, চোখে দেখা যায় না তার কষ্ট।'

'অথচ কাগজে লিখেছে ওরা নাকি দুষ্কৃতকারী।'

শরীফ বাইরে গিয়েছিল, বাড়ি ফিরেই আরেকটি বম্বশেল ফাটাল। 'শুনছো, হামিদুল্লাহ বউ-ছেলে নিয়ে নৌকায় করে ওদের গ্রামের বাড়িতে যাচ্ছিল। জিঞ্জিরার কাছে পাক আর্মির গোলা গিয়ে পড়ে ওদের নৌকায়। ওর ছেলেটা মারা গেছে। বউ ভীষণভাবে জখম।'

হামিদুল্লাহর বউ সিদ্দিকাকে ওর বিয়ের আগে থেকেই চিনতাম। ভারি ভাল মেয়ে। হামিদুল্লাহ ইস্টার্ন ব্যাংকিং করপোরেশনের ম্যানেজিং ডিরেক্টর, সেও খুব নিরীহ নির্বিরোধ মানুষ। একটাই সন্তান ওদের। তার এরকম মর্মান্তিক মৃত্যু? মনটা খারাপ হয়ে গেল। খবর কাগজটা তুলে বললাম, 'অথচ সামরিক সরকার এদেরকে দুষ্কৃতিকারী বলছে।'

বিকেলে রেবা ও মিনিভাই বেড়াতে এলো। তাদের মুখও থমথমে। মিনিভাইয়ের এক দূরসম্পর্কের আত্মীয় খোন্দকার সাত্তার–তিনিও তাঁর পরিবার পরিজন নিয়ে নৌকায় করে দেশের বাড়ীর দিকে যাচ্ছিলেন। কামানের গোলার টুকরো তাঁদের নৌকায় গিয়ে পড়ে। নৌকায় ওর ছোটো ভাই এবং আরো কয়েকজন গুরুতর জখম হয়েছে।'

(জাহানারা ইমাম : একাত্তরের দিনগুলি : পৃঃ ৭১-৭২)

AMARBOI.COM

৫

জিঞ্জিরা অপারেশনের শুরুটা কীভাবে হয়েছিল, সে সম্পর্কে আমি দুজন প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ পেয়েছি। ঘটনাচক্রে ওরা দুজনই ছিল আমার আজিমপুর মেসের প্রতিবেশী। বয়সে আমার চেয়ে বেশ ছোটো। একাত্তরে তারা দুজনই ছিল কিশোর। জাকির হোসেন মিলন ও নজরুল ইসলাম খোকা। ওরা ২৭ মার্চ ঢাকা থেকে পালিয়ে জিঞ্জিরার মান্দাইল গ্রামে আশ্রয় নিয়েছিল। ১ এপ্রিল ঐ বাড়ির গর্ভবতী মেয়েটির প্রচণ্ড প্রসব বেদনা শুরু হলে ওরা দ্রুত একটি নৌকা ভাড়া করে মেয়েটিকে নিয়ে মিটফোর্ড হাসপাতালে যায়। মেয়েটির স্বামী তখন বাড়িতে ছিল না। পিতাটিও বৃদ্ধ। পিতা ও কন্যাকে নিয়ে হাসপাতালে আসার পথে বুড়িগঙ্গা নদীতে টহলরত পাকসেনারা নৌকা থামিয়ে তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে শেষ পর্যন্ত ছেড়ে দেয়। তখনও তারা বুঝতে পারেনি যে, পাকসেনাদের নদীপথের ঐ টহলটা ছিল আগামীকালের জিঞ্জিরা জেনোসাইডের প্রস্তুতিপর্ব। তারা সেদিন প্রচুরসংখ্যক পাকসেনাকে নদীপথে টহল দিতে দেখেছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রসূতিকে হাসপাতালে ভর্তি করার পর মেয়েটির পিতার সঙ্গে রাত জাগবে বলে তারাও মিটফোর্ড হাসপাতালে থেকে যায়। গভীর রাতে তাদের ঘুম ভাঙে মিলিটারির বুটের শব্দে। হাসপাতালটি দখল করে নিয়ে কিছু আর্মি হাসপাতালের ছাদে উঠে যায়, কিছু আর্মি পার্শ্ববর্তী মসজিদের ছাদে ওঠে বিভিন্নরকমের আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রসহ পজিশন নেয়। ওরা ভয় পেয়ে হাসপাতালের করিডোরের শেষ-প্রান্তের একটি টেবিলের নিচে লুকিয়ে পড়ে। যখন সকালের আলো ফুটে ওঠে, যাকে বলে সুবে সাদেকের আলো, তখন হঠাৎ মসজিদের উপর থেকে পাক-আর্মিরা আকাশে গুলি ছুড়তে শুরু করে। ঐ গুলিগুলো আকাশে ফেটে চৌচির হয়ে চারপাশে ছড়িয়ে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে আলোয় আলোকিত হয়ে ওঠে চারদিক। আকাশে যাও কিছু অন্ধকার অবশিষ্ট ছিল, পাক-আর্মির ছোড়া আগুনের গোলায় তাও দূর হয়ে যায়। যে অন্ধকারে ওরা আত্মগোপন করেছিল, সেই স্থানটাকে তাদের আর নির্ভরযোগ্য বলে মনে হলো না। তখন আল্লাহর নাম নিয়ে মিলন আর নজরুল ভয় পেয়ে হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে গলিপথ ধরে ছুটতে থাকে। ছাদ থেকে পাকসেনারা তাদের লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ে। কিন্তু গলিপথ ধরে দৌড়ানোর কারণে তারা অল্পের জন্য রক্ষা পায়।

ঘটনাপরম্পরা বিশ্লেষণ করলে সহজেই বোঝা যায় যে, বুড়িগঙ্গা নদীর এপারে অবস্থিত মিটফোর্ড হাসপাতালসংলগ্ন মসজিদটির ছাদ থেকেই সেদিন ভোর পাঁচটার দিকে নদীর ওপারের জিঞ্জিরায় মিলিটারি অপারেশন শুরু করার সিগন্যাল দেয়া হয়েছিল।

AMARBOI.COM

৬

পথের পাশে ছড়িয়ে থাকা বেশকিছু মৃতদেহকে দেখেও না দেখার ভান করে, তাদের পাশ কাটিয়ে আমরা যখন নদীর পারে পৌঁছাই, তখন নদীর পারে অনেক মানুষের ভিড়। এক সপ্তাহ আগে ঢাকা থেকে বুড়িগঙ্গা নদীর এপারে পালিয়ে আসার দিন নদীতে যেরকম ভিড় ছিল, দেখলাম ফেরার পথেও তেমনি ভিড়। যদিও জানি, সেদিন যারা এপারে পালিয়ে এসেছিল তাদের অনেকেই আজ ফিরছে না। আর ফিরবে না কোনোদিনও। তবু ভিড়।

হঠাৎ তাকিয়ে দেখি, লেখক বদরুদ্দীন উমর। তিনি উদ্ভ্রান্তের মতো নদীর পার ধরে হাঁটছেন। তিনি আমাকে চিনতেন কি না জানি না। আমি তাঁকে চিনতাম। একবার ভাবলাম তাঁর সঙ্গে কথা বলি। আবার ভাবলাম থাক, তিনি যেমন মুজিববিরোধী, আমার মতো মুজিবভক্তকে পেয়ে গায়ের ঝাল মিটাতে কখন কী বলে ফেলেন। তিনি জনারণ্যে মিলিয়ে গেলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটি করুণ দৃশ্য আজও আমার চোখে গেঁথে আছে। মাথায় গুলি লেগে স্বামীর মাথার খুলি উড়ে গেছে। খুলি-উড়ে যাওয়া মাথার ফাঁক দিয়ে তার মগজের কিছুটা বাইরে বেরিয়ে এসেছে। লোকটি জল জল বলে স্ত্রীর কাছে জল চাচ্ছে। কিন্তু লোকজনের নিষেধের কারণে স্ত্রীটি তাকে জল খেতে দিচ্ছে না। ঐরকম মুহূর্তে নাকি রোগীকে জল দিতে নেই। তাতে রোগীর ক্ষতি হয়। সামনে বুড়িগঙ্গা নদী। সেখানে টলমল করছে স্ফটিকস্বচ্ছ জল। লোকটা তৃষিত চোখে ঐ জলের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। মনে পড়ল লালনের গান– 'লালন মরলো জল-পিপাসায় কাছে থাকতে নদী মেঘনা... ।'

কিংকর্তব্যবিমূঢ় স্ত্রীর কপালে সিঁদুরের গোল টিপ। হাতে শাঁখা। স্বামীকে দুহাতে আগলে ধরে স্ত্রী বসে আছে। লোকটির মাথা দিয়ে গড়িয়ে পড়া রক্তে ভিজে যাচ্ছে উভয়ের গা। মনে হলো বুড়িগঙ্গার ওপারে যাবার নৌকার জন্য নয়, আরও অনেক অনেক দূরে কোথাও যাবার জন্য অপেক্ষা করছে লোকটি। স্ত্রীটিও হয়তো বুঝে গেছে ঐ কঠিন সত্যটা। কী নিষ্ঠুর অমানবিক সময় তখন গ্রাস করেছিল আমাদের মানবিক বোধগুলোকে। ঢাকা থেকে নদীর এপারে আসার সময়, এক সপ্তাহ আগেও আমরা এ রকম ছিলাম না। জিঞ্জিরার গণহত্যা কি আমাদের এতটাই বদলে দিল? আমরা ভাবিনি, আগে ঐ মরণোন্মুখ মানুষটিকে নৌকায় তুলে দিই। বলা তো যায় না, সময়মতো হাসপাতালে পৌঁছতে পারলে লোকটা হয়তো বেঁচেও যেতে পারত। কিছু করতে পারতাম কিনা জানি না, কিন্তু ঐ মানুষটাকে বাঁচাবার জন্য আমরা সেদিন কোনো চেষ্টাও করিনি। অনেকের মতো আমরাও সেদিন নৌকায় ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম। ঐ অপরাধবোধ আমাকে আজও তাড়া করে ফেরে। আমি চোখ বন্ধ করলে আজও সেই খুলি উড়ে যাওয়া লোকটির ব্রহ্মতালু দিয়ে বেরিয়ে আসা মগজের অংশবিশেষ স্পষ্ট দেখতে পাই। খোলস-অপসৃত শামুকের মতো তার নরম মগজটা আজও আমার চোখে ভাসে। আজও আমার চোখে ভাসে স্বামীকে দুহাতে জাপটে ধরে রাখা স্ত্রীর হাতের সাদা ধবধবে শঙ্খের শাঁখা আর কপালের লাল সিঁদুরের গোল টিপটি। কিন্তু ঐ মেয়েটির মুখটা আমি কিছুতেই মনে করতে পারি না। লোকটা কি বেঁচেছিল? গাঙুরের জলে লখিন্দরের শবদেহ নিয়ে বেহুলার মতো ঐ মেয়েটি কি বুড়িগঙ্গার জলে স্বামীর শব নিয়ে তার নৌকো ভাসিয়েছিল? নাকি অলৌকিকভাবে বেঁচে গিয়েছিল লোকটি? কে জানে?

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বুড়িগঙ্গা, শরীফ মিয়া ও বেলাল বেগ

In the distant past, a course of the Ganges river used to reach the Bay of Bengal through the Dhaleshwari river. This course gradually shifted and ultimately lost its link with the main channel of the Ganges and was renamed as the Bsuriganga. It is said that the water levels during high and low tides in this river astonished the Mughals.

(from Wikipedia)

এই সেই বুড়িগঙ্গা নদী। ঢাকা নগরীর কণ্ঠহার। নদীর তরঙ্গের বিরুদ্ধে লড়তে লড়তে এবার দক্ষিণ থেকে উত্তরের দিকে এগিয়ে চলেছে আমাদের নৌকো। নৌকার জল ছুঁই-ছুঁই গলুইয়ের কাছে বসে আমি বুড়িগঙ্গার স্ফটিকস্বচ্ছ জলে আমার দু'হাত ডুবিয়ে দিলাম। আমার মনে হলো আমি যেন বুড়িগঙ্গা নদীর জলে নয়, তার গোপন চোখের জলে হাত ডুবিয়েছি। বুড়িগঙ্গা তার তীরবর্তী মানুষের দুঃখ দেখে কাঁদছে। তার চোখে জল।

নদী পেরোনোর সময় আমরা বেশ কটি মৃতদেহকে নদীর জলস্রোতে ভেসে যেতে দেখলাম। ঐসব মৃতদেহের মধ্যে দু'একটি নারীর দেহও ছিল। বুড়িগঙ্গার স্ফটিকস্বচ্ছ জলে ডুবতে ডুবতে ভেসে উঠছিল তাদের মাথার দীর্ঘকালো চুল। ঐ রমণীদের ভাসমান মরদেহ দেখে আমার মনে পড়ছিল, বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজের জননী আমিনা ও তাঁর খালা ঘসেটি বেগমের কথা। এই বুড়িগঙ্গার জলেই তাদের সলিল সমাধি রচিত হয়েছিল একদিন। ঢাকার লালবাগ কেল্লার বন্দিজীবনের অবসান ঘটিয়ে আগে থেকে তল ফুটো করা নৌকায় উঠিয়ে মুর্শিদাবাদে ফিরিয়ে নেবার নাম করে তাদের সুকৌশলে ডুবিয়ে মারা হয়েছিল এই নদীতে। আমার মনে হচ্ছিল, বুড়িগঙ্গার জলে ভাসমান ঐ নারীদেহ দুটি বুঝি সেই সিরাজ-জননী আমিনা বেগম ও তাঁর বড় খালা ঘসেটি বেগমেরই হবে। তাদের মরদেহও নিশ্চয়ই এভাবেই সেদিন বুড়িগঙ্গার জলে ভেসে গিয়েছিল।

'Ghaseti Begum, the former Nawab's hostile aunt, and his mother Amina, were put in a boat, rowed out into the Buriganga river and drowned.' (Clive, The life and death of a British Emperor. Page 229)

বুড়িগঙ্গা নদী পেরিয়ে ওপারে যাবার সময় আমার মনে হয়েছিল– ওপারেতে যত সুখ। ওপারে সপ্তাহ কাটিয়ে পাকসেনাদের মরণতাড়া খেয়ে আজ যখন নদীর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এপারে ফিরছি, তখন মনে হলো, নদীর এপারে আমাদের জন্য কোনো সুখের হাতছানি নেই। আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে জলে কুমির, ডাঙায় বাঘ। বাঘের তাড়া খেয়ে আমরা ছুটে গিয়েছিলাম কুমিরের খাদ্য হতে। কুমিরের তাড়া খেয়ে আজ আমরা আবার ফিরে আসছি মানুষখেকো সেই পুরনো বাঘের খাঁচায়। জানি না বাঘের খাঁচা থেকে প্রাণ বাঁচিয়ে ঢাকা থেকে আমরা বেরোতে পারব কি না।

নদী পেরিয়ে আমরা নদীতীরবর্তী একটি ছোট্ট চায়ের স্টলে আরাম করে বসে চা-বিস্কিট খেলাম। ঐ দোকানে চা-বিস্কিট ও সিগারেট ছাড়া আর কিছুই ছিল না। সারাদিন যে আমাদের পেটে কিছু পড়েনি, মনেই ছিল না। কিছু খেতে বসে বুঝলাম, আমাদের পেট ক্ষিধায় চোঁ চোঁ করছে। সাড়া পথ পায়ে হেঁটে কামরাঙ্গীরচর হয়ে আমরা যখন ঢাকায় ফিরলাম, তখন সন্ধ্যা।

নবাবগঞ্জ বাজারের কাছে, ঢাকার মাটিতে পা রাখতেই দেখা হলো শরীফ মিয়ার সঙ্গে। শরীফ মিয়া পথের পাশে দাঁড়িয়ে বুড়িগঙ্গার ওপার থেকে ফিরে আসা মানুষজনকে কৌতূহলভরে দেখছিলেন। ওপার থেকে এপারে ফিরে আসা মানুষজনের কাছ থেকে নদীর ওপারে কী ঘটেছে, কত মানুষ মরেছে পাকসেনাদের হাতে সে সম্পর্কে খবরাখবর নিচ্ছিলেন।

আমাদের কাছে পেয়ে শরীফ মিয়ার খুশির অন্ত নেই। তাঁকে দেখে আমরাও মহা খুশি। তিনি আমাদের জোর করে ধরে তাঁর বাড়িতে নিয়ে গেলেন। পিলখানার পাশে আমাদের মেস। সেখানে যাবার আগে চা খেতে খেতে আরও অন্ধকারের অপেক্ষায় আমরা কিছুটা সময় শরীফ মিয়ার লালবাগের বাসায় কাটালাম। তিনি আমাদের ডাল-ভাত খাওয়াতে চেয়েছিলেন, কিন্তু আমরা রাজি হইনি।

নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা শরীফ মিয়াকে চেনে না, জানার কথাও নয়। তাদের জন্য শরীফ মিয়া সম্পর্কে কিছু বলা দরকার। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরির উত্তর দিকে, বর্তমান নাটমণ্ডলের সামনেই ছিল শরীফ মিয়ার ক্যান্টিন। সবাই বলত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনটিলেকচুয়্যাল কর্নার। ঐ ক্যান্টিনটি এখন আর নেই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধুর ক্যান্টিনটি ছিল ছাত্রনেতা ও রাজনৈতিক কর্মীদের দখলে আর শরীফ মিয়ার ক্যান্টিনটি ছিল ঢাকার উঠতি তরুণ কবি, শিল্পী, সাংবাদিক ও চিন্তাবিদদের দখলে। আমরা নিয়মিত তাঁর ক্যান্টিনে চা, টোস্ট বিস্কিট ও আট আনা প্লেটের বিরিয়ানি খেতাম। আমরা দিনরাত আড্ডা দিতাম ঐ ক্যান্টিনে বসে। জগন্নাথ হলে থাকতেন মধুদা। মধুসূদন দত্ত। পঁচিশে মার্চের রাতে মধুদাকে হত্যা করে পাকসেনারা। শরীফ মিয়া থাকতেন তাঁর লালবাগের নিজ বাড়িতে। তাই তিনি বেঁচে গেছেন। শরীফ মিয়াকে তখন কে না চেনে? ঢাকার উঠতি তরুণ কবি-সাহিত্যিক ও শিল্পী-সাংবাদিকদের কাছে শরীফ মিয়া ছিলেন তাদের খুব আপনজন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঢাকার মানুষ জন্মসূত্রেই খুব রসিক হয়, শরীফ মিয়া ছিলেন আরও এককাঠি সরেস। আমার সঙ্গে ছিল তাঁর বিশেষ রসের সম্পর্ক। ময়মনসিংহের মানুষও যে কম রসিক হয় না, সেইটে প্রমাণ করার জন্য আমি সর্বদা তাঁর পেছনে লাগতাম। আমাদের মধ্যে রসসৃষ্টির একটা গোপন প্রতিযোগিতা চালু ছিল। একেকদিন আমাদের একেকজনের জয় হতো। কিছুক্ষণের মধ্যেই টের পেলাম, এত দুঃখের মধ্যেও শরীফ ভাই আমাদের মধ্যকার গোপন প্রতিযোগিতার ব্যাপারটা ভোলেননি। তাঁর বাড়ি থেকে চলে যাবার জন্য বাড়ির বাইরে পা বাড়াতেই, তিনি আমাকে তাঁর শীর্ণ বুকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে আমার কানের কাছে মুখ এনে মৃদুস্বরে বললেন– 'যাউকগা, আগের পাওনা পয়সা আর দিবার লাগব না।'

ইপিআরদের চোখ এড়িয়ে কিছুটা ঘুরপথে আমি আমার মেসে ফিরলাম। দেখলাম মেস খালি। সেখানে আতিক, কাসেম বা হারুন– কেউ নেই। মেস ছেড়ে সবাই পালিয়ে গেছে। আমাদের মেসের সামনের বাড়িটি আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু শাহজাদাদের। ওরা সপরিবারে বাড়ি ছেড়ে গ্রামের বাড়িতে চলে গেছে। পাশের শরীয়তুল্লাহর ত্রিতল বাড়ির গ্রাউন্ড ফ্লোরে থাকতেন বেলাল বেগ। পাকিস্তান টেলিভিশনের প্রযোজক। আমরা শুনলাম তিনি তখনও আছেন। একজন আত্মীয়ের বাসায় রাত কাটাবে বলে, নজরুল আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেল। থাকলাম আমি আর হেলাল হাফিজ। স্থির করলাম, আমরা আজকের রাতটা বেলাল বেগের সঙ্গে গল্প করে কাটাব। বিদ্যুৎ না থাকাতে, সুবিধেই হলো। কারও দৃষ্টিতে না পড়ে আমরা আমাদের মেসের ভিতরে অন্ধকারে লুকিয়ে থাকতে পারলাম। পাড়ায় কিছু বিহারির বাস, তাই সঙ্গতকারণেই ওদের নিয়ে আমাদের বেশ ভয় ছিল। পাকসেনাদের সঙ্গে মিশে ওরা কীভাবে নগরীতে বাঙালি নিধনে অংশ নিচ্ছিল, ২৭ মার্চের সকালে আমরা নিজ চোখে তা প্রত্যক্ষ করেছি।

AMARBOI.COM

রাত দশটার দিকে বেলাল বেগ ডিআইটির টিভিভবন থেকে ফিরলেন। আমরা মেস ছেড়ে চুপিচুপি তাঁর বাসায় চলে গেলাম। তিনি আমাদের আনন্দে বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

বললেন, 'খাওয়া-দাওয়া কিছু করেছেন? মুখ দেখে তো মনে হচ্ছে না সারাদিন পেটে কিছু পড়েছে।'

আমরা বললাম, 'পাকসেনাদের গুলি খাওয়ার ভয়ে আর কিছু খাইনি। আমরা লুকিয়ে এখানে এসেছি। পাড়ার বিহারিরা দেখে ফেললে বিপদ ঘটাতে পারে।'

বেলাল বেগ বললেন, 'ভাল করেছেন, গুলি খেয়ে মরার চেয়ে না খেয়ে মরা ভাল।'

আমাদের কাছ থেকে কিছু জানার আগেই তিনি বললেন, 'ওপারে যা ঘটেছে আমি সব রিপোর্ট পেয়েছি।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'পিটিভি সেই খবর দিয়েছে নাকি?' আমি জানতে চাই।

মুচকি হেসে বেলাল বেগ বললেন, 'হ্যাঁ, দিয়েছে বটে। বলেছে, বুড়িগঙ্গা নদীর ওপারে কেরানীগঞ্জের জিঞ্জিরায় আশ্রয়গ্রহণকারী বিচ্ছিন্নতাবাদী দুষ্কৃতকারীদের কঠোর হাতে নির্মূল করা হয়েছে।'

বলতে বলতে তিনি তাঁর রান্নাঘরে প্রবেশ করলেন। ফিরে এসে বললেন, 'ঠিক আছে, আমার বুয়া আমার জন্য যা রান্না করে রেখে গেছে, তাই আমরা ভাগ করে খেয়ে নেব। নো প্রবলেম। যান বাথরুম থেকে হাত মুখ ধুয়ে আসেন।'

আমরা তাঁর নির্দেশ শিরোধার্য করে ঘরের মেঝেতে পাটি বিছিয়ে খেতে বসি। কেমন ছিল সেই রাতটি? আমার অনুরোধে, সেই রাত্রির স্মৃতিচারণ করে আমেরিকা থেকে বেলাল বেগ সম্প্রতি আমাকে যে ইমেইলটি পাঠিয়েছেন, আমি তা হুবহু এখানে প্রকাশ করছি। তিনি লিখেছেন :

Hello Goon,

The other day Koushik Ahamed, the owner-editor of Weekly Bangalee of NewYork surprised me at dead of night with a rare phone-call just for the copies of the two poems I wrote on Shamsur Rahman before and after his death only because he came across an Internet message where in you expressed some of your feelings for the poems and for me. Goon, the pure poet, writing about me in all his 62 years ! I just could not believe and I started searching for the message. Finally last night I discovered your message in my Junk-mail which I generally delete without even looking. Now I have transfered you to my mailing list. Thanks to Bill Gates and others who have done what God or Gods could not do : re-unite friends and lovers and the poets. Yes, you used to call me Belal Bhai occasionaly but most of the times by the name albait with Apni. Fact is I am senior to you by at least 5 years. I first saw you and Helal Hafiz as my neighbour. On my first sight, you immidiately impressed me with your striking personality. Our friendship started the day you and Helal returned from Zinzira, where you escaped from the ongoing manslaught at Dhaka during and after March 25.

You two were hungry like dogs and I felt you must be given some food. We had a little left-over daal and nothing else to go with rice if it is cooked. Suddenly I remembered we had one live Koi fish. Our lady-cook cooked it with plenty of soup. Then

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

I noticed how you gulped the food. Our poor but motherly cook was almost in tears seeing your plight. Then I remember how anxious I was to see you escape Dhaka.

Your stories will never end with me because I was one of the sincerest admirers of your poetic self. Well, now that we are connected, once again together we can resume our love and duty towards our country and the people .Yes, Momin Bhai also lives in New York. He loves to keep himself incognito. He is still the same arrogant goodself. I will contact him soon and tell him about you.

This far today.
Keep well
Belal Beg

হিন্দু মৌলানা কিধার গিয়া

AMARBOI.COM

বেলাল বেগের ঘরের মেঝেতে মাদুর বিছিয়ে ভাত খেতে বসে শুভার কথা মনে পড়ল। শুভা আমাকে ওদের বাড়িতে দুপুরের খাওয়া খেয়ে যাবার জন্য অনুরোধ করেছিল। নজরুল আর হেলালের কথা ভেবে আমি তার প্রস্তাবে রাজি হইনি। ওদের খুঁজে বের করাটাই তখন ছিল আমার প্রধান কাজ। একা থাকলে আমি নিশ্চয়ই শুভার নিমন্ত্রণ সানন্দে গ্রহণ করতাম। যাকে বলে হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলা, আমি তাই করে শুধু শুভার হাতের এক গ্লাস জল গোগ্রাসে গিলে ওদের বাড়ি থেকে চিরদিনের জন্য বেরিয়ে এসেছি। ঘটনার ছত্রিশ বছর পর, শুভার কথা লিখতে বসে, যুক্তিসঙ্গত কারণেই 'চিরদিন' শব্দটা আমি আজ ব্যবহার করতে পারছি। এতদিন যার সঙ্গে আমার দেখা হয়নি, অবশিষ্ট জীবনে কখনও তার দেখা পাব, এমনটি আর ভাবি না। যখন শুভার কথা ভাবি, মনে হয় শুভা ছিল জলের দেবী। বুড়িগঙ্গার ভিতর থেকে উঠে এসে আমাকে ক্ষণিকের দেখা দিয়ে সে আবার জলের মধ্যেই মিশে গিয়েছে। 'কেঁদেও পাবে না তারে, বর্ষার অজস্র জলধারে।'

জানি, জল তার নিজগুণেই গুণান্বিত, কিন্তু সেই জল যদি কোনো শুভার মমতাময়ী হাতের স্পর্শধন্য হয়, তবে তার মধ্যে যে অব্যাখ্যাত অমৃতগুণ যুক্ত হয়, সে আমি নিশ্চয় করে বলতে পারি। তার নেশা সোমরসের চেয়ে কম না বেশি, তা মর্ত্যের মানুষ বলবেই বা কিসের জোরে?

বেলাল বেগের বাসায় সেই রাতে আমরা কী দিয়ে কীভাবে খেয়েছিলাম,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেখানে তাঁর মাতৃতুল্য কাজের বুয়াটি কখন আমাদের জন্য কৈ মাছ রেঁধেছিল, আমাদের গোগ্রাসে ভাত খেতে দেখে তাঁর চোখ আদৌ অশ্রুসজল হয়েছিল কি না, তা আমার মনে পড়ে না। বেলাল বেগের মনে আছে হয়তো এজন্য যে, তাঁর স্মৃতিকোষে তখন আমার চেয়ে ঢের বেশি খালি স্পেস ছিল। তিনি ছিলেন আমাদের আশ্রয়দাতা, আর আমরা ছিলাম তাঁর আশ্রয়প্রার্থী। দাতার স্মরণশক্তি বেশি প্রখর হওয়ারই কথা। অন্য একটি ব্যাপারও ছিল, যার গুরুত্বকেও খাটো করে দেখা যাবে না। আমার মস্তিষ্কের জন্য বরাদ্দকৃত স্পেসের অনেকটাই ভরে গিয়েছিল জিঞ্জিরা-গণহত্যার বীভৎস দৃশ্যকাব্যে, তারপরও অবশিষ্ট যা ছিল, তাও কেড়ে নিয়েছিল সুন্দরী শুভার সোনার তরী। আমার সেই রাত্রির আচরণের মধ্যে বেলাল বেগ কোনোরূপ পাগলামি প্রত্যক্ষ করেছিলেন কি না, জানি না। করে থাকলেও, জানি ভদ্রতাবশত তিনি তা কখনও কাউকে বলবেন না।

বেলাল বেগ পাক-টিভিতে কাজ করতেন বলে তাঁর পক্ষে পাকিস্তানি সেনা ও তাদের নীতিনির্ধারকদের সান্নিধ্য পাওয়াটা যেমন সহজ, তেমনি তাদের গোপন মনোভাব সম্পর্কে কিছু আগাম ধারণা লাভ করাও সম্ভব ছিল। অত্যন্ত বুদ্ধিমান মানুষ তিনি। প্রখর বুদ্ধির জোরে তাঁর পক্ষে অপ্রখর পাকিদের অন্তর্জগত সার্ভিং করাটা খুব কঠিন ছিল না। তিনি বললেন, ওদের সঙ্গে কথা বলে আমি যতটা বুঝতে পেরেছি, পাকসেনারা তাদের সার্চ লাইট অপারেশনের শুরুতে নির্বিচারে বাঙালি নিধনে ব্রতী হলেও এখন কিন্তু ওদের নির্বিচার-নিধনের শিকার হবে মুখ্যত হিন্দুরা। যার প্রমাণ আপনি জিঞ্জিরাতে নিজেই কিছুটা পেয়েছেন। সুতরাং দেশের বাড়িতে ফিরে গেলেও সেখানে গিয়ে খুব বেশিদিন আপনি নিরাপদে থাকতে পারবেন, এমনটি ভাববেন না। পাকসেনারা দ্রুতই মফস্বলের শহরগুলোতে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করবে। তাদের ছত্রছায়ায় হিন্দুদের বাড়িঘরে নারী ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ ও লুটতরাজ হবে। ওরা দেশটাকে হিন্দুশূন্য করার চেষ্টা করবে। নির্বিচারে হিন্দু-নিধনের পাশাপাশি চলবে বেছে বেছে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের ধরে নিধন ও নির্যাতন করার কাজ। খবর পেয়েছি, ভারতের বিভিন্ন সীমান্তবর্তী অঞ্চলে শরণার্থী শিবির খোলা হয়েছে, যত দ্রুত পারেন সীমান্ত অতিক্রম করে সেখানে গিয়ে আশ্রয় নিতে চেষ্টা করবেন।

পাকসেনাবাহিনীর পরবর্তী পরিকল্পনা সম্পর্কে বেলাল বেগের আহরিত ধারণাগুলো আমার নিজের আশংকার সঙ্গে মিলে গেল। স্থির করলাম, পরদিনই আমরা ঢাকা ত্যাগ করব। বেলাল বেগ আমার সঙ্গে একমত হলেন যে, মেসে রাত না-কাটানোই ভাল। বেলাল বেগের বাসায় থাকাটাও ঠিক হবে না। তাতে আমাদের বিপদ তো কাটবেই না, বরং আমাদের মতো মুক্তিদের আশ্রয়দানের কারণে তাঁর বিপদ বাড়বে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সন্ধ্যার পরপর আমরা যখন আমাদের মেসে প্রবেশ করছিলাম, তখন আমার এক প্রতিবেশীর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তিনি আমাকে কাছে ডেকে চুপিচুপি জানিয়েছেন যে, পাড়ার বিহারিরা মেসের আশপাশের লোকজনের কাছে আমার অবস্থান সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিচ্ছিল। ওরা আশপাশের লোকজনকে প্রশ্ন করে জানতে চাইছিল, 'হিন্দু মৌলানা কিধার গিয়া?'

কথাটা শুনে আমার খুব হাসিও পেল, আবার খুব ভয়ও পেলাম। বুঝলাম, আমাকে 'হিন্দু মৌলানা' বলে আমার প্রতি ঐ বিহারিরা যে সম্মান প্রদর্শন করেছে, তা শুধু আমাকে শনাক্ত করার সুবিধের জন্যই। আমার লম্বা চুল-দাড়ির কারণেই আমার এই উপাধিপ্রাপ্তি। দশচক্রে পড়ে আমি যে আমার দীর্ঘদিনের প্রিয় দাড়ি সম্প্রতি কেটে ফেলেছি, সেই তথ্যটি তারা জানে না। আর জানে না বলে, আজিমপুরে ফিরতে দেখেও আমাকে হয়তো ওরা চিনতে পারেনি। দাড়ি কাটার সময় আমার কষ্ট হয়েছিল। রাগ হয়েছিল দাড়ি কাটায় প্ররোচনাদানকারী আমার কবিবন্ধু আবুল হাসান, মহাদেব সাহা, রফিক আজাদ, শহীদ কাদরীদের প্রতি। 'হিন্দু মৌলানা' সন্ধানী বিহারিদের চোখে ধুলো দিতে পারার আনন্দে আমার সব রাগ, সব কষ্ট জল হয়ে গেল।

নেতাজী মুখে কৃত্রিম দাড়ি লাগিয়ে ব্রিটিশদের চোখে ধুলো দিয়ে ভারত ছেড়ে আফগানিস্তান দিয়ে রাশিয়া হয়ে হিটলারের জার্মানিতে পালিয়েছিলেন। আর আমি আমার আসল দাড়ি কেটে, বিহারিদের চোখে ধুলো দিয়ে আমার মেসের চারপাশে ঘুরপাক খাচ্ছি। নিজেকে একজন গুরুত্বপূর্ণ নেতা বলে আমার মনে হতে লাগল। মনে হলো, কবি তো কিছুটা নেতাও বটে।

পাকসেনাদের চাইতে স্থানীয় বিহারিদের ভয়টাই আমাকে বেশি পেয়ে বসল। ভাবলাম, ওদের হাতে ধরা পড়লে ওরা আমাকে মৌলানার সম্মান তো দেবে না, মালাউন হয়ে মৌলানার লেবাস ধারণের অপরাধে আমাকে কচুকাটা করে তাদের গায়ের ঝাল মিটাবে। সুতরাং মেসে থাকার ঝুঁকি না নিয়ে স্থির করলাম, মেসের সামনে শাহজাদাদের বাড়িতে রাত কাটাব। ওরা শহরের বাড়ি ছেড়ে সবাই ওদের গ্রামের বাড়ি নরসিংদীতে চলে গেছে। বাড়িটি সম্পূর্ণ খালি। প্রতিটি ঘরেই বড় তালা ঝুলছে কিন্তু ওদের রান্নাঘরটি খোলা পড়ে আছে। আমরা শাহজাদাদের ঐ রান্নাঘরে রাত্রি যাপনের সিদ্ধান্ত নিলাম।

রাতের অন্ধকারে মেস থেকে চুপিচুপি বিছানার চাদর, বালিশ আর কিছু প্রয়োজনীয় বই নিয়ে এসেছিলাম, যাতে পরদিন বিহারিদের চোখে পড়ার ঝুঁকি নিয়ে আমাকে ঐ মেসে আবার ঢুকতে না হয়। পাড়ার বিহারিদের খাটো করে দেখার কোনো কারণই নেই। ঐ বিহারিদের সহযোগিতায় পাকসেনারা নিউ পল্টনে, আমাদের মেসের তিন শ' গজের মধ্যে অবস্থিত খসরুর বাড়িটি জ্বালিয়ে দিয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার মেসটি যদি আমার নিজের বাড়ি হতো, তবে নিশ্চিত ওরা তা পুড়িয়ে দিত।

শাহজাদাদের রান্নাঘরের মেঝেতে চাদর বিছিয়ে শুয়েছি। কাছেই পিলখানা। সেখানে বিদ্রোহী বাঙালি জোয়ানরা আর নেই। পিলখানাটি পুরোপুরি তখন পাকসেনাদের দখলে। বাঙালি যারা ছিল, তারা কেউ পিলখানা ছেড়ে পালিয়েছে, কেউ ধরা পড়েছে, কেউবা পাকবাহিনীর হাতে মারা পড়েছে। ভয়ে ও দুশ্চিন্তায় রাতে ভাল ঘুম হলো না। ভয় তো শুধু পাকসেনাদের নিয়ে নয়, ভয় হিন্দু মৌলানাসন্ধানী আমাদের বেসামরিক বিহারি ভাইজানদের নিয়েও। আকৃতি-প্রকৃতিতে কঞ্চির মতো দেখালেও, পাকিস্তান ও ইসলাম রক্ষার সংগ্রামে পাকসেনাদের ছত্রছায়ায় তখন বিহারিরা হয়ে উঠেছিল পাকিস্তানি বউড়া বাঁশের চেয়েও বড়।

গত রাত পর্যন্ত আমরা ছিলাম কেরানীগঞ্জের শুভাড্যায়। আজ রাত কাটাচ্ছি ঢাকার নিউ পল্টনে, আমার এক প্রতিবেশীর পরিত্যক্ত রান্নাঘরে। আজকের ভোরটা শুরু হয়েছিল পাকসেনাদের দ্বিতীয় নির্বিচার গণহত্যা, জিঞ্জিরা অপারেশন দিয়ে। আমাদের আসন্ন ভোরটি কী দিয়ে, কেমনভাবে শুরু হবে, কে জানে? সকলের অগোচরে, অদৃশ্যলোকে একজন থাকলেও, দৃশ্যলোকে পাকসেনারাই তখন হয়ে উঠেছিল আমাদের জানমালের প্রকৃত মালিক। তারা যা চায়, তারা তাই করে, করতে পারে। তারা যা চায় তাই হয়, তাই হচ্ছে, তাই হবে।

একটি জনপদের নিরস্ত্র জনগণ যখন এ রকম একটি সশস্ত্র অপশক্তির উন্মত্ত রোষের কবলে পড়ে, তখন তার অসহায়তার আর সীমা-পরিসীমা থাকে না। তাদের হাত থেকে মুক্তিলাভের জন্য তখন সে তার চরম শত্রুর সঙ্গেও হাত মিলাতে কুণ্ঠা বোধ করে না। ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র আবাসভূমি হিসেবে পাকিস্তানের জন্ম হওয়ার পর থেকে, পাক-মার্কিন অক্ষশক্তির সঙ্গেই এ জনপদের মানুষের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। পাকিস্তানের জন্মশত্রু ভারতের সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েট ইউনিয়নের বিকাশমান বন্ধুত্বের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দ্রুত বিকশিত হচ্ছিল পাক-মার্কিন বন্ধুত্ব। পঁচিশ বছরের মাথায়, পাকিস্তানি সামরিক জান্তার সঙ্গে একটি মরণপণ যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার পরিপ্রেক্ষিতে, সেই অক্ষশক্তির সমর্থকরাও অনেকটা অনন্যোপায় হয়েই তাদের পছন্দের বিপরীতে অবস্থান নিয়ে, তাদের অপছন্দের অক্ষশক্তিটির মুখাপেক্ষী হয়ে উঠল। পুরনো বন্ধুত্বের আপাত অবসান ঘটিয়ে শুরু হলো একটি নববন্ধুত্বের নবযাত্রা। বন্ধু বদলের পরিবর্তিত আঞ্চলিক ও বিশ্বপ্রেক্ষাপটের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে একটু সময় তো লাগতেই পারে। সময় লাগছিলও বটে। বাইরে থেকে ততটা বোঝা না গেলেও, অনেকের সঙ্গে কথা বলে আমি তা বেশ টের পাচ্ছিলাম। দেখছিলাম, দুদিন আগেও যাঁরা ছিলেন কট্টর ভারতবিরোধী, তারা কী দ্রুত ভারতবন্ধুতে পরিণত হয়ে গেছেন। তাদের কণ্ঠে রুশ বিপ্লবের জয়গান। বুঝতে পারছিলাম, সাময়িকভাবে হলেও রুশ-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভারত অক্ষশক্তির ওপর আস্থা স্থাপন করা ছাড়া তাদের সামনে আপাতত আর কোনো বিকল্প নেই। এই অনতিক্রম্য জটিল পরিস্থিতিটি সৃষ্টি করার জন্য বঙ্গবন্ধুকে আকারে-ইঙ্গিতে কেউ কেউ দায়ীও করছিলেন। যদিও মুখ ফুটে জোর গলায় সে কথা বলার মতো সাহস তখন তাদের অনেকেরই ছিল না।

আগের দিন রাতে আকাশবাণী থেকে প্রচারিত সংবাদে শুনেছিলাম, ভারতের প্রধানমন্ত্রী মিসেস ইন্দিরা গান্ধী কর্তৃক লোকসভায় আনীত প্রস্তাবে পূর্ব বাংলার স্বাধিকার আন্দোলনের প্রতি ভারত সরকার ও তার জনগণের পক্ষ থেকে জোরাল সমর্থন জানানো হয়েছে। আজ আকাশবাণী থেকে প্রচারিত সংবাদে বলা হলো, পাক প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানকে সোভিয়েট প্রেসিডেন্ট নিকোলাই পোদগর্নি একটি খুব কড়া-চিঠি পাঠিয়েছেন। খবরটা শুনে আমার মনটা খুশিতে ভরে উঠল। ভারতের সঙ্গে সুর মিলিয়ে দুর্ধর্ষ পরাশক্তি সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েট ইউনিয়নও যখন আমাদের সাহায্যে এগিয়ে এসেছে, তখন আমার মনে আর কোনো সন্দেহ রইল না যে, বাংলাদেশের স্বাধীনতা অবশ্যম্ভাবী এবং তা এখন কেবলই সময়ের ব্যাপার মাত্র। আমাদের ইতিহাস এবং ভূগোল দুটোই আমাদের স্বাধীনতালাভের অনুকূলে। ফলে আমার অন্তরের গভীরে ক্রিয়াশীল ছিল আত্মবিশ্বাস ও আনন্দ। পক্ষান্তরে যারা যমদূত বা আজরাইলবেশে আমাদের তাড়িয়ে ফিরছিল, তাদের অন্তর ছিল অন্তহীন পাপে পূর্ণ এবং অনিবার্য পরাজয়ের আশংকায় ফাঁকা।

দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুললিত কণ্ঠে আকাশবাণী কলিকাতা থেকে প্রচারিত ইয়াহিয়ার কাছে সোভিয়েট ইউনিয়নের মহাপরাক্রমশালী প্রেসিডেন্ট পোদগর্নির লেখা সেই ঐতিহাসিক পত্রটি ছিল এ রকম :

> 'ঢাকায় আলোচনা ভেস্তে গেছে, সামরিক কর্তৃপক্ষ চরম ব্যবস্থা গ্রহণের পথ নিয়েছেন এবং পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনীকে নিয়োগ করেছেন, এই খবরে সোভিয়েট ইউনিয়নে গভীর উদ্বেগের সৃষ্টি হয়েছে। পাকিস্তানের যেসব মানুষ ঘটনার আবর্তনের শিকার হয়েছেন, দুর্ভোগ ও দুঃখকষ্টে ভুগছেন, তাদের জন্য সোভিয়েট জনগণ উদ্বিগ্ন না হয়ে পারে না। সাম্প্রতিক নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের সুস্পষ্ট সমর্থন প্রাপ্ত মিঃ শেখ মুজিবুর রহমান এবং অন্যান্য রাজনৈতিক নেতাদের গ্রেফতার ও নির্যাতন সোভিয়েট জনগণের মধ্যে গভীর উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে। পাকিস্তানি জনগণের এই সংকটের দিনে আমরা বন্ধু হিসেবে একটি কথা না বলে পারি না। আমরা নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করতাম এবং এখনও করি যে, পাকিস্তানে যে জটিল সমস্যা সম্প্রতি দেখা দিয়েছে– শক্তি প্রয়োগ না করে রাজনৈতিক পথেই তা সমাধান করা যেতে পারে এবং অবশ্যই তা করতে হবে। পূর্ব পাকিস্তানে নির্যাতন ও রক্তপাত অব্যাহত থাকলে নিঃসন্দেহে তাতে

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

> সমস্যাগুলোর সমাধান ব্যাহত হবে এবং সমগ্র পাকিস্তানি জনগণের গুরুত্বপূর্ণ স্বার্থের ক্ষতি হবে। মি. প্রেসিডেন্ট (ইয়াহিয়া খান) আমাদের জরুরি আবেদন, আপনি পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের ওপর নির্যাতন ও রক্তপাত বন্ধ করার আশু ব্যবস্থা নেবেন এবং শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক মীমাংসার ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।'

পোদগর্নির পত্রের ভাষা ও মর্মার্থ শুনে অত্যন্ত স্পষ্টভাবেই প্রতিভাত হলো যে, ভারতের লোকসভায় আগের দিন গৃহীত রাজনৈতিক প্রস্তাবটির সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই পোদগর্নির ঐ হুমকিপূর্ণ পত্রটি প্রণীত হয়েছে। যেমন ওল, তেমনি বাঘা তেঁতুল। এইবার আসিয়াছি রণে আসিয়াছো রণে, বাণে বাণে হবে পরিচয়। পোদগর্নির পত্রবাণে শুধু যে আমাদের মুক্তিযুদ্ধে নতুন প্রাণের সঞ্চার হলো তাই নয়, শেখ মুজিবের জীবনাশংকাও কিছুটা দূর হলো।

হৃদয়ের মতো মারাত্মক একটি আগ্নেয়াস্ত্র

আমাদের পরমায়ু বৃদ্ধি করে দিয়ে শেষ-পর্যন্ত আরও একটি ভোর হলো। গোলাগুলির শব্দে নয়, আজ আমাদের ঘুম ভাঙলো মোরগের ডাকে। চোখ মেলেই দেখি, একটি লাল-ঝুঁটিওলা তাগড়া মোরগ পায়ের চকচকে পাতাবাহারি পালক দুলিয়ে নির্ভয়ে আমাদের রান্নাঘরের ভিতরে হেঁটে বেড়াচ্ছে। কার মোরগ, কীভাবে এখানে এসেছে, জানি না। রাতে কি উনি এই ঘরের ভিতরে ছিলেন, নাকি দরোজার ফাঁক গলিয়ে ভোরের দিকে আমাদের রান্নাঘরের ভিতরে ঢুকেছেন, ঠিক বুঝতে পারলাম না। দুজন জলজ্যান্ত মানুষের উপস্থিতিকে আমলে না নিয়ে উনার সদম্ভ বিচরণ ও রান্নাঘরটির উপর দখলি-মনোভাব দেখে মনে হলো, আমাদের মতো উনি এখানে নবাগত নন। ঐ বাড়ির সঙ্গে তার অধিকার একেবারে দলিল-মূলে বাঁধা। মনে হয়, বাড়ির লোকজন বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যাবার সময় ঐ বীর-বাহাদুরকে ধরতে পারেনি। মোরগের সঙ্গে দৌড়াদৌড়ি করে সময় নষ্ট করার মতো সময় তখন অনেকেরই ছিল না। য পলায়তি স জীবতি।

মোরগটিকে আমাদের স্বাধীনতার পক্ষের মোরগ বলেই আমার মনে হলো। মনে হলো, আকাশ পুরোপুরি ফর্সা হওয়ার আগেই যে সে আমাদের ঘুম থেকে জাগিয়ে দিয়েছে, তার নিশ্চয়ই একটা কারণ আছে। হয়তো সে চাচ্ছে, আমি যেন বিহারিদের চোখে পড়ার আগেই এই এলাকা ছেড়ে পালাই। এলাকাটি আমার জন্য নিরাপদ নয়। শুনেছি ভাল-মন্দের দ্বন্দ্বের ভিতরে পশু-পাখিরা তাদের স্ব-স্ব সাধ্য অনুযায়ী ভাল মানুষের পক্ষে অবস্থান নেয়। মানুষের সঙ্গে বসবাস করার কারণে গৃহপালিত পশু-পাখিদের মধ্যে ঐ বিবেচনাবোধটি হয়তো আরও তীব্র হয়। এ-রকম নির্ভয়চিত্ত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মোরগ আমি খুব বেশি দেখিনি। একবার তো সে দৃপ্তভঙ্গিতে আমার বুকের উপর দিয়েই আমাকে ডিঙিয়ে গেল। আমি তার সুঠাম পদযুগল চেপে ধরতে চেয়েছিলাম, পারতামও, কিন্তু এই ভেবে ধরিনি যে উনি আমাদের পথের বিপদই শুধু বাড়াবেন। পাকসেনাতাড়িত বিপদগ্রস্ত বাঙালিদের এই অক্ষমতার কথা মোরগটিও বুঝে গিয়েছিল। পাকসেনা বা বিহারিদের প্রতি তার দৃষ্টিভঙ্গি কী, জানি না, তবে আমাদের নিয়ে ওঁর মনে যে বিন্দুমাত্র ভয় ছিল না– কিছুক্ষণের মধ্যে সে তা নানাভাবে আমাদের বুঝিয়ে দিয়েছে। জানি না, ঐ নির্ভয়চিত্ত মোরগটির পরিণতি কী হয়েছিল।

গতকাল ২ এপ্রিল নদীর ওপারে, শুভাড্যায় আমাদের ঘুম ভাঙিয়েছিল আমাদের আশ্রয়দাতার পুত্র রফিক। সময়মতো পালাতে পেরেছিলাম বলে কালকে কোনোক্রমে আমরা বেঁচে গিয়েছি, কিন্তু জিঞ্জিরা অপারেশনে পাকবাহিনীর গুলিবৃষ্টিতে প্রাণ হারিয়েছে রফিক। সেই থেকে রফিক আমার পিছু নিয়েছিল। মোরগটির দিকে তাকিয়ে রফিকের কথা আমার মনে পড়ল। আমার মনে হলো, রফিকের রুহ্ ঐ মোরগটির ভিতরে ঢুকেছে। তাই গতকালের মতো আজও মোরগ সেজে সেই রফিকই আমাদের ঘুম ভাঙাল।

হিন্দুরা বিশ্বাস করে যে, পঞ্চভূতে বিলীন হওয়ার আগে মৃতের আত্মা প্রাথমিকভাবে দাঁড়কাকের (পাঁতিকাক নয়) ভিতরে আশ্রয় গ্রহণ করে। তাই তারা মৃতের ক্ষুধার কথা বিবেচনা করে কাকবলি দেয়। বাংলা একাডেমী কর্তৃক প্রকাশিত, ড. মুহম্মদ এনামুল হক ও শিবপ্রসন্ন লাহিড়ী সম্পাদিত 'ব্যবহারিক বাংলা অভিধান' অনুসারে 'কাকবলি' হচ্ছে কাককে দেয় অন্নাদি, কাকের আহারের উদ্দেশ্যে উৎসৃষ্ট ভাত (অগ্রে দিয়া কাকবলি, সবান্ধবে কৌতূহলী, নতুন তণ্ডুল দেয় মুখে– ভারতচন্দ্র)। মৃতের সন্তান বা তার নিকটজনেরা কাকের উদ্দেশ্যে কলার বাকল দিয়ে তৈরি করা ডোঙায় দুধ-ভাত পরিবেশন করে বায়সকণ্ঠ নকল করে কো-কো, কো-কো করে দাঁড়কাককে ডাকে। ডাকে সাড়া দিয়ে যতক্ষণ না দাঁড়কাক এসে সেই খাদ্য গ্রহণ করবে, ততক্ষণ নিজেও সে খেতে পারে না। কাককে না খাইয়ে সে অন্নগ্রহণ করতে পারে না। এটি একটি প্রাচীন সনাতন-ধর্মীয় লোকাচার। বৈদিক মত নয়। তাই বাংলাদেশের ভিতরেও, অঞ্চলবিশেষে তার রকমফের দেখা যায়। চট্টগ্রাম অঞ্চলে শ্রাদ্ধক্রিয়া সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত কাকের পরিবর্তে কুকুরের উদ্দেশ্যে অন্ন পরিবেশন করা হয়। কুক্কুট বা কুক্কুটী সনাতন ধর্মাবলম্বীদের কোনো ধর্মকাজে লাগে বলে কখনও শুনিনি। কিছুকাল আগেও হিন্দুরা মুরগির মাংসকে হারাম বলেই ভাবত। কিন্তু ঐ ঘুম-ভাঙানিয়া গৃহপালিত প্রাণীটি আমার বড় প্রিয়। মুরগি আমার প্রায় নিত্যভোজ্য।

কত মানুষের, কতরকম দুর্দশার চিত্র আমার স্মৃতিকোষ থেকে মুছে গিয়েছে, কিন্তু ঐ সামান্য মোরগটির কথা আমি আজও ভুলতে পারিনি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমরা বেলাল বেগের বাসায় গেলে বেলাল বেগ বললেন, আমার বাসায় আপনারা আসবেন না। হোটেল থেকে নাস্তা করে আপনারা দ্রুত গুলিস্তানের দিকে চলে যান। ওখান থেকে বাস পাবেন। ঘন ঘন না হলেও মাঝে মাঝে সেখান থেকে কিছু বাস ছাড়ছে। ঢাকার মানুষজন ঐ পথেই ঢাকা থেকে বাইরে যাচ্ছে। আমরা তাঁকে আমাদের জন্য কিছু টাকা যোগাড় করে দেবার জন্য অনুরোধ করলাম। তিনি বললেন, ও কে। আপনারা গুলিস্তান সিনেমা হলের আশপাশে থাকবেন। আমার হাতে এই মুহূর্তে টাকা নেই। অফিসে গিয়ে টাকা জোগাড় করে আমি আপনাদের পৌঁছে দেব।

আজিমপুর বটতলার একটি ছোট্ট হোটেলে সকালের নাস্তা সেরে আমরা চললাম গুলিস্তানের উদ্দেশে। পায়ে হেঁটে। উদ্দেশ্য যতটা সম্ভব শহরটাকে প্রাণ ভরে দেখতে দেখতে যাওয়া। দীর্ঘদিনের চেনা পথ-ঘাট, বাড়ি-ঘর, অফিস-আদালত; আজিমপুর-পলাশীর মোড়, জহুর হল-এসএম হল ও জগন্নাথ হল দেখতে দেখতে আমরা এগিয়ে চলেছি গুলিস্তানের দিকে। আমাদের প্রাণপ্রিয় শহর ঢাকা। গত ক'বছর ধরে এই নগরী আমার আনন্দ-বেদনার নিত্যসহচর। সে আমার প্রতিদিনের আনন্দ-বেদনা, সুখ-দুঃখ, সংগ্রাম ও সঙ্গমের সাথী। আমি তার সঙ্গে অচ্ছেদ্য নাড়ীর বাঁধনে বাঁধা। ঢাকা তার বুকের উম দিয়ে আমাকে মায়ের মতো জড়িয়ে রেখেছিল। আজ তার সঙ্গে আমার বাঁধন ছিন্ন হবে। ঢাকার কথা ভেবে আমার খুব কান্না পেল। আবার কবে আমি আমার এই প্রিয় নগরীতে ফিরে আসতে পারব, কে জানে?

"এই ঢাকাতেই মুক্তি-সুখ, এই ঢাকাতেই ধিক-থু।
এর ধুলোতেই জন্ম আমার, এর ধুলোতেই মৃত্যু।"

নদীর ওপার থেকে ফিরে আসার পর রাস্তাঘাটে কোথাও পাকসেনাদের দেখিনি। আজ কার্জন হল পেরিয়ে হাইকোর্টের সামনে দিয়ে যাবার সময় আবারও কিছু পাকসেনার দেখা মিলল। রাস্তায় তখন বেশকিছু গাড়ি ও রিকসা চলছিল। পায়ে হাঁটা লোকজনও ছিল। ঢাকার অবস্থা ক্রমশ স্বাভাবিক হয়ে আসছে, বিদেশী সাংবাদিক ও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার তদন্তকারীর এইটে দেখানোর জন্য পাকসেনারা আগ্রহী ছিল বলে তারা তখন আর আগের মতো পথচারীদের তাড়া করছিল না।

২৫ মার্চের রাতে টিক্কা খান অপারেশন সার্চ লাইটের বর্বরতার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বেশকিছু সামরিক আইনবিধি জারি করেছিলেন। কালক্রমে সামরিক আইনবিধি ১১৭-১৩১ নামে সেগুলো আমাদের ইতিহাসের অংশে পরিণত হয়েছে। ঐ সব আইনবিধির মধ্যে একটি ছিল আগ্নেয়াস্ত্র-সম্পর্কিত সামরিক বিধান। বিধানটির নাম আইনবিধি ১২২। ঐ বিধিতে বলা হয় : 'কোনো ব্যক্তি কোনো ধরনের আগ্নেয়াস্ত্র রাখতে পারবে না। কূটনৈতিক স্টাফ ছাড়া অন্যদের নিকটতস্থ পুলিশ স্টেশনে আগ্নেয়াস্ত্র জমা দিতে হবে। এই নির্দেশ সেনাবাহিনীর জন্য প্রযোজ্য হবে না। লাইসেন্স পরীক্ষার পর মালিককে নিজ নিজ অস্ত্র ফেরত দেয়া হবে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সামরিক বিধিতে নিকটস্থ পুলিশ স্টেশনের কথা বলা হলেও, আগ্নেয়াস্ত্র সম্পর্কিত ঐ সামরিক ফরমানটি কার্যকর করার জন্য পাকসেনারাও তাঁবু ফেলেছিল ঢাকা হাইকোর্টের গেটমুখে। চেয়ার-টেবিল বিছিয়ে তারা সেখানে একটি অফিস পরিচালনা করছিল। তারা সেখানে অধীর আগ্রহে বসে অপেক্ষা করছিল ঢাকার নাগরিকদের আগ্নেয়াস্ত্র জমা নেবার জন্য। কিন্তু প্রাণের ভয়ে সেখানে কেউ আগ্নেয়াস্ত্র জমা দিতে যাচ্ছিল না। অনেকের আগ্নেয়াস্ত্রই তখন নিয়ে গিয়েছিল স্বাধীনতাকামী তরুণ ছেলেরা। কেউ-কেউ তাদের আগ্নেয়াস্ত্রগুলো পাকসেনাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য কাজে লাগবে ভেবে স্বেচ্ছায় মুক্তিযোদ্ধাদের বিলিয়েও দিয়েছিল। আর্মি ক্র্যাকডাউনের পরপরই তারা সবাই নগরী ছেড়ে পালিয়েছে। ফলে আগ্নেয়াস্ত্র গ্রহণ করার জন্য পাকসেনাদের বিছানো টেবিলগুলো ছিল শূন্য। আমরা কার্জন হলের ভিতর থেকে ঐ সেনাছাউনিটি দেখছিলাম। টেবিলের উপর হাত গুটিয়ে তীর্থের কাকের মতো আগ্নেয়াস্ত্রের প্রত্যাশায় বসে থাকা পাকসেনাদের দেখে আমার ভারি মায়া হলো। বেচারা!

তখন পর্যন্ত একটি আগ্নেয়াস্ত্রও টেবিলে জমা পড়েনি। একটি টেবিলের উপর দেখলাম– কিছু লাল ও হলুদ ফুল শোভা পাচ্ছে। দৃশ্যটাকে আমি কিছুতেই মিলাতে পারছিলাম না। ফুল কেন? বর্বর পাকসেনাদের সঙ্গে নিষ্পাপ ফুলের সম্পর্ক হলো কীভাবে? এটা তো হওয়ার কথা নয়। আমরা সবাই জানি, রসুলুল্লাহ্ ফুল ভালোবাসতেন। স্মর্তব্য : 'যদি পাও একটি পয়সা খাদ্য কিনিও ক্ষুধার লাগি/ যদি পাও দুইটি পয়সা ফুল কিনে নিও, হে অনুরাগী।' কিন্তু পাকসেনারা তো সেই পুষ্পঅনুরাগী রসুলের উম্মত নয়। জন্মসূত্রে তাঁর উম্মত হলেও, গত ক'দিনের কর্মসূত্রে ওরা তো তাঁর উম্মত হওয়ার যোগ্যতা হারিয়েছে। বুঝলাম, হাইকোর্টের ভিতরে আছে জনপ্রিয় কামেল পীর খাজা শরফুদ্দিনের মাজার। সেখানে তাঁর ভক্তদের ভিড় দিনরাত লেগে থাকে। পীরের ভক্তরা অনেকে ফুল কিনে ঐ মাজারে দেয়। তাই ফুলের চাহিদা মিটাতে হাইকোর্টের ভিতরে-বাইরে বেশকিছু ফুলের দোকান গড়ে উঠেছে। তাছাড়া ছোটো ছোটো গরিব ছেলেমেয়েরাও সেখানে দিনরাত ফুল বিক্রি করে। হারমাদ পাকসেনারা ঐসব ফুল বিক্রেতাদের কারও কাছ থেকে পয়সা দিয়ে ফুল কিনেছে বলে আমার মনে হলো না। কিন্তু ঐ দৃষ্টি কেড়ে নেয়া সুন্দর দৃশ্যটি আমার চোখে গেঁথে গেল।

ঢাকার নাগরিকদের কাছ থেকে 'আগ্নেয়াস্ত্র' উদ্ধারের পাক-প্রয়াসটিকে মাঠে মারা যেতে দেখে আমার খুব আনন্দ হলো। আমার মনের ভিতরে তখন একটি ছোট্ট কবিতার জন্ম হয়। দৌড়ের মধ্যে ছিলাম বলে, কবিতাটি তখন আমি লিখতে পারিনি। গ্রামের বাড়িতে ফিরে গিয়ে আমি ঐ কবিতাটি লিখি এবং কবিতাটির নাম রাখি— আগ্নেয়াস্ত্র।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আগ্নেয়াস্ত্র

পুলিশ স্টেশনে ভিড়, আগ্নেয়াস্ত্র জমা নিচ্ছে শহরের
সন্দিগ্ধ সৈনিক। সামরিক নির্দেশে ভীত মানুষের
শটগান, রাইফেল, পিস্তল এবং কার্তুজ, যেন দরগার
স্বীকৃত মানৎ; — টেবিলে ফুলের মতো মস্তানের হাত।
আমি শুধু সামরিক আদেশ অমান্য ক'রে হয়ে গেছি
কোমল বিদ্রোহী, প্রকাশ্যে ফিরছি ঘরে,
অথচ আমার সঙ্গে হৃদয়ের মতো মারাত্মক
একটি আগ্নেয়াস্ত্র,— আমি জমা দিইনি।

২৫ মার্চের রাতে পাকসেনাদের হাতে বঙ্গবন্ধুর গ্রেফতারবরণের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে একজন জাপান-প্রবাসী বাংলাদেশী শিক্ষার্থীর অভিমত।

Dear Goon Da
Sorry to take your time.

I want to share some words with you regarding your comment on the decision taken by Bangabandhu at the night of 25th March 1971. I totally agree with your view that it was the right decision taken by Bangabandhu to get arrested on that night. I want to differ about the reason of taking that decision by him, that you mentioned in the Shaptahik 2000, current issue.

For last many years I talk with my friends and near ones about this incidence and feel so proud of our father of the nation. It is very simple and clear decision, but hard to take by any leader. But Bangabandhu took that boldly and I should say he is the first person who took decision to sacrifice himself, before the crackdown started. If he would not take that decision at that time, what he could do? He could escape and only that single decision could make the total history of our freedom! different. That could turn the liberation war into separatist movement, that the East Pakistanis wanted that time.

Just compare the different historical events, Yasir Arafat could not establish any free state as he was in exile (not in jail of Israel), so the Palestinians are still on the streets, Provakaran could not establish any Tamil state as he is treated as separatist leader, Nelson Mendela could free his country people only because he was in Jail for 40 yrs. So I believe Bangabandhu took his decision to get arrested to make sure that the new country Bangladesh can be established without any controversy. Obviously that happened.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

I understand Bangabandhu had studied a lot about the previous historical events and found this way to be the best way to free the people. Obviously he took the risk of getting killed, even then independence was a must. So what was next scenario?

Bangladesh without Bangabandhu, yes, he was not looking to become the President or Prime Minister of Bangladesh, rather he wanted to make sure the people are free.

I will be happy if I just can understand that you find my idea to be wrong. I am a PhD student in Kanazawa University, Japan. I was born in 1969. I am a medical graduate, passed from Sylhet Osmani Medical College.

With regards
Sufi Ahammad

এবার শীতলক্ষ্যা পেরিয়ে

পঁচিশে মার্চের পর ঢাকা নগরীর বাণিজ্যিক প্রাণকেন্দ্র গুলিস্তান এলাকায় আমাদের যাওয়া হয়নি। ঢাকার এই এলাকাটা আমাদের খুব প্রিয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শরিফ মিয়ার ক্যান্টিন বা নিউ মার্কেটের মনিকো বা লিবার্টি ক্যাফে বন্ধ হয়ে যেত রাত নয়টার দিকে। কিন্তু আমাদের আড্ডার তখন মাত্র নবযৌবন দশা। সেই নবজাগ্রত আড্ডার তৃষ্ণা নিবারণের জন্য আমরা ছুটতাম পুরনো ঢাকার দিকে। গুলিস্তানের কাছাকাছি জিন্নাহ এভিনিউতে ছিল রেক্স রেস্টুরেন্ট ও গুলসিতান বার; একটু দূরে নবাবপুর রোডে ছিল হোটেল আরজু আর ক্যাপিটেল রেস্টুরেন্ট। সুস্থ দেহের জন্য ক্ষতিকর জেনেও কম পয়সার চল্লু বা চুলাই (চৌ এন লাই নহে) মদ পানে নেশা করতে যারা ভয় পেত না, তাদের জন্য সহজলভ্য ছিল ঠাঁঠারিবাজারের হাক্কা আর পরিত্যক্ত ফুলবাড়িয়া রেলস্টেশনের খোলা মাঠের আলো-আঁধারিতে অবৈধভাবে গড়ে ওঠা বাংলা মদের শুঁড়িখানা। আমাদের নৈশ-জীবনের কত রকমের কত মধুময় স্মৃতিই না ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে সেখানে। আমার সেই প্রিয় 'স্মৃতির শহর'কে (শামসুর রাহমানের একটি আত্মজৈবনিক গ্রন্থের নাম) ছেড়ে আজ আমি চলে যাচ্ছি। চলে যাব। আমার পা চলে না। পথের পিচের মধ্যে আমার অনিচ্ছুক পা আটকে যেতে চায়। রবীন্দ্রনাথের কবিতার ভাষায় মনে হয় সে আমাকে কানে কানে বলছে, যেতে নাহি দিব। যেতে নাহি দিব...। ঠিক তখনই কয়েকটা মিলিটারি ভ্যান আমাদের পাশ দিয়ে চলে যায়। আমি সম্বিত ফিরে পাই। আমরা দ্রুত গুলিস্তানের দিকে পা বাড়াই। সেখানে বেলাল বেগ আমাদের জন্য টাকা নিয়ে অপেক্ষা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করবেন। তাঁকে উৎকণ্ঠার মধ্যে দাঁড় করিয়ে রাখাটা অন্যায় হবে।

বর্তমান রাজউক (রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ) ভবনটি তখন পরিচিত ছিল ডিআইটি (ঢাকা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট) ভবন হিসেবে। ঐ ভবনের কপালে লাগানো বিরাটাকার ঘড়িটি ছিল আমাদের মতো ঘড়িহীন নগরবাসীর আকাশ-ঘড়ি। ১৯৬৪ সালে ওই ভবনের কয়েকটি কক্ষ ভাড়া নিয়ে পাকিস্তান টেলিভিশন যখন যাত্রা শুরু করে, তখন থেকে নিজস্ব পরিচয় হারিয়ে ডিআইটি ভবনটি ঢাকার লোকজনের কাছে টিভি-ভবন হিসেবেই বেশি পরিচিত হয়ে ওঠে। পাকিস্তান টিভিতে যারা কাজ করতেন তাঁদের মধ্যে বেশ ক'জন ছিলেন আমাদের মতো তুর্কি তরুণ কবি-সাহিত্যিকদের পৃষ্ঠপোষক। তাঁদের মধ্যে ছিলেন আতিকুল হক চৌধুরী, আবদুল্লাহ আল মামুন, শহীদ কাদরী, মোস্তাফিজুর রহমান, মোমিনুল হক, বেলাল বেগ, খালেদা ফাহমী, জিয়া আনসারী প্রমুখ। আমরা প্রোগ্রাম বাগানোর ধান্দায় প্রায়ই ওঁদের কাছে ধরনা দিতাম। একবার আমি মোস্তাফিজুর রহমানের জন্য বেশকিছু গান লিখে দিয়েছিলাম এবং নামী শিল্পীদের কণ্ঠে গীত হবার পর কিছু গান রমনা পার্কের মনোরম নৈসর্গিক পটভূমিতে চিত্রায়িতও হয়েছিল। টিভিতে ঐ গানগুলো প্রচারিত হয়েছিল কি না, তা মনে নেই।

দৈনিক পাকিস্তান, পূর্বদেশ, পাকিস্তান অবজারভার পত্রিকা অফিসের পাশাপাশি তখন পিটিভি-ভবনেও আমাদের আড্ডা জমত। আমাকে টিভি-ভবনের নেশাটা ধরিয়েছিল আমার নাট্যকার বন্ধু মামুনুর রশীদ। তার মাধ্যমেই পিটিভির ঐসব নামকরা প্রযোজকদের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। এক পর্যায়ে একটু নাক-উঁচু ঘরানার প্রযোজক হিসেবে পরিচিত মোমিনুল হক আমার একটি গল্প (আপন দলের মানুষ) পড়ে আমাকে গল্পটির নাট্যরূপ দিতে বলেন। তাঁর পরামর্শক্রমে আমি আমার গল্পটির নাট্যরূপ দেই। তিনি তাঁর দীর্ঘলালিত এন্টিহিরোর ধারণাটিকে কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করে দর্শক-প্রতিক্রিয়া উপভোগ করার জন্য একদিন ঐ নাটকে নায়কের চরিত্রে অভিনয় করার জন্য আমাকে অনুরোধ করেন। তাঁর প্রস্তাব শুনে আমি আকাশ থেকে পড়ি। বলি, আমি পারব না। তিনি বলেন, আমিও জানি আপনি পারবেন না। কিন্তু ওটাই আমি চাই। ঐ না পারাটাই আমার নাটক। তিনি বলেন, আপনি রাজি না হলে আমি কিন্তু ঐ নাটক করব না। তখন কিছুটা বাধ্য হয়ে, কিছুটা নায়ক হওয়ার লোভে, কিছুটা মোমিনুল হকের প্ররোচনায় আমি ঐ নাটকের নায়কের চরিত্রে অভিনয় করি। ঐ ঐতিহাসিক নাটকে হেলাল হাফিজকেও একটি ছোট্ট চরিত্রে অভিনয় করার সুযোগ দেয়া হয়, যাতে সেও অভিনয়সূত্রে নাটক থেকে কিছু টাকা পেতে পারে। একাত্তরের জানুয়ারি মাসের মাঝামাঝি সম্ভবত ১২ ফেব্রুয়ারি ঐ নাটকটি পিটিভি থেকে সরাসরি প্রচারিত হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঐ নাটকের নায়ক জঙ্গি ছাত্র-মিছিল থেকে পুলিশের হাতে গ্রেফতার হয়েছিল। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খানের সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে রুদ্ররোষে ফুঁসে ওঠা বাংলাদেশের ছাত্র-জনতার বিদ্রোহের কিছুটা ঝলক যদি কোনো নাটকে প্রচারিত হয়ে থাকে, তাহলে বলতে দ্বিধা নেই যে, তা একমাত্র ঐ নাটকটিতেই ছিল। মোমিনুল হক শুধু যে আমাকে এন্টি-হিরো বানিয়েই সাহসের পরিচয় দিয়েছিলেন তা নয়, পিটিভির কোনো নাটকে ঢাকার রাজপথের সরকারবিরোধী মিছিলের ভিডিও ফুটেজ ব্যবহার করেও তিনি একটি অনন্য সাহসের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন।

অল্পদিনের ব্যবধানে পঁচিশে মার্চ কার্যকর না হলে, ঐ নাটকের প্রভাব পিটিভির পরবর্তী নাটকগুলোতেও নিশ্চয়ই পড়ত। আমার খুব ইচ্ছে হচ্ছিল, ঢাকা ছেড়ে যাবার আগে একবার মোমিন ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করি। তাঁকে একটু দেখে যাই। আবার কবে দেখা হবে কে জানে? কিন্তু বেলাল বেগের কড়া নির্দেশ, ডোন্ট ট্রাই টু ডু দ্যাট। দেয়ার বাই ইউ অনলি ইনভাইট ট্রাবল ফর হিম।

গুলিস্তানের কাছে পৌঁছে দেখি, বেলাল বেগ গুলিস্তানের সামনের ফুটপাথে ঠোঁট কামড়ে বিমর্ষ মুখে পায়চারি করছেন। আমরা তাঁর কাছে গেলাম। তিনি দ্রুত আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে এমনভাবে আমার হাতে কিছু টাকা গুঁজে দিলেন যাতে আশপাশের কেউ ব্যাপারটা আঁচ করতে না পারে। মোমিনুল ভাইয়ের কথা জিজ্ঞেস করার আগেই তিনি বললেন, আমি আপনাদের সব কথা তাঁকে বলেছি। আপনারা বেঁচে আছেন শুনে তিনি খুব খুশি হয়েছেন। আমার কাছে তো টাকা ছিল না। থাকলে তো সকালেই আপনাদের দিয়ে দিতাম। এটি তাঁরই টাকা।

বেলাল বেগ দ্রুত দৃশ্যপট থেকে নিজেকে ভিড়ের মধ্যে সরিয়ে নিলেন। টিভির মতো সেনসেটিভ একটা গণমাধ্যমে তিনি কাজ করেন, পাকিস্তানি গোয়েন্দাদের নজরে পড়লে তাঁর চাকরি শুধু নয়, প্রাণও যাবে। আমরা তাঁর গমনপথের দিকে তাকিয়ে থাকলাম। কিছুটা দূরে গিয়ে তিনি পেছন ফিরে তাকালেন। আমাদের দূর থেকে দেখলেন। আমার বক্ষসমুদ্রের তল থেকে কান্না দলা পাকিয়ে গলা বেয়ে উপরের দিকে উঠে আসতে চাইল। মনে হলো, আমার গলাটা ব্যথা করছে। পাকসেনাদের বর্বরতা দেখে দেখে মানুষ ও স্রষ্টার ওপর যখন বিশ্বাস হারাতে বসেছিলাম, তখন বেলাল বেগ আর মোমিনুল হকের মতো মানুষরা আমার ভুল ভাঙিয়ে দিয়ে যেন আমাকে ঐ পুরনো কথাটাই নতুন করে বুঝিয়ে দিলেন যে, মানুষের ওপর বিশ্বাস হারানো পাপ। পাকসেনারাই শেষ কথা নয়। শেষ সত্য নয়। আরও কথা আছে। আরও সত্য আছে।

ঢাকা ছেড়ে যাবার ব্যাপারে হেলাল যে কিছুটা দ্বিধার মধ্যে আছে, তা আমি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বুঝতে পারছিলাম। ঐ দ্বিধা থাকাটাই স্বাভাবিক। ওর বড় ভাই দুলাল হাফিজ সরকারি চাকুরে। তাঁর সঙ্গে দেখা না করে হেলালের পক্ষে একা ঢাকা ত্যাগ করার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়াটা ঠিক হবে না। বললাম, তুমি চিন্তা কর না, আমি তোমার আব্বার সঙ্গে দেখা করে তোমার কুশল সংবাদ তাঁকে জানাব। তুমি বরং তোমার বড় ভাইয়ের সন্ধানে যাও। হেলাল বলল, তাই যাই। আমি বড় ভাইকে খুঁজে বের করে, তারপর সিদ্ধান্ত নেব।

আমি বললাম, 'তাই ভাল হবে। তুমি কিছু টাকা রাখ।' বলে আমি হাতের মুঠো খুলে টাকাটা গুনলাম। দেখলাম আশি টাকা। হেলাল বলল, আমি তো ভাইয়ের কাছ থেকে টাকা নিতে পারব। আপনি টাকাটা নিয়ে যান। আমাকে দশ টাকা দেন। আমি দশের পরিবর্তে ওকে বিশ টাকা দিলাম। আমিও তো গ্রামে ফিরে যাচ্ছি। বেশি টাকা দিয়ে আমিই বা কী করব? তারপর এল চোখের জলে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার সেই অনতিক্রম্য মুহূর্তটি। গুলিস্তান আমাদের দু'জনের অশ্রুসজল বিদায়ের মুহূর্তটির সাক্ষী হয়ে থাকল। তখনও আমার চোখে জল ছিল।

আমি গভর্নর হাউজের সামনের বিআরটিসির বাস ডিপোটির উদ্দেশ্যে এগিয়ে গেলাম। জানতাম, ডিপোর ভিতর থেকে সরকারি বাসগুলো ছাড়লেও ডিপোর বাইরে থেকে লোকাল বাসগুলো শহরে ও শহরের আশপাশের বিভিন্ন গন্তব্যে ছেড়ে যায়। সেখান থেকে ডেমরার বাস ছাড়ার কথা। আপাতত আমার গন্তব্য হলো ডেমরা। শীতলক্ষ্যা নদীর তীর। আমার ঢাকা ত্যাগের নীল-নকশাটি হচ্ছে এ রকম : সম্ভব হলে আমি বাসে করে ডেমরা পর্যন্ত যাব। বাসে না পারলে, কিছুটা পথ রিকশায় যাব, কিছুটা পায়ে হেঁটে। ডেমরায় গিয়ে শীতলক্ষ্যা নদী পেরিয়ে নরসিংদী-কিশোরগঞ্জ হয়ে যাব নেত্রকোনায়। নেত্রকোনা থেকে বারহাট্টা।

২৭ মার্চ আমি ঢাকা থেকে পালিয়ে গিয়েছিলাম বুড়িগঙ্গা নদীর ওপারে কেরানীগঞ্জের জিঞ্জিরা-শুভাড্যায়। আজ ৩ এপ্রিল। আজ আমি যাচ্ছি শীতলক্ষ্যার ওপারে। দেখি, শীতলক্ষ্যার শীতল জলের স্পর্শে আমার প্রাণ শীতল হয় কি না।

গতকাল নজরুল চলে গেছে। নজরুল চলে যাবার পর আমার সঙ্গী ছিল হেলাল। আজ হেলালের সঙ্গ থেকেও আমি বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলাম। হেলাল চলে যাবার পর প্রথমবারের মতো আমার মনে হলো এই নগরীতে আমি একা। খুব একা। এই বিপন্ন-বিমুখ নগরীতে এমন একা, এমন নিঃসঙ্গ আমি আর কখনও হইনি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নদীপথে : আমাদের ইতিহাস

১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দের ১লা বৈশাখ। খুব হাস্যকর শোনাচ্ছে কি তারিখটা? হাস্যকর শোনালেও বিষয়টা কিন্তু মিথ্যে নয়। আমরা এভাবে কখনও তারিখ লিখি না বটে, কিন্তু এ রকম করে ভাবি। আমরা এভাবেই ইংরেজি বাংলা মিলিয়ে আমাদের প্রয়োজনীয় সন-তারিখগুলো মনে রাখি। ইংরেজি সনের সঙ্গে সাত যোগ করলে আমরা বাংলা সনটা পেয়ে যাই; আবার বাংলা সন থেকে সাত বিয়োগ করে ইংরেজি সনটাকে শনাক্ত করি। ইংরেজ-শাসনের অবসান হলেও আমাদের জীবন থেকে ইংরেজি-কালচারের অবসান তো হয়নি। বাংলা ভাষা ও বাঙালি-সংস্কৃতিভিত্তিক একটি প্রগতিশীল সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য আমরা বারবার রক্ত দিয়েছি। কিন্তু বাংলা ভাষা বা বাংলা পঞ্জিকাকে আমাদের রাষ্ট্রজীবনে আমরা আজও প্রতিষ্ঠিত করতে পারিনি। বাংলা সনের প্রথম দিন, পয়লা বৈশাখকে আমরা খুব সাড়ম্বরে পালন করি। কিন্তু পয়লা বৈশাখের পরের দিন থেকে আমরা আর বাংলা পঞ্জিকার দিকে ফিরেও তাকাই না। পয়লা বৈশাখের পরের দিনটি, আমি নিশ্চিত জানি, অনেকেই বলবেন ১৫ এপ্রিল। ২রা বৈশাখ, ৩রা বৈশাখ আমাদের ব্যবহারিক জীবনে প্রায় অনুপস্থিত বললেই চলে। রবীন্দ্রনাথ সারাজীবন বাংলা তারিখকে প্রাধান্য দিয়ে গেছেন। তাঁর রচিত কবিতা বা চিঠিপত্রে রচনাকাল হিসেবে বাংলা তারিখই দেখতে পাই। কিন্তু রবীন্দ্র-পরবর্তী কবি-সাহিত্যিকদের রচনায় সেই ধারাটি আর রক্ষিত হয়নি। আমি নিজেও পয়লা বৈশাখে যখন কাউকে অটোগ্রাফ দেই তখন আমি বাংলা তারিখটিই লিখি, কিন্তু কিছুদিন পরের বাংলা তারিখ আর আমারও স্মরণে থাকে না।

সেজন্যই আমি যে শুরুতে ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দের ১লা বৈশাখ তারিখটির প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি, তাতে শহুরে শিক্ষিত সমাজের কারও হাসবার কারণ আছে বলে মনে করি না। বরং এভাবে বললে তাদের সুবিধেই হয়। কেননা পয়লা বৈশাখ খুব সাড়ম্বরে পালন করলেও বছরের বাকি ৩৬৪ দিনে তো তারা ইংরেজি দিনপঞ্জিই অনুসরণ করেন। অন্যকে কী বলব? আমি নিজেই করি।

শুরুতে ১৯৬৯ খ্রিস্টাব্দের 'পয়লা বৈশাখ'-এর কথা মনে পড়ল এজন্যই যে, ঐদিন ভোরে ঢাকার নিকটবর্তী শীতলক্ষ্যা নদী-তীরের কিছু এলাকাজুড়ে একটি প্রলয়ঙ্করী টর্নেডো আঘাত হেনেছিল। ঐ টর্নেডোর ছোবলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল ডেমরার শিল্পাঞ্চল। বেশকিছু বাড়ি-ঘর, দোকানপাট ও শিল্পকারখানা টর্নেডোর প্রলয় বাতাসে সেদিন উড়ে গিয়েছিল। বেশকিছু মানুষও মারা গিয়েছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ডেমরার বাওয়ানী জুট মিলের নিকটবর্তী সোনা মসজিদের ইমাম সাহেব ধসেপড়া মসজিদের টিনের নিচে চাপা পড়ে মারা গিয়েছিলেন। তাঁর মস্তক দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। রমনা পার্কের বটমূলের ছায়ানটের বর্ষবরণ অনুষ্ঠানে অংশ না নিয়ে ঢাকা থেকে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন, সাংস্কৃতিক সংগঠন ও রাজনৈতিক সংগঠনের কর্মীরা সেদিন ছুটে গিয়েছিল শীতলক্ষ্যার তীরে, ঘূর্ণিঝড়-বিধ্বস্ত ডেমরা এলাকার বিপন্ন মানুষের মধ্যে। আমিও গিয়েছিলাম। মাত্র কয়েক সেকেন্ড স্থায়ী একটি টর্নেডো মানুষের জন্য কত বড় ধরনের প্রলয় নিয়ে আসতে পারে, আমি ডেমরায় তা দেখেছিলাম। প্রকৃতির খামখেয়ালির কাছে মানুষ নামক প্রাণটি যে কী অসহায়, টর্নেডোবিধ্বস্ত জনপদের দিকে তাকিয়ে সেকথাই আমার বার বার মনে পড়েছিল। সেদিন শীতলক্ষ্যার জলে ভেসে যাচ্ছিল উড়ে-যাওয়া ঘরের টিনের চালা, গাছের ডালপালা ও মানুষের লাশ।

সেখান থেকে ফিরে এসে আমি লিখেছিলাম—'একটি গৃহিণী গ্রাম, গ্রামবাসী' কবিতাটি। কবিতাটি আমার প্রথম কাব্যগ্রন্থ প্রেমাংশুর রক্ত চাই-এ ঠাঁই পেয়েছে। আগ্রহী পাঠক কবিতাটি পড়তে পারেন। ডেমরার ওপর রচিত ঐ কবিতাটি প্রকাশিত হয়েছিল পূর্ব পাকিস্তান লেখক সংঘের মাসিক সাহিত্যপত্র 'পরিক্রম'-এ। কবি হাসান হাফিজুর রহমান ও প্রফেসর সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী ঐ সাহিত্যপত্রটি সম্পাদনা করতেন। মনে পড়ে হাসান ভাই আমার কবিতাটি খুব পছন্দ করেছিলেন এবং তাঁর আগ্রহেই কবিতাটি 'পরিক্রম'-এ ছাপা হয়। পরে কবিতাটি যখন আমার প্রথম কাব্যগ্রন্থে গ্রহণ করি তখন কবিতাটির দু'টো স্তবক কীভাবে যেন বাদ পড়ে যায়। আমি নিজেই কি সচেতনভাবে ঐ স্তবক দু'টি বাদ দিয়েছিলাম? মনে করতে পারছি না। বাদ দেবার কোনো সঙ্গত কারণও খুঁজে পাচ্ছি না।

তখন খুব এলোমেলো জীবনযাপন করতাম আমি। করতাম মানে, করতে বাধ্য ছিলাম। তখন আমার কোনো চাকরি ছিল না। আমার থাকার কোনো নির্দিষ্ট ঠিকানা ছিল না। ভেসে বেড়াচ্ছিলাম। এক একদিন একেক জায়গায় আমাকে থাকতে হতো। এ রকম অবস্থায় কবিতার পাণ্ডুলিপি সযত্নে রক্ষা করাটা বেশ কঠিন ছিল। আমার কিছু কবিতা তখন হারিয়েও গিয়েছে। হতে পারে যে, বর্জিত স্তবক দু'টি হয়তো পরে কবিতার সঙ্গে যুক্ত করব ভেবে ভিন্ন কাগজে লিখেছিলাম। কবিতাটি পরিক্রমে দেয়ার সময় ঐ স্তবক দু'টি পাইনি। প্রকাশের পর কোথাও খুঁজে পেয়েছিলাম। ঐ বর্জিত স্তবক দু'টি পরে কোনো একটি লিটল ম্যাগে প্রকাশিত হয়। ১৯৯৬ সালে প্রকাশিত আমার 'প্রিয় নারী, হারানো কবিতা' কাব্যগ্রন্থে ঐ বর্জিত স্তবক দু'টি আছে। 'প্রিয় নারী, হারানো কবিতা' গ্রন্থের কবিতাগুলো বাংলাদেশের স্বাধীনতা পূর্বকালে প্রকাশিত বিভিন্ন লিটল ম্যাগাজিনে ও একুশের সংকলনে ছড়িয়েছিটিয়ে ছিল। আমার আত্মজীবনী 'আমার কণ্ঠস্বর'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রচনার জন্য বাংলা একাডেমীর সংগ্রহশালায় কাজ করতে গিয়ে একাডেমীতে সংরক্ষিত বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকা, সাপ্তাহিক পত্রিকা, লিটল ম্যাগাজিন ও একুশের সংকলন ঘেঁটে আমি আমার বেশকিছু অগ্রন্থিত কবিতার সন্ধান পাই। প্রেমাংশুর রক্ত চাই কাব্যগ্রন্থে গৃহীত মূল কবিতাটিতে বাওয়ানী জুট মিলের উল্লেখ থাকলেও ডেমরার উল্লেখ নেই। কিন্তু ঐ কবিতার পরিত্যক্ত স্তবক দু'টিতেই ডেমরার উল্লেখ আছে। ডেমরা যাওয়ার পথে সে কথা মনে পড়ল।

একটি গৃহিণী গ্রাম, গ্রামবাসী

পরিত্যক্ত অংশ

ডেমরা যেন ডোমের ঘর
পরিত্যক্ত শূকরবিহীন ফাঁকা,
হাজার চোখের এক নদী ঢেউ–
বিধুর ব্যথার অশ্রুজলে মাখা।
ডেমরা যেন ছিচকাঁদুনে মেয়ে
সকাল-বিকাল ডুকরে ওঠে কেঁদে,
প্রেতলোকের শক্র ফাঁদে
বিস্মরণের ভয়াল নির্বেদে।

(প্রকাশকাল ১৯৬৯)

অনেক দিন পর আমি আজ আবার সেই ডেমরায় যাচ্ছি। ১৯৬৯ সালের পয়লা বৈশাখ গিয়েছিলাম সেদিনকার টর্নেডোবিধ্বস্ত ডেমরার মানুষের মধ্যে ত্রাণ বিতরণের কাজে অংশ নিতে। সেদিন ঢাকার মানুষ দল বেঁধে ছুটে গিয়েছিল ডেমরায়। আমার সঙ্গে ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক বন্ধু।

পাকসেনাদের হাত থেকে জীবন বাঁচাতে আজ ডেমরা যাচ্ছি ঢাকা থেকে নিষ্ক্রমণের পথসন্ধানে। আজ আমি একা। ডেমরা, আমাকে রক্ষা করো, বোন। আমি তো তোমাকে নিয়ে কবিতা লিখেছি। তোমার কবিকে রক্ষা করাটা তোমার কর্তব্য।

ডেমরাগামী বাসের জন্য আমাকে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না। বুড়িগঙ্গার ওপার থেকে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে আসা ঢাকার লোকজন এবার ডেমরা দিয়ে শীতলক্ষ্যার ওপারে পালাচ্ছিল বলে বাসস্টপে যাত্রীদের বেশ ভিড় ছিল। বাসগুলোও দ্রুত ভরে যাচ্ছিল যাত্রীতে। আমি একটা লক্কড় মার্কা বাসে ঢুকে সিটে বসার সুযোগও পেয়ে গেলাম। চলন্ত বাসের ভিতরে বসে আমি ডেমরার ছবিটা চোখে আনতে চেষ্টা করলাম। এই পথে আমি আগে কখনও কোথাও যাইনি। শীতলক্ষ্যা নদী পেরিয়ে ঐ পথে যে নরসিংদী-কিশোরগঞ্জ হয়ে নেত্রকোনায় যাওয়া যায়, তা আমার জানাই ছিল না। পাকবাহিনীর তাড়া না

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খেলে ঐ পথের সন্ধান হয়তো আমি কখনই পেতাম না। পাকসেনাদের অত্যাচারের একটা সুফল ছিল এই যে, বাংলাদেশের মানচিত্র-উদাসীন মানুষ একাত্তরে দেশটাকে কিছুটা হলেও চিনেছিল।

পাকসেনাদের ধন্যবাদ যে, বুড়িগঙ্গা নদীলব্ধ অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে তারা শীতলক্ষ্যা নদীতে গানবোটের পাহারা বসায়নি। ডেমরায় শীতলক্ষ্যা নদীর ওপর যে ফেরিঘাটটি আছে, সেটি যদি ওরা বন্ধ করে দিত, বা সেখানে যদি পাকসেনারা পাহারায় থাকত– তাহলে আমাদের পক্ষে ঐ পথে ঢাকা ছাড়ার সাহসই হতো না। তারপরও ভয় ছিল, হঠাৎ যদি পাকসেনারা ঐ পথটা বন্ধ করে দেয়। বাস থেকে নেমে যদি আমরা ওদের সামনে পড়ে যাই? যদি ফেস টু ফেস উইথ ম্যান ইটিং টাইগারের অবস্থা হয়?

কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের লক্কড়মার্কা (ভারতীয় জিনিসপত্রের বিরুদ্ধে জনরোষ তৈরি করতে মওলানা ভাসানী এই শব্দটিকে খুব জনপ্রিয় করেছিলেন) বাসটি এসে থামল একেবারে ডেমরা ফেরিঘাটের গা ঘেঁষে।

আমি যখন ডেমরায় পৌঁছলাম তখন দুপুর। আমার 'হুলিয়া' কবিতায় বর্ণিত মধুময় চৈত্রের উত্তপ্ত দুপুরটির মতো। চতুর্দিকে চিক চিক করছে রোদ, শোঁ শোঁ করছে হাওয়া। কিন্তু অনেক বদলে গেছে ডেমরা, তা বলা যাবে না। বছর দুয়েক আগে ডেমরাকে যেমন দেখে গিয়েছিলাম, মনে হলো ডেমরা অনেকটা সে রকমই আছে। 'ছিঁচকাঁদুনে মেয়ে' ডেমরার চোখের গোপন অশ্রুধারা নিয়ে বয়ে চলেছে শীতলক্ষ্যা নদী। কী চমৎকার নাম নদীটির। আমাদের পূর্বপুরুষরা যে কবি ছিলেন, বাংলাদেশের নদী ও গ্রামের নামকরণ থেকে তা আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি।

AMARBOI.COM

নদীর এপারের হোটেলগুলোতে ক্ষুধার্ত মানুষজনের ভিড়। সবাই দ্রুত কিছু খাদ্য পেটে পুরে নিচ্ছে। ক্ষুধার্ত হলেও তাদের মধ্যে খাওয়ার তাড়াটা যেন মুখ্য নয়, নদীর ওপারে যাবার তাড়াটাই বেশি। ওপার থেকে এপারে মানুষজন আসছে না খুব একটা। শীতলক্ষ্যার ওপারে যাত্রীদের নামিয়ে দিয়ে ফেরিগুলো যখন এপারে ফিরছে, তখন দেখছি সেগুলো অনেকটাই ফাঁকা।

আমি 'যা থাকে কপালে' বলে একটি নামগোত্রহীন হোটেলে ঢুকলাম। তারপর শীতলক্ষ্যা নদীর তাজা গুলসা মাছের গরম ঝোল ও গরম ভাত দিয়ে অনেকদিন পর পেট ভরে খেলাম। বেলাল বেগ ভাইয়ের (তিনি আমার চেয়ে পাঁচ বছরের বড়) হাত দিয়ে পাঠানো মোমিনুল হক ভাইয়ের টাকাটা আমাকে পেট পুরে মাছ-ভাত খেতে খুব অনুপ্রাণিত করল। আবার কখন খাওয়ার সুযোগ হবে কে জানে? শুধু পকেটে টাকা থাকলে তো হবে না, খাওয়ার মতো হোটেলও তো থাকতে হবে। পেট পুরে ভাত খাওয়ার পর এক প্যাক ক্যাপস্টান সিগারেটও কিনলাম। সিগারেটে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অগ্নিসংযোগ করার সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটিশ টোব্যাকো কোম্পানির প্রাণ মাতানো সুগন্ধে এলাকাটা মৌ মৌ করে উঠল। মনে মনে বললাম, আহ্ কী চমৎকার এই মনুষ্যজীবন। বুদ্ধদেব বসু বলেছেন, তিনি দুপুরের ভাত খান, ভাত খাওয়ার আনন্দ লাভের জন্য নয়, খাওয়ার পর সিগারেট খাওয়ার আনন্দটাকে প্রাণভরে উপভোগ করার জন্য। বুদ্ধদেব বসুর কথাটার যথার্থতা উপলব্ধি করলাম প্রতি টানে। মনে মনে স্থির করলাম, যদি কখনও পাকসেনাদের হাতে ধরা পড়ি, যদি ওরা আমার শেষ ইচ্ছা জানতে চায়, তাহলে আমি তাদের কাছে এক থালা গরম ভাত, কৈ বা মাগুর মাছের গরম ঝোল, এক বাটি মসুরের ডাল ও সব শেষে একটা সিগারেট খাওয়ার অনুমতি চাইব। গরম ভাত, মাছের ঝোল, মসুরের ডাল ও সিগারেট– এই চারটির মধ্যে যদি তারা আমাকে কোনো একটিকে বেছে নিতে বলে, তাহলে আমি চাইব সিগারেট। হ্যাঁ, তখন সিগারেট আমার কাছে এতটাই প্রিয় ছিল। পাঠক নিশ্চয়ই ভুলে যাননি যে, ২৭ মার্চ দুপুরে ঢাকা থেকে বুড়িগঙ্গার ওপারে পালিয়ে যাবার আগে আমি আজিমপুরের চায়না বিল্ডিংয়ের সামনের একটি দোকান থেকে আড়াই টাকা দিয়ে এক প্যাকেট থ্রি ক্যাসেল সিগারেট কিনেছিলাম। তখন আমার পকেটে দশ-বারো টাকার বেশি ছিল না।

সিগারেটে সুখ টান দিয়ে, জ্বলন্ত সিগারেটের শেষ অংশটাকে মাটিতে ফেলে পায়ের স্যান্ডল দিয়ে মাড়িয়ে নিভিয়ে দিয়ে যখন ফেরিতে উঠব বলে মন স্থির করেছি, তখন হঠাৎ দেখি সাইফুল আমার দিকে এগিয়ে আসছে। সাইফুল পিপল পত্রিকায় আমার সহকর্মী। আমার মতোই সাইফুলও পিপলের সাব-এডিটর। অনেকটা সময় একা কাটানোর পর পথে সাইফুলকে পেয়ে আমি তাকে আনন্দে সর্বশক্তি দিয়ে আমার বুকে জড়িয়ে ধরলাম। ছাড়ো ছাড়ো বলে চিৎকার করলেও আমি সাইফুলকে সহজে ছাড়লাম না। বললাম, একদম কোনো কথা বলবা না, আমাকে আমাদের বেঁচে থাকাটা এনজয় করতে দাও।

AMARBOI.COM

আমাদের কাণ্ড দেখে লোকজন খুব মজা পেল। তারা আমাদের চারদিক থেকে ঘিরে ধরল। যারা আমাদের দেখে খুব মজা পাচ্ছিল, তাদের মধ্যে সাইফুলের বোন, ভগ্নিপতি ও ওর বোনের দুটো তুলতুলে ভাগনিও ছিল। ওদের আমি আগে থেকেই চিনতাম। সাইফুল আমাকে একদিন ওদের পলাশীর বাসায় নিয়ে গিয়েছিল। ওরা থাকত বিটিপি হাউসে। সাইফুলের ভগ্নিপতি কী একটা বিদেশী ফার্মে কাজ করেন। চমৎকার সুদর্শন মানুষ। সাইফুলের বোনটিও ভারি সুন্দরী। ওদের বাচ্চা দু'টিও তাদের বাবা-মাকে অনুকরণ করেই জন্মেছে।

যে ট্রাকটা ফেরীতে উঠানো হচ্ছিল, সাইফুল বলল, ওটা আমরাই ঢাকা থেকে ভাড়া করে নিয়ে এসেছি। ঐ ট্রাক দিয়েই আমরা নরসিংদী হয়ে কিশোরগঞ্জ যাব। তুমিও আমাদের সঙ্গে চল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এ যেন মেঘ না চাইতেই বৃষ্টি। আমার একাকিত্ব কোথায় হাওয়া হয়ে গেল। নদী পার হওয়ার পর কীভাবে নরসিংদী পর্যন্ত যাব, ভেবে পাচ্ছিলাম না, তখন আকাশ থেকে শ্রীকৃষ্ণ যেন আমার জন্য সারথীসহ স্বর্গের রথ পাঠালেন। আনন্দে আমার চোখে জল এসে গেল। ভাবলাম, আমি যদি ডেমরার স্মৃতির টানে কালক্ষেপণ না করে আগের ফেরিটিতে নদী পেরিয়ে যেতাম, তাহলে সাইফুলের সঙ্গে আমার দেখাই হতো না। মনে হলো ডেমরা তার স্মৃতিকাব্যে আটকে রেখে সাইফুলের সঙ্গে খুব কায়দা করে আমাকে মিলিয়ে দিয়েছে। এখন আর আমার মনে যাত্রাপথের কোনো ভয় নেই। কিশোরগঞ্জ পর্যন্ত নির্বিঘ্নে ওদের সঙ্গে চলে যাওয়া যাবে।

সাইফুলের বড় ভাগনিটির বয়স তখন পাঁচ ছয় হবে। ছোটটি তখনও মায়ের কোলে। আমি বড়টিকে আমার কাঁধে তুলে নিয়ে ফেরিতে উঠলাম। আগে থেকেই আমাকে চিনত বলে মেয়েটি আমার কাঁধে চড়তে একটুও আপত্তি করল না। বরং ব্যাপারটাতে সে খুব মজা পেল। মনে হলো কারও কাঁধে চড়তে পারায় মজা পাওয়াটা মেয়েদের বেলায় হয়তো কিছুটা মজ্জাগতই হবে।

ওর মা অবশ্য মেয়েকে বলল—'মামাকে কষ্ট দিচ্ছ, দুষ্টু মেয়ে। উনার কাঁধ থেকে নামো।' কিন্তু মেয়েটি তার মায়ের কথা শুনবে তো।

আমাদের ট্রাকটি ছাড়াও আরও কিছু গাড়ি ও ট্রাক উঠানো হলো ঐ ফেরিতে। ফেরিতে উঠে সে আমার কাঁধ থেকে নামল। নামল আমার স্কন্ধের চেয়ে বেশি আকর্ষণীয় শীতলক্ষ্যার জলটা আসলেই শীতল কিনা, তা নিজের হাতে ছুঁয়ে পরখ করে দেখতে। আমাদের নিয়ে ফেরিটি চলতে শুরু করল ওপারের উদ্দেশে।

AMARBOI.COM

'আমাদের কাছে কোনো কেয়াপাতা ছিল না।
আমরা ভালোবাসার নৌকা ভাসিয়েছিলাম নদীতে।
হাওয়ার টানে ভাসতে-ভাসতে, ঢেউয়ের দোলায়
দুলতে-দুলতে বুড়িগঙ্গা থেকে শীতলক্ষ্যা—;
শীতলক্ষ্যা থেকে পদ্মা-মেঘনা হয়ে
সে ছুটে গিয়েছিল নদীর চূড়ান্ত লক্ষ্য, সমুদ্রে।

ভদ্রে, তোমার কি মনে পড়ে না সেই
ভেঁপুর আওয়াজে বধির রাত্রিগুলো?
দেখতে দেখতে সময় গিয়েছে চলে।
তুমি পরিণীতা, উড়ে গেছো, শীতপাখি।
বিরহে তোমার স্বাধীন হয়েছে দেশ।
ভালোবাসা পেলে কে আর স্বাধীন হতো?'

(নদীপথে : আমাদের ইতিহাস : ধাবমান হরিণের দ্যুতি)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২

'তোমার ভূমিকা মানি, স্বাধীনতা যুদ্ধে যেরকম
বাংলাদেশে নদীর ভূমিকা চিরায়ত।
ভালোবাসা আল ভাঙে কোনসেচা জলে,
অন্যকে প্লাবিত করে বাঁচায়, বাড়ায়, খেলে–
প্রসারিত করে তার ক্রীড়াযোগ্য ভূমি।
তখন জাগ্রত চরে ভালোবেসে মুখ তোলো তুমি।'

(এক দুপুরের স্বপ্ন : চৈত্রের ভালোবাসা)

নদী তো শুধু ভাঙেই না, গড়েও। নদীর এপার ভাঙে, ওপার গড়ে – এই তো নদীর খেলা। সমুদ্রের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে আবির্ভূত বাংলাদেশের নদ-নদী ও হাওড়-বাঁওড়ের নিত্যচিত্র যারা কাছে থেকে দেখেননি, তারা এই বঙ্গীয় বদ্বীপের অপার সৌন্দর্যের অনেকটাই দেখেননি। রবীন্দ্র-পরবর্তী কবিদের মধ্যে পদ্মা-যমুনার সঙ্গমভূমির কবি, পল্লীকবির সম্মানে ভূষিত জসীম উদদীন আমাদের নদ-নদীকে খুব কাছে থেকে দেখেছিলেন। ভালোবাসার কামনামিশানো চোখ দিয়ে দেখেছিলেন। তাই প্লাবনের পলি জমতে জমতে নদীতে জেগে ওঠা নতুন চরের মধ্যে তাঁর হারানো-প্রেয়সীর মুখচ্ছবি প্রত্যক্ষ করে তিনি রচনা করতে পেরেছিলেন এ রকম একটি বিস্ময়জাগানিয়া কাব্যপঙক্তি– 'কাল সে আসিয়ে মুখখানি তার নতুন চরের মতো।'

'তখন জাগ্রত চরে ভালোবেসে মুখ তোলো তুমি।'–এই চিত্রনির্মাণে অন্তরাল থেকে পল্লীকবির ঐ-প্রবাদপঙক্তিটি আমাকে প্রভাবিত করেছে। মজার ব্যাপার হলো, ১৯৭৪ সালে আমি যখন এই কবিতাটি লিখি, কবি জসীম উদদীন তখনও বেঁচে ছিলেন। বাংলাবাজারে মাওলা ব্রাদার্সের বুক কাউন্টারে তাঁর সঙ্গে আকস্মিকভাবে আমার দেখা হলে, আমাকে তিনি তাঁর কমলাপুরের বাসায় অনুষ্ঠিতব্য একটি সাহিত্যবাসরে যাবার জন্য নিমন্ত্রণ করেন। সেদিন কাঁপা-কাঁপা হাতে আমার নাম লিখে তিনি তাঁর 'সুচয়নী' কাব্যসঞ্চয়নটি আমাকে উপহার দিয়েছিলেন। আমিও আমার প্রিয় কবিকে সেদিন আমার সদ্য প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ– 'দীর্ঘ দিবস দীর্ঘ রজনী' উপহার দিয়েছিলাম। বলেছিলাম, আমি আপনার কবিতা দ্বারা প্রভাবিত কবিদের একজন। কিন্তু তিনি তা বিশ্বাস করেননি। আমার পিঠ চাপড়ে দিয়ে হেসেছিলেন। ১৯৭৫ সালের জুনে প্রকাশিত হয় আমার 'চৈত্রের ভালোবাসা' কাব্যগ্রন্থটি। 'এক দুপুরের স্বপ্ন' ঐ গ্রন্থেরই একটি কবিতা। আমার কর্তব্য ছিল, ঐ কবিতাটির প্রতি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করে ঐ কাব্যগ্রন্থটি তাঁর হাতে তুলে দেয়া। কিন্তু বঙ্গবন্ধু-হত্যাকাণ্ডের ভিতর দিয়ে আমাদের জাতীয় জীবনে সৃষ্ট ভয়াল ভাঙনের কারণেই এরপর কবির সঙ্গে আমার আর দেখা করা হয়ে ওঠেনি। আমি আমার গ্রামের বাড়িতে পালিয়ে যেতে বাধ্য হই। অল্পদিনের ব্যবধানে, ১৩ মার্চ ১৯৭৬ কবি জসীমউদ্‌দীন মারা যান।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কে জানে মৃতেরা হয়তো জীবিতের লেখা ঠিকই পড়তে পারেন। তাদের কথা শুনতে পান। আমাদের ভাষা তাদের অতীত জীবন থেকে জানা বলে বুঝতেও পারেন। হয়তো বলতেও পারেন। কিন্তু আমাদের যাপিত জীবনের অভিজ্ঞতার মধ্যে মৃত্যুজগতের কোনো ছাপ নেই বলে আমরা হয়তো তাদের বলাটা বুঝতে পারি না। তারা হয়তো নদীর স্রোতের ভাষায় কথা বলেন; পাখির গানের সুরে সুর মিলিয়ে কথা বলেন, বাতাসের শোঁ শোঁ শব্দের ভিতর দিয়ে তারা হয়তো বর্ষার বৃষ্টি ও শীতের দিনের প্রিয় রোদের ভাষায় কথা বলেন। হে প্রিয় অগ্রজ কবি, আজ আমি আপনাকে স্মরণ করছি। আপনি কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন?

বুড়িগঙ্গার ওপার থেকে ২ এপ্রিল ঢাকায় ফিরে পরদিন ৩ এপ্রিলের দ্বিপ্রহরে যখন শীতলক্ষ্যা নদী পাড়ি দেয়ার ঘটনাটি লিপিবদ্ধ করছি, তখন নদীমাতৃক বাংলাদেশের নদ-নদীর দিকে আমার চোখ ও মন নিবদ্ধ হয়। আমাদের নদ-নদীর জীবনী জানার জন্য আমি খুব আগ্রহী হয়ে উঠি। অনেক খোঁজাখুঁজি করার পর আজিজ মার্কেটের বইপত্র থেকে প্রয়াত মীজানুর রহমান কর্তৃক সম্পাদিত 'মীজানুর রহমানের ত্রৈমাসিক পত্রিকা'র বিপুল তথ্যসমৃদ্ধ প্রায় সাড়ে পাঁচ শ' পৃষ্ঠার নদী সংখ্যাটি সংগ্রহ করি। মনে পড়ছে, এই সংখ্যাটি প্রকাশের সময় (১৯৯৯-২০০০) মীজানুর রহমান সাহেব আমার কাছে নদী বিষয়ক লেখা চেয়েছিলেন। কিন্তু আমি তাঁকে তখন কোনো লেখা দিতে পারিনি। নদী সম্পর্কে আমার তখন আগ্রহের কিছুটা ঘাটতিও ছিল। ভাবিনি যে, তাঁর পরিকল্পিত ঐ নদী সংখ্যাটি ভবিষ্যতে কোনোদিন আমার 'আত্মকথা ১৯৭১' রচনায় এভাবে কাজে লাগবে। এ রকম একটি গুরুত্বপূর্ণ নদী-গ্রন্থ সম্পাদনা করার জন্য দূরদৃষ্টিসম্পন্ন, নদী-প্রেমিক মরহুম মীজানুর রহমানের প্রতি আমি আজ গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। হয়তো তাঁর সুসম্পাদিত নদীগ্রন্থ থেকে খুব বেশি তথ্য আমি আমার রচনায় ব্যবহার করব না, কিন্তু আমাদের দেশের বুকের ওপর দিয়ে প্রবাহিত নদ-নদীর মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ক, তাদের উৎপত্তি, ব্যুৎপত্তি, গতিপথ ও কাণ্ডকীর্তি সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাওয়ার জন্য তাঁর সম্পাদিত নদী-গ্রন্থটি আমার জন্য অত্যন্ত সহায়ক হয়েছে। আমাদের দেশের নদ-নদীর মধ্যকার মিলন-বিরহ গাথা যে রামায়ণ-মহাভারতের মতো মহাকাব্যের মহাকাব্যিক উপাদানে সমৃদ্ধ, মীজানুর রহমান সাহেব তাঁর সম্পাদিত নদী-সংখ্যায় যেন এই সত্যটির প্রতিই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। ফলে তাঁর সম্পাদিত নদী-সংখ্যাটি শুধু বাংলাদেশের নদী সম্পর্কে আমাদের ভূগোল-তৃষ্ণা নিবারণ করেই ক্ষান্ত হয় না। বাংলা ভাষার বিভিন্ন সাহিত্যিকের রচনা থেকে আহরিত নদীসংক্রান্ত অনুভবকেও তিনি এমন নৈপুণ্যের সঙ্গে নদীজল জালে জুড়ে দিয়েছেন, যা থেকে এ রকম ধারণা পাঠকচিত্তে সংক্রমিত হয় যে, এই ভূখণ্ডের মানুষ ও নদ-নদী যেন যুগ যুগ ধরে পাশাপাশি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রবাহিত হয়ে চলেছে একই মহাসাগরের ডাকে, একই মহাসিন্ধুর সন্ধানে।

১৯৮২ সালে আমার সোভিয়েত ভ্রমণকালে রাশিয়ার বিখ্যাত নদী ভলগা দর্শনের অব্যবহিত পর আমি একটি কবিতায় লিখেছিলাম, ... 'যখন সে নদী, তখন ভলগা; যখন মানুষ, তখন লেনিন।' যদিও লেনিনের শৈশব কেটেছে ভলগার তীরে, তবু তিনি তাঁর লেনিন ছদ্মনামটি গ্রহণ করেছিলেন লেনা নদী থেকে। তাতে বোঝা যায়, মহামতি লেনিন নদীকে কোন চোখে দেখতেন। নদী সম্পর্কে বঙ্গবন্ধুর উপলব্ধিও কম আকর্ষক ছিল না। 'তোমার আমার ঠিকানা, পদ্মা-মেঘনা-যমুনা' এই স্লোগানটিকে তিনি আমাদের দেশাত্মবোধ ও জাতীয়তাবাদী চেতনা বিকাশের মোক্ষম অস্ত্র হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। বিভিন্ন জনসভায় আমি যখন ঐ স্লোগানটি তাঁর কণ্ঠে শুনতাম, যখন তিনি তাঁর দরাজ বজ্রকণ্ঠে আমাদের প্রাণপ্রিয় নদীর নাম উচ্চারণ করতেন, তখন আমার মনে হতো, তিনিই আমাদের মেঘনা, তিনিই আমাদের পদ্মা, তিনিই যমুনা। তাঁর ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণে পাকসেনাদের উদ্দেশ্যে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে তিনি বলেছিলেন, 'আমরা তোমাদের ভাতে মারবো, পানিতে মারবো...' তখন আমার মনে হয়েছিল, আমাদের তরঙ্গিত নদ-নদীর ওপর দিয়ে তিনি পালতোলা নৌকার মতো তাঁর কৃতজ্ঞ মুগ্ধ চোখ দু'টি বুলিয়ে গেলেন। গেরিলা যুদ্ধের জন্য জাতিকে তৈরি হওয়ার আহ্বান জানানোর পাশাপাশি তিনি যেন আমাদের এই অভয়বাণীটিও শুনিয়ে গেলেন যে, আমরা একা নই, আমাদের আছে নদী। অসংখ্য নদ-নদী। এটা পঞ্চনদের দেশ পাঞ্জাব নয়, এটা হচ্ছে হাজার নদ-নদীর দেশ, বাংলাদেশ। সুতরাং তাঁর প্রত্যয়দীপ্ত ঘোষণা—'পানিতে মারবো' কথাটার মধ্যে একটা বাস্তবসম্মত গেরিলা-রণকৌশলের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত ছিল বলেই মনে করি।

শুরুতে উদ্ধৃত আমার 'এক দুপুরের স্বপ্ন' কবিতার মধ্যে স্বাধীনতা যুদ্ধে বাংলাদেশের নদ-নদীর চিরায়ত ভূমিকাকে আমি সে-আলোকেই স্বীকৃতি দিয়েছি। ভারতীয় মিত্রবাহিনীর সহায়তায় আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সাফল্য ত্বরান্বিত না হলে, আমি গভীরভাবে বিশ্বাস করি যে, আমাদের নদ-নদীর আনুকূল্য নিয়ে, কিছুটা বিলম্বে হলেও বাংলাদেশে হানাদার পাকসেনাদের সলিল সমাধি আমরা ঠিকই রচনা করতে পারতাম। পাকসেনাদের দ্রুত আত্মসমর্পণের সিদ্ধান্ত গ্রহণের পেছনে আমাদের দেশের অসংখ্য নদ-নদীরও যে একটা বড় ভূমিকা ছিল না, তাই বা বলি কেমন করে? ১৬ ডিসেম্বর পাকসেনারা শুধু মিত্রবাহিনী আর মুক্তিযোদ্ধাদের কাছেই আত্মসমর্পণ করেনি, আমাদের রুদ্রচণ্ডী নদ-নদীর কাছেও তারা সেদিন আত্মসমর্পণ করেছিল। সুতরাং হে বঙ্গদেশীয় নদ-নদী, আপনারা আমার প্রাণের প্রণতি গ্রহণ করুন।

> মীজানুর রহমান সম্পাদিত নদী সংখ্যাটিতে কবি-গবেষক দীপঙ্কর গৌতম প্রদত্ত তথ্যে আমার একটি ভুল বা অস্পষ্ট ধারণার অবসান হয়েছে। তথ্যটি হচ্ছে— নবাব সিরাজের মাতা আমিনা বেগম ও তাঁর বড়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খালা কুচক্রী ঘষেটি বেগমের মৃত্যু-সম্পর্কিত। আমার ধারণা ছিল, আন্দাজ করে লিখেওছিলাম যে, বুড়িগঙ্গার জলে ডুবিয়ে মারার আগে আমিনা বেগম ও ঘষেটি বেগমকে লালবাগের কেল্লায় বন্দি করে রাখা হয়েছিল। রবার্ট ক্লাইভের জীবনী থেকে আমি শুধু বুড়িগঙ্গার জলে তাদের ডুবিয়ে মারার তথ্যটিই পেয়েছিলাম, তাদের কোথায় লুকিয়ে রাখা হয়েছিল, কার নির্দেশে তাদের জলে ডুবিয়ে হত্যা করা হয়, তা জানতে পারিনি। দীপঙ্কর গৌতম জানাচ্ছেন...' ১৭৫৭ সালে পলাশীর আম্রকাননে মীরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতায় বাংলার স্বাধীনতার সূর্য অস্তমিত হলে মীরজাফরের পুত্র মীরনের নির্দেশে মুহম্মদী বেগ নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে হত্যা করে। সিরাজকে হত্যা করার পর সিরাজের মা আমিনা বেগম এবং খালা ঘষেটি বেগমকে জিঞ্জিরার একটি প্রাসাদে বন্দি করে রাখা হয়েছিল। মীরনের নির্দেশে একদিন তাদের নৌকায় তুলে এনে বুড়িগঙ্গায় ডুবিয়ে হত্যা করা হয়। সে করুণ আর্তচিৎকার ও আহাজারি আজও 'শূন্যতায় শোকসভা' করে চলে বুড়িগঙ্গা তার শীর্ণকায় বিমূর্ত বিলাপে।'

(দ্রঃ মীজানুর রহমানের ত্রৈমাসিক পত্রিকার নদীসংখ্যা- ৩৩১ পৃঃ)

'ভাসতে ভাসতে শীতলক্ষ্যা, ভাসতে ভাসতে পদ্মা,
পদ্মা থেকে ভাসতে ভাসতে একটানা এক নদী।
ভাসতে ভাসতে ভালোবাসা, ভাসতে ভাসতে দোলা,
একটি মৈত্রি নৌকা আমার ভাসতে ভাসতে যায়।'

(কৃষ্ণচূড়াঞ্জলি : চৈত্রের ভালোবাসা)

শীতলক্ষ্যা আমার খুব প্রিয় নদী। আমাকে এই নদীটি চিনিয়েছিলেন আমার প্রিয় বন্ধু পূরবী। পূরবীর বাড়ি 'ধলেশ্বরী নদী-তীরে', মুন্সীগঞ্জে। নারায়ণগঞ্জ থেকে লঞ্চে করে শীতলক্ষ্যা-ধলেশ্বরী পাড়ি দিয়ে আমি পূরবীর সঙ্গে অনেকবার মুন্সীগঞ্জে গিয়েছি। গেলে ফিরতে হয় বলে একই জলপথে অনেকবার ফিরেছিও। খুব মনে পড়ে, একবার গহনা-নৌকায় চড়ে ধলেশ্বরী-শীতলক্ষ্যায় ভেসে আমরা মুন্সীগঞ্জ থেকে নারায়ণগঞ্জে ফিরেছিলাম। দিনটি ছিল খুব বৃষ্টিমুখর। আকাশে ছিল কালো মেঘের ভেলা। নদীতে জলের কল্লোল।

আমার 'তুমি চলে যাচ্ছো' কবিতাটি ছিল সেই সুন্দরীতমা শীতলক্ষ্যা ও রুদ্র ধলেশ্বরীর জল দিয়ে লেখা।

অনেকদিন পর আমি আবার আমার প্রিয় নদী শীতলক্ষ্যার জলে চোখ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাখলাম। কী ভালোই না লাগল আমার। এই নদীর জল একই সঙ্গে শীতল এবং এই নদী লক্ষ্মীমন্ত চরিত্রের বলেই না তার ভাগ্যে এমন সুন্দর নামটি জুটেছে। এটা যে কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন নয়, এ-নদীর ইতিহাসই তা সাক্ষ্য দেয়। পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদ থেকে বেরিয়ে ১০৪ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে শীতলক্ষ্যা মেঘনা ও ধলেশ্বরী নদীর সঙ্গে মিলেছে। ড. করুণাময় গোস্বামীর বরাত দিয়ে মীজানুর রহমান তাঁর সম্পাদিত পত্রিকার নদী সংখ্যায় আমাদের জানিয়েছেন, ইংরেজ আমলের নথিপত্রে শীতলক্ষ্যাকে ঢাকা জেলার সুন্দরীতমা নদী হিসেবে আখ্যায়িত করা হতো। তখন এই নদীর জলের এমনই সুনাম ছিল যে, একটি ব্রিটিশ কোম্পানি এই নদীর জল দিয়ে সোডা-ওয়াটার বানাত। কোম্পানিটির নাম ছিল ডেভিড কোম্পানি। ঐ ডেভিড কোম্পানির তৈরি করা সোডা ওয়াটারের বোতলের গায়ে লেখা থাকত– 'মেড বাই শীতলক্ষ্যা ওয়াটার।' শীতলক্ষ্যার জল সম্পর্কে এর চেয়ে বড় সার্টিফিকেট আর কী হতে পারে?

সম্প্রতি বুড়িগঙ্গার মতো শীতলক্ষ্যার জলও তার পূর্বের সুনাম হারিয়েছে। ১৯৭১ সালেও শীতলক্ষ্যার হাল এমন ছিল না। শীতলক্ষ্যা তখনও মানুষকে তার শান্ত শীতল জলে দেহপ্রাণ জুড়ানোর জন্য হাতছানি দিয়ে ডাকত। প্ররোচিত করত জলখেলায়। মনে পড়ল, ১৯৬১ সালে আমরা যখন প্রথমবারের মতো ঢাকা ভ্রমণে আসি, তখন আমরা নারায়ণগঞ্জের ডায়মন্ড রোডের একটি হোসিয়ারি দোকানে উঠেছিলাম। দীর্ঘ ভ্রমণের সঙ্গে রাতের অনিদ্রা যুক্ত হওয়ায় আমার শরীর মন ছিল খুবই ক্লান্ত, অবসন্ন। প্রায় অসুস্থই হয়ে পড়ি আমি। কিন্তু কী আশ্চর্য! পরদিন ভোরে শীতলক্ষ্যার স্বচ্ছ-শীতল জলে প্রাণভরে সাঁতার কাটার পর আমি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠি। শীতলক্ষ্যার জলে সিনানরতা টানবাজারের রমণীরাও যে সেদিন আমাকে তাদের সঙ্গসুধাদানে ধন্য করেছিল, তার মূল্যকেও আমি কখনও খাটো করে দেখি না।

সাইফুলের ভাগনিটি সেদিন যে শীতলক্ষ্যার জলে গোসল করার জন্য বায়না ধরেছিল, তাও অকারণে নয়। আমার নিজেরই খুব ইচ্ছে করছিল, ঐ মেয়েটিকে কাঁধে তুলে নিয়ে ফেরি থেকে শীতলক্ষ্যার জলে লাফিয়ে পড়ি। ১৯৬১ সালে একবার নেমেছিলাম। তারপর থেকে পাগলচোখে শীতলক্ষ্যার জল শুধু দেখেই এসেছি, তার জলে কখনও নামিনি। আজও তার জলে আমার নামা হলো না।

শীতলক্ষ্যা নদীর ওপারে পৌঁছার পর আমরা যখন নারায়ণগঞ্জের মাটি স্পর্শ করলাম, মনে হলো এবার আমরা একটি বিস্তৃত মুক্ত-এলাকার ভিতরে প্রবেশ করেছি। আপাতত আমাদের মধ্যে পাকসেনার ভয়টা আর নেই। এখন থেকে আমরা পাকসেনাদের আওতা থেকে ক্রমশ দূরে সরে যাব। আমাদের সামনে এখন দিগন্ত-বিস্তৃত মুক্ত-প্রান্তর। আহ! কী আনন্দ। কী স্বস্তি!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফেরিতে সাইফুলের সঙ্গে ২৫ মার্চের রাত নিয়ে আমার অনেক কথা হয়। সাইফুল জানায়, ২৫ মার্চে নাইট শিফটে তারও ডিউটি ছিল, কিন্তু আমার মতোই সে-ও ঐ রাতে পিপল পত্রিকার অফিসে যায়নি। ওর বোন ও ভগ্নিপতি ওকে যেতে দেয়নি। ফলে সাইফুল বেঁচে গিয়েছে। ঢাকায় আর্মি ক্র্যাকডাউন হলে পিপল পত্রিকার অফিসটি যে পাকসেনাদের টার্গেট হবেই– এ বিষয়টি প্রায় অনেকেরই জানা ছিল। কয়েকজন প্রেস-কর্মচারী ও পিয়ন মারা গেলেও কোনো সাংবাদিক বা পিপলের কোনো কর্মকর্তা ২৫ মার্চের রাতে মারা যায়নি, এ তথ্যটি আমার কাছ থেকে জেনে সাইফুল নিহতদের জন্য শোক প্রকাশ করার পাশাপাশি কিছুটা স্বস্তিও প্রকাশ করে। সাইফুল জানত, আমি নাইট শিফট করতে খুব ভালোবাসি। আমার ডে-অফ (আমার বেলায় নাইট-অফ) থাকলেও আমি পারতপক্ষে ঐ কর্মবিরতি এনজয় করতাম না। অফিসে গিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে জমিয়ে আড্ডা দিতাম। গভীর রাতের আড্ডার মধ্যে একটা আলাদা মজা আছে। তাই সাইফুলের ধারণা ছিল, আমি নিশ্চয়ই সেই রাতে অফিসে গিয়েছি এবং দি পিপল অফিসের অনেকের সঙ্গে আমারও নির্ঘাত মৃত্যু হয়েছে। ওর ধারণাটা মোটেও অসঙ্গত নয়। ঐ রাতে আমার সত্যিই বাঁচার কথা ছিল না। আমার বন্ধু নজরুল ইসলাম শাহ কীভাবে সেই রাতে আমাকে এলিফেন্ট রোড থেকে আমার আজিমপুর নিউ পল্টনের মেসে ফিরিয়ে নিয়ে এসেছিল, সাইফুলকে সেই ঘটনাটি বলি। ঘটনাটি আমি সুযোগ পেলেই রসিয়ে রসিয়ে বলি। ঘটনাটি বলতে আমার খুব ভাল লাগে। ওটা হচ্ছে ২৫ মার্চের রাতে আমার অলৌকিকভাবে বেঁচে যাওয়ার গল্প। আমি যতদিন বেঁচে থাকব, সুযোগ পেলেই গল্পটি আমি বলব। আমারটির মতো না হলেও, সাইফুলের বেঁচে যাওয়ার গল্পটিও আমার কাছে কিছুটা অলৌকিক বলেই মনে হলো।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্রের অষ্টম খণ্ডে বাংলাদেশ কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ড. মোজাম্মেল হোসেন, যিনি ২৫ মার্চের 'অপারেশন সার্চ লাইট' বাস্তবায়নকালে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পাকসেনাবাহিনীর বিভিন্ন ইউনিটের সদস্যদের মধ্যকার ওয়ারলেস-কথোপকথন টেপরেকর্ডারে রেকর্ড করেছিলেন– সেখানে দি পিপল পত্রিকার অফিস উড়িয়ে দেয়ার পরমুহূর্তের একটি রোমহর্ষক বর্ণনা পাওয়া যায়। তিনি লিখছেন– 'ধীরস্থির গলায় হুকুম দিচ্ছিল কমান্ডার– এতটুকু উত্তেজনা ছিল না কণ্ঠস্বরে। পরে জেনেছিলাম, ঐ গলা ছিল ব্রিগেডিয়ার আবরীর খানের (আবরার?)। ঐ গলায় আনন্দে বিভিন্ন টার্গেট দখলের খবর দিচ্ছিলেন, সবাইকে জানাচ্ছিলেন যে, দৈনিক পিপল পত্রিকার অফিস উড়িয়ে দেয়া হয়েছে। কী সাংঘাতিক ক্রোধ ছিল পিপল পত্রিকাটির ওপর, ট্যাংকবিধ্বংসী কামান ব্যবহার করেছে পিপল পত্রিকার অফিসের ওপর পাকসেনারা। এটি ছিল ২৬ নম্বর ইউনিট। পরে জেনেছি, এর 'ইমাম' ছিল কর্নেল তাজ। যার হেড কোয়ার্টার প্রেসিডেন্ট হাউস।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'এই ২৬ নম্বর ইউনিট হত্যা করেছে লেঃ কমান্ডার মোয়াজ্জেমকে। বলেছে তাকে ধরতে যাওয়া হয়েছিল, বাধা দেয়ায় নিহত হয়েছে সে। ঠাণ্ডা মাথায় তাকে হত্যা করে জীপের পেছনে দড়িতে বেঁধে রাস্তায় টেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে তার মৃতদেহ। এই ২৬ নম্বর ইউনিট আক্রমণ করেছে রাজারবাগ পুলিশ লাইন। সবচেয়ে উল্লাস ছিল এই ২৬ নং ইউনিটেরই। তার বীরত্বের পুরস্কার হিসেবে কর্নেল তাজকে করা হয়েছিল ডিএসএএমএল— ডেপুটি সাব এ্যাডমিনিস্ট্রেটর মার্শাল ল। মাঝে মাঝেই শোনা যাচ্ছিল কন্ট্রোল বলছে, দ্যাট ইজ জলি গুড। দ্যাট ইজ একসেলেন্ট বা হি ইজ ইউজিং এভরিথিং হি হ্যাজ গট।

সেই এভরিথিং-এ ছিল ট্যাংক, রিকয়েললেস রাইফেল, রকেট লাঞ্চার ইত্যাদি।'

(বা. স্বা. যু. দ.প:, ৮ম খ : পৃ: ৩৫৪)

ট্রাকের পাটাতনে বিছানার চাদর বিছিয়ে, তাতে আরাম করে বসে আমি জিঞ্জিরা জেনোসাইডের ঘটনাটি সাইফুল, ওর বোন ও ভগ্নিপতির কাছে সবিস্তারে বর্ণনা করছিলাম। সাইফুলের বেঁচে যাওয়ার চেয়ে আমার বেঁচে যাওয়ার মধ্যে যে একটা বড় রকমের হিরোইজম আছে, আমার গল্প বলার মধ্যে সেই সত্যটাকে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা ছিল। ফলে আমার প্রতিটি কথা সবাই পিনপতন নীরবতার মধ্যে শুনছিল।

আমরা ছাড়াও ঐ ট্রাকে সেদিন আরও কিছু অচেনা মানুষজন ছিল। ঢাকা থেকে পালিয়ে তারাও নরসিংদীর দিকে যাচ্ছিল। শীতলক্ষ্যা পেরিয়ে অন্য কোনো যানবাহন না পেয়ে তারা আমাদের ট্রাকেই সওয়ার হয়। তাদের মধ্যে একটি পরিবার ছিল আমার মতোই জিঞ্জিরা জেনোসাইড থেকে বেঁচে যাওয়া। পরিবারের সদস্য তিনজন। স্বামী, স্ত্রী ও তাদের একটি কিশোরী-কন্যা। ওরা ট্রাকের এক কোণে বসে আমার মুখে জিঞ্জিরা হত্যাকাণ্ডের বর্ণনা শুনছিল। আমার ঘটনা বর্ণনার এক পর্যায়ে মহিলাটি হঠাৎ হাউমাউ করে কান্না জুড়ে দিল। সে কী কান্না!

সাইফুলের ভাগনিটি মহিলার বুকফাটা করুণ কান্না শুনে, ভয়ে আমার গলা জড়িয়ে ধরল। মাথায় হাত বুলিয়ে স্ত্রীকে সান্ত্বনা দিতে দিতে মহিলার স্বামী আমাদের জানালেন যে, ওরা যখন জিঞ্জিরায় গিয়েছিল তখন তাদের সঙ্গে ছিল তাঁর এক শ্যালক। শ্যালকটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। যুবক। ২ এপ্রিল ভোরে পাকসেনাদের আচমকা আক্রমণের মুখে ওরা তাদের অস্থায়ী বাসস্থানের নিকটবর্তী জঙ্গলের ভিতরে ঢুকে পড়েছিল, তখন ঐ যুবক তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। পাকসেনাদের আট-নয় ঘণ্টাস্থায়ী সামরিক অভিযান শেষ হলে জঙ্গল থেকে বাইরে বেরিয়ে এসে জিঞ্জিরার পথে-ঘাটে ও বনবাদাড়ে অনেক খুঁজেও তারা আর ঐ ছেলেটির দেখা পায়নি। সেই থেকে ঐ যুবক নিখোঁজ। রাস্তাঘাটে মরে পড়ে থাকা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মরদেহ বা অর্ধমৃত অবস্থায় কাঁতরাতে থাকা অনেক মানুষজনকে তারা কাছে গিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেছে। কিন্তু তাকে কোথাও তারা পায়নি। ভগ্নিপতিটির ধারণা, তার শ্যালকটি বেঁচে আছে। কিন্তু তার স্ত্রীকে কিছুতেই সে কথা সে বোঝাতে পারছে না। স্ত্রীটি তার ভাইয়ের জন্য থেকে থেকেই কেঁদে চলেছে। বোনের ধারণা তার ভাইটি বেঁচে নেই। জিঞ্জিরার পথেঘাটে বা বনেবাদাড়ে কোথাও নিশ্চয়ই মরে পড়ে আছে। সব মৃতের মুখ তো আর তারা উল্টেপাল্টে দেখেনি।

ভাইটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া যুবক-বয়সী বলে বোনের সন্দেহটাকে অমূলক বলে আমিও উড়িয়ে দিতে পারলাম না। তবুও ক্রন্দনরত বোনটিকে মিথ্যে অভয় দিয়ে বললাম,...' কিচ্ছু ভাববেন না, আপনার ভাই নিশ্চয়ই বেঁচে আছে। বাড়িতে গিয়ে দেখেন, ও হয়তো আপনাদের আগেই বাড়ি পৌঁছে গেছে।'

আমার পরের কথাটাই ছিল বোনটিরও শেষ-ভরসা। আমার মুখে তার সেই শেষ-ভরসার প্রতিধ্বনি শুনে মনে হলো বোনটি যেন নতুন করে আশায় বুক বাঁধল। এতক্ষণ টানা-ঘোমটার মেঘের আড়ালে মেয়েটি ওর চাঁদপনা মুখটিকে লুকিয়ে রেখেছিল, এবার মুখ থেকে সমস্ত লজ্জা মুছে ফেলে ঘোমটা সরিয়ে মেয়েটি তার ডাগর চোখ দুটি মেলে সরাসরি আমার মুখের দিকে তাকাল। মনে হলো সে-যেন আমার মুখের মধ্যে তার হারিয়ে যাওয়া ভাইটিকে খুঁজছে। মুখ ফুটে বলতে না পারলেও মনে মনে বলছে, আপনার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক। আপনার কথা সত্য হোক। আমিও চাই আমার কথা সত্য হোক।

সন্ধ্যার দিকে নরসিংদী বাজারে পৌঁছে আমরা সেখানেই রাত্রি যাপনের কথা চিন্তা করছিলাম। কিন্তু নরসিংদীর স্থানীয় লোকজনই আমাদের বলল যে আমাদের নিজেদের ট্রাক যখন রয়েছে, তখন নরসিংদীতে রাত্রি যাপন না করে কিশোরগঞ্জের পথে যতটা সম্ভব অগ্রসর হয়ে যাওয়াটাই শ্রেয় হবে। পাকসেনারা তখন নরসিংদীতে আসবে আসবে করছে। কখন এসে পড়বে, কে বলতে পারে? নরসিংদীর আকাশে নাকি দিনের বেলায় টহল দিয়ে গেছে পাক বিমানবাহিনীর বিমান। যে কোনো সময় পাকসেনারা নরসিংদীতে চলে আসতে পারে। বুড়িগঙ্গা নদী পেরিয়ে পাকসেনাদের জিঞ্জিরায় গণহত্যা চালানোর খবরটি জানার পর থেকে নরসিংদীর মানুষজনও নরসিংদী থেকে দূরে পালাচ্ছিল। তাই মুক্ত অঞ্চল হলেও নরসিংদীর মানুষজনের চোখে-মুখে স্বাভাবিক আনন্দ-উল্লাস ছিল অনুপস্থিত।

অগত্যা নরসিংদীতে নিশি যাপনের চিন্তা পরিত্যাগ করে, একটি ছোট্ট পরিচ্ছন্ন হোটেলে পেট পুরে ভাত খেয়ে আমরা সারা রাজ্যের অন্ধকার সামনে নিয়ে রওয়ানা দিলাম শিবপুরের পথে–, মনোহরদির উদ্দেশে। নরসিংদী থেকে মনোহরদি মাইল বিশেক পথ। আজকের বিশ মাইল নয়, ১৯৭১ সালের বিশ মাইল। ডিস্ট্রিক্ট

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বোর্ডের ভাঙা কাঁচা রাস্তা। তবে মনোহরদি পর্যন্ত আমাদের আর কোনো নদী পেরোতে হবে না।

জিঞ্জিরায় প্রিয়জন হারিয়ে আসা পরিবারটি আমাদের ট্রাক থেকে নরসিংদীতে নেমে গেল। ওরা যাবে রায়পুরা। ওদের পথ ভিন্ন। ওরা যাবে নরসিংদী থেকে পুব দিকে, আর আমরা সোজা উত্তরে। শিবপুর হয়ে মনোহরদি।

সাইফুলদের সঙ্গে একটি মাল্টি ব্যান্ডের ট্রানজিস্টার ছিল, ব্যাটারির জোর ছিল না বলে আমরা সেটি কাজে লাগাতে পারছিলাম না। নরসিংদী বাজার থেকে অনেক খুঁজে আমরা চারটি নতুন তরতাজা চান্দা ব্যাটারি সংগ্রহ করলাম। চলন্ত ট্রাকের পাটাতনে আরাম করে বসে ট্রানজিস্টার থেকে পুরনো ব্যাটারিগুলো ফেলে দিয়ে নতুন ব্যাটারিগুলো ঢুকালাম। নতুন ব্যাটারি পেটে পেয়ে দীর্ঘ সময় নীরব হয়ে থাকা রেডিওটি আনন্দে গান গেয়ে উঠল– 'আমার দেশের মাটির গন্ধে ভরে আছে সারা মন/ শ্যামল-কোমল পরশ ছাড়া যে নাই কোনো প্রয়োজন।'

এই দেশাত্মবোধক গানটি, যতদূর মনে পড়ে কবি মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানের বা কবি হাবিবুর রহমানের লেখা। যেমন সুন্দর গানটির কথা তেমনি তার হৃদয়স্পর্শী সুর। ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধের সময় পাকিস্তানকে প্রিয় স্বদেশরূপে জ্ঞান করে পূর্ব-পাকিস্তানের কবি ও গীতিকাররা বেশ কিছু ভাল দেশাত্মবোধক গান লিখেছিলেন। আমাদের কণ্ঠশিল্পীরাও কী দরদ দিয়েই না সেই দেশাত্মবোধকগানগুলো তখন গেয়েছিলেন। ঢাকা রেডিও থেকে প্রচারিত ঐ জনপ্রিয় দেশাত্মবোধকগানটি শুনে আমার মনটা জুড়িয়ে গেল।

কোনোদিনই বাঙালির কোনো স্বাধীন দেশ ছিল না বটে, কিন্তু তার দেশপ্রেম ছিল অতুলনীয়। তাই আবহমান বাংলার কবিদের রচিত কাব্যে-গানে তার দেশপ্রেমের আশ্চর্য সুন্দর প্রকাশ ঘটেছে বারবার। অন্য জাতির সঙ্গে বাঙালির পার্থক্য এখানেই যে, তার প্রাণের ভিতরে দেশপ্রেম এসেছে আগে, পরে তার দেশপ্রেমকে অনুসরণ করে বিভিন্ন সময় বিভিন্নরূপে জাগ্রত হয়েছে তার দেশমূর্তি। অনেকটা রামের জন্মের আগে রামায়ণ লেখার মতো।

চলন্ত ট্রাকে বসে আকাশবাণীর সন্ধানে রেডিওর নব ঘোরাতে গিয়ে হঠাৎ করেই আমরা পেয়ে গেলাম স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র। ৩০ মার্চ পাক বিমানবাহিনীর গোলাবর্ষণে চট্টগ্রামের কালুরঘাটস্থ স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রটি গুঁড়িয়ে দেয়ার পর, ঐ স্টেশনটি আকাশ থেকে হারিয়ে গিয়েছিল। তার স্থান দখল করেছিল আকাশবাণী কলকাতা। অনেকদিন পর আজ আবার নরসিংদীর আকাশ চিরে ঘোষিত হলো স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের নাম। পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে জয় বাংলা বলে আমরা আনন্দে লাফিয়ে উঠলাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তখন নরসিংদী ছিল নারায়ণগঞ্জ জেলার অন্তর্গত একটি মহকুমা। বেলাবো, পলাশ, শিবপুর, রায়পুরা ও মনোহরদি— এই পাঁচটি থানা নিয়ে নরসিংদী। মনোহরদির যে শিক্ষক-মহোদয় আমাদের রাত্রি যাপনের সুব্যবস্থা করেছিলেন, তিনি ছিলেন একজন রাজনীতিমনস্ক সাহিত্যরসিক মানুষ। আমি যে কবি, আমার যে একটি কবিতার বই (প্রেমাংশুর রক্ত চাই) বেরিয়েছে, সে খবরও তিনি রাখেন। তিনি আমার 'হুলিয়া' কবিতাটির কথা বললেন। তাঁর সঙ্গে কথা বলে আমার খুব ভাল লেগেছিল। নামটি ভুলে গেছি। খুব স্বাভাবিকভাবেই শহীদ আসাদের কথা আমাদের আলোচনায় উঠে আসে। তিনি আসাদকে ব্যক্তিগতভাবে চিনতেন, জানতেন। আসাদ ছিল সকলের প্রিয়জন।

১৯৬৯ সালের ২০ জানুয়ারি দুপুরের দিকে স্বৈরাচারী আইয়ুববিরোধী ছাত্র-আন্দোলনের এক পর্যায়ে একটি জঙ্গী মিছিলে নেতৃত্বদানকালে জনৈক পুলিশ অফিসারের পিস্তলের গুলিতে যখন আসাদ নিহত হয়েছিলেন, ঘটনাচক্রে আমিও সেদিন চাঁনখার পুলের চৌরাস্তায় পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষরত সেই মিছিলে আসাদের খুব কাছাকাছি ছিলাম। ঢাকা মেডিকেল কলেজের হাসপাতালের বেডে বুকে-গুলিবিদ্ধ আসাদের মৃতদেহও আমি দেখেছি। আসাদ যে শিবপুরের কৃতী সন্তান— নরসিংদী, বিশেষ করে শিবপুরের মানুষ গর্বের সঙ্গে তা স্মরণ করে। আসাদের কথার সূত্র ধরে আমাদের আলোচনায় আসেন কবি শামসুর রাহমান। শামসুর রাহমানের জন্ম পুরনো ঢাকার আওলাদ হোসেন লেনে হলেও তাঁর পৈত্রিক নিবাস নরসিংদী মহকুমার রায়পুরা থানার অন্তর্গত পাড়াতলী গ্রামে।

আসাদের মৃত্যুসংবাদ দাবানলের মতো ঢাকায় ছড়িয়ে পড়লে, আসাদের রক্তাক্ত শার্টটিকে পতাকার মতো বহন করে একটি দীর্ঘ মিছিল সেদিন ঢাকার রাজপথ প্রকম্পিত করেছিল। সেই মিছিলের পুরোভাগে লাল পতাকার মতো উড্ডীন আসাদের রক্তরঞ্জিত শার্টটি শামসুর রাহমানের চোখে পড়েছিল। তখনই তাঁর মনের ভিতরে একটি কবিতার জন্ম হয়। দৈনিক পাকিস্তান কার্যালয়ে গিয়ে সম্পাদকীয় লেখার পরিবর্তে শামসুর রাহমান নিউজপ্রিন্টে লিখেন তাঁর বিখ্যাত 'আসাদের শার্ট' কবিতাটি। নরসিংদীর বীর সন্তান, কৃষক আন্দেলনের অন্যতম সংগঠক মওলানা ভাসানীর শিষ্য শহীদ আসাদ নরসিংদীর আরেক কৃতীসন্তান কবি শামসুর রাহমানের কবিতায় এভাবেই অমর আসন লাভ করেন।

শহীদ আসাদ (১৯৪২-১৯৬৯; জন্ম : ধানুয়া গ্রাম, থানা শিবপুর) এবং কবি শামসুর রাহমান (১৯২৯-২০০৬; পিতৃনিবাসঃ পাড়াতলী গ্রাম, থানা রায়পুরা)-এর জন্মস্থানের ওপর দিয়ে আমি আমার নিজ জন্মস্থানের দিকে যাচ্ছি। শহীদ আসাদ ও কবি শামসুর রাহমানকে নিয়ে আলোচনা করে আমার খুব ভাল লাগল। ২৫ মার্চের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পর কবি শামসুর রাহমান কেমন আছেন, কোথায় আছেন, বেঁচে আছেন কি না, কিছুই জানি না। আমার বন্ধু কবি আবুল হাসান বা মহাদেব সাহার খবরও নিতে পারিনি। তবে কোনো দুঃসংবাদ যখন পাইনি, তখন ওঁরা বেঁচে অছেন বলেই মনে হলো।

বিভিন্ন মানুষের সঙ্গে কথা বলে বুঝলাম, কবি শামসুর রাহমান যে নরসিংদীর মানুষ, তা নরসিংদীর অনেকেই জানে না। তিনি গ্রামের সঙ্গে খুব একটা সম্পর্ক রাখেন না। এলাকায় তাঁর যাতায়াতও প্রায় নেই বললেই চলে। বাস্তবকারণেই, নাগরিক কবির অভিধায় ভূষিত শামসুর রাহমানের কবিতাতে নরসিংদী-রায়পুরার গ্রাম জীবনের চিত্রও ছিল অনুপস্থিত। পাক-দখলদার বাহিনীর হাত থেকে বাংলাদেশ মুক্ত হওয়ার পর শামসুর রাহমান আমাদের একটি লেখায় জানিয়েছেন যে, একাত্তরের মাঝামাঝি সময়ে জীবন বাঁচাতে তিনি তাঁর পৈত্রিক নিবাস, যেখানে রয়েছে তার শিকড়, সেই সাত-পুরুষের গ্রাম পাড়াতলীতে গিয়ে কিছুদিনের জন্য আশ্রয় নিয়েছিলেন। ঐ গ্রামের বাড়ির পুকুর-ঘাটে বসেই তিনি এক দুপুরে লিখেছিলেন তাঁর দুটি বিখ্যাত কবিতা– 'স্বাধীনতা তুমি' এবং 'তোমাকে পাওয়ার জন্য, হে স্বাধীনতা'। তাঁর ভাষায়, 'ঐ কবিতা দু'টি কে যেন আমাকে দিয়ে লিখিয়ে নিয়েছিল।'

কিছুদিন বন্ধ থাকার পর স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রটি আবার আকাশে ফিরে আসাতে আমাদের সবারই খুব আনন্দ হলো। যতক্ষণ শোনা গেল আমরা পিনপতন নীরবতার মধ্যে বসে ঐ বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠান শুনলাম। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের প্রচারিত অনুষ্ঠানে আমার বেশ ক'জন বন্ধুর পরিচিত কণ্ঠ শুনতে পেয়ে আমি খুব উত্তেজিত বোধ করলাম। ইচ্ছে হচ্ছিল, পাখির মতো ডানা মেলে উড়ে যাই। মনে হচ্ছিল, আমার কানের ভিতর দিয়ে মরমে পশেছে যে আহ্বান, সেই আহ্বানে আমাকে সাড়া দিতেই হবে। দেশমাতৃকার মুক্তির জন্য আমার সমস্ত শক্তি ও সামর্থ্য নিয়ে আমি সেখানেই যুক্ত করব নিজেকে।

কিন্তু বেতারকেন্দ্রটি ঠিক কোথায় অবস্থিত, তা জানার কোনো উপায় ছিল না। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত সেদিন রাতের সংবাদ ও অন্যান্য অনুষ্ঠানে ঠিক কী কী বলা হয়েছিল, তা ভুলে গিয়েছি।

রবীন্দ্রনাথ ত্রিবেদী সম্পাদিত 'একাত্তরের দশ মাস' গ্রন্থ থেকে সেদিনের কিছু সংবাদ-কণিকা এখানে উদ্ধৃত করছি।

সকাল ১০টায় ও রাত ৮-৩০ মিঃ দ্বিতীয়বারের মতো স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র চালু করা হয় ভারতের আগরতলা বিএসএফ-এর ১২ ব্যাটেলিয়নের সদর দফতর থেকে। ৮ এপ্রিল পর্যন্ত বিপ্লবী বেতার চালু থাকে। ৯ এপ্রিল থেকে ১১ এপ্রিল বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠান প্রচার অনিবার্য কারণে বন্ধ থাকে।

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা কবি বেলাল মোহাম্মদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাছে পরে জেনেছিলাম, 'অনিবার্য কারণে' বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠান সম্প্রচার বন্ধ হয়ে যাবার অন্তরালের আসল ঘটনাটা।

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে তখন অনেক অনুষ্ঠানেই দখলদার পাকসেনাদের বর্বরতার কাহিনী প্রচারিত হতো। পাকসেনা মানেই পাঞ্জাবী-সেনা। পাকসেনাদের মধ্যে পাঠান, বা বালুচরা থাকলেও তাদের সবারই নিয়ন্ত্রক ছিল মূলত পাঞ্জাবী সেনারাই। জাতিপরিচয়ে যারা ছিল পাঞ্জাবী। ১৯৪৭ সালে দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে বাংলার মতো পাঞ্জাবও দ্বিখণ্ডিত হয়। মুসলমান অধ্যুষিত পশ্চিম পাঞ্জাব পড়ে পাকিস্তানে আর পূর্ব পাঞ্জাব পড়ে ভারতে। হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় তখন প্রচুর প্রাণ ও সম্পদহানির ঘটনা ঘটে। তারপরও জাতিতৃষ্ণা বলে কথা। ধর্মের চেয়েও অনেক পুরনো এই ব্যাধি। তাই পাঞ্জাব ভাগ হয়ে গেলেও পাঞ্জাবীরা তাদের জাতিসত্তার গর্বিত পরিচয়কে ঠিকই আগলে রাখে বাঙালিদের মতোই। বিএসএফ-এর সদর দফতরে কর্মরত হিন্দু-পাঞ্জাবী সৈনিকরা তাদের মুসলমান-পাঞ্জাবী ভাইদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ও নিন্দামন্দ প্রচার থেকে বিরত থাকার জন্য স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের ওপর চাপ সৃষ্টি করে। তাতে একটি অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়। রামকে বাদ দিয়ে রামায়ণ রচনা যেমন সম্ভব নয়, পাঞ্জাবীদের বাদ দিয়ে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের রামায়ণ রচনাও তেমনি সম্ভব নয়। কিন্তু সর্দারজীরা তার মর্ম বুঝতে রাজি নয়। যারা আশ্রয়দানকারী, তারা আশ্রিতের যুক্তি মানবে কেন? তাই একপর্যায়ে জাত্যাভিমানী সর্দারজীরা আমাদের স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠান সম্প্রচার গায়ের জোরে বন্ধ করে দিলে ৯ এপ্রিল থেকে ১১ এপ্রিল পর্যন্ত স্বাধীন বাংলা বেতারের অনুষ্ঠান সম্প্রচার বন্ধ হয়ে যায়। পরে উপর মহলের ফলপ্রসূ হস্তক্ষেপের পর ১২ এপ্রিল থেকে আবার তার সম্প্রচার শুরু করা সম্ভব হয়।

ঐদিনের উল্লেখযোগ্য খবরের মধ্যে আরও ছিল– আওয়ামী লীগ নেতা তাজউদ্দীন আহমদের সঙ্গে বিএসএফ-এর প্রধানের যোগাযোগ ঘটে। তাঁকে দিল্লিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী মিসেস গান্ধীর সঙ্গে আলোচনার জন্য বলা হলে তাজউদ্দীন দিল্লি যাবার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করেন।

পাকবাহিনীর একটি দল জামায়াত ও মুসলিম লীগের দোসরদের সহায়তায় মৌলভীবাজারের দেওড়াছড়া চা বাগানের শ্রমিকদের উলঙ্গ করে হাত-পা বেঁধে হত্যা করে। দেওড়াছড়া হয় জনশূন্য।

স্বাধীন বাংলা বেতারের সংবাদে আরও জানা যায় যে, কর্নেল এমএজি ওসমানী, আবদুল মালেক উকিল, মিজানুর রহমান চৌধুরী, এম আর সিদ্দিকী ও আলহাজ্ব জহুর আহমদ চৌধুরীসহ বেশ ক'জন উল্লেখযোগ্য আওয়ামী লীগ নেতা নিরাপদে ভারতের আগরতলায় পৌছেছেন। মুক্তির নৌকার পালে যে মহাসমুদ্রের টান লেগেছে, তাতে আর সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুক্তিযুদ্ধে শামসুর রাহমানের কবিতা

২৫ মার্চের গণহত্যার পর কিছুদিন ঢাকায় এবাড়ি-ওবাড়িতে পালিয়ে বেড়ানোর পর অন্য অনেকের মতো কবি শামসুর রাহমানও তাঁর গ্রামের বাড়ি নরসিংদীর পাড়াতলীতে চলে গিয়েছিলেন। ঢাকা শহরে পাকসেনাদের নির্বিচার গণহত্যা চালানোর এই একটা সুফল ফলেছিল ১৯৭১ সালে। পাকহানাদার বাহিনীর ভয়ে ঢাকাকে কেন্দ্র করে ক্রমশ গড়ে ওঠা শিকড়চ্ছিন্ন নব্যনাগরিক শ্রেণীর অনেকেই তখন 'গ্রামছাড়া ঐ রাঙা মাটির পথ' ধরে তাদের গ্রামের বাড়িতে ফিরে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন। শামসুর রাহমানের যে একটি গ্রাম আছে, তাঁরও শিকড় যে গ্রামে, তা ১৯৭১-এর আগে আমার মতো অনেকেরই জানা ছিল না। শামসুর রাহমানকে তাঁর গ্রামের বাড়িতে যেতে বাধ্য করার জন্য পাকসেনাদের ধন্যবাদ দিতে হয়। ঐ ঘটনাটি আত্মনিমগ্ন নাগরিক কবি শামসুর রাহমানকে আমাদের দেশের বৃহত্তর গ্রাম-জীবনের সঙ্গে যুক্ত করেছিল এবং তাঁর কবিতা হয়ে উঠেছিল জনঘনিষ্ঠ এবং প্রতিবাদমুখর।

তাঁর গ্রামের বাড়ির বাঁধানো পুকুর ঘাটে বসে তিনি লিখেছিলেন তাঁর বিখ্যাত কবিতাদ্বয় 'স্বাধীনতা তুমি' এবং 'তোমাকে পাওয়ার জন্য, হে স্বাধীনতা।' সে কথা আমি আগেও কিছুটা বলেছি। কিন্তু যা বলা হয়নি, তা হলো মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে বন্দিশিবিরে বসে লেখা শামসুর রাহমানের মুক্তিযুদ্ধের সাহসশিখা-উসকানো উদ্দীপক কবিতাগুলো পাকসেনা ও তাদের দোসরদের চোখে ধুলো দিয়ে সীমান্ত পেরিয়ে কীভাবে ভারতের আগরতলা ও কলকাতায় পৌঁছেছিল, সেই চমকপ্রদ বীরত্বের কাহিনী। সেই কাহিনীও আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। শামসুর রাহমানের ঐ কবিতাগুলো আমাদের অনেক মুক্তিযোদ্ধাকে রণক্ষেত্রে সাহসে, আশায় ও বিশ্বাসে উজ্জীবিত করেছিল। অনুপ্রাণিত করেছিল বাংলা ভাষার অগণিত পাঠককে। তাঁর কবিতাগুলো সাইক্লোস্টাইল করে ছাপিয়ে বিভিন্ন রণাঙ্গনে বিলি করা হয়েছিল এবং কলকাতার 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ার কারণে তাঁর কবিতা অনেকের হাতেই পৌঁছতে পেরেছিল। শামসুর রাহমানের সেই টাটকা কবিতাগুলো তখন মুজিবনগরস্থ স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকেও প্রচারিত হয়েছিল।

আমাদের আরেকজন গুরুত্বপূর্ণ কবি রফিক আজাদ, যিনি অস্ত্র হাতে কাদের বাহিনীর সদস্য হয়ে বিভিন্ন রণাঙ্গনে ছিলেন, শামসুর রাহমানের ঐ কবিতাগুলো সম্পর্কে তিনি আমাদের জানিয়েছেন—

> 'তিনি [শামসুর রাহমান] মুক্তিযুদ্ধে রাইফেল নিয়ে যুদ্ধ করেননি সত্য, কিন্তু তিনি যুদ্ধ করেছেন কলম দিয়ে। 'বন্দিশিবির থেকে' কবিতার কথা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মনে করুন। এটি আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে ছিল অসামান্য কিছু। আমাদের অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে। তাঁর হাতে লেখা কবিতা, সাইক্লোস্টাইল করে শাহাদত চৌধুরী সখীপুরে পৌঁছাত। সেখান থেকে বিভিন্ন ক্যাম্পে পৌঁছাত। আশ্চর্যভাবে তাঁর কবিতায় স্পষ্ট করে উল্লেখ থাকত যে, বেশি দিন যুদ্ধ করতে হবে না। শিগগিরই আমরা স্বাধীনতা অর্জন করব। এই যে কথা তা আজকে সাধারণ মনে হলেও যুদ্ধকালে তা ছিল অমিয়বাণীর মতো। মুক্তিযোদ্ধাদের জাগ্রত করার ক্ষেত্রে এ ধরনের আশার বাণী তা কি ভোলার মতো?

'দেশ' পত্রিকায় মজলুম আদিব নামে তিনি লিখেছেন সে সময়। কলকাতার দেশ পত্রিকা তখন শামসুর রাহমানের কবিতা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করেছে। সাইক্লোস্টাইল করা কিছু কিছু কবিতা হয়তো বা টাঙ্গাইলে পাওয়া যেতে পারে।'

(দ্রঃ মুক্তিযুদ্ধে তিনি ছিলেন অনুপ্রেরণা : রফিক আজাদ। মোহাম্মদ শাজাহান সম্পাদিত 'শামসুর রাহমান : জীবনমঙ্গলের কবি')

শামসুর রাহমান মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে পারিবারিক কারণে ঢাকা ছেড়ে ভারতে যেতে পারেননি। তখনকার ছাত্র ইউনিয়ন নেতা মতিউর রহমান (প্রথম আলো সম্পাদক) তাঁকে পাড়াতলী থেকে ভারতে নিয়ে যেতে নরসিংদী গিয়েছিলেন, কিন্তু পরিবারকে অনিশ্চয়তার মধ্যে ফেলে রেখে তিনি যেতে পারেননি। তিনি জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তাঁর ভাষায় 'বন্দিশিবিরে' দুঃসহ দিন কাটিয়েছেন এবং লুকিয়ে লুকিয়ে মুক্তিযুদ্ধের কবিতা লিখেছেন।

একবার ভাবুন তো, বন্দিশিবিরে বসে লেখা তাঁর সেই কবিতাগুলো যদি তাঁর হাতেই থেকে যেত, মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে যদি সেগুলো আলোর মুখ না দেখত, যদি তাঁর ঐ কবিতাগুলো সাইক্লোস্টাইলে মুদ্রিত হয়ে আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে না পৌঁছাত? যদি ঐ কবিতাগুলো ছাপা না হত দেশ পত্রিকায়? যদি পঠিত না হতো স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র বা আকাশবাণী থেকে, তবে?

মুক্তিযুদ্ধের অবসানে ১৬ ডিসেম্বরে আমাদের বিজয় লাভের পর তাঁর ঐ সব কবিতা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হতো ঠিকই, কাব্যপাঠকদের প্রশংসাও নিশ্চয়ই জুটত তাদের ভাগ্যে। কিন্তু শিল্পমান বিচারে যত ভালো কবিতাই হোক না কেন, তারা কখনও আমাদের মুক্তিযুদ্ধের অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হতে পারত না। তাঁর ঐ কবিতাগুলো আমাদের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী কবিতার মর্যাদা থেকে বঞ্চিত হতো। মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেয়া 'মুক্তিযোদ্ধা কবিতা' হিসেবে কখনও গণ্য হতে পারত না। মুক্তিযোদ্ধারাও বঞ্চিত হতো রণক্ষেত্রে প্রেরণা ও প্রত্যয় সৃষ্টিকারী তাঁর ঐ বলিষ্ঠ উদ্দীপক কবিতাগুলোর সুধারস থেকে। সুতরাং শামসুর রাহমানের কবিতা ছড়িয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেয়ার ঐ গুরুত্বপূর্ণ কাজটি সেদিন যারা সম্পন্ন করেছিলেন, জীবনের ঝুঁকি নিয়ে যারা শামসুর রাহমানের কবিতা বুকে-পিঠে বহন করে দেশের ভিতরের মুক্তাঞ্চলে এবং দেশের বাইরে ভারতের আগরতলা ও কলকাতায় নিয়ে গিয়েছিলেন, তাদের কথা যেন আমরা ভুলে না যাই। তাদের ভূমিকাকে আমরা যেন এতটুকু খাটো করে না দেখি। আমি মনে করি, তাঁরা যদি আর কিছু নাও করতেন, তবু শুধু এই দায়িত্বটুকু পালন করার জন্যই আমরা তাদের শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতাম।

এই কাজের কাজটি শামসুর রাহমানের কবিতার ভক্ত যে দুজন তরুণ সেদিন সম্পন্ন করেছিলেন, তারা হলেন সাপ্তাহিক ২০০০ পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক, চারুশিল্পী শাহাদত চৌধুরী ও জনাব হাবীবুল আলম বীরপ্রতীক। ১৯৭১ সালে ওঁরা দুজন ছিলেন পরস্পরের ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং আমাদের কিংবদন্তী মুক্তিযোদ্ধা খালেদ মোশাররফের নেতৃত্বে গঠিত জেড ফোর্সের সদস্য। শাহাদত চৌধুরী আজ আর আমাদের মধ্যে নেই। আমার দুঃখ, সে জেনে যেতে পারল না, আমি তাঁরই রেখে যাওয়া পত্রিকায় আমার জীবনের দীর্ঘতম এবং আমাদের জাতীয় জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময়ের স্মৃতিকথা ধারাবাহিকভাবে লিখছি। কবি শামসুর রাহমানও গত বছর ১৭ আগস্ট লোকান্তরিত হয়েছেন। আমি কেন যে আরও আগে এটি লিখিনি। তাহলে শামসুর রাহমানও নিশ্চয়ই খুশি হতেন। তবে তিনি বেঁচে থাকলে আমার লেখায় তিনি এতটা জায়গাজুড়ে আসতেন কি না, কে জানে?

শামসুর রাহমানের কবিতা পাচারের বিষয়টি নিয়ে ঘটনাটির প্রত্যক্ষকারী হিসেবে জনাব হাবীবুল আলম বীরপ্রতীকের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। তিনি অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে আমাকে বলেছেন, এই ঘটনাটির সমস্ত কৃতিত্ব শাহাদত ভাইয়ের। আমি শুধু তাঁর সঙ্গে ছিলাম। তিনিই আমাকে নিয়ে দুবার কবি শামসুর রাহমানের বাসায় গিয়েছিলেন। প্রথমবার জুলাই মাসে ও পরে আগস্টের কোনো একদিন, দিনের বেলায়। শামসুর রাহমান দুবারই তাঁর রচিত কবিতা শাহাদত ভাইয়ের হাতে তুলে দিয়েছিলেন। শামসুর রাহমান তাঁর পুরনো ঢাকার আওলাদ হোসেনের বাসায় তাদের চা দিয়ে খুব সঙ্গোপনে আপ্যায়নও করেছিলেন এবং কবিতা নিয়ে ফেরার সময় তাদের পিঠে হাত রেখে বলেছিলেন, ভয় নেই। শামসুর রাহমানের কবিতা ও অভয়বাণী সেদিন দুই তরুণের মনেই নতুন করে সাহস সঞ্চার করেছিল।

কবিতা নিয়ে তারা চলে যান। হাবীবুল আলম যান তাঁর যুদ্ধক্ষেত্র ২নং সেক্টরের মেলাঘরে। শাহাদত যান আগরতলায়। সেখানে 'দি হিন্দু' পত্রিকার সাংবাদিক ছিলেন অনিল ভট্টাচার্য। তাঁর মাধ্যমেই শামসুর রাহমানের কবিতা কলকাতায় পাঠানো হয়।

শামসুর রাহমানের কবিতা কীভাবে দেশ পত্রিকায় প্রকাশের ব্যবস্থা হয়, তার বিবরণ শামসুর রাহমানের আত্মজীবনী 'কালের ধুলোয় লেখা' গ্রন্থে তিনি নিজেই লিখেছেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'অবরুদ্ধ ঢাকা শহরে একদিন বিকেলে আমাদের বাসায় এসে হাজির হলেন তেজী মুক্তিযোদ্ধা আলম (হাবীবুল আলম বীরপ্রতীক) এবং তার সহযোগী শাহাদত চৌধুরী। কিছুক্ষণ ওরা আমার সঙ্গে কথাবার্তা বললেন। আমি তাঁদের কয়েকটি কবিতা পড়ে শোনালাম। সাম্প্রতিক পরিস্থিতি নিয়ে রচিত কবিতাবলি শুনে ওঁরা কলকাতায় পাঠানোর ব্যবস্থা করবেন বলে স্থির করলেন। কয়েকটি কবিতা শেষ পর্যন্ত শিল্পী আলভির মাধ্যমে শাহাদত চৌধুরী কলকাতায় শ্রদ্ধেয় আবু সায়ীদ আইয়ুব-এর কাছে পাঠাতে পেরেছিলেন। আবু সায়ীদ ও তাঁর সহধর্মিণী গৌরী আইয়ুবের উদ্যোগ ও উৎসাহে আমার 'বন্দিশিবির থেকে' কাব্যগ্রন্থটি কলকাতায় ১৯৭২ সালের জানুয়ারি মাসে প্রকাশিত হয়। এই বইয়ের দু'চারটি কবিতা কলকাতার সাপ্তাহিক 'দেশ'-এ মজলুম আদিব ছদ্মনামে বেরিয়েছিল। এই ছদ্মনামটি রেখেছিলেন খোদ আবু সায়ীদ আইয়ুব। মজলুম আদিব-এর অর্থ হচ্ছে নির্যাতিত লেখক।

...আমার কয়েকটি কবিতা শার্ট ও প্যান্টের কোনও কোনও অংশে লুকিয়ে নিয়ে কিছুক্ষণ পর ওঁরা আমার এখান থেকে বেরিয়ে গেলেন।'

(কালের ধুলোয় লেখা, পৃঃ ২৮০)

AMARBOI.COM

'স্বাধীনতা তুমি' ও 'তোমাকে পাওয়ার জন্য, হে স্বাধীনতা' কবিতা দুটোর রচনার পটভূমি আমি তাঁর মুখে শুনেছি। ঘটনাটি তাঁর আত্মজীবনীতে নিজ ভাষ্যে বর্ণিত হয়েছে এভাবে :

'এপ্রিল মাসের সাত অথবা আট তারিখ দুপুরের কিছুক্ষণ আগে বসেছিলাম আমাদের পুকুরের কিনারে গাছতলায়। বাতাস আদর বুলিয়ে দিচ্ছিল আমার শরীরে। পুকুরে ছোট ছোট ছেলে মেয়ে, কিশোর-কিশোরীও ছিল ক'জন, সাঁতার কাটছিল মহানন্দে। হঠাৎ আমার মনে কী যেন বিদ্যুতের ঝিলিকের মতো খেলে গেল। সম্ভবত একেই বলে প্রেরণা। কবিতা আমাকে জড়িয়ে ধরল। আমি চট্‌জলদি আমার মেজ চাচার ঘরে চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্র চাচাতো ভাইয়ের কাছ থেকে একটা কাঠপেন্সিল এবং কিছু কাগজ চাইলাম। সে কাঠপেন্সিল এবং একটি রুলটানা খাতা দিল। এই কাঠ পেন্সিল এবং খাতা দিয়ে সে যেন নিজেকে খুবই সৌভাগ্যবান মনে করল। আমি সেই কাঠপেন্সিল এবং খাতাটি নিয়ে তাড়াতাড়ি পুকুরের দিকে ছুটলাম। পুকুর মুন্সীবাড়ির একেবারে গা ঘেঁষে তার অবস্থান ঘোষণা করছে যেন সগর্বে। পুকুরের প্রতিবেশী সেই গাছতলায় আবার বসে পড়ে খাতায় কাঠপেন্সিল দিয়ে শব্দের চাষ শুরু করলাম। প্রায় আধ ঘণ্টা কিংবা কিছু বেশি সময়ে পর পর লিখে ফেললাম দুটি কবিতা 'স্বাধীনতা তুমি' এবং 'তোমাকে পাওয়ার জন্য, হে স্বাধীনতা।' (কালের ধুলোয় লেখা, পৃঃ ২৭০)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহে কবি শামসুর রাহমান নরসিংদীতে তাঁর গ্রামের বাড়ি রায়পুরা থানার পাড়াতলী গ্রামে গিয়েছিলেন। আমি নরসিংদীতে ছিলাম ৩ এপ্রিল। কে জানে, হয়তো তখন তিনিও নরসিংদীতেই ছিলেন। তাঁর আত্মজীবনীতে ঢাকা ছেড়ে নরসিংদীর গ্রামের বাড়িতে যাবার তারিখটি লিপিবদ্ধ নেই। তবে নরসিংদীর পথে শামসুর রাহমানের ঢাকা ত্যাগের বর্ণনাটি আমার অভিজ্ঞতার সঙ্গে খুব মেলে। তিনি লিখেছেন :

> 'সকাল দশটা সাড়ে দশটার সময় ঢাকা থেকে বাসে চেপে রওয়ানা হলাম নরসিংদীর উদ্দেশে। সেখান থেকে নৌকায় মেঘনা নদী পেরিয়ে পৌঁছতে হয় আমাদের পাড়াতলীর আলুঘাটায়। সেখানে কিছু পথ পেরুলেই আমাদের মুন্সিবাড়ি। এটা বলা তো খুবই সহজ মনে হচ্ছে, কিন্তু সেদিন পাড়াতলী পৌঁছতে পারাটা তেমন অনায়াস ছিল না। শুরু হলো আমাদের যাত্রা বাসের দুলুনি খেতে খেতে। মনে সংশয়, বিপদের আশংকা পদে পদে। ডেমরার কাছে এক জলাশয়ে দেখতে পেলাম ভাসমান চার-পাঁচটি মৃতদেহ। পাক হানাদারদের করুণ শিকার। চোখ ফিরিয়ে নিলাম সেই দৃশ্য থেকে পলায়নপর আমি।'
>
> (কালের ধুলোয় লেখা, পৃঃ ২৬৮)

শহীদ আসাদকে নিয়ে লেখা শামসুর রাহমানের 'আসাদের শার্ট' কবিতাটি ছিল কবি শামসুর রাহমানের কাব্যজীবনের একটি টার্নিং পয়েন্ট। এই কবিতা-রচনার পটভূমি সম্পর্কে তিনি লিখেছেন :

> 'চোখের সামনে বারবার ভেসে উঠছিল লাঠির ডগায় ঝুলে-থাকা একটি রক্তাক্ত শার্ট। আসাদের শার্ট। যাকে আমি দেখিনি কোনদিন, সেই মুক্তিকামী, রাজনীতিসচেতন, দেশপ্রেমিক যুবকের কথা ভেবে মনে এক ধরনের শূন্যতার সঙ্গে সঙ্গে আশার এক পবিত্র প্রদীপ জ্বলজ্বলে হয়ে কাঁপছিল। এই আত্মদান কি বৃথা লুণ্ঠিত হতে পারে পথের ধুলোয়? আমাদের দুঃখিনী বাংলা কি পরাধীনতার শেকলবন্দি হয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদবে শুধু? মুক্তির আলোকধারায় স্নাত হবে না কি তার সত্তা? অফিসের চেয়ারে বসেই আমি আমার অজ্ঞাতে যেন নিঃশব্দে উচ্চারণ করছিলাম দু'টি শব্দ 'আসাদের শার্ট'। সেদিন দুপুর কিংবা বিকেলে কারও সঙ্গে বেশি কথা বলিনি। বলতে পারিনি। গোধূলিবেলায় হেঁটে বাড়ি ফিরেও নীরব ছিলাম। সন্ধ্যারাতে লেখার টেবিলে ঝুঁকে প্রায় ঘণ্টাখানেকের মধ্যে লিখে ফেললাম 'আসাদের শার্ট' কবিতাটি।...
>
> 'আমাদের দুর্বলতা, ভীরুতা, কলুষ আর লজ্জা
> সমস্ত দিয়েছে ঢেকে একখণ্ড বস্ত্র মানবিক;
> আসাদের শার্ট আজ আমাদের প্রাণের পতাকা।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র ও শামসুর রাহমান, নজরুল ইসলাম ও জীবনানন্দ দাশ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ও রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

গ্রামের বাড়ি নরসিংদীর পাড়াতলীতে আত্মগোপনে থাকার সময় কবি শামসুর রাহমান স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত অনুষ্ঠান শুনে ভীষণ উজ্জীবিত বোধ করতেন। তাঁর আত্মজীবনী 'কালের ধুলোয় লেখা' গ্রন্থে শামসুর রাহমান লিখেছেন :

> 'খবর পাওয়ার একমাত্র উৎস ছিল রেডিও। প্রায় সারাক্ষণই খুলে রাখা হতো, কান পেতে শুনতাম স্বাধীন বাংলা বেতার, আকাশবাণী এবং বি.বি.সি। তবে লুকিয়ে নয়, প্রকাশ্যেই ভল্যুম চড়িয়ে। কারণ পাড়া-পড়শীদের কয়েকজন হাজির হতেন সংবাদ তৃষ্ণায় কাতর হয়ে। যেদিন স্বাধীন বাংলা বেতার শোনা যেত না, সেদিন সবকিছু কেমন আবছা মনে হতো। এক ধরনের মনের তো বটেই, সারাদিনের মুখও নিরাশায় কালো হয়ে যেত। তারপর হঠাৎ সেই বেতার কেন্দ্র সচল হলেই মনে সূর্যোদয়।'
>
> (কালের ধুলোয় লেখা, পৃঃ ২৭০)

AMARBOI.COM

কবির কাছে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র ছিল, তাঁর নিজের ভাষায়– 'সচল হলেই মনে সূর্যোদয়।' ১৯৭১ সালে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র শুধু শামসুর রাহমানের মনে নয়, মুক্তিকামী সকল বাঙালির মনেই সূর্যোদয়ের আনন্দ ছড়িয়ে দিত। 'সচল হলেই মনে সূর্যোদয়...' স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের ঐতিহাসিক গুরুত্ব শামসুর রাহমান রচিত এই চিত্রকল্পের মধ্যে চমৎকারভাবে বর্ণিত হয়েছে।

আমাদের মুক্তিযুদ্ধে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ভূমিকা সম্পর্কে আমি পূর্বেও আলোচনা করেছি। ঐ বেতার কেন্দ্র স্থাপনের সঙ্গে যারা সংশ্লিষ্ট ছিলেন, জীবনের ঝুঁকি নিয়ে যাঁরা সেদিন দায়িত্ব পালন করেছিলেন, দুঃখের বিষয়, তাঁদের রাষ্ট্রীয়ভাবে কখনও সম্মান জানানো হয়নি। মুক্তিযুদ্ধে বীরত্ব প্রদর্শনের জন্য কিছুসংখ্যক মুক্তিযোদ্ধাকে বীরশ্রেষ্ঠ, বীর উত্তম ও বীর প্রতীক খেতাবে ভূষিত করা হয়েছে। কিন্তু স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার সঙ্গে যুক্ত 'শব্দ-সৈনিক'দের মধ্য থেকে কাউকে তেমন কোনো খেতাব প্রদান করা হয়নি। বিলম্বে হলেও এটা করতে হবে। ভুল হয়ে গেছে। ভুলটা অবশ্যই আমাদের শোধরাতে হবে। বেটার লেট দ্যান নেভার। আগেও আমি এই দাবি উত্থাপন করেছি, কবি শামসুর রাহমানকে সাক্ষী রেখে সেই দাবি আজ আবারও উত্থাপন করছি। ন্যায্য কথা বারবার বললেও দোষ নেই। লজ্জা নেই। অধিকন্তু ন দোষায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লেখক-গবেষক আফসান চৌধুরী সম্পাদিত 'বাংলাদেশ ১৯৭১' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড থেকে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র সম্পর্কে প্রয়োজনীয় কিছু তথ্য এখানে উদ্ধৃত করছি। স্বাধীন বাংলা বেতারের যাত্রা শুরুর দিনগুলো ঐ গ্রন্থে স্বল্পপরিসরে সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে।

> '২৫ মার্চ অষ্টম বেঙ্গল এবং ইপিআর-এর প্রতিরোধের ফলে চট্টগ্রামে 'অপারেশন সার্চ লাইট' ব্যর্থ হয়। পাক সৈন্যরা শুধু চট্টগ্রাম শহর ও বন্দর নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে। এছাড়া সমগ্র চট্টগ্রাম বাঙালিদের অধীনে চলে আসে। এই হিসাবে চট্টগ্রাম বেতার কেন্দ্রও তাদের দখলে আসে।
>
> চট্টগ্রাম বেতারের আঞ্চলিক প্রকৌশলী মীর্জা নাসিরউদ্দিন, প্রকৌশলী আবদুস সোবহান, টেকনিশিয়ান আবদুস শুকুর (শাকের), দেলওয়ার, মোসলেম খান প্রমুখের চেষ্টায় ২৬ মার্চ দুপুরে বেতার চালু হয়। বেতার কার্যক্রম শুরু হওয়ার ঘোষণা দেন রাখালচন্দ্র বণিক। আগ্রাবাদে বেতারের এই সম্প্রচার সময়ের কার্যকাল ছিল মাত্র ৫ মিনিট।
>
> ঐদিনই বেতার কর্মকর্তা বেলাল মোহাম্মদের প্রচেষ্টায় কালুরঘাটে বেতার কেন্দ্র চালু করা হয়। সন্ধ্যা ৭-৪০মি. আবুল কাসেম সন্দ্বীপ অনুষ্ঠানের সূত্রপাত করেন 'স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র থেকে বলছি' ঘোষণার মাধ্যমে। আধ ঘণ্টা অনুষ্ঠানের পর, পরদিন ২৭ মার্চ সকাল ৭টায় পরবর্তী অনুষ্ঠানের ঘোষণা দিয়ে অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।
>
> ২৬ মার্চেই রাত ১০টার সময় মাহমুদ হোসেনের প্রচেষ্টায় ফারুক চৌধুরী, বেতারশিল্পী রঙ্গলাল দেব এবং কবির হোসেনের সহায়তায় কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে আরেকটি অধিবেশন প্রচারিত হয়। বেতারের দু'জন প্রকৌশলী দেলওয়ার ও সোবহান তাদের সঙ্গে ছিলেন। এই সময়েও স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী বেতার কেন্দ্র হিসেবে ঘোষণা দেওয়া হয়। এই অধিবেশন চলে প্রায় ১০ মিনিট।
>
> ২৬ মার্চ এভাবে তিনটি গ্রুপে তিনবার বেতার কেন্দ্র চালু করে। একবার আগ্রাবাদে, দুইবার কালুরঘাটে।
>
> ২৭ মার্চ সকালে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজের ছাত্রদের প্রচেষ্টায় কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র পুনরায় চালুর কথা জানা যায়। তবে আগের দিনের অনুষ্ঠান প্রচার সম্পর্কে তারা সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলেন। ঐ দিন বেতার চালু করে ডা. এম এ মান্নান (হান্নান) প্রথমে ভাষণ দেন। বাংলা ও ইংরেজি সংবাদ পাঠ এবং প্রতিবেদন প্রচার করা হয়। এ-সময়ের বুলেটিনে টিক্কা খান নিহত হওয়ার খবর প্রচার করা হয়েছিল। এই সময়ে উপস্থিত ছিলেন শাহ-ই-জাহান চৌধুরী, ডা. মাফুজুর রহমান, ডা. বেলায়েত হোসেন এবং কয়েকজন বেতার প্রকৌশলী।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এদিন বিকেল থেকে বেলাল মোহাম্মদ, আবুল কাসেম সন্দীপ, আমিনুর রহমানসহ অভিজ্ঞ বেতার কর্মীগণ বেতারের পরিকল্পিত অনুষ্ঠান শুরু করেন। বাংলাদেশের জনগণের প্রতিরোধ যে এক সর্বাত্মক যুদ্ধের রূপ নিয়েছে ; বাঙালি ইপিআর, সৈনিক ও জনতা যে এই যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে, তা সকল প্রতিরোধ-যোদ্ধাকে জানিয়ে দেয়াটা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ।'

(বাংলাদেশ ১৯৭১ : ১ম খণ্ড : পৃ-৫১১-৫১২)

'Bangabandhu's recorded voice message of declaration of Independence of Bangladesh ("This may be my last message ....") were sent from Boldha Garden, Pilkhana BDR (then EPR) communication centre and written telegram messages (*JARURI GHOSHONA: ADDO RAT BARO TA BORBOR PAK BAHINI DHAKAR PILKHANA & RAZARBAG POLICE ..... : Joy Bangla"*) were sent through T & T transmission Centre at Dhaka, just after the crackdown at late night of 25.03.71 (early hours of 26.03.71).

* Chittagong District Awami League General Secretary, Mr. M A Hannan, read the Bangabandhu's Message of Declaration of Independence of Bangladesh at about 2.30 PM of 26.03.71 Chittagong City (Agrabad) Radio Station.
* Mr. Abul Kashem Swandip, Mr. Abdullah Al Faruk, Mr. Sulatanul Alam, Belal Mohammed & others read the Bangabandhu's declaration of Independence of Bangladesh at about 7.40 PM of 26.03.71 from "SHADIN BANGLA BIPLOBI BETAR KENDRA" at Kalurghat (Chittagong) Radio Station.
* Major (then) Zia read the similar message of declaration of Independence of Bangladesh by Bangabandhu (that was drafted, in English, by Zia & Mr. Belal Mohammed and in Bengali translation by Prof. Momtazuddin) on behalf of our great national leader Bangabandhu about 7.30 PM of 27.03.71 from "SHADIN BANGLA BETAR BIPLOBI KENDRA" Kalurghat (Chittagong) Radio Station.

References :

* Pakistan Crisis by Mr. David Losac, The Reporter of the Daily Telegraph, 1971
* Witness to surrender by Brig Siddique Salik of Pak Army
* American suit Report

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

* White papers of Pakistan Government
* Massacre by Mr. Robert Pain
* "SHADIN BANGLA BETAR KENDRA" by Mr. Belal Mohammed.

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র সম্পর্কে পরে আরও আলোচনা হবে। ঘুরেফিরেই আসবে স্বা.বা.বে.কে। আপাতত ঐ প্রসঙ্গের ইতি।

যাত্রাপথে রেডিওটি সঙ্গে রাখার জন্য সাইফুলকে ধন্যবাদ দিলাম। বললাম, তোমার রেডিওটি থাকার কারণে স্বাধীন বাংলা বেতারের অনুষ্ঠান আবারও শুনতে পেলাম। কী ভাল যে লাগল আমার! বুকে জড়িয়ে ধরে রেডিওটির গায়ে চুমু খেয়ে বললাম, তুমি বেঁচে থাকো সোনা। তুমি তো শুধু রেডিও নও, তুমি হলে আমাদের সকলের প্রিয় স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র। আমাদের প্রাণভোমরা তোমার মধ্যে বাঁধা। তুমি আবার আকাশে হারিয়ে যেও না।

সাইফুল জানাল যে, রেডিওটি আসলে তার নয়। ওটি তার ভগ্নিপতির। বাস্তব অবস্থাদৃষ্টে কিন্তু তেমন মনে হলো না। মনে হলো, রেডিওর আসল মালিক নকল মালিকের কাছে হার মেনেছেন। মালিক নিজে তা কদাচ ব্যবহার করার সুযোগ পান। সাইফুলের স্টেশন নির্বাচনের সঙ্গে তাল মিলানো ছাড়া বেচারা ভগ্নিপতিটির আর উপায় থাকে না। ভাবি, আহা আমারও যদি একটি রেডিও থাকত। আমি কেন যে সময়মতো একটি রেডিও কিনিনি। থাকলে আজ সেটি আমার কত কাজেই না লাগত। যখন খুশি বিবিসি, আকাশবাণী ও স্বাধীন বাংলা বেতার শুনতে পেতাম। জানতে পারতাম মুক্তিযুদ্ধের গতিপ্রকৃতি, বুঝতে পারতাম বিশ্বপরিস্থিতি। আমাদের বাড়িতে অবশ্য একটি এক ব্যান্ডের ফিলিপস রেডিও আছে। বাড়িতে গিয়ে প্রাণের তৃষা জুড়িয়ে ঐ রেডিওটিতে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠান শোনা যাবে। জানতে পারব, আমার পরিচিত ও বন্ধুদের মধ্যে কারা কারা সেখানে জয়েন করেছেন।

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে আমি কবিতা পাঠ করছি, এ রকম একটি প্রিয় দৃশ্য কল্পনা করতে করতে, ভাবতে ভাবতে, চাদর বিছানো মাটির মেঝেতে ঘুমিয়ে পড়লাম। পাকসেনাদের আক্রমণের ভয় না থাকায় রাতে অনেকদিন পর খুব ভাল ঘুম হলো।

আজ ৪ এপ্রিল। রবিবার। ঘুম ভাঙল প্রভাত-সূর্যের ডাকে। জানালা দিয়ে বাইরে তাকালাম। চোখের মধ্যে লাফিয়ে পড়ল মনোহরদির দিগন্তবিস্তৃত সবুজ-মনোহর মাঠ। রোদ-সেঁকা ভোরের হাওয়া ছুটে এসে লুটিয়ে পড়ল আমার গায়ে। মনের মধ্যে গুনগুনিয়ে উঠল নজরুলের গানের কলি...

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'এ কী অপরূপ রূপে মা তোমায়
হেরিনু পল্লী জননী।
ফুলে ও ফসলে কাদামাটি জলে
ঝলমল করে লাবণী।'

আহা! কী অপূর্ব সুন্দর আমার এই রূপসী বাংলা। মনে পড়ল জীবনানন্দের কথা। তিনি কী ভালই না বেসেছিলেন এই বাংলা নামের দেশটিকে। তাঁর রচিত রূপসী বাংলার কবিতার চরণ দিয়ে আমরা আমাদের প্রাণের শহীদ মিনার সাজিয়েছি— 'বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি'। মনে পড়লেন দ্বিজেন্দ্রলাল। একটুও বাড়িয়ে বলেননি তিনি—

'এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি,
সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি।'

এমন সুন্দর একটি দেশের পক্ষে কি পরাধীনতা মানায়? না, মানায় না। মানায় না। যা মানায়, যা আমাদের মানানো উচিত, সে কথাই তাঁর 'পদ্মিনী উপাখ্যান'-এ বলে গেছেন ব্রিটিশ-কবলিত বন্দিদেশমাতৃকার স্বাধীনতাপ্রিয় কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮২৭-১৮৮৭)। আমরা পূর্ব বাঙলার বাঙালিরা তো শেখ মুজিবের নেতৃত্বে 'স্বাধীনতার কবি'র সেই স্বপ্নের পথ ধরেই এগিয়ে চলেছি।

'স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে,
কে বাঁচিতে চায়?
দাসত্ব-শৃঙ্খল বলো কে পরিবে পায় হে,
কে পরিবে পায়?'
কোটিকল্প-দাস থাকা নরকের প্রায় হে,
নরকের প্রায়।
দিনেকের স্বাধীনতা স্বর্গসুখ তায় হে,
স্বর্গসুখ তায়।।
সার্থক জীবন আর বাহুবল তার হে,
বাহুবল তার।
আত্মনাশে যে করে দেশের উদ্ধার হে,
দেশের উদ্ধার।।
একথা যখন হয় মানসে উদয় হে,
মানসে উদয়।
নিভাইতে সে-অনল বিলম্ব কি সয় হে
বিলম্ব কি সয়?'

রঙ্গলালের এই প্রবাদকাব্যের প্রথম স্তবকটি অনেকের মতো আমারও মুখস্থ ছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু পরের স্তবকগুলো কিছুতেই মনে করতে পারছিলাম না। বাকি স্তবকগুলোর সন্ধান করতে গিয়ে আমি গবেষক-সাহিত্যিক শামসুজ্জামান খানের শরণ নিলে তিনি আমাকে ঐ কবিতার দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তবকটি উপহার দেন। চতুর্থ স্তবকটি পেয়েছি কবি-সাংবাদিক-ঔপন্যাসিক-নাট্যকার আনিসুল হকের সৌজন্যে। ঐ চারটি স্তবক হচ্ছে একটি দীর্ঘ কবিতার অংশ। যাঁরা পুরো কবিতার স্বাদ গ্রহণ করতে চান, তাঁরা কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মিনী উপাখ্যান' সংগ্রহ করে পড়তে পারেন। তবে ঐ উপাখ্যান কাব্যটি কোথায় পাওয়া যায়, আমি জানি না।

পুরাতন ব্রহ্মপুত্রকথা

শীতলক্ষ্যার তীর থেকে নরসিংদী বাজার পর্যন্ত সড়কটা মোটামুটি চলনসই ছিল। তারপর থেকেই সড়কপথের ইতি, নরকপথের শুরু। ভাঙা-চোরা, উঁচু-নিচু খানাখন্দে ভরা অপ্রশস্ত পথ। পথের কোথাও ইট বিছানো আছে, কোথাও নেই। ঢাকা থেকে সাইফুলরা যে ট্রাকটি ভাড়া করে নিয়ে এসেছিল, আমাদের মনোহরদিতে নামিয়ে দিয়ে কাল রাতেই সেটি ঢাকার উদ্দেশে ফিরে গেছে। তখনই স্থির হয়েছিল, বাকি চার-পাঁচ মাইল পথ আমরা পায়ে হেঁটেই চলে যাব। প্রয়োজনে রিকশাও নেয়া যাবে। মনোহরদি থেকে পুরাতন ব্রহ্মপুত্র পর্যন্ত সড়কপথটি ভারী ট্রাক চলার উপযোগী না হলেও রিকশা বা ঠেলাগাড়ি চলে।

সকালে তেলেভাজা মচমচে পরোটা ও মুরগির মাংস দিয়ে পেটপুরে নাস্তা করে দশটার দিকে মনোহরদির মায়া ছেড়ে আমরা রওয়ানা দিলাম কিশোরগঞ্জের প্রবেশদ্বার পুরাতন ব্রহ্মপুত্র-তীরবর্তী মঠখলা বাজারের উদ্দেশে। আমাদের মতো মনোহরদিতে কাল রাতে যারা যাত্রাবিরতি করেছিল, তারাও এসে কিশোরগঞ্জের পথে আমাদের সঙ্গে যোগ দিল। বেশ ছোটোখাটো একটা কাফেলা।

মনোহরদি থেকে নাক বরাবর উত্তরের দিকে আমরা চলেছি। আমার কল্পনায় তখন আরও একটি নদীর হাতছানি। বুড়িগঙ্গা ও শীতলক্ষ্যার পর এবার আমার যাত্রাপথে পড়বেন পুরাতন ব্রহ্মপুত্র মহাশয়। ব্রহ্মপুত্র নদী নয়, নদ। নারী নয়, পুরুষ। সেই পুরুষনদ পুরাতন ব্রহ্মপুত্র পেরিয়ে আমরা যাব মঠখলা। মঠখলা কিশোরগঞ্জ মহকুমার কটিয়াদি থানার অন্তর্গত একটি ছোট্ট বাজার।

নদীমাতৃক দেশের মানুষ আমি। হাজার নদীর দেশ বাংলাদেশ। তার দু'কূল-ভাসানো আগ্রাসীমূর্তির কথা স্মরণে রেখেও বলতে পারি, আমি নদী খুব ভালোবাসি। ভাল না বেসে উপায় নেই বলে নয়, তাকে ভালবাসতে ভাল লাগে বলেই। জানি নদী সবাই ভালোবাসে। আমি হয়তো একটু বেশিই বাসি। বেশি বলি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এজন্য যে, আমি যখন কোনো নদীর দিকে অগ্রসর হই, আমার মন এক অব্যাখ্যাত অজানা আকর্ষণে চঞ্চল হয়। আমার রক্তের মধ্যে জাগ্রত হয় নদীদর্শনের তৃষ্ণা। আমি বিশ্বাস করি সব মানুষই কমবেশি কবি। আর নদীমাতৃক দেশের মানুষদের মধ্যেই কবিদের পাল্লা ভারি। তা না হলে আমাদের প্রিয় ভাটিয়ালি গানগুলো রচিত হতে পারত না। আমাদের লোকসাহিত্যের অমূল্য সম্পদ হিসেবে বিবেচিত সারি আর ভাটিয়ালি গানগুলোর রচয়িতাদের নাম সুনির্দিষ্ট করে কেউ বলতে পারবেন কি? ঐ সব প্রাণমনকাড়া গান তো আর আকাশ থেকে নদীতে পড়েনি, নদী থেকে জন্ম নিয়ে, নানা কণ্ঠে গীত হয়েই তারা বাংলার আকাশে বাতাসে উড়েছে। অতুলনীয় ভাবসম্পদে আমাদের লোকসাহিত্যের সঙ্গীতভাণ্ডকে করেছে সমৃদ্ধ। রবীন্দ্ররচনাতেও তার অকাট্য প্রমাণ মেলে। সবচেয়ে বেশি মেলে বোধ করি জীবনানন্দ দাশের কবিতায়। তিনি যেন নিজেই নদী। আর কবি না হলেও কবিপ্রায় বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসুর নদীদর্শন আরও চমকপ্রদ। তিনি নদীকে একটি 'গতি-পরিবর্তনশীল জীব' বলে মনে করতেন। আমিও মনে করি, নদীর প্রাণ আছে। তার তীরে তীরে যে মানুষের সভ্যতা গড়ে উঠেছে, সে শুধুই তার সুপেয় জলের জন্য নয়, তার সুমিষ্ট জলের ভিতরে লুকানো প্রাণের জন্যও।

আমাদের সঙ্গে একটা লক্কড়মার্কা রিকশা ছিল। সেই রিকশা তার যাত্রীকে ত্বরা করে গন্তব্যে পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব নেয়নি, যুক্তিসঙ্গত কারণেই তার সে ক্ষমতাও ছিল না। তার সাধ্য শুধু পায়ে হাঁটার দায় থেকে যাত্রীকে কিছুটা মুক্তি দেয়ার মধ্যেই সীমিত ছিল। তবে পায়ে হাঁটার দায় থেকে মুক্তি মিললেও, রিকশা থেকে ছিটকে পড়ার ভয় থেকে যাত্রীকে অব্যাহতি দেয়ার সাধ্য ছিল না রিকশাচালকের। পড়ে যেতে পারি,— এই ভয়টা সত্যিকারের পড়ে যাবার চেয়ে কম ক্ষতিকর নয় মোটেও। তাই, এক পর্যায়ে সাইফুলের বোনটি রেগেমেগে রিকশা থেকে নেমে গেল। বলল, 'এর চেয়ে পায়ে হাঁটা আমার ঢের ভাল। রিকশার মধ্যে বসে থাকার জন্য সংগ্রাম করার কোনো মানে হয়? পাকসেনাদের হাত থেকে বেঁচে এসে, শেষে বাচ্চা-কাচ্চা নিয়ে রিকশা থেকে পড়ে মরব নাকি?'

তখন রিকশাওয়ালাকে বিদায় করে দেয়া হলো। আমরা মরুতীর্থপথে হিংলাজ যাত্রীদের মতো পদব্রজে এগিয়ে চললাম পুরাতন ব্রহ্মপুত্রের দিকে। ভাঙা বায়সকণ্ঠে আমি গলা ছেড়ে গেয়ে উঠলাম...'গ্রাম-ছাড়া ঐ রাঙা মাটির পথ আমার মন ভোলায় রে।'

সাইফুলের ভাগনিটি বলল, 'মামা, তুমি গান জান?'

বললাম, 'সবসময় জানি না, তবে মাঝে মাঝে জানি।'

যার জন্য গাওয়া, সে ঠিকই বুঝল। তাই আমার কথায় পিঠে ফোড়ন কেটে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলল, 'তা, বেদনার দিনে এই আনন্দের গান কেন?'

আমার গান প্রাণ না ছুঁলেও তার কান যে ছুঁয়েছে, তার প্রমাণ পেয়েই আমি খুশি। তাই আনন্দই আমাকে ভাষা আর যুক্তি জোগাল। বললাম, 'বেদনা ছিল, আছে, থাকবে; কিন্তু সে জীবনের বড় সত্য নয়। আনন্দই বড় সত্য। তাই আনন্দের গানই মনে আসছে।'

শুভার গল্পটা রাখলাম লুকিয়ে।

কী কারণে জানি না, আজ সকাল থেকেই আমার মন ছুটেছে গানের টানে। ঢাকা থেকে যতই আমি দূরে সরে যাচ্ছি, যতই আমি এগিয়ে যাচ্ছি আমার জন্মগ্রামের দিকে, ততই যেন আমার কাছে ছুটে আসছে গান।

বারোটার দিকে, চৈত্রের উত্তপ্ত দুপুরে আমরা পুরাতন ব্রহ্মপুত্রের তীরে এসে দাঁড়ালাম। জায়গার নামটা ভারী মজার। ড্রেইনের ঘাট। ড্রেইন কখনও কোনো স্থানের নামের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে, আমি ভাবতেও পারিনি। নামের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ কোনো ড্রেইন আমাদের চোখে পড়ল না, কিন্তু নামটা গেঁথে রইল আমার মনের ভিতরে।

AMARBOI.COM

চৈত্রের দাবদাহে বাংলাদেশের প্রকৃতিতে তখন গ্রীষ্মের জাগ্রতদশা। গ্রীষ্ম জাগ্রত দ্বারে। তারই টান পড়েছে আমাদের নদী-নালায়, খালে-বিলে-ঝিলে। দেখলাম, পুরাতন ব্রহ্মপুত্র জলাভাবে শুকিয়ে এসেছে। এত বড় নামকরা পুরান-প্রসিদ্ধ নদের এই দশা? ব্রহ্মপুত্রের স্বল্পদীর্ঘ মূল প্রবাহটি পাড়ি দিতে যদিও আমাদের নৌকার সাহায্য নিতে হলো, কিন্তু নদীর অবশিষ্ট জলপ্রবাহদৃষ্টে 'আমাদের ছোটো নদী'র কথাই মনে পড়ল বেশি। কবি বলেছেন– বৈশাখ মাসে তার হাঁটুজল থাকে। তাও সর্বত্র থাকলে হতো। কোথাও কোথাও পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত ডুবতে চায় না।

বুড়িগঙ্গার কথা মনে পড়ল। গঙ্গার মূল প্রবাহটি ধলেশ্বরীতে সরে যাবার কারণে সৃষ্ট ক্ষীণস্রোতা গঙ্গা নদীর নাম যদি বুড়িগঙ্গা হতে পারে, তবে তো মূল প্রবাহ ছেড়ে বেরিয়ে আসা পুরাতন ব্রহ্মপুত্রের নাম হওয়া উচিত ছিল বুড়া বা বৃদ্ধ ব্রহ্মপুত্র। পুরাতন ব্রহ্মপুত্র কেন? নদ-নদীতেও পুরুষতন্ত্র? পুরানকাহিনী অনুযায়ী বুড়িগঙ্গা তো কাঙালিনী সুফিয়ার মতো বলতেই পারে, ... 'বুড়ি হইলাম তোর কারণে।'

ময়মনসিংহ জেলা শহরের উত্তর-পূর্ব পাশ দিয়ে প্রবাহিত পুরাতন ব্রহ্মপুত্র আমার অনেক দিনের দেখা, প্রিয় নদ। সেখানে তাঁর এমন দীনজলদশা তো কখনও দেখিনি। আমি আমার মা-কাকীমাকে পুরাতন ব্রহ্মপুত্রে বহুবার অষ্টমী স্নানে নিয়ে গেছি। সেখানে প্রচণ্ড গ্রীষ্মেও ব্রহ্মপুত্রের জল-গৌরব ছিল। মঠখলায় যে পুরাতন ব্রহ্মপুত্রকে দেখলাম, তার নাম ব্রহ্মপুত্র না হয়ে অন্য কোনো নাম হলেই আমি খুশি হতাম বেশি। অন্য কোনো নদীর দীনজলদশায় আমার খুব যায় আসে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না, কিন্তু ব্রহ্মপুত্র ছোটো হলে আমার কষ্ট হয় বৈকি। আমি যে নিজেকে মনে মনে ব্রহ্মপুত্র বলে ভাবি। ঐরকম ভাবার একটি গোপন কারণও আছে। ব্রহ্মপুত্রের এক নাম হচ্ছে লৌহিত্য-নদ। লৌহিত্য মুনির নামে এই নদের নামকরণ। আমাদের বংশগোত্র হচ্ছে– লৌহিত্য গোত্র। তার মানে, লৌহিত্য মুনি আমাদের কুলগুরু? ব্রহ্মপুত্রই হচ্ছে আমাদের নদীরূপ, আর ব্রহ্মপুত্রের মানুষরূপ হচ্ছি আমরা, যাদের বংশ-গোত্র লৌহিত্য।

কৈশোরে ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার পর থেকেই আমি অনুভব করে আসছি যে, ঐ নদটির প্রতি আমার অন্তরের মধ্যে একটা গোপন টান আছে। ব্রহ্মপুত্রের পৌরাণিক জন্মকথা ও মাহাত্ম্যগাথা শুনে ঐ নদের সঙ্গে আমার হৃদবন্ধন কালক্রমে দৃঢ় হয়েছে। আসুন আমার প্রিয় নদের সঙ্গে আমি আপনাদের কিছুটা পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি।

ব্রহ্মপুত্র হচ্ছে তিব্বত, ভারত ও বাংলাদেশ– এই তিন দেশের ভিতর দিয়ে প্রবাহিত একটি দীর্ঘ নদের নাম। তিব্বতের মানস সরোবর থেকে বের হয়ে সাংপো নামে প্রায় হাজার মাইল পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয়ে ভারতের আসাম সীমান্তে এসে দক্ষিণ-পশ্চিমগামী হয়ে আসামের লোহিত এবং ডিসাং নদের ভিতরে মিশে এই প্রবল জলধারাটি ব্রহ্মপুত্র নাম ধরেছে। রংপুর ও পাবনার ভিতর দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করে ব্রহ্মপুত্রের মূল প্রবাহটি যমুনা নাম নিয়ে পদ্মায় পড়েছে। আর ব্রহ্মপুত্রের পুরনো একটি ধারা বাহাদুরাবাদ থেকে ময়মনসিংহ জেলার ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে কিশোরগঞ্জের ভৈরব বাজারের কাছে গিয়ে মেঘনার সঙ্গে মিশেছে। বিশ্বের বড় নদ-নদীগুলোর অন্যতম ব্রহ্মপুত্র নদের দৈর্ঘ্য হচ্ছে ২,৯০০ কি.মি. (বিশ্বের ১৯তম নদ)।

ব্রহ্মপুত্রের জন্মকথা এ রকম : মহর্ষি শান্তনু এবং তাঁর স্ত্রী অমোঘা কৈলাস পর্বতে বসবাস করতেন। গর্ভবতী অমোঘা সন্তানের পরিবর্তে একবার জলরাশি প্রসব করেন। মহর্ষি শান্তনু সেই জলরাশিকে পুত্রসন্তানরূপে গ্রহণ করেন এবং তার নাম রাখেন ব্রহ্মপুত্র। এরপর ব্রহ্মপুত্রকে তিনি কৈলাস, গন্ধমাদন, জারুধি ও সংবর্তক নামক চার পর্বতের মাঝখানে অবস্থিত একটি কুণ্ডে রেখে দেন। কুণ্ডের নাম রাখা হয় ব্রহ্মকুণ্ড। ব্রহ্মকুণ্ডের জল ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে।

জমদগ্নি নামে এক মুনি তাঁর স্ত্রীর অপরাধের দণ্ড দিতে একদিন তাঁর পুত্রদের ডেকে বলেন, 'তোমরা তোমাদের মাকে হত্যা কর।' তাঁর অন্য সব পুত্ররা পিতৃআজ্ঞা লংঘন করলেও, ছোটো পুত্র পরশুরাম কুঠারাঘাতে তাঁর মাকে দু'ভাগ করে ফেলেন। মাতৃহত্যার পাপে কুঠারটি পরশুরামের হাতের সঙ্গে লেগে যায়। জমদগ্নি তখন পুত্রকে বলেন, 'ব্রহ্মকুণ্ডে বন্দি ব্রহ্মপুত্রকে মুক্ত করতে পারলে তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে এবং তোমার হাতের কুঠার খসে পড়বে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরশুরাম তখন ক্রৌঞ্চরন্ধ্র খনন করে ব্রহ্মপুত্রকে প্রবাহিত করেন। পরশুরামের হাতে লেগে যাওয়া কুঠারটি তখন তাঁর হাত থেকে খসে পড়লে মাতৃহত্যার পাপ থেকে পরশুরাম মুক্তি লাভ করেন। সেই থেকে হিন্দুরা ব্রহ্মপুত্রকে পুণ্যতোয়া হিসেবে মানেন এবং যাবতীয় পার্থিব পাপ থেকে মুক্তিলাভের আশায় বাসন্তী পূজা (দুর্গাপূজা) চলাকালীন অষ্টমী তিথিতে ব্রহ্মপুত্রের পবিত্রকল্পিত জলে পুণ্যস্নান করেন।

নদীর প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার আরও একটি সঙ্গত কারণ আছে। পৃথিবীর প্রথম কবিতাটি রচিত হয়েছিল নদীর তীরে। ব্যাধের তীরে বিদ্ধ হয়ে মিথুনরত পাখির মৃত্যুদৃশ্য দেখে দস্যু রত্নাকর ক্রোধান্বিত হয়ে ব্যাধকে যে অভিশাপ দিয়েছিলেন, সেটিই পৃথিবীর প্রথম কবিতা। দস্যু রত্নাকর তখনও কবি হয়ে ওঠেননি। তখনও পর্যন্ত তিনি ছিলেন শুধুই দস্যু রত্নাকর। মহাভারতবর্ণিত তমসা নদীর তীরে ছিল তাঁর আস্তানা। সেখানেই তিনি দস্যুবৃত্তি করে দিন কাটাতেন। মহর্ষি নারদের কৃপায় তিনি কবিত্বশক্তি লাভ করেন এবং মিথুনরত পাখি নিধনকারী ব্যাধকে তিনি যে ভাষা ও ছন্দে অভিশাপ দেন, তাই পরবর্তীকালে তাঁকে রামায়ণ রচনায় উদ্বুদ্ধ করে। তার মানে, পৃথিবীর প্রথম কাব্যপঙক্তিদ্বয় তমসা নামক নদীর তীরেই রচিত হয়েছিল।

চরণবদ্ধ সমান অক্ষরবিশিষ্ট বীণাদি সহযোগে গীত হওয়ার যোগ্য রত্নাকরের সেই অভিশাপ বাক্য তথা পৃথিবীর প্রথম কাব্যশ্লোকটি ছিল নিম্নরূপ :

'মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতমঃ।।'

পৌরাণিক বিশ্বাস অনুসারে এখান থেকেই ছন্দের উদ্ভব ঘটে এবং এই ছন্দ দিয়েই পরে বাল্মীকি তাঁর রামায়ণ রচনা করেন।

তমসা নদীর তীরে বসবাসকারী দস্যু রত্নাকর আর পুরাতন ব্রহ্মপুত্রের তীরে দাঁড়ান দস্যু নির্মলেন্দু গুণের মধ্যে কাল ও কাব্যশক্তি বিচারে যত দূরত্ব বা পার্থক্যই থাক না কেন, তারা একই কাব্যকলার অচ্ছেদ্যমিলে বাঁধা। পুরাতন ব্রহ্মপুত্রের তীরে দাঁড়িয়ে আমি নিজের ভিতরে যুগপৎ একজন দস্যু রত্নাকর ও মহাকবি বাল্মীকির সহাবস্থান অনুভব করলাম। মনে হলো, আমি তো একজন ছোটোখাটো দস্যু রত্নাকরও বটে। আমি তো ডাকাতি মামলার আসামি ছিলাম। পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে হুলিয়া মাথায় নিয়ে আমাকেও কিছুকাল পালিয়ে বেড়াতে হয়েছিল। সেই পলাতক জীবনের অভিজ্ঞতা নিয়েই আমি লিখেছি আমার হুলিয়া কবিতাটি। 'হুলিয়া'-ই আমার প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'প্রেমাংশুর রক্ত চাই'-এর প্রথম কবিতা।

পুরাতন ব্রহ্মপুত্রের দিকে তাকিয়ে আমার হঠাৎ মনে হলো, কী জানি বাবা, আমি হয়তো কলিযুগের বাল্মীকিই হব। হয়তো আমার হাতেই রচিত হবে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের মহাকাব্য। ব্যাধের নিক্ষিপ্ত তীরে মিথুনরত পাখিযুগলের একটিকে হত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হতে দেখে বেদনাবিদ্ধ ক্রুদ্ধ রত্নাকর যদি মহাকবি বাল্মীকিতে পরিণত হতে পারেন, মহর্ষি নারদের কৃপা পেলে, বিশ্ববর্বর পাকসেনাবাহিনীর নির্বিচার মানবনিধনযজ্ঞ প্রত্যক্ষ করার মর্মবেদনা বুকে নিয়ে তবে আমিই বা বাল্মীকি হতে পারব না কেন?

কিশোরগঞ্জ পর্ব

প্রস্তাবনা

চলতি অধ্যায়-রচনার শুরুতেই ঘটনাটি বলে নিই। আমি লক্ষ্য করে দেখেছি, পরে একসময় আরও সুন্দর করে বলব ভেবে মগজের একপাশে সরিয়ে রাখা অনেক ঘটনার কথাই আর শেষতক বলা হয়ে ওঠে না। অনেক সময় ভুলে যাবার কারণে এমনটি ঘটে, আবার অনেক সময় মনে পড়লেও প্রাসঙ্গিক পটের অভাবেই জন্মের জন্য অপেক্ষমাণ গল্পটির প্রতিমা প্রতিষ্ঠা আর হয়ে ওঠে না। দেবীর প্রতিমা প্রতিষ্ঠার জন্যই পট, নাকি পটের মধ্যে সৃষ্ট শূন্যতা দূর করার জন্য বা পটের ভিতরে প্রাণ প্রতিষ্ঠার জন্যই প্রতিমাযোজন–, তা বলা মুশকিল। পট আর প্রতিমা এই দুইয়ে মিলেই দুর্গা। পট যেমন দেবীর অংশ, দেবীও তেমনি পটের।

যাক, অনেক ভণিতা হলো। এবার ঘটনাটি বলি। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট রাতের অন্ধকারে বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে হামলাকারী ঘাতকদলের হাত থেকে যে সামান্য ক'জন বেঁচে গিয়েছিল, তাদের মধ্যে একটি ছেলে ছিল বঙ্গবন্ধুর সর্বকনিষ্ঠ পুত্র শেখ রাসেলের বয়সী। ঐ ছেলেটি ১৫ আগস্টের পুরো হত্যাযজ্ঞটি কাছে থেকে প্রত্যক্ষ করেছিল এবং এখনও স্মৃতি থেকে সে পুরো ঘটনাটি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বর্ণনা করতে পারে। বঙ্গবন্ধু স্মৃতি যাদুঘরে আগত দর্শকদের সামনে সে এখন ঐ কালরাত্রির ঘটনা বয়ান করে। এটাই তার চাকরি।

আমি একদিন ওর মুখে ১৫ আগস্টের পুরো ঘটনার বিবরণ শুনেছি। ছেলেটির নাম কিশোর। বেশ তাগড়া জোয়ান। পরিপূর্ণ যুবক সে। তাকে ছেলে না বলে লোকটা বলা উচিত। ওর কিশোর নামটা শুনে আমার খুব হাসি পেল। বললাম, 'এই মিয়া, তোমার নাম কেডা রাখছে? নাম বদলাও।'

আমার কথা শুনে কিশোর মাটির দিকে ওর মুখ নত করে রাখল। কী যেন ভাল আপন মনে। তারপর আমার দিকে চোখ তুলে বলল, 'স্যার, বঙ্গবন্ধু আমারে এই নামডা দিছিলেন। তাই এই নামডা আমি আর বদলাই না। আমি রাসেল ভাইয়ার লগে খেলতাম। খালাম্মা আমারে রাসেল ভাইয়ার মতোই একচোখে দেখতেন। আমরা একসঙ্গে খেলতাম, খাইতাম, ঘুমাইতাম। একদিন বঙ্গবন্ধু আমারে কাছে ডাইক্যা আমার নাম জিগাইলেন। আমি আমার নাম কইলাম। নাম শুইন্যা তিনি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খুশি অইলেন না। কইলেন, তোর বাড়ি কই? আমি কইলাম, কিশোরগঞ্জ। সঙ্গে সঙ্গে খুশি হইয়া আমার মাথায় হাত বুলাইয়া দিয়া বঙ্গবন্ধু কইলেন, '...যা, আইজ থিইক্যা তোর নাম হইল গিয়া কিশোর।'

'তারপর থিইক্যা সবাই আমারে কিশোর বইল্যাই ডাকত। অহনও ডাকে। আফাও ডাহেন। ঐ নাম হুনলে আমারও কষ্ট অয়। কিন্তু স্যার, কষ্ট অইলেও এই নাম আমি বদলাইতাম না।'

আমি লজ্জা পেয়ে কিশোরকে আমার বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলাম। বললাম, 'এই ঘটনাটি জানলে আমি কি আর তোমার নাম বদলাতে বলতাম? কী সৌভাগ্য তোমার যে, বঙ্গবন্ধু তোমার নাম রেখেছেন। তোমার নাম বদলালে বাংলাদেশের নামটাও তো বদলাতে হয়। তুমি বরং কিশোর নাম নিয়েই বাঙালি জাতির হৃদয়মন্দিরে হাজার বছর বেঁচে থাকো, ভাই।'

বঙ্গবন্ধুর শব্দচয়ন-ক্ষমতা যে কতটা সহজাত, কতটা প্রখর ও লক্ষ্যভেদী ছিল, কিশোরের নামকরণ থেকে তার অব্যর্থ প্রমাণ পাওয়া গেল। রাজনৈতিক বিবেচনা থেকে নয়, আমি বঙ্গবন্ধুকে কবিত্বশক্তির অধিকারী বলে মানি এজন্যই। তিনি শব্দ নিয়ে খেলতে জানতেন।

পাঠকের কি মনে হয় না যে, কিশোরগঞ্জ পর্বের শুরুতে, অশ্রুজলে লেখা ঐ গল্পটি ঠিক যথাস্থানেই সংস্থাপিত হয়েছে?

AMARBOI.COM

পুরাতন ময়মনসিংহকথা, মৈমনসিংহ গীতিকা ও শহীদ ডাক্তার সমর কর

ময়মনসিংহ ছিল ব্রিটিশভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম জেলা। প্রথম স্থানে ছিল বিশাখাপত্তম (অন্ধ্র প্রদেশ)। ময়মনসিংহের অন্তর্গত পঞ্চমহকুমাগুলো ছিল যথাক্রমে ময়মনসিংহ সদর, কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোনা, জামালপুর ও টাঙ্গাইল। ভাবা যায়, পাঁচটি মহকুমা নিয়ে একটি জেলা? অখণ্ড ময়মনসিংহের আকৃতি ছিল বিশ্বের কিছুসংখ্যক দেশের চেয়েও বড়। আর লোকসংখ্যা বিচারে ঘনবসতিপূর্ণ ময়মনসিংহের স্থান মনে হয় বিশাখাপত্তম নয় শুধু, কিছু কিছু দেশের চেয়েও এগিয়ে ছিল। এ নিয়ে ময়মনসিংহের মানুষদের মধ্যে ছিল একটা পৃথক গর্ববোধ। তার সঙ্গে 'মৈমনসিংহ গীতিকা'র গৌরব যুক্ত হলে ময়মনসিংহ জেলা নিয়ে আমার ভিতরে একধরনের কালচারাল অহং ও আঞ্চলিক সাম্প্রদায়িকতার অনুপ্রবেশ ঘটে। আমার মনে হতো আমার পায়ের তলায় যেমন 'মৈমনসিংহ গীতিকা'র শক্ত মাটি আছে, তেমনটি আর কারও পায়ের তলায় নেই। আমি এক অতুলনীয় ঐশ্বর্যের অধিকারী। আমার অতিনিকট পূর্বপুরুষ ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রমণীগণ (যথা চন্দ্রাবতী) কাব্য ও পালাগান রচনায় অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন।

'মৈমনসিংহ গীতিকা' পাঠান্তে রোমা রোঁলা মন্তব্য করেছিলেন :

> 'I was specially delighted with the touching story of Madina which although only two centuries old is an antique beauty and a purity of sentiment which art has rendered faithfully without changing it. Chandravati is a very noble story and Madina, Kanka and Lila are charming.'

শিল্পাচার্য উইলিয়াম রদেনস্টাইন বলেছিলেন : 'এই পালাগানের নায়িকাগুলোর চরিত্র পাঠ করে মনে হচ্ছে যেন অজন্তা গুহার চিত্রগুলো জীবন্ত হয়ে আমার চক্ষের সম্মুখে দাঁড়িয়েছে। ইহাদের লীলায়িত ভঙ্গি ও লাস্যের মনোহারিত্ব আমাকে মুগ্ধ করিয়াছে।'

তবে আমি মনে করি, পশ্চিমা মনীষীদের মধ্যে যিনি 'মৈমনসিংহ গীতিকা'র অভ্যন্তরের সত্যিকারের সুপ্ত-শক্তির সন্ধান পেয়েছিলেন, তাঁর নাম উইলিয়াম ডি এ্যালেন। মার্কিন লেখক ও কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন তিনি। মৈমনসিংহ গীতিকার চরিত্রগুলোর মধ্যে তিনি স্বাধীনচেতা বাঙালির সুপ্ত প্রাণশক্তির পরিচয় পান, যা বাঙালির সুদীর্ঘ সংগ্রাম ও ধারাবাহিকতায় ১৯৭১-এ পূর্ণবিভায় প্রকাশিত আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের অসাম্প্রদায়িক চেতনার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ।

তিনি বলেছিলেন : 'গীতিকাব্যগুলো পড়িয়া মনে হইল বঙ্গদেশ এখনও তাহার যৌবন হারায় নাই।'

> 'In these Mymensing ballads I found an instinct for original thinking, countless instances of individual ... *swaraj* and a high value attadched to deeds in contrast to passiveness... all of which confirmed my conviction on reading history that India could never have reached such age unless hearing within it the roots of unweakening youth.
>
> For an occidental to doubt the essential unity of East and West is impossible if he has the pictures and emotions awakened by these ballads in his mind. The same love of nature, <u>the same desire for freedom</u>, the same exaltation of the individual's right to live happily which we are proud to discover in our literatures we find in these songs by and for the simple peasants of Bengal.'

(Eastern Bengal Ballads : Vol 4, Part 1.
Calcutta University. Published in 1932.)

পাকিস্তানের শেষ দিকে, টাঙ্গাইল (১৯৬৮) মহকুমাকে জেলায় উন্নীত করে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ময়মনসিংহ থেকে টাঙ্গাইলের বিচ্ছিন্ন করাটাকে আমি মন থেকে কখনও সমর্থন করতে পারিনি। বাংলাদেশ হওয়ার পর, ১৯৮৪ সালে ময়মনসিংহের অবশিষ্ট মহকুমাগুলোকেও জেলার মর্যাদা দিয়ে ময়মনসিংহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে একদিকে ময়মনসিংহবাসীকে তার দীর্ঘলালিত বড়ত্বের গৌরব থেকে যেমন বঞ্চিত করা হয়, তেমনি এর খণ্ডীকরণের ফলে 'মৈমনসিংহ গীতিকা'ও তার নামকরণের তাৎপর্য হারায়। কেননা, 'মৈমনসিংহ গীতিকার' পালাগুলোর রচয়িতারা হয় কিশোরগঞ্জ নয় নেত্রকোনার কবি ছিলেন। বর্তমানের অবশিষ্ট ময়মনসিংহের সঙ্গে তাদের জন্মকর্মের কোনো সম্পর্ক ছিল না।

১৯৪৭ সালের ভারত ভাগের ঘটনাটির মধ্যে আমার কষ্টের কারণ ছিল ব্যাপক হারে পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের বাস্তুহারা হয়ে ভারতের পশ্চিমবঙ্গে চলে যেতে বাধ্য হওয়ার মতো অমানবিক সাম্প্রদায়িকতার মধ্যে নিহিত। ভারতের খণ্ডিত হওয়ার বেদনা সেখানে আদৌ মুখ্য ছিল না। আর সাম্প্রদায়িক রাজনীতির জাতক, প্রজাপীড়ক রাষ্ট্র হিসেবে সমরশাসিত পাকিস্তান থেকে পূর্ব পাকিস্তানের বিচ্ছিন্ন হওয়ার সংগ্রামে আমি তো বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে নিজেই সানন্দে শরিক হয়েছি। সেই সংগ্রামের সাফল্য অনেকের মতো আমারও চিরআনন্দের সঞ্চয়। ক্রমশ ছোটো হতে অভ্যস্ত সেই আমি, ময়মনসিংহ-ভাগটাকে আজও মন থেকে মানতে পারিনি। আমার মতো অনেকেই যে তা পারেননি, তার প্রমাণ পাই যখন রাজধানী ঢাকার কোনো মিলনায়তনে বৃহত্তর ময়মনসিংহ সাংস্কৃতিক ফোরামের কোনো অনুষ্ঠানে আমরা মিলিত হই। তখন আমি খুব স্মৃতিকাতর বোধ করি। মনে হয় 'মৈমনসিংহ গীতিকা'র প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্যই ময়মনসিংহ জেলাটাকে অখণ্ড রাখা দরকার ছিল। এখনও তা করা যেতে পারে। তাতে বহির্বিশ্বে আমাদের গৌরব বৃদ্ধি পাবে।

৩ এপ্রিল নরসিংদীর মনোহরদিতে রাত কাটিয়ে, পরদিন ৪ এপ্রিল গ্রীষ্মশুষ্ক পুরাতন ব্রহ্মপুত্র পেরিয়ে মঠখলা বাজার দিয়ে আমরা কিশোরগঞ্জে প্রবেশ করি। তখন কিশোরগঞ্জে প্রবেশ করার মানে ছিল, আমার জন্মজেলা মৈমনসিংহের প্রিয়-পবিত্র মাটিতে পা রাখা। মনটা আনন্দে ভরে উঠল। অজস্র মৃত্যুকে পেছনে ফেলে শেষপর্যন্ত আমার জন্মজেলায় তাহলে পৌঁছুতে পারলাম!

মৈমনসিংহের অন্তর্গত বলে নয়, কিশোরগঞ্জ জায়গাটা আমার কাছে আরও একটি বিশেষ কারণে খুবই আপন ছিল। কিশোরগঞ্জ হচ্ছে আমার মামাবাড়ি। আমার মা ছিলেন অষ্টগ্রামের পূর্ব-পাড়ার সুখ্যাত দত্তবংশের মেয়ে। সত্যমিথ্যা জানি না, আমার বড় মাসিমার (বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ ড. অসীম রায়ের মাতা) মুখে শুনেছি, মনসামঙ্গলের আদিকবি কানাহরি দত্ত নাকি তাদের পূর্ব-পুরুষ। আমার মায়ের 'পদ্মপুরাণ' মুখস্থ থাকার কারণ নাকি সেটাই। আমার বাল্যকালে, আমার বয়স যখন চারের কাছাকাছি, আমার মা অল্পবয়সে মারা যান। আমাদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনেকগুলো ভাইবোনের কথা ভেবে আমার পিতা দ্বিতীয়বার বিবাহ করেন। এবার কিশোরগঞ্জ সীমান্তবর্তী কেন্দুয়ার নওহাটা গ্রাম। এবারও সেই দত্তবংশে।

অষ্টগ্রামে আমার মামাদের পরিবারের কেউ বাস করেন না। আমাকে মামাবাড়ি ভ্রমণের সুযোগ না দিয়েই দেশভাগের পরপর তারা জন্মগ্রাম ছেড়ে ভারতে চলে যান। তাই অষ্টগ্রামের মামাবাড়িতে আমরা কখনও যাওয়া হয়ে উঠেনি। হিন্দু-উত্তরাধিকার আইনানুযায়ী ভাগনেদের জন্য মামাছাড়া মামাবাড়িই হচ্ছে অতি উত্তম স্থান। কেননা, হিন্দু উত্তরাধিকার আইন অনুসারে মামাদের অবর্তমানে ভাগনেরাই মাতুলসম্পদের মালিক হয়। প্রবাদ আছে :

'মামা দিল দুধ-ভাত
দুয়ারে বইসা খাই।
মামী আইলো লাঠি লইয়া
পালাই পালাই।'

আমার বেলায় মামীদের লাঠি নিয়ে আসার কোনো ভয় ছিল না। মুসলিম উত্তরাধিকার আইনের মতো হিন্দু উত্তরাধিকার আইনও যদি তার নিজস্ব গতিতে চলত, যদি চলতে পারত, তাহলে 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে-ভাতে'– অন্নদামঙ্গলের ঈশ্বর পাটনীর এই অপত্যপ্রার্থনা আমার মতো পাকিস্তানে থেকে যাওয়া অনেক হিন্দুর জন্যই সত্য হতে পারত। কিন্তু হয়নি। ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধের পরপরই জঘন্য সাম্প্রদায়িক পাকিস্তান সরকার এনিমি প্রপার্টি বা শত্রুসম্পত্তি আইন জারি করে পূর্ব পাকিস্তানের হিন্দুদের মাজা ভেঙে দেয়। মাতুল সম্পত্তির ওপর অধিকার প্রতিষ্ঠা তো দূরের কথা, স্ব স্ব পৈত্রিক সম্পত্তি রক্ষার জন্যই তাদের মরণপণ সংগ্রামে লিপ্ত হতে হয়। তাই, মামার বাড়ির কলা খাওয়ার সহজ চিন্তাটাকে আমরা যে তখন মাথায় তুলিনি, তার পেছনে কার্যকর ছিল আমার পরিত্যক্ত মামাবাড়িতে অবস্থানগ্রহণকারী 'পুরুষ-মামী'দের লাঠির ভয়।

আমার প্রথম মামাবাড়ি অষ্টগ্রামে না গেলেও, স্কুলের ছাত্রাবস্থায় আমার দ্বিতীয় মাতুলালয় নান্দাইলের নওহাটা গ্রামের মামাবাড়িতে আমি একাধিকবার গিয়েছি। নান্দাইল রোড রেলস্টেশনে নেমে জননিন্দিত মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমীন সাহেবের তৈরি করা নান্দাইল-তাড়াইল সড়ক ধরে নওহাটা যেতে হতো। বিরাট উঁচু ও চওড়া সড়ক। তাঁর নির্বাচনী এলাকায় স্বীয় প্রভাব অক্ষুণ্ন রাখার ক্ষেত্রে ঐ সড়কটি নিয়ামক ভূমিকা রেখেছিল। তাই ১৯৭০ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মুজিব-প্লাবনে অন্য সবাই খড়কুটোর মতো ভেসে গেলেও ভাষা-আন্দোলনের শত্রুপক্ষ হিসেবে চিহ্নিত হয়েও নুরুল আমীন ভেসে যাননি। তাঁর শাসনামলে তৈরি ঐ পথিকপাগলকরা সড়কটির জন্যই এলাকার কৃতজ্ঞ মানুষ নুরুল আমীনকে ভোট দিয়েছিল, যার ফলে পূর্ব-পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমীন পাকিস্তানের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মৃত্যুশয্যায় কিছুদিনের জন্য পূর্ণ-পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীও হয়েছিলেন। যদিও পূর্ণ-পাকিস্তান বলতে তখন বাস্তব অর্থে শুধু পশ্চিম পাকিস্তানকেই বোঝাত।

কলেজে উঠেও আমি নওহাটা গ্রামে গিয়েছি। সেখানে আমার একজন মামা ছিলেন, বয়সে আমার চেয়ে বড় হলেও ফেল করার কারণে কলেজ জীবনে ভাগনের সহপাঠী হয়েছিলেন। ছিলেন আমার অত্যন্ত সুরসিকা ও সুন্দরী বৃদ্ধা দিদিমা ও তাদের কিছু জ্ঞাতিপরিজন। ছিলেন আমার মামার আপন কাকা, হেডমাস্টার দাদু। তাঁর নাম ব্রজেন্দ্র দত্ত। তিনি ছিলেন পুরুরা হাই স্কুলের হেডমাস্টার। আমার মামাবাড়ির পাশের বাড়িতে ছিলেন এক ডাক্তার দাদু। তাঁর নাম সমর কর। কলকাতা থেকে এলএমএফ পাস করার পর গণ্ড গ্রামে ফিরে এসে এখানেই ডাক্তারি পেশা জমিয়ে বসেছেন। তিনি গ্রামের গরিব রোগীদের বিনামূল্যে চিকিৎসা করেন। সঙ্গত কারণেই এলাকায় তাঁর খুব নামডাক। তাঁর স্ত্রী কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট। সাহিত্যপ্রাণা। শ্যামবর্ণা। সুন্দরী। স্মার্ট। স্বামীর ব্রতই তাঁরও ব্রত। তিনি প্রচুর বই পড়েন। বাড়িতে বাংলাভাষার নামীদামী লেখকদের মূল্যবান পুস্তকসমৃদ্ধ ছিল তাঁর পাঠাগার। সেখানে গেলে আমি তাদের পাঠাগার থেকে ইচ্ছে মতো পছন্দের বই নিয়ে পড়তে পারতাম। সুদূর কলকাতা থেকে আমার ডাক্তার দিদিমার নামে দেশ ও নবকল্লোল পত্রিকার পুজো সংখ্যা ডাকে আসত। আমি যে কবিতা লিখি, কবি হওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি, তা আমার ডাক্তার দাদু ও দিদিমা জানতেন। ফলে তারা আমাকে যদু-মধুর মতো না দেখে, একটু আলাদা খাতির করতেন। নওহাটায় গেলে আমি ঐ বাড়িতেই বেশি সময় কাটাতাম। আমি অনেকবার ঐ নিঃসন্তান ব্রতচারী দম্পতিকে আমার সদ্যরচিত কবিতা পাঠ করে শুনিয়েছি। বিশেষ করে আমার ডাক্তার দিদিমাটি আমার কবিতার একনিষ্ঠ শ্রোতা ছিলেন। অপ্রাপ্য প্রশংসা করে তিনি আমাকে কবিতা রচনায় নিরন্তর উৎসাহ দিতেন। বলতেন, 'কবি হবে কি? তুমি তো কবিই। নাও, আরেকটা শোনাও।'

আমিও বোকার মতো তখন আরেকটা কবিতা পড়তাম। আমাদের কাণ্ড দেখে ডাক্তার দাদু মুচকি হাসতেন। সেই হাসির ভিতরে, এখন বুঝি অবশ্যই কিছু রহস্য ছিল।

কিশোরগঞ্জের মাটিতে প্রবেশ করার পর আমার বৃদ্ধা স্নেহময়ী দিদিমা বা আমার মামার চেয়েও ঐ কাব্যানুরাগী দম্পতির কথাই আমার বেশি করে মনে পড়ল। কতদিন সেখানে যাওয়া হয়নি। কতদিন তাঁদের দেখি না। আজ আমি যখন সত্যি সত্যি কিছুটা কবিখ্যাতি লাভ করেছি বা করতে চলেছি, যখন আমার প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'প্রেমাংশুর রক্ত চাই' প্রকাশিত হয়েছে, তখন ডাক্তার দাদু আর দিদিমার হাতে আমি যদি আমার কবিতার বইটি তুলে দিতে পারতাম! আহা, কী খুশিই না তাঁরা হতেন।

কিশোরগঞ্জের কোর্ট রোডে আমার এক মাসির বাড়ি। নন্দী বাড়ি। ঐ বাড়িতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাত কাটিয়ে কালই আমি নেত্রকোনার উদ্দেশে রওয়ানা দিব। নান্দাইল হয়েই আমাকে নেত্রকোনায় যেতে হবে। নান্দাইল থেকে নওহাটা বড় জোর মাইল দুয়েকের পথ। পথিকপাগলকরা সেই সবুজ ঘাসবিছানো সড়কপথ ধরে একবার যাব নাকি নওহাটায়? ভাবি, কিন্তু মন স্থির করতে পারি না। আমার নিজ গ্রামের বাড়িতে অপেক্ষমাণ মা-বাবা-ভাই-বোনের উৎকণ্ঠা ও উদ্বেগের কথা ভেবেই আমার মনের ভিতরে কুঁড়িমেলা ভাবনাটাকে আমি সেদিন ফুলের মতো পাপড়ি মেলে ফুটতে দেইনি। শেষ পর্যন্ত দ্বিতীয় মাতুলালয়ে যাবার চেয়ে আপন আলয়ে ফিরে যাবার দিকেই আমার দেহ-মনের সায় মিলেছিল। কুলায় ফেরা পাখির মতো আমি নিজগৃহে ফেরার জন্যই তখন চঞ্চল হয়ে উঠেছিলাম। কিন্তু আমার নিদ্রার মধ্যেও আমার দিদিমা হানা দিলেন। মনের ভিতরে গুনগুনিয়ে উঠল রবীন্দ্রনাথের গান—

এ পথে আমি যে গেছি বারবার ভুলিনি তো এক দিনও
আজি কি ঘুচিল চিহ্ন তাহার উঠিল বনের তৃণ॥
একেলা যেতাম যে প্রদীপ হাতে নিবেছে তাহার শিখা
তবু জানি মনে তারার ভাষাতে ঠিকানা রয়েছে লিখা।
পথের ধারেতে ফুটিল যে ফুল
জানি জানি তারা ভেঙে দেবে ভুল
গন্ধে তাদের গোপন মৃদুল সংকেত আছে লীন ॥

সেদিন বুঝিনি, 'আত্মকথা ১৯৭১'-এর বর্তমান অধ্যায়টি লিখতে বসে আজ মনে হচ্ছে, আমার ঐ দিদিমাটি বোধহয় তাঁর অজান্তেই এই নবীন কবির প্রেমে পড়েছিলেন। অথবা এই নবীন কবিটিই পড়েছিল তাঁর প্রেমে। না হলে, এত গান থাকতে, এই গানটিই আজ আমার মনে পড়বে কেন?

ছত্রিশ বছর পর, আজ যখন আমার আত্মকথায় আমি তাঁদের কথা লিখছি, তাঁদের কথা ভাবছি ; তখন স্মৃতির মণিকোঠায় ঘুমিয়ে পড়া সেই ব্রতচারী দম্পতির কথা ভেবে আমার মন তীব্র অনুশোচনার অগ্নিতে দগ্ধ হচ্ছে। অমিয় চক্রবর্তী আমার কর্ণকুহরে আবৃত্তি করে চলেছেন,... 'কেঁদেও পাবে না তারে, বর্ষার অজস্র জলধারে।'

ঠিকই বলেছেন কবি। আমি তাঁদের আর কোথাও কখনও খুঁজে পাব না। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে আলবদরের হাতে আমার দাদু, ডাক্তার সমর কর নিহত হন। প্রিয় স্বামীকে হারিয়ে আমার হতভাগিনী দিদিমাটি তাঁর পালিতা কন্যাটিকে নিয়ে ভারতে পালিয়ে যান এবং সম্প্রতি তিনিও কলকাতার শহরতলী বেলঘরিয়ায় লোকান্তরিত হয়েছেন।

গ্রামের অসহায় হতদরিদ্র মানুষদের ভালোবেসে আমার ডাক্তার দাদু সমর কর মহাশয় কলকাতায় বসবাস না করে নওহাটার মতো একটা গণ্ড গ্রামকেই তাঁর কর্মজীবনের আপন আবাস বলে গ্রহণ করেছিলেন। এটা ছিল তাঁর জন্য একটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জনহিতকর ব্রত। তিনি ভাবতেও পারেননি, তাঁর এলাকার কিছু মানুষের হাতে তাঁকে কোনোদিন এভাবে প্রাণ দিতে হতে পারে। তাই পঁচিশে মার্চের পরও তিনি জন্মগ্রাম ছেড়ে ভারতে পালিয়ে যাননি। হয়তো রবীন্দ্রবচনকেই সত্য জ্ঞান করে তিনি ভেবেছিলেন, মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ। হায়রে মুক্তিযুদ্ধ, হায়রে নিষ্ঠুর! কত মহৎ প্রাণকেই না অকাতরে হরণ করলি তুই! রক্তপায়ী রাক্ষুসীর মতো কত নির্দোষ-নিরপরাধ-নিষ্পাপ প্রেমাংশুর রক্তই না পান করলে তুমি।

নিজেকে খুব অপরাধী বলে মনে হচ্ছে। কে জানে, আমি যদি পূর্ব পাকিস্তানকে হিন্দুশূন্য করার পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর নীল-নকশাটি সম্পর্কে আমার ডাক্তার দাদুকে বুঝিয়ে বলতে পারতাম, যা আমি বিটিভির প্রযোজক অগ্রজপ্রতিম বেলাল বেগের কাছ থেকে শুনেছিলাম; তাহলে তিনি হয়তো নওহাটার মাটি ও মানুষের মায়াবন্ধন ছিন্ন করে সীমান্ত পাড়ি দিয়ে ভারতে গিয়ে তাঁর জীবন বাঁচাতেও পারতেন। মানুষের প্রাণ বাঁচানোর ব্রতপালনকারী ডাক্তার সমর করকে পাকসেনাবাহিনীর ছত্রছায়ায় গড়ে ওঠা আলবদরদের হাতে হয়তো এভাবে প্রাণ দিতে হতো না। আবার ভাবি, কী জানি, এমনও তো হতে পারত যে, পাকিস্তানের দোসর নুরুল আমীনের লোকজন আমার মতো মুজিবভক্ত কবিকে ভাগে পেলে ডাক্তার সমর করের আগে আমাকেই বধ করত।

বেঁচে আছি বলেই না আজ ডাক্তার সমর করের কথা আমি লিখতে পারছি, তিনি বেঁচে থাকলে তো আর আমার কথা লিখতে পারতেন না। লিখতে পারলেই বা তা ছাপত কে? আমাদের মুক্তিযুদ্ধের কত শহীদের মৃত্যুকথাই তো লেখা হয়নি। হবে না।

AMARBOI.COM

২

আমাকে ডাক্তার দাদুর মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানার জন্য শহীদ সমর করের ছোটো ভাই যতীন্দ্র করের জ্যেষ্ঠা কন্যা, দেবী মাসির সঙ্গে আমি যোগাযোগ করি। দেবী মাসি একইসঙ্গে আমার মামীও হন। আমার মামা প্রদীপ দত্ত ভালোবেসে পাশের বাড়ির দেবী মাসিকে বিবাহ করেছিলেন। আমার মামার সঙ্গে বিয়ে হওয়ার আগে তাঁকে আমি দেবী মাসি বলেই সম্বোধন করতাম। দেবী মাসির দেবী মামীতে পরিণত হওয়ার পূর্বের ঘটনা বর্ণনায় তাই তাঁর প্রসঙ্গে মাসি সম্বোধনটাই আমার বেশি মনে আসছে। অল্পবয়সে আমার মামা প্রদীপ দত্ত হার্ট-এট্যাকে মারা যান। ময়মনসিংহ শহরের আঠারোবাড়িতে তাদের একটি নিজের বাড়ি আছে। গ্রামের জমি বিক্রি করে আমার মামা ঐ বাড়িটি ক্রয় করেছিলেন।

মাঝখানের দীর্ঘ বিরতির পর দেবী মাসির সঙ্গে আমার টেলিফোনে যোগাযোগ হয়। তিনি আমাকে পেয়ে খুব খুশি হন। কিন্তু ডাক্তার সমর করের হত্যাকাণ্ড

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সম্পর্কে আমি কাগজে লিখেছি, এই তথ্যটি শোনামাত্র তাঁর উৎফুল্ল কণ্ঠস্বর মুহূর্তের মধ্যে বেদনায় ভারী হয়ে আসে। যে দুঃসহ স্মৃতিকে তিনি মনের গভীরে পাথরচাপা দিয়ে রেখেছিলেন, আমার লেখার ভিতর দিয়ে তাঁর বুকের সেই ঘুমন্ত বেদনাকে খুঁচিয়ে জাগিয়ে তোলার জন্য আমার একটু খারাপও লাগল। জীবনানন্দ বলেছেন, কে আর হৃদয় খুঁড়ে বেদনা জাগাতে ভালোবাসে? আবার ভাবি, বাইরের জগতের সঙ্গে বোঝাপড়ার বেলায় মানুষ ফাঁকি দিতে পারলেও, অন্তরের সঙ্গে বোঝাপড়ার বেলায় সেই ফাঁকি চলে না। দুঃখ যখন গোপনে গোকুলে বাড়ে, তখনই মানুষ তার ওপর নিয়ন্ত্রণ হারায়। সত্য যত কঠিনই হোক, প্রকাশ্য-স্বীকৃতির মধ্যেই তার স্বস্তি সত্যিকারের স্থায়ী হয়।

তাই দেবী মাসি যখন বললেন, 'এইসব লিখে কী লাভ? বাদ দেও।' তখন আমি বললাম, 'আমি মুক্তিযুদ্ধের ওপর একটি বই লিখছি বলেই এই ঘটনাটি আমার কাছে এত প্রাসঙ্গিক। আমি চাই আমাদের স্বাধীনতার জন্য যাঁরা তাঁদের অমূল্য জীবন দিয়ে গেছেন, সেইসব মহান শহীদদের গৌরব-তালিকায় আমার দাদুর নামটিও যুক্ত হোক।'

একটি অন্তরঙ্গ দীর্ঘশ্বাসের মাধ্যমে মুঠোফোনের অন্যপ্রান্ত থেকে তিনি আমার যুক্তির যথার্থতা স্বীকার করলেন। বললেন, 'ঠিক আছে, বল কী জানতে চাও।'

আমার ধারণা ছিল, শহীদ সমর ডাক্তারের একমাত্র ছোটোভাই অর্থাৎ দেবী মাসির পিতা যতীন্দ্র করের স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছিল। কিন্তু আমাকে হতবাক করে দিয়ে দেবী মাসি জানালেন, ...'না, ঐ রাতে আমার বাবাকেই ওরা আগে হত্যা করেছিল। তারপর জেঠামশাইকে। ওরা জানত, আমার বাবাকে না মেরে জেঠামশাইকে মারা যাবে না। তুমি তো জান তিনি কেমন দুর্ধর্ষ প্রকৃতির মানুষ ছিলেন।'

১৯৭১ সালে রাজাকারদের হাতে আমার ডাক্তার দাদুর নিহত হওয়ার কথা জানলেও, দেবী মাসির বাবার নিহত হওয়ার বিষয়টি আমি ঠিক জানতাম না বলে আমার ভারী লজ্জা হলো। কিছুটা অপরাধী বলেও মনে হলো নিজেকে। সাহিত্যমনা ছিলেন না বলে উনার সঙ্গে আমার সম্পর্ক খুব গভীর ছিল না। তিনি খুব কম কথা বলতেন। দেবী মাসির কাছে আমি জানতে চাইলাম, 'ঐ হত্যাকাণ্ডের তারিখটি আপনার মনে আছে?'

কান্নাজড়িত অভিমানী কণ্ঠে তিনি বললেন, 'কোনো সন্তান কখনও তাঁর পিতার মৃত্যুতারিখ ভুলে যেতে পারে? বিশেষ করে মৃত্যুটি যদি হয় এ রকমের একটি অপঘাত-মৃত্যু?'

তাঁর কাছে আমি শুধু হত্যাকাণ্ডের তারিখটি জানতে চেয়েছিলাম, তিনি তারিখের সঙ্গে মৃত্যুবারটিও আমাকে জানিয়ে দিলেন। বললেন, 'তারিখটি ছিল ৮ জ্যৈষ্ঠ, বার ছিল শুক্রবার। ইংরেজি তারিখটি ঠিক মনে নেই। সম্ভবত ২৩ মে, ১৯৭১।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নির্মম হত্যাকাণ্ডটি কীভাবে ঘটেছিল, জানতে চাইলে তিনি জানান, 'রাত বারোটার দিকে প্রায় জনা পঞ্চাশেক রাজাকার এসে আমাদের বাড়িটিকে চারদিক থেকে ঘেরাও করে ফেলে। তাদের ভিতর থেকে কয়েকজন অস্ত্রহাতে বাড়ির অন্দরমহলে প্রবেশ করে আমাদের শয়ন ঘরের দরোজা ভেঙে আমার বাবাকেই প্রথমে গুলি করে হত্যা করে। তিনি প্রাণ বাঁচাতে খাটের নিচে লুকাতে যাচ্ছিলেন। খুনীরা সেখান থেকে তাঁকে টেনে বের করে এবং তাঁর বুকে বন্দুক ঠেকিয়ে উপর্যুপরি গুলি চালায়। গুলির শব্দ শুনে পালানোর পরিবর্তে, আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান হয়ে খুনীদের নিবৃত্ত করার জন্য আমার জেঠামশাই (সমর ডাক্তার) নিজের শয়নঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে আসেন। আর ঘরের বাইরে আসামাত্র তারা তাঁকে খুব কাছে থেকে গুলি করে হত্যা করে। কয়েক মিনিটের ব্যবধানে বিশাল বিত্তবৈভব ও সুকৃতির অধিকারী দুই সহোদরের জীবনাবসান হয়। তারপর হত্যাকারীরা বাড়িঘর লুট করে সোনাদানাসহ যা পায়, সবই নিয়ে যায়। গ্রামের লোকজন সতর্ক দূরত্বে অবস্থান গ্রহণ করে যুগপৎ ঐ হত্যাকাণ্ড ও হত্যাপরবর্তী সম্পদ-লুণ্ঠনপর্বটি রাতভর প্রত্যক্ষ করে। সাহস করে তখন কেউ আমাদের সাহায্যে এগিয়ে আসেনি।'

পবিত্র পাকিস্তান ও তার ততোধিক পবিত্র অখণ্ডতা বজায় রাখার দায়িত্বে নিয়োজিত পাকিস্তানের ধর্মপুত্ররা সেই রাতে কর-পরিবারের অভিভাবকহীন অসহায় মহিলা ও মেয়েদের সঙ্গে কেমন আচরণ করেছিল, দেবী মাসিকে ঐ প্রশ্ন করার সাহস আমার হয়নি। পাঠক, আপনার সাহস হলে আপনি ঐ প্রশ্নটি তাঁকে করতে পারেন। আমাকে ক্ষমা করবেন।

পরদিন শনিবার সকাল এগারোটার দিকে গরু-মরার সংবাদ পেয়ে উড়ে আসা শকুনের মতো কেন্দুয়া থানার পুলিশ অবিশ্বাস্য দ্রুততার সঙ্গে নওহাটা কর-বাড়িতে ঘটনার তদন্তে আসে এবং আমার দুই দাদুর নিথর মরদেহ হুগলার চাটাই দিয়ে বেঁধে পোস্টমর্টমের কথা বলে দূরবর্তী কেন্দুয়া থানায় নিয়ে যায়।

আমার ডাক্তার দাদু, সমরেন্দ্র কর, আগেই বলেছি নিঃসন্তান ছিলেন। তাঁর ছোটো ভাই যতীন্দ্র করের (তাঁর ডাক নাম ধনা কর, নামী ফুটবলার) ছিল চারকন্যা। তাঁরও কোনো পুত্র সন্তান ছিল না। বিশাল বাড়িতে পুরুষ বলতে ছিল ঐ দুজনই।

রাতে তো নয়ই, পরদিনও গ্রামবাসী বা প্রতিবেশীরা ঐ বাড়িতে প্রবেশ করতে ভয় পাচ্ছিল। পোস্টমর্টম শেষে তাদের মরদেহ ফেরত আনার জন্য পুলিশের সঙ্গে কেন্দুয়া থানায় যাবার মতো কাউকেই পাওয়া যায়নি।

পাকসেনাদের হাতে কিশোরগঞ্জ এবং নেত্রকোনার পতন ঘটায় কেন্দুয়া থানায় পাকসেনারা অবস্থান নিয়েছিল। তখন কেন্দুয়া যাওয়ার মানে হতো আগ বাড়িয়ে বাঘের খাঁচায় গলা ঢুকানো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেন্দুয়ায় ঐ হতভাগ্য ভ্রাতৃযুগলের মরদেহের পোস্টমর্টেম সত্যিই হয়েছিল কি না, তা তাদের পরিবারের কেউ তো নয়ই, এলাকার অন্যেরাও জানে না। কী করে জানবে? ১৯৭১ সালে কে কার খবর রাখে? ঢাকা থেকে গ্রামের বাড়ি ফেরার পথে আমি নিজেই তো কত মৃতদেহ ডিঙিয়ে এসেছি। ভাল করে তাকিয়েও দেখিনি তাদের মুখ। আমার দুই দাদুর মরদেহের ভাগ্যে শেষ পর্যন্ত কী জুটেছিল? চিরপ্রণম্য অগ্নি নাকি বাংলাদেশের সর্বংসহা মাটি, তা আজ পর্যন্ত তাদের পরিবারের কেউ জানতেও পারেনি। আমার নিজের ধারণা– ভয়ার্ত কুকুর, ক্ষুধার্ত শকুন আর পাগলা শৃগালের খাদ্য হয়েছিল তাদের শব ও হৃদয়।

মুক্তিযুদ্ধের বলি, আমার দুই শহীদ-দাদুর ছোটোগল্পটি এখানেই শেষ। ভগবান তাঁদের আত্মার সদগতি করুন।

সাইফুলদের পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর আমি কিছুটা নিঃসঙ্গবোধ করি। অনেকটা সময় আমরা একসঙ্গে আনন্দে কাটিয়েছি। অনেকটা দুর্গম পথ আমরা পাড়ি দিয়েছি একসঙ্গে। বিচ্ছিন্ন হওয়ার আগে সাইফুল আমাকে ওদের বাড়িতে যেতে বলেছিল। শহরের কাছেই ওদের বাড়ি। আমি যাইনি। আমার একজন মাসি (আমার মায়ের মাসতুতো বোন) থাকেন এই শহরে। কিশোরগঞ্জ কোর্টের কাছে তাদের নিজেদের বাড়ি। নন্দী বাড়ি। শহরের মানুষজনের মধ্যে নন্দী বাড়ি বেশ পরিচিত। মেট্রিক পাস করার পর, ১৯৬২ সালে আমার বাবা চেয়েছিলেন আমি যেন কিশোরগঞ্জের গুরুদয়াল কলেজে ভর্তি হই। কিশোরগঞ্জের প্রতি আমার বাবার দুর্বলতার সঙ্গত কারণ ছিল। তখন গুরুদয়াল কলেজটি কতটা গুরু আর কতটা দয়াল ও কিশোরগঞ্জ শহরটি কেমন–, তা সরেজমিনে তদন্ত করে দেখার জন্য আমি এই শহরে বেড়াতে এসেছিলাম। তখন গুরুদয়াল কলেজ বা কিশোরগঞ্জ শহরটি আমার খুব একটা পছন্দ হয়নি। আমার মনের ভিতরে ছিল আরও বড় শহরের টান। তাই আরও বড় শহরের টানে আমি ভর্তি হই ময়মনসিংহের আনন্দমোহনে।

দশ বছর আগে, প্রথমবারের মতো কিশোরগঞ্জে এসে আমি উঠেছিলাম ঐ নন্দী বাড়িতে। সেখানে আমার সমবয়সী এক মাসতুতো ভাই আছে। তার নাম বাবু। বাবু জানে আমি কবিতা লিখি। বাবু আমার কবিতার ভক্ত। অনেকটা বাবুর আকর্ষণেও সাইফুলদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমি নন্দী বাড়িতে যাই। অনেকদিন পর আমাকে কাছে পেয়ে বাসার সবাই খুব খুশি। বাবুর তো কথাই নেই। ভর-সন্ধ্যায় মাসিমা ডাল ভাত রান্না করে আমাকে যত্ন করে খাওয়ান।

আমি ভাত খেতে খেতে গত কিছুদিন ধরে ঢাকা ও জিঞ্জিরায় যা ঘটেছে, তার যথাসম্ভব বর্ণনা দিলাম। অল্পক্ষণের মধ্যেই বাবুর মাধ্যমে আমার আগমন সংবাদ এলাকায় রটে যায়। ফলে আমাকে একনজর দেখার জন্য আশপাশের বাড়ি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থেকেও লোকজন এসে ভিড় করে। আমি যে কবি, ঐ মূল্যবান তথ্যটি প্রচার করতেও বাবু বিন্দুমাত্র ভুল করেনি। সেখানকার কিছু তরুণ কবিও আমার সঙ্গে পরিচিত হতে আসে। আমাকে কিছুই বলতে হয় না, আমার সদ্য প্রকাশিত কবিতার বইটি ঝোলা থেকে বের করে বাবু জনে জনে দেখাতে শুরু করলে এক পর্যায়ে আমার মুখচ্ছবি দিয়ে তৈরি করা প্রচ্ছদ-সম্বলিত আমার প্রথম কাব্যগ্রন্থটি কতিপয় কোমল কুমারী হাতের পরশও লাভ করে। তাতে আমার খুব আনন্দ হয়। একে তো আমি রক্তচোষা বাঘের চেয়ে ভয়ঙ্কর পাকসেনাদের খাঁচা থেকে প্রাণে বেঁচে আসা, তারপর আবার উঠতি তরুণ কবি–, অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমি বেশকিছু উৎসুক মানুষের দৃষ্টির কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হই।

কোর্ট রোডের একটি চায়ের স্টলে আমাকে কেন্দ্র করে ধীরে ধীরে একটি ছোটোখাটো সাহিত্য ও রাজনীতির আড্ডা জমে ওঠে। সেই সন্ধ্যার আড্ডায় উপস্থিত কারও নাম আজ আর আমার মনে পড়ে না। কিন্তু ঐ সন্ধ্যার জম্পেশ আড্ডাটির স্মৃতি আজও মনে পড়ে। মনে পড়ে, কখন পাকবাহিনীর হাতে কিশোরগঞ্জের পতন ঘটবে, এই নিয়ে চায়ের স্টলে বিস্তর জল্পনাকল্পনা চলছিল। ঐ চায়ের স্টলেই জানতে পাই, আমরা চলে আসার পরপরই (৪ এপ্রিল, সকাল দশটার দিকে) নরসিংদী বাজারে বিমান থেকে পাকসেনারা নাপাম বোমা ফেলেছে। তাতে বেশকিছু মানুষ মারা গেছে। আগুনে পুড়ে গেছে বহু দোকান ও বাড়িঘর। নরসিংদীতে ভাগ্যিস আমরা থাকিনি। ঐরকমের বিমান আক্রমণের ভয়েই আমরা আগের দিন রাতে শিবপুর পেরিয়ে একেবারে কিশোরগঞ্জ সীমান্ত বর্তী মনোহরদিতে চলে এসেছিলাম। নরসিংদীতে থাকলে আজ সকালে (৪ এপ্রিল) নির্ঘাত পাকসেনাদের বিমান হামলার মুখে পড়তে হতো আমাদের। বড় বাঁচা বেঁচে গেছি।

AMARBOI.COM

আমি মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিকথা লিখছি জেনে সম্প্রতি নরসিংদীর একজন গবেষক-লেখক, সরকার আবুল কালাম ঢাকার নিখিল প্রকাশনীর স্বত্বাধিকারী নিখিল শীলের সঙ্গে আমার বাসায় এসেছিলেন। তাঁর দুটি বই আছে। নরসিংদীর মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদ বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে লেখা। তিনি আমাকে জানিয়েছেন, ৪ এপ্রিল ও ৫ এপ্রিল– পরপর দুদিন পাকসেনারা বিমান থেকে নরসিংদী বাজার ও তার আশপাশের এলাকা লক্ষ্য করে নাপাম বোমা বর্ষণ করে এবং মেশিনগান থেকে স্ট্রাফিং করে। লেখকের বিশিষ্ট বন্ধু আবদুল খালেক সেদিন নরসিংদী বাজারে বোমার আঘাতে নিহত হয়েছিলেন। তিনি নিজে অল্পের জন্য প্রাণে রক্ষা পান। সেদিন নরসিংদী বাজারের বেশ কিছু জেলে বোমার আঘাতে প্রাণ হারিয়েছিলেন। বিমান আক্রমণের কভারে পাকসেনারা দ্রুত নরসিংদী বাজারে প্রবেশ করে এবং হিন্দু ও আওয়ামী লীগারদের বাড়ি-ঘর ও দোকানপাট চিহ্নিত করে সেগুলো লুট

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করার জন্য স্থানীয় লোকজনকে প্ররোচিত করে। পাকসেনাদের প্রত্যক্ষ মদদে তখন নরসিংদীতে শুরু হয় লুটপাটের মহোৎসব।

কিশোরগঞ্জ তখনও পর্যন্ত মুক্তাঞ্চল। আমি অনেকের মুখেই কিশোরগঞ্জের জনপ্রিয় এসডিও (মহকুমা প্রশাসক) জনাব খসরুজ্জামান চৌধুরীর সুনাম শুনতে পাই। কিশোরগঞ্জ থেকে নেত্রকোনা পর্যন্ত কীভাবে যাব তাই নিয়ে যখন ভাবছি, তখন বাবুর এক বন্ধু আমার সাহায্যে এগিয়ে আসে। আমার চেয়ে বয়সে সামান্য ছোটো হলেও তরুণটি দারুণ সাহসী। একনিষ্ঠ মুজিব সৈনিক। নাম ভুলে গেছি। সত্যি বলতে কি ওর চেহারাটাও ঠিক মনে করতে পারছি না। আমার হুলিয়া কবিতাটি সে পড়েছে এবং কবিতাটি নাকি তার খুব ভাল লেগেছে। সেকারণে সে আমাকে মোটর সাইকেলে করে নেত্রকোনা পর্যন্ত পৌছে দিতে রাজি। তার একটাই শর্ত, কিশোরগঞ্জ থেকে নেত্রকোনা আসা যাওয়ার জন্য পেট্রোল জোগাড় করার দায়িত্ব আমাকে নিতে হবে। তখন খোলা বাজারে পেট্রোল পাওয়া যাচ্ছিল না। কিশোরগঞ্জের এসডিও সব পেট্রোল অধিগ্রহণ করে নিয়েছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয় বলে বিবেচিত কাজেই শুধু ঐ পেট্রোল ব্যবহার করা হচ্ছে।

স্থির হলো, আমি কাল সকালে আমার কবিতার বই প্রেমাংশুর রক্ত চাই হাতে নিয়ে মাননীয় মহকুমা প্রশাসকের কাছে গিয়ে তাঁকে বলব, আমার ভ্রমণকষ্ট লাঘব করার জন্য কিছু পেট্রোল চাই। বাবু বলল, ভদ্রলোক খুব সাহিত্যামোদী, সংস্কৃতিমনা মানুষ। তাঁর স্ত্রীও লেখেন। উপস্থিত সবারই ধারণা, প্রয়োজনীয় তাঁর কাছে গেলে তিনি আমাকে খালি হাতে বিদায় করবেন না। আমাকে নিশ্চয়ই পেট্রোল দেবেন।

AMARBOI.COM

৩

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র, কলকাতার আকাশবাণী ও বিবিসি-র সংবাদ শুনে আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারছিলাম যে ইতোমধ্যেই আওয়ামী লীগ ও স্বাধীনতার সমর্থক রাজনৈতিক দলের অধিকাংশ নেতৃবৃন্দই সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে প্রবেশ করেছেন এবং ঐ তালিকায় প্রতিদিনই নতুন নতুন নাম যুক্ত হচ্ছে। তাতে মুক্তিযুদ্ধে গতির সঞ্চার হচ্ছে। ভারত সরকার গণহত্যা চালানোর জন্য পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে লোকসভায় নিন্দা-প্রস্তাব এনেই ক্ষান্ত হয়নি, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করার জন্য আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দকে ভারতীয় ভূখণ্ড ব্যবহার করার প্রয়োজনীয় অনুমতিও দিয়েছেন। পাকিস্তানি বিমান আমাদের মুক্তাঞ্চলগুলো নিজেদের দখলে নেবার জন্য তাদের পদাতিক বাহিনীকে যত সাহায্যই করুক না কেন, তাতে তাদের যতই আপাতসাফল্য আসুক না কেন, অত্যাচারী পাকিস্তানি কংশরাজকে বধিবে যে, ভারতে গোপনে বাড়িছে সে। আপাতত কিছুটা গোপনীয়তা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রক্ষা করে চললেও, ভারতীয় জনগণের ক্রমবর্ধমান সমর্থন ও কংগ্রেস শাসিত ভারত সরকারের ভূমিকা দৃষ্টে বোঝা যাচ্ছিল যে, অচিরেই সেই গোপন আঁচলখানি ঝরে যাবে, উড়ে যাবে এবং একসময় পুরোপুরি খসে পড়বে।

গভীর রাত পর্যন্ত নন্দীবাড়িতে আগত মানুষজনকে আমার নরক থেকে ফেরার অভিজ্ঞতার কথা বলতে হলো। বলতে পেরে আমারও ভাল লাগল। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সাফল্য সম্পর্কে যাদের মনে বিন্দুমাত্র সন্দেহ ছিল, তারা তাদের মনের সকল সন্দেহবিন্দু পুরাতন ব্রহ্মপুত্রের জলে বিসর্জন দিয়ে মহানন্দে নিজ নিজ ঘরে ফিরে গেলেন। আমার মনে হলো, মানুষের মধ্যে স্বাধীনতার স্বপ্ন ও তার সাফল্যের সম্ভাবনার দীপশিখাটিকে নিরন্তর জ্বালিয়ে রাখাটাই কবির কাজ। আমার পক্ষে মেজর জিয়া, মেজর খালেদ মোশাররফ বা মেজর শফিউল্লাহর মতো প্রত্যক্ষসমরে অংশগ্রহণ করা সম্ভব হবে না। খসরু-মন্টুদের মতোও না। আমার সেরকম প্রশিক্ষণও নেই, সেই মানসিকতাও আমার নয়। তারপরও কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের ময়দানে আমি অস্ত্র হাতে লড়াই করছি, আমার গোলাগুলোতে মুছুয়া-পাকসেনারা (চরমপত্রে এম আর আখতার মুকুল পাকসেনাদের এভাবেই বর্ণনা করেছেন) কাতারে-কাতারে মাটিতে লুটিয়ে পড়ছে; তাদের দেহবিচ্ছিন্ন মুছুয়ামস্তকগুলো গড়াগড়ি খাচ্ছে আমার ধাবমান রথের তলায়— এ রকম ভয়াবহ স্বপ্ন দেখে আমার নিদ্রা ভেঙেছে। কিশোরগঞ্জে ঐ রাতে আমি ঠিক কী স্বপ্ন দেখেছিলাম, মনে পড়ে না। বাস্তবে ঘটে যাওয়া কত ঘটনার কথাই ভুলে গেছি, স্বপ্নের ওপর আর ভরসা কী?

পরদিন ৫ এপ্রিল, সোমবার, সকাল দশটার দিকে আমি কিশোরগঞ্জের মহকুমা প্রশাসক জনাব খসরুজ্জামান চৌধুরীর কাছে যাই। অত্যন্ত কর্মব্যস্ততার মধ্যেও আমাকে তিনি সানন্দে গ্রহণ করেন। তিনি জানান যে, আমার কিশোরগঞ্জে আগমনের খবর তিনি তাঁর গোয়েন্দাবাহিনীর মাধ্যমে কালই পেয়েছেন। আমি যে কবি, আমার কবিতার বই দেখিয়ে তা প্রমাণ করতে হলো না। তিনি বললেন আমার কবিতা তিনি পড়েছেন। বললেন, তাঁর স্ত্রী তাহমিনা জামানও লেখেন। আলাপকালে আমাদের মাঝে উপস্থিত খসরুজ্জামান চৌধুরী সাহেবের শ্যালক গালিবও (প্রাক্তন সচিব, লেখক মহিউদ্দিন আহমদের মাধ্যমে সম্প্রতি তাঁর সঙ্গে আমার টেলিফোনে কথা হয়) আমাকে মুখোমুখি পেয়ে মহা খুশি। গালিব বলল, আমিও আপনার কবিতার ভক্ত। আমার যাত্রাপথের প্রয়োজনীয় পেট্রোল পেতে মোটেও অসুবিধা হলো না।

ঐ দিনের কথা জানবার জন্য আমি বর্তমানে আমেরিকার লুসিয়ানায় বসবাসরত প্রফেসর ডক্টর খসরুজ্জামান চৌধুরীর সঙ্গে আন্তর্জালে (ইন্টারনেট) যোগাযোগ করি। তাঁর আন্তর্জাল-ঠিকানা পেতে আমাকে সাহায্য করেন নিউইয়র্ক প্রবাসী কবি-সাংবাদিক ফকির ইলিয়াস ও ড. বিমলচন্দ্র পাল। আমার একটি ছোট্ট

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পত্রের উত্তরে প্রফেসর চৌধুরী আমাকে যে দীর্ঘ পত্রটি লিখেছেন, তার ঐতিহাসিক গুরুত্ব বিবেচনা করে তাঁর অনুমতিক্রমে আমি পুরো পত্রটিই এখানে পত্রস্থ করছি।

Goon Babu

Here are some of the answers to your questions. My wife recollects her meeting with you at Bangla Academy, when you gave her a copy of one of your books. 'Dukkho Korona- Bacho' on 22 February 1989! She sends her best wishes. Same from me. Please acknowledge the reciept of this email, so that I know you recieved my answers and related observations.

First about myself. During 1971-1972, I acted as Deputy Commissioner of Greater Mymensingh. Then I worked as Deputy Secretary first in Relief and Rehabilitation (1972-1974) then in Education (1974-1977). I was the first Secretary of the reconstituted Bangladesh National Commission for UNESCO. I graduated from Harvard University, USA with a Master in Public Administration (MPA) degree in 1978 (1977-1978) and from Syracuse University, USA with a Ph.D degree in Economics in 1987 (1983-1987). I resigned from Govt. Service in 1980.

Here are answers to your questions. I do recollect you met me in my residential office on April 5, 1971. Because petrol was in shortage, I had to control it. I remember to have given you some petrol. I do recollect the boy, but I do not certainly recollect his name. I believe his name was Babul. Yes, my brother-in-law Galib was with me. He stayed with me throughout the Liberation war. Earlier, in late March, I had sent off my wife Tahmina Zaman from Kuliarchar in a passenger launch-off to a safer destination- with my 8 month old Sal, Faisal (who is now a young man and works as a Marketing Director in a USA company in San Diego, California!) I thought their presence with me restricted my ability to work harder, and free of extra worries, for the war activities. To stop the advancement of the Pakistan Army. I destroyed some important bridges in and around Kishoreganj.

What happened next was that Bhairab, under my jurisdiction, fell to Pak Army although we had destroyed part of the bridge. Captain Nasim (now retired Chief of Staff) and others fought so hard at Bhairab but could not save it! I was constantly in touch with Bhairab when the battles were going on there. Bhairab fell

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

to Pak Army probably in April 10, 1971. I got news that Pak Army was advancing towards Kishoreganj—they had come upto Sararchar, only about 20 miles from Kishoreganj!!

That was the big decision moment! I had to decide what to do. I had assured the people of Kishoreganj that if I left, I would let them know in advance. I must keep my promise. Kishoreganj was not safe any more, and I could not protect anyone any more!

I took decisions which my conscience dictated. I paid three months advance salaries to all SDO's office employees, violating all Govt. rules!! I asked them to leave town and go to safer places. Under my instruction, microphone announcement was made all over the town that the SDO (that is, me!) could no longer provide protection to anyone and everyone should seek proper safer shelters! It was also announced that I would also leave at the appropriate time.

The time finally arrived. Someone rushed from Sararchar to warn me. I then left in the night of April 17. I left in my official jeep, the SDO's jeep.

My companions were my brother-in-law Galib, my driver Subodh and his family (wife and 2 children). I took them with me because I feared for their lives!! We went to Netrokona with great hardships. I was stopped several times!! At one point, villagers were almost attacking us thinking that we were Pakistanis!!

I reached Netrokona the next day. My CSP batchmate Abdul Hamid Chowdhury (Retired Secretary, Govt. of Bangladesh) was then SDO, Netrokona. I urged him to come with me to Meghalaya. Finally, my companion and I reached Baghmara on Indian side after crossing the treacherous Kongsho river,. We left our jeep behind and walked into India. I was recieved by BSF who provided me with a shelter! I heard later that Kishoreganj fell to the Pak Army probably on April 22, 1971.

This is part of my story and part of history!! My wife and I have written in Bangali (and some English) many episodes on the Liberation war days and events : Next time we are in Dhaka, we will contact you and share those moments. Poet Shelley so rightly wrote :

'Our sweetest songs are those that tell of saddest thought'!

Many people want to publish my book on the war. Maybe I should write soon! (I have my diaries).

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

I am very very busy. Yet I thought I must honor your request. What I am sending you is in a rush- probably somewhat disorganized.

I am in tears as I am writing you these lines. You threw me into the past, a past which still haunts, and pleases me even in my dreams. I love Kishoreganj and I love Bangladesh. Bangladesh is in my blood— oi desher shonge amar narhir shomporko!! I can never forget. I only pray for the country and its real people!

Once again, I am grateful that I was lucky enough to be in your thoughts. To me, this is a great pleasure; and also a great treasure.

I am a professor now. I must thank my Ph.D. Student who is kindly sending this email for me. (I cannot type long emails!!)

Wishing you all the best.
Yours Sincerely,
Khashruzzaman Choudhury

৪

ধন্যবাদ প্রফেসর খসরুজ্জামান চৌধুরী, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। অকারণে বা আপাততুচ্ছ কারণে চঞ্চল বোধ করার মানসিকতা, কবিত্ব-দোষে দুষ্ট বলে আমি অদ্যপি অতিক্রম করতে পারিনি; কিন্তু প্রথম জীবনে গুরুত্বপূর্ণ সরকারি দায়িত্ব পালন ও পরে সর্বোচ্চ স্তরে শিক্ষকতায় নিয়োজিত হওয়ার কারণে, বিশ্বাস করি আপনি অনেক আগেই তা অতিক্রম করেছেন। আপনি স্থিরচিত্ত, স্থিতধী। তারপরও, সঙ্গতকারণে ব্যস্ত থাকার পরেও আমার একটি সামান্য ছোট্ট পত্রের উত্তরে আপনি দ্রুততার সঙ্গে যে দীর্ঘ এবং অসামান্য সুন্দর পত্রটি আমাকে লিখেছেন, তা শুধু সাপ্তাহিক ২০০০ পত্রিকার একটি পৃষ্ঠা পূর্ণ করার দায় থেকেই আমাকে অব্যাহতি দেয়নি, আমার চলমান রচনাটিকেও যথেষ্ট পরিমাণে সমৃদ্ধ করেছে। এটা শুধু আমার কথাই নয়, কানাডার কনকর্ডিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি অধ্যয়নরত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের এ্যাসিসটেন্ট প্রফেসর গোবিন্দ চক্রবর্তীও তাই মনে করেন। আপনার পত্রে বর্ণিত একাত্তরের যুদ্ধদিনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে পরিচিত হয়ে তিনি একটি জীবন্ত ঐতিহাসিক দলিলপাঠের আনন্দই শুধু পাননি—, আপনার ব্যক্তিজীবনের কথকতা জানতে পেরে পত্রপাঠান্তে তাঁর চোখ অশ্রুসিক্ত হয়েছে।

Gurujaneshu
Goon babu,

Namaskar. In fact, I am in tears as well after reading your Kishoreganj part-3, especially the email from Prof.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

Khashruzzaman that you have put in it. So many thanks for giving me a chance to get in a wonderful historical document. You take the best care of yourself.

Shraddhabanata,
Gobinda Chakraborty.
Assistant Professor of Political Science
University of Dhaka
Now doing PhD at Concordia University, Montreal.

সত্যি বলতে কি, মুক্তিযুদ্ধের কাজে অধিকতর মনোযোগ এবং সময় দেবার উদ্দেশ্যে আপনি আট মাসের পুত্রসহ আপনার প্রিয়তমা পত্নীকে দূরগামী লঞ্চে তুলে দিয়ে আপন কর্মস্থলে ফিরে আসার ঘটনাটি মনের আবেগ লুকিয়ে আপনি এমন নির্লিপ্তভাবে বর্ণনা করেছেন, যাতে মনে হয়েছে, দেশকে পাকবাহিনীর হাত থেকে মুক্ত করার প্রয়োজনে আপনার ওপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করাটা আপনার কাছে স্ত্রী ও সন্তানের চেয়ে তখন কম প্রিয় বলে মনে হয়নি।

'চারি দিকে দেখো চাহি হৃদয় প্রসারি,
ক্ষুদ্র দুঃখসব তুচ্ছ মানি
প্রেম ভরিয়া লহো শূন্য জীবনে।'

আপনার পত্রপাঠের পর থেকে রবীন্দ্রনাথের গানের এই কথাটা আমার মনে বারবার গুনগুনিয়ে উঠেছে। মহামতি লেনিন বলেছিলেন, বড় প্রয়োজন সামনে এসেছে, ছোটো প্রয়োজন ছাড়তে হবে। বঙ্গবন্ধুর মতো আত্মস্বার্থবিসর্জনকারী নেতার একজন যথার্থ যোগ্য অনুসারীর মতোই ১৯৭১ সালে আপনি তা করতে পেরেছিলেন। তাই পাকসেনাদের আগমনী সংবাদ পেয়ে কিশোরগঞ্জ থেকে সরে যাবার আগে শহরবাসীকে সর্বশেষ পরিস্থিতি সম্পর্কে মাইকযোগে সতর্ক করতে আপনি যেমন ভুল করেননি, তেমনি ভারতে আশ্রয় গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়ে কিশোরগঞ্জ ত্যাগের সময় আপনার গাড়ির চালক সুবোধের স্ত্রী ও তাদের দুই সন্তানকেও আপনার জিপে তুলে নিতে আপনি ভুল করেননি। পাকসেনাদের নির্বিচার হিন্দু-নিধনের পরবর্তী নীল নকশা নিয়ে আমি আপনার সঙ্গে যে মতবিনিময় করেছিলাম, আপনার গৃহীত সিদ্ধান্ত দৃষ্টে মনে হয়েছে, আপনিও তার সত্যতা সম্যকভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন এবং তাদের বাঁচানোর তাগিদ বোধ করেছিলেন। অন্যথায় আপনার ছোট্ট জিপে সুবোধের পরিবারের সদস্যদের স্থান সংকুলান হতো না।

আপনার স্ত্রী ও সন্তানের সঙ্গে আপনার মিলনপর্বটি কবে, কীভাবে সম্ভব হয়েছিল, অনেক পাঠকের মতো আমার নিজেরও তা জানবার খুব আগ্রহ রয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আপনার শ্যালক গালিব মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে পুরো সময় জুড়ে আপনার সঙ্গে ছিল, আপনি তা আমাদের জানিয়েছেন। তবে কি, আপনার স্ত্রী ও সন্তানের সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে আপনার আর দেখাই হয়নি?

আমার চলমান রচনাটির সঙ্গে আপনাকে যুক্ত করার চিন্তাটি এ রকম সুফলদায়ক হবে, ভাবিনি। আমার মাঝে মাঝে মনে হয়, কী জানি, অন্তরাল থেকে কোনো অদৃশ্য শক্তি বোধহয় আমাকে বুদ্ধি জোগাচ্ছে। তা না হলে, আমার তো এত বুদ্ধি, এত ধৈর্য পূর্বে কখনও ছিল না। আমি যেন আমার ভিতরে একটি নতুন আমি'র অস্তিত্ব অনুভব করছি।

'অন্তরমাঝে বসি অহরহ
মুখ হতে তুমি ভাষা কেড়ে লহ,
মোর কথা লয়ে তুমি কথা কহ
মিশায়ে আপন সুরে।
কী বলিতে চাই সব ভুলে যাই,
তুমি যা বলাও আমি বলি তাই,
সঙ্গীতস্রোতে কূল নাহি পাই—
কোথা ভেসে যাই দূরে।'

(আত্মপরিচয় : রবীন্দ্রনাথ)

কবিতা একা লেখা যায়, কিন্তু ইতিহাস বোধ করি এভাবেই, অনেকে মিলেই লিখতে হয়। অনেকের অংশগ্রহণের ভিতর দিয়েই ইতিহাস সত্য হয়ে ওঠে। পূর্ণ হয়ে ওঠে। 'আত্মকথা-১৯৭১' লিখতে বসে এই শিক্ষাটাই আমার জানা হলো।

তথ্যপ্রবাহের এই স্বর্ণযুগে প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়ে আপনার কাছে আমাকে পৌঁছতে যাঁরা সাহায্য করেছেন, তাঁদের কথা আমি আগেও কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করেছি, আবারও করছি।

জনাব মহিউদ্দিন আহমদ সম্পর্কে পাঠককে কিছু তথ্য জানানো প্রয়োজন বোধ করছি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি বিভাগে পড়াকালে জনাব খসরুজ্জামান চৌধুরী জনাব মহিউদ্দিন আহমদের চেয়ে এক বছরের জুনিয়র ছিলেন, কিন্তু কর্মজীবনে তাঁরা দুজন ছিলেন একই সিভিল সার্ভিস ব্যাচের (১৯৬৭)। জনাব মহিউদ্দিন আহমদ পাক-সরকারের পক্ষ ত্যাগ করে লন্ডনের ট্রাফালগার স্কয়ারে আয়োজিত একটি জনসভায় উপস্থিত (১ আগস্ট ১৯৭১) হয়ে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করে আমাদের মুক্তিযুদ্ধে দেশপ্রেমের নতুন আবেগ যুক্ত করেছিলেন। ইউরোপের পাকদূতাবাসগুলোতে দায়িত্ব পালনরত বাঙালি-কূটনীতিকদের মধ্যে বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করেছিলেন তিনিই প্রথম। তিনি আমাকে জানিয়েছেন যে, তিনিও ১৯৭১ সালের এপ্রিল মাসেই তাঁর পাকপক্ষ ত্যাগ করার ঘোষণাটি দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু প্রবাসী সরকারের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিশেষ দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিনিধি হিসেবে ইউরোপ ভ্রমণরত বিচারপতি আবু সায়ীদ চৌধুরী নিবৃত্ত করায় তাঁর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন বিলম্বিত হয়।

৭ মার্চের দিকনির্দেশনামূলক ঐতিহাসিক ভাষণে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, 'তোমাদের যার যা আছে তাই নিয়া শত্রুর মোকাবিলা করতে হবে...।' এই 'যার যা আছে' কথাটা এখানে খুবই প্রণিধানযোগ্য। পাক-সরকারের গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন বাঙালিদের বেলায় বঙ্গবন্ধুর ঐ কথাটার তখন একটাই মাত্র অর্থ ছিল, তা হলো, পূর্ববাঙলা-শোষণকারী ও শ্মশানকারী পাকিস্তান সরকারের সঙ্গে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী মুজিবনগর সরকারের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করা।

জনাব খসরুজ্জামান চৌধুরী বা জনাব মহিউদ্দিন আহমদ ছিলেন পাকিস্তান সরকারের উচ্চপদে আসীন অকুতোভয় বাঙালি, যাঁরা পাক-প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান বা পূর্ব বাংলার গভর্নর জল্লাদ জেনারেল টিক্কা খানের ভয়ে বা নিরুদ্বিগ্ন জীবনযাপনের লোভে বা পিয়ারে পাকিস্তানের প্রতি এক ধরনের দুর্বলতা অবশিষ্ট থাকার কারণে তাঁদের বিবেকবুদ্ধিকে পাক-সেনাদের বুটের তলায় লুটিয়ে দেননি। তাঁরা পূর্ব বাংলার বাঙালিদের অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণের মাধ্যমে প্রদত্ত নির্দেশকে শিরোধার্য করে তাঁদের নর্মজীবন, মর্মজীবন ও কর্মজীবনের ওপর ঝুঁকি নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে সরাসরি অংশগ্রহণ করেছিলেন।

আমার 'আত্মকথা ১৯৭১'-এ প্রফেসর চৌধুরীর মতো একজন বীর মুক্তিযোদ্ধাকে অন্তর্ভুক্ত করতে পেরে আমি আমার অন্তরে গভীর আনন্দ বোধ করেছি। মনে করছি, জনাব খসরুজ্জামান চৌধুরী বা জনাব মহিউদ্দিন আহমদের মতো আরও যাঁরা পাকিস্তানের পক্ষ ত্যাগ করে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে গৌরবময় ভূমিকা পালন করেছিলেন, এই দুজনের মধ্য দিয়ে তাঁরাও আমার রচনায় সগৌরবে অন্তর্ভুক্ত হলেন। বাঙালি চিরদিন তাঁদের ভূমিকার কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে।

আঠারবাড়ি হয়ে কেন্দুয়া যাবার পথে আমার আরেক মামাবাড়ি আছে আমতলা গ্রামে। আমার দাদুর নাম অতুল রাহা। তিনি ব্রিটিশ আমলের দারোগা ছিলেন বলে বাড়িটি দারোগা বাড়ি হিসেবেও এলাকায় পরিচিত। ১৯৬৬ সালে আমি যখন হুলিয়া মাথায় নিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছিলাম, তখন কিছুদিন ঐ দারোগা দাদুর বাড়িতে পালিয়ে ছিলাম। গ্রামোফোনে হেমন্তর গান আর শচীন সেনগুপ্তের সিরাজউদ্দৌলা নাটক শুনে আমার দিন ভালই কাটছিল। সান্দিকোণা হাই স্কুলের শিক্ষক আমার অরুণ মামা একদিন রাতে বাড়ি ফিরে আমাকে বললেন, কেন্দুয়া থানার একজন পরিচিত পুলিশ তাঁকে বলেছে যে আমার অবস্থান সম্পর্কে তাদের কাছে খবর আছে। যে কোনো সময় কেন্দুয়া থানার পুলিশ আমার সন্ধানে আসবে। তার আগেই আমি যেন অন্য কোথাও সটকে পড়ি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরদিন রাত পোহানোর আগেই আমি দারোগা-দাদুর বাড়ি ছেড়ে পালাই। ঐ পুলিশের কারণেই আমি সেবার পুলিশের হাতে ধরা পড়ার হাত থেকে বেঁচে গিয়েছিলাম। আমার দারোগা-দিদিমা অবশ্য আমাকে পুলিশের হাতে সোপর্দ করার পক্ষেই ছিলেন, কিন্তু শেষ-পর্যন্ত তিনি আমাকে বিদায় দিয়েছিলেন তাঁর চোখের জলে।

আমার 'হুলিয়া' কবিতায় আমতলা গ্রামের কথা আছে। 'আমতলা থেকে আসবে আব্বাস'।

পাঁচ বছর পর আমি ঐ গ্রামের পাশ দিয়ে নেত্রকোনায় ফিরছি। একবার ভাবলাম আমতলায় একটু থেমে গেলে মন্দ হয় না। কিন্তু ঐ ভাবা পর্যন্তই। নান্দাইলের পাশ দিয়ে আসার সময় নওহাটায় যখন থামিনি, তখন আর আমতলাতেই বা থামব কেন? যে তরুণটি আমাকে তার মোটর সাইকেলে বহন করে নিয়ে চলেছে, নেত্রকোনায় আমাকে নামিয়ে দিয়ে তাকে আবার দীর্ঘ পঞ্চাশ মাইল পথ ফিরতে হবে। চরৈ বেতি, চরৈ বেতি। মাইলস টু গো বিফোর আই স্টপ।

এখন আমার ঐ দারোগা দাদুও নেই, আমার প্রিয় ঐ দজ্জাল দিদিমাটিও নেই। আজ সেদিনের কথা লিখতে বসে নিজেকে খুব অপরাধী মনে হচ্ছে।

মোটর সাইকেলের পেছনে বসিয়ে নিয়ে যে ছেলেটি আমাকে কিশোরগঞ্জ থেকে নেত্রকোনায় পৌঁছে দিয়েছিল, জনাব খলিকুজ্জামান সাহেবকে ধন্যবাদ যে তিনি অন্তত অনুমান করে হলেও বলেছেন, ছেলেটির নাম— খুব সম্ভবত, বাবুল। বাবুল? বা-বু-ল...? আহা! তাই যেন সত্য হয়। ওর নাম বাবুল হলেই ভাল। আমার তো তাও মনে নেই। তবে, নিশ্চিত করে ঐ ছেলেটির নাম জানত আমার মাসতুতো ভাই বাবু। বাবু নন্দী। কিশোরগঞ্জে যাদের বাড়িতে ৪ এপ্রিল আমি রাত কাটিয়েছিলাম। বাবুর মাধ্যমেই ঐ তুর্কী-তরুণের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল। দুর্ভাগ্য আমার, অনেকদিন পর বাবুর সন্ধান করতে গিয়ে জানলাম, কিছুদিন আগে আমার প্রিয় বাবুও লোকান্তরিত হয়েছে।

এখন আমার এই লেখাটি যদি কিশোরগঞ্জের এমন কারও চোখে পড়ে, যিনি অনুসন্ধান চালিয়ে ঐ তরুণকে আবিষ্কার করতে পারেন, বা যার কথা আমি আমার আত্মকথায় লিপিবদ্ধ করছি, লেখাটি যদি তাঁর চোখে পড়ে, তবে তিনি যেন দয়া করে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেন, তবেই আমি কিছুটা ভারমুক্ত হতে পারি।

শ্রীজ্ঞান যতীন সরকারের আত্মজীবনী 'পাকিস্তানের জন্মমৃত্যু-দর্শন' গ্রন্থে ঐ সময়টার একটা চমৎকার বর্ণনা পাচ্ছি। সেখানে দেখতে পাচ্ছি— আমরা দুজন ভিন্ন ভিন্ন অবস্থান থেকে প্রায় একই সময়ে একটি অভিন্ন গন্তব্যের দিকে ক্রমশ অগ্রসর হচ্ছি। তিনি লিখছেন :

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"দু'একদিন পর (ময়মনসিংহ থেকে) আমি পরিবারের আর সবাইকে নিয়ে কিছুদূর পর্যন্ত ট্রাকে, কিছুদূর রিকশায় এবং কিছুটা গরুর গাড়িতে করে নেত্রকোনা শহর হয়ে বারহাট্টায় গিয়ে পৌঁছলাম। বারহাট্টায় আমি দু'বছর মাস্টারি করেছি, এ এলাকায় অনেকেই আমার পরিচিত, আমার শুভানুধ্যায়ীর সংখ্যাও এখানে অনেক। তাছাড়া ছোট ভাই মতীন্দ্র এই বারহাট্টা স্কুল থেকেই মেট্রিক পাস করেছে। তারও বন্ধুবান্ধব এখানে কম নেই। তাই বারহাট্টাতেই আপাতত আশ্রয় নেয়া সমীচীন মনে করলাম।

বারহাট্টার পাশেই কলমাকান্দা থানা। কলমাকান্দার পরেই সীমান্ত। এর পরেই ভারতের মেঘালয় রাজ্য। কাজেই বারহাট্টায় থাকলেই সীমান্ত পাড়ি দেয়াটাও অনেক সহজ হবে। এ বিবেচনাটাও মাথায় ছিল। তাই মা-বোন-ভাগনির সঙ্গে মতীন্দ্রকে বারহাট্টায় রেখে আমি গ্রামের বাড়িতে বাবা ও ঠাকুরমার সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। কিন্তু বারহাট্টায় আর আমার ফিরে যাওয়া হলো না। ফুলবাড়িয়ায় স্ত্রী-পুত্রের খবর নেয়াও অসম্ভব হয়ে উঠল। পাকসেনারা কিছুদিনের মধ্যেই ময়মনসিংহ-কিশোরগঞ্জ-নেত্রকোনা শহরগুলো দখল করে নিল। পথ-ঘাট আর আমাদের জন্য নিরাপদ রইল না।

এপ্রিলের চার কি পাঁচ তারিখে আমি গ্রামের বাড়িতে যাই।..."

(পাকিস্তানের জন্মমৃত্যু-দর্শন, পৃঃ ৩৬৮)

AMARBOI.COM

অবশেষে নেত্রকোনায়

নেত্রকোনা শহর বেষ্টনকারী দুর্বিনীত মগরা নদ পাড়ি দিয়ে আমরা যখন শহরের ভিতরে পৌঁছলাম, তখন দুপুর। চতুর্দিকে চিকচিক করছে রোদ্দুর–, শোঁ শোঁ করছে হাওয়া। শহরের সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন ভবনশীর্ষে চৈত্রের উত্তপ্ত বাতাসে পতপত করে উড়ছে স্বাধীন বাংলাদেশের লাল-সবুজ পতাকা।

নেত্রকোনা শহরের কোর্টরোডে অবস্থিত 'সিদ্দিক প্রেস'টি অন্য সকলের কাছে সিদ্দিক প্রেস হিসেবে পরিচিত হলেও আমার ও আমার মতো নেত্রকোনার ষাট দশকের নবীন লিখিয়েদের কাছে অধিক পরিচিত হয়ে উঠেছিল 'উত্তর আকাশ' পত্রিকার কার্যালয় হিসেবে। সেখানে 'উত্তর আকাশ'-এর সম্পাদক প্রবীণ সাহিত্যিক খালেকদাদ চৌধুরী প্রতিদিনই কিছু সময়ের জন্য বসতেন। নেত্রকোনায় থাকাকালে তাঁকে ঘিরে আমরা প্রায়ই আড্ডা দিতাম। ঐ আড্ডায় নেত্রকোনা কলেজের বাংলার অধ্যাপক শামসুদ্দিন আহমদ, ইংরেজির জলিল স্যার, অধ্যাপক প্রাণেশ চৌধুরী, অধ্যাপক শাজাহান কবির, কবি-সাংবাদিক আল আজাদ, সাংবাদিক-সাহিত্যিক জীবন চৌধুরী, সাংবাদিক কালীপদ চক্রবর্তী, কবি শান্তিময়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিশ্বাস, ছড়াকার প্রণব চৌধুরী, কবি খালেদ বিন আস্কার (খালেদ মতিন), শাহনেওয়াজ ফকির, শ্যামলেন্দু পাল, দীলিপ দত্তসহ অনেকেই আসতেন।

রফিক আজাদ নেত্রকোনা কলেজ থেকে আইএ পাস করার পর ১৯৬১ সালেই নেত্রকোনা ছেড়ে ঢাকায় পাড়ি জমিয়েছিলেন। তিনি উত্তর আকাশ পত্রিকায় নিয়মিত কবিতা লিখতেন, কিন্তু তাঁকে আমি কখনও ঐ আড্ডায় পাইনি। কবি রফিক আজাদের সঙ্গে নেত্রকোনায় আমার কখনও দেখাই হয়নি। তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঢাকা হলে। 'আমার কণ্ঠস্বর' গ্রন্থে তার বর্ণনা আছে।

প্রেস ব্যবসায় বিঘ্ন ঘটলেও, আমার পিতৃবান্ধব প্রেস-মালিক আলী ওসমান সিদ্দিকী সাহেব আমাদের মতো নবীন লিখিয়েদের যাবতীয় অত্যাচার হাসিমুখে বরণ করতেন। আমাদের গ্রামের পাশের গ্রাম ডেমুরায় ছিল তাঁর বাড়ি। আমার পিতার সঙ্গে তাঁর খুব সুসম্পর্ক ছিল। সম্ভবত স্কুল জীবনে তাঁরা পরস্পরের সহপাঠী ছিলেন। ১৯৬১ সালের শুরুতেই 'উত্তর আকাশ' পত্রিকায় আমার জীবনের প্রথম কবিতা (নতুন কাণ্ডারী) ছাপা হয়। আমার ঐ কবিতাটি উত্তর আকাশ পত্রিকায় প্রকাশের পেছনে সম্পাদক খালেকদাদ চৌধুরী সাহেবের চেয়েও পত্রিকার প্রকাশক-মুদ্রক আলী ওসমান সিদ্দিকী সাহেবের মুখ্য ভূমিকা ছিল। সিদ্দিক চাচার (পিতৃবান্ধব হিসেবে আমি তাঁকে চাচা বলেই ডাকতাম) আনুকূল্য না পেলে উত্তর আকাশ পত্রিকায় আমার প্রথম কবিতা প্রকাশের ঘটনাটি আরও কিছুকাল বিলম্বিত হতো বলেই আমার ধারণা।

তারপর দেখতে দেখতে কংশ-মগরা-সোমেশ্বরী আর পদ্মা-মেঘনা-যমুনার ওপর দিয়ে অনেক জল গড়িয়েছে বঙ্গোপসাগরে। শুধু কি জল গড়িয়েছে? না, শুধু জল নয়, মুক্তিকামী লাখো বাঙালির বুকের তাজা রক্তও মিশেছে সেই নদীজলে। আমাদের জলের নদ-নদী পরিণত হয়েছে রক্তের নদনদীতে। সেই রক্তনদী বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষ্যা ও পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদ পাড়ি দিয়ে, আজ ঠিক এক দশক পর, বহু ভাগ্যবলে যমদূতরূপী পাকসেনাদের খাঁচা থেকে আমি প্রাণ নিয়ে ফিরে এসেছি আমার মহুয়ার কাছে, নেত্রকোনায়। আমি ফিরে এসেছি আমাকে কবি-স্বীকৃতি প্রদানকারী প্রথম পত্রিকা 'উত্তর আকাশ'-এর মাতৃক্রোড়ে। আমার খুব আনন্দ হলো।

'পেছনে রহিল কংশের বুক ভরি
অশ্রু আমার মগরা, সোমেশ্বরী।'

(আনন্দকুসুম : নির্মলেন্দু গুণ)

ঢাকার বধ্যভূমি থেকে মুক্ত—নেত্রকোনায় আমার ফিরে আসার সংবাদটি ছড়িয়ে পড়লে আমার সঙ্গে দেখা করতে আমার বন্ধুরা সিদ্দিক প্রেসে ছুটে আসে। আমি বেঁচে আছি দেখে তারা সবাই খুব খুশি। আমি হেলাল হাফিজের কুশল-সংবাদ ওর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পিতা কবি খোরশেদ তালুকদার সাহেবের কাছে পৌঁছে দেবার দায়িত্ব দিলাম বন্ধুদের। অনেকেই ভেবেছিল, হেলাল হয়তো ইকবাল হলেই ছিল এবং মিলিটারি অপারেশনে মারা পড়েছে। হেলাল সেই রাতে ইকবাল হলের পরিবর্তিত নাম সার্জেন্ট জহুরুল হক হলে ছিল না এবং ২৭ মার্চ থেকে ৩ এপ্রিলের দুপুর পর্যন্ত সে আমার সঙ্গেই ছিল জেনে হেলালের প্রিয়জনরা সবাই স্বস্তি পেলেন।

আমার প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'প্রেমাংশুর রক্ত চাই' ততদিনে নেত্রকোনার বইয়ের লাইব্রেরিগুলোতে পৌঁছে গিয়েছিল। অনেকেই জানাল, তারা আমার কবিতার বইটি কিনেছে। তখন বইটির মূল্য ছিল তিন টাকা। ঝোলার ভিতর থেকে আমার কবিতার বইটি বের করে আমি আমার প্রিয় বন্ধুদের দেখতে দিলাম। বইটির অতিরিক্ত কপি আমার ব্যাগে ছিল না। তাই কাউকে উপহার দিতে পারলাম না। আমার বইটি বন্ধুদের হাতে হাতে ঘুরতে লাগল। সবাই বলল, বইটি খুব ভাল হয়েছে। শুধু মুদ্রণমান বিচারে নয়, কবিতামান বিচারেও। 'হুলিয়া' কবিতাটির প্রশংসায় দেখলাম সবাই পঞ্চমুখ।

আমাকে মোটর সাইকেলে করে কিশোরগঞ্জ থেকে নেত্রকোনায় পৌঁছে দিয়েছিল যে ছেলেটি, সেই বাবুল (মুক্তিযুদ্ধচলাকালে কিশোরগঞ্জের এসডিও জনাব খসরুজ্জামানের মতে)-কে পাশের একটি হোটেলে অন্নব্যঞ্জনে যতটা সম্ভব তুষ্ট করে দ্রুত বিদায় দিলাম। বেচারিকে এখন কিশোরগঞ্জ পর্যন্ত সারাটা পথ একা ফিরতে হবে। ওকে বিদায় দিতে গিয়ে ভাবলাম, কবিতাপ্রেমিক এমন মুজিবভক্ত ছেলে যে দেশে আছে, সেই দেশ কখনও স্বাধীন না হয়ে পারে না।

নেত্রকোনার মহকুমা প্রশাসক ছিলেন আবদুল হামিদ চৌধুরী। কিশোরগঞ্জের মহকুমা প্রশাসক জনাব খসরুজ্জামান চৌধুরীর পত্রে ঐ নামটির উল্লেখ আছে। বন্ধুদের নিয়ে আমি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলাম। উদ্দেশ্য আমার অর্জিত অভিজ্ঞতা যতটা সম্ভব তাঁকে জানানো, যেন আমার অভিজ্ঞতার আলোকে তিনি মুক্তিযুদ্ধের অনুকূলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে পারেন। তিনি তখন কোর্টে ছিলেন। সেখানে আমার আগমন সংবাদ শুনে কোর্টের ভিতর ও আশপাশ থেকে অনেক মানুষ এসে ভিড় করলেন। কবি-সাংবাদিক আল আজাদ, শ্যামলেন্দু পাল, মোহাম্মদ আলী সিদ্দিকী, হায়দার জাহান চৌধুরীসহ ছাত্র লীগের কিছু নেতা কর্মীও আমার সঙ্গে ছিলেন। তাঁরা আমার সব কথাই খুব গুরুত্বসহকারে শুনলেন।

মনে পড়ে, পাকসেনাদের গোপন নীল নকশা অনুযায়ী নির্বিচার বাঙালি নিধনের পর, এবার যে নির্বিচার হিন্দু নিধনের পালা শুরু হবে–, দেশজুড়ে যে একটা ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-পরিস্থিতি সৃষ্টি করার চেষ্টা হবে– ঐ বিষয়টির ওপরই আমি বেশি জোর দিয়েছিলাম। বঙ্গবন্ধুও তাঁর ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণে দেশবাসীকে এ ব্যাপারে সতর্ক করেছিলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'শুনুন, মনে রাখবেন, শত্রুবাহিনী ঢুকেছে। নিজেদের মধ্যে আত্মকলহ সৃষ্টি করবে, লুটতরাজ করবে। এই বাংলায় হিন্দু-মুসলমান, বাঙালি-অবাঙালি যারা আছে, তারা আমাদের ভাই। তাদের রক্ষার দায়িত্ব আপনাদের ওপর, আমাদের যেন বদনাম না হয়।'

কিশোরগঞ্জের মহকুমা প্রশাসকের সঙ্গে আমার সাক্ষাতের কথা নেত্রকোনার মহকুমা প্রশাসককে জানালাম। বিভিন্ন স্তরের মানুষের সঙ্গে কথা বলে বুঝলাম, ঢাকার ২৫ মার্চের গণহত্যা সম্পর্কে অনেককিছু জানলেও, তারা বুড়িগঙ্গার ওপারের ২ এপ্রিলের 'জিঞ্জিরা জেনোসাইড' সম্পর্কে প্রায় কিছুই জানে না। মনে হলো ঘটনাটির কথা আমার কাছ থেকেই তারা প্রথম জানলেন।

বঙ্গবন্ধুর খবর তখনও পর্যন্ত আমাদের কারও জানা ছিল না। করাচি বিমানবন্দরে তোলা বঙ্গবন্ধুর ছবিটি ৫ এপ্রিল বিশ্বের বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। কিন্তু ঐ তথ্যটি আমাদের তখন জানার কোনো উপায় ছিল না। পাকসেনারা বঙ্গবন্ধুকে বাঁচিয়ে রেখেছে, ২৫ মার্চের মিলিটারি অ্যাকশনের অভাবনীয় নিষ্ঠুরতা দেখার পর, এমন আশার কথা জোর দিয়ে তখন কেউই বিশ্বাস করতেও পারছিলেন না। আমি একটু আগ বাড়িয়েই বিজ্ঞের ভঙ্গিতে বললাম, হ্যাঁ, তিনি বেঁচে আছেন। একটু মিথ্যে করেই বললাম, শেখ মণি ও মোস্তফা মহসীন মন্টুর কাছে আমি শুনেছি, তিনি ঢাকার কাছেই কোথাও লুকিয়ে আছেন। পাকসেনারা তাঁকে ধরতে পারেনি। পারবেও না কখনও। আমার কথা অনেকেই বিশ্বাস করল। বিশ্বাস করল, হয়তো আমি কবি বলেই।

ইচ্ছে থাকলেও সময়ের অভাবে আওয়ামী লীগের নেতা খালেক ভাই, ফজলুর রহমান খান বা তারা ভাইয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা সম্ভব হলো না। তবে তাঁরা যে নেত্রকোনার নিকটবর্তী মেঘালয় সীমান্তের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছেন, সে বিষয়টি জানতে পারলাম।

'সুতরাং' নামে ষাটদশকে খুব ভাল একটি ছবি হয়েছিল। ছবির নায়ক ছিলেন সুভাষ দত্ত, নায়িকা কবরী। দীর্ঘদিন পর ছবির নায়ক ছুটি পেয়ে নিজের বাড়িতে ফিরছিলেন। বাড়ির একেবারে কাছে পৌছার পর তিনি একটা ভোঁ দৌড় দেন। ঐ দৌড়ের দৃশ্যটি ছিল খুব অন্তরস্পর্শী। দূরের পথটা শান্ত-ভদ্র পায়ে হেঁটে এলেও, বাড়ির কাছে আসার পর মনের ভিতরের চঞ্চলতাটাকে তিনি আর লুকাতে পারেননি। আমার হয়েছিল সেই সুভাষ দত্তের দশা। আমি যতই আমার বাড়ির কাছে যাচ্ছিলাম, বাড়ির জন্য আমার নাড়ীর টান যেন সময়ের সাথে পাল্লা দিয়ে ততই বাড়ছিল। তাই বন্ধুদের অনুরোধ সত্ত্বেও আমি নেত্রকোনায় যাত্রাবিরতি করতে কিছুতেই রাজি হলাম না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বারহাট্টার পথে : গৃহগত প্রাণ

খবর নিয়ে জানলাম, রেলগাড়ি চলছে না। ২৫ মার্চের পর থেকে ময়মনসিংহ-মোহনগঞ্জ লাইনে একটি ট্রেনও যাওয়া আসা করেনি। এই এলাকার মানুষজন বিশেষ প্রয়োজনে কখনও রিকশায়, কখনও গরুর গাড়িতে করে সড়কপথে যাতায়াত করছে। নদীপথে চলছে নৌকা। কিন্তু অধিকাংশ মানুষেরই তখন শ্রীচরণ ভরসা। নিকট অতীতে না থাকলেও, এই সড়কপথে পায়ে হেঁটে বা কবি রফিক আজাদের ভাষায় 'পদব্রজে' যাতায়াত করার পূর্ব-অভিজ্ঞতা আমার আছে। রেলপথে নেত্রকোনা থেকে বারহাট্টার দূরত্ব প্রায় দশ মাইল। সড়কপথে দূরত্ব কিছুটা কম হবে, যদিও রেলপথের সঙ্গে নিরাপদ দূরত্ব রেখে মায়ের সঙ্গে রাগ করে পথ-চলা অভিমানী শিশুর মতো পাশাপাশিই ছুটে চলেছে সেও।

নেত্রকোনা-মোহনগঞ্জ রেলপথের সবগুলো স্টেশনের নামই খুব সুন্দর। বেশ কাব্যিক। নেত্রকোনার পরের স্টেশনটির নাম 'বাংলা'। সেটেলমেন্ট রেকর্ড-অনুযায়ী এলাকাটার নাম হচ্ছে 'সিংহের বাংলা'। কিন্তু রেলস্টেশনটির নামফলকে বড় কালো হরফে লেখা আছে শুধুই বাংলা। আমার সোনার বাংলা। ছোট্ট স্টেশন। এত ছোটো যে, এর চেয়ে ছোটো কোনো রেলস্টেশন আর হয় না। কিন্তু তার ছোট্ট অবয়বের মধ্যেই সে ধারণ করে আছে আমাদের স্বপ্নের বিশাল দেশটিকে। স্টেশনটির নামের সঙ্গে 'দেশ' শব্দটিকে যুক্ত করলেই বাংলাদেশটিকে পাওয়া হয়। এমন দেশাত্মবোধক, অর্থবহ একটি নাম বাংলাদেশে তো নয়ই, পৃথিবীর অন্য কোনো দেশের রেলস্টেশনেরও আছে বলে আমার মনে হয় না। বাংলার পরের স্টেশন হচ্ছে ঠাকুরাকোণা, তারপর বারহাট্টা, বারহাট্টার পরের স্টেশন হচ্ছে অতিথপুর ও সবশেষে মোহনগঞ্জ। তার আর পর নেই। ওখানেই রেলপথের শেষ, আর সিলেটগামী জলপথের শুরু।

রবীন্দ্রনাথ জনমভর জানতে চেয়েছিলেন পথের শেষ কোথায়? ঐ প্রশ্নের উত্তর যে মোহনগঞ্জ, তাঁর স্নেহভাজন সঙ্গীতজ্ঞ শৈলজারঞ্জন মজুমদার মহাশয়ের কর্তব্য ছিল কবিগুরুকে সেই কথাটা বলা। মোহনগঞ্জের মানুষ হয়েও শৈলজাবাবু যে কেন তা বিশ্বকবিকে বলেননি, সে এক রহস্য।

তবে আমরা খুব খুশি যে, তিনি 'নেত্রকোনা' জায়গাটাকে রবীন্দ্রকাব্যে ঢুকিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। শৈলজারঞ্জন ১৯৩০ সালে বিশ্বকবির সত্তর বছর পূর্তিতে নেত্রকোনা শহরের দত্ত হাই স্কুলে রবীন্দ্র-জয়ন্তী পালন করেন। শান্তিনিকেতনের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাইরে, ওটাই ছিল প্রথম রবীন্দ্র-জয়ন্তী অনুষ্ঠান। নেত্রকোনা ছাড়া ভারতের আর কোথায়ও তা পালিত হয়নি। রমা রোঁলার উদ্যোগে সেবার ইউরোপেও রবীন্দ্র-জন্মজয়ন্তী পালিত হয়েছিল বলে শুনেছি। নেত্রকোনায় রবীন্দ্রজয়ন্তী পালনের বিষয়টি শৈলজারঞ্জনকে লেখা রবীন্দ্রপত্রদ্বারা সমর্থিত। ফলে এখানে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। রবীন্দ্রকাব্যে 'নেত্রকোনা' এসেছে এভাবে—

জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসে
আমের শাখায় আঁখি ধেয়ে যায় সোনার রসের আশে
লিচু ভরে যায় ফলে,
বাদুরের সাথে দিনে আর রাতে অতিথির ভাগ চলে।
বেড়ার ওপারে মৌসুমে ফুলে রঙের স্বপ্ন বোনা,
চেয়ে দেখে দেখে জানালার নাম রেখেছি নেত্রকোনা।

(শ্যামলী : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

গ্রন্থের পরিশিষ্টে শৈলজারঞ্জন মজুমদারকে লেখা সেই ঐতিহাসিক রবীন্দ্রপত্র ও নেত্রকোনায় অনুষ্ঠিত রবীন্দ্রজয়ন্তী পালনের স্মৃতিকথা উদ্ধৃত হলো। স্মৃতিচারণ করেছেন একসময়ের নেত্রকোনার প্রখ্যাত বাম-রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক কর্মী ও জনপ্রিয় শিক্ষক, বর্তমানে কলকাতা নিবাসী শ্রীসত্যকিরণ আদিত্য।

ময়মনসিংহ থেকে নেত্রকোনা পর্যন্ত রেললাইনটি চালু হয়েছিল উনিশ শতকের গোড়ার দিকে। আমার ঠাকুরদাদা রামসুন্দর গুণ মহাশয় ময়মনসিংহ শহরে জজ-কোর্টে চাকরি করতেন। তিনি পালকিতে চড়ে আমাদের গ্রামের বাড়ি থেকে নেত্রকোনায় গিয়ে রেলগাড়িতে চড়তেন। আমার জন্মের এক যুগ আগে ও আমার ঠাকুরদার মৃত্যুর এক যুগ পরে ১৯৩৩ সালে নেত্রকোনা থেকে মোহনগঞ্জ পর্যন্ত রেললাইনটি সম্প্রসারিত হয়। কমবেশি আঠার মাইল দীর্ঘ ঐ সম্প্রসারিত রেলপথ তৈরিতে সময় লেগেছিল প্রায় দুই বছর। ঘটনাটি উল্লেখ করলাম এজন্য যে, আমাদের নিত্যপতনমুখী রেলের উন্নয়ন নিয়ে যারা ভাবনা-চিন্তা করেন তাদের পরিকল্পনা প্রণয়নে হয়তো সহায়ক হতে পারে।

ময়মনসিংহ থেকে মোহনগঞ্জ পর্যন্ত জেলাবোর্ডের রাস্তাটি অবশ্য রেলপথের আগেই চালু হয়েছিল। শুরুতে এই সড়কপথে বাহন বলতে ছিল পালকি ও গরুর গাড়ি। ১৯৭১ সালেও ঐ পথে রিকশা বা বাস চালু হয়নি। ভাঙা রাস্তা। পুরোটাই তখন ছিল কাঁচা। বুঝলাম পুরো পথটা পায়ে হেঁটেই পাড়ি দিতে হবে আমাকে। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়ে আসছে।

বন্ধুদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে পা বাড়ালাম বারহাট্টার উদ্দেশ্যে। আপাতত পেছনে পাকসেনাদের আক্রমণের ভয় নেই। সামনে আপনজনদের সঙ্গে মিলিত হতে পারার আনন্দ-হাতছানি। আহা! কতদিন পর আমি আমার গ্রামের বাড়িতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফিরছি। আমার নিজের লেখা 'হুলিয়া' কবিতাটির কথা মনে পড়ল। মনে হলো আমার ওপর থেকে হুলিয়া আজও উঠে যায়নি। হুলিয়া মাথায় আমি আজও পালিয়ে বেড়াচ্ছি। আজ এখানে তো কাল সেখানে। এপ্রিল মাসের প্রথম রাতটি আমি কাটিয়েছিলাম বুড়িগঙ্গার ওপারে, শুভাড্যায়। ২ এপ্রিল জিঞ্জিরায় গণহত্যার পর ঢাকায় ফিরে রাত কাটিয়েছি আজিমপুর কবরের পাশে, আমার প্রতিবেশী বন্ধু শাহজাদাদের পরিত্যক্ত বাড়ির রান্নাঘরের মেঝেতে। ৩ এপ্রিলের রাত কাটিয়েছি নরসিংদীর মনোহরদিতে। ৪ এপ্রিল কিশোরগঞ্জ শহরের নন্দী বাড়িতে। আজ এপ্রিলের ৫। অনেকদিন পর আমি আজ আমার জন্মগ্রামে, নিজের বাড়িতে ঘুমাতে পারব। হয়তো বা সেখানে থিতু হব কিছুদিনের জন্য।

আমি যখন বারহাট্টায় পৌঁছলাম, তখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। অস্তগামী চৈত্র-সূর্যের শেষ-অস্তরাগে চারপাশের প্রকৃতি রাঙানো। উত্তরের দিকে তাকালেই বারবার চোখে পড়ছে মেঘমুক্ত গারো পাহাড়। পাহাড় তো নয়, আকাশে হেলান দেয়া সাদা ক্যানভাসের মধ্যে আঁকা একটা ঢেউ খেলানো নীলচে-সবুজ রঙের পোচ। আমি পদব্রজে বাড়ি ফিরছি জেনে নেত্রকোনা থেকেই সে আমার সঙ্গ নিয়েছিল। সেই থেকে সারাটা পথ সে আমার পাশে পাশেই আসছে। 'আকাশে হেলান দিয়ে পাহাড় ঘুমায় ঐ'— গানটা তো মনে পড়লই, মনের মধ্যে একটা নতুন চিত্রকল্পেরও জন্ম হলো। মনে হলো আমাকে চোখে চোখে পাহারা দিয়ে চলেছে পাহাড়। বলছে, আমার কাছে কখন আসবে তুমি? ঢাকায় থাকতেই কল্পনায় ভারত-সীমান্তবর্তী ঐ পাহাড়ের নিমন্ত্রণ আমি গ্রহণ করেছিলাম। আজ মনে হলো, তার সঙ্গে মিলনের দিন খুব দূরে নয়।

গৌরীপুর বাজারের একটি চায়ের স্টলে বসে চা খেলাম। অনেক প্রিয়-পরিচিত জনের সঙ্গে আমার দেখা হলো। তারা আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে আনন্দ করলেন। বললেন, ২৫ মার্চের পর আমার কোনো খবর না পেয়ে তারা ধরেই নিয়েছিল, আমি আর বেঁচে নেই। ভারতের আকাশবাণী আর লন্ডনের বিবিসির সংবাদে এলাকার সবাই জেনেছে, আমার কর্মস্থল 'দি পিপল' পত্রিকার অফিসটি পাকসেনারা ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দিয়েছে। ঐ রকম সংবাদ পাওয়ার পর খুব স্বাভাবিকভাবেই আমার পরিবারের সবাই ছিল আমার জীবনাশংকায় উৎকণ্ঠিত। বিশেষ করে আমার বাবা। ভাইবোনদের কাছে শুনেছি, তিনি দিনরাত আমার কবিতার বইটি হাতে নিয়ে বারান্দার চেয়ারে বসে পথের দিকে তাকিয়ে থাকতেন। কবিতাগুলো বারবার পড়তেন। বইটির প্রচ্ছদে কবির মুখচ্ছবি ব্যবহার করার বিষয়টি অনভ্যস্ততার কারণে বন্ধুদের কারও কারও কাছে কিছুটা অশোভন বলে মনে হলেও, আমার বাবার জন্য তা ছিল কিছুটা উপরি পাওয়ার মতোই। কষ্ট করে আমার মুখটি তাঁকে কল্পনা করতে হতো না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আমার বাবার মতো সবাই যদি আমাকে স্বাধীনতা দিত!' —এই দ্ব্যর্থবোধক বাক্যটি লিখে আমি আমার কাব্যগ্রন্থটি তাঁকে উৎসর্গ করেছিলাম। উৎসর্গে বর্ণিত কথাটা দুঃসময়ে তাঁকে আনন্দের চেয়ে কষ্টই দিত বেশি। একসময় তাঁর চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়ত কাব্যগ্রন্থের প্রচ্ছদে। আমার কাব্যগ্রন্থটি তাঁর কাছে শ্রীমৎভগবদগীতার মতোই নিত্যপাঠ ও পবিত্র হয়ে উঠেছিল।

বাবাকে নিয়ে আমার অনুভূতি ছিল কিছুটা একদেশদর্শী। আমার জন্মপ্রিয় গ্রাম, ভাইবোন, আমার আদুল গায়ের সাথী-বন্ধুরা আমার কাছে কম প্রিয় ছিল, এমন নয়। ছিল। কিন্তু সবকিছু ছাপিয়ে আমার বারবার মনে হচ্ছিল, আমি যেন আমার বাবার কাছেই ফিরছি। আরও অনেকের কাছেই ফিরছি বটে, কিন্তু সবচেয়ে বেশি ফিরছি তাঁর কাছে। আজ বুঝি, তার কারণ ছিল আমাদের দু'জনের শিল্পীসত্তার অভিন্ন অন্বেষা। আমার কাছে তিনি শুধু আমার পিতাই ছিলেন না, ছিলেন শিল্পীও। অন্যদিকে আমিও তাঁর কাছে শুধু তাঁর সন্তানমাত্র ছিলাম না, ছিলাম মুক্তিকামী বাঙালির জন্য এক উদীয়মান কবিকণ্ঠ। ফলে তাঁর কাছে আমার অস্তিত্বের একটা পৃথক অর্থ ছিল।

আমার প্রিয়-পরিজনদের সকল উৎকণ্ঠার অবসান ঘটিয়ে আমি বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করলাম। আমার বাড়ি পৌঁছানোর আগেই আমার আগমন সংবাদ বাড়িতে পৌঁছে গিয়েছিল। বাকি ছিল চোখের জলে ভিজিয়ে প্রত্যাগতকে বুকে জড়িয়ে ধরার পালা। ঘরের ভিতরে প্রবেশের আগে সেই পর্বটিও যথারীতি সম্পন্ন হলো।

আপনজনের উদগত অশ্রুর ভিতরে আমি নিজেকে সঁপে দিয়ে হাত-পা ছড়িয়ে উঠানে বসে পড়লাম। 'দুই বিঘা জমি'র উপেনের কথা মনে পড়ল—

'ভাবিলাম মনে বুঝি এতক্ষণে আমারে চিনিল মাতা।
স্নেহের সে দানে বহু সম্মানে বারেক ঠেকানু মাথা ॥'

আমার ছোট বোন ঝিল্লি টাঙ্গাইলের কুমুদিনী কলেজে পড়ে। ঢাকায় যাওয়া আসার পথে আমি ওকে আনা-নেওয়া করতাম। এবার আর আমার পক্ষে সেই দায়িত্ব পালন করা সম্ভব হয়নি। কলেজ বন্ধ ঘোষিত হলে সে একাই বাড়িতে চলে এসেছে। আমার প্রতি ওর অসীম দরদ। আমার জলতৃষ্ণার কথা আমি ভুলে গিয়েছিলাম, কিন্তু আমার বোনটি বুঝতে পারল। সে এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল এনে আমার মুখের কাছে তুলে ধরল। ওর ডান হাতে ধরা ঝকঝকে কাঁসার গ্লাসে চোখ পড়তেই আমার মনে পড়ে গেল শুভার কথা। আহা! এখন কী করছে শুভা? অপস্রিয়মাণ শুভার মুখশ্রীকে আমি স্মরণে আনার চেষ্টা করলাম। বসন্তের মাতাল হাওয়া এসে লুটিয়ে পড়ল আমার অবসন্ন দেহের ওপর।

মনে হলো কোনো দূর-দেবতার আশীর্বাদে এই ভরসন্ধ্যায় আমার পুনর্জন্ম সাধিত হয়েছে। মৃত্যুর ইটবিছানো দীর্ঘপথ পাড়ি দিয়ে আমি আমার জন্মগ্রামে ফিরে এসেছি, যেখানে আমার জন্ম, আমার আঁতুড় ঘরের ভেজা-মাটি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরিশিষ্ট

জিঞ্জিরা গণহত্যাকে আমি মার্কিন সেনাদের দ্বারা সংঘটিত ভিয়েতনামের মাই-লাই গণহত্যার সঙ্গে তুলনীয় বলেছি। অন্তর্জাল থেকে পাওয়া মাই-লাই গণহত্যার কিছু প্রাসঙ্গিক তথ্য *আত্মকথা* ১৯৭১-এর পরিশিষ্টে যুক্ত করা হলো।

My Lai Massacre

From Wikipedia, the free encyclopedia

Location	Son My village, Son Tinh District of South Vietnam
Date	March 16, 1968
Target	My Lai 4 and My Khe 4 hamlets
Attack type	Massacre
Deaths	347 according to the U.S Army (not including My Khe killings), others estimate more than 400 killed and injuries are unknown, Vietnamese government lists 504 killed in total from both My Lai and My Khe
Perpetrators	Task force from the United States Army America Division 2LT. William Calley (convicted and then released by President Nixon to serve house arrest for two years)

The **My Lai Massacre** was the Vietnam Warmass murder of

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

between 347 and 504 unarmed civilians in South Vietnam on March 16, 1968, by United States Army soldiers of "Charlie" Company of 1st Battalion, 20th Infantry Regiment, 11th Brigade of the Americal Division. Most of the victims were women, children, infants, and elderly people. Some of the women were gang-raped and their bodies were later found to be mutilated and many women were allegedly raped prior to the killings. While 26 U.S. soldiers were initially charged with criminal offenses for their actions at My Lai, only Second Lieutenant William Calley, a platoon leader in Charlie Company, was convicted. Found guilty of killing 22 villagers, he was originally given a life sentence, but only served three and a half years under house arrest.

The massacre took place in the hamlets of My Lai and My Khe of Son My village. In modern Vietnam, the event is called the **Son My Massacre**. The U.S. militarycodeword for the "Viet Cong stronghold" was "Pinkville".

The incident prompted global outrage when it became public knowledge in 1969. The massacre also increased domestic opposition to the U.S. involvement in the Vietnam War. Three U.S. servicemen who had tried to halt the massacre and protect the wounded were initially denounced by several U.S. Congressmen as traitors. They received hate mail and death threats and found mutilated animals on their doorsteps. The three were later widely praised and decorated by the Army for their heroic actions.

AMARBOI.COM

মাই-লাই গণহত্যাটি সংঘটিত হয় ১৯৬৮ সালের ১৬ মার্চ। ধারণা করি, মাত্র তিন বছর পনেরো দিনের মাথায়, জিঞ্জিরা গণহত্যার নীলনকশা প্রণয়ণের সময় মার্কিন সমর্থিত পাকিস্তান সেনাবাহিনী, তাদের মুরুব্বি মার্কিন সেনাবাহিনীর কাছ থেকে সরাসরি যদি নাওবা হয়, পরোক্ষ প্রেরণা অবশ্যই লাভ করেছিল। প্রশিক্ষণও কি? কে জানে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার বড় ভাই ভারতের নাগরিক। পশ্চিমবাংলার শিল্পনগরী দুর্গাপুরে তিনি চাকরি করেন। ১৯৭১ সালে আমরা তাঁর কাছেই গিয়ে উঠেছিলাম। ডিসেম্বরে দেশ স্বাধীন হয়ে যাবার পর জয়-বাংলার শরণার্থীরা সবাই যখন দল বেঁধে দেশে ফিরতে শুরু করে, তখন আমরাও দেশে ফিরে আসার জন্য মানসিকভাবে তৈরি হই। আমার বড় ভাই আমাদের দেশে ফিরে যাবার ব্যাপারটিকে আরও কিছুদিনের জন্য স্থগিত রাখার পরামর্শ দেন। তিনি বলেন, এখনই দেশে ফিরে যাওয়াটা ঠিক হবে না। কিছুদিন পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করা দরকার। আগে তো শেখ মুজিবর মুক্তি পাক। [আমি ১৯৬৯-এর ২৩ ফেব্রুয়ারি রমনা রেসকোর্সের জনসভায় উপস্থিত ছিলাম— যেদিন ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের পটভূমিতে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা থেকে সদ্য মুক্তি পাওয়া শেখ মুজিবকে পাঁচ লক্ষাধিক জনতার সামনে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছিল। তখন থেকেই আমি শেখ মুজিবকে বঙ্গবন্ধু বলতাম— কিন্তু আমার বাবা এবং আমার বড় ভাই বঙ্গবন্ধুকে সাধারণত মুজিবরই বলতেন। কখনও-কখনও বলতেন শেখ মুজিবর।] মুজিবর দেশে ফিরুক। দেশটি তো এখনও নেতাশূন্য। দেশের স্বাধীনতার বিরোধীরা তোদের ঐ তাজউদ্দীন আর নজরুল ইসলামকে বেশিদিন মানবে না। মুজিবরের না ফিরা পর্যন্ত বাংলাদেশের অবস্থা স্বাভাবিক হবে না। মারামারি হানাহানি লেগে থাকবে। বলা যায় না, অচিরেই আবার হয়তো জয় বাংলা ছেড়ে তোদের পালাতেও হতে পারে।

আমরা যদিও দেশে ফিরার জন্য খুবই ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলাম, দেশের জন্য আমাদের মন যদিও খুবই চঞ্চল হয়ে উঠেছিল, তথাপি আমার বড় ভাইয়ের অনুমোদন না পাওয়ার কারণেই আমাদের দেশে ফেরা বিলম্বিত হতে থাকে। নিজ পরিবার থেকে দীর্ঘদিন বিচ্ছিন্ন থাকার পর মুক্তিযুদ্ধের কারণে পারিবারিকভাবে মিলিত হতে পারার ব্যাপারটি আমার বড় ভাইয়ের মনে একটা নতুন আবেগের সৃষ্টি করেছিল। কোনো সন্দেহ নেই যে, দুর্গাপুরে আমাদের খাওয়া-থাকার ব্যবস্থা করতে গিয়ে তাঁকে বেশ কষ্ট করতে হচ্ছিল। তাই দ্রুত আমাদের শরণার্থীদশার অবসান হোক, এটি তিনি হয়তো আমাদের চাইতেও বেশি করেই চাইতেন। কিন্তু যখন সত্যি-সত্যি চোখের পলকে আমাদের দেশটি স্বাধীন হয়ে গেল এবং আমরা আমাদের সাতপুরুষের ভিটা-বাড়িতে ফিরে আসার জন্য অস্থির হয়ে উঠলাম তখন আমার বড় ভাইয়ের মনে হয়তো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমাদেরকে আরও কিছুদিনের জন্য নিজের কাছে ধরে রাখার গোপন ইচ্ছাও কাজ করে থাকবে। হয়তো সেজন্যই তিনি আমাদের সামনে ভবিষ্যতের বাংলাদেশের একটি ভয়াবহ চিত্র সবসময়ই তুলে ধরছিলেন। মুজিবর ফিরে আসার পরও সাম্প্রদায়িকতা থেকে দেশটি যে মুক্ত হতে পারবে, তা তিনি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। তিনি যদি আর না ফেরেন, তবে তো কথাই নেই।

কিন্তু নতুন বছরে, জানুয়ারির ১০ তারিখে পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তি লাভ করে লন্ডন-দিল্লী হয়ে বঙ্গবন্ধু যখন বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার মাটিতে পা রাখেন, তখনই আমার বড় ভাইয়ের অনুমোদনক্রমে আমাদের পরিবার বাংলাদেশে ফিরে আসার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

পাকিস্তানের কারাগার থেকে বঙ্গবন্ধু যদি মুক্তি না পেতেন; যদি তিনি স্বাধীন বাংলাদেশে ফিরতে না পারতেন, — আমরা কি তাহলে ভারতেই থেকে যেতাম? আমার কথা ঠিক বলতে পারি না, তবে মনে হয় আমার পরিবারটি হয়তো থেকেই যেত। অন্তত আমার বড় ভাই সে রকমটিই চাইতেন। দেশে ফেরার ব্যাপারে আমার বাবাও কিছুটা দ্বিধার মধ্যে ছিলেন। কবিতা লেখার কারণে, কবিতা লিখে দেশের মানুষের ভালোমন্দের সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে পড়ার কারণে ব্যক্তিগতভাবে দেশের প্রতি আমার মনে যতটা দুর্বলতার সৃষ্টি হয়েছিল; আমার পরিবারের অন্য সদস্যদের মধ্যে তা ছিল না। বঙ্গবন্ধু বেঁচে থাকাতে এবং স্বাধীনতা লাভের অল্পদিনের ব্যবধানে পাকিস্তানি কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে বাংলাদেশে ফিরে আসাতে, অন্যদের কথা জানি না, আমাদের পরিবারটি খুবই লাভবান হয়। ১৯৭১ সালে হিন্দুদের মধ্যে যারা শরণার্থী হয়েছিলেন, তাদের বেশ কিছু ভারতে থেকে যান। দশই জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু দেশে ফিরে না এলে আমাদেরও হয়তো ভারতেই স্থান হতো। ঢাকার টানে কিছুদিনের জন্য দেশে ফিরে এলেও পরিবারের আপনজনদের টানে আমাকেও হয়তো এক-পর্যায়ে ভারতেই চলে যেতে হতো। চলে যেতে যে হয়নি, তাকে আমি আমার সৌভাগ্য বলেই মানি।

বঙ্গবন্ধু দেশে ফেরার পর স্থির হয়, আমরা দুই পর্যায়ে ভারত ত্যাগ করব। আমি দেশে ফিরে এসে দেশের অবস্থা জানিয়ে দুর্গাপুরে চিঠি লিখব, তারপর আমার পরিবার দেশে ফেরার ব্যাপারটি চূড়ান্ত করবে। তার আগে নয়। ঐরূপ পারিবারিক সিদ্ধান্তের জটিলতার কারণেই আমার বহু প্রত্যাশিত মুক্তিযুদ্ধের বিজয় দেখার সৌভাগ্য আমার হয়নি। আমি বিজয় দেখিনি।

আমি যুদ্ধজয়ের একমাস পর, পরবর্তী বছরের জানুয়ারি মাসের মাঝামাঝি সময়ে ঢাকায় ফিরি। ঢাকা ফিরে এসে আমি উঠেছিলাম মগবাজারের মুক্তিযোদ্ধা হেলালের বাসায়। হেলালের সঙ্গে নাট্যকার মামুনুর রশীদের মাধ্যমে আমার পরিচয় ও বন্ধুত্ব হয়েছিল ১৯৬৭ সালের দিকে। আমরা মগবাজারের ক্যাফে তাজ-এ অনেকদিন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একসঙ্গে আড্ডা দিয়েছি। পরে একাত্তরে হেলাল মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেয় এবং কলকাতায় আবার কিছুদিন আমাদের একসঙ্গে থাকার সুযোগ হয়। দীর্ঘদিন পরবাসে কাটিয়ে আমার প্রিয় নগরীতে ফিরে এসে আমার নিরাপত্তার কথা ভেবে যখন আমি মনে মনে একজন বিশ্বস্ত বন্ধুর সন্ধান করছিলাম, তখন আমার কেন জানি হেলালের কথাই মনে পড়ল। হেলালের বাসায় দু'দিন থাকার পর আমি সার্জেন্ট জহুরুল হক হলে গিয়ে উঠি। সেখানে থাকার জন্য ছাত্রনেতা আসম আবদুর রব এবং হলের ভিপি জিনাত আলী আমাকে ঐ হলের একটি রুম ছেড়ে দিয়েছিলেন।

কয়েকদিন ঢাকায় কাটিয়ে আমি আমার গ্রামের বাড়িতে যাই। আমার গ্রামের এবং এলাকার মানুষ অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে আমাকে গ্রহণ করে। আমাদের ফেলে যাওয়া বাড়িঘরও মোটামুটি বাসযোগ্যরূপেই পাওয়া যায়। পাকসেনাদের আগমন সংবাদের প্রচারিত শংকার ভিতরে, স্থানীয় আত্মসম্মানবঞ্চিত লোভী-মুসলমানদের মধ্যে যারা আমাদের বাড়িঘর লুটপাট করেছিল, তারা এসে রাতের অন্ধকারে আমার সঙ্গে দেখা করে এবং কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। তারা খুবই কাতরকণ্ঠে জানায়, আমি যদি তাদের না রক্ষা করি তাহলে মুক্তিবাহিনীর ছেলেরা তাদের মেরে ফেলবে। এখন তো বটেই, যৌবনেও আমি খুবই নরম মনের মানুষ। আমি তাদের ক্ষমা করে দিই। ফলে ওদের সঙ্গে অচিরেই আমার সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে। আমি তখন 'বাংলাদেশ বাসযোগ্য' বলে দুর্গাপুরে রিপোর্ট পাঠাই। আমার কাছ থেকে ইতিবাচক রিপোর্ট পেয়ে আমার পরিবারের অন্য সদস্যরাও শরণার্থীজীবনের ইতি ঘটিয়ে, দেশে ফিরে এসে নতুন করে বসতি স্থাপন করে।

বঙ্গবন্ধুর অনুরোধে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বঙ্গবন্ধুর জন্মদিনে ভারতীয় সেনাবাহিনীকে বাংলার মাটি থেকে অভাবিত দ্রুততার সঙ্গে প্রত্যাহার করতে রাজি হলে, আমার বাবা একটু ভড়কে যান। শুধু বঙ্গবন্ধু বা আওয়ামী লীগই তো বিবেচ্য নয়; মুসলিম লীগার, আলবদর-রাজাকার এবং অতিবিপ্লবী চৈনিক-পরিবৃত বাংলাদেশের মাটিতে ভারতীয় সেনাবাহিনীর উপস্থিতির বিষয়টিও আমাদের দেশে ফিরে আসার সিদ্ধান্তটিকে প্রভাবিত করেছিল। অবিশ্বাস্য দ্রুততায় বাংলার মাটি থেকে ভারতীয় সৈন্য সরিয়ে নেবার সংবাদে আমার বাবা তাই কিছুটা চিন্তিত হয়ে পড়েন। ভারতীয় সেনাদের সহায়তা ছাড়া আওয়ামী লীগ ও তার মিত্ররা দেশকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারবে বলে আমার বাবা বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। তিনি মনে করতেন, ভারতীয় সেনাবাহিনীকে আরও কিছুদিন বাংলাদেশে রাখা দরকার। আমি ঢাকা স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ভারতীয় সৈন্যদের বিদায়ী-অনুষ্ঠানটি দেখেছিলাম এবং ভিড় ঠেলে ইস্টার্ন কমান্ডের জিওসি লে. জেনারেল জগজিৎ সিং অরোরার সঙ্গে করমর্দন করেছিলাম। ভারতীয় সেনাবাহিনীর একজন সদস্যকে কৃতজ্ঞতা ও সম্মান জানানোর বাসনা আমার মাধ্যমে পূর্ণ হওয়ার সংবাদে আমার বাবা খুব খুশি হয়েছিলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার এক পিসতুতো ভাই পি. সি. সোম ছিলেন ভারতীয় বিমানবাহিনীর পাইলট। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে মিত্রবাহিনীর হয়ে গভর্নর হাউস এবং ঢাকা সেনানিবাসে পরিচালিত বিমান হামলায় তিনি অংশ নিয়েছিলেন। ভারতীয় সেনাবাহিনীতে আমার আরও একজন কাকা ছিলেন। আমার বাবার আপন মামাত ভাই। তাঁর নাম কর্নেল বি. সি. দত্ত। ১৯৭১ সালে শিলিগুড়ি ক্যান্টনমেন্টে তিনি কর্মরত ছিলেন। তিনিও মিত্রবাহিনীর হয়ে আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশ নেন। আমি নিজে অস্ত্র হাতে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিইনি, আমার সেরকম সাহস ছিল না; কিন্তু আমার ঐ দু'জন নিকট-আত্মীয় বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন বলে আমি মনে মনে কিছুটা স্বস্তিবোধ করতাম। ভাবতাম, আমার বাবা ও তাঁর পরিবারের অনিচ্ছার মধ্যে যেমন পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রটির জন্ম হয়েছিল, — বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রটি আমাদের কাছে সে রকম নয়; এই দেশটি, আমার ও আমার পরিবারের সদস্যদের প্রবল ইচ্ছার মধ্যে; ত্যাগ, কষ্ট ও স্বপ্নের মধ্যে জন্ম নিয়েছে। খুব সরাসরি না হলেও, ভারতের মাধ্যমে আমার নিকটজনরাও এসে ঘটনাচক্রে যুক্ত হয়েছেন এই দেশ-জন্মের প্রক্রিয়ায়। সুতরাং এই দেশটির ওপর আমার অধিকার প্রশ্নাতীতভাবেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অতঃপর এই দেশে আমার থাকা না-থাকার ব্যাপারটি বাংলাদেশে ভারতীয় সেনাবাহিনীর উপস্থিতি বা বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের রাষ্ট্রক্ষমতায় থাকা না-থাকার ওপর নির্ভর করে না। পৃথিবীর মানচিত্রে এই দেশটি যদি টিকে থাকে, তার শাসক যারাই হোক না কেন, আমি তাতে থাকব। এ আমার অধিকার। শ্রী অন্নদাশংকরের ভাষায় বলা যায়— 'যতদিন রবে পদ্মা মেঘনা গৌরী যমুনা বহমান...' ততদিন। বাংলাদেশের সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতাকে অন্যতম-রাষ্ট্রনীতি হিসেবে ঘোষণা করে এই ভূখণ্ডে বসবাসকারী (তা বাঙালি বা বাংলাদেশী যাই বলি না কেন) জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঐ ন্যায়নিষ্ঠ বাস্তবতাকে স্বীকার করে নিয়েছিলেন।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুর নিহত হওয়ার পর, আমার মধ্যে যে তীব্র ভীতি, প্রচণ্ড ঘৃণাবোধ ও উৎকণ্ঠামিশ্রিত আবেগের সৃষ্টি হয়েছিল; —তার অন্তরালের মনস্তাত্ত্বিক পটভূমি উপরে কিছুটা বর্ণিত হলো। বঙ্গবন্ধুহীন বাংলাদেশে আমার মনে পড়ে যায় আমার বড় ভাইয়ের কথা। আমি ভাবতে বসি, তবে কি আবার আমাকে ভারতে চলে যেতে হবে? দেশটা কি আবার পাকিস্তানে পরিণত হবে? ১৫ আগস্টের হত্যাকাণ্ডের ভিতরে ফুটে ওঠা অভাবিত নির্মমতার দিকটির কথা ভেবে আমি খুবই বিচলিত ও অসহায় বোধ করি। আমার মনে প্রশ্ন জাগে, হত্যাকারীদের মনে ঘৃণার এই যে জোর— তারা কোথা থেকে তা পেল? প্রতিহিংসাপরায়ণতার এই যে উচ্চমাত্রা— তা কি কেবলই মুহূর্তের মতিভ্রম? আমার বিশ্বাস হয় না। বিপুলসংখ্যক মুসলমানের বাসভূমি হলেও, একশ্রেণীর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুসলমানের কাছে চিরশত্রুরূপে গণ্য হিন্দুস্থানের সহায়তায় ইসলামিক রিপাবলিক অব পাকিস্তানকে ভেঙে ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশ গঠন করার অপরাধই ছিল ঐরূপ দুর্মর ঘৃণার জাতক বলে আমার মনে হয়।

মনে পড়ে, আমার ঐ সময়ের অসহায়ত্ববোধের সঙ্গে এক ধরনের অপরাধবোধও এসে যুক্ত হয়েছিল। ঐ অপরাধবোধটা ছিল, কবি আল মাহমুদের সম্পাদনায় প্রকাশিত গণকণ্ঠ পত্রিকায় কিছুদিন কাজ করার কারণে। আমি সরল বিশ্বাসে আমার প্রতিষ্ঠানবিরোধী চরিত্রের কারণে যে কাগজটিতে যোগ দিয়েছিলাম— পরবর্তীকালে ঐ কাগজটি জাসদের মুখপত্রে পরিণত হয়। বঙ্গবন্ধু ও তাঁর সরকারকে জনবিচ্ছিন্ন করার ক্ষেত্রে ঐ পত্রিকাটি যে ভূমিকা রেখেছিল, আমিও সেখানে দাবার ঘুঁটি হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছিলাম। সে কথা ভেবে আমার অনুশোচনা হয়। আমি নিজেকে অপরাধী বলে ভাবতে থাকি। বিশ্বাসঘাতক এই নগরীটিকে আর আমার বাসযোগ্য বলে মনে হয় না। আমি স্থির করি, এই নগরীতে আর নয়। আমি অনির্দিষ্টকালের জন্য আমার গ্রামের বাড়িতে ফিরে যাই।

কিছুদিনের মধ্যেই বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী ভারতে পালিয়ে গিয়ে কাদের বাহিনী গঠন করেন। গ্রামে যাবার কিছুদিনের মধ্যেই কাদের বাহিনী গঠনের সংবাদ আমার কানে আসে। আমাদের এলাকার বিশেষ করে হিন্দু-ছেলেরা বিপুল সংখ্যায় ঐ কাদের বাহিনীতে যোগ দিতে থাকে। রক্ষীবাহিনীর এক লিডার কমলাকান্দার সুকুমার সরকারও কাদের বাহিনীতে যোগ দেয়। মেঘালয় সীমান্ত দিয়ে দুর্গাপুর, কমলাকান্দা, বারহাট্টা এবং মোহনগঞ্জে এসে কাদের বাহিনীর সদস্যরা থানা ও হাট-বাজারে হামলা চালাতে শুরু করে। কিন্তু ঐসব হামলার জোর এবং ভবিষ্যৎ ছিল খুবই অনিশ্চিত। কেননা ঐরূপ কাজে সিদ্ধি লাভ করার জন্য ১. যেরকম বিপুল সংখ্যায় দেশত্যাগের দরকার ছিল এবং ২. সাহায্যকারী দেশটির যেরূপ রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত থাকা প্রয়োজন ছিল— ভারতের তৎকালীন সরকারের তা ছিল না। ফলে ঐসব সম্ভাবনাহীন আক্রমণ দারোগা-পুলিশ অপহরণ এবং থানার অস্ত্র লুট করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। মাঝখান থেকে যাদের বাড়িঘরে আশ্রয় নিয়ে ঐসব হামলা চালানো হচ্ছিল, কাদের বাহিনীর সদস্যদের চলে যাবার পর তারা খুবই বিপদের মধ্যে পড়ে যায়। আমার এক মামা, আওয়ামী লীগের স্থানীয় নেতা ডাক্তার মতিলাল চৌধুরী (মোহনগঞ্জ থানার খলাপাড়া গ্রামে) কাদের বাহিনীর সদস্যদের আশ্রয়দানের অপরাধে পুলিশের হাতে ধরা পড়েন এবং তাঁর পরিবারটি পুলিশি নির্যাতনের শিকারে পরিণত হয়। পরে মামলায় আমার মামা মতিলাল চৌধুরী এবং উনার এক ভাতিজা তুষারকে প্রায় বছর দশেক জেল খাটতে হয়েছিল।

মানসিক ভারসাম্য হারানো অবস্থায় আমি ঢাকা ত্যাগ করে গ্রামে ফিরে গিয়েছিলাম, গ্রামের নির্জনতা ও রাজনীতি থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে শান্তি ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্বস্তি ফিরে পাবার আশায়। কাদের বাহিনীর থানা আক্রমণ ও আক্রমণের সঙ্গে আমার মামার জড়িত থাকার অভিযোগে পুলিশের হাতে গ্রেফতার হওয়ার সংবাদ শুনে আমি কিছুটা উন্মাদের মতোই আমার পরিবারের সঙ্গে গ্রামের বাড়িতে দিনাতিপাত করতে থাকি। ইতোমধ্যে ঢাকা থেকে আমার তরুণ কবি-বন্ধু গোলাম সাবদার সিদ্দিকী হঠাৎ একদিন আমার গ্রামে হাজির হয়। ওর আগমনে আমার মানসিক শান্তি বিঘ্নিত হয়। ওর অতিবিপ্লবী নকশালমার্কা কথাবার্তা আমার খুবই অপছন্দ ছিল। ফলে তাকে আমি বেশিদিন আমার বাড়িতে থাকতে দিই না।

আমি গ্রামে ফিরে গিয়েই শুনতে পেয়েছিলাম, আমাদের গ্রামের মুসলেমউদ্দিন নামে একজন সরকারি কর্মচারী, মেজর ডালিমের কণ্ঠে বঙ্গবন্ধু-হত্যার সংবাদটি রেডিওতে প্রচারিত হতে শুনে আনন্দে এমনই উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলেন যে, তিনি আর নিজেকে ধরে রাখতে পারেননি। ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের বড় সড়ক ধরে তিনি খালি গায়ে, মাথায় গামছা বেঁধে দৌড়াতে শুরু করেন এবং চিৎকার করে বলতে থাকেন— "ভাইসব আর চিন্তা নাই 'হিন্দুর বাপ' শেখ মুজিবর শেষ। আপনেরা সব বাইরইয়া আসেন।" ঐ চিত্রকল্পটি কল্পনায় অনুভব করে আমার হাসিও পায় আবার রাগে দুঃখে, অক্ষম-যাতনায় মনে কষ্টও পাই। (এখানে মুসলেমউদ্দিন নামটি খুবই লক্ষণীয়। এমন মিল কী করে যে হলো!)

মুসলেমউদ্দিনের 'হিন্দুর বাপ' কথাটা আমার খুবই মনে লাগে। আমি ভাবি, শেখ মুজিব কি ছিলেন শুধুই হিন্দুদের বাবা? মুসলমানদের কেউ নন তিনি? অথচ হিন্দুদের জন্য সত্যিকার অর্থে তেমন কিছুই তো তিনি করে যাননি। তিনি না একাত্তরে, পাকবাহিনীর ভেঙে ফেলা রমনা কালীমন্দিরটি পুনঃনির্মাণ করেছেন, না তিনি ১৯৬৫-র পাক-ভারত যুদ্ধের পটভূমিতে ঘোষিত শত্রুসম্পত্তি আইনটি রদ করেছেন। না তিনি বৈষম্যমূলক সরকারি নীতির কারণে, চাকরি-বাকরির ক্ষেত্রে পিছিয়ে-পড়া হিন্দুদের বিশেষ কোনো সুবিধা দিয়ে মুসলমানদের পাশাপাশি এগিয়ে যেতে সাহায্য করেছেন। তাহলে? শেখ মুজিব 'হিন্দুদের বাপ' হবেন কেন? কথাটা তো মোটেও সত্য নয়। তবুও তো বলা হলো। কেন বলা হলো? আমি ভাবতে বসি।

যদিও এইরকমের একটি অসৎ-প্রশ্নের কোনো সদুত্তর হয় না, তবু অনুমান করতে পারি সম্ভাব্য কারণ। তিনি কারও কারও কাছে হিন্দুদের বাপ বলে প্রতিভাত হয়েছেন :

১. হিন্দুস্তানের সহায়তায় পাকিস্তান ভাঙার জন্য।
২. বাঙালি জাতীয়তাবাদের জন্য।
৩. রবীন্দ্রনাথের প্রতি প্রীতির কারণে।
৪. ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ গ্রহণের জন্য।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুসলেমউদ্দিনের মাথায় গামছা-বাঁধা দৌড়ের ঘটনাটি শোনার পর আমার কৃতজ্ঞ কবিচিত্ত এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, শেখ মুজিবকে নিয়ে আমি কবিতা লিখব। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে হলেও তাঁর কথা আমি প্রচার করব। সংখ্যালঘুর সমানাধিকারকে নিশ্চিত করার জন্য যিনি জীবনদান করে গেছেন, একজন সংখ্যালঘুর সন্তান হিসেবেই এ আমার পবিত্র কর্তব্য। তাঁর হত্যাকাণ্ডের অব্যবহিত পরে কয়েকটি প্রতীকী কবিতা আমি রচনা করেছিলাম। সিদ্ধান্ত নিলাম আর প্রতীকী কবিতা নয়, এবার সরাসরিই লিখব।

অক্টোবরের মাঝামাঝি সময়ে, হঠাৎ একদিন ঢাকা থেকে একই খামে পাঠানো আমার দুই কবিবন্ধু আবুল হাসান ও মহাদেব সাহার দুটি চমৎকার চিঠি পাই। তাদের সমবেদনাসিক্ত চিঠি দুটো পড়ে, বিশেষ করে আবুল হাসানের চিঠিটি পড়ে আমি ঢাকার প্রতি আমার অভিমান অনেকটাই ভুলে যেতে সক্ষম হই। আবার ঢাকা আমাকে ডাকে, আয় ফিরে আয়। তখনো আমি শারীরিকভাবে পুরোপুরি সুস্থ ছিলাম না। তাই আমার বাবা-মা আমাকে ঢাকায় যেতে বারণ করেন। আমার মা-বাবার ইচ্ছার বিরুদ্ধেই আমি নভেম্বরের শুরুতে ঢাকায় ফিরে আসি।

একাত্তরের নয় মাস বাদ দিলে, এর আগে এত দীর্ঘদিন আমি আমার প্রিয় নগরী ছেড়ে বাইরে কখনো থাকিনি। প্রায় আড়াই মাস পর, বঙ্গবন্ধুহীন এই নগরীতে ফিরে এসে আমি আর আমার নিউপল্টনের অরক্ষিত বাঁশের-বেড়ার মেসটিতে ফিরে যাইনি। আমি আমার বন্ধু মহাদেব সাহার ১১২ আজিমপুরের বাসায় উঠি। দীর্ঘদিন পর আমাদের দেখা হয়। আমরা দু'জন মিলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কথা বলি। আমরা হিসাব মিলাতে চাই। কেন এই হত্যাকাণ্ড? কেন এই নৃশংসতা? এখন কোথায় যাবে বাংলাদেশ? সংখ্যালঘুরা বঙ্গবন্ধুহীন এই নতুন বাংলাদেশে থাকতে পারবে কি? ধর্মনিরপেক্ষতার পথ কি অনুসৃত হবে আর? নাকি একটি মিনি পাকিস্তানে ('মুসলিম বাংলা' কথাটা তখন চালু হয়েছিল) পরিণত হবে এই দেশ? ভারত কী করবে? সোভিয়েত ইউনিয়ন কি পারবে আমেরিকার ষড়যন্ত্রকে রুখতে? দীর্ঘদিন পর আমরা প্রাণ খুলে কথা বলার সুযোগ পেয়েছি। আমাদের কথা ফুরাতে চায় না। রাজ্যের রাজনীতি এসে ভিড় করে আমাদের মাথায়। আলাপে-উদ্বেগে রাত ভোর হয়ে আসে। বাইরে খুব কমই বেরোই আমরা। মহাদেবের বাসায় অনেকটাই গৃহবন্দির মতো আমি থাকি। আমি যে ঢাকায় ফিরে এসেছি, তা খুব একটা মানুষকে জানাতে চাই না। পরদিন আবুল হাসানের সন্ধানে ওর শান্তিনগরের বাসায় যাব, ঐরূপ স্থির করে অনেক রাত পর্যন্ত গল্প করে আমরা ঘুমিয়েছিলাম।

ভোরের দিকে কয়েকটি রাশান মিগ-২১ বিমান ঢাকার আকাশ কাঁপিয়ে উত্তর থেকে দক্ষিণের দিকে উড়ে যায়। সঙ্গে হেলিকপ্টার। শব্দে আমাদের ঘুম ভেঙে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যায়। আমরা চমকে উঠি। অনেকদিন পর ঢাকার আকাশে, এ কিসের গর্জন? কার গর্জন? বঙ্গবন্ধুর নয়তো!

মারাত্মক একটা কিছু ঘটেছে— এমন আশংকায় দ্রুত রেডিও নিয়ে আমরা সংবাদ শুনতে বসি। কিন্তু না, রেডিও চলছে না। একেবারে বন্ধ। কোনো সাড়া শব্দই নেই। তবে? ভালো করে সকাল হবার আগেই পাড়ার মধ্যে একটা সাড়া পড়ে যায়। সবারই প্রশ্ন, রেডিও বাংলাদেশ ঢাকা বন্ধ কেন?

আকাশবাণী বা বিবিসিও আমাদের কোনো খবর দিতে পারে না। আমরা খবর জানতে দুপুরের দিকে প্রেসক্লাবে যাই। ওখানে গিয়ে খবর পাই, ভোরের দিকে সামরিক বাহিনীতে একটি অভ্যুত্থান হয়েছে। ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ এই অভ্যুত্থানটি করেছেন। সকালের দিকে ঢাকার আকাশে যে বিমান ও হেলিকপ্টারগুলো উড়েছিল সেগুলো উড়েছিল ঐ অভ্যুত্থানেরই পক্ষে। বিমান ও হেলিকপ্টারগুলোকে নাকি সোরওয়ার্দী উদ্যান এবং বঙ্গভবনের ওপর দিয়ে উড়ে যেতে দেখা গেছে। সোরওয়ার্দী উদ্যানে তখন ১৫ আগস্টের মোশতাক বর্ণিত সূর্য-সন্তানদের ট্যাংক ও অ্যাটিলারি বাহিনীর ঘাঁটি ছিল। ফলে, অভ্যুত্থানটি যে ঐসব তথাকথিত সূর্যসন্তানদের বিরুদ্ধেই ঘটেছে— তা অবশ্য সহজেই বোঝা গেল। অভ্যুত্থানের খবর শুনে আমি ও মহাদেব খুব খুশি হই।

দেশে এত বড় একটা ঘটনা ঘটে গেল— অথচ কোথাও কোনো প্রতিবাদ নেই—, এই অসহনীয় অবস্থাটির অবসান ঘটাতে আমাদের আনন্দের শেষ নেই। আমরা সতর্কতার সঙ্গে আমাদের মনের খুশি-ভাবটাকে লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করি। আমরা হচ্ছি ঘর পোড়া গরু। আকাশে সিঁদুরে মেঘ দেখলে ভয় পাই। বলা তো যায় না, যদি অভ্যুত্থানটি ব্যর্থ হয়ে যায়। আমি আর মহাদেব দ্রুত বাসায় ফিরে আসি এবং আকাশবাণী, বিবিসি ও ভয়েস অব আমেরিকার সংবাদ শোনার জন্য রেডিও নিয়ে বসি। ঢাকা বেতার তখনো বন্ধ, তবে টিভি চালু ছিল। টিভিতে এমনকিছু সংবাদ পাওয়া যাচ্ছিল না, যা থেকে সামরিক বাহিনীর মধ্যে যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব শুরু হয়েছে, সে-সম্পর্কে কোনো সঠিক ধারণা লাভ করা যায়।

বিবিসির রাতের খবরে আমরা জানতে পারি যে, ৩ নভেম্বরের ভোরের দিকে, ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দি চার জাতীয় নেতা– সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, এম মনসুর আলী এবং এ এইচ এম কামরুজ্জামান নিহত হয়েছেন। সকল প্রকারের কারাবিধান লঙ্ঘন করে সামরিক বাহিনীর কিছু লোক জেলের ভিতরে প্রবেশ করে চার বন্দি জাতীয় নেতাকে গুলি করে, বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে-খুঁচিয়ে হত্যা করেছে। শুনে বেদনা ও ঘৃণায় আমরা স্তব্ধ হয়ে যাই। আমাদের চোখ থেকে ঘুম উধাও হয়ে যায়। আমরা খুব ভয় পেয়ে যাই। এও কি সম্ভব? এ রকম একটি বর্বর হত্যাকাণ্ডের কথা তো আমরা ভাবতেও পারি না। পরে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৫ আগস্টের নৃশংসতার দিকটির কথা স্মরণ করে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসি, অতঃপর ঐ রকমের কাজ এদেশের মাটিতে খুবই সম্ভব। রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমরা আমাদের জীবনের চারপাশে আততায়ীদের পদশব্দ অনুভব করতে থাকি।

পরদিন আমরা দু'জন ভয়ে ভয়ে বাসা থেকে বেরোই। আমরা যাব নিউমার্কেট হয়ে প্রেসক্লাবে। মহাদেবকে তাঁর ছেলের জন্য দুধ সংগ্রহ করতে হবে। তখন গুঁড়ো দুধের খুবই আকাল চলছিল। নীলক্ষেতের কাছে যেতেই দেখি একটি মিছিল আসছে। মিছিল? আমরা চমকে উঠি। ১৫ আগস্টের পর এটিই ঢাকার প্রথম মিছিল। নীরব মিছিলটি যাচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে। মিছিলে লোকজন খুব বেশি একটা নেই। শ'দুয়েক হবে। ঐ মিছিলে ছিলেন আমাদের পরিচিত অনেকেই। আমাদের পরিচিত বন্ধুদের মিছিলে দেখে আমরাও ঐ মিছিলে ভিড়ে যাই। শুনতে পাই এই মিছিলের অগ্রভাগে আছেন ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফের বৃদ্ধা মাতা এবং ভাই আওয়ামী লীগ নেতা রাশেদ মোশাররফ। শুনে খুব ভালো লাগে।

ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দি চার জাতীয় নেতার হত্যা না ১৫ আগস্টের মোশতাক বর্ণিত সূর্যসন্তানদের বিরুদ্ধে ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফের অভ্যুত্থান— কোনটি আগে ঘটেছে, তা কেউই সঠিক করে বলতে পারল না। জানলাম মিছিলটি বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে ফুল দিয়ে এসেছে। এটি একটি মস্ত বড় ঘটনা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা এই মিছিলের আয়োজন করেছে। বাংলাদেশ ছাত্রলীগ এবং বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের সমন্বয়ে গঠিত সংগ্রামী ছাত্রসমাজ বঙ্গবন্ধু স্মৃতি দিবস পালনের জন্য ঐ মিছিলের আয়োজন করেছিল। ঐ মিছিলে ছিলেন সংসদ সদস্য মহিউদ্দিন আহমদ, সংসদ সদস্য শামসুদ্দিন মোল্লা, সংসদ সদস্য রাশেদ মোশাররফ, মরহুম খন্দকার মুহম্মদ ইলিয়াস, জনাব মোস্তফা মহসীন মন্টু, বেগম মতিয়া চৌধুরী, জনাব সাইফুদ্দিন আহমদ মানিক, জনাব মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম, জনাব ইসমত কাদির গামা, খালেদ মোশাররফের বৃদ্ধা মাতা প্রমুখ।

সংগ্রামী ছাত্রসমাজের উদ্যোগে ঐদিন বিকেল ৪টায় কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে একটি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশ শেষে নগরীতে একটি সংক্ষিপ্ত মিছিলও বের হয়।

৩ নভেম্বরে খালেদ মোশাররফের নেতৃত্বে সামরিক অভ্যুত্থানটি না ঘটলে, মিছিলসহকারে বঙ্গবন্ধুর বাড়িতে শ্রদ্ধা জানাতে যাওয়া কি সম্ভব হতো? মনে হয় না। দীর্ঘ বিরতির পর বঙ্গবন্ধুর প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর সুযোগ লাভ করার জন্য আমরা খুবই খুশি হই এবং খালেদ মোশাররফের প্রতি কৃতজ্ঞতা বোধ করি। আরও একটি কারণে আমি খালেদ মোশররফের প্রতি দুর্বল বোধ করি, তা হলো, তাঁর সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত পরিচয়। ১৯৭৪ সালে কোনো একদিন সকালে নিউমার্কেটের নওরোজ কিতাবিস্তানে তাঁর সঙ্গে আমাকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন সচিত্র সন্ধানী পত্রিকার সম্পাদক জনাব গাজী সাহাবুদ্দিন সাহেব।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঐদিন খালেদ মোশাররফ বইয়ের দোকানে কিছু বই খুঁজছিলেন। খুব বেশি কথা হয়নি—সামান্য পরিচয়ের ঘটনাটিই আমার মনে দাগ কেটেছিল। আমার ভালোই লেগেছিল তাঁকে। আমি জানতে চাইছিলাম তিনি কী ধরনের বই খুঁজছেন। কবিতা, গল্প কি না? আমার কৌতূহলী প্রশ্নের উত্তরে মুচকি হেসে খালেদ বলেছিলেন, না ভাই, আমি মিলিটারি স্ট্র্যাটেজির ওপর বই খুঁজছি। তবে আমি কবিতাও পড়ি।

১৯৭১ সালে কলকাতায় ইন্ডিয়া টু ডে পত্রিকার সম্পাদক প্রীতিশ নন্দীর মুখে তাঁর প্রশংসা শুনেছিলাম। প্রীতিশ খালেদের একটি বড় ইন্টারভিউ করেছিলেন। আমি সে কথা স্মরণ করলাম। খালেদ খুশি হয়ে হাসলেন। বললেন, প্রীতিশ? হ্যাঁ, খুব মনে আছে।

মিছিলের পেছনে হাঁটতে-হাঁটতে আমার ঐ দিনের কথা মনে পড়ল। সেদিন তিনি আমাদের লোক কি-না, তা ভাববার প্রয়োজন বোধ করিনি। আজ ঐটি জানাই সবচেয়ে বড় জানার বিষয় হয়ে দেখা দিলো। মনে হলো, খালেদ আমাদেরই লোক হবেন। যার মা আমাদের, যার ভাই আমাদের, তিনি আমাদের না হয়ে যান না। আমি মনে মনে খালেদ মোশাররফের সাফল্য কামনা করতে থাকি।

সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল জিয়ার খবর কি—তা তখনও জানতে পারি না। তিনি কোথায় আছেন, তিনি কী ভাবছেন—তা কেউ-ই বলতে পারে না। খালেদ কি তাঁর বিরুদ্ধে এই অভ্যুত্থান করেছেন? নাকি বঙ্গবন্ধুর খুনীদের বিরুদ্ধে? জিয়া কি বঙ্গবন্ধুর খুনীদের পক্ষে আছেন না বিপক্ষে? অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সংবাদগুলো না জানতে পারা এবং কিছুই স্পষ্ট করে না বুঝতে পারার প্রচণ্ড উত্তেজনা বুকে নিয়ে আমি অপেক্ষা করতে থাকি রাতে বিবিসির সংবাদভাষ্য শোনার জন্য। তখনও আমি ভাবতে ভালোবাসি, যাঁর কণ্ঠে ১৯৭১ সালের ২৭ মার্চের দুপুরে আমি বঙ্গবন্ধুর নামে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা ইথারে তরঙ্গিত হতে শুনেছিলাম—মুক্তিযুদ্ধের সেই বীর, সেই মুজিবভক্ত জেনারেল জিয়াউর রহমানও এই অভ্যুত্থানে নিশ্চয় খালেদের পক্ষেই আছেন। হয়তো খালেদকে সামনে দিয়ে তিনি পেছনে অবস্থান গ্রহণ করেছেন কোনো কৌশলগত কারণে। ২৫ মার্চের গভীর রাতে পাক-সেনাদের হাতে বঙ্গবন্ধুর গ্রেফতার হওয়ার পর চট্টগ্রামস্থ স্বাধীন বাংলা বেতার থেকে বঙ্গবন্ধু কর্তৃক প্রচারিত স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠ করে ১৯৭১-এর ২৭ মার্চে তিনি যে ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করেছিলেন, আজ তাঁর সামনে আবার সে রকম একটি মুহূর্ত এসে উপস্থিত হয়েছে। তিনি কি এই দায়িত্ব এড়াতে পারেন?

আমেরিকার নির্বাচন শেষ হয়েছে। আজ সকাল সকাল (৬ নভেম্বর) বাংলাবাজার পত্রিকা অফিসে আসার আগে পুনঃনির্বাচিত মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট আল গোর-এর বিজয় ভাষণ সিএনএন-এর চ্যানেলে শুনে এসেছি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২ নভেম্বর তারিখে বাংলাবাজারের উপসম্পাদকীয় পাতায় ১৯৭৫ সালের রক্তঝরা নভেম্বরের স্মৃতিচারণমূলক যে লেখাটি শুরু করেছিলাম, আজ তার পরবর্তী কিস্তি লেখার কথা। প্রশ্ন উঠতে পারে, আজকের লেখার সঙ্গে আমেরিকার নির্বাচনের কোনো প্রাসঙ্গিক সম্পর্ক আছে কি? হ্যাঁ, আছে। খুবই সম্পর্ক আছে। ১৯৭৫ সালে আমেরিকার রাষ্ট্রক্ষমতা ছিল রিপাবলিকান দলের হাতে। আমেরিকার রিপাবলিকানরা আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানের পক্ষে অবস্থান নিয়েছিল। আমাদের পক্ষে ছিল ভারত-রাশিয়াসহ পূর্ব-ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক শিবির। আমেরিকার সশস্ত্র বিরোধিতার পরও আমরা যখন আমাদের বহু প্রত্যাশিত স্বাধীনতা লাভ করি, তখন আমেরিকা তা ভালোভাবে নিতে পারেনি। তাদের মধ্যে এক ধরনের পরাভব বোধ কাজ করছিল। তদুপরি বঙ্গবন্ধু যখন দেশ চালাতে গিয়ে রাশিয়া-কিউবা (আমেরিকার নিষেধ সত্ত্বেও কিউবায় চটের থলে রফতানি করা) ঘেঁষা নীতি গ্রহণ করেন, তখন বঙ্গবন্ধু ও তাঁর সরকারকে উৎখাত করে বাংলাদেশকে একটি মিনি-পাকিস্তানে পরিণত করার ব্যাপারে আমেরিকার কম করেও নীরব সমর্থন তো ছিলই। এমন কথাই তখন আমরা শুনেছিলাম।

২১ বছর পর, বঙ্গবন্ধুর দল আওয়ামী লীগ যে আজ আবার বাংলাদেশের ক্ষমতায় ফিরে এসেছে, আসতে পেরেছে, তার পেছনে শুধু দেশের ভিতরের জনসমর্থনই নয়, বর্তমানে বিরাজিত আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটটিও বিবেচ্য। সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নের ভেঙে যাওয়া এবং আমেরিকার রাষ্ট্রক্ষমতায় রিপাবলিকানদের স্থলে ডেমোক্র্যাটদের আসীন হওয়ার ব্যাপারটিও আওয়ামী লীগের রাষ্ট্রক্ষমতায় ফিরে আসতে পারার পথ প্রশস্ত করেছে। সোভিয়েত ইউনিয়ন পরাশক্তিধর দেশ হিসেবে সত্তরের দশকে আমাদের দেশটিকে স্বাধীন হতে সাহায্য করেছিল। নব্বইয়ের দশকে এসে সেই সোভিয়েত ইউনিয়ন নিজেকে ভেঙে, দুর্বল করে আমাদের রাষ্ট্রক্ষমতা ফিরে পেতে ভিন্নভাবে সাহায্য করল। সোভিয়েত ইউনিয়ন যদি টিকে থাকত, তাহলে আমেরিকায় রিপাবলিকানরাও টিকে থাকত, আর তখন আওয়ামী লীগের পক্ষেও ক্ষমতায় যাওয়া হয়তো সম্ভবই হতো না। আমেরিকার উস্কানিতে দেশে আরও একটি সামরিক অভ্যুত্থান ঘটে যেত।

'৯৪-৯৫ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিতে গড়ে ওঠা জনপ্রিয় অসহযোগ আন্দোলনের সময় বেগম খালেদা জিয়ার অনুরোধ সত্ত্বেও জেনারেল নাসিম যে ক্ষমতা দখল করেননি— তার পেছনেও রয়েছে ঐ পরিবর্তিত বিশ্ব রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট। আজ ক্ষমতায় গিয়ে বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনা যে ১৫ আগস্ট ও ৩ নভেম্বরের জেলহত্যার বিচারকার্য প্রক্রিয়াটি নির্ভয়ে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারছেন— তার পেছনেও আছে আমেরিকা। আছেন ক্লিনটন। মানে ঐ ডেমোক্র্যাটিক পার্টি। বাংলাদেশ সরকার সতর্কতা অবলম্বন করার প্রয়োজনে কোনো স্পর্শকাতর বিদেশি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাষ্ট্রকে ১৫ আগস্ট বা ৩ নভেম্বরের ঘটনার সঙ্গে জড়িত না করার জন্য গোয়েন্দা সংস্থাগুলোকে পরামর্শ দিয়েছেন। সতর্কতা অবলম্বন করা নিশ্চয়ই ভালো। তবে, সত্য উদঘাটনের স্বার্থে ১৯৭৫-এর ঘটনার পেছনে আমেরিকার উস্কানি ছিল,—এমন তথ্য যদি উদঘাটিত হয়েও পড়ে, তাতেও খুব একটা অসুবিধা হবে বলে আমার মনে হয় না। দ্বিতীয়বারের মতো নির্বাচিত মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন তো আমেরিকার ভিয়েতনাম-নীতির সমালোচনা করেই নবীন আমেরিকার জনচিত্ত জয় করেছিলেন। বিল ক্লিনটন মার্কিন জনগণকে বুঝাতে পেরেছেন যে, রিপাবলিকানদের দায় বহন করাটা ডেমোক্র্যাটদের জন্য বাধ্যতামূলক কিছু নয়। তাতেই বরং আমেরিকার লাভ। তাতে এক দলের ভুল করার সুযোগ যেমন থাকে, অন্য দলের পক্ষে সেই ভুল সংশোধন করার উপায়ও থাকে। প্রয়োজনে খারাপও হওয়া যায়, আবার প্রয়োজনে ভালোও হওয়া যায়।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভাগ্য ভালো বলেই মনে হচ্ছে। তিনি গত মাসে যখন আমেরিকায় ছিলেন, তখন আমাদের সাগরে গভীর নিম্নচাপের সৃষ্টি হয়েছিল। ১৯৯১ সালে বেগম খালেদা জিয়ার ক্ষমতা গ্রহণের পরপরই গৃহশত্রুরূপী সমুদ্র আমাদের উপকূলে আঘাত হানে। তাতে হাজার হাজার প্রাণ ও প্রচুর ধনসম্পদ বিনষ্ট হয় এবং ত্রাণ কার্যের ছুঁতো ধরে রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশের নির্দেশে অপারেশন ডেজার্ট স্টর্ম সাঙ্গ করে দেশে ফেরার পথে মার্কিন সেনারা খালেদা জিয়ার অনুমতি না নিয়েই বাংলাদেশের জলসীমায় প্রবেশ করে নতুন সরকারকে বিবৃতকর পরিস্থিতিতে ফেলেছিল। আমি ঐ সময় আমেরিকা ভ্রমণে ছিলাম এবং বাংলাদেশে মার্কিন সৈন্য প্রবেশের বিরোধিতা করে সেখানকার বাংলা কাগজে বিবৃতি দিয়েছিলাম।

এবারের নিম্নচাপের সংবাদ শুনেও আমার মনে আশংকা হয়েছিল, কী জানি আবার! কিন্তু না। এবার আর ঐরূপ কিছু ঘটেনি। ঘটেনি যে, খুব অল্পের ওপর দিয়েই যে ঐ নিম্নচাপটি আমাদের দেশ অতিক্রম করেছে—তা শেখ হাসিনার জন্য খুবই সৌভাগ্যসূচক বলে গণ্য হয়েছে। আর চলতি নভেম্বরের শুরুতেই মার্কিন নির্বাচনে ডেমোক্র্যাট দলীয় প্রার্থী বিল ক্লিনটনের পুনরায় মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার ব্যাপারটিও শেখ হাসিনার জন্য খুবই ভালো হলো। অতঃপর ১৫ আগস্ট ও ৩ নভেম্বরের বর্বর হত্যাকাণ্ডের বিচার করার পথে শেখ হাসিনা অন্তত আমেরিকার দিক থেকে কোনোরূপ বাধার সম্মুখীন হবেন না বলেই মনে হয়।

আশা করি এতক্ষণ পর, আমার চলতি রচনার সঙ্গে এবারের মার্কিন নির্বাচনের প্রাসঙ্গিক কথা প্রতিষ্ঠায় আমি মোটামুটিভাবে কৃতকার্য হয়েছি। এবার আমি ১৯৭৫-এর রক্তঝরা নভেম্বরের স্মৃতিচারণে ফিরে যেতে পারি।

১৫ আগস্টের ঘটনার পর আমি অনির্দিষ্টকালের জন্য আমার গ্রামের বাড়িতে ফিরে গিয়েছিলাম। সহসা ঢাকা ফিরে আসার কোনো ভাবনাই আমার ছিল না। আমি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার দেশ সম্পর্কে সকল আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছিলাম। নিকটবর্তী থানা শহরে গিয়ে খবরের কাগজ পড়তে পারতাম—কিন্তু পড়তাম না। বাড়িতে রেডিও ছিল না, পাশের বাড়িতে ছিল—, ইচ্ছে করলে শুনতে পারতাম, কিন্তু শুনতাম না। ঢাকায় কী হচ্ছে না হচ্ছে, আমি প্রায় কিছুই খবর রাখতাম না। আমি সারাদিন আমাদের গ্রামের শ্মশানে জগা সাধুর আশ্রমে পড়ে থাকতাম। আধ্যাত্মিক গান শুনতাম এবং দিনরাত সিদ্ধি সেবন করতাম। সংসার ত্যাগী জগা সাধুর সঙ্গে আমার একটা আত্মিক-আধ্যাত্মিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। জগা সাধুর আশ্রমটা ছিল আমার মায়ের শ্মশানের খুবই কাছে। ঐ আশ্রমে বসে আমি আমার ছোটবেলায় হারানো মাকে অনুভব করতাম। আসলে পরে বুঝেছি, ঐ সময়টায় এক ধরনের মানসিক রোগীতে পরিণত হয়েছিলাম আমি। আমার ঐ মানসিক রোগটার কী নাম জানি না— রোগটা ছিল সবাইকে সন্দেহ করা। সবসময় আমার মনে হতো, আমাকে মেরে ফেলার জন্য বিশ্বজুড়ে একটা গভীর ষড়যন্ত্র চলছে। ঐ ষড়যন্ত্রের হোতা হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার গোয়েন্দা সংস্থা— সিআইএ। আমার তখন মনে হতো, আমি তো শুধু আমি নই, বঙ্গবন্ধুর আত্মা বা রুহু পুনর্জন্মের আশায় আমার ভিতরে এসে আশ্রয় নিয়েছে। এই সংবাদটি সিআইএ-এর অজানা নয়। তাই আমাকে শেষ করে দেবার জন্য সিআইএ-র লোক এই প্রত্যন্ত গ্রাম পর্যন্তও হানা দিতে পারে। আমার বিমাতা তো পারেনই, আমার আপন পিতাও প্রচুর ডলারের লোভে সিআইএ-র ফাঁদে পা দিতে পারেন। কিছুই বলা যায় না। কাউকেই বিশ্বাস নেই। আমার খুবই সতর্ক থাকা দরকার। মানুষকে বিশ্বাস করা চলবে না। বঙ্গবন্ধু মানুষকে বিশ্বাস করে ঠকেছেন। আমাকে যে খাদ্য প্রদান করা হতো, আমি ঐ খাদ্য অন্যকে খাইয়ে টেস্ট করে তবেই খেতাম। তার আগে নয়। আমার আচরণে আমার মা-বাবা ভাইবোনরা খুব কষ্ট পেত। কিন্তু তাদের চোখের জলও আমাকে আমার অটল সিদ্ধান্ত থেকে টলাতে পারত না। চারদিকে রাষ্ট্র হয়ে গিয়েছিল যে, আমি পাগল হয়ে গেছি। আমার পাগল হয়ে যাবার খবর শুনে দূর থেকেও মানুষ আমাকে দেখতে আমাদের বাড়িতে এসে ভিড় করত। আমি দেখা দিতাম কিন্তু পারতপক্ষে কারও সঙ্গে কথা বলতাম না। ঐরূপ মানসিক ভারসাম্য হারানো অবস্থার মধ্যেই আমার অনেকগুলো দিন কেটে যায়।

১৫ আগস্টের পর মোশতাক সরকারের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করার পর জেনারেল শফিউল্লাহকে সরিয়ে দিয়ে তাঁর জায়গায় জেনারেল জিয়াউর রহমানকে সেনাপ্রধান নিযুক্ত করা হয়েছিল। তাতে বোঝা যায়, জিয়াউর রহমান বঙ্গবন্ধুর খুনীদের বিশ্বাস অর্জনে সক্ষম হয়েছিলেন। তারপরও জিয়া সম্পর্কে আমার প্রত্যাশার অবসান না হওয়াটাকে কেউ কেউ যুক্তিহীন বলে আখ্যায়িত করেছেন। তাদের কথা হলো, ১৫ আগস্টের অব্যবহিত পর ইনফরমেশন গ্যাপের কারণে জিয়া সম্পর্কে আমার প্রত্যাশাকে কিছুটা সত্য বলে ধরে নিলেও, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর পার হয়ে নভেম্বরে পৌঁছেও খুনীদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে তিনি বঙ্গবন্ধুর পক্ষে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অবস্থান গ্রহণ করবেন; জিয়া সম্পর্কে এমন কথা ভাববার কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণই আর অবশিষ্ট ছিল না। জিয়া যে মোশতাক ও তাঁর সূর্যসন্তানদের খুব কাছের মানুষ—তা নাকি নানাভাবেই জানা যাচ্ছিল।

আমার মনে হয়, বঙ্গবন্ধু নিহত হওয়ার পরের ঘটনাপ্রবাহ থেকে নিজেকে গুটিয়ে নেবার কারণেই আমার ক্ষেত্রে আরও বড় রকমের একটি ইনফরমেশন গ্যাপ ঘটে থাকবে। এ কারণেই স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের পাঠক, মেজর জিয়া (পরে জেনারেল) সম্পর্কে আমার মোহভঙ্গ হয়েছিল অন্যদের চাইতে কিছু পরে। সে-কারণেই বঙ্গবন্ধুর অনুসারী হিসেবে আমার মনে জিয়ার পরমায়ু অন্যদের তুলনায় কিছুদিন বেশি স্থায়ী হয়েছিল।

খালেদ এবং জিয়ার মধ্যকার বন্ধুত্বের কথা আমি লোকমুখে শুনেছি। পাকিস্তানের কাকুল মিলিটারি একাডেমিতে তাঁরা একই সঙ্গে কর্মরত ছিলেন। যখন আমি জানতে পারলাম যে, জিয়া এই অভ্যুত্থানের সঙ্গে নেই— এবং ব্রিগেডিয়ার খালেদ জিয়াকে গৃহবন্দি করে রেখেছেন, তখন আমি খুবই দুশ্চিন্তায় পড়ে যাই। আমি ১৫ আগস্টের খুনি সৈনিকদের সম্পর্কে কিছুই জানতাম না। আমার মনে হয়েছিল, এরা সবাই পাকিস্তানপন্থী হবেন। কিছুসংখ্যক লোক দেখানো মুক্তিযোদ্ধা এদের সামনে থাকলেও, পাকিস্তান ফেরত প্রবীণ সৈনিক এবং মুসলিম লীগের কিছু রাজনীতিবিদ নিশ্চয়ই এদের পেছনে লুকিয়ে আছে। সময় ও সুযোগ বুঝে তারা ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করবে। জিয়া ও খালেদের মতো মুক্তিযোদ্ধারা যদি ১৫ আগস্ট ও ৩ নভেম্বরের অভিন্ন-খুনিদের বিরুদ্ধে একজোট হতে না পারে, তবে বঙ্গবন্ধুর অনুসারীদের পক্ষে পুনরায় জয়ের ধারায় ফিরে আসতে পারাটা খুবই কঠিন হবে। মাঝখান থেকে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তিটি দুই ধারায় বিভক্ত হয়ে পড়বে।

বঙ্গবন্ধু ও চার জাতীয় নেতার খুনিদের পক্ষে আমেরিকা-চীন-লিবিয়া-সৌদি আরব যতটা আছে—খুনিদের বিরুদ্ধে ভারত বা সোভিয়েত ইউনিয়ন ততটা পজেটিভলি নেই। তাই পরিবর্তিত বিশ্ব-পরিস্থিতিটা এই মুহূর্তে আমাদের অনুকূলে নেই। তাছাড়া, আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ (বাকশাল) গঠন করা এবং চারটি পত্রিকা রেখে বাকি সমস্ত কাগজ বন্ধ করে দেবার কারণে, দেশের মানুষও কিছুটা বিভ্রান্তির মধ্যে পড়ে গিয়েছিল। মানুষ ভালো করে বুঝে উঠতে পারছিল না, বাকশাল গঠন করে বঙ্গবন্ধু আসলে কী করতে চেয়েছিলেন। আওয়ামী লীগ ভেঙ্গে গিয়েছিল ঠিকই কিন্তু দেশের সমমনা রাজনৈতিক দলগুলোর সমন্বয়ে গঠিত বাকশাল তখনও ক্ষতস্থানকে প্রোটেক্ট করার মতো শক্ত চামড়া নিয়ে গড়ে উঠতে পারেনি। বঙ্গবন্ধুর অনুসারীদের ঐ রূপ অসংগঠিত অবস্থার মধ্যে খুনিরা ১৫ আগস্ট ও ৩ নভেম্বরের ঘটনার নজিরবিহীন নির্মমতার সুফলও ভোগ করছিল উপরি-পাওয়া হিসেবে। আমার মতো অনেকেই তখন ভয়ে হোক, ঘৃণায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হোক বা অক্ষম অভিমানেই হোক— নিজের ভিতরে সেঁধিয়ে গিয়েছিল আপনা থেকে বাহির হয়ে, ঘৃণার কৃপাণ হাতে খুনির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার শক্তি তখনও অনেকেই সঞ্চয় করে উঠতে পারেনি।

যেহেতু আমি ঐ অভ্যুত্থানের সঙ্গে মনে মনে নিজেকে যুক্ত করে ফেলেছিলাম, সেহেতু অভ্যুত্থানটিকে খুব ধীরগতিতে অগ্রসর হতে দেখে আমি খুব ভীত হয়ে পড়ি। চারদিকে আতংক। কী হবে না হবে তা কেউ-ই বলতে পারছে না। সংশয় সর্বত্র পাখা মেলে আছে। বিদেশী সংবাদ মাধ্যমই তখন আমাদের প্রধান সংবাদ ভরসা। সারাক্ষণ রেডিও খুলে আমি আর মহাদেব বাসায় বসে থাকি। জিয়া যে বঙ্গবন্ধুর খুনিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করার প্রশ্নে খালেদ ও শাফায়েত জামিলের সঙ্গে একমত নন, তা ক্রমশ আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে আসে। জিয়ার দিকে আমার খুব রাগ হয়। আমার মনে হয় জিয়া ভুল করছেন। জিয়ার প্রতি আমার যে বিশ্বাস ছিল তা দ্রুতই ভেঙ্গে যেতে থাকে।

ব্রিগেডিয়ার খালেদকে নিয়েও আমার মনে সংশয় দেখা দেয় দুটো কারণে।

১. ১৫ আগস্ট ও ৩ নভেম্বরের জেল-হত্যার সঙ্গে যুক্ত সামরিক অফিসারদের তিনি দেশ থেকে নির্বিবাদে পালিয়ে যেতে দিলেন কেন?

(পরে জেনেছিলাম, খালেদ মোশাররফ জেল-হত্যার বিষয়টি সময়মতো জানতেন না। মিসেস মোশাররফ খালেদের প্রদত্ত তথ্যানুযায়ী, খালেদ মোশাররফ পরদিন ৪ নভেম্বর জেলখানায় নিহত চার জাতীয় নেতাকে দেখতে যান। তথাকথিত 'সূর্যসন্তানদের' সঙ্গে যখন খালেদ মোশাররফের প্যাকেজ ডিল হয়, তখন জেল-হত্যার বিষয়টি সম্পর্কে অবগত থাকার পরও জেনারেল ওসমানী, মেজর জেনারেল খলিলুর রহমান এবং তৎকালীন ডিআইজি অব পুলিশ ই.এ. চৌধুরী খালেদকে ঐ তথ্যটি গোপন করেছিলেন।)

AMARBOI.COM

২. তিনি যদি আওয়ামী লীগের সমর্থকই হবেন, তবে জেলে নিহত জাতীয় চার নেতাকে সম্মানের সঙ্গে সোহরওয়ার্দী উদ্যানের নিকটবর্তী তিন নেতার কবরের পাশে কবর দেবার ব্যবস্থা করলেন না কেন? আমার স্পষ্ট মনে আছে, সোহরওয়ার্দী উদ্যানের পাশে তিন নেতার কবরের দক্ষিণের ফাঁকা জায়গাটিতে চার নেতাকে মর্যাদার সঙ্গে সমাহিত করার জন্য চারটি কবর খোঁড়া হয়েছিল। আমি ঐ খোঁড়া কবরগুলোকে চোখে চোখে রাখছিলাম। অপেক্ষা করছিলাম, কখন ঐ চার নেতার লাশ এখানে আনা হবে। আমার খুব ইচ্ছে ছিল চার নেতার দাফনে শরিক হবার। তাঁদের প্রতি শেষ-শ্রদ্ধা নিবেদন করার। কিন্তু আমার সে ইচ্ছে সেদিন পূরণ হয়নি। সন্ধ্যার পরও নেতাদের লাশ সেখানে আনা হয়নি। পরে খোঁড়া কবরগুলো মাটি দিয়ে পুনরায় ভরাট করে ফেলা হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরে ৫ নভেম্বর সন্ধ্যায়, চার নেতার মধ্যে তিন নেতাকে বনানী কবরস্থানে বঙ্গবন্ধু এবং সেরনিয়াবাতের পরিবারের নিহত সদস্যদের পাশেই দাফন করা হয়। শহীদ কামরুজ্জামানের লাশ রাজশাহীতে তাঁর পারিবারিক গোরস্তানে দাফন করা হয়।

ঘটনাদৃষ্টে মনে হয়, ৩ নভেম্বরের অভ্যুত্থানের বলি হয়েছেন এই চার জাতীয় নেতা। সেনাবাহিনীর মধ্যে 'চেইন অব কমান্ড' প্রতিষ্ঠিত হলে ভেঙ্গে পড়া সাংবিধানিক চেইন অব কমান্ডও যে স্বাভাবিকভাবেই পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে—, সে-কথা বুঝতে পেরেই জেলের ভিতরে বন্দি চার নেতাকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল মোশতাক এবং তার সহযোগীরা। সেনাবাহিনীতে চেইন অব কমান্ড প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ না নিলে, ঐ চার নেতা হয়তো বেঁচে যেতে পারতেন। তাই বলতে হয়, ৩ নভেম্বরের অভ্যুত্থানকারীরা জেলের ভিতরে বন্দি চার জাতীয় নেতার নিরাপত্তা নিশ্চিত করার ব্যাপারটিকে অগ্রাধিকার না দিয়ে সেদিন অদূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছিলেন। পরে ৩ নভেম্বরের অভ্যুত্থানের পরোক্ষ বলি, জাতীয় চার নেতাকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় তিন নেতার কবরের পাশে কবর না দেয়ার বিষয়টিও আমাকে খালেদ মোশাররফ ও তাঁর সহযোগীদের রাজনৈতিক বিশ্বাস সম্পর্কে কিছুটা সন্দিহান করে তুলেছিল। মর্যাদাপূর্ণ ঐ জায়গাটিতে চার নেতাকে সমাহিত করার পথে কোথায় বাধা ছিল— তা আমরা বুঝে উঠতে পারিনি। আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে, তবে কি সামরিক বাহিনীতে চেইন অব কমান্ড পুনঃপ্রতিষ্ঠার 'সীমিত লক্ষ্য'-কে সামনে নিয়েই খালেদ মোশাররফ এই অভ্যুত্থান ঘটিয়েছিলেন? দ্রুত সিদ্ধান্তগ্রহণে অপটু একজন দুর্বলচিত্তের জেনারেল হিসেবে খালেদ যখন চিহ্নিত হতে চলেছেন, তখন আমাদের কানে আসে কর্নেল শাফায়েত জামিলের নাম। আমরা শুনতে পাই, শাফায়েত জামিল বঙ্গভবনে গিয়ে খুনি মোশতাককে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিলেন। তখন জেনারেল ওসমানী সাহেব বুক পেতে মোশতাকের সামনে দাঁড়িয়ে শাফায়েত জামিলের রুদ্ররোষ থেকে মোশতাককে প্রাণে রক্ষা করেন— এমন ঘটনার কথা তখন প্রেসক্লাবে শোনা যাচ্ছিল। সেদিন 'নো মোর ব্লাড' তত্ত্ব হাজির করে ওসমানী সাহেব মোশতাকসহ বঙ্গবন্ধুর খুনিদের রক্ষাকর্তা হিসেবে আবির্ভূত হওয়ার সংবাদ শুনে আমাদের খুবই খারাপ লেগেছিল।

একসময় জাসদের পত্রিকা গণকণ্ঠে কাজ করেছি। জাসদের অনেক নেতার সঙ্গে চেনাজানা আছে। ৩ নভেম্বরের অভ্যুত্থানের বিরুদ্ধে প্রেসক্লাবে তাদের অনেককেই খুব তৎপর বলে মনে হলো। তখন একটা জিনিস লক্ষ্য করেছিলাম, ঐ অভ্যুত্থানের পক্ষে বা বিপক্ষে— কেউই খুব সরব ছিলেন না। একটা অনিশ্চয়তা আমার ও মহাদেবের মতো অন্য অনেকের মনকেই ঘিরে রেখেছিল। জাসদের অনেক বন্ধুকে তখন খালেদের বিরুদ্ধে তৎপর হতে দেখছিলাম— তার অর্থ যে ঐ ঘটনার ভিতরে কর্নেল তাহেরের সম্পৃক্ততার সূচক, তা আমরা জানতাম না। তবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঐ অভ্যুত্থানকে ভারতীয় স্বার্থের সঙ্গে যুক্ত করে প্রচার চালানোর বিষয়টি যে খুবই কৌশলের সঙ্গে করা হচ্ছিল— তা আমি এবং মহাদেব বুঝতে পারছিলাম এ কারণে যে, আমাদের কাছ ঘেঁষতে দেখে প্রেসক্লাবের অনেক টেবিল-আলাপ বন্ধ হয়ে যেত। এবং আমাদের দিন অর্থাৎ হিন্দুদের দিন এসে গেছে বলে কেউ কেউ আমাদের বিদ্রূপ করতেন। ঐ অভ্যুত্থানের সঙ্গে আমাদের বিন্দুমাত্র সম্পর্ক না থাকার পরও — এমন মন্তব্যকারীদের সঙ্গেও আমাদের এমন সৌজন্যমূলক আচরণ করতে হতো যে, সত্যিই তাই এবং আমরা দু'জন এ-কারণে সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী।

৭২ ঘণ্টা চলে যাবার পরও ব্রিগেডিয়ার থেকে জেনারেল ও সেনাবাহিনীর প্রধান (জিয়াকে সেনাপ্রধানের পদ থেকে সরিয়ে দেয়া হয়) পদে উন্নীত খালেদ মোশাররফ যখন বেতার বা টিভি ভাষণের মাধ্যমে তাঁর এ্যাকশনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে দেশবাসীকে কোনো কিছুই বোঝাতে পারলেন না—, তখন তাঁর বিরুদ্ধপক্ষের প্রচারণাকেই মানুষ সত্য বলে ধরে নিতে শুরু করল। ভিতর থেকে বন্দি জেনারেল জিয়ার নিষ্ক্রিয় অসহযোগিতা এবং বাইরে থেকে কর্নেল তাহেরের সক্রিয় প্রতিরোধের কারণে তিনি যে সেনাবাহিনীকে নিজের অনুকূলে আনতে ব্যর্থ হয়েছেন— সে কথা আমরা যারা তাঁর সমর্থক, তারা ভয়ে-ভয়ে ভাবতে থাকলাম বটে— কিন্তু সাধারণ মানুষ ষড়যন্ত্রকারীদের নীরবতার সঙ্গে খালেদের নীরবতার মিল খুঁজে পেল।

AMARBOI.COM

বঙ্গবন্ধুহীন বাংলাদেশের প্রতি ভারতের দৃষ্টিভঙ্গি কী হবে— তা আমাদের জানা ছিল না। ফলে আমরাও খুব আশংকার মধ্যে ছিলাম। বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুর পর থেকেই মানুষ ভারতের দিকে এক চোখ সতর্ক রেখেছিল। ১৫ আগস্টের 'সূর্যসন্তানদের' শায়েস্তা করার লক্ষ্যে গৃহীত খালেদ মোশাররফের অভ্যুত্থানের পর ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী চুক্তিটি নিয়ে দেশের মানুষের মধ্যে আশংকাভাব আরও বৃদ্ধি পায়। মনে হতে থাকে, এই বুঝি ভারতীয় সেনারা ঢাকায় ঢুকে পড়ল। এই বুঝি আকাশপথে ছুটে এলো ভারতীয় বিমান। এ রকম সম্ভাবনার কথাই তখন চারদিকে প্রচারিত হতে থাকে। ঐ সংগঠিত প্রচারণার মোকাবিলা করার শক্তি তখন, আগেই বলেছি, বঙ্গবন্ধুর অসংগঠিত অনুসারীরা অর্জন করতে পারেননি। আমি আর মহাদেব তখন রাত জেগে এরূপ ভাবতে বাধ্য হই— ভারত যদি রাজনৈতিক কোনো উচ্চাভিলাষ থেকে বাংলাদেশের এই সংকটের মধ্যে জড়িত হয়ে ফায়দা লুটতে চায়, বা ভগবান না করুন, অন্য কোনো কারণেও জড়িত হয়ে পড়ে, তাহলে বাংলাদেশের হিন্দুরাই তার প্রথম বলি হবে। আমরা প্রার্থনা করি, খুনিচক্র ও তাদের স্বাধীনতাবিরোধী সমর্থকদের হাতে বাংলাদেশের নিরীহ হিন্দুদের জিম্মি করে ভারত যেন এমন কাজ কখনও না করে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমাদের প্রার্থনাই সত্য হয়। ভারত আমাদের কথা রাখে। বঙ্গবন্ধুকে বাঁচাতে যেমন ভারত কোনো ভূমিকা রাখেনি; খালেদ মোশাররফকে বাঁচানোর জন্যও ভারত কোনো ভূমিকা রাখে না। অথচ ভারত জুজুর ভয় দেখিয়েই খালেদের বারোটা বাজিয়ে দিতে সক্ষম হয় খালেদের বিরুদ্ধবাদীরা। খালেদের হাত থেকে দেশকে উদ্ধার করা আর ভারতের হাত থেকে দেশকে মুক্ত করা সমার্থক—এমন প্রচারিত বাস্তবতার মধ্যে খালেদের পক্ষে জয়ী হওয়া শুধু তখনই সম্ভব যদি সত্যি সত্যিই ভারত তাঁর পাশে এসে দাঁড়াত। কিন্তু তা আর সম্ভব ছিল না। কেননা আমরাই তো একই সঙ্গে খালেদের জয় এবং নিজেদের নিরাপত্তা কামনা করছিলাম। আমাদের নিজেদের অস্তিত্বের স্বার্থেই আমরা তখন ভারতীয় অনুপ্রবেশের ভয়ে ভীত। ঐরকমের হাত-পা বাঁধা অবস্থায় খালেদ মোশাররফ ও তার সহযোগীদের জন্য তখন আমাদের বুকের ভিতরে এক ধরনের মায়া তৈরি হয়। ভাবি, কী প্রবল দুশ্চিন্তার মধ্যেই না অভ্যুত্থানের ঐ নেতারা প্রহর গুনছেন। তাঁদের একটি মহৎ প্রয়াস কী করুণ পরিণতির পথেই না এগিয়ে চলেছে। বিবিসির রাতের খবরে ক্ষমতার দ্বন্দ্বে খালেদের পাল্লা ভারী বলে বলা হলেও আমাদের মনের সংশয় তাতে দূর হয় না। আমরা উদ্বেগ নিয়েই ৬ তারিখ রাতে ঘুমাতে যাই।

আমাদের সমগ্র সত্তাকে ভয়ে কাঁপিয়ে দিয়ে, বিগত বিনিদ্রপ্রায় রজনীর সকল জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে, ৭ নভেম্বরের ভোর আসে। পিলখানার ভিতর থেকে রাইফেলের গুলি ছুঁড়তে-ছুঁড়তে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনাপূর্ণ স্লোগান ছড়িয়ে বেরিয়ে আসে জোয়ানরা। তাদের কণ্ঠে 'নারায়ে তাকবির আল্লাহু আকবর' ধ্বনি। সারা আজিমপুর জেগে ওঠে উল্লাসে। সেই উল্লাস সারা শহরে ছড়িয়ে পড়ে। ছড়িয়ে পড়ে পরাজিত জেনারেল খালেদের হাত থেকে জেনারেল জিয়ার ক্ষমতা উদ্ধারের সংবাদ। জিয়া গৃহবন্দি হওয়ার পর মোশতাক ক্ষমতা হারিয়েছিলেন। খালেদ-শাফায়েত খুনি মোশতাককে হটিয়ে প্রধান বিচারপতি আবু সাদাত মোহাম্মদ সায়েমকে রাষ্ট্রপতি করেছিলেন। মোশতাকসহ বঙ্গবন্ধুর খুনিদের সঙ্গে জেনারেল জিয়ার যে দূরত্বটুকু এতদিন বজায় ছিল; ৭ নভেম্বরে সকালের আলো ফুটবার সঙ্গে সঙ্গেই তা ঘুচে যায়। তখন জিয়া ও মোশতাকের অনুগত সৈনিক ও বঙ্গবন্ধুবিরোধী নগরবাসীর মুখে মুখে জিয়ার পাশাপাশি মোশতাকের নামেও জয়ধ্বনি ওঠে। জিয়া-মোশতাক ভাই ভাই। চারদিকে ভারতের হাত থেকে দেশটিকে এইমাত্র মুক্ত করা হয়েছে— এমন মনোভাব প্রকাশিত হতে থাকে। আমরা বাইরে গিয়ে বিডিআর থেকে বেরিয়ে যাওয়া সৈনিকদের বিজয় উল্লাস দেখবার সিদ্ধান্ত নিই। তখনই 'ভারত-রাশিয়ার দালালেরা হুঁশিয়ার সাবধান' বলে আমাদের থামিয়ে দেয়া হয়। আমরা ৪ নভেম্বরের মৌন-মিছিলে অংশ নিয়েছিলাম। মনে মনে মোশতাক ও জিয়ার বিনাশ কামনা করেছি। সুতরাং আমরা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘরের মধ্যেই বসে থাকলাম। আমাদের রক্তশূন্য ভীত মুখ দেখে মহাদেবের স্ত্রী নীলা আমাদের ঘরের বাইরে না যাবার পরামর্শ দিল। কিন্তু আমি স্থির করলাম, আমি যাব। না গেলে আমার বিপদ হতে পারে। ঐ দিনই দুপুরে রেডিওতে আমার কবিতা পড়ার কথা। আগের দিন আমি অনুষ্ঠানের প্রযোজকের কাছে আমার কবিতা জমা দিয়ে এসেছি। আমার জমা দেয়া কবিতাগুলোতে ১৫ আগস্টের ঘটনার শোকাচ্ছন্নতা রয়েছে। প্রিয়জন-হত্যার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার প্রস্তুতি গ্রহণের কথাও বলা হয়েছে। আমার কবিতাগুলো ছিল ১। যীশু ক্রুশ। ২। প্রস্তুতি। [পরে ঐ কবিতা দুটো 'ও বন্ধু আমার' (প্রকাশকাল : ডিসেম্বর ১৯৭৫) নামক কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়।] অন্য কবিতাটির কথা মনে নেই। তিনটি কবিতা আমি জমা দিয়েছিলাম। ভাবলাম, এখন আমি যদি ঐ কবিতাগুলো পড়তে না যাই, তবে ভাবা হতে পারে যে, আমি খালেদ মোশাররফের ক্যু'র প্রশ্রয়েই এই কবিতাগুলো লিখেছিলাম। এখন খালেদ পরাজিত হওয়াতে আমি ভয় পেয়ে গেছি। তাই কবিতা পড়তে যাইনি। অথচ আমার এ-কবিতাগুলো আমি লিখেছিলাম আমার গ্রামের বাড়িতে বসে। আমার কবিতাগুলোর উৎসশক্তি সম্পর্কে ভুল ধারণা পোষণ করা হোক—আমি তা হতে দিতে পারি না। তাই মহাদেব এবং নীলার নিষেধ সত্ত্বেও আমি দুপুর বারোটার দিকে শাহবাগের দিকে যাই। স্থির করলাম পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রেডিওতে আমার কবিতা যদি পড়তে পারি তো পড়ব— তারপর আমার কবিবন্ধু আবুল হাসানকে পিজিতে দেখতে যাব। ৪ নভেম্বর অসুখ বেড়ে যাওয়ার কারণে আবুল হাসান পিজি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে।

রেডিওতে যাবার পথে উল্লসিত সৈনিক ও জনতার ট্রাকমিছিল এবং রাজপথে কিছু ট্যাংক চলতে দেখা গেল। সিপাহী-জনতা ভাই ভাই শ্লোগানটি তখনই এক দু'বার শুনলাম। তারা কেউ কেউ আমাকেও মিছিলে যোগ দিতে ডাকল; কিন্তু আমি গেলাম না, আমি গেলাম রেডিও অফিসে। সেখানে গিয়ে দেখি এলাহি কাণ্ড। ট্যাংক নিয়ে সৈনিকরা ঘিরে রেখেছে রেডিও অফিসটি। আমি বুকে সাহস সঞ্চয় করে গেটের দিকে এগিয়ে গেলাম। দোতলায় দাঁড়িয়ে, আমাকে রেডিওতে ঢুকতে দেখে আমার প্রযোজক একজন পিয়নকে আমার কাছে পাঠালেন। আমি তাঁকে চিনতাম না, কিন্তু তিনি আমাকে চিনতেন। তিনি আমার কাছে এসে আমাকে টেনে গেটের বাইরে নিয়ে গেলেন। বললেন, দাদা, আপনার কি মাথা খারাপ হয়েছে? আমি বললাম কেন, আমি আমার কবিতা পড়তে এসেছি। আমার তো প্রোগ্রাম আছে দুপুরে। তিনি বললেন, আপনার নিশ্চয়ই মাথা খারাপ হয়েছে। আপনি কি দুনিয়াদারির কোনো খবর রাখেন না নাকি? আমি বললাম, কেন? কি খবর? তিনি জানালেন, প্রেসিডেন্ট খন্দকার মোশতাক এখন রেডিওর ভিতরে আছেন। তিনি এসেছিলেন জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দিতে। কিন্তু কর্নেল তাহের তাঁকে কিছুতেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভাষণ দিতে দেবেন না। তিনি মোশতাককে টয়লেটের মধ্যে বন্দি করে রেখেছেন। সবাই এখন জিয়ার জন্য অপেক্ষা করছে। আপনি তাড়াতাড়ি বাসায় চলে যান। কখন কী হয় কিচ্ছু বলা যায় না। আপনি নিজেও মরবেন, আমাদেরও মারবেন।

ডুবন্ত মানুষ যেমন খড়কুটোকে আশ্রয় করে বাঁচবার শেষ চেষ্টা করে, আমার অবস্থাও অনেকটা সে রকম। খালেদ মোশাররফের ওপর বাজি ধরে হেরে যাবার পর— আমি এবার বাজি ধরলাম কর্নেল তাহেরের নামে। তাহের মোশতাককে পায়খানার মধ্যে আটকে রেখেছেন, তাকে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দিতে দেননি— ঐ আনন্দ সংবাদটি শুনে আমার খুব ভালো লাগল। ঐ কথা শুনে আমি কর্নেল তাহেরকে মনে মনে খুবই তারিফ করলাম। আমার বাড়ি নেত্রকোনায়। তাহেরও নেত্রকোনার মানুষ। ভাবলাম, এই যুদ্ধে তাহের জিতলেও মন্দ হয় না।

৩ নভেম্বর বঙ্গভবনে আয়োজিত এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে একই সঙ্গে জেনারেল এবং সেনাবাহিনীর প্রধানের পদে উন্নীত হওয়ার সময় খালেদ মোশাররফ ঘুণাক্ষরেও ভাবতে পারেননি যে, তাঁর জেনারেলের ব্যাজসম্বলিত এই পোশাক এবং সেনাপ্রধানের নতুন পদটি— এতটাই ক্ষণস্থায়ী হবে, মাত্র তিন দিনের ব্যবধানে, ক্ষমতার দ্বন্দ্বে পরাভব মেনে, ঐ পোশাক ছেড়ে সিভিল পোশাক পরিধান করে তাঁকে নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে ছুটতে হবে জীবন বাঁচানোর জন্য। তিনি তাঁর দুই বিশ্বস্ত-সহযোগী কর্নেল নাজমুল হুদা এবং লে. কর্নেল হায়দারকে নিয়ে ভোরের দিকে শেরেবাংলা নগরস্থিত ১০ম বেঙ্গল রেজিমেন্টে গিয়ে আশ্রয় নেন। জেনারেল খালেদ হয়তো ভেবেছিলেন, তিনি যেমন গত চার দিন ধরে জেনারেল ওসমানী সাহেবের 'আর রক্ত নয়' কথাটি অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলেছেন, তেমনি অভ্যুত্থানজয়ী জেনারেলরাও নিশ্চয়ই ঐ ওসমানী-দর্শন মেনে চলবেন। তাই তিনি শেরেবাংলা নগরের ১০ম বেঙ্গল রেজিমেন্টে আশ্রয় নিয়েছিলেন আত্মবিশ্বাস থেকে। ঐ রেজিমেন্টটি মুক্তিযুদ্ধকালীন 'কে' ফোর্সের সদস্যদের নিয়ে গঠিত ছিল। কিন্তু হায়রে বিশ্বাস! মোশতাককে বাঁচানোর জন্য বঙ্গভবনে যেমন ওসমানী সাহেব সর্বদা উপস্থিত ছিলেন, খালেদ ও তাঁর সহযোগীদের বাঁচানোর জন্য শেরেবাংলা নগরে সে রকম কোনো ওসমানী উপস্থিত ছিলেন না। ফলে ৭ নভেম্বর সকাল ১১টার দিকে ঊর্ধ্বতন সামরিক অফিসারের নির্দেশমতো অত্যন্ত ঠাণ্ডা মাথায় নিম্নস্তরের সামরিক অফিসাররা গুলি ও বেয়নেট চার্জ করে ৩ নভেম্বরের অভ্যুত্থানের নেতৃত্বদানকারী তিন বীর-মুক্তিযোদ্ধাকে নির্মমভাবে হত্যা করে। [সূত্র : কর্নেল (অবঃ) শাফায়েত জামিল, ভোরের কাগজ, ৭ নভেম্বর ১৯৯৬]।

আমি অবশ্য শুনেছিলাম যে, ক্যান্টনমেন্টের কাছেই, এখনকার আর্মি স্টেডিয়ামের সামনে, পথের ওপর খেজুর গাছের নিচে খালেদ মোশাররফের লাশ পড়ে আছে। কারাগারে নিহত জাতীয় চার নেতার লাশ যথার্থ মর্যাদায় শেরেবাংলা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ও সোরওয়ার্দীর কবরের পাশে দাফন না করার জন্য দু'দিন আগে যাকে অভিযুক্ত করেছিলাম, দু'দিন পর তাঁর লাশ রাস্তার ওপর পড়ে থাকার সংবাদ শুনে আমি সেই অভিযোগ প্রত্যাহার করে নিলাম। বুঝতে পারলাম, অভ্যুত্থান করলেও তিনি সেনাবাহিনীর ভিতরের পরিস্থিতিকে পুরোপুরি নিজ-নিয়ন্ত্রণে আনতে পারেননি। অভ্যুত্থান-উত্তর সেনাবাহিনীর মধ্যকার বেসামাল অবস্থার কাছে তিনি খুবই অসহায় হয়ে পড়েছিলেন। তাই চার নেতাকে বনানীতে পাঠিয়ে দিয়ে হয়তো প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছিলেন যে, আওয়ামী লীগের নেতাদের প্রতি তাঁর বিশেষ কোনো দুর্বলতা নেই। বঙ্গবন্ধুর রুহের মাগফেরাত কামনা করার জন্য সংগ্রামী ছাত্রসমাজ কর্তৃক আয়োজিত ৪ নভেম্বরের মৌন-মিছিলের সঙ্গে তাঁর মা ও ভাইয়ের সম্পর্ক থাকলেও, তাঁর নিজের কোনোরূপ সম্পর্ক ছিল না— এটি প্রমাণ করাটাও হয়তো তাঁর জন্য তখন জরুরি হয়ে পড়েছিল। দু'দিনের ব্যবধানে তাঁকেও যে ঐ বনানী কবরস্থানে, চার জাতীয় নেতার পাশেই অন্তিম-শয়নে শায়িত হতে হবে, তা অন্ত রাল থেকে সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করেন যে ঈশ্বর, তিনি ছাড়া কে আর ভাবতে পেরেছিল ! আমার কী যে খারাপ লাগল। আমার বুকের ভিতরটা গোপনে কেঁদে উঠল। কেঁপে উঠল। হায় কী দুর্ভাগ্য ! আমাদের মুক্তিযুদ্ধের বীর মুক্তিযোদ্ধাদের এ কী করুণ পরিণতি ! হা ঈশ্বর, তাঁরা কি এভাবেই এক এক করে শেষ হয়ে যাবেন?

খালেদকে সহায়তা করার জন্য রংপুর ক্যান্টনমেন্ট থেকে ঢাকায় ছুটে এসেছিলেন কর্নেল নাজমুল হুদা। মেজর হায়দার (পরে লে. কর্নেল) বিমানবাহিনীর এআর খন্দকারের সঙ্গে পাকিস্তান বাহিনীর আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে মুক্তিবাহিনীর প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন রেসকোর্সে, ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বরে। তিনি ছুটিতে থাকা অবস্থায় ঢাকায় খালেদের সঙ্গে দেখা করতে এসে ঘটনার ভিতরে জড়িয়ে পড়েছিলেন। নিশ্চিত পরাজয়ের মুখে বন্ধু খালেদের সঙ্গ আর ত্যাগ করতে পারেননি। একেই বলে বন্ধুত্বের টান !

রেডিও থেকে বেরিয়ে, আমি আমার বন্ধু আবুল হাসানের টানে তার সঙ্গে দেখা করার জন্য পিজি হাসপাতালে যাই। হাসান খুবই অসুস্থ। তাঁর শেষ-জীবনের বান্ধবী কবি সুরাইয়া খানম তখন পিজিতে হাসানের দেখাশোনা করছিল। সুরাইয়া কবিতা লিখত এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগে শিক্ষকতা করত। শামসুন্নাহার হলের হাউস টিউটরও ছিল। হাসানের কাছে তখন আর কে ছিল, ঠিক মনে পড়ছে না। হাসানের আম্মা এবং ওর বোন বুড়িও হয়তো ছিল।

আমার কাছে লেখা হাসানের শেষ-চিঠিতে হাসান তাঁর বান্ধবী সুরাইয়া সম্পর্কে লিখেছিল... 'ঐ শ্রীমতীও এখন আর আমাকে একাকীত্ব দিতে পারেন না।' [দ্রঃ আবুল হাসানের শেষ-চিঠি : সচিত্র সন্ধানী : ২৬ নভেম্বর ১৯৭৮] সুরাইয়া কি জানত তাঁকে নিয়ে হাসানের ঐ উপলব্ধির কথা? হয়তো জানত না ঠিক, তবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বুঝতে পারত। আমার আর হাসানের অন্তর্গত সম্পর্কের গভীরতাটুকু সুরাইয়ার না জানার, বা না বোঝার কোনো কারণ ছিল না। ফলে হাসানের কাছ থেকে সে আমাকে যতটা সম্ভব দূরে রাখার চেষ্টা করত।

সুরাইয়া ছিল মুজিব-বিরোধী। বাইরে একটু বিদ্রোহী ভাব থাকলেও মনে মনে আমি ছিলাম খুবই মুজিবভক্ত। ষাটের দশকের শুরুতে, অসাম্প্রদায়িক বাঙালি জাতীয়তাবাদী রাজনীতির কারণে শেখ মুজিবকে ঘিরে আমার মধ্যে ঐ ভক্তি ভাবটার সৃষ্টি হয়েছিল। পরে, আমার ক্ষণস্থায়ী বিশ্ববিদ্যালয়-জীবনের সহপাঠিনীরূপে আবির্ভূতা মুজিবনন্দিনী আমার ঐ ভক্তিকে প্রেমে পরিণত করার ক্ষেত্রে পরোক্ষ-ভূমিকা রাখেন। আমার কারণে কমবেশি আবুল হাসানও ঐ প্রেমে জড়িয়ে পড়েছিল। তবে রাজনৈতিক অর্থে আবুল হাসানকে আমার মতো মুজিবভক্ত অবশ্যই বলা যাবে না। আসলে, রাজনীতি সম্পর্কেই হাসানের এক-ধরনের নিরাসক্তি ছিল। হাসানের পিতা, একজন অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মকর্তা ছিলেন। বিখ্যাত মুসলিম লীগ নেতা ঢাকার হাবিব ফকিরের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। পার্টিশনের আগে কলকাতায় তাঁরা একসঙ্গে থাকতেন। পিতার সঙ্গে বন্ধুত্বের কারণেই আবুল হাসান ঢাকায় এসে প্রথমদিকে হাবিব ফকিরের বাসায় থাকত। আমিও হাসানের সঙ্গে হাবিব ফকিরের বাসায় একাধিকবার রাত কাটিয়েছি। তাঁর মুসলিম লীগ ভাবাপন্ন পিতার সঙ্গে অগ্রবর্তী সময়ের মতাদর্শগত বিরোধ এড়াবার জন্যই কি হাসান রাজনীতি থেকে নিজেকে গুটিয়ে রাখত? কে জানে?

জানি, দুরারোগ্য ব্যাধির চিকিৎসা-সুবিধার কথা বিবেচনা করেই বাকশাল হওয়ার পর আবুল হাসান বাকশালে যোগ দিয়েছিল। আবুল হাসান বাকশালের ওপর আস্থা স্থাপন করে বাকশালে যোগ দিয়েছিল, এমন নয়। আগের বছর চিকিৎসার জন্য সরকারি আনুকূল্যে জিডিআরে যাবার সময়ই আওয়ামী লীগ সরকারের সঙ্গে আবুল হাসানের একটা কৃতজ্ঞতার সম্পর্ক গড়ে ওঠে। তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী অধ্যাপক ইউসুফ আলী চিকিৎসার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে আবুল হাসানকে পাঁচ হাজার টাকা অনুদান দিয়েছিলেন, যা টিভি-সংবাদে প্রচারিত হয়েছিল।

কথাশিল্পী-সাংবাদিক জনাব রাহাত খান, বাংলা একাডেমীর তৎকালীন পরিচালক জনাব শামসুজ্জামান খান এবং সাহিত্যিক-রাজনীতিক মরহুম খন্দকার মহম্মদ ইলিয়াস আমাকে বাকশালে যোগ দিতে অনুরোধ করেছিলেন—কিন্তু আমি বাকশালে যোগ দিইনি। আমার মনে হয়েছিল, বঙ্গবন্ধু বাকশাল গঠন করে একটি অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ এবং অসময়োচিত পদক্ষেপ নিয়েছেন। বাকশাল গঠনের ভিতর দিয়ে তিনি তাঁর ক্ষমতাকে পাকাপোক্ত করতে চাচ্ছেন— আমার মনে হয়েছিল, ঐরূপ অভিযোগ তুলে বিরোধী মহল এখন মানুষকে বিভ্রান্ত করতে পারবে। বাকশাল গঠনের উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আমার নিজের মনেও কিছু সংশয় ছিল। তা ছাড়া, কোনো রাজনৈতিক সংগঠনের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত হওয়ার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্যাপারে আমার মনের দিক থেকে সায় ছিল না। আমি ভাবতাম, এখনও ভাবি, বড় রকমের জাগতিক দায়িত্ব পালনের জন্যই কবির কর্তব্য হলো, ছোট ধরনের যাবতীয় দায়বদ্ধতা থেকে নিজেকে মুক্ত রাখা। কবির অবিনাশত্ব এবং সার্বভৌমসয়ম্ভূতা সম্পর্কে আমি খুব তরুণ বয়স থেকেই ছিলাম অতিমাত্রায় সচেতন।

কবি শামসুর রাহমান এবং কবি মহাদেব সাহাও কাছাকাছি ধারণা পোষণ করতেন। তাঁরাও বাকশালে যোগদান করেননি। তবে ঐ দু'জনের বাকশালে না-যোগদানের পটভূমি এক ছিল না। মহাদেব সাহা বঙ্গবন্ধুর ভক্ত ছিলেন। কিন্তু দৈনিক বাংলার পিকিংপন্থী রাজনৈতিক বৃত্তের ভিতরে বন্দি কবি শামসুর রাহমান, তখন পর্যন্ত ছিলেন মওলানা ভাসানীর ভক্ত।

অন্য প্রধান কবিদের মধ্যে কবি শহীদ কাদরী এবং আল মাহমুদ বাকশালে যোগ দিয়েছিলেন। শহীদ কাদরী তখন একটি মস্কোপন্থী ফিচার-সংস্থায় কাজ করতেন। তিনি বাকশালে বিশ্বাসও করতেন। আমার সঙ্গে ১৯৯৩ সালে আমেরিকায় দেখা হয়েছিল। ঐ বছর আমরা দু'জন একুশের একটি অনুষ্ঠানের অতিথি হয়ে নিউইয়র্কে গিয়েছিলাম। অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করতে গিয়ে শহীদ কাদরী বাকশালের পক্ষে কথা বলেছিলেন।

কিন্তু আল মাহমুদের বাকশালে যোগ দেবার সংবাদ শুনে সবাই খুব অবাক হয়েছিল। জাসদের সঙ্গে সকল আদর্শিক সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়ে, জেল থেকে মুচলেকা প্রদানের মাধ্যমে মুক্তিলাভ করার পরপরই বঙ্গবন্ধুকে গলায় ফুলের মালা পরিয়ে আল মাহমুদ বাকশালে যোগ দেন। দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত আবুল হাসানের সরকারি আনুকূল্য লাভের বিষয়টিকে আমরা মানবিক সহানুভূতির দৃষ্টিতে দেখতাম। কিন্তু আল মাহমুদের বাকশালে যোগদানের সংবাদে আমরা খুবই কৌতুক বোধ করি। ন্যূনতম একাডেমিক শিক্ষাগত যোগ্যতা ছাড়াই বঙ্গবন্ধু তাঁকে শিল্পকলা একাডেমীতে যে উপপরিচালকের চাকরিটি দিয়েছিলেন, বাকশালে যোগ না দেবার কারণে যদি ঐ চাকরিটি চলে যায়, ঐ রূপ কাল্পনিক ভয় থেকেই মনে হয় আল মাহমুদ ঘটা করে বাকশালে যোগ দেন। তা ছাড়া তাঁর বাকশালে যোগদানের কোনো বিশ্বাসগত কারণ ছিল না। তিনি বঙ্গবন্ধু বা বাকশাল কোনোটাতেই বিশ্বাস করতেন না। 'চক্রবর্তী রাজার অট্টহাসি' কবিতার লেখকের কাছে বাকশালে যোগদানের অন্য কোনো 'অনুক্ত কারণ' বিদ্যমান ছিল কিনা—তা অবশ্য আমাদের জানবার কথা নয়।

মনে পড়ে, ১৯৭৩ বা ৭৪ সালে চট্টগ্রামে আমরা কবিতা পড়তে গিয়েছিলাম। শামসুর রাহমান, শহীদ কাদরী, আল মাহমুদ, ফজল শাহাবুদ্দিন এবং আমি। রাতে চট্টগ্রাম পোর্টের ডাক্তার কামালের বাসায় আমাদের নৈশভোজের ব্যবস্থা ছিল। সঙ্গে ছিল সুরা। একপর্যায়ে শামসুর রাহমানের সঙ্গে রাজনীতি নিয়ে আল মাহমুদের তুমুল তর্ক বেঁধে যায়। শামসুর রাহমান তর্কপটু মানুষ ছিলেন না। তাই শিল্পী দেবদাস চক্রবর্তী

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তখন শামসুর রাহমানের পক্ষ হয়ে আল মাহমুদের আক্রমণের জবাব দিতে উঠে দাঁড়ান। আল মাহমুদ যে রব-জলিলের খুঁটির জোরেই আজকাল এমন নর্তন-কুর্দন করছে— দেবুদা ঐ কথাটা খুবই জোরের সঙ্গে উত্থাপন করলে, কারও ভুলে যাবার কথা নয় ঐ নয়নমনোহর দৃশ্যটি, আল মাহমুদ তড়াক করে উত্তেজনায় কাঁপতে-কাঁপতে একটি সোফার ওপর লম্ফ দিয়ে উঠে দাঁড়ান। তারপর মুহূর্তমাত্র বিলম্ব না করে, শতকরা এক শ' ভাগ সাফল্যের সঙ্গে, পুরোপুরি সামরিক কায়দায় তাঁর তখনকার প্রিয় দুই নেতা রব-জলিলের উদ্দেশ্যে স্যালুট নিবেদন করে বলেন, ... 'সেদিন খুব বেশি দূরে নয়, যেদিন সব ব্যাটাই রব-জলিলের নামে এইভাবে স্যালুট দেবে।'

'৭৫-এর শুরুতে, ঐ জাসদতাত্ত্বিকের বাকশালে যোগদান করার খবর পাঠ করে, চট্টগ্রামের ঐ রাতের দৃশ্যটি আমার খুব মনে পড়ে গিয়েছিল। পরে '৭৫-এর শেষের দিকে, রমনা থানার হাজতে গিয়ে, ক্ষমতার কাছ থেকে ফিরে-আসা জাসদের জঙ্গী তরুণকর্মীদের সঙ্গে যখন আমার দেখা হয়, তখনও চট্টগ্রামে দেয়া কবি আল মাহমুদের এ-রাতের সদর্প-ঘোষণার তাৎপর্য আমি নতুন করে অনুভব করার চেষ্টা করেছিলাম।

১৯৭৫-এর শুরুতে রব-জলিলের জাসদ ত্যাগ করে বঙ্গবন্ধুর বাকশালে যোগদানকারী কবি আল মাহমুদ, ৭৫-এর মাঝামাঝি বঙ্গবন্ধুর নিহত হওয়ার পর, ক্ষমতায় আসা জেনারেল জিয়াউর রহমানের সামাজিক সাংস্কৃতিক ফ্রন্ট— 'জাসাস'-এর সভাপতির পদ অলংকৃত করেন।

AMARBOI.COM

সুরাইয়া খানম ও আবুল হাসানের মধ্যকার বন্ধুত্বকে প্রেমের সম্পর্কে উন্নীত করার পেছনে আমার একটি খুবই কার্যকর ভূমিকা ছিল। বার্লিন থেকে ফিরে আসার পর, আবুল হাসানের সঙ্গে ভালোবাসার সম্পর্ক গড়ে তোলা তাঁর পক্ষে সম্ভব কি-না, তা সহৃদয়চিত্তে ভেবে দেখার জন্য টিএসসির সবুজ ঘাসের গালিচায় তিনজন মুখোমুখি বসে, হাসানের পক্ষ থেকে আমিই সুরাইয়াকে অনুরোধ করেছিলাম। সুরাইয়া প্রথমদিকে হাসানের সঙ্গে নিজেকে আবেগী-সম্পর্কে জড়াতে রাজি হয়নি। পরে ফেনী ব্রাউন ও কীটস-এর সম্পর্কের কথা বিবেচনায় গ্রহণ করে সুরাইয়া হাসানের সঙ্গে নিজেকে জড়াতে রাজি হয়। কিন্তু আমি একটু আশ্চর্য হয়েই লক্ষ্য করি যে, কিছুদিনের মধ্যেই সুরাইয়া হাসানকে তাঁর প্রেমের একান্ত শিকারে পরিণত করে, আমার কাছ থেকে ক্রমশ আপন গোপন গুহার ভিতরে হাসানকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। যেন আমি ওদের প্রেমের পথের কাঁটা। মনে হয় সুরাইয়াকে তুষ্ট করার জন্য, আবুল হাসানও আমার প্রতি একধরনের উদাসীনতা প্রদর্শন করে চলেছে। এ নিয়ে অবশ্য আমার মনে কোনো ক্ষোভ ছিল না। আমি ভাবছিলাম, হাসান যদি এই প্রেমে সুখী হয়, তবে তাই হোক। ঐ সময়টাতে রূপসী ও রহস্যময়ী মৈত্রেয়ীর প্রেমে নিমগ্ন না থাকলে, নব-প্রেমিকযুগলের এই উদাসীনতা আমাকে হয়তোবা আরও বেশি কষ্ট দিতে পারত।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শিল্পী মৈত্রেয়ী রায়—তাঁর পিতা, মনস্বী লেখক প্রফেসর শিবনারায়ণ রায়ের সঙ্গে ১৯৭৫ সালের শুরুর দিকে অস্ট্রেলিয়া থেকে ঢাকায় বেড়াতে এসেছিল। শ্রী রায় প্রফেসর সৈয়দ আলী আহসানের আমন্ত্রণে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিজিটিং প্রফেসর হিসেবে ঢাকায় এসেছিলেন। মৈত্রেয়ী ছিল, শুধু তখন পর্যন্ত নয় এখনও পর্যন্ত, আমার দেখা রমণীদের মধ্যে সবচেয়ে রূপসী। তখন ওর মতো রূপসী-বিদুষী ও বিদেশিনীর প্রেমে পড়া থেকে নিজেকে বিরত রাখতে পারাটা ছিল সকল কবির জন্যই খুব কঠিন ব্যাপার। হাসান তখন চিকিৎসার্তে পূর্ব-বার্লিনে। ঢাকায় থাকার কারণে, অন্য অনেকের মতো আমিও মনে মনে রূপসী মৈত্রেয়ীর প্রেমে পড়ি। তারপর প্রচলিত নিয়মমাফিক, মৈত্রেয়ীর প্রেম অর্জনের জন্য আরও কয়েকজন প্রেমার্থীর সঙ্গে আমি দ্বন্দ্বে লিপ্ত হই। অন্য কেউ লেখার আগেই আমি মৈত্রেয়ীকে নিয়ে 'পিপীলিকা' কবিতাটি লিখে ফেলি এবং শাহজাদপুরে রবীন্দ্রস্মৃতিপীঠ পরিদর্শনে যাবার পথে, যমুনাবক্ষে ওকে ঐ কবিতাটি পাঠ করে শোনাই। ও বাংলা ভালো জানত না। পরিবারের সঙ্গে অস্ট্রেলিয়ায় সে বড় হয়েছে। ভালো ইংরেজি জানে। ইংরেজিতে লেখালেখিও করে। তখন আমার বাংলা কবিতাটি মেয়েকে ইংরেজিতে তর্জমা করে বুঝিয়ে দিতে ওর বাবা-মা আমাকে সাহায্য করেন। তাতে আমার খুবই উপকার হয়। কবিতাটি মৈত্রেয়ীর মনকে স্পর্শ করতে সক্ষম হয়। করুণাময়ী মৈত্রেয়ী, তখন ব্যাপারটা বুঝতে পারে এবং ওর উদ্দেশ্যে দ্রবিত আমার ভালোবাসাকে অবিশ্বাস্য-প্রশ্রয় দান করে আমাকে চিরঋণী করে।

কিছুদিনের মধ্যেই আমাকে প্রথমে প্রেমে ডুবিয়ে ও পরে বিরহে নিক্ষেপ করে, সে তার পিতা-মাতার সঙ্গে বাংলাদেশ ত্যাগ করে, ইউরোপ হয়ে অস্ট্রেলিয়ায় ফিরে যায়। যাবার পরে, রোম থেকে সে আমাকে শেলী ও কীটস-এর কবর থেকে তোলা রক্তলাল গোলাপের দুটো পাপড়ি ওর চিঠির ভাঁজের ভিতরে পুরে পাঠায়। আমি তখন দিবানিশি জেগে, মৈত্রেয়ীকে নিয়ে একটি প্রায় পুরো কাব্যগ্রন্থ ['চৈত্রের ভালোবাসা' : প্রকাশকাল : জুন ১৯৭৫] রচনা করি।

কিছুটা রাজনৈতিক ও কিছুটা মনস্তাত্ত্বিক জটিলতার কারণেই সুরাইয়া আমাকে এবং আমি সুরাইয়াকে অপছন্দ করতে শুরু করি। সুরাইয়া হাসানকে সত্যি-সত্যিই ভালোবাসে কি-না, এ নিয়েও আমার মনে সন্দেহ কাজ করতে থাকে। হাসান ছাড়াও কবিতার জগতের বাইরের জগতের অপরিচিত পুরুষদের সঙ্গে সুরাইয়াকে আমি প্রায়ই দেখতাম। আমার সন্দেহ হতো, কি জানি! সুরাইয়া আবার সিআইএ-র সঙ্গে যুক্ত নয়তো? শুধু সুরাইয়া নয়, বঙ্গবন্ধু নিহত হওয়ার পর, আমি মৈত্রেয়ীকেও সিআইএ-র সঙ্গে যুক্ত বলে মনে মনে সন্দেহ করতাম। তবে ঐ সন্দেহটা খুব একটা জোরালো ছিল না। সুরাইয়ার সঙ্গে সেনাবাহিনীর কোনো কোনো অফিসারদের ওঠা-বসা ছিল বলে, সুরাইয়া সম্পর্কে ঐ সন্দেহটা ছিল খুবই জোরালো। আমি সুরাইয়াকে কিছুটা ভয়ও পেতাম। ওর এক ভাই তখন সেনাবাহিনীতে ছিল বলে শুনেছিলাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাসানের কারণে সুরাইয়া আমাকে মুখ ফুটে 'আপনি হাসানের কাছে আসবেন না'—কথাটা বলতে পারত না। কিন্তু এমনটিই সে মনে মনে চাইত। সুরাইয়া আমাকে একটু ঘুরিয়ে অন্যভাবে বলত, 'আপনি ওর কাছে বেশি আসবেন না। আপনি আসলে ও একটু ইমোশনাল হয়ে যায়। তাতে ওর ক্ষতি হয়।' আমি সুরাইয়ার যুক্তিটা মানতাম না। বার্লিন থেকে ফেরার পর আমি জানতাম, হাসান খুব বেশিদিন বাঁচবে না। হাসানও তা জানত। ফলে মৃত্যুপথযাত্রী হাসানের শয্যাপাশে যতটা সম্ভব বসে থেকে তাঁকে সঙ্গ দেয়ারই চেষ্টা করতাম আমি। সুরাইয়া তা পছন্দ না করলেও হাসান, ওর মা এবং বোন বুড়ি আমাকে ধরে রাখত। আমাকে কাছে পেলে হাসান সত্যিই একটু আবেগপ্রবণ হয়ে পড়ত।

খালেদের অভ্যুত্থানটি যে ব্যর্থ হয়েছে, তা গোপন করার মতো সামান্য ব্যাপার ছিল না। পিজির পাশেই রেডিও। হাসানের কাছে এত বড় খবরটি গোপন থাকার কথা নয়। হাসান আমার মতো রাজনীতি-নিমগ্ন ছিল না, তবে আমার মনের দিকটা বিবেচনা করে সে আমার রাজনৈতিক উদ্বেগকে নিজের উদ্বেগে পরিণত করত। আমি তা জানতাম। তাই অভ্যুত্থান ব্যর্থ হওয়ার কথাটি জানালেও হাসানের কাছ থেকে আমি খালেদ মোশাররফের করুণ মৃত্যুর খবরটি গোপন করলাম। তাছাড়া খালেদের নিহত হওয়ার খবরটি তখনও সমর্থিত ছিল না। খালেদের সঙ্গে হাসানেরও পরিচয় ছিল।

হাসান ভাবল, ১৫ আগস্টের শোক সামলে উঠতে না উঠতেই আমি যে আবার একটা আঘাত পেয়েছি, তাতে হয়তো আবার আমি গ্রামের বাড়িতে ফিরে যাব। সেই ভয় থেকেই হাসান বলল, তুমি আবার গ্রামে ফিরে যাবে না তো! বুঝলাম, হাসান আমার মনের ভাবনা ঠিকই ধরতে পেরেছে। আমি এ রকম ভাবছিলামও বটে। কিন্তু সেই ভাবনাটাকে মনের ভিতরে বাড়তে না দিয়ে হাসানের পাণ্ডুর মুখের দিকে তাকিয়ে আমি বললাম, না, তুমি সুস্থ হয়ে না ওঠা পর্যন্ত আমি আর গ্রামে ফিরে যাব না।

হাসান কি একটু আশার আলো দেখতে পেয়েছিল আমার কথার মধ্যে? হয়তো পেয়েছিল। তাই বলল, এবার আমিও তোমার গ্রামের বাড়িতে যাব।

হাসান আগে বেশ কয়েকবার আমাদের গ্রামের বাড়িতে গেছে। আমাদের পরিবারের সকলের সঙ্গেই ওর মধুর সম্পর্ক। গ্রাম থেকে ফিরে আসার পর হাসান অভিমানী কণ্ঠে বলেছিল, 'তোমার মতোই আমিও ভাবছি আমার গ্রামের বাড়িতে ফিরে যাব। ঢাকা আমার আর ভালো লাগছে না। গ্রামের বাড়িতে ফিরে গিয়ে পুকুর পাড়ে একটি ছোট্ট কুঁড়েঘর বানিয়ে তার মধ্যে আমি থাকব একা। কবিতা লিখব। মা থাকবে, বোন থাকবে। ...' তাঁর পাশে কোনো প্রেমিকার কথা সে আর কেন জানি ভাবতে পারছিল না। আমি বললাম, ঠিক আছে যাবে, আগে তো তুমি সেরে ওঠ।

হাসান বলল, তুমি তো এখনও মহাদেবের বাসাতেই থাকছ, তাই থাক। ঐ মেসে আর ফিরে যেয়ো না। একদিন সময় করে নীলা বৌদিকে নিয়ে এসো। খুব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেখতে ইচ্ছে করে। বলবে রান্না করে কিছু নিয়ে আসতে। তীর্থ (মহাদেবের ছেলে তীর্থ তখন মাত্র এক বছরের) ভালো আছে? আমি বললাম, হ্যাঁ, ভালো আছে। আমি উঠে যাচ্ছিলাম। হাসান আমাকে নীলার কথা আবার স্মরণ করিয়ে দিল।

রাতে বাসায় ফিরে গিয়ে আমি আর মহাদেব রেডিও নিয়ে বসলাম খবর শোনার জন্য। এভাবেই আমাদের সময় কাটে। বিভিন্ন রেডিওর খবর শুনি এবং প্রাপ্ত খবরের ভিত্তিতে পরিস্থিতি পর্যালোচনা করি। তখন আমাদের নাওয়া-খাওয়ার কোনো ঠিক নেই। নানা রকমের দুশ্চিন্তার মধ্যে আমাদের সময় যে কীভাবে কেটে যায়, তা বুঝতেই পারতাম না। আজিমপুরে আমাদের পাশের গলিতেই থাকতেন আবুল মঞ্জুর। তিনি তখন খুব সম্ভবত ব্রিগেডিয়ার ছিলেন। গভীর রাতে কার্ফ্যুর মধ্যে গলির ভিতরে তাঁর গাড়ি আসত। আমরা ভয়ে ভয়ে থাকতাম; এই বুঝি সেনাবাহিনীর জীপ এলো আমাদের তুলে নিয়ে যেতে। পরে জেনেছিলাম, গভীর রাতে মঞ্জুর বাসায় ফেরেন। তাতে আমাদের ভয় কিছুটা কাটে। হাজার হলেও তিনি আমাদের পাড়ার মানুষ। বিপদে আপদে সাহায্য পাওয়া যাবে।

শেষ পর্যন্ত তাহেরের নেতৃত্ব কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়, তা দেখার জন্য কিছুটা উদগ্রীব ছিলাম। দুপুরে রেডিও অফিসে গিয়ে শুনে এসেছিলাম, মোশতাককে তিনি জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দিতে দেননি। শুনেছিলাম, তাহের তাকে পায়খানার মধ্যে আটকে রেখেছিলেন। কিন্তু রাতে যখন জিয়ার পর তিনিও জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন, তখন বুঝলাম এই যুদ্ধে তাহেরও হেরে গেছেন। তাঁর সিপাহী বিপ্লবটিও ব্যর্থ হয়েছে। তাই ব্যক্তিগতভাবে কর্নেল তাহেরের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানালেও, জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণে জিয়া তাহেরের নাম একবারের জন্যও উল্লেখ করেননি। জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ভাষণে জিয়া বলেন :

> 'প্রিয় দেশবাসী, আসসালামু আলাইকুম।
>
> আমি মেজর জেনারেল জিয়া বলছি : বর্তমান পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের জনগণ, সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী, বিমান বাহিনী, বিডিআর, পুলিশ, আনসার এবং অন্যান্যদের অনুরোধে আমাকে সাময়িকভাবে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের চীফ মার্শাল ল এডমিনিস্ট্রেটর ও সেনাবাহিনী প্রধান হিসেবে দায়িত্বভার গ্রহণ করতে হয়েছে। এ দায়িত্ব ইনশাআল্লাহ আমি সুষ্ঠুভাবে পালন করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করব। আপনারা সকলে শান্তিপূর্ণ-ভাবে যথাস্থানে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করুন। দেশের সর্বস্থানে, অফিস-আদালত, যানবাহন, বিমান বন্দর, নৌবন্দর ও কলকারখানাগুলি পূর্ণভাবে চালু থাকবে। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন। খোদা হাফেজ। বাংলাদেশ জিন্দাবাদ।'

(সূত্র : দৈনিক বাংলা, ৮ নভেম্বর ১৯৭৫)।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জিয়ার ভাষণের পরপরই খালেদের হাতে ক্ষমতা হারানো খন্দকার মোশতাকও জাতির উদ্দেশ্যে একটি সংক্ষিপ্ত ভাষণ প্রদান করেন। তিনি অত্যন্ত কৌশলের সঙ্গে তাঁর ভাষণে ৩ তারিখের জেল-হত্যার দায় এড়াবার উদ্দেশ্যে তাঁর সরকারকে '১৫ আগস্ট থেকে ২ নভেম্বর পর্যন্ত বিদ্যমান সরকার' বলে অভিহিত করেন। তাঁর অন্তিম ভাষণে তিনি জেনারেল ওসমানীর ভূমিকাকে মূল্যায়ন করেন এভাবে :

> 'আমার প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা এম এ জি ওসমানীর সংকটকালীন এক ঐতিহাসিক ভূমিকা পরিসমাপ্ত হয়েছে। দৃঢ় চরিত্রের অধিকারী এই কর্মবীর যা করেছেন তার জন্য আমরা কৃতজ্ঞ।'

খালেদ মোশাররফ কর্তৃক মনোনীত রাষ্ট্রপতি বিচারপতি আবু সাদাত মুহম্মদ সায়েম আগের দিন রাতে (৬ নভেম্বর) জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দিয়েছিলেন।

৬ নভেম্বর রাষ্ট্রপতি সায়েম জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণে বলেছিলেন :

> 'গত ১৫ আগস্ট কতিপয় অবসরপ্রাপ্ত এবং চাকুরিরত সামরিক অফিসার এক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ও তাঁর পরিবার পরিজনকে হত্যা করে। জনাব খন্দকার মোশতাক আহমদ রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণ করে সামরিক আইন জারী করেন। প্রকৃতপক্ষে এই ঘটনার সঙ্গে সামরিক বাহিনী সংশ্লিষ্ট ছিলো না।'

(সূত্র : দৈনিক বাংলা, ৮ নভেম্বর ১৯৭৫)

খালেদের অভ্যুত্থান ব্যর্থ হয়ে যাবার পর, মনে হয়েছিল স্বাভাবিকভাবেই অতঃপর তিনি ক্ষমতা ছেড়ে দেবেন। জিয়া তাঁকে আর রাখবেন না। আর জিয়া তাঁকে রাখতেও চান, তিনিই থাকতে চাইবেন না। কিন্তু না, তিনি অপরিবর্তিত থেকে গেলেন। মাত্র ২৪ ঘন্টার ব্যবধানে পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে, ভোল পাল্টিয়ে, তিনি আবার বেতার-টিভির সামনে এসে উপস্থিত হলেন জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দিতে। আমরা অত্যন্ত কৌতূহল নিয়ে তাঁর কৌতুকময় দ্বিতীয় ভাষণটি শুনলাম। আগের দিন খালেদের জোরে তিনি যে-প্রেসিডেন্টকে হটিয়ে দিয়ে ক্ষমতায় এসেছিলেন, পরদিন ক্ষমতায় থাকতে দেয়ার কৃতজ্ঞতায় গদগদ হয়ে তিনি সেই ক্ষমতাচ্যুত খুনি প্রেসিডেন্ট খোন্দকার মোশতাকের ভূয়সী প্রশংসা করে যে ভাষণটি প্রদান করেন তা ছিল নিম্নরূপ :

> 'বিসমিল্লাহের রাহমানের রাহীম।
>
> প্রিয় দেশবাসী ভাই ও বোনেরা, আসসালামু আলাইকুম।'
>
> 'গত রাতে আপনাদের উদ্দেশ্যে দেয়া ভাষণে কি পরিস্থিতিতে আমার প্রেসিডেন্টের দায়িত্বভার গ্রহণ করতে হয়েছে— তার কিছুটা আভাস দিয়েছি। প্রেসিডেন্ট পদে খোন্দকার মোশতাক আহমদের পুনর্বহাল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

> হওয়ার পক্ষে স্বতঃস্ফূর্ত দাবি সত্ত্বেও তাঁরই অনুরোধক্রমে আমি প্রেসিডেন্টের দায়িত্বভার চালিয়ে যেতে সম্মত হয়েছি। খোন্দকার মোশতাক আহমদের দেশব্যাপী জনপ্রিয়তা সত্ত্বেও তিনি ক্ষমতা হস্তান্তরের যে মহান দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন, তা যে কোনো উন্নয়নশীল দেশে বিরল এবং সেই দেশের জনগণের জন্য গর্বের বিষয়। ....'

খালেদ মোশাররফের অভ্যুত্থানটি কি তবে ব্যর্থ হলো? তাঁর আত্মদান বিফলে গেল? বাংলাদেশের রাজনীতিতে এর কি কোনো সদর্থক ভূমিকা ছিল না? আমি বলব, না ব্যর্থ হয়নি। খালেদ মোশাররফ তিনটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে যেতে সক্ষম হয়েছিলেন।

১। খোন্দকার মোশতাক আহমদ ও তাঁর তথাকথিত 'সূর্যসন্তান'দের ক্ষমতাচ্যুত করে বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িতদের (আত্মস্বীকৃত খুনিদের) দ্বারা শাসিত হওয়ার গ্লানির হাত থেকে তিনি আমাদের বাঁচিয়েছিলেন।

[পরবর্তীকালে বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে পরোক্ষভাবে জড়িতদের দ্বারা শাসিত হওয়াটা তুলনামূলকভাবে ভালো ছিল কিনা— তা অবশ্য ভিন্ন বিচার্য বিষয়।]

২। তিনি জেল-হত্যার বিচারের লক্ষ্যে বিচারপতি আহসানউদ্দিন চৌধুরী ও বিচারপতি কে এম সোবহানের নেতৃত্বে একটি তদন্ত কমিশন গঠন করেছিলেন। কারা, কীভাবে জেলের ভিতরে চার জাতীয় নেতাকে হত্যা করেছে— তা তদন্ত করার পাশাপাশি ৩ তারিখের সন্ধ্যায় কী পরিস্থিতিতে দুষ্কৃতকারীদের দেশত্যাগ করতে দেয়া হয়েছে— তাও ঐ তদন্ত কমিশনের বিচার্য বিষয় হিসেবে গৃহীত হয়েছিল।

৩। ১৫ আগস্টে বর্বর হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর সরকারকে উৎখাত করার ষড়যন্ত্রের সঙ্গে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে আমাদের সামরিক বাহিনী যে যুক্ত ছিল না, এই অতীব গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণাটিও তিনি তাঁর নিযুক্ত রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সায়েমের মাধ্যমে জাতি ও বিশ্বকে অবহিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

প্রকৃত প্রস্তাবে, প্রথমে জাতির জনককে সপরিবারে ও পরে জেলের ভিতরে বন্দি চার জাতীয় নেতাকে হত্যা করার কলংকের হাত থেকে সেদিনই আমাদের সেনাবাহিনী মুক্তি লাভ করেছিল। এটা ছিল খালেদের একটা খুবই বড় কৃতিত্ব।

আমার লেখাটি এখানেই শেষ হতে পারত। কিন্তু পারল না। পারল না এই জন্য যে, আমি লেখার শুরুতেই বলেছিলাম, নভেম্বর মাসটি ব্যক্তিগতভাবে আমার জন্য ছিল আরও বেশি ঘটনাবহুল। ঐ মাসটি আমার কাছে কেন বেশি ঘটনাবহুল ছিল, তা বলার জন্যই আমাকে আরও কয়েকটা পাতা লিখতে হচ্ছে।

৮ নভেম্বর তারিখে আমরা জানতে পারি, ৭ নভেম্বরের সকালে বিপ্লবী সিপাহীরা ঢাকা টেলিভিশনের ভিতরে ঢুকে টিভির কর্মাধ্যক্ষ জনাব মনিরুল আলম,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রধান হিসাবরক্ষক জনাব আকমল হোসেন ও টিভির প্রশাসনিক কর্মকর্তা জনাব সিদ্দিক সাহেবকে গ্রেফতার করে; পরে ঐ গ্রেফতারের প্রতিবাদ করতে গিয়ে আলোকচিত্রগ্রাহক ফিরোজ চৌধুরীও সেনাবাহিনীর হাতে গ্রেফতার হন। সারাদিন তাঁদের টিভিতে আটক রাখার পর সন্ধ্যার দিকে চোখ বেঁধে তাঁদের অজানা স্থানের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হয়। তারপর থেকে তাঁদের আর সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না। ভারতের দালাল হিসেবেই তাঁদের চিহ্নিত করা হয়েছিল বলে লোকমুখে শুনতে পাই। তাঁরা নিহত হয়েছেন বলে তখন খবর রটে।

উন্মত্ত সিপাহীরা সেনাবাহিনীকে অফিসারমুক্ত করার নামে বেশ কিছু সংখ্যক সামরিক অফিসারকেও গুলি করে হত্যা করেছে বলে খবর পাওয়া যায়। ঐসব রোমহর্ষক সংবাদ শোনার পর সিপাহী বিপ্লবের ভয়ে আমার ও মহাদেবের হৃৎকম্প বেড়ে যায়। আকমল সাহেবের স্ত্রীর সঙ্গে আমার খুব ভালো সম্পর্ক ছিল। তিনি ছিলেন আমাদের দেশের প্রথম মহিলা ইঞ্জিনিয়ারদের একজন। মাত্র কিছুদিন হয় বিয়ে হয়েছিল তাদের। ওদের দুর্ভাগ্যের কথা ভেবে আমার খুব কষ্ট হতে থাকে; কিন্তু মুখ বুজে কষ্টকে বুকের মধ্যে বহন করা ছাড়া তখন আমার আর কিছুই করার থাকে না। আমার ঘুম আসে না। অজস্র চিন্তা এসে মাথার ভিতরে ভিড় করে। আমি আমার চারপাশে আততায়ীর তপ্ত নিঃশ্বাস শুনতে পাই। প্রিয়জনদের সঙ্গে সঙ্গে আমিও মনে মনে নিহত হতে থাকি।

হাসানের অবস্থা ভালো নয়। শ্বাস নিতে খুবই কষ্ট হচ্ছে। হৃৎপিণ্ডের নষ্ট হয়ে যাওয়া বাল্ব দুটো ক্রমশ আরও খারাপ হতে চলেছে। শীত পড়াতে শ্বাসকষ্টের সঙ্গে কাশিটাও এসে যুক্ত হয়েছে। সুরাইয়া আমাকে জানাল, এখন কাশির সঙ্গে একটু একটু রক্তও যাচ্ছে। ডাক্তাররা খুব একটা আশা দিতে পারছেন না। তবু পিজির ডাক্তাররা চিকিৎসা চালিয়ে যাচ্ছেন যথাসাধ্য। আমরা সকাল-বিকাল হাসানের কাছে যাচ্ছি। ওকে সঙ্গ দিয়ে যতটা সম্ভব অসুখের যাতনা ভুলিয়ে রাখার চেষ্টা করছি। ওর শয্যাপাশে বন্ধুবান্ধব আর অনুরাগীর ভিড় লেগেই আছে। সন্ধানী প্রকাশনী থেকে হাসানের নতুন কবিতার বই 'পৃথক পালংক' বেরিয়েছে। লাইনোতে ছাপা। কাইয়ুম চৌধুরীর আঁকা চমৎকার বাইকালার প্রচ্ছদ। প্রচ্ছদে একটি পুরনো দিনের পালংকের ছবি। চার ফর্মার কবিতার বইটি হাতে নিয়ে হাসান সারাক্ষণ নাড়াচাড়া করছে। বারবার পড়ছে কবিতাগুলো। এ বইয়ের অধিকাংশ কবিতাই অসুখ আর মৃত্যুর বিষাদময়তা দিয়ে মোড়া। আগের দুটো কাব্যগ্রন্থের তুলনায় এই বইয়ের কবিতাগুলো ভিন্ন স্বাদের হয়েছে। হাসান বইটি কোনো মন্তব্য ছাড়াই উৎসর্গ করেছে ওর কবি-বান্ধবী সুরাইয়া খানমকে। আমি হাসানের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছি এবং এ বইয়ের কবিতাগুলো যে খুবই ভালো হয়েছে, তা বলেছি। হাসান আমার প্রশংসা শুনে খুশি হয়েছে। হাসান ওর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'যে তুমি হরণ করো'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমাকে উৎসর্গ করেছিল। আমি আমার প্রথম বইয়ে হাসানকে একটি কবিতা উৎসর্গ করেছিলাম। কিন্তু কোনো বই উৎসর্গ করা হয়নি। হাসানকে বললাম, আমি আমার পরের বইটি তোমাকে উৎসর্গ করব। বইটির কিছু কবিতা লেখা হয়ে গেছে। আগামী ফেব্রুয়ারির মধ্যে বাকি কবিতাগুলো লিখে ফেলব। হাসান বলল, তোমার 'চৈত্রের ভালোবাসা' বইটা আমাকে দিতে পারতে। আমি লজ্জা পেলাম। বললাম, তোমার এই বইটির মতোই ওই বইটা ছিল মৈত্রেয়ীকে নিয়ে লেখা, কিছু কবিতা ছিল পূরবীকে নিয়ে। তাই ওটা তোমাকে দিইনি। এবার আর মিস হবে না। হাসান হাসল। আমি বুঝতে পারলাম, ঐ হাসির মধ্যে স্বস্তি এবং আনন্দের চাইতে অভিমানের পরিমাণটাই বেশি ছিল। কিন্তু আমার তখন কিছুই করার ছিল না। আমি যে ইতোমধ্যেই বিলম্ব করে ফেলেছি, তা তখন কেমন করে বুঝব। হাসান যে আমাকে ঢাকায় ফিরে আসার আহ্বান জানিয়ে নিজে অসুস্থ হয়ে পড়বে এবং তাঁর জীবন সংশয় দেখা দেবে— তা আমি কেমন করে জানব?

আজ ১১ নভেম্বর। সকালের দিকে বাসা থেকে বেরিয়েছি। রয়েলটির টাকা উদ্ধার করার জন্য বাংলাবাজারে প্রকাশকদের কাছে যাব। হাতে টাকা নেই একেবারে। ঢাকায় আসার পর থেকে মহাদেবের ওপর খাচ্ছি। 'পূর্বদেশ' (অবজারভার হাউস থেকে প্রকাশিত বাংলা দৈনিক) বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে মহাদেবও প্রায় বেকার। বাকশাল গঠনের পর সরকারি সিদ্ধান্তে চারটি কাগজ রেখে বাকি সব কাগজ বন্ধ হয়ে যাবার কারণে তখন পূর্বদেশও বন্ধ হয়ে যায়। বন্ধ হয়ে যাওয়া কাগজের সাংবাদিকরা তখন তাঁদের মোট বেতনের একটা অংশমাত্র পায়। পুরোটা পায় না। বন্ধ হয়ে যাওয়া কাগজের অনেক সাংবাদিককে তখন সরকারি চাকরি দেয়া হয়েছিল। মহাদেব সরকারি চাকরি নেয়নি। ফলে তাকে বেশ অর্থকষ্টের মধ্যেই দিনাতিপাত করতে হচ্ছিল। বাংলাবাজারে আমার বইয়ের প্রকাশকদের কাছে যাবার সময় ভাবলাম, কিছু টাকা দিয়ে যদি মহাদেবকে সাহায্য করা যায় তো ভালো হবে। হাসানের জন্যও কিছু ফলটল কিনে নিয়ে যেতে পারব।

সারাদিন বাংলাবাজারে কাটিয়ে, বিউটি বোর্ডিং-এ দুপুরের খাওয়া সেরে পড়ন্ত বিকেলের দিকে আমি বাংলাবাজার থেকে পিজির উদ্দেশে ফিরে আসি। নীলাকে যে পিজিতে নিয়ে যাব বলে বসিয়ে রেখে এসেছিলাম, তা আমার একদম মনেই ছিল না। এই লেখাটি লিখতে শুরু করার পর সম্প্রতি নীলা আমাকে এ-তথ্যটি জানিয়েছে। শুনে আমারও মনে পড়ল।

রিকশা করেই আমি পিজির গেটে আসি। রিকশা থেকে নেমে ভিতরে ঢুকতে যাব— এমন সময় আমার চোখে পড়ল— রিসেপশনের সামনের ছাদের নিচে একদল মিলিটারি অপেক্ষা করছে। দূর থেকে মিলিটারি জিপ দেখলেই ভয়ে আমার বুক কাঁপে। এখন দেখছি একেবারে আমার চোখের সামনে। অপেক্ষমাণ। কে জানে কার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জন্য অপেক্ষা করছে এই মিলিটারি জিপ? আমার জন্য নয় তো? আমার ভয়টাই আজ সত্য হবে না তো! জলপাই রঙের জিপটি রয়েছে সামনে। তার পেছনেই একটি জলপাই রঙের বড় পিকআপ ভ্যান। জিপে একজন সামরিক অফিসার বসে আছেন, তার পাশে একজন ড্রাইভার। পিক-আপটিতে দশ বারোজন সশস্ত্র জোয়ানের একটি দল। তাদের ভাবসাব দেখে মনে হয় তারা কারও জন্য অপেক্ষায় আছে। হাসপাতালে ঢুকতে গেলে ওদের সামনে দিয়েই আমাকে যেতে হবে। তাই আপাতত হাসপাতালে না-ঢোকার সিদ্ধান্ত নিয়ে আমি গেট-সংলগ্ন নাহিদ স্টোরের সামনে গিয়ে দাঁড়ালা।। আমি যে ভয় পেয়ে গেছি মিলিটারিদের দেখে, তা যথাসম্ভব গোপন করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে থাকি। আমি মিলিটারিদের দিকে পেছন দিয়ে নাহিদ স্টোর থেকে এক খিলি পান নিই। ইচ্ছা করেই বিলম্ব করতে থাকি, যাতে এর মধ্যে মিলিটারিরা চলে যায়। আমি তাদের চলে যাবার জন্য সময় দিই। পান মুখে পুরে কিছুক্ষণ পর একটু কালো জরদা চাই। পানের বোঁটা হাতে নিয়ে আমি চুনের সন্ধান করি। পকেটে খুচরো পয়সা থাকার পরও আমি একটি পাঁচ টাকার নোট বাড়িয়ে ধরি দোকানির উদ্দেশ্যে। তাতে বেশ কিছুটা সময় কাটানো সম্ভব হয়। শুধু এক খিলি পান খাবার জন্য আমি যে এতটা সময় নিচ্ছিলাম সেজন্য দোকানিটি যে খুব বিরক্ত হচ্ছিল আমার ওপর, —তা আমি বেশ বুঝতে পারছিলাম। কিন্তু আমি কেন এরকম করছিলাম, ঐ দোকানিটি তা বুঝতে পারল কিছুক্ষণ পর; যখন মিলিটারিরা তাদের অফিসারের নির্দেশমতো পিকআপ থেকে নেমে আমাকে পেছন থেকে ঘিরে ফেলল। আমি দোকানির হঠাৎ ভড়কে যাওয়া বিকৃত চেহারা দেখেই বুঝতে পারলাম, আমাকে চারপাশ থেকে মিলিটারিরা ঘিরে ফেলেছে। তখন পাঁচ টাকার অবশিষ্টটা ফেরত দেয়ার উদ্দেশ্যে আমার দিকে প্রসারিত দোকানির হাতটি ভয়ে ফ্রিজ হয়ে যায়। আমার পক্ষেও হাত বাড়িয়ে অবশিষ্ট টাকাটা আর ফিরত নেয়া হয়ে ওঠে না। সামরিক অফিসারের স্টিকের গুঁতো খেয়ে আমি তড়িৎগতিতে তার দিকে এমনভাবে ফিরে দাঁড়াই, যেন এতক্ষণ আমি এসবের কিছুই টের পাইনি। আমি যেন এই ভুবনের কেউ নই।

মিলিটারিদের এ্যাকশনের মধ্যে এমন একটি ভাব ফুটে ওঠে, যেন তাঁরা একজন খুব দুর্ধর্ষ আসামিকে গ্রেফতার করতে চলেছেন। যেন এ-সময়ে আমি এখানে আসব–এমন একটা পাকা ইনফরমেশন পেয়েই তারা এখানে এসেছিলেন। মনে হলো দীর্ঘ অপেক্ষার পর তারা তাদের প্রার্থিত আসামিটিকে খুঁজে পেয়েছে। এখন তাকে ধরবার পালা। আমি আমার চেহারার মধ্যে যতদূর সম্ভব নির্বিকার ভাবটি বজায় রাখার চেষ্টা করি। খুব বিনীত ভঙ্গিতে আমার বগলের নিচে চেপে ধরা বইয়ের প্যাকেটটি হাতে নিতে চাই। তখন ঐ অফিসার আমার বইয়ের প্যাকেটটি ছিনিয়ে নেবার জন্য প্যাকেটটি ধরে আচমকা জোরে টান দেন। তাতে আমার প্যাকেটের ভিতর থেকে একটি বই মাটিতে পড়ে যায়। বইটির নাম— 'প্রেমাংশুর রক্ত চাই'। আমি বইটি মাটি থেকে তুলতে গেলে তিনি আমাকে বাধা দেন। তিনি নিজেই বইটি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাতে তুলে নিয়ে বইয়ের পাতা উল্টাতে থাকেন। তার আগে তিনি বইয়ের প্রচ্ছদে ছাপা আমার প্রতিকৃতিতে চোখ বোলান। বইয়ের প্রথম কবিতা 'হুলিয়া'র ওপর চোখ রেখে প্রশ্ন করেন, আমিই নির্মলেন্দু গুণ কি-না। আমি তাতে কিছুটা স্বস্তি বোধ করি; ভাবি, আমার পরিচয় জানার পর নিশ্চয়ই আমাকে ছেড়ে দেয়া হবে। তাই কিছুটা আনন্দের সঙ্গেই বলি, জ্বি আমিই। আমার বন্ধু কবি আবুল হাসান এই হাসপাতালে। অসুস্থ, আমি তাঁকে দেখতে এসেছি। ঐ অফিসারটি আমার বইটি নিজের দখলে নিয়ে নেন। তাতে আমি খুশি হই। মনে করি, তিনি হয়তো কবির ভক্ত। আমার কবিতার বইটি হয়তো তাঁর পছন্দ হয়ে থাকবে। ভাবি, বইটি সঙ্গে থাকাতে ভালোই হলো।

আমি যখন ভাবছি তিনি এখন আমাকে হাসপাতালে যাবার অনুমতি দেবেন, তখনই জিপে উঠতে-উঠতে তিনি আমাকে পেছনের জোয়ানদের পিক-আপটিতে ওঠার নির্দেশ দেন। আমি তখন খুবই ভয় পেয়ে যাই। জীবনাশংকায় আমার মুখ শুকিয়ে আসে। গত ক'দিন ধরে সিপাহীদের আনরুলি অবস্থার যেসব খবর পেয়েছি, তাতে সিপাহীদের সঙ্গে উঠতে আমার পা একেবারেই নড়ছিল না। বিশেষ করে ৭ নভেম্বরের টিভি-হত্যাকাণ্ডের ঘটনার কথা আমার মনে পড়ে। এবার কি তবে আমার পালা? ভগবান জানেন। আমাকে ঐ জোয়ানদের হাতে ছেড়ে দিয়ে অফিসারটি যদি অন্য কোথাও চলে যান, তাহলে ওরা কি আমার প্রতি সুবিচার করবে? ভারতের দালাল সন্দেহে ওদের হাতেই হয়তো আমার মৃত্যু হবে। আমি শেষবারের মতো ঐ অফিসারটিকে অনুরোধ করে বলি, স্যার, প্লিজ আমাকে আপনার জিপে উঠতে দিন। তিনি আমার অনুরোধে কান না দিয়ে জিপে উঠেই তাঁর ড্রাইভারকে জিপ চালানোর নির্দেশ দেন। জিপটি চলতে শুরু করে। তখন পেছনের পিক-আপ ভ্যান থেকে নেমে আসা কয়েকজন জোয়ান, একটু আগে যাদের সঙ্গে উঠতে আমি আপত্তি জানিয়েছিলাম, আমাকে প্রায় চ্যাংদোলা করে তাদের গাড়িতে তুলে নেয়। পিক-আপে উঠে আমি একটি সিটের ওপর বসতে চেয়েছিলাম। তারা আমাকে নিচে বসবার জন্য বলে। আমি তাদের পায়ের নিচে লেটা দিয়ে বসি। তারা তাদের অস্ত্রগুলো আমার মাথা ও বুকের ওপর স্থাপন করে। আমি অসহায়ের মতো বাইরের দিকে তাকাই। লোকজন ঐ ঘটনাটি পথে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিল। আমি পথের মধ্যে একটি পরিচিত মুখের সন্ধান করি, যাতে আমার মিলিটারির হাতে ধরা পড়ার খবরটি তাকে জানাতে পারি। কিন্তু না, কোনো চেনামুখই আমার চোখে পড়ে না। আমি তখন মৃত্যুর জন্য মনে মনে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকি। হাসান এবং মহাদেবের প্রতি আমার খুব রাগ হতে থাকে। এদের চিঠি পেয়েই না আমি ঢাকায় ফিরে এসেছি। না হলে আমি তো আমার গ্রামেই থাকতাম। কী ভুলটাই না করলাম ! অনুশোচনায় আমার বুক ভেঙে কান্না আসে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমাকে পিক-আপে উঠাতে কিছুটা বিলম্ব হয়েছিল, তাই অফিসারের জিপটি কোন পথে অগ্রসর হয়েছে তা জানার জন্য পিক-আপের জোয়ানরা শাহবাগের মরা-ঝর্ণাটির কাছে দাঁড়িয়ে পথচারীদের সাহায্য নেয়। তখন পথচারীরা জানায় যে, ঐ জিপটি সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের ভিতরে পুলিশ কন্ট্রোল রুমের দিকে গেছে। জোয়ানরা তখন আমাকে নিয়ে পুলিশ কন্ট্রোল রুমের দিকে ছুটে যায়।

আমরা যখন ভিতরে প্রবেশ করি তখন সামরিক অফিসারটি কন্ট্রোল রুমে অবস্থানরত পুলিশদের প্রয়োজনীয় নির্দেশদান করে বেরিয়ে আসছিলেন। আমি তাঁর সঙ্গে কথা বলার জন্য তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হই। তিনি ইঙ্গিতে তাঁর জোয়ানদের কী একটা নির্দেশ দিয়ে দ্রুত বেরিয়ে যান। ভিতরে একজন পুলিশের এসপি বসেন। ঐ এসপিসহ বেশ ক'জন পুলিশ জোয়ানদের হাত থেকে আমার চার্জ বুঝে নেবার জন্য এগিয়ে আসেন। পুলিশের হাতে আমাকে তুলে দিয়ে জোয়ানরাও তাদের পিক-আপে উঠে দ্রুত বেরিয়ে যায়। আমি অসহায়ের মতো একা দাঁড়িয়ে থাকি। আমি বুঝতে পারি, আমাকে আপাতত পুলিশ কাস্টডিতে রেখে যাওয়া হচ্ছে। পরে আমাকে ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে যাওয়া হবে। কন্ট্রোল রুমের পুলিশরা আমার প্রতি খুবই সদয় ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় শরিফের ক্যান্টিনে আড্ডা দিয়েছেন, এমন দু'একজনকে সেখানেই পাই। তাঁরা সবাই আমাকে সাহস দেবার চেষ্টা করেন। বলেন, কবি সাহেব, আমাদের দিক থেকে আপনার কোনো ভয় নেই। আমরা আপনার কোনো ক্ষতি করব না। আমরা আপনার সম্পর্কে কোনো অভিযোগও পাইনি। তবে বোঝেনই তো। আমরা কিন্তু আপনাকে ছাড়তেও পারব না। তারা কেন আপনাকে ধরেছে, তা তারাই ভালো জানে। আপনার জন্য আমরা চিন্তিত।

পুলিশদের সহানুভূতিমূলক আচরণ ও তাদের কথা থেকে আমি বুঝতে পারছিলাম আমার ভবিষ্যত-চিন্তায় ঐ পুলিশ অফিসাররাও চিন্তিত। তখন এসপি সালাম সাহেব আমাকে সাহস দেবার জন্য একটি পুলিশের খাতা খুলে আমাকে দেখান। তাতে দেখলাম, আমাকে যিনি আটক করেছেন তার নাম লেখা আছে। তার নাম কর্নেল নোয়াজেশ আহমদ। অভয় দিয়ে এসপি সালাম সাহেব জানালেন, কর্নেল নোয়াজেশ সাহেব আমাকে পুলিশের হেফাজতে রেখে যাবার সময় লিখিতভাবে একটি নির্দেশ রেখে গেছেন পুলিশের জন্য— Do'nt misbehave with him. (উনার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করবেন না)। ঐ কথাটি পুলিশের খাতায় লিখে দিয়ে তিনি ইংরেজিতে তাঁর নাম স্বাক্ষর করেছেন। আগে রাগ করলেও, ঐ নির্দেশটা লিখে দিয়ে যাবার জন্য কর্নেল নোয়াজেশের প্রতি আমি খুবই কৃতজ্ঞ বোধ করি। ভেবে পাই না, এমন নির্দেশই যদি রেখে যাবেন, তাহলে তিনি আমাকে গ্রেফতারই বা করলেন কেন? আমি যে বঙ্গবন্ধুর ভক্ত, আমি যে অভ্যুত্থানে খালেদ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মোশাররফের সাফল্য কামনা করেছিলাম, তা তো তাঁর জানবার কথা নয়। সন্দেহবশত ধরলেনই যদি, তবে আবার আমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার না করার জন্য পুলিশের প্রতি লিখিত নির্দেশ দেবার কারণ কি? এই নির্দেশের অর্থ কি এই যে, এই কবির সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করতে হলে আমি বা আমরা করব, তোমরা পুলিশরা করো না? কী জানি! বিষয়টা আমার কাছে খুবই রহস্যজনক বলে মনে হতে থাকে। তিনি কি কারও কাছ থেকে আমার বিরুদ্ধে কোনো সুনির্দিষ্ট অভিযোগ পেয়েছিলেন?

পুলিশ আমাকে অভয় দিলেও আমি তাদের সম্পূর্ণভাবে আস্থায় নিলাম না। আমি প্রথম সুযোগেই পায়খানায় যাবার নাম করে, পায়খানার ভিতরে ঢুকে আমার বুক পকেটে রাখা দুটো চিঠি বের করলাম। একটি চিঠি ছিল আমার ভারতবাসী বড় ভাইয়ের লেখা। বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে আমার জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করে তিনি ঐ চিঠিটি লিখেছিলেন। অন্যটি আমেরিকা থেকে লিখেছিলেন পূরবী বসু। ঐ পত্রেও ছিল আমার জন্য উদ্বেগ। মহাদেবের বাসার ঠিকানায় চিঠি দুটো এসেছিল। আমি ভাবলাম, দেহতল্লাশি করে ঐ চিঠি দুটো পেলে আবার সমস্যা হতে পারে। তাই ঐ চিঠি দুটো আমি টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে টয়লেটের মধ্যে ফ্ল্যাশ করে দিলাম।

সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছে। আলো জ্বলে উঠেছে শহরে। ঐসব জ্বলে-ওঠা আলোর দিকে তাকিয়ে আমি ভাবি, আমার জীবনের আলো নিভতে না জানি আর কতক্ষণ বাকি! এসপি সালাম সাহেব আমাকে কন্ট্রোল রুম থেকে রমনা থানায় হস্তান্তর করার জন্য রমনা থানার ওসিকে একটি গাড়ি ও কিছু পুলিশ পাঠানোর জন্য ওয়ারলেসে ম্যাসেজ পাঠালেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই রমনা থানা থেকে এক গাড়ি পুলিশ চলে এলো। সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের পুলিশ-কর্মকর্তারা আমাকে ব্যথিত-মনেই বিদায় জানালেন। গাড়িতে উঠবার সময় আমার কানের কাছে এসে একজন বললেন, এই রাতটা যদি ভালোয় ভালোয় কেটে যায় তো বাঁচলেন। আচ্ছা, আপনাকে সাহায্য করতে পারেন, এমন কেউ কি আছেন আর্মিতে? আমার তখন আবার খালেদের কথাই মনে পড়ল। বললাম, না ভাই, যিনি ছিলেন তিনি নিহত হয়েছেন। একবার জেনারেল সি. আর. দত্তর কথাও মনে এসেছিল। কিন্তু তার নাম বলে, জানি, কোনো লাভ তো হবেই না বরং ঐ নামের কারণে আমার আরও বিপদ বাড়তে পারে।

আমি রমনা থানায় বেশ ক'জন পরিচিত পুলিশের দেখা পেলাম। আমি একসময় খুবই নিশাচর ছিলাম। তখন ঢাকার পথে তাদের সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটেছিল। তারা আমাকে নিয়ে বেশ চিন্তার মধ্যে পড়লেন। রমনা থানার দারোগা সাহেব আমাকে সম্মান দেখিয়ে তাঁর পাশেই একটি চেয়ারে বসিয়ে রাখলেন। আমি ভাবলাম আর্মির সঙ্গে নিশ্চয়ই তাঁর কথা হবে একসময়। কর্নেল নোয়াজেশ নিশ্চয়ই আমার কথা ভুলে যাবেন না। তিনি একটা নির্দেশ অবশ্যই দেবেন। তখন হয় তিনি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমাকে ছেড়ে দেবেন, না হয় আমাকে চোখ বেঁধে পাঠিয়ে দেবেন ক্যান্টনমেন্টে এবং সেখানেই আমার বিচার হবে। চার জাতীয় নেতা এবং খালেদ মোশাররফ ও তাঁর সহযোগীদের মতো হয়তো গুলি করে, বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে-খুঁচিয়ে হত্যা করা হবে আমাকেও। দারোগা সাহেব চাচ্ছিলেন যেন আমাকে আর্মি এসে নিয়ে যায়। তাহলে তিনি একটা উটকো ঝামেলা থেকে বাঁচেন। যখন তা হলো না এবং হবার আশাও কম বলে মনে হলো— তখন রাত বারোটার দিকে তিনি আমাকে বললেন, কবি সাহেব, আপনাকে হাজতে ঢুকাবো না বলে ভেবেছিলাম কিন্তু আর তো অপেক্ষা করা যায় না। এবার একটু কষ্ট করে ওখানেই চলে যান। ওখানে একটু কষ্ট হবে, তবে আমি বলে দিচ্ছি, অন্য আসামিরা আপনাকে বিরক্ত করবে না।

দারোগা সাহেব আমাকে হাজতে ঢুকিয়ে অন্য আসামিদের কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, তখন বেশ ক'জন আসামি সমস্বরে আমাকে স্বাগত জানিয়ে বলল, দাদাকে আমরা চিনি। উনি আমাদের গুরু। গুরু, আপনি এখানে কেন? ঐ সব আসামিদের সঙ্গে হাইকোর্ট প্রাঙ্গণে আমার পরিচয় হয়েছিল। ওরা মারফতী লাইনের সংসারত্যাগী মানুষ। হাইকোর্টে সিদ্ধি সেবন করে। আর মারফতী গান করে। ওদের পেয়ে আমার হাজতের ভয়টা একেবারেই কমে গেল।

দারোগা সাহেবও খুশি হয়ে বিদায় নিলেন। কর্নেল নোয়াজেশ সাহেবের ঐ নির্দেশটির মূল্য আবারও টের পেলাম রমনা থানার দারোগা সাহেবের আচরণে। তিনি হয়তো ভয় পাচ্ছিলেন, হাজতের ভিতরে ধরা পড়া দাগী আসামিরা যদি আমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে। হাজতের দাগী আসামিরা আমাকে সাদরে গ্রহণ করায় তিনি কিছুটা নিশ্চিন্ত মনে ঘরে ফিরতে পারলেন বলেই মনে হলো।

হাজতের ভিতরে ঢুকেই পরিচয় হলো কয়েকজন তরুণের সঙ্গে। এরা কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ে। জাসদ ছাত্রলীগ করে। জাসদ আহূত ১৮ নভেম্বরের জনসভার প্রচারকার্য চালানোর সময় বেবি ও মাইকসহ পুলিশ রাস্তা থেকে ওদের গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে এসেছে। ওরা কর্নেল তাহেরের ভক্ত ও অনুসারী। ওরা জিয়ার প্রতি খুবই ক্ষিপ্ত ছিল। বলল, 'জিয়াকে আমরা দেখে নেব। শালা বিশ্বাসঘাতক। আমরাই তাঁকে মুক্ত করেছি, আর এখন সে আমাদের জেলে পুরছে।'

'কী যাতনা বিষে বুঝিবে সে কিসে/কভু আশীবিষে দংশেনি যারে ...' কবিতার কথা আমার মনে পড়ল। ভাবলাম, ভালোই হয়েছে। কর্নেল তাহের আর জেনারেল জিয়ার সমর্থকরা একসঙ্গে মিলতে পারলে বঙ্গবন্ধুর অনুসারীদের বিপদ আরও বাড়ত।

নোয়াজেশের তাঁবুতেই যে খালেদের মৃত্যু হয়েছিল তা তখন আমি জানতাম না।

১১ তারিখেই জেনারেল জিয়াউর রহমান দ্বিতীয়বারের মতো জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ প্রদান করেন। তিনি তাঁর অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ ভাষণে বলেন :

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

> 'আমি রাজনীতিবিদ নই। আমি একজন সৈনিক। কতিপয় মহলের বিভিন্ন প্রচারণার সঙ্গে আমার নাম জড়িত দেখে আমি বিস্মিত হয়েছি। আমি পরিষ্কারভাবে বলে দিতে চাই যে রাজনীতির সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই এবং আমাদের সরকার সম্পূর্ণ নির্দলীয় ও অরাজনৈতিক।'

(জাসদের ডাকা ১৮ তারিখের জনসভায় কর্নেল তাহেরসহ জাসদ নেতাদের সঙ্গে জেনারেল জিয়াও ভাষণ দেবেন বলে তখন জাসদের পক্ষ থেকে প্রচার করা হচ্ছিল। রমনা থানায় আনীত জাসদ ছাত্রলীগের কর্মীদের ঐরূপ প্রচার চালানোর সময়ই রাস্তা থেকে তাদের গ্রেফতার করা হয়। সভাটি হওয়ার কথা ছিল বায়তুল মোকারম প্রাঙ্গণে।)

১১ নভেম্বরের ভাষণে জেনারেল জিয়া ১৫ আগস্টের রাজনৈতিক পট-পরিবর্তনকে সুকৌশলে সমর্থন করেন এভাবে :

> 'গত ১৪ আগস্ট পর্যন্ত আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর দুরবস্থা সম্পর্কে আপনারা অবগত আছেন। স্বাধীনতার পর ঐদিন পর্যন্ত যে সরকার অধিষ্ঠিত ছিল সশস্ত্র বাহিনীর প্রতি তাদের অবহেলার ফলে... ।'

[সূত্র : দৈনিক বাংলা, ১৩ নভেম্বর ১৯৭৫]

এ রকম একটি জীবন-মরণ সংকটের মধ্যে নিজেকে জড়িয়ে ফেলার জন্য নিজেকেই দায়ী বলে মনে হতে থাকে আমার। আমার মনে এরকম বিশ্বাস কাজ করতে থাকে যে, আজকের এই পরিস্থিতিটিকে আমিই ইনভাইট করেছি। এখন এর মূল্য তো আমাকে দিতেই হবে। আমার জন্য তখন ঘুম অবাস্তব কল্পনা। তবু হঠাৎ কি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম আমি কিছুক্ষণের জন্য? কী জানি! একটু আগে তন্দ্রার ভিতরে আমি একটি স্বপ্ন দেখছিলাম। কে যেন আমাকে বলছে : "১৫ আগস্টের হত্যাকাণ্ডটি নিঃসন্দেহে খুবই বর্বর, খুবই নির্মম এবং নিষ্ঠুর একটি ঘটনা। পৃথিবীর ইতিহাসে এর কোনো তুলনা নেই। এমনকি পৃথিবীর কোনো কাব্যেও এ রকম নিষ্ঠুরতার সন্ধান পাওয়া যাবে না। তাই বলে, কবি হলেই তুমি এমন বিশেষ কে যে, ঐ ঘটনার পর তোমাকে এতটাই ভেঙ্গে পড়তে হবে; মানসিকভাবে এতটাই বিপর্যস্ত হতে হবে; লোকজনকে জানান দিয়ে তোমার মন খারাপ ভাবটিকে প্রকাশ করতে হবে; ঢাকাকে আর 'বাসযোগ্য নয়' বলে প্রকাশ্য ঘোষণা দিয়ে এই নগরী ত্যাগ করে গ্রামের বাড়িতে ফিরে যেতে হবে? বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে এতটা প্রেম দেখানোর মতো কোনো বাস্তব যুক্তি তোমার জন্য কি ছিল? তাঁর সঙ্গে তুমি এমনকি ব্যক্তিগতভাবে পরিচিতও ছিলে না। আসলে, তুমি তাড়িত হয়েছিলে তোমার পোয়েটিক ইগো দ্বারা। একটি বড় রকমের ট্রাজিক ঘটনা যে ঘটে গেছে, এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। অনেকেই তা স্বীকার করেন। প্রকাশ করার সুযোগ নেই বলে অনেকেই গোপনে ঐ ঘটনার বেদনা অনুভব করেছেন। কিন্তু তুমি অন্যদের মতো তোমার প্রতিক্রিয়া গোপন করতে চাওনি। শত্রুকে শাস্তি দেবার শক্তি তোমার ছিল না, যার ছিল যে

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অস্ত্র হাতে লড়তে ভারতে চলে গেছে। তুমি তো লড়তেও যাওনি। তোমার অস্ত্র হচ্ছে অভিমান। সেই অভিমানের অস্ত্রে নিজেকে উন্মাদে পরিণত করে, তুমি নিজেকে অন্যের চাইতে পৃথক প্রমাণ করার সুযোগ তৈরি করে নিয়েছ। এর সবটাই যে তোমার জ্ঞাতসারে ঘটেছে, তুমি পরিকল্পিতভাবে এগুলো করেছ, তা আমি বলব না, তবে তুমি নিশ্চয়ই অস্বীকার করবে না যে, কল্পনায় এই ঘটনার সঙ্গে কোনো-না-কোনোভাবে নিজেকে তুমি জড়িত করে দেখতে চেয়েছিলে। তোমার কবিস্বভাবের এই খুব ভেতরের গোপন চাওয়াটাই তোমার পরবর্তী আচরণগুলোকে নির্দিষ্ট করে দিয়েছিল। তাই গ্রামের বাড়ি থেকে ঢাকায় ফিরে এসেই তুমি যখন ৩ নভেম্বরের অভ্যুত্থানের মুখে পড়লে, তখন তুমি এমন একটা ভাব প্রকাশ ও প্রচার করতে চেয়েছ যে, তোমার অনুমোদন নিয়েই খালেদ মোশাররফ তাঁর অভ্যুত্থানটি ঘটিয়েছেন। তুমিই তাঁর গাইড-ফিলোসফার !"

"তোমার বিগত কিছুদিনের আচরণের মধ্য দিয়ে যে সংঘাত ও সংকটকে তুমি আহ্বান করেছ, আজ সেই সংকট তোমার জীবনে প্রবেশ করেছে। কর্নেল নোয়াজেশ তোমাকে গ্রেফতার করেছেন, কথাটা যত না সত্য, তার চেয়ে বড় সত্য হলো, কর্নেল নোয়াজেশকে তুমি তোমার গোপন ইচ্ছাপূরণের ফাঁদে পা দিতে বাধ্য করেছ। এমনকিছু ঘটুক, তুমি কি তা চাওনি? চেয়েছ। চেয়েছ। কিন্তু এখন যখন ঘটনা ঘটে গেছে তখন ঘটনার ভয়াবহতা আঁচ করে ভয় পাচ্ছ। এখন ভয় পাচ্ছ কেন? যে বিপদকে মনে মনে কামনা করেছিলে, সে এসেছে, এখন তাকে বীরের মতো স্বাগত জানাও। তুমি যে বঙ্গবন্ধুর কথা বল, তিনি তো তোমার মতো ভয় পাননি। তিনি তো যথার্থ বীরের মতো ফাঁসির দড়ি গলায় নিয়েও তাঁর বিশ্বাসের কথা বলেছেন। তাঁর ভালোবাসার কথা বলেছেন। তুমি ভয় পাও কেন? ভয় পেয়ো না, ওঠ, জাগো।"

স্বপ্নের ঘোর কেটে গেলে আমি দ্রুত উঠে বসলাম। বুঝতে পারলাম, আমি স্বপ্নমতো কিছু একটা দেখেছি। আমার গ্রামের শ্মশানবাসী জগা সাধুর শুভ্রশ্মশ্রুমণ্ডিত হাসিমাখা মুখখানি আমার মনের পর্দায় ভেসে উঠল। তবে কি তিনিই এই কথাগুলো আমাকে বললেন? তখন আমার ভিতরে বিভ্রম কাজ করছিল না। আমি স্পষ্টই অনুভব করতে পারছিলাম, আমি আগের চাইতে সাহসী। কোথা থেকে আমি যেন সাহস খুঁজে পাচ্ছি।

দেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ার সময় লক্ষ্য করেছি, কোনো অপরাধ না থাকলেও, জন্মগতভাবে হিন্দু হওয়ার কারণেই আমি নিজেকে একপর্যায়ে শাস্তিযোগ্য বলে ভাবতে শুরু করি। জন্মগতভাবে হিন্দু বা মুসলমান, শিখ বা খ্রিস্টান হওয়াটা যে আসলে কোনো অপরাধ নয়, হিংসার উন্মত্ততার ভিতরে পড়ে, তা আর তখন স্থির সত্য বলে আমার মনে হয় না। জীবন বাঁচানোর জন্মগত অধিকারবোধটি তখন ভিতর থেকেই কিছুটা শিথিল হয়ে পড়ে। ১৯৬৪-তে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা চলাকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে এসে আমি এ রকম উপলব্ধি করেছিলাম। তারপর, ১৯৭১-এ মুক্তিযুদ্ধ শুরু হয়ে যাওয়ার পটভূমিতে 'হিন্দু-শূন্য পাকিস্তান' গঠনের লক্ষ্যে পরিচালিত পাকবাহিনীর অঘোষিত শুদ্ধি-অভিযানের ছাত্রছায়ায় আমাদের আশপাশের গ্রামের একদল লুটেরা-মুসলমান যখন নির্বিবাদে আমাদের বাড়িঘর লুট করছিল, তখনও আমি ঐরকমের উপলব্ধির শিকার হয়েছিলাম। এই উপলব্ধিটি এমনই মারাত্মক একটি ব্যাপার যে, তখন মানুষ একটি তুচ্ছাতিতুচ্ছ পতঙ্গে পরিণত হয়। সে তার সকল প্রতিরোধ ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। প্রবল প্রতিপক্ষ তখন পতঙ্গ নিধনের মতো করেই দুর্বল প্রতিপক্ষকে নিধন করে। হত্যাকারীকেও মানুষ হত্যার বিবেকী দায় তখন আর বইতে হয় না।

শুধু ধর্মীয় সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতিতেই নয়, বিশ্বাসগত রাজনৈতিক মত-পার্থক্যের কারণেও দেশে যখন ঐ রকমের সংঘাতক্ষেত্র তৈরি হয়, তখনও বিজয়ী শক্তির হাতে পরাজিতরা কীটপতঙ্গবৎ নিহত হয়। ১৫ আগস্ট থেকে ৭ নভেম্বরের ঘটনাপুঞ্জ বিশ্লেষণ করে আমি এই ধারণায় উপনীত হলাম যে, জাতির জীবনে এখন সে রকম সময়ই উপস্থিত হয়েছে। আমি এখন আর কবি নির্মলেন্দু গুণ নই, আমি একজন কীট নির্মলেন্দু গুণ। আমি এখন একজন সামান্য পতঙ্গ। যাকে বুটের তলা দিয়ে মাড়িয়ে দিলেও কেউ আহা! এটা কী করলেন, বলে সামান্য আপেক্ষটুকুও এখন আর প্রকাশ করবে না।

৩ নভেম্বরের ভোর থেকে ৬ নভেম্বরের মধ্যরাত পর্যন্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রক্ষমতায় আসীন থেকেও খালেদ মোশাররফ যে তাঁর প্রতিপক্ষকে মুহূর্তের জন্যও কীটপতঙ্গের দৃষ্টিতে দেখেননি, এটি মানবিক দৃষ্টিকোণ বিচারে খুব বড়মাপের একটি বিষয় ছিল। ক্ষমতাদখলের দ্বন্দ্বে লিপ্ত হওয়ার পর, কোনো সামরিক অফিসার ইতিপূর্বে প্রতিপক্ষের সঙ্গে এমন মানবিক আচরণ করেছেন বলে মনে পড়ে না। এটি অবশ্যই খুব বড় একটি ঘটনা। হয়তো ঐ রকমের বড়মাপের একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে গিয়েই খালেদ ব্যর্থ হয়েছেন। যে দেশে ১৫ আগস্ট এবং ৩ নভেম্বরের জেল-হত্যার মতো নৃশংস ঘটনায় স্বাধীনতাযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী শক্তিটি ক্ষমতাচ্যুত হয়েছে, সেই দেশে কোনো রক্তপাতহীন সামরিক অভিযানের পক্ষে জয়ী হওয়া কখনই সম্ভব ছিল না এবং উচিতও নয়। খালেদ মোশাররফের মতো আপাত-ব্যর্থ একজন সমরনায়কের ভূমিকার মূল্যায়নে আমরা হয়তো এইরকমের একটি সরলীকৃত বিবেচনাকেই প্রাধান্য দিতে চাইব। বলব, ব্যাটা নিজে তো মরেছেই, আমাদেরকেও মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়ে গেছে। বলব, কী দরকার ছিল ঐরকমের একটি ধরি মাছ না ছুঁই পানির মতো শান্তিবাদী-অভ্যুত্থান ঘটানোর?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এক সময় খালেদকে নিয়ে আমি নিজেও এরকমই ভেবেছি। ভেবেছি, এই খালেদের জন্যই আজ আমার এই দুর্ভোগ। পরে মানুষের ঘুমিয়ে পড়ার কারণে রাত যখন খুব গভীর হয়ে আসে, যখন খুব ঘনঅন্ধকারে নিমজ্জিত হয় পৃথিবী, যখন এই মরণপৃথিবীর কোনো-কোনো মানুষের চোখে আলো এসে পড়ে অনেক দূরের কোনো গ্রহ থেকে; —যখন আমার দেহ মৃত্যুকে গ্রহণ করার জন্য বীরের মতো প্রস্তুত হয়, তখন হঠাৎ মনে হয় যে-কোনো মূল্যে নিজ-জীবনকে রক্ষা করার চেয়েও জগত-সংসারে এমনকিছু বড় বিষয়ও আছে, যার কাছে জীবনের মতো একটি বড় জিনিসকেও খুবই তুচ্ছ বলে মনে হয়। তাই তো হাসিমুখে জীবনদানের ঘটনা পৃথিবীতে খুব একটা কম ঘটেনি। আমাদের দেশেও অমন ঘটনা অনেক ঘটেছে। আমি নিজে ভীতু বলেই খালেদকে দুষেছি। আত্মস্বার্থে আমার দৃষ্টি অন্ধ থাকার কারণে আমি তাঁর রক্তপাতহীন ব্যর্থ-অভ্যুত্থানের সৌন্দর্যকে দেখতে পাইনি।

সেদিন রমনা হাজতে পুরোপুরি না কাটলেও, আজ ২১ বছর পর ঐসব দিনের কথা লিখতে বসে অনুভব করছি, এখন আমার চোখের ছানি অনেকটাই কেটেছে। তাই এতদিন পর আজ খালেদের বীরত্ব এমন করে আমার চোখে পড়ল। ৭২ ঘণ্টা ক্ষমতায় থেকেও খালেদের হাতে এক ফোঁটা রক্তও যে ঝরেনি; তাঁর উন্মত্ত হিংসার আগুনে তার প্রতিপক্ষ যে কীটপতঙ্গের মতো ভস্মীভূত হয়নি—এখানেই তিনি বড়। সবসময় বৈষয়িকভাবে জয়ী হওয়াটাই বড় কথা নয়। খালেদ হয়তো অন্যায়ের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে রক্তের সুবাস ছড়িয়ে, কুয়াশাঢাকা ভোরে শীতের শেফালির মতো ঝরে যাওয়াটাকেও মূল্যবান বলেই মনে করেছিলেন। সামান্য সময়ের পরিচয়ে, কবিতা প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়ে খালেদ আমাকে বলেছিলেন, তিনি কবিতা ভালোবাসেন। হয়তো কবির মতোই ভেবেছিলেন তিনি, 'যদি মরে যাই ফুল হয়ে যেন ঝরে যাই।'

খালেদ ঐ অভ্যুত্থানে জয়ী হননি বলেই তিনি ব্যর্থ, এমন চিন্তাকে আমি আজ আর সমর্থন করব না। আমি বলব, প্রতিপক্ষকে পতঙ্গের মতো নিধন করে জয়ী হওয়ার রাজনৈতিক ধারণাটিকেই তিনি তাঁর ঐ ব্যর্থ-অভ্যুত্থানের ভিতর দিয়ে চ্যালেঞ্জ করে গেছেন। তিনি এমন এক উচ্চতর মানবিক ধারণাকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন যে, শত্রু হলেও মানুষ মানুষই। কোনো অবস্থাতেই মানুষ কীটপতঙ্গ নয়। শত্রুকেও কীটপতঙ্গের মতো (১৫ আগস্ট ও ৩ নভেম্বরে যেমন ঘটেছে) হত্যা করাটা অন্যায়। জয়ী হওয়ার জন্য খালেদ এমন কাজ করেননি।

তাই খালেদের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে আগামী দিনের ইতিহাসবেত্তারা নির্দ্বিধায় এমন দাবি করতে পারবেন যে, খালেদ ছিলেন আপাদমস্তক মানবিক। খালেদের প্রতিপক্ষ ছিল বর্বর, নিষ্ঠুর এবং অমানবিক। মানবিকতার চর্চা করতে গিয়ে খালেদ তাঁর জীবন দিয়েছেন বটে, কিন্তু তার এ জীবনদান ব্যর্থ হয়নি। এই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মূল্যবান সত্যটি তিনি প্রমাণ করে যেতে পেরেছেন যে, ১৯৭১ সালে তিনি বর্বরতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন। বর্বরতার পক্ষে নয়। অনেকেই তা পারেনি। তারা সাময়িকভাবে জয়ী হলেও, শেষ-বিচারে তারা পরাজিত হয়েছেন। শুধু মানবিক ইতিহাসের বিচারেই নয়, রোজ হাসরের দিনে, মনে করি তা সর্বশক্তিমান আল্লাহর বিচারেও সত্য বলেই গণ্য হবে। খালেদ কাউকে খুন করেননি। এটা আমাদের অনেকের চোখ এড়িয়ে যাওয়া খুব বড় একটা ঘটনা।

রমনা হাজতে পাকা মেঝের ওপর হাত দুটোকে বালিশ বানিয়ে তার উপরে শুয়ে শুয়ে আমি আমাদের রক্তাক্ত ইতিহাসের পাতাগুলো উল্টেপাল্টে দেখছিলাম। আমি যে কেন এরকমভাবে এ-দেশের ইতিহাসের সঙ্গে জড়িয়ে পড়লাম ! আমি কি চাইলে অন্যরকম কবিতাও লিখতে পারতাম না? জীবনানন্দের মতো। হাসান যেমন লেখে। পারতাম। কিন্তু আমি যে কেন সুকান্তের মতো এত স্পষ্ট করে রাজনৈতিক বিষয়নির্ভর কবিতা লিখতে গেলাম? আমার বাবার কথা খুব মনে পড়ল। তিনি আমাকে ঢাকায় আসতে দিতে চাননি। আমার মৃত্যুর খবর পেয়ে বাবা কী কষ্টটাই না পাবেন। তাকেসহ আমার পুরো পরিবারটিকে এভাবে কষ্ট দেয়াটা কি আমার উচিত হলো? আমাকে ১৯৭১-এ ভারত থেকে যিনি বাংলাদেশে ফিরতে দিতে আগ্রহী ছিলেন না—আমার সেই বড় ভাই যখন জানবেন আমি নেই, তখন? ভুল হয়ে গেছে। খুবই ভুল হয়ে গেছে। শেষ পর্যন্ত আমি বেঁচে যাব, এমন ভাবনা আমার মনে তখন একেবারেই আসছিল না।

আমার প্রিয় পরমায়ুকে প্রসারিত করে দিয়ে একটি নিদ্রাহীন রজনীর অবসান হয়। পাখির কিচিরমিচির শব্দে মগবাজারে, রমনা থানার হাজতে ভোর আসে। আর কাকডাকা ভোরের দিকে আমাদের হাজতঘরটি পরিষ্কার করার জন্য একজন মেথরের আগমন ঘটে। তার নামটি আজ আর মনে নেই আমার। তখন জেনেছিলাম। আমি তার সঙ্গে কথা বলে তাকে একটা কাজ দিই। বলি, এই ঠিকানাটা তুমি তোমার কাছে রাখো। ঐ ঠিকানায় আমার এক বন্ধু থাকেন। উনার নাম মহাদেব সাহা। তুমি তার কাছে গিয়ে আমার কথা বলবে। বলবে আর্মি আমাকে ধরে এখানে রেখে গেছে। তিনি তোমাকে যাতায়াত ভাড়া ছাড়াও কিছু টাকা বখশিশ দেবেন। আমার কাছে বেশি টাকা নেই। এই টাকাটা রাখো। বলে তার হাতে পাঁচ টাকার একটা নোট গুঁজে দিই। বলি, পারবে তো? আমার চিরকুটটি লুকিয়ে কোমরের ভাঁজে গুঁজতে গুঁজতে লোকটি বলল, খুব পারব। আপনি কিচ্ছু চিন্তা করবেন না, বাবু।

লোকটি আমার চিরকুট নিয়ে বেরিয়ে গেলে আমার মনে একটু স্বস্তি ফিরে আসে এই ভেবে যে, অতঃপর মহাদেব আমার খবর জানতে পারবে। বাসায় না ফিরে যাওয়াতে মহাদেব ও নীলা নিশ্চয়ই আমার দুর্ঘটনার কথা আঁচ করতে পেরেছে। এতক্ষণ আমি ছিলাম আমার প্রিয়-পরিচিতিজনদের থেকে বিচ্ছিন্ন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভাবলাম, এই চিরকুটটি আমাকে আমার প্রিয়জনদের সঙ্গে যুক্ত করতে সাহায্য করবে। (ঐ লোকটি ঐ চিরকুট যথাসময় মহাদেবের বাসায় পৌঁছে দিয়েছিল এবং নীলার কাছ থেকে সংবাদ পৌঁছে দেবার বখশিশ হিসেবে একটি পঞ্চাশ টাকার নোট আদায় করেছিল বলে নীলা সম্প্রতি দাবি করেছে।)

সকালে হাজতিদের সবাইকে তন্দুর রুটি আর লাউ ভাজি খেতে দেয়া হয়। সকলের সঙ্গে মিলে আমিও তাই খেলাম। পেটের ভালোমন্দের কথা ভেবে আর লাভ নেই। দেহই যদি না থাকে, তো পেট ভালো রেখে আর লাভ কি? হাইকোর্টের মাস্তান-বন্ধুদের কারণে হাজতে সিগারেটের অভাব ছিল না। বিশেষ ব্যবস্থায় দারোগা সাহেবের নির্দেশে একটু চা-ও দেয়া হলো আমাকে।

এরই মধ্যে মহাদেব এসে থানায় হাজির। মহাদেবকে খুবই বিধ্বস্ত দেখায়। বুঝতে পারি রাতভর আমার মতোই মহাদেবের ওপর দিয়েও একটা বড় রকমের ঝড় বয়ে গেছে। আমাকে সপ্রাণ দেখতে পেয়ে মহাদেব খুবই স্বস্তিবোধ করল। মহাদেবকে দেখে আমিও হালে পানি পাই। বলি, দোস্ত, আমাকে যত তাড়াতাড়ি পারো এই নরক থেকে উদ্ধার করো। সারারাত কী টেনশনের মধ্যেই না কাটিয়েছি। থানা-হাজত-কারাগার কখনও কবির বাসস্থান হতে পারে না।

কিন্তু কী করা যায়, তা মহাদেবও যেমন ভেবে পাচ্ছিল না— আমিও তেমনি ভেবে পাচ্ছিলাম না। কাকে বললে কাজ হবে, কাকে বলা দরকার, কিছুই ঠিকমতো ভাবতে পারছিলাম না। পরে দু'জনের মিলিত পরামর্শ অনুযায়ী আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ এবং দৈনিক বাংলায় কবিদের শরণাপন্ন হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে মহাদেব বিদায় নেয়।

সকাল দশটার দিকে শুরু হয় হাজতিদের কোর্টে নিয়ে যাবার আয়োজন। নিয়ম হলো ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই হাজতিদের কোর্টে হাজির করতে হয়। সেখান থেকে কেউ খালাস হয়ে যায়, কেউ যায় কেন্দ্রীয় কারাগারে, কেউ আবার পুলিশ রিমান্ডে থানায় ফিরে আসে। আমি ভেবেছিলাম, আমাকে কোর্টে নেয়া হবে না। পরে যখন বুঝলাম আমাকেও কোর্টে নেয়া হবে তখন ভাবলাম, অন্য সব কম-গুরুত্বপূর্ণ আসামিদের যেভাবে কোমরে দড়ি দিয়ে লট বাঁধা হচ্ছে, আমাকে সে রকম করে বাঁধা হবে না। আমি আর্মির হাতে ধরা পড়া লোক। তা ছাড়া আমি একজন কবি। আমার একটা পৃথক মর্যাদা আছে। কিন্তু না, কিছুক্ষণের মধ্যেই একই রশিতে আমাকেও কোমর-পেঁচিয়ে শক্ত করে বাঁধা হলো। হাতে ঐ বিখ্যাত হ্যান্ডকাফ, খুব ছোটবেলা থেকে নাটকে-সিনেমায় যেগুলো দেখে আসছি। কোনোদিন হাতে ছুঁয়ে দেখিনি। আজ যখন আমার নিজের হাতেই আক্ষরিক অর্থে শোভা পেল, তখন আর না দেখে কী চলে? আমার দুই হাত একসঙ্গে বাঁধা। এক ধরনের থ্রিল অনুভব করলাম তাতে। আজ একটু ছেলেখেলার মতোই লাগে ঐদিনটির কথা ভাবতে— কিন্তু ঐদিন ঐ হ্যান্ডকাফগুলো নকল নয়, সত্যিকারের হ্যান্ডকাফই ছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের সবাইকে পুলিশ-ভ্যানে তোলা হলো। বিরাট ভ্যান। উপরের দিকে জালি কাটা। তাতে চোখ লাগিয়ে বাইরের লোকজনদের চলাচল দেখা যায়। আমরা সবাই ঐ জালিপথে চোখ রেখে বাইরের আকাশ-বাতাস, লোকজন, গাড়ি-রিকশা ও ঢাকার ব্যস্ত রাজপথ দেখতে-দেখতে চললাম পুরনো ঢাকায়, কোর্টে।

কোর্টে যাবার পর নিয়মমতো আসামিদের ছবি তোলার জন্য একটি নির্জন কক্ষে আমাদের নিয়ে যাওয়া হলো। আমিও গেলাম। সেখানে একজন একজন করে আসামির ছবি তোলা হচ্ছে। একসময় আমার ছবিও তোলা হলো। যিনি ছবি তুলছিলেন, তিনি আমাকে মুখটা সোজা করে দেবার ছল করে আমার কানের কাছে মুখ এনে বললেন, আমি আপনাকে চিনি। আমি বাংলা একাডেমীতে আপনার কবিতা আবৃত্তি শুনেছি। আপনার এই ছবির একটি কপি আমি আমার কাছে রেখে দেব। পরে আপনাকে দেব। এ কথা শুনে আমার খুব ভালো লাগল। বললাম, যদি বাঁচি তবে তো। আমাকে ওরা কোথায় নিয়ে যাবে, আপনি কি কিছু অনুমান করতে পারেন?

তিনি আমার সঙ্গে বেশি কথা বলতে সাহস পাচ্ছিলেন না। পুলিশ তাকে তাড়া দিচ্ছিল। তিনি দ্রুত ক্লিক ক্লিক করে পরপর আমার ফটো ছবি তুললেন। যাবার সময় আমি ঐ আলোকচিত্রশিল্পীকে বললাম, ভাই, আমি যদি আর না থাকি, তবে আমার এই শেষ-ছবিটা আপনি আমার পরিবারের কাছে পৌঁছে দেবেন। কবি মহাদেব সাহার কাছে পৌঁছে দিলেও চলবে। তিনি বললেন, আপনি ভাববেন না। আমি যতটা পারি মানুষজনকে আপনার খবর জানিয়ে দেব।

ছবি তোলার পর আমাদের নিয়ে যাওয়া হলো একজন হাকিমের এজলাশে। সেখানে পুলিশ আমাকে তিন দিনের রিমান্ড চাইলে, মাননীয় হাকিম পুলিশের দাবি মেনে নিয়ে আমাকে রমনা থানার হাজতে ফিরে যাবার নির্দেশ দিলেন। তিনি আমাকে ভালো করে তাকিয়ে দেখলেনও না। আমি ভাবছিলাম, আমাকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে পাঠালেই ভালো হয়। তাতে আর্মি এসে আমাকে সহজে নিয়ে যেতে পারবে না। কিন্তু তা আর হলো না। আমি একটা বড় রকমের মারের অপেক্ষা নিয়ে রমনা থানায় ফিরে গেলাম।

১১ তারিখের রাতে একজন অপরিচিত যুবক আমার আর্মির হাতে এ্যারেস্ট হওয়ার খবরটি মহাদেবের বাসায় পৌঁছে দিয়েছিল। মহাদেব তখন বাসায় ছিল না। সে গিয়েছিল পিজিতে। হাসানের কাছে। হাসানের কাছ থেকে বাসায় ফিরে এসেই মহাদেব নীলার কাছে আমার আর্মির হাতে এ্যারেস্টের খবরটি পায়। নীলার কাছে শুনেছি, মহাদেব ঐ খবর পেয়ে ছোটদের মতোই অঝোরে কাঁদতে শুরু করেছিল। মহাদেব, মনে হয় ঐ রাতেই আমার জন্য বরাদ্দ ওর কান্নাটুকু কেঁদে শেষ করে ফেলে থাকবে। তখন দশটার পর ঢাকায় কার্ফ্যু শুরু হয়ে যেত। হাতে ঘণ্টাখানেকের চেয়ে কম সময়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এর মধ্যেই মহাদেব বাইরে বেরুবার জন্য যখন তৈরি হলো, তখন মহাদেবকে বিরত করতে না পেরে ওর বাসার মালিকের (ক্যাপ্টেন রব সাহেব, তিনি একজন মুসলিম লীগার ছিলেন) ছেলে হাবিব মহাদেবের নিরাপত্তার কথা ভেবে তার সাথে যায়। ঐ রাতেই মহাদেব আমাদের কবি-বন্ধুদের দু'একজনের বাসায় গিয়ে আমার বিষয়টি নিয়ে কথা বলে। কিন্তু তাদের কাছ থেকে খুব ভালো সাড়া পাওয়া যায় না। আমার খবর পেয়ে তারা খুবই ভয় পেয়ে যায়। ভাবে, আমার কেসটি নিয়ে মুভ করতে গেলে হয়তো নিজেদেরই বিপদ হতে পারে। আমি এজন্য আমার বন্ধুদের খুব একটা দোষ দিই না। কেননা, তখনকার পরিস্থিতিটা আজকের দিনের আলোকে ঠিক বোঝা যাবে না। মহাদেব কার্ফ্যুর মধ্যে ব্যর্থ মনোরথ হয়ে বাসায় ফিরে আসে।। মহাদেব ভেবেছিল, রাতের মধ্যে যদি আমাকে প্রয়োজনীয় প্রোটেকশন দেয়া না যায়, তবে হয়তো আর সময় না-ও পাওয়া যেতে পারে। তাই সে খুবই বিচলিত হয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মতো কার্ফ্যুর মধ্যেই বেরিয়ে পড়েছিল— কিছু একটা করার আশায়। কিন্তু পারেনি। আমি বুঝতে পারি, ঐ কিছু করতে না পারার ব্যথা মহাদেবকে কতটা কষ্ট দিয়েছিল সেদিন।

পরদিন তরুণ কবি মোস্তফা মীর এবং আমার ছোট ভাই শৈবালেন্দু (তখন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ত) লোকমুখে ছড়িয়ে পড়া আমার গ্রেফতার হওয়ার খবর পেয়ে মহাদেবের বাসায় আসে এবং মহাদেবের সঙ্গে এসে যুক্ত হয়। তাতে মহাদেব এবং আমার বল বাড়ে। মহাদেব তরুণ কবি মোস্তফা মীর ও আমার ছোট ভাই শৈবালেন্দুকে সঙ্গে নিয়ে আমাকে মুক্ত করার জন্য সাহায্য চাইতে দৈনিক বাংলায় যায়। সেখানে আমাদের বড় কবি ও বড়-সাংবাদিকরা কাজ করেন। কবি শামসুর রাহমান, কবি আহসান হাবীব, কবি মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ, সাংবাদিক আহমেদ হুমায়ুন, শ্রী নির্মল সেন—এঁদের সঙ্গে আমার ব্যাপারে মহাদেবের কথা হয়। তাঁদের কাছে মহাদেব আমার মুক্তি চেয়ে একটি বিবৃতি প্রদানের অনুরোধ করে। তাঁরা আমার বিষয়টি নিয়ে ভাবতে রাজি হলেও কিছু বলতে রাজি হননি। আমার জন্য কিছু করা তো দূরে থাক, আমার বিষয়টি নিয়ে নিজের ওপর ঝুঁকি না বাড়িয়ে বাসায় ফিরে যাবার জন্যই সেদিন তাঁরা মহাদেবকে পরামর্শ দিয়ে বিদায় করেছিলেন। মহাদেব অবশ্য সেদিন তাঁদের প্রদত্ত ঐ পরামর্শটি মেনে চলেনি।

১১ তারিখ রাতে মহাদেবকে বাসায় না পেয়ে ঐ অচেনা যুবকটি পিজি হাসপাতালে গিয়ে আবুল হাসানকে আমার এ্যারেস্ট হওয়ার খবর জানায়। তাকে দেখতে গিয়ে আমার আর্মির হাতে এ্যারেস্ট হওয়ার কথা শুনে আবুল হাসান খুবই ব্যথিত হয়। মহাদেব এবং আবুল হাসানের চিঠি পেয়ে আমি যে ঢাকায় ফিরে এসেছিলাম— এটি পৃথক পৃথকভাবে হাসান এবং মহাদেব, দু'জনের মধ্যেই এক ধরনের গিল্টি ফিলিং তৈরি করেছিল। সুস্থ থাকার কারণে এবং পরবর্তী টার্গেট হওয়ার সম্ভাবনা বিদ্যমান থাকার ভয়ে, সর্বোপরি বন্ধুত্বের টানেই মহাদেব আমাকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুক্ত করার জন্য জীবনপণ করে মাঠে নেমেছিল, কিন্তু নীরবে উদ্বিগ্ন বোধ করা এবং হাসপাতালের শয্যায় শুয়ে শুয়ে পরম করুণাময়ের কাছে আমার মুক্তির জন্য প্রার্থনা করা ছাড়া, আবুল হাসানের পক্ষে আর কিছুই করার ছিল না। কে ছিল ঐ অচেনা যুবক? আজ পর্যন্ত আমরা তার কোনো হদিস পাইনি।

আমার ব্যাপারে পুলিশের সঙ্গে আর্মির কোনোরূপ যোগাযোগ হয়েছে কি-না, তা জানতে চাইলে পুলিশ না-সূচক জবাব দেয়। সরকারের নানা ধরনের গোপন এজেন্সি থাকে। আমার কেসটি ডিল করার জন্য কোন এজেন্সিকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে, তা বুঝে উঠতে পারছিলাম না। তবে রমনা থানা কর্তৃপক্ষ আমার ব্যাপারে যে নির্বিকার ছিল, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। প্রবল অনিশ্চয়তার মধ্যেই আমি সময় কাটাতে বাধ্য হচ্ছিলাম। আমার যেমন স্বভাব, আমার ইচ্ছার বাইরে আমি একটি মুহূর্তও কাটাতে পারি না। আর এখন? আমার স্বাধীন-সার্বভৌম কবি-চিত্তের ওপর অস্ত্রের জোরে চাপিয়ে দেয়া এই নিষ্ঠুর অবদমন, কী অসহ্য! অথচ মুখ বুজে সহ্য করা ছাড়া, এ-মুহূর্তে আমার কিছুই করার নেই। কিচ্ছু করার নেই, এমন কি এরা যদি আমাকে মেরেও ফেলে, তবুও। সুতরাং আমাকে যে বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে, ভাবলাম এটাই আমার লাভ। বর্বরতা যখন রাষ্ট্র-ক্ষমতা দখলের ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়, তখন রাষ্ট্রজীবন থেকে ন্যায়-নীতি আইন-কানুনসহ যাবতীয় মূল্যবোধই অস্তিত্বহীন হয়ে পড়ে। বাংলাদেশ এখন সে রকমই একটা প্রচণ্ড দুঃসময় অতিক্রম করছে। অনেকের মতো আমিও সেই দুঃসময়ের শিকার। এ নিয়ে দুঃখ করে লাভ নেই। দুঃখজয়ের শক্তি অর্জন করাটাই এখন আমার কাজ।

দ্রুতই আর্মির হাতে আমার গ্রেফতার হওয়ার ঢাকায় খবরটি ছড়িয়ে পড়ে। তাতে আমাকে বিনাবিচারে, গোপনে গায়েব করে দেয়ার সম্ভাবনা হ্রাস পায়। আমিও কিছুটা স্বস্তিবোধ করি। আমাকে কেন কোর্ট থেকে রিমান্ডে থানায় নিয়ে আসা হয়েছে, সারাদিন তার কোনো প্রমাণ পাওয়া গেল না। আমার সম্পর্কে পুলিশের রহস্যজনক নীরবতা সারাদিনই বজায় থাকল।

সন্ধ্যার দিকে, মাগরিবের আজানের পর, বেশ ক'জন সিভিল পোশাক পরা গোয়েন্দা কর্মকর্তা রমনা থানায় আসেন। তাদের নির্দেশমতোই আমাকে হাজতের গেট খুলে বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়। আমি ধারণা করি, কর্নেল সাহেবের নির্দেশেই ঐ গোয়েন্দারা আমার সম্পর্কে তদন্ত করতে এসেছে। আমাকে হাজত থেকে বাইরে নিয়ে যাবার সময় একজন সহআসামি আমার হাতে একটি ট্যাবলেট গুঁজে দিল। বলল, দাদা পুলিশকে বিশ্বাস নেই। এরা এখন মুখে যত ভালো কথাই বলুক না কেন, কখন যে টর্চার করতে শুরু করবে বলা যায় না। এই ট্যাবলেটটি সঙ্গে রাখুন। আন্তরিকতার স্পর্শযুক্ত ঐ ট্যাবলেটটি সাদরে গ্রহণ করে আমি অজানার উদ্দেশ্যে হাজতের বাইরে পা রাখি। ভগবান জানেন, আমাকে এখন কোথায় নিয়ে যাওয়া হবে !

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাজতে যে সব আসামিকে ধরে আনা হতো— আমি গত দু'দিন ধরে দেখছি, পুলিশ তাদের একেকজনকে একেক সময় ধরে বাইরে নিয়ে যায় ইন্টারোগেট করার জন্য। পুলিশের ইন্টারোগেট মানে খুবই কঠিন ব্যাপার। পুলিশের কাছে টর্চার হচ্ছে ইন্টারোগেটের সুফল লাভের বিশ্বস্ত উপায়। বিশেষ করে রাতের দিকেই ঐ টর্চার-কর্মটি চলত। কিল-ঘুষি, লাথি-চড়-থাপ্পড় ছাড়াও আরও বিভিন্ন উপায়ে আসামিদের টর্চার করা হতো। আসামিদের আর্ত-চিৎকারে থানার আকাশ বাতাস ভারি হয়ে উঠত। যখন আসামিটি মার খেতে-খেতে প্রায় জ্ঞান হারিয়ে ফেলার উপক্রম হতো, তখন পুলিশরা একটি মৃতদেহকে চ্যাংদোলা করে ধরে আনার মতো করে আসামিটিকে নিয়ে এসে হাজতের ভিতরে শুইয়ে দিয়ে চলে যেত। তখন অত্যাচারিতের দেহের ভিতরে এখনও যে প্রাণটুকু অবশিষ্ট আছে, তার প্রমাণ পেতে আমাকে বেশ কিছুক্ষণ উদ্বেগের সঙ্গেই অপেক্ষা করতে হতো। আমি খুবই ভয় পেয়ে যেতাম। মনে হতো লোকটি হয়তো আর বাঁচবে না। পরে মানুষের বেঁচে থাকার শক্তিও যে খুবই অসীম—তাও লক্ষ্য করতাম। কিছুক্ষণ পরেই দেখতাম ঐ মৃত্যুপথযাত্রীটির জ্ঞান ফিরে এসেছে এবং আমাদের দিকে তাকিয়ে জলের জন্য ইঙ্গিত করছে। তখন তার মুখে জল ঢেলে দিত অন্য আসামিরা। সঙ্গে ঐ পেইনকিলার ট্যাবলেট। চুরি-ডাকাতি-ছিনতাই ও মারামারি-হানাহানির অপরাধে ধৃত আসামিরাই শংকার মধ্যে থাকত বেশি। পলিটিক্যাল আসামিরা সেইদিক থেকে কিছুটা দুর্ভাবনামুক্ত ছিল। কর্নেল সাহেবের দয়ায় আমি কমবেশি পলিটিক্যাল আসামির মর্যাদাই ভোগ করছিলাম। আমাকে চোর-ডাকাতের মতো ট্রিট করা হচ্ছিল না। ১৮ নভেম্বরের জনসভার প্রচারকার্যে নিয়োজিত জাসদের ছাত্র-কর্মীদেরও পুলিশ টর্চার করেছিল বলে আমার মনে পড়ে না। খুব সম্ভবত ১২ তারিখেই ওরা কোর্ট থেকে জামিনে মুক্তি পেয়ে চলে গিয়েছিল অথবা ঢাকার কেন্দ্রীয় কারাগারে স্থানান্তরিত হয়েছিল। আমি ঠিক মনে করতে পারছি না। ১২ তারিখ থেকে রমনা থানার হাজতে কিছুটা পলিটিক্যাল চাটযুক্ত আসামি বলতে ছিলাম আমি একাই। অন্য আসামিরা ছিল চুরি-ডাকাতি, মারামারি, ছিনতাই, খুন এইসব অভিযোগে ধৃত। লাল শালু পরা, হাতে লোহার কড়া লাগানো ঢাকা হাইকোর্টের বটবৃক্ষতলবাসী গঞ্জিকাসেবীরাও জামিনে মুক্তি পেয়ে গিয়েছিল। তাই বলে হাজতটি ফাঁকা হয়ে যায়নি। বড় নগরীর থানার হাজত কখনও ফাঁকা থাকে না। এ হচ্ছে লক্ষ্মীর ঝোলা। ভরাই থাকে। আর হাজত ভরা থাকলে কে না জানে যে, তাতে দেশের লাভ, উকিলদের লাভ এবং পুলিশের লাভ।

পুলিশের অভয় সত্ত্বেও আমি মানসিকভাবে পুলিশের কঠিন ইন্টারোগেশনের মুখোমুখি হবার জন্য মনে মনে তৈরি হয়েছিলাম। আমাকে দোতলায় একটি ঘরের মধ্যে নিয়ে যাওয়া হলো। পকেটে রাখা পেইনকিলার ট্যাবলেটে হাত রেখে আমি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গিয়ে বসলাম গোয়েন্দাদের মুখোমুখি একটি চেয়ারে। আমাকে ঘিরে পাঁচ ছয় জন আইবির লোক। আমি স্থির করেই রেখেছিলাম, আমি একটি বর্ণও মিথ্যা বলব না। আমি আমার ব্যাপারে যা সত্য তাই বলব। কোনো তথ্য গোপন করব না। তাতে যা হবার হবে। আমার মনে হয়েছিল, মিথ্যা পরিচয়ে বাঁচার চাইতে সত্য পরিচয়ে মরাটাও আমার জন্য উত্তম হবে। আর আগেই বলেছি, আমি কোথা থেকে কোন দূরের ভুবন থেকে যেন সাহস পাচ্ছিলাম। আমার মরণের ভয় আর ছিল না। আমি হাজতের ভিতরে এককোণে বসে পাহারারত সেন্ট্রি-পুলিশের বুলেটবেল্টের দিকে তাকিয়ে থাকতাম। পুলিশ বলত, কী দেখেন, কবি সাব? আমি বলতাম, দেখছি আপনার কোমরের বুলেটগুলো। আপনি কোমরে বহন করছেন বলে ভাবছেন— এগুলো আপনার। আপনি এগুলোর আসল মালিক নন। আপনি হচ্ছেন বাহক। পুলিশ ঠিক বুঝে উঠতে পারত না আমার রসিকতাটা। বলত, তার মানে? তখন আমি রহস্যভেদ করার মতো করে বলতাম, জীবনের বিনিময়ে এই বুলেটগুলোকে যারা দেহের ভিতরে ধারণ করবে, বুলেট হচ্ছে তাদেরই।

আমার ঐ কথা বলার পর হাজতচত্বরে এক ধরনের নিস্তব্ধতা নেমে আসত।

গোয়েন্দা পুলিশরা, তাই আমাকে যতটা অপ্রস্তুতভাবে পাবে বলে ভেবেছিল, ততটা অপ্রস্তুত অবস্থায় তারা আমাকে পেল না। প্রশ্নের ধরন শুনেই আমি বুঝতে পারলাম, এটি একেবারেই পুলিশের রুটিনওয়ার্ক। আমার বাবা-কাকারা এ রকম প্রশ্নের উত্তর বিগত পাকিস্তান আমল থেকেই দিয়ে আসছেন। দেশটা যে আবার পাকিস্তানের পথে এগিয়ে চলতে শুরু করবে —তাদের প্রশ্নের মধ্যে আমি তারই আভাস পেলাম। আমাকে তারা ১৯৭১-এ আমার অবস্থান ও ভূমিকা থেকে শুরু করে ১৯৭৫ সালের ৫ আগস্ট থেকে ৭ নভেম্বর পর্যন্ত আমার অবস্থান, আমার প্রতিক্রিয়া জানবার জন্য যতরকম প্রশ্ন করা হতে পারে, তাই করল। আমি প্রতিটি প্রশ্নের দ্রুত উত্তর দিলাম। তাদের প্রশ্নের উত্তর দিতে আমার বরং ভালো লাগছিল এই ভেবে যে, আমি মন খুলে আমার সকল দুঃখ-বেদনার কথা বাংলাদেশ সরকারের পুলিশদের জানাতে পারছি। এবং তারা অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে আমার বলা কথাগুলো সরকারি নথিপত্রে লিপিবদ্ধ করছেন। আমি যে ১৫ আগস্ট ও ৩ নভেম্বরের জেল হত্যার ঘটনায় খুবই ব্যথিত হয়েছি, আমি যে পাগল হয়ে গ্রামের বাড়িতে ফিরে গিয়েছিলাম, তা বললাম। ভারতে যে আমার অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজনরা রয়েছেন তাও জানালাম। খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্নের উত্তরে বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকীর পরিবারের সঙ্গে আমার পরিবারের দীর্ঘদিনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথাও আমি সানন্দেই স্বীকার করলাম।

একজন গোয়েন্দা বললেন, ১৫ আগস্টের পর আপনাকে মোহাম্মদপুর এলাকায় কাদের সিদ্দিকীর জিপে উঠতে দেখা গেছে। সত্য?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি বললাম, না কথাটা সত্য নয়। আমি একটু জোরের সঙ্গেই বললাম, ভাই ১৫ আগস্টের পর আমার সঙ্গে কাদের সিদ্দিকীর যদি দেখা হতো, তবে আমি কি আর এখানে থাকি? সে-ও আমাকে নিশ্চয়ই ঢাকায় রেখে যেত না।

আপনি কি তবে ১৫ আগস্টের পর গ্রামের বাড়িতে যাবার নাম করে অন্য কোথাও গিয়েছিলেন?

বুঝলাম ওরা আমাকে সীমান্তের ওপারে কাদের বাহিনীতে পাঠাতে চাইছে।

আমি বললাম, না ভাই, আমি পুরো সময়টা আমার গ্রামের বাড়িতেই ছিলাম। আপনারা তদন্ত করে দেখতে পারেন। আমি একটু ভীতু ধরনের মানুষ। আমার সাহস কম। আমি অস্ত্র হাতে নিতে ভয় পাই। ১৯৭১-এও আমি অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করার সাহস সঞ্চয় করে উঠতে পারিনি।

আপনি খালেদ মোশাররফকে চিনতেন?

একদিন খুব অল্পসময়ের জন্য তার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। খুব সামান্যই কথা হয়েছে। কুশল বিনিময়। এটাকে ঠিক চেনা বলা যাবে না।

তার জন্য আপনার দুঃখ হয়?

আমি বললাম, হয়। প্রতিটি অকাল ও অপঘাত মৃত্যুর জন্যই আমার দুঃখ হয়।

আপনার এক বন্ধু নাকি পিজিতে অসুস্থ। ঠিক তো? কী যেন নাম তার?

আবুল হাসান। পিজিতে খোঁজ করলেই জানতে পারবেন। তিনি খুবই অসুস্থ।

তাঁকে দেখার জন্যই আপনি পিজিতে গিয়েছিলেন, নাকি অন্যকিছু?

অন্যকিছু হতে যাবে কেন? আপনারা খোঁজ নিয়ে দেখুন।

জাসদের মুখপত্র গণকণ্ঠে আমি যে একসময় কাজ করেছি এবং জাসদের নেতাদের সঙ্গে আমার যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল, সে প্রসঙ্গেও তারা জানতে চাইল।

আমি বললাম, এদের সবাই আমার দীর্ঘদিনের পরিচিত।

কর্নেল তাহেরকে চেনেন?

আমি বললাম, নেত্রকোনার লোক হলেও কর্নেল তাহেরের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত পরিচয় নেই। আমি তাকে নামেই শুধু জানি।

গণকণ্ঠ পত্রিকায় কী করতেন আপনি?

আমি বললাম, আমি সম্পাদকীয় লিখতাম। একটি রাজনৈতিক কলামও লিখেছি। সরকারি আমলা এবং আওয়ামী লীগের কিছু কিছু নেতাকর্মীর দুর্নীতির বিরুদ্ধে আমি ঐ পত্রিকায় লিখেছি। কিন্তু তাই বলে আমি কখনও জাসদের রাজনীতির সমর্থক ছিলাম না। তাদের সঙ্গে আমার বনিবনা হয়নি। গণকণ্ঠে যোগ দেবার সময় আল মাহমুদ আমাকে বলেছিলেন, জামায়াতের দখল থেকে ছিনিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নেয়া ঐ কাগজটি বঙ্গবন্ধুর রাষ্ট্রীয় চার-নীতির পক্ষে প্রচার চালাবে। বঙ্গবন্ধু ঐ শর্তেই কাগজটির দায়িত্ব রব-সিরাজ-আল মাহমুদের হাতে ছেড়ে দিয়েছিলেন। ঐ কাগজে যোগদানে প্রলুব্ধ করার জন্য আল মাহমুদ আমাকে ঐ কথাই বলেছিলেন। জাসদের কথা তখন আসেনি। রব-জলিলের নেতৃত্বে জাসদ গঠিত হওয়ার পর ঐ কাগজটি জাসদের কাগজে পরিণত হয়। আমি জাসদের পক্ষে লিখতে অস্বীকার করায় আল মাহমুদের সঙ্গে আমার বিরোধ হয়। তোহা ভাইয়ের সঙ্গেও আল মাহমুদের বিরোধ হয়। তখন প্রবীণ সাংবাদিক তোহা ভাই (মরহুম তোহা খান)-এর সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করে আমিও গণকণ্ঠের চাকরি ছেড়ে দিই।

গণকণ্ঠ ত্যাগ করার পর সাংবাদিক বজলুর রহমানের আহ্বানে আমি কিছুদিনের জন্য সংবাদে যোগ দিই। এক বছরের মাথায় সংবাদ থেকেও আমার চাকরি চলে যায়। তারপর লেখক-সাংবাদিক রাহাত খানের আহ্বানে আমি কিছুদিন অন টেস্ট বেসিসে ইত্তেফাকে লিখেছিলাম। মইনুল হোসেনের মন জয় করতে পারিনি, তাই চলে আসি। তারপর আর কোনো কাগজে যাইনি। আমি বুঝতে পারি, আমি ঠিক সাংবাদিক নই। অনেক দিন বেকার থাকার পর আমি রেজা আলী ও রামেন্দু মজমুদার পরিচালিত বিটপী এ্যাডভার্টাইজিং ফার্মে কপিরাইটিংয়ের কাজ পাই। সেখানেও বেশিদিন টিকতে পারি না। অফিসের অনুমতি না নিয়ে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি অনুষ্ঠানে কবিতা পড়তে যাওয়ার অভিযোগে ১৫ আগস্টের কিছুদিন আগে আমার ঐ চাকরিটিও চলে যায়। এর পর থেকে আমি বেকারই ছিলাম। ১৫ আগস্টের পর আমার গ্রামে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণের পেছনে ওটাও একটা কারণ ছিল। আমি ভেবেছিলাম, আমি তো বেকারই। চাকরি হারানোর ভয় আমার ছিল না।

আমার ঘণ্টা দুয়েক স্থায়ী জবানবন্দিটি বেশ কয়েকজন মিলে লিপিবদ্ধ করেছিলেন। তারা আমার কথায় ও তাদের উত্থাপিত প্রশ্নের উত্তর শুনে খুব মজা পাচ্ছিল বলেই মনে হয়। ফলে একজন বুড়োমতো মানুষ, মুখে শাদা দাড়ি, আমাকে প্রশংসা করে বলেছিলেন, কবি সাহেব, আপনি খুবই সাহসী এবং সত্যবাদী। আপনি একজন ভালো মানুষ।

আমি বললাম, আমি সত্যবাদী এবং ভালো মানুষও, কিন্তু সাহসী না।

তিনি মাথা নাড়িয়ে বললেন, সত্যবাদী আর সাহসীতে তফাৎ খুবই কম।

আমি বললাম, কী জানি হতে পারে।

ইন্টারোগেশনের একপর্যায়ে আমাকে একবার চা পরিবেশন করা হলো। আমার সঙ্গে তারাও চা-পান-সিগারেট খেলেন। আমাকেও তারা তাদের সামনে সেদিন সিগারেট খেতে দিয়েছিলেন। আর তখনই পকেট থেকে সিগারেট বের করতে গিয়ে ঐ ট্যাবলেটটির গায়ে হাত পড়েছিল আমার। আমি তখন একটু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাসতে হাসতেই জিজ্ঞেস করলাম, আপনারা কি এভাবেই আমাকে ইন্টারোগেট করবেন? আমাকে মারধর করবেন না?

আমার কথা শুনে ওরা একটু লজ্জা পেলেন। বললেন, না ভাই। কর্নেল সাহেব তো আপনার সঙ্গে দুর্ব্যবহার না করতে লিখিত নির্দেশ দিয়ে গেছেন। উনিও খুব ভালো মানুষ। তা ছাড়া আপনি তো আর সত্য আড়াল করছেন না। সাহসের সঙ্গে, জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সত্য কথা বলছেন। সত্য জানার জন্য আপনার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করার তো কোনো প্রয়োজন নেই।

একজন জানতে চাইলেন, আপনার কি হাজতে থাকতে খুব কষ্ট হচ্ছে?

আমি বললাম, না তেমন কিছু নয়। কষ্ট হয় যখন হাজতের অন্য আসামিদের পুলিশ অমানুষিকভাবে অত্যাচার করে। ওদের আর্তচিৎকার শুনে আমার খুব কষ্ট হয়।

কী করা যাবে বলেন, ওরা তো আর আপনার মতো সত্য কথা বলে না। ওরা হচ্ছে ক্রিমিন্যাল।

আমি ক্রিমিন্যাল নই— পুলিশের কাছ থেকে এই স্বীকৃতিটুকু লাভ করার লজ্জায় আমি মাথা নিচু করে থাকি। বলি, এটা একটা সমস্যাই বটে। মানুষ যে কবে সত্য বলার সাহস অর্জন করবে। তবে এ কথাও তো ঠিক যে, পুলিশরা অনেক সময়ই অর্থের লোভে সত্যকে মিথ্যা এবং মিথ্যাকে সত্য বলে চালিয়ে দেয়। কনফেশন করার জন্য ক্রিশ্চিয়ান পাদ্রিরা যতটা নির্ভরযোগ্য, সত্য ভাষণের জন্য পুলিশ কি ততটা নির্ভরযোগ্য?

আমার ঐ কথার কোনো জবাব না দিয়েই ওরা আমাকে খুশিমনে বিদায় জানায়। বলে, আমরা চাই আপনি মুক্তি পান। তবে আমাদের ইচ্ছাটাই তো শেষ কথা নয় আর। সবকিছুই নির্ভর করবে ঐ কর্নেল সাহেবের ওপর। একজন আমার কানের খুব কাছে এসে আমাকে জানায়, আমাদের হাতে ক্ষমতা থাকলে আমরা আপনাকে এখনই মুক্তি দিতে পারতাম। কিন্তু ঐরূপ ক্ষমতা তাদের ছিল না।

বাংলাদেশকে স্থলপথে তিন দিক থেকে ঘিরে রেখেছে ভারত। আমাদের দক্ষিণে সমুদ্র। সমুদ্রপথেও ভারতেরই দাপট। ঐ রকমের একটি বিশাল দেশের প্রতি আমাদের মতো ছোট একটি দেশের দৃষ্টিভঙ্গি কী রকম হওয়া উচিত, এই প্রশ্নে বাংলাদেশের অভিভাবক শ্রেণীর মুসলমান রাজনীতিবিদরা দুটো স্পষ্ট ধারায় ভাগ হয়ে যান। একদল মনে করতে থাকেন শক্তিশালী ভারতের সঙ্গে আমাদের সৎ-প্রতিবেশীসুলভ সুসম্পর্ক থাকাই ভালো। তাতে আমাদের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব নিশ্চিত হবে। চীনের কাছে ১৯৬২-র যুদ্ধে বিপুল পরিমাণ ভূখণ্ড হারানোর তিক্ত অভিজ্ঞতা ও পাকিস্তানের সঙ্গে অনুষ্ঠিত একাধিক যুদ্ধের অভিজ্ঞতাকে বিবেচনায় রেখে ভারত বিগত বছরগুলোতে তার সামরিক শক্তিকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যেভাবে বাড়িয়ে তুলেছে এবং তুলে চলেছে— তার সঙ্গে যদি পাল্লা দিয়ে আমাদের অস্তিত্ব রক্ষার চিন্তা করতে হয়, তা হবে আমাদের মতো একটি ছোট দরিদ্র দেশের জন্য খুবই আত্মঘাতী অবাস্তব এবং অসম্ভব ব্যাপার। ভারতের বিরুদ্ধে সামরিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করার তালিকায় পাকিস্তানের মতো বাংলাদেশের নাম লেখানোর বিপদ কতটা ক্ষতিকর হতে পারে, তা অনুভব করে পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তি লাভ করে স্বাধীন দেশের মাটিতে পা রেখেই বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, বাংলাদেশ হবে প্রাচ্যের সুইজারল্যান্ড। অর্থাৎ যুদ্ধ নয়, শান্তি। সংঘর্ষ নয়, সম্প্রীতিই হবে বাংলাদেশের পথ। ভারতের সঙ্গে কুসম্পর্ক বজায় রেখে চলাটা যে ভালো নয়, ১৯৭১ সালে পাকিস্তান খুব চড়া মূল্য দিয়ে তা অনুভব করেছে। তাই আমাদের সঙ্গে বৈরী আচরণ করার সুযোগ আমরা ভারতকে দিতে পারি না। ভারতকে বন্ধুত্বের বন্ধনে বেঁধে রাখাটাই হবে আমাদের কাজ। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন ঐ ধারার জনপ্রিয় নেতা। বাংলাদেশটিকে তিনি 'মুসলিম বাংলা' বলে মনে করতেন না। মুসলমানদের পাশাপাশি বাংলাদেশ নামক এই ভূখণ্ডে বসবাসকারী হিন্দু-বৌদ্ধ এবং খ্রিস্টান সম্প্রদায়কেও তিনি সর্বদা বিবেচনায় রেখে চিন্তা-ভাবনা করতেন, কথা-বার্তা বলতেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, বাংলাদেশের সংস্কৃতি হচ্ছে হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খ্রিস্টানের মিলিত বিশ্বাস, শ্রম ও ভালোবাসার ফসল। সংস্কৃতির মূলধারাটি অবশ্যই সর্বকালে সর্বদেশে তার বৃহত্তর জনগোষ্ঠীরই ধর্মাশ্রয়ী হয়; খণ্ডিত বাংলার পূর্বপটের সংস্কৃতির মূলধারাটি তাই বলা বাহুল্য, ইসলামধর্ম নির্ভর। কিন্তু তাই বলে ইসলামী সংস্কৃতির চারপাশে ব্যারিকেড দিয়ে তাকে অন্য ধর্মনির্ভর সংস্কৃতির সঙ্গে মিলিত হবার পথ রুদ্ধ করে দিতে হবে, না দিলে ইসলামী সংস্কৃতি বিকশিত হবে না, ইসলাম চলে যাবে— ইসলামকে তিনি অতটা ঠুনকো কিছু বলে ভাবতেন না। মরু-অঞ্চলের পোশাক পরে মুসলমান সাজার প্রয়োজন আছে বলেও তিনি মনে করতেন না।

এই ধারার বিপরীতে, মুসলিম-বাংলার ভবিষ্যত নিয়ে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ধারার অনুসারীরা মনে করতেন, ভারতের পথ আমাদের পথ হতে পারে না। ভারত ধর্মনিরপেক্ষতার কথা মুখে যতই বলুক না কেন, মাঝে মাঝে ভারতীয় মুসলমানদের মধ্য থেকে লোক-দেখানো রাষ্ট্রপতি বা বিমানবাহিনী প্রধান বা রাষ্ট্রসংঘের স্থায়ী প্রতিনিধি তারা যতই নিয়োগ করুন না কেন— এটি হচ্ছে পলিটিক্স। ভারত আসলে একটি ছদ্মবেশী হিন্দুরাষ্ট্র ছাড়া কিছু নয়। 'হিন্দুস্থান'ই এর যথার্থ নাম। ভারতকে হিন্দুরাষ্ট্র বলাটা যে একইসঙ্গে ভারতে বসবাসকারী বিপুলসংখ্যক মুসলমান এবং বাংলাদেশে বসবাসকারী তার চেয়ে কিছু কম অমুসলমানদের জন্য অপমানজনক, এ দিকটা তাদের ধর্মান্ধ চোখে ধরা পড়ত না। তারা মনে করতেন, ভারতকে হিন্দুরাষ্ট্র প্রমাণ করতে পারলে বাংলাদেশকে আর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কষ্ট করে 'মুসলিম বাংলা' প্রমাণ করতে হবে না। অটোমেটিক্যালি তা প্রমাণিত হয়ে যাবে। সন্দেহ জাগে, ভারতকে হিন্দুর হাতে সঁপে দিয়ে তারা কি বাংলাদেশকে সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রে পরিণত করে এখানে বসবাসকারী সংখ্যালঘুর সম্পদ লুণ্ঠন কর্মটিকে সহজ করতে চাইতেন? তারা ভাবতেন ভারত সবসময়ই বাংলাদেশকে শোষণ করার তালে থাকবে এবং আমাদের সঙ্গে বড়ভাইসুলভ আচরণ করবে। তাকে কোনো অবস্থাতেই বিশ্বাস করা যায় না। ভারতকে শক্তির মাধ্যমে মোকাবিলা করার প্রস্তুতি আমাদের থাকা দরকার। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করলেও, ভবিষ্যতের কথা ভেবেই আমাদের উচিত মুসলিম উম্মার সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক সুদৃঢ় করা। ভারতকে চাপের মধ্যে রাখার জন্য একদলশাসিত, নাস্তিকের দেশ কমিউনিস্ট চীনের সঙ্গেও সম্পর্কের উন্নতি করা দরকার। পাকিস্তানের মতোই। ১৯৭১ সালে এদের অনেকেই মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেছিলেন। আবার কেউ কেউ মুক্তিযুদ্ধ করেছিলেনও। মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ছিলেন ঐ ধারার সবচেয়ে জনপ্রিয় নেতা। তিনি খুব চমৎকার ভাষায় সাম্প্রদায়িক চুলকানিযুক্ত ভারতবিরোধী বক্তব্য প্রদান করতে পারতেন। তিনি বলতেন, ওপার থেকে দল বেঁধে ধুতি পরে আসা হিন্দুরা' সব লুটেপুটে খেয়ে যাচ্ছে। ঐ সুনির্বাচিত চিত্রকল্পটির বদৌলতে ধুতি পরে আসা ভারতীয় হিন্দুরা উপদ্রবকারী বুনো হাতিতে পরিণত হতো। ভারত থেকে আসা ঐসব হিন্দু যে বাংলাদেশে বসবাসকারী হিন্দুদের পরম আত্মীয়স্বজনও বটে—ভাসানী সাহেব জেনেও তা না জানার ভান করতেন। ধুতি নামক পরিধেয়টির প্রতি বিদ্রূপ প্রদর্শন করাটাও ছিল খুবই আপত্তিজনক। মিত্রবাহিনী হিসেবে আমাদের সঙ্গে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে মুক্তিযুদ্ধে প্রাণ দেবার জন্য ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের পরিবর্তে তিনি বলতেন, ভারতীয় সেনাবাহিনী বাংলাদেশে ঢুকে আমাদের হাজার-হাজার কোটি টাকার সম্পদ লুট করে নিয়ে গেছে। সে কারণেই বাংলাদেশের এই দুর্দশা। বাংলাদেশে ঢোকার পর ভারতীয় সেনাবাহিনীর কোনো সদস্য লুটপাটে বা অন্যবিধ অপকর্মে কখনও অংশগ্রহণ করেনি—তা এমনকি ভারতও বলবে না। মিলিটারিরা, তা সে যে দেশেরই হোক, মিশনের পাদ্রী বা মঠের ভিক্ষু নয়। দেশে ফিরে যাবার পর, '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ভারতীয় সেনাবাহিনীর কোনো কোনো সদস্যের অপকর্মের অভিযোগে সামরিক আদালতে বিচার হয়েছিল বলেও শুনেছিলাম। এর মধ্যে লুটতরাজ ও নারী ধর্ষণে অংশ নেয়া অন্তর্ভুক্ত ছিল বলেও শুনেছি। কিন্তু ভাসানী সাহেবের কথামতো, লুটতরাজ করার জন্যই ভারতীয় সেনাবাহিনী বাংলাদেশে ঢুকেছিল, লুটতরাজ ও নারী দর্ষণ ছাড়া তার পেছনে অন্য কোনো মহৎ প্রেরণা বিদ্যমান ছিল না—এমন মিথ্যা ধারণা বিতরণকারীকে আল্লাহও ক্ষমা করবেন না। ১৯৭১-এ বাংলাদেশকে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর হাত থেকে মুক্ত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করার জন্য কম করেও বারো হাজার ভারতীয় সেনা প্রাণ দিয়েছিল। ওঁরা হিন্দুস্তানী ছিল বলেই কি ভাসানী সাহেব তাঁদের প্রাণকে এত তুচ্ছ বলে মনে করতেন? না, এটা খুবই অন্যায় কথা।

'৭১-পরবর্তী বাংলাদেশে মওলানা ভাসানী সাহেবই 'প্রগতিশীল সাম্প্রদায়িকতা'র জন্ম দিয়েছিলেন। ঐ প্রগতিশীল সাম্প্রদায়িকতাকে সেদিন শক্ত হাতে মোকাবিলা করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন বঙ্গবন্ধুর সরকার। তার কুফলও তিনি ভোগ করেছেন জীবন দিয়ে, মৃত্যু-অন্তে। ১৫ আগস্টের মতো নারকীয় হত্যাযজ্ঞ বা ৩ নভেম্বরের জেল-হত্যার মতো বর্বর ঘটনা ঘটে যাবার পরও মওলানা ভাসানী ঐরূপ অপকর্মের বিরুদ্ধে টু শব্দটিও করেননি। তাঁর রহস্যময় নীরবতা বঙ্গবন্ধু ও চার নেতার খুনিদের অপকর্মকেই সমর্থন যুগিয়েছিল। বঙ্গবন্ধু তাঁর জীবদ্দশায় মওলানা ভাসানীকে যথেষ্ট ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতেন। বঙ্গবন্ধুর একটি মস্ত ভুল ধারণা ছিল যে, মওলানা সাহেব তাঁকে পুত্রবৎ স্নেহ করেন। তাঁকে মওলানা সাহেব ভালোবাসেন। কিন্তু আমার তা কখনও সত্য বলে মনে হতো না। বঙ্গবন্ধুর সপরিবারে নিহত হওয়ার পর ঐ হত্যাকাণ্ডের নিন্দা করা দূরে থাক, মুজিবের পিতৃপ্রতিম মওলানা ভাসানী যে তাঁর ঐ কথিত রাজনৈতিক-পুত্রের রুহের মাগফেরাত পর্যন্ত কামনা করেননি—তাতে মওলানা ভাসানী সম্পর্কে আমার ধারণাটিই সত্য বলে প্রমাণিত হয় এবং সত্যটি প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে আমি খুশি হই।

৭ নভেম্বরে 'সিপাহী-জনতার বিপ্লবের' মাধ্যমে খুনি-মেঘের আড়াল ভেদ করে যখন লুকানো সূর্য উঁকি দেয়, তখন, দীর্ঘ নীরবতার পর আমরা আবার মওলানা সাহেবকে বিবৃতি নিয়ে দেশবাসীর সামনে হাজির হতে দেখি। ১২ নভেম্বর এক দীর্ঘ বিবৃতির মাধ্যমে ১৫ আগস্ট এবং ৩ নভেম্বরের ঘটনাকে পাশ কাটিয়ে ৭ নভেম্বরের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসা নতুন শক্তিকে আশীর্বাদ করেন এবং দেশবাসীকে আধিপত্যবাদীদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে সতর্ক থাকার আহ্বান জানান। তাঁর ঐ আশীর্বাদী-বিবৃতিটি পরদিনের সরকারি পত্রিকা দৈনিক বাংলার প্রথম পাতাজুড়ে ফলাও করে প্রকাশিত হয়। তাতে আমি মোটেও অবাক হই না। আমি অবাক হই, যখন দেখি, মওলানা ভাসানী তাঁর বাসস পরিবেশিত ঐ বিবৃতিতে সজ্ঞানে বা অজ্ঞানে হোক—'ধর্মনিরপেক্ষতা'র রাষ্ট্রীয় আদর্শটিকে সমর্থন করেছেন।

ঐ বিবৃতিতে তিনি বলেন, ... 'বাংলাদেশ বিশ্বসভায় মর্যাদার সঙ্গে এবং একটি ধর্মনিরপেক্ষ দেশ হিসেবে বেঁচে থাকবে।' [সূত্র : দৈনিক বাংলা, ১৩ নভেম্বর ১৯৭৫]

যারা মওলানা ভাসানীর ভক্ত, অনুসারী—যারা ভাসানীকে স্বাধীনতার স্থপতি বলে মনে করেন; প্রকারান্তরে তাঁকে যারা জাতির পিতা বলে খুশি হতে চান, ভেবে পাই না, পরবর্তীকালে সংবিধান থেকে 'ধর্মনিরপেক্ষতাকে বিসর্জন দিয়ে তারা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কীভাবে মওলানা ভাসানীকে অপমান করতে পারলেন। 'ধর্মনিরপেক্ষতা'র প্রশ্নটি নিয়ে জেনারেল জিয়ার সঙ্গে মওলানা ভাসানীর বিরোধ হয়েছিল, —এমন কোনো তথ্য আমাদের জানা নেই। ভাসানী যদি ধর্মনিরপেক্ষতা শব্দটিকে সত্যিই 'মিন' করে থাকেন, তাহলে তো জেনারেল জিয়ার সঙ্গে তাঁর কোনো একপর্যায়ে বিরোধ হবারই কথা ছিল। কিন্তু হয়নি। কেন হয়নি? এটা খুবই রহস্যজনক।

আমি যখন রমনা থানার হাজতের ভিতরের নিশ্চলতায় বন্দি ছিলাম, তখন বাইরের পরিস্থিতি ছিল খুবই গতিচঞ্চল। ১৫ আগস্ট ও ৩ নভেম্বরকে পেছনে ফেলে ৭ নভেম্বরের সিপাহী বিপ্লবের মাধ্যমে নতুন সরকার সবে ক্ষমতায় বসেছে। রাজনীতিবিদদের কনুইয়ের গুঁতোয় হটিয়ে দিয়ে, বাংলাদেশের রাজনীতির নিয়ামক শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে আমাদের সেনাবাহিনী। সিভিল সমাজ প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনাকে অঙ্কুরে বিনষ্ট করে দিয়ে শুরু হয়েছে খাকি পোশাকের দাপট প্রতিষ্ঠার যুগ। সামরিক গণতন্ত্রের রক্তযাত্রা।

সামরিক গণতন্ত্রের ধারণার উদগাতারা চমৎকারভাবে সারা বিশ্বকে, বিশেষভাবে ভারতকে বুঝিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছে যে, খোলসের মতো ১৯৭১-এ আমরা পাকিস্তানকে পরিত্যাগ করেছি বটে, কিন্তু পাকিস্তানের রাষ্ট্র-আদর্শকে আমরা ছাড়িনি। পাকিস্তানই আমাদের পথ, পাকিস্তানই আমাদের আদর্শ। পাকিস্তানের মতোই আমরা চলব সামরিক রথে, সামরিক শাসনের পথে। এই সামরিক শাসনের রথ ও পথের শেষ কোথায়?— তা কেউ জানে না!

AMARBOI.COM

১৪ নভেম্বর পড়ন্ত দুপুরের দিকে এক ভদ্রলোক আসেন আমার সঙ্গে দেখা করার জন্য। আমি আমার ছোটভাই শৈবালেন্দুর দিয়ে-যাওয়া মহাদেব-পত্নী নীলার রান্না করা সুস্বাদু খাবার সাবাড় করে ভারতীয় পশমী চাদরটিকে মুড়িয়ে বালিশের মতো বানিয়ে মাথার নিচে স্থাপনকরত পাথরের খাটে ছাদের দিকে চোখ রেখে আরাম করে শয়ন করেছি। স্যাঁতাপরা হাজতঘরের দেয়াল ও ছাদের ওপর চুইয়ে পড়া জলশিল্পীর আঁকা নানারকমের মূর্ত-বিমূর্ত ছবিতে চোখ রেখে কী যেন ভাবছিলাম। বালি খসে-পড়া হাজতের চার-দেয়ালের মধ্যে কত মানুষের নাম যে লেখা আছে। সেখানে একটু চেষ্টা করলেই অজস্র রকমের মুখ কল্পনায় নির্মাণ করা সম্ভব। অনেকদিন পর মনে হচ্ছিল ঘুম আসবে। তখনই সেন্ট্রি এসে হাজির হলো আমাদের হাজত-ঘরের সামনে। বলল, কবি সাহেব আপনার লোক। আমি শোয়া থেকে মেঝের ওপর হুড়মুড় করে উঠে বসলাম। যে ভদ্রলোক আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন তাঁকে আমি আগে কোথাও দেখেছি বলে আমার মনে পড়ল না। তাঁর স্বাস্থ্য ভালো। মুখে সুন্দর করে ছাঁটা গোঁফ। গায়ের রঙ কালো। মাথায় চুল একটু কম। কেমন আছ? আমি তাঁর প্রশ্নের কোনো উত্তর দিলাম না। আমি আর্মির গোয়েন্দা বলে ইতোমধ্যেই তাঁকে সন্দেহ করে নিয়েছি। তাই কিছুটা ভয়ে এবং কিছুটা ঘৃণায় আমার মুখ থেকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোনো কথা বেরুল না। তিনি বুঝলেন, আমি তাঁকে আস্থার মধ্যে নিচ্ছি না। তিনি তখন আবদুল্লাহ আবু সায়ীদের কথা বললেন। মহাদেব সাহার কথা বললেন। বললেন, আমি সরকারের পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ে আছি। আমি একজন জয়েন্ট সেক্রেটারি। আমার নাম মোহাম্মদ সিরাজুদ্দিন। কবি সিকান্দার আবু জাফরের কথাও তিনি বললেন। এতগুলো প্রিয় নাম শোনার পর তাঁর ওপর আমার কিছুটা আস্থা আসে। আমি দরোজার লোহার শিকের ভিতর দিয়ে হাত বাড়িয়ে তাঁর সঙ্গে করমর্দন করি। আমার মুক্তির জন্য প্রয়োজনবোধে রাষ্ট্রপতি সায়েম পর্যন্ত যাওয়া যায় কি-না, তা ভেবে দেখার জন্য তাঁকে অনুরোধ করি। আমার ক্ষীণ প্রত্যাশা ছিল বিচারপতি সায়েমকে নিয়ে। মোশতাককে হটিয়ে দিয়ে খালেদ মোশাররফ তাঁকে ক্ষমতায় নিয়ে এসেছিলেন। তিনি খালেদের কোনো উপকারে লাগতে পারেননি। তাঁর মাধ্যমে খালেদের একজন সমর্থক যদি উপকৃত হয়, তবে তো তাঁর কিছুটা হলেও ঋণমুক্ত হওয়ার কথা। আমার মন বলছিল, তাঁর কাছে যেতে পারলে কাজ হবে। কিন্তু যাবে কে? সিরাজ ভাই বললেন, আমি দারোগার সঙ্গে আমার পরিচয় দিয়ে কথা বলেছি। তাঁরা তোমার প্রতি সহানুভূতিশীল তোমাকে শারীরিকভাবে যাতে নির্যাতন করা না হয়, সেজন্য আমি দারোগাকে ওয়াদা করিয়েছি। ভয় নেই। আমি আইজি-র সঙ্গেও কথা বলব। আমাকে সাহায্য করার আশ্বাস তিনি দিয়ে চলে যান। একজন উর্ধ্বতন সরকারি কর্মকর্তা আমার পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করায় আমি খুবই খুশি হই। আমার আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পায়। আমি ভাবতে শুরু করি, আমার মুক্তি খুব দূরে নয়।

সম্প্রতি এই লেখা তৈরি করার সময় আমি পূর্ণ সচিব হিসেবে অবসরপ্রাপ্ত সিরাজ ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলে জানলাম, ঐ সময়টাতে তিনি নিজেও আর্মি-প্রহরায় ছিলেন। বঙ্গবন্ধু ও আওয়ামী লীগের নিকটজন হিসেবে মোশতাকের সরকার তাঁর বাড়িতে পাহারা বসিয়েছিল। একজন মেজর সর্বক্ষণ তাঁকে পাহারা দিত। তিনি ঐ মেজরকে সঙ্গে নিয়েই আমাকে সাহায্য করার জন্য রমনা থানায় গিয়েছিলেন। ঐ মেজর সঙ্গে থাকার কারণে রমনা থানার দারোগা সিরাজ ভাইকে খুবই সমীহ করতে বাধ্য হন। উদার মনের অধিকারী সিরাজ ভাই সেদিন আমাকে কিছু সিগারেটও দিয়ে এসেছিলেন, যা আমি হাজতের অন্য আসামিদের সঙ্গে ভাগ করে মহানন্দে পুড়িয়েছিলাম।

১৬ নভেম্বর। দুপুরবেলা। হঠাৎ রমনা থানা প্রাঙ্গণ বুটের শব্দে চঞ্চল হয়ে ওঠে। স্যালুটের পর স্যালুট চলতে থাকে। একসঙ্গে আসা বেশ ক'টি জিপের আওয়াজ পাওয়া যায়। বোঝা যায়, থানায় গুরুত্বপূর্ণ কেউ এসেছেন। আমি তো চুন খেয়ে মুখ-পোড়ানো মানুষ, বুটের শব্দ শুনলেই ভয় পাই। ভাবি, ঐ বুঝি এলো আমার যম। পুলিশদের দৌড়াদৌড়ি শুনে হাজতকক্ষের সকল হাজতি দ্রুত গা ঝাড়া দিয়ে উঠে বসল। যখন বুঝলাম বুটের শব্দ হাজতের দিকে আসছে, তখন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার বুকের পালপিটিশন বেড়ে গেল। সর্বনাশ ! না জানি কে এলো আমার দ্বারে। পাছে চোখে পড়ে যাই, সেই ভয়ে আমি অন্য হাজতিদের পেছনে নিজেকে লুকিয়ে ফেলার চেষ্টা করি। কিন্তু লাভ হয় না। পুলিশ হাজতের সামনে এসে সরাসরি আমার নাম ধরে ডাক দেয়। কোথায় কবি সাহেব? আমার জন্য নিশ্চয়ই এটা সুখবর আছে, এরকম মনে করে হাজতের ভিতরের বেশ ক'জন আমাকে সামনের দিকে ঠেলে দেয়। মনের ভিতরে প্রচণ্ড দুর্বিনীত ভাবের সৃষ্টি হলেও, আমি খুবই বিনীত ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়াই। ঐ পুলিশের পেছনেই দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিলেন পুলিশের একজন বড়কর্তা। আমাকে বেরুতে দেখে তিনি আমার দিকে এগিয়ে আসেন। তিনি নিজেকে ডিআইজি বলে দাবি করেন। আমি তাঁকে আদাব দিই। বলি, এখন আমাকে অন্য-কোথায়ও নিয়ে যেতে এসেছেন বুঝি? তিনি মাথা নেড়ে বললেন, না ভাই, আপনাকে আমরা অনেক কষ্ট দিয়েছি। আর নয়। আমরা এবার আপনাকে মুক্তি দিতে এসেছি।

হাজতের লৌহ দরজাটি খোলা থাকার পরও আমি হাজত থেকে সম্পূর্ণ বেরুচ্ছিলাম না। ৩ নভেম্বরের জেল-হত্যার ঘটনার কথা মনে করে আমি একটু ভয় পাচ্ছিলাম বেরুতে। খাঁচায় বন্দি-পাখির মতো দরজা খোলা পেয়েও আমি খাঁচা ছাড়ছিলাম না। ঐ পুলিশ অফিসার আমার দ্বিধাগ্রস্ত ভাবটা ঠিকই বুঝতে পারলেন। তিনি তখন আমাকে নির্ভয় করার জন্য আমার কাছে এগিয়ে এসে আমাকে তাঁর বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে বললেন, ভয় কিসের? হাজতের জন্য মায়া হচ্ছে? তাঁর স্পর্শের মধ্যে আমি অভয়বোধ খুঁজে পেলাম। আমি তাঁকে বিশ্বাস করলাম। বললাম, হ্যাঁ, যখন মুক্তির এত কাছে চলে এসেছি, তখন সত্যি বলতে কি, এই হাজত ছেড়ে যেতে আমার সত্যিই মায়া লাগছে। একটা পিছুটান আমি সত্যিই অনুভব করছি। ভালোবাসার সুখের স্মৃতি যে মানুষকে পিছু টানে, তা নিজ-জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে জানতাম; অপমান লাঞ্ছিত দুঃখের স্মৃতিও যে মানুষকে পিছু টানে, তা আজ আমার নতুন করে জানা হলো।

হাজতের অন্যসব বন্দি-আসামি আমার দিকে এমনভাবে তাকাচ্ছিল, মনে হচ্ছিল, তারা সবাই এরকমের একটি মুহূর্তেরই স্বপ্ন দেখছে। তাদের অনেকের স্বপ্নই হয়তো সফল হবে না। বন্দির কাছে মুক্তির চেয়ে বড় স্বপ্ন আর হয় না। চলে আসার সময় পেছনের দিকে তাকিয়ে যখন আমি ঐ হাজতের মধ্যে গুটিসুটি মেরে নিশ্চুপ বসে-থাকা নিজেকে আর দেখতে পেলাম না—, তখন আমি খুবই আবেগাপ্লুত হয়ে পড়লাম। সবার উদ্দেশ্যে বললাম, যাই, আবার দেখা হবে। বললাম বটে, কিন্তু সেটা ছিল নিতান্তই কথার কথা। আমি ঠিকই জানতাম, ঐগুলো শুধুই কথার কথা। তবু বলতে হয়। বলাটাই ভালো। যারা বন্দি, তাদের ঐরকমের আশার কথা শুনতে ভালো লাগে। মিথ্যা হলেও।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাজত থেকে বেরিয়ে আমি ওসি-র রুমে এসে বসি। আমাদের জন্য চা-বিস্কিট আসে। ডিআইজি সাহেবের সঙ্গে আমিও চা-বিস্কিট খাই। স্বাধীন মানুষ হিসেবে আমি আবার নিজেকে অনুভব করতে শুরু করি। ইতোমধ্যে আমাকে মুক্তি দেবার জন্য যাবতীয় কাগজপত্র তৈরি করা হয়। যে কাগজটি কোর্টে হাকিমের কাছে জমা দেয়া হবে, সেই কাগজে ডিআইজি সাহেব লেখেন— 'Honourably released.'

এমন আকস্মিকভাবে আমাকে যে মুক্তি দেয়া হতে পারে, আমি বা মহাদেব তা আঁচও করতে পারিনি। ঐ দিন রোববার ছিল। আমি আরও একটি বিনিদ্র রজনী পাড়ি দেবার জন্যই মানসিকভাবে প্রস্তুত হচ্ছিলাম। তখন মেঘ না চাইতেই বৃষ্টির মতো দুপুর এলো আমার মুক্তির বার্তা নিয়ে। মুক্তির আনন্দে আমার মনটা নেচে উঠল। আহ্ কী আনন্দ! দুঃখ যেমন আকস্মিকভাবে আসে, আনন্দও তেমনি। তখনও দুপুরের খাবার নিয়ে শৈবালেন্দু বা মোস্তফা মীর থানায় আসেনি। এলে ভালো হতো। একটু পরে থানায় এসে ওরা যখন আমাকে পাবে না,— তখন?

আনন্দের মধ্যে বিষাদের মতোই একটি প্রশ্ন মনে এলো আমার, আজ তো ছুটির দিন। রবিবার। আজ কোর্ট কোথায়? ডিআইজি সাহেব বললেন, সবকিছু ঠিক আছে। কোর্টের ছুটি থাকে না। আপনি এখুনি কোর্টে চলে যান। সেখানে একজন হাকিম অপেক্ষায় থাকবেন আপনার জন্য। আমাদের তো নিয়ম মেনে চলতে হবে। হাকিম ছাড়া আমরা আপনাকে ছাড়তে পারব না। তিনি একজন পুলিশ অফিসারের জিপে আমাকে উঠতে বললেন, যিনি আমাকে কোর্টে নিয়ে যাবেন। আমি একটু সন্দেহ নিয়েই ঐ পুলিশ অফিসারের জিপে আরোহণ করলাম। ভাবলাম, কী জানি বাবা! আবার ভুল করলাম না তো? এখন তো কাগজেপত্রে আমি রমনা থানা থেকে মুক্ত। এখন আমি কোথায়? এখন আমাকে যদি?—তাহলে? আমি জিপে ওঠার সময় ডিআইজি সাহেব কাঁধে হাত রেখে আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, দুঃখ করবেন না কবি সাহেব, আপনি হলেন লেখক মানুষ। লেখার জন্য নানা রকমের অভিজ্ঞতা দরকার পড়ে। আপনি একসময় এই অভিজ্ঞতার কথা লিখতে পারবেন। দেশের জন্য মাঝে মাঝে এরকম কষ্ট করা ভালো।

আমি বললাম, নিশ্চয়ই। তাতে দেশ ও মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক গাঢ় হয়। দেশের জন্য মানুষ অকাতরে প্রাণ দিচ্ছে। আমি তো সামান্য ক'দিন। এটা কোনো ব্যাপারই না। সময়টা ভালো নয় বলেই আমাকে বেশি দুশ্চিন্তার মধ্যে দিন কাটাতে হয়েছে। আর লেখার কথা বললেন? হ্যাঁ, লিখতে নিশ্চয়ই পারব। কিন্তু আমি এই অভিজ্ঞতা নিয়ে কিছু লিখব না। না লেখারই চেষ্টা করব আমি। আমার লেখার বিষয় আরও অনেক আছে।

২১ বছর পর আজ ঐ কথাগুলো আমার খুব মনে পড়ছে। ডিআইজি ছিলেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একজন সত্যিকারের ভালো মানুষ। আমার প্রতি তিনি ছিলেন খুব সহানুভূতিশীল এবং শ্রদ্ধাশীলও। তাঁকে ঐ কথাটা আমি সেদিন কেন বলেছিলাম? মনে হয় মৃত্যু-সম্ভাবনার সঙ্গে যুদ্ধ করে করে কষ্ট পাওয়ার অভিমান থেকেই আমি সেদিন রেগে গিয়ে কথাটা ঐরকম করে বলেছিলাম। যে কথা ভেবে আমি আজও অনুতপ্ত বোধ করি।

দুপুরে আমাকে ভাত দিতে গিয়ে রমনা থানার হাজতে আমাকে না পেয়ে শৈবালেন্দু চোখে অন্ধকার দেখে। সে দ্রুত মহাদেবের বাসায় ফিরে যায় এবং বাসায় ফিরেই হাউ-মাউ করে কাঁদতে শুরু করে। মহাদেবও খুবই দুশ্চিন্তার মধ্যে পড়ে যায়। আমাকে ছুটির দিনে কোর্টে নিয়ে যাওয়া হয়েছে— রমনা থানা-পুলিশের ঐ কথায় তারা কেউই আস্থা স্থাপন করতে পারে না। ওরা ভাবে, কোর্টের নাম করে আমাকে নিশ্চয়ই ক্যান্টনমেন্টে নিয়ে যাওয়া হয়েছে এবং অদ্যই আমার শেষ-রজনী।

মহাদেব, মোস্তফা মীর আর শৈবালেন্দু— তিনজন মিলে তখন বিষয়টি তদন্ত করে দেখার জন্য বিকেলের দিকে কোর্টে আসে। যার বন্ধু বা ভাই রক্তচক্ষু-সামরিক বাহিনীর সন্দেহবিদ্ধ— তার নিজের বিপদও কিছু কম ছিল না। ঝুঁকি নিয়েই তারা কোর্টে আসে এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা আমাকে আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়। আমার মতো অন্যান্য থানা থেকেও কিছু আসামি সেদিন কোর্টে এসেছিল। কিন্তু ছুটির দিন থাকায় হাকিম সাহেব সহজে কোর্টে আসছিলেন না। সূর্য ডোবার একটু আগে-আগে তিনি কোর্টে আসেন। তখন উকিলের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র তৈরি করে আমাদের মহামান্য হাকিমের সামনে হাজির করা হলে, মাননীয় হাকিম আমার মুক্তিপত্রে সদয় স্বাক্ষর দান করেন।

কাঠগড়া থেকে সমতলে নামামাত্র মহাদেব, মোস্তফা মীর আর শৈবালেন্দু আমার দিকে দৌড়ে ছুটে আসে। আমিও মুক্তির আনন্দে আমার তিন রকমের, তিন বয়সের তিন শুভার্থীর দিকে ধাবিত হই।

কলেরা ইনজেকশন নেয়ার পর কলেরায় আক্রান্ত হওয়ার ভয় থেকে দেহ-মন যেমন মুক্ত হয়—, আমার সে রকমই নিজেকে নির্ভয় বলে মনে হতে থাকে। মনে এইরূপ প্রত্যয় আসে যে, অতঃপর আমাকে আর কেউ দেশদ্রোহী সন্দেহে গ্রেফতার করতে পারবে না। আমি দেশপ্রেমের ইনজেকশন নিয়ে এসেছি। একটা প্রচণ্ড রকমের ভূমিকম্পকে সহ্য করে, বাংলার মাটিতে দাঁড়িয়ে থাকার সংগ্রামে আমি জয়ী হয়েছি।

পাঁচ দিনের বন্দিজীবনের ধকল সইতে না পেরে আমার স্বাস্থ্য ভেঙে পড়েছিল। আমি এত ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম যে, আমি প্রায় কথাই বলতে পারছিলাম না। আমার মাথার চুল কয়েক দিনের মধ্যেই অনেকটা পেকে গিয়েছিল। এমনিতেই আমার স্বাস্থ্য খুব ভালো ছিল না। শীতের সময় আমার সর্দিকাশি হতো। থানা হাজতের ঠাণ্ডা মেঝে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ও স্যাঁতসেঁতে দেয়ালের একটি ছোট্ট ঘরের মধ্যে অপরিচিত সব হাজতির সঙ্গে বন্দি-বিনিদ্র রজনী যাপনের কারণে আমার বুকে কফ জমে যায়। আমি বাসায় ফিরেই শয্যা নিই। পাড়ার যারা আমাকে আর দেখা যাবে না বলে আশংকার মধ্যে ছিলেন, তারা অনেকেই আমাকে দেখতে আসেন। আমার হয়ে মহাদেবই তাদের সঙ্গে কথা বলে। অনেকদিন পর আমি আমার বিশ্বস্ত-বন্ধুর গৃহে নিশ্চিন্তে ঘুমাই।

ঐ দিন আমি আর পিজিতে যাই না। মহাদেব পিজিতে গিয়ে আবুল হাসানকে আমার ফিরে আসার সুসংবাদটি জানায়। আবুল হাসান আমার ভবিষ্যৎচিন্তায় খুবই দুর্ভাবনার মধ্যে ছিল। মহাদেবের মুখে আমার মুক্তির খবর পেয়ে হাসান খুব খুশি হয়। মহাদেব রাতে বাসায় ফিরে এলে আমি তার কাছে আবুল হাসানের স্বাস্থ্যের খোঁজ নিই। মহাদেব জানায়, হাসানের অবস্থার খুব একটা উন্নতি হচ্ছে না। ডাক্তাররা ওর ব্যাপারে খুব একটা কার্যকর কিছু করতে পারছেন না।

পরদিন আমি নিজেকে দেখাতে এবং আবুল হাসানকে দেখতে পিজিতে যাই। হাসান পিঠের তলে বালিশ দিয়ে হাসপাতালের শুভ্র-শয্যায় শুয়ে ঘন-ঘন শ্বাস টানছিল। বুক ওঠানামা করছে। বুঝতে পারছিলাম তার শ্বাস নিতে খুব কষ্ট হচ্ছে। আমাকে দেখেই হাসান বিছানায় উঠে বসতে চায়। আমি ছুটে গিয়ে বিছানায় উবু হয়ে ওর বুকের সঙ্গে বুক মিলাই। আমার মুক্তিতে হাসানকে দায়মুক্ত বলে মনে হয়। সে আমার ঐ ক'দিনের অভিজ্ঞতা জানতে আগ্রহ প্রকাশ করলে আমি বলি, আমি বেশ ভালোই ছিলাম। পুলিশের হাতে আমি টর্চারড হয়েছি কি না, তা-ও সে জানতে চায়। আমি বলি, না। আমাকে টর্চার না করার জন্য কর্নেল নোয়াজেশ পুলিশের প্রতি যে নির্দেশ দিয়ে গিয়েছিলেন ঐ নির্দেশটি যে যথাযথভাবে পুলিশ পালন করেছিল, তা শুনে হাসান খুশি হয়।

ফিরে আসার সময় হাসানকে আশায় উদ্বুদ্ধ করার উদ্দেশ্যেই বলি, আমি যখন মুক্তি পেয়ে যমের ঘর থেকে ফিরে এসেছি, তখন তুমিও ভালো হয়ে যাবে। দেহের বাইরের শত্রুতাকে জয় করে আমি যেমন জীবনযুদ্ধে জয়ী হয়েছি, তুমিও তোমার দেহের ভিতরের শত্রুতাকে জয় করে সুস্থ হয়ে উঠবে।

আমি জানতাম, আবুল হাসান ছিল ওর মা এবং ওর বোনদের প্রতি খুবই দুর্বল। বিশেষ করে বুড়ির প্রতি ওর খুবই দুর্বলতা ছিল। পারিবারিক কথা উঠলে হাসান ওর মা এবং বোনদের কথাই বেশি বলত। বাবা বা ভাইদের কথা সে খুব একটা বলত না। ওর শয্যাপাশে গ্রাম থেকে আসা বোন বুড়ি এবং মা সর্বদাই উপস্থিত থাকত। হাসানের কাছ থেকে ওরা আমার সম্পর্কে এবং আমার পরিবারের অনেকের কথাই শুনেছিল। বুড়ি ও হাসানের আম্মা জানত যে, হাসান অনেকবার আমাদের গ্রামের বাড়িতে গেছে। কিন্তু আমি ওদের বাড়িতে কখনও যাইনি। হাসানও নিজের বাড়িতে খুব একটা যেত না। সুস্থ থাকার সময়ও হাসান আমার চাইতে কমই গ্রামের বাড়িতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যেত। বার্লিন থেকে ফিরে আসার পর হাসান একবারও গ্রামের বাড়িতে যায়নি। আমি ওকে গ্রামের বাড়িতে যাবার কথা বললে হাসান বলত, যাব ... আরও একটু ভালো হয়ে নিই, পরে যাব। আমার এখন বড়-ডাক্তারদের কাছাকাছি থাকা দরকার। দীর্ঘদিন হাসান গ্রামের বাড়িতে না যাওয়ার কারণে বুড়ি এবং খালাম্মা আমার কাছে অভিযোগ করলেন। বললেন, এবার হাসান ভালো হয়ে গেলে তুমিও হাসানের সঙ্গে আমাদের বাড়িতে আসবে। আমি বললাম, নিশ্চয়ই যাব।

বুড়ির মাথায় ও হাসানের পায়ে আদর করে হাত বুলিয়ে দিয়ে আমি হাসপাতাল থেকে চলে আসি। হাসানের পায়ে হাত বুলাতে গিয়ে লক্ষ্য করি, তার পা বেশ ফুলে উঠেছে। তার মানে জল এসেছে হাসানের পায়ে। এটা খুবই খারাপ লক্ষণ। আমি খুব চিন্তিত বোধ করি।

মহাদেব ও আবুল হাসান আমাকে যৌথভাবে যে চিঠি দুটো লিখেছিল— আমি ঐ চিঠি দুটো সঙ্গে করে ঢাকায় নিয়ে এসেছিলাম। আমার প্রিয় চিঠিগুলোকে আমি আমার সঙ্গে সঙ্গেই রাখতাম। আগেই জানিয়েছি, ভারত এবং আমেরিকান কানেকশন ছিল বলে আমার বড় ভাই ও বন্ধু পূরবীর চিঠি দুটো আমি ভয় পেয়ে পুলিশ কন্ট্রোলরুমের বাথরুমে ঢুকে ছিঁড়ে ফেলে টয়লেটে ফ্লাশ করে দিয়েছিলাম। কিন্তু আবুল হাসান ও মহাদেবের চিঠির খামটি আমার পকেটেই ছিল। রমনা থানা হাজতে যখন ছিলাম, তখন আমার ঘুম আসত না, তখন সময় কাটাবার জন্যই ঐ চিঠি দুটো আমি পড়তাম। বারবার পড়তাম। ভালো লাগত। হাজতিদের কেউ-কেউ ভাবত আমি বুঝি আমার কোনো প্রেমিকার চিঠি পড়ছি। আসলে ঐ চিঠি দুটোকে আমি প্রেমপত্ররূপেই গ্রহণ করতাম। বন্ধুর উদ্বেগ ও ভালোবাসা মাখা ঐ চিঠি দুটো আমাকে জীবনের বিষাদদীর্ণ মুহূর্তে আনন্দ দিত, বাঁচবার সাহস যোগাত। উন্নতির পরিবর্তে হাসানের অবস্থা যখন ক্রমশ অবনতির দিকে যাচ্ছিল, তখন আমার কাছে হাসানের চিঠিটির গুরুত্ব আরও বেড়ে যায়। আমি গভীর রাতে আবার হাসানের চিঠিটি খুলে পড়তে বসি। কী বলতে চেয়েছে হাসান চিঠিতে? আমার মতো একজন সামান্য বন্ধুর চিঠি না পাওয়ার জন্য এত অভিমান হয়েছিল কেন হাসানের? নিজেকে অপরাধী মনে হতে থাকল আমার।

অন্য অনেককে লিখলেও, হাসান বার্লিন থেকে আমাকে চিঠি লেখেনি। ১৫ আগস্টের পর, ঐরূপ একটি নৃশংসতম রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় আমি যখন মানসিকভাবে একেবারে বিপর্যস্ত, তখন একদিন দুপুরের দিকে আমি আর মোস্তফা মীর হাইকোর্ট মাজার থেকে সিদ্ধি সেবন করে নিউ পল্টনের মেসের দিকে ফিরছিলাম। সুরাইয়ার সঙ্গে একই রিকশায় করে তখন হাসান যাচ্ছিল হাইকোর্টের সামনে দিয়ে। আমি হাসানকে দেখে রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে হাত উঠাই। হাসান, স্পষ্টই বুঝতে পারি, সুরাইয়ার নির্দেশে তখন চকিতে অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে নেয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রিকশাটি আমাদের পাশ দিয়েই প্রেসক্লাবের দিকে চলে যায়। থামে না। আমি খুব কষ্ট পাই হাসানের ঐরূপ আচরণে। তার দু'একদিন পরেই আমি গ্রামের বাড়িতে ফিরে যাই অনির্দিষ্টকালের জন্য। মহাদেব ওর বাবার শ্রাদ্ধক্রিয়াদি সম্পন্ন করার জন্য তখন গ্রামের বাড়িতে গিয়েছিল। মহাদেব নেই, হাসানও আমাকে দেখে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। নিজেকে খুবই নির্বান্ধব বলে মনে হলো। আমার বুকের মধ্যে লুকিয়ে রাখা ঐ অভিমানের কারণেই আমি গ্রাম থেকে ইচ্ছে করেই হাসানকে কোনো চিঠি লিখিনি। আমি চেয়েছিলাম, ওর চিঠি না পাওয়ার কষ্ট আমি যেমন ভোগ করেছি, ওর উপেক্ষা যেমন আমাকে কষ্ট দিয়েছে; আমার উপেক্ষা, আমার চিঠি না পাওয়ার কষ্টও তেমনি হাসান অনুভব করুক।

চিঠি না লিখে আমি যতটা আঘাত করতে চেয়েছিলাম হাসানকে, হাসানের চিঠি পড়ে মনে হলো সে তার চেয়ে অনেক বেশি আঘাত পেয়েছে। প্রিয়জনের দেয়া আঘাতকে বড় করে গ্রহণ করার ক্ষমতা, আমার তুলনায় হাসানের যে বেশি ছিল, ওর চিঠি থেকে তাই প্রমাণিত হয়। একটি নরম কোমল বন্ধুবৎসল কবিচিত্তকে আহত করার জন্য আমি মনে মনে কষ্ট পেতে থাকি। মহাদেবের চিঠিটিও ছিল খুবই আন্তরিকতাপূর্ণ। কিন্তু পার্থক্য এই যে, মহাদেবের চিঠিটি নিয়ে আমার মনের মধ্যে কোনো অপরাধবোধ তৈরি হয়নি। কিন্তু হাসানের চিঠিটি আমার মনের মধ্যে একধরনের 'গিল্টি ফিলিং' তৈরি করেছিল।

আমি হাসানের চিঠিটি ভালো করে আবার পড়তে শুরু করি।

AMARBOI.COM

আবুল হাসান
মহাদেবের বাসা থেকে

প্রিয় গুণ,

আজ রাত্রে মহাদেবের সঙ্গে আল মাহমুদের এক তুমুল বাকবিতণ্ডার পর, মহাদেবের বাসায় এসে দেখি তোমার একটি অভিমানী চিঠি মহাদেবের কাছে, যা তুমি লিখেছ। চিঠিটা বারবার পড়লুম। অনেকদিন পর তোমার সান্নিধ্য চিঠির মাধ্যমে পেয়ে একদিকে যেমন ভালো লাগল, অন্যদিকে তেমন আহত হলুম, এই ভেবে যে তুমি আমার ঠিকানা জানা সত্ত্বেও একটা চিঠিও আমাকে লেখনি। জানি না কী কারণ? তবে চিঠি না পেলেও তোমার সম্পর্কে অনবরত এর ওর কাছ থেকে খবর নিতে চেষ্টা করেছি— মাঝে মাঝে তোমার অনুপস্থিতির নৈঃসঙ্গের তাড়নায়ই হয়তোবা। এ ছাড়া এর পেছনে আর কোনো মানবিক কারণ নেই। এক সময় ছিল, যখন তুমি আমাকে হলুদ পোস্টকার্ডে চিঠি লিখতে— তখন তুমি বাইরে থাকলেও মনে হতো তোমার উপস্থিতি উজ্জ্বলভাবে বর্তমান।

আমি মানুষ হিসেবে কতটুকু সৎ এবং শুভবুদ্ধির সেটা বিচারসাপেক্ষ, তবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বন্ধু হিসেবে একসময় তো আমরা পরস্পরের কাছাকাছি এসেছিলাম। আমাদের জীবনযাপন সূত্রগুলো একে একে পরে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত হলেও সেই প্রবল প্রচ্ছন্ন দিনগুলোর কি কোনো কিছুই আর আমাদের মধ্যে অবশিষ্ট নেই, যা তোমার স্মৃতিকে একবারও নাড়া দিতে পারে? বা পারত? এবং সেই স্মৃতির সুবাদে একটা চিঠি কি আমিও পেতে পারতুম না? মানি, আমার নিজের কিছু কিছু এককেন্দ্রিক দোষ-ক্রটি এবং মানবিক দুর্বলতা শেষকালে আমাদের দু'জনকে দু'দিকে সরিয়ে দিয়েছিল— প্রথমদিকে আমি যা ভালোবাসতাম না সেইগুলো তোমার ভালোবাসার জিনিস ছিল- পরে যখন তুমি সেই মদ মাগী গাঁজা চরস পরিত্যাগ করলে এবং সেই সময় যখন আমাদের সবচেয়ে নিকটবর্তী হওয়ার সময়, কেন জানি না এক অনির্দিষ্ট অদৃষ্টের তাড়নায় আমরা দু'জন পরস্পরের কাছ থেকে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লাম। বিচ্ছিন্নতার কারণ হয়তোবা আমার দুরারোগ্য ব্যাধির তাড়া না।

বার্লিন থেকে আসার পর আমি অন্য মানুষ। ফলে পুরনো যোগসূত্র সংস্থাপনের চেষ্টা করেছি যতবার, —ততবার দেখেছি আমার শরীর আমার বৈরী। তুমি যা ভালোবাসো, সেইসব আমার শরীর ভালোবাসে না, তবে অসুস্থতার কারণেই। কিন্তু সত্তায় আমাদের যে গভীর সম্পর্কের সূত্র, কবির সঙ্গে কবির সেই সম্পর্ককে তো আমি কোনোদিন হ্রাস করিনি।

১৬ আগস্টের পর; তোমার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে— কিন্তু পরে একদিন হঠাৎ জানলাম তুমি আর ঢাকায় নেই। তোমার ঢাকা ছেড়ে চলে যাওয়ার ব্যাপারটায় দুঃখ পেয়েছিলাম; বিস্ময়ও কম বাজেনি। কিন্তু পরে আবার ভেবেছি, যেভাবে তুমি মাঝে মাঝে বাড়ি যাও, সেভাবেই হয়তো গিয়েছ, পরে আবার কিছুদিনের মধ্যে ফিরে আসবে। কিন্তু পরে জানতে পারলুম, তুমি গিয়েছ অনেকদিনের জন্য। বাড়ি গিয়ে তুমি বিভিন্নজনের কাছে চিঠি লিখেছ, সেইসব চিঠিতেই এইসব জানতে পেরেছি। আমিও অপেক্ষায় ছিলুম, একটা চিঠি পাব, কিন্তু সবসময় অপেক্ষা যে ফলপ্রসূ হবে, এটার তো কোনো কথা নেই।

মহাদেবের কাছে তোমার চিঠি বারবার পড়েছি। বারবার পড়বার মতোই। কবির চিঠির মধ্যে যে দুঃখবোধ এবং নৈঃসঙ্গবোধ থাকে, তার সবরকম চিৎকার হঠাৎ আমাকেও একা— সম্পূর্ণ একা করে দিয়ে গেল কিছুক্ষণের জন্য। এই একাকীত্বের দরকার ছিল আমারও। আমি অনেকদিন এরকম সুন্দরভাবে একা হতে পারিনি। বার্লিন থেকে ফেরার পর আমি এই একাকীত্বই বিভিন্নজনের সান্নিধ্যে খুঁজতে চেষ্টা করেছি। যার জন্য আমি এক রমণীর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলাম, এখন সেই শ্রীমতীও আমাকে আর একাকীত্ব দিতে পারেন না। হতে পারে এই একাকীত্ব কেবল তুমিই আমাকে একবার অনেকদিন ধরে দিয়েছিলে। তুমি কি ভুলেই গেলে সেইসব দিনের কথা— যখন শীতের কুয়াশায় মধ্যরাত্রির বাতাসকে আমরা সাক্ষী রেখে ঢাকা শহরের অলিগলি চষে বেড়িয়েছি। আমরা তখন কী সুখী ছিলাম না? সেই সুখের কারণেই কি তুমি আবার ফিরে আসতে পার না? যতই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভালোবাসার পিছনে ধাবমান আমাদের ছায়া এর ওর সঙ্গে ঘুরুক, তুমিও জানো আর আমিও জানি — একসময় আমরাই আমাদের প্রেমিক ছিলাম। আর একমাত্র পুরুষ এবং আর একজন পুরুষই ভালোবাসার স্মৃতি সংরক্ষণ করতে পারে—, কারণ রমণীরা অতি নশ্বর। কিন্তু সেই নশ্বরতার বেদনাবোধ কেবল কবি-পুরুষরাই একমাত্র গ্রহণ করতে পারে। সেই নশ্বরতার অঙ্গীকারে আমরা আমাদের বেঁধেছিলুম একদিন। এখনও সেই বোধ, সেই ভালোবাসা আমার জীবনের একমাত্র স্মৃতি, জানি না তোমার ক্ষেত্রে তার স্পর্শ আর কতদূর মূল্যবান।

ভালোবাসা নিও। ভালো থেকো এবং ফিরে এসো।
ইতি। চিরশুভাকাঙ্ক্ষী হাসান।

[সচিত্র সন্ধানী : ১ম বর্ষ ৩১ সংখ্যা, রবিবার ২৬ নভেম্বর ১৯৭৮]

আমি খুবই শক্ত মনের মানুষ। ছোটবেলায় মাকে হারিয়েছিলাম। কাঁদিনি। বড় ভাই যখন ভারতে চলে যায়, তখনও আমার কান্না আসেনি। আমি সহজে কাঁদি না। একেবারে কাঁদিই না বলা যায়। কিন্তু হাসানের চিঠি পড়ে আমার প্রায় কান্না চলে আসে। আমি মনে মনে কাঁদি।

হাসানের চিঠিটি আমার হস্তগত হয়েছিল ১৫ অক্টোবর, ১৯৭৫ তারিখে। এর রচনা তারিখ ১২ অক্টোবর রাত। আমাকে অভিমানমুক্ত করার জন্য, চিঠির অন্তিম পঙক্তি 'এবং ফিরে এসো' কথাটাকে কী প্রবল ভালোবাসার আর্তি দিয়েই না কাচের ওয়েটপেপারের ভিতরের রঙিন ফুলের মতো করে সাজিয়েছে হাসান। ওর চিঠি পড়ে মানতেই হলো, আমি হাসানকে যতটা ভালোবেসেছি, হাসান আমাকে তার চেয়ে বেশি ভালোবেসেছে। না হলে এমন চিঠি কখনও বানিয়ে লেখা যায় না।

দিনের পর দিন যেতে থাকে। হাসানের অবস্থার কোনো উন্নতি হয় না। তার অবস্থা ক্রমশ অবনতির দিকেই ধাবিত হতে থাকে। আমরা কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মতো ক্রমশ নিভে-আসা হাসানের জীবনপ্রদীপের তেলহীন সলতেটিকে উসকে দিয়ে তার মধ্যে আলো ফুটিয়ে তোলার বৃথা চেষ্টায় দিন গুনতে থাকি।

নভেম্বরের ৪ তারিখ হাসান ভর্তি হয়েছিল পিজিতে। ক্রমাগত বাইশ দিন বক্ষব্যাধির (Enlarged heart) সঙ্গে সংগ্রাম করার পর আসে ২৬ নভেম্বরের ভোর। শীতের কুয়াশামাখা ভোর হাসানের প্রিয় ছিল। মৃত্যুর জন্য কোন সময়টা ভালো—এই নিয়ে একদিন আমার সঙ্গে হাসানের কথা হয়েছিল। আমি বলেছিলাম, মৃত্যুর জন্য কোনো সময়ই ভালো নয়। হাসান বলেছিল, এটা হচ্ছে তোমার গায়ের জোরের কথা। একটা সময় তো বেছে নিতেই হবে। হাসান বলেছিল, আমার ভালো লাগে ভোরের দিকটা। শীতের সময়। ছোটবেলায় গ্রামের বাড়িতে যখন থাকতাম, খুব সকালে উঠতাম ঘুম থেকে, শীতের শেফালি কুড়াবার জন্য। মসজিদে তখন আজান দিত মোয়াজ্জিন। খুব ভালো লাগত!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওর ঐ কথাটাই শেষ পর্যন্ত সত্য হলো। প্রিয় সময়টাতেই শেষ-নিঃশ্বাস ত্যাগ করল হাসান। ২৬ নভেম্বরের কুয়াশাঢাকা ভোরে, ঝরা শেফালির মতোই অভিমানী হাসান নশ্বর দেহকে পরিত্যাগ করে ওর অনশ্বর-অদৃশ্য আত্মায় তুলে নিল অনন্তের পথ।

হাসান যখন জন্মভূমির এই মায়াময় মাটির পৃথক পালংকে শয়ন করবে—, তখন তার উদ্বাস্তু-উন্মূল যৌবনসঙ্গীটি যেন ঘটে-যাওয়া রাজনৈতিক নিষ্ঠুরতার ঘটনায় অভিমান করে দূরে, গ্রামের বাড়িতে লুকিয়ে না থেকে ঢাকায় ফিরে এসে তার প্রিয়বন্ধুর অন্তিম পালংক-নির্মাণে অংশ নিতে পারে, তা নিশ্চিত করার জন্যই কি আবুল হাসান এই আবেগমথিত পত্রটি আমাকে লিখেছিল? ওর অজ্ঞাতসারে? আমার তা মনে হয় না। আমার মনে হয়, হাসান জানত, এটিই হবে ওর শেষ চিঠি।

একবার হাসানের মরদেহ তাঁর গ্রামের বাড়িতে নিয়ে যাবার কথাও ভাবা হয়েছিল, কিন্তু পরে পরিবারের সদস্যরা, তাঁর অনুরাগী ভক্ত ও বন্ধুরা বনানী কবরস্থানেই তাঁকে কবর দেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। বাংলা একাডেমী ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মসজিদে নামাজে জানাজা পড়ার পর, আমরা বিকেলের দিকে হাসানের মরদেহটিকে একটি পুষ্পশোভিত ট্রাকে তুলে বনানী কবরস্থানে নিয়ে যাই। তাঁর অন্তিম কাব্যগ্রন্থ 'পৃথক পালংক'-এর প্রকাশক গাজী শাহাবুদ্দিন আবুল হাসানের কবরের মাটি ক্রয় করার জন্য তিন হাজার টাকা প্রদান করেন।

আমরা জানতাম, ১৫ আগস্ট, ৩ নভেম্বর এবং ৭ নভেম্বরের শহীদরা বনানীর কবরে শায়িত আছেন। ইচ্ছা থাকলেও এতদিন ঐ শহীদানদের কবর জিয়ারত করার সুযোগ আমাদের হয়ে ওঠেনি। সুযোগ থাকলেও সাহস হয়নি। আবুল হাসান আমাদের সেই সাহস বাড়িয়ে দিয়ে গেল। আবুল হাসানের কবরের জন্য একটি ভালো জায়গা খুঁজতে গিয়ে আমি বঙ্গবন্ধুর পরিবারের সদস্যদের পাশাপাশি, রব সেরনিয়াবাত ও শেখ মণির পরিবারের সদস্যদের কবরের সামনে থমকে দাঁড়াই। ১৫ আগস্টের নিহতদের কবরের পরেই ৩ নভেম্বরে জেলে নিহত ৩ জাতীয় নেতা সৈয়দ নজরুল ইসলাম, এম মনসুর আলী এবং তাজউদ্দীনের কবর। তিন নেতার কবর পেরুতেই চোখে পড়ল ৭ নভেম্বরে 'সিপাহী বিপ্লবে' নিহত খালেদ মোশাররফের ব্যর্থ অভ্যুত্থানের বিশ্বস্ত সহযোগী (রংপুর ব্রিগেডের কমান্ডার) কর্নেল হুদার কবর। কর্নেল খন্দকার নাজমুল হুদার কবরের পরে আর কারও কবর হয়নি। পাশের জায়গাটা ছিল খালি। কেন খালি ছিল, কে জানে? হয়তো ভয়ে। ভারতের চর হিসেবে কলংকিত করে যারা খালেদ মোশাররফ ও তাঁর দুই সহযোগীকে হত্যা করেছিল, তারাই রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করতে, মনে হয় ৩ নভেম্বরের ব্যর্থ-অভ্যুত্থানের অন্যতম নায়কের পাশের মাটিতে কেউ তার প্রিয়জনকে কবর দিতে সাহস পাচ্ছিল না, পাছে মৃতের জীবিতরা রাষ্ট্রক্ষমতা দখলকারীদের কুনজরে পড়ে যায়। ৩

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নভেম্বরের অভ্যুত্থানের নায়করা সত্যি সত্যিই ভারতের চর ছিল— ঐরূপ বিশ্বাস থেকেই এমনটি হতে পারে। কিন্তু আমার ঐরূপ ভয় ছিল না। আমি কখনও বিশ্বাস করিনি, খালেদ মোশাররফ-হুদা-হায়দাররা ভারতের চর। বরং ভারত জুজুর ভয় তখন যারা বেশি দেখিয়েছিল, তাদের নিয়েই আমার সন্দেহ। খালেদ-হুদা-হায়দাররা ছিলেন সত্যিকারের বীর ও দেশপ্রেমিক। খালেদ মোশাররফের কবরটি ছিল বনানী কবরস্থান সংলগ্ন আর্মি গ্রেভিয়ার্ডের ভিতরে। কর্নেল হুদার পাশের জায়গাটা খালি পেয়ে আমার খুব ভালো লাগল। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম আসামী হিসেবে কর্নেল হুদা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের একজন বিশ্বস্ত ভক্ত ছিলেন। মনে মনে সিদ্ধান্ত নিলাম, খালেদের পাশেই আবুল হাসানের কবর হবে। সবাই আমার প্রস্তাব মেনে নিল। তখন বনানীর মাটি খুঁড়ে আমরা আবুল হাসানের জন্য একটি গভীর কবর খনন করলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই ১৫ আগস্ট, ৩ নভেম্বর ও ৭ নভেম্বরের বীর-শহীদদের পাশে নির্মিত হলো ২৬ নভেম্বরের অকালপ্রয়াত এক অভিমানী কবির কবর। জীবদ্দশায়, চঞ্চল জীবন যাদের দূরে সরিয়ে রেখেছিল, নিশ্চল মৃত্যু কী চমৎকারভাবেই না একই মালার ফুলের মতো করে পাশাপাশি গেঁথে দিয়ে গেল তাঁদের।

কবি আবুল হাসানের মরদেহকে মাটির গভীরে প্রোথিত করে, আমরা যখন নগরীর দিকে ফিরছি, তখন আমার বক্ষচাপা-ক্রন্দন উদগত দীর্ঘশ্বাসের মতো মুক্ত হলো একটি ছোট্ট-পঙক্তিতে : ভালোবেসে যাকে ছুঁই সেই যায় দীর্ঘ পরবাসে...।

কিছুদিন পরে আবুল হাসানকে নিয়ে আমি যে এলিজিটি লিখি, ঐটি তার অন্তিমচরণে পরিণত হয়।

২৬ নভেম্বরের ভোরে আবুল হাসানের মৃত্যুর পাশাপাশি আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে। হাসানের মৃত্যুসংবাদ শুনে আমি যখন পিজি হাসপাতালের গেটে পৌঁছাই—তখন হঠাৎ একদল পুলিশ ছুটে এসে পিজি হাসপাতালটিকে ঘিরে ফেলে। পুলিশ কর্ডন করা অবস্থায় একটি বড় কালো মার্সিডিজ গাড়ি একই সঙ্গে খুব দ্রুত পিজি হাসপাতালের ভিতরে প্রবেশ করে। আমি হাসপাতালের ভিতরে প্রবেশ করতে গিয়ে দেখতে পাই, পুলিশরা একজন রাষ্ট্রদূতকে ধরাধরি করে হাসপাতালের রিসেপশনের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। একজন পুলিশকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারি, উনি হচ্ছেন ভারতীয় হাইকমিশনার শ্রী সমর সেন। তখন তাঁর দেহ ছিল রক্তাক্ত। তাঁর গায়ে শার্ট ছিল না। শুধু গেঞ্জি ছিল। তিনি বাম হাতে ডান কাঁধের দিকে একটি ক্ষতস্থানকে চেপে ধরে খুবই ক্রুদ্ধ-ভঙ্গিতে চারপাশে তাকাচ্ছিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই স্ট্রেচার নিয়ে নার্স ও ডাক্তাররা সমর সেনকে বাঁচানোর জন্য ছুটে আসে। আমি দ্রুত ঐ ঘটনাটিকে পাশ কাটিয়ে উপরে উঠে যাই। সমর সেনের কী হয়েছে— কীভাবে কী ঘটেছে— তা আর তখন জানা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়নি। পরে জানতে পারি, ৬ জন আত্মঘাতী তরুণের একটি দল সকালের দিকে ভারতীয় হাইকমিশনার শ্রী সমর সেনকে অপহরণ করার জন্য ধানমন্ডির ২ নম্বর সড়কে অবস্থিত ভারতীয় দূতাবাসে হামলা চালিয়েছিল। অল্পের জন্য ঐ হামলাটি ব্যর্থ হয়। শ্রী সেনের দেহরক্ষী এবং দূতাবাস-প্রহরারত পুলিশের গুলিতে ঘটনাস্থলেই অপহরণপ্রয়াসীদের মধ্যে চারজন নিহত হয়। দু'জন আহত অবস্থায় পুলিশের হাতে ধরা পড়ে। এরা সবাই জাসদের কর্মী বলে জানা যায়।

এই ঘটনার দু'দিন আগে, ২৩ নভেম্বর রাষ্ট্রদ্রোহী তৎপরতায় লিপ্ত থাকার অভিযোগে জাসদ নেতা রব-জলিলসহ ১৯ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। সরকারি পত্রিকা দৈনিক বাংলায় প্রকাশিত সংবাদের শিরোনামে শুধুই আসম রব ও মেজর জলিলের কথা থাকলেও, ভিতরে ১৭ নম্বর আসামী হিসেবে যে নামটি ছিল, ওটিই ছিল ঐ কথিত রাষ্ট্রদ্রোহী মামলার আসল টার্গেট। তাঁর নাম কর্নেল তাহের।

ঐ মৃত্যুদণ্ডযোগ্য রাষ্ট্রদ্রোহী মামলাটি যে কর্নেল তাহেরকে ফাঁসিতে লটকিয়ে দেবার জন্যই করা হয়েছে—তা বুঝতে পেরেই জাসদের ছয় জন জঙ্গী সদস্য একটি আত্মঘাতী স্কোয়াড গঠন করে ভারতীয় হাইকমিশনার শ্রী সমর সেনকে অপহরণের মাধ্যমে জিম্মি করার চেষ্টা করেছিল। এভাবেই তারা ঐ মামলাটি প্রত্যাহারে জিয়ার সরকারকে ভারতের চাপের মুখে ফেলতে চেয়েছিল। কিন্তু জাসদের জন্য বিধি ছিল বাম। তাই পরিকল্পনাটি অল্পের জন্য ব্যর্থ হয়ে যায়। তাহেরকে বাঁচাতে গিয়ে তাহেরের আপন এক ছোট ভাইসহ চারজন টাটকা তাজা-তরুণ প্রাণ অকালে ঝরে পড়ে।

খালেদ মোশাররফের ৩ নভেম্বরের অভ্যুত্থানের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক আছে—এই অভিযোগটি প্রচার করার ব্যাপারে কর্নেল তাহের ও তাঁর দলের খুবই তৎপর ভূমিকা ছিল। যার পরিণতিতে খালেদ মোশাররফসহ তিন-তিনজন বীর মুক্তিযোদ্ধাকে জীবন দিতে হয়। নিয়তির নির্মম পরিহাসই বলতে হবে, ১৯ দিনের ব্যবধানে, সেই ভারতকে সম্পর্কিত করেই জিয়ার হাত থেকে বাঁচার পথ সন্ধান করতে হলো তাহের ও তাঁর দলকে। ২৬ নভেম্বরের ঐ অপহরণ-প্রচেষ্টাটি সফল হলে বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি কোন দিকে মোড় নিত, তা আমাদের কল্পনার বিষয় হিসেবেই থেকে গেল।

শ্রী সমর সেনকে জিম্মি করার প্রচেষ্টাটি ব্যর্থ হওয়ার ফলে শেষপর্যন্ত জেনারেল জিয়াই লাভবান হন। জঙ্গী জাসদের মোকাবিলায় তিনি ভারতের পরোক্ষ সমর্থন লাভ করেন। তাই অল্পদিনের ব্যবধানে, সংক্ষিপ্ত সামরিক আদালতে দ্রুত বিচারের মাধ্যমে নিষ্ঠুর জিয়া ৭ নভেম্বরের 'সিপাহী বিপ্লবের' প্রধান রূপকার, মুক্তিযুদ্ধে এক-পা হারানো অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল আবু তাহেরকে প্রত্যাশিত অনুকম্পা প্রদর্শনের পরিবর্তে, অবলীলায় ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেন।

এভাবেই ১৯৭৫ খ্রিস্টবর্ষের রক্তঝরা নভেম্বর মাসটির অবসান হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সং যো জ নী

১. ৭ নভেম্বরে খালেদ মোশাররফের বাড়ির যাবতীয় সম্পদ অভ্যুত্থানকারী বিপ্লবী সিপাইরা লুট করে নিয়ে যায়। শুধু অবশিষ্ট ছিল একটি পুরনো মডেলের সোফা। পরে খালেদের স্ত্রী ঐ সোফাটি উদ্ধার করে গাজী শাহাবুদ্দিনকে উপহার দেন।

২. জেলে নিহত জাতীয় চার নেতাকে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের নিকটবর্তী তিন নেতার কবরের পাশে কবর দেয়ার অনুমতি দেয়ার জন্য (৪ নভেম্বর) আওয়ামী লীগের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আবদুল মান্নান খালেদ মোশাররফকে অনুরোধ করেছিলেন। খালেদ ঐ প্রস্তাবে রাজি হননি।

৩. ৫ নভেম্বর বাংলাদেশ টাইমস পত্রিকার তখনকার সম্পাদক এনায়েতুল্লাহ খান খালেদ মোশাররফের অনুমোদনসাপেক্ষে টাইমস-এর প্রথম পাতায় প্রকাশার্থে একটি সম্পাদকীয় লিখে খালেদকে পড়তে দিয়েছিলেন। খালেদ ঐ প্রশংসাসূচক সম্পাদকীয়টি পত্রিকায় প্রকাশের অনুমতি দেননি। পরের দিন ৭ নভেম্বর, খালেদকে হটিয়ে দিয়ে জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় এলে, জিয়াকে স্বাগত জানিয়ে ঐ সম্পাদকীয়টি টাইমস-এর প্রথম পাতায় প্রকাশিত হয়। শুধু খালেদের নাম কেটে বসিয়ে দেয়া হয় জিয়ার নাম।

৪. ৯ তারিখে খালেদের লাশ সিএমএইচ-এর মর্গ থেকে তাঁর পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়। ঐ লাশ গ্রহণ করেছিলেন খালেদের এক চাচা, গাজী শাহাবুদ্দিন এবং সচিত্র সন্ধানী পত্রিকার প্রধান হিসাবরক্ষক শ্রী কেশব গুপ্ত। সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে খালেদের লাশ গ্রহণকারীদের গোপনীয়তা রক্ষা করে, ক্যান্টনমেন্টের বাইরে নিয়ে গিয়ে দ্রুত লাশটিকে দাফন করার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। গাজী শাহাবদ্দিন তার একটি পুরনো মাইক্রোবাসে করে খালেদের লাশটি বহন করে বনানী কবরস্থানে নিয়ে গিয়েছিলেন। বাসায় ভয়ে ভয়ে তার নামাজে জানাজা পড়া হয়। কার্ফ্যু শুরু হয়ে যাবার ভয়ে, খালেদের কবরটিকে গভীরভাবে খনন করাও সেদিন সম্ভব হয়নি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প রি শি ষ্ট

গ্রন্থ-পরিচয়, প্রাসঙ্গিক তথ্য ও আলোচনা

সূত্রধর

সৈকত হাবিব

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাংলাদেশের সাহিত্যে, দেশবিভাগের পর থেকে অদ্যাবধি, যে কজন কবি-লেখক আত্মজীবনী রচনা করে সবিশেষ প্রশংসিত ও আলোচিত হয়েছেন, তাঁদের ভেতর কবি নির্মলেন্দু গুণ নিঃসন্দেহে শীর্ষ একজন। তাঁর অকপট সত্য বলার ভঙ্গি, নিজের গোপনতম কথাটিও অবলীলায় বলে ফেলার ক্ষমতা এবং তথাকথিত শ্লীল-অশ্লীলের দেয়াল ভেঙে সত্যকে নিঃসংকোচে প্রকাশের সাহস আমাদের লেখকদের মধ্যে নির্মলেন্দু গুণেরই আছে। অন্যদিকে পুরো বাংলা আত্মজীবনী-সাহিত্যেই এ ধরনের দৃষ্টান্ত অতি অল্প। কবি এজন্যই নিজেকে 'সত্যসন্ধানী, স্বীকারোক্তিমূলক সাহিত্য-ধারার লেখক' বলে দাবি করে বর্তমান বইয়ের ভূমিকায় লিখেছেন, 'আমি সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় আমার জীবনের অভিজ্ঞতালব্ধ সত্যকে প্রকাশ করার চেষ্টা করেছি।' অন্যদিকে তাঁর আত্মজীবনীর একটি বিশিষ্ট বই *আমার কণ্ঠস্বর* সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে ও-বাংলার কবি-প্রাবন্ধিক সুরজিৎ দাশগুপ্ত *দেশ* পত্রিকায় বইটিকে বিশ্বসাহিত্যের বিখ্যাত সত্য-আত্মজীবনী রুশোর *কনফেশনস*-এর সঙ্গে তুলনা করে লেখেন, 'বহু দিক থেকেই নির্মলেন্দু গুণের *আমার কণ্ঠস্বর* অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসি দার্শনিক জাঁ জাক রুশোর লেখা *স্বীকারোক্তি* নামক বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থের সঙ্গে তুলনীয়। স্বাধীনতার স্বপ্নে উদ্বেলিত, কিন্তু প্রবৃত্তির নাগপাশে জর্জরিত। এ গ্রন্থ মানবিক অস্তিত্বের এমন এক বহুমাত্রিক প্রকাশ, যা একাধারে নাটকীয় ও মর্মস্পর্শী।'

আত্মজীবনী নামে চিহ্নিত রচনা ছাড়াও নির্মলেন্দু গুণের তাবৎ সাহিত্য ও রচনা– কবিতা, প্রবন্ধ, জার্নাল, ভ্রমণকাহিনী ইত্যাদির একটি বৃহৎ অংশই নানা অর্থে আত্মজৈবনিক। নিজের জীবনকাহিনী ছাড়াও যে পর্বে তাঁর জন্ম, বেড়ে ওঠা এবং প্রকাশ ও বিকাশ, তা বাংলাদেশের ইতিহাসের সবচে গুরুত্বপূর্ণ কাল। তাঁর জন্মের দু বছরের মাথায় দেশভাগ; তারপর বাঙালির স্বাধিকার-চেতনার প্রথম প্রকাশ বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন, বঙ্গবন্ধুর ছয় দফা আন্দোলন, উত্তাল উনসত্তর। তারপর বাঙালি জাতির সবচে বড় অর্জন একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধ ও বাংলাদেশ নামে স্বাধীন দেশের আত্মপ্রকাশ। এরপর জাতির সবচে মর্মান্তিক ও শোকাবহ ঘটনা পঁচাত্তরে বঙ্গবন্ধুর সপরিবারে নিহত হওয়া এবং জাতীয় চার নেতার হত্যাকাণ্ড ...।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই যে বিপুল ঘটনাবহুল কাল, এ যেন নির্মলেন্দু গুণেরই সমানবয়সী। এবং সব ঘটনাই তার ৩০ বছর বয়সের মধ্যে সংঘটিত। এই ঘটনাবহুল সময়ই উঠে এসেছে তাঁর চার পর্বের আত্মজীবনীতে। কবির জবানিতেই শোনা যাক:

> 'আমার কবি হয়ে ওঠা, পূর্ব পাকিস্তানের বাংলাদেশ হয়ে ওঠা এবং শেখ মুজিবের বঙ্গবন্ধু হয়ে ওঠা—পরস্পরের হাত ধরে অগ্রসর হওয়া এই তিনটি প্রতিপাদ্যই আমার আত্মজীবনীতে যথাযথ গুরুত্বের সঙ্গে বর্ণিত হয়েছে। আমার আত্মজীবনী তাই আমাদের ইতিহাসের প্রামাণ্য দলিলও বটে। একই সঙ্গে আমার হয়েও সে আমাদের। আমার আত্মজীবনী বাংলাদেশেরও জীবনী। বঙ্গবন্ধুরও জীবনকথা। সে একের ভিতরে তিন।'
>
> 'সম্প্রতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আত্মজীবনী *অসমাপ্ত আত্মজীবনী* নামে প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিটি আত্মজীবনীই অসমাপ্ত। আমার ক্ষেত্রে 'অসমাপ্ত' কথাটা আরও অনেক বেশি সত্য। আমার বয়স এখন আটষট্টি। আমার জীবনবৃত্তান্তে লিপিবদ্ধ সময়কাল আপাতত আমার জীবনের প্রথম তিরিশ বছর। ১৯৪৫ থেকে ১৯৭৫। পুরোপুরি তিরিশ বছরও নয়। ১৯৭১-এর মে থেকে ১৯৭৫-এর ১৫ আগস্ট ও তৎপরবর্তী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছুটা সময় আমার রচনায় অনুপস্থিত রয়ে গেছে। সময়ের ধারাবাহিকতা ডিঙিয়ে রচিত হয়েছে *রক্তঝরা নভেম্বর ১৯৭৫*। এই গ্রন্থটিকে আমার আত্মজীবনীর চতুর্থ পর্ব হিসেবে গ্রন্থের অন্তে যুক্ত করেছি। যুক্ত করেছি গ্রন্থটিকে প্রকাণ্ড করার জন্য নয়, দলছুট সময়খণ্ডকে যতটা সম্ভব এক মলাটের ভিতরে, আমার জীবন-তরীতে তুলে নেবার জন্য।' (এই বইয়ের 'প্রাককথন' দ্রষ্টব্য)

AMARBOI.COM

কবির উপরের উদ্ধৃতি থেকেই অনুমেয়, সেই তিরিশ বছরের আত্মজীবনীতেও অনেক ফাঁক থেকে গেছে। আমরা জানি না, আগামী দিনগুলোতে সেই ফাঁক তিনি পূরণ করবেন কিনা। অন্যদিকে, সেই তিরিশ বছরের পরও তিনি আরো আটত্রিশ বছরের ঘটনাবহুল জীবনযাপন করেছেন। আমার মতো তাঁর বহু রসগ্রাহী পাঠক এই সময়খণ্ডের কথাও তাঁর কাছ থেকে শুনতে বিপুলভাবে আগ্রহী।

তবে আত্মজীবনীর সেই সব পর্ব রচনার আগ পর্যন্ত আমরা এই বইটিকে তাঁর অখণ্ড আত্মজীবনী বলে ধরে নিতে পারি, যদিও সত্যের খাতিরে বইটির নাম হওয়া উচিত (বঙ্গবন্ধুর *অসমাপ্ত আত্মজীবনীর* মতোই) *অসমাপ্ত অখণ্ড আত্মজীবনী*।

একটু আগেই উল্লেখ করেছি, নির্মলেন্দু গুণের রচনার বৃহৎ অংশই নানা অর্থে আত্মজৈবনিক। কিন্তু আত্মজীবনী হিসেবেই তিনি লিখেছেন এই গ্রন্থভুক্ত চারটি বই। এগুলো হলো *আমার ছেলেবেলা, আমার কণ্ঠস্বর, আত্মকথা ১৯৭১* এবং *রক্তঝরা নভেম্বর ১৯৭৫*। আর এই চারটি বই-ই একসঙ্গে গ্রন্থিত হলো *মহাজীবনের কাব্য* শিরোনামে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিচে এই বইয়ে অন্তর্ভুক্ত বইগুলোর প্রকাশনা ও প্রাসঙ্গিক তথ্য উল্লেখ করা হলো :

আমার ছেলেবেলা

এতে বর্ণিত হয়েছে কবির জীবনের ১৯৪৫-১৯৬২ সময়ের ঘটনাবলি। বইটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৮৮-র একুশে বইমেলায়। এরপর ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬ ও ফেব্রুয়ারি ২০১০-এর বইমেলায় যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এই বইটির মধ্য দিয়েই নির্মলেন্দু গুণের আত্মজীবনী রচনার সূত্রপাত ঘটে।

উৎসর্গপত্র

আমার কন্যার উদ্দেশে

বইটির প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংস্করণের প্রতিটিতেই ভূমিকা লিখেছেন কবি। তিনটি ভূমিকাতেই নতুন নতুন তথ্য রয়েছে। তাই তিনটি ভূমিকাই এখানে পরপর সাজিয়ে দেওয়া হলো।

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

AMARBOI.COM

আমার বাবা তাঁর সন্তানদের জন্মের দিন, তারিখ, লগ্ন, রাশি ইত্যাদি লিখে রাখতেন। প্রত্যেক বাংলা সনের শুরুতেই তিনি নতুন পঞ্জিকা কিনতেন। পঞ্জিকার পেছনের দিকের একটি পাতা বরাদ্দ থাকত তাঁর সন্তানদের জন্ম-সংক্রান্ত প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি লিপিবদ্ধ করার জন্য। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতদের দিয়ে কোষ্ঠী তৈরি করার বিধানও ছিল। আমার বড় দুই ভাইয়ের কোষ্ঠী তৈরি করা হয়েছিল, কিন্তু আমার কোনো কোষ্ঠী করা হয়নি। আমার ইমিডিয়েট বড় ভাই কালিদাস তিন বছর বয়সে মারা যাওয়ার পর বাবা কোষ্ঠী তৈরি করা বন্ধ করে দেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের তাণ্ডবমুক্ত পৃথিবীতে আমার জন্ম ১৯৪৫ সালের ২১ জুন, বাংলা ৭ আষাঢ় ১৩৫২, বৃহস্পতিবার। আষাঢ়ের প্রবল বর্ষণের মধ্যে আমার জন্ম হয়। জন্মের পরপরই নবজাতকের কান্না করার কথা– কিন্তু আমি কাঁদতে ভুলে গিয়েছিলাম। আমার ধাইমা আমার কানের মধ্যে ফুঁ দিতে থাকেন, তারপর আমি পৃথিবীতে মানবশিশুর আগমনের নিয়ম রক্ষা করে খুব সামান্য ক্রন্দন করি। আমার ক্রন্দন শুনে সবাই স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেন।

বড় লেখকদের ছেলেবেলার কথা লেখার একটা রেওয়াজ আছে। আমি জানি, আমি খুব বড় লেখক নই, কিন্তু দীর্ঘদিন ধরেই আমি বড় লেখকদের নানাভাবে অনুসরণ করে আসছি। আমার এই গ্রন্থ রচনা সেই অনুসরণবিদ্যারই একটি ফসল। অনেক আগেই এ-গ্রন্থ আমি লিখতে পারতাম, হয়তো পরেও এ-গ্রন্থ লেখা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যেত। আগে লিখিনি, এই গ্রন্থের প্রকাশক পাব, এমন বিশ্বাস নিজের মধ্যে সৃষ্টি হয়নি বলে; আরো পরে লেখার ঝুঁকি নিইনি, নিজের পরমায়ুর ওপর আগের মতো আস্থা নেই বলে। তাছাড়া বিয়াল্লিশ বছরকে আমি একজন লেখকের জন্য যথেষ্ট বয়স বলেই মনে করি। ইতোমধ্যেই আমার স্মৃতি লোপ পেতে শুরু করেছে। আমি অপেক্ষা করব কোন ভরসায়। আমার জ্যাঠতুতো ভাই, যে আমারই সমবয়সী, আমার সঙ্গে একই বছর যে বৃত্তি-পরীক্ষা দিয়েছিল, তার নামটা পর্যন্ত আমি ভুল করে ফেলেছি– তার নাম অতুল্য, অনিন্দ্য অতুল্যর বড় ভাই, আমাদের কাজলদা। শুরুতে আমাদের সঙ্গে কাকাদের পারিবারিক কলহের কথা বলেছি, পরবর্তীকালে সেই কলহের অবসান হওয়ায় কথাটি আর লিখতে মনে ছিল না। বাংলা একাডেমীর সহ-পরিচালক আব্দুল হান্নান ঠাকুরের বাড়ি মোহনপুর গ্রামে, আমি ভুল করে তাঁর গ্রাম বিক্রমশ্রী বলে উল্লেখ করেছি। নজর আলী স্যারের বাড়ি কংশের ওপারে নয়, এপারের ইসপিঞ্জারপুর গ্রামে, এসব ভুলের জন্য আমার লজ্জার শেষ নেই। অনেক প্রিয় ঘটনা, অনেক প্রিয় সহপাঠী বন্ধু, আমার অনেক প্রিয় মেয়েদের নাম আমি অনেক চেষ্টা করেও স্মরণে আনতে পারিনি।

এই গ্রন্থ রচনায় আমার খুড়তুতো ভাই অমলেন্দু ও রামেন্দুদা এবং আমার ছোট দুই ভাই নীহারেন্দু এবং শৈবালেন্দু আমাকে নানাভাবে সাহায্য করেছে। আমার ছোট বোন সোনালি গ্রন্থ রচনাকালে ভারত থেকে বাংলাদেশে বেড়াতে এসেছিল, সে-ও কিছু তথ্য দিয়ে আমাকে সাহায্য করেছে। তাদের সবাইকে ধন্যবাদ।

ভাষা ও বানান সংস্কারের ক্ষেত্রে বিজ্ঞান-লেখক তপন চক্রবর্তী, সাংবাদিক বন্ধু মাহফুজুল হক খান, কবি মহাদেব সাহা, কবি অসীম সাহা, কবি কাজলেন্দু দে আমাকে সাহায্য করেছেন। আমি জানি, আমার মতো অকৃতজ্ঞের কাছে তাঁরা ধন্যবাদ প্রত্যাশা করেন না, কিন্তু আমি তাদের ভুল ভেঙ্গে দিতে চাই।

এই গ্রন্থ রচনার সময় বিভিন্ন বড় লেখকের ছেলেবেলা আমি পাঠ করেছি। আমাকে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করেছে গোর্কির ছেলেবেলা। আমার জীবন তাঁর মতো এতটা দুঃখময় নয় বলে আমি দুঃখিত। তবে যেখানে তাঁর সঙ্গে আমার মিল আছে, সেখান থেকেই শুরু করেছি আমিও। আমার ছেলেবেলাকে উপন্যাস বলার কোনো অবকাশ নেই। এই গ্রন্থে বর্ণিত প্রতিটি ঘটনাই সত্য। উপস্থাপনার কৌশলে কোথাও কোথাও যে উপন্যাসের আদল ফুটিয়ে তুলেছি, সে শুধুই পাঠকের চিত্তজয়ের আশায়।

সমগ্র গ্রন্থের মধ্যে এক জায়গায় আমি একটি মিথ্যে ভাষণ করেছি। সত্য দৃশ্য দিয়ে শুরু করা আমার ছেলেবেলার ইতি টেনেছি একটি মিথ্যে স্বপ্ন দিয়ে। পাঠক আমাকে এই মিথ্যেটুকুর জন্যে ক্ষমা করবেন। গ্রন্থটি প্রকাশে রাজি হওয়ার জন্য প্রকাশক জনাব গোলাম আলিকে অভিনন্দন জানাই।

নির্মলেন্দু গুণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

প্রথম সংস্করণের দু-চারটি ভুল তথ্য বর্তমান সংস্করণে সংশোধন করা হলো। প্রুফ দেখার সময় কোথাও কোথাও মূল বিষয়কে অবিকৃত রেখেই ঘটনাবিন্যাস ও বাক্যগঠনে সামান্য পরিবর্তন এনেছি।

শান্তিনিকেতনের বাইরে প্রথম রবীন্দ্রজয়ন্তী পালিত হয়েছিল নেত্রকোণায়, এ-তথ্যটি রবীন্দ্রসঙ্গীত বিশেষজ্ঞ স্বর্গীয় শৈলজারঞ্জন মজুমদারের কাছে লেখা রবীন্দ্রনাথের একটি পত্রে সমর্থিত হয়েছে। ঐ পত্রটি অতি-সম্প্রতি নাঈম হাসান সম্পাদিত 'নিরন্তর' পত্রিকার চতুর্থ বর্ষ বর্ষা সংকলনে জনাব ওয়াহিদুল হক রচিত 'রবীন্দ্রগীতির নীলকণ্ঠধারক' প্রবন্ধে প্রকাশিত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের একটি পত্র 'আমার ছেলেবেলা'র সঙ্গে প্রাসঙ্গিকভাবে যুক্ত হওয়ার জন্য আমি বিশেষ আনন্দ বোধ করছি।

দ্বিতীয় সংস্করণটিকে আরও সুন্দরভাবে প্রকাশ করতে রাজি হওয়ার জন্য কাকলী প্রকাশনীর এ কে নাছির আহমেদ সেলিম সাহেবকে ধন্যবাদ জানাই।

জানুয়ারি ১৯৯৬ নির্মলেন্দু গুণ

AMARBOI.COM

তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা

আমার ছেলেবেলা গ্রন্থটি আমি রচনা করি ১৯৮৬ সালে। বাংলা একাডেমীর মাসিক সাহিত্যপত্র 'উত্তরাধিকার'-এ রচনাটি প্রথম প্রকাশিত হয়। লেখাটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৯৮৮ সালে। প্রকাশক ছিল পূর্বাপর পাবলিশার্স। আট বছর পর, ১৯৯৬ সালে আমার সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য এবং বেশিসংখ্যক গ্রন্থের প্রকাশক কাকলী প্রকাশনী থেকে নতুন মোড়কে বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। 'আমার ছেলেবেলা'র প্রথম সংস্করণটি শেষ হতে দীর্ঘ আট বছর লেগেছিল। একজন জনপ্রিয় কবির জন্য তা মোটেও সুখের কথা নয়। আশা করেছিলাম, কিছু দুর্লভ ছবিযুক্ত বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ দ্রুত নিঃশেষিত হবে। কিন্তু বিধাতার অভিপ্রায় ছিল ভিন্ন। আমার প্রতিষ্ঠিত স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে প্রায় দুই শতাধিক কপি উপহার হিসেবে প্রদান করার পরও বইটির দ্বিতীয় সংস্করণের কুম্ভকর্ণ নিদ্রা ভাঙতে সময় লাগল আরও দু বছর বেশি। অর্থাৎ দশ বছর। আমার অত্যন্ত প্রিয়-গ্রন্থটি আমাকে এ রকম জ্বালাবে, আমি ভাবতেও পারিনি। কী আর করা যাবে!

এবার ধ্রুব-র আঁকা অধিকতর আকর্ষণীয় প্রচ্ছদ এবং আরও কিছু দুর্লভ ছবিসহ বইটির তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হলো। একই সঙ্গে কিছু তথ্যগত ভুলও সংশোধন করা হলো। আশা করি, অতঃপর 'আমার ছেলেবেলা' সম্পর্কে পাঠকের অকারণ-উদাসীনতার অবসান হবে।

১ জানুয়ারি ২০১০ নির্মলেন্দু গুণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার কণ্ঠস্বর

রচনাক্রম অনুসারে এটি কবির দ্বিতীয় আত্মজীবনী। এতে আলোচিত হয়েছে ১৯৬২-১৯৭০ সময়ের ঘটনাপঞ্জি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এ-ধারার রচনায় এটি তাঁর সবচে আলোচিত বই। বইটি নিয়ে একটি বিস্তৃত ও সুগভীর আলোচনা লিখেছিলেন কবি-প্রাবন্ধিক সুরজিৎ দাশগুপ্ত। *দেশ* পত্রিকায় প্রকাশিত এ আলোচনাটি হুবহু বইয়ের শেষে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৯৫-র একুশে বইমেলায়। এর দু বছরের মাথায় বইটির পরিবর্ধিত-পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় বইমেলা ১৯৯৭-এ। এরপর এর তৃতীয় ও চতুর্থ মুদ্রণ প্রকাশিত হয় যথাক্রমে মে ২০০০ ও ২০১০-এর একুশে বইমেলায়।

উৎসর্গপত্র

স্বর্গীয় সুখেন্দু প্রকাশ গুণ চৌধুরী
স্বর্গীয় রামসুন্দর গুণ চৌধুরী

পরলোকগত পিতা ও
পিতামহের স্মৃতির উদ্দেশে

AMARBOI.COM

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের ঘটনাটি, ভবিষ্যতে কখনও যদি একটি ভুল পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত না হয়; তা হলে আমার এই দাবি অবশ্যই গ্রাহ্য হবে বলে মনে করি যে, আমার যৌবন এই বঙ্গীয়-ভূখণ্ডের জনগোষ্ঠীর জীবন ও মৃত্যুর ওপর দিয়ে প্রবাহিত ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ সময়কেই প্রত্যক্ষ করেছে। খ্রিস্টীয় সময়-রীতি অনুসারে যদি ঐ সময়কে চিহ্নিত করি, তা হলে ১৯৬৬-১৯৭১, এই অর্ধদশক-ব্যাপ্ত সময়কেই আমি বলব আমাদের সেই শ্রেষ্ঠ সময়।

ঐ সময়খণ্ডের শুরু ১৯৬৬ থেকে বলব এজন্য যে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঐ বছরই বাঙালির অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মুক্তির লক্ষ্যে ঐতিহাসিক ৬ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করার মধ্য দিয়ে প্রকারান্তরে এমন এক আণবিক-সংগ্রামের সূচনা করেছিলেন, যা লক্ষ লক্ষ প্রাণের মূল্যে, রক্তক্ষয়ী সশস্ত্র-যুদ্ধের ভিতর দিয়ে, ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বরে, এই ভূখণ্ডকে একটি সম্পূর্ণ স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত করেছিল।

শিশুর জন্মের আবশ্যিক পূর্বশর্তগুলো যেমন প্রতিফলিত হয় মাতৃদেহের নানাবিধ পরিবর্তনের মধ্যে, তেমনি একটি স্বাধীন দেশের অভ্যুদয়ের লক্ষণগুলোও দৃশ্যমান হতে শুরু করে সমাজরূপী মাতৃদেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সমাজরূপী মাতৃদেহের অভ্যন্তরের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পরিবর্তনসমূহ যে শিল্প-প্রত্যঙ্গে সবচেয়ে বেশি নির্ভুলভাবে ধরা পড়ে, তার নাম কাব্য। মানবজাতির ইতিহাস আর কাব্যসাহিত্যের ইতিহাস, তাই এমন অভিন্ন ও অবিচ্ছেদ্য।

আমাদের ষাট দশকের কাব্য-আন্দোলন আর আমাদের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক স্বাধীনতা লাভের আন্দোলন ছিল তাই মূলত একই আন্দোলনের অভিন্ন প্রকাশ।

কণ্ঠস্বর পত্রিকার সম্পাদক জনাব আবদুল্লাহ আবু সায়ীদের প্রস্তাব অনুযায়ী আমি যখন কণ্ঠস্বরের সঙ্গে আমার সম্পর্ক-বিষয়ক এই লেখাটি লিখতে শুরু করেছিলাম— তখন আমার সামনে কোনো প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল না। ভেবেছিলাম, কয়েক পাতার মধ্যেই আমি আমার লেখাটি শেষ করব। কিন্তু নিজের জীবন-অভিজ্ঞতার কথা লিখতে লিখতে, পেছনে ফেলে আসা ধূসর স্মৃতির পাতা উল্টাতে উল্টাতে, প্রচণ্ড ঘোরের মধ্যে কীভাবে যে আমার সময় চলে যায়, আমি টেরই পাইনি। লেখাটি ক্রমশ বড় আকার ধারণ করে। আমি আমার ভিতরে কবির পাশাপাশি, একজন ইতিহাসসন্ধানী গবেষকের অস্তিত্ব অনুভব করি। কিন্তু ইতিহাস প্রণেতার একাডেমিক প্রশিক্ষণ, বা ধৈর্য—কোনোটাই আমার নেই। ফলে পাকিস্তানের লৌহমানব আইয়ুব খানের পতনের পটভূমিতে অনুষ্ঠিত ১৯৭০-এর ঐতিহাসিক জাতীয় নির্বাচনের খুব কাছাকাছি পৌঁছে, আমার প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'প্রেমাংশুর রক্ত চাই' প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে, আমি এই রচনার আপাতত সমাপ্তি টেনে দিই।

আমি ১৯৭১-এর সামনে এসে থমকে দাঁড়াই, সমুদ্রের কাছে পৌঁছে মানুষ যেমন থমকে দাঁড়ায়। আমার ধারণা, ১৯৭১ একটি পৃথক খণ্ডকে দাবি করে। আমার খুব ইচ্ছে আছে, বর্তমান গ্রন্থটির মতো অন্তত আরও দু-তিনটে খণ্ড রচনা করার।

এই গ্রন্থটি রচনা করতে গিয়ে আমি বিভিন্ন সময় বাংলা একাডেমীর গ্রন্থাগার ব্যবহার করে খুবই উপকৃত হয়েছি। ঐ গ্রন্থাগারের সহ-পরিচালক জনাব আমীরুল মোমেনীন এবং আমার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহপাঠী বন্ধু নুরুল ইসলাম আমাকে বিশেষভাবে সাহায্য ও সহযোগিতা করেছেন।

ভারতভুক্ত পশ্চিমবঙ্গের দুর্গাপুর শিল্পনগরী নিবাসী আমার বড় ভাই শ্রীপূর্ণেন্দু গুণ চৌধুরী, আমার ছোট বোন শ্রীমতী সোনালি গুহঠাকুরতা, আমার আনন্দমোহন কলেজের সহপাঠী, বর্তমানে বর্ধমান নিবাসী জেঠতুতো ভাই শ্রীঅতুল্য গুণ চৌধুরীর কাছেও আমি নানা বিষয়ে সাহায্য লাভ করেছি। আমার ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমান সোমনাথ, আমাকে তাঁর বাবার কাছে লেখা কিছু দুষ্প্রাপ্য চিঠির ফটোস্ট্যাট-কপি পাঠিয়ে এই গ্রন্থ রচনায় আমাকে প্রভূত সহায়তা করেছে।

আমার পিসতুতো ভাই বাংলাদেশবাসী ইঞ্জিনিয়ার-কবি সুকোমল বল এবং কেমিস্ট পরিমল বলও আমাকে ঐ সময়ের কিছু প্রাসঙ্গিক তথ্য দিয়ে খুব উপকার করেছে।

বিভিন্ন সময় আমার কবি-বন্ধুদের সঙ্গে আলাপ করেও আমি উপকৃত হয়েছি। তাদের সকলের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাংলাবাজার পত্রিকার সাহিত্য বিভাগে লেখাটি প্রায় এক বছর ধরে প্রকাশিত হয়েছে। তখন বিভিন্ন পাঠক আমাকে পত্র লিখে সাহস জুগিয়েছেন। আমি বাংলাবাজার পত্রিকা কর্তৃপক্ষ এবং পাঠকদের কাছেও কৃতজ্ঞ।

কাগজের চড়ামূল্যের এই দিনে বইটি প্রকাশ করতে অনীহা প্রকাশ না করার জন্য আমি কাকলী প্রকাশনীর মালিক এ. কে. নাছির আহমেদ সেলিমের প্রতিও কম কৃতজ্ঞ নই।

পরিশেষে, আমাদের রুদ্র-ষাটের কুলগুরু আবদুল্লাহ আবু সায়ীদকে জানাই আমার অন্তহীন কৃতজ্ঞতা। ১৯৬৭ সালে তিনি আমাকে ঢাকায় এসে তাঁবু ফেলতে সাহায্য করেছিলেন। আটাশ বছর পর তাঁর আগ্রহের অছিলাতেই, ১৯৯৫ সালে আমি এ রকমের একটি মোটা গদ্যগ্রন্থের রচয়িতা হতে পারলাম।

আমার কণ্ঠস্বর গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ হিসেবে পাঠক ও গবেষক মহলে বিবেচিত হলেই আমার শ্রম সার্থক হবে এবং আমি আমার পরবর্তী খণ্ডগুলো রচনা করার প্রেরণা পাব।

আগ্রহী পাঠকদের অবগতির জন্য বলি, *আমার ছেলেবেলা* গ্রন্থটি যেখানে এসে শেষ হয়েছে, ঠিক সেখান থেকেই শুরু হয়েছে *আমার কণ্ঠস্বর*। একুশের অভিনন্দনসহ। ইতি।

পলাশী ব্যারাক, ঢাকা ১২০৫ — নির্মলেন্দু গুণ

AMARBOI.COM

দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

আমি খুব খুশি যে, *আমার কণ্ঠস্বর* পাঠক-সমালোচক ও গবেষকরা আশাতীত আদরের সঙ্গে গ্রহণ করেছেন। প্রথম সংস্করণে নিজের বইয়ের প্রুফ নিজে দেখার কারণে কিছু বানান ভুল থেকে গিয়েছিল। দু-একটি কম ক্ষতিকর তথ্যগত ভুলও তাতে ছিল। এবার ঐ ভুলগুলো সংশোধন করা হয়েছে। অনেকেই বইটির শেষে নির্ঘণ্ট যুক্ত করার জন্য আমাকে পরামর্শ দিয়েছিলেন। এবার ঐ দাবি পূরণ করা হলো। এই দুরূহ কাজটি বাংলা একাডেমীর গ্রন্থাগারের সহ-পরিচালক জনাব আমীরুল মোমেনীন অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে সম্পন্ন করে একজন গবেষক হিসেবে আমাকে পূর্ণতা দান করেছেন। আমি তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ।

কলিকাতার বিখ্যাত *দেশ* পত্রিকা *আমার কণ্ঠস্বর*-এর একটি দীর্ঘ-উচ্ছ্বসিত আলোচনা প্রকাশ করে আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছে। সেজন্য আমি দেশ পত্রিকার সম্পাদক শ্রীসাগরময় ঘোষ এবং আলোচক, সুসাহিত্যিক শ্রীসুরজিৎ দাশগুপ্তকে সকৃতজ্ঞ অভিবাদন জানাচ্ছি। একুশের অভিনন্দন।

২০ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭ — নির্মলেন্দু গুণ
পলাশী ব্যারাক, ঢাকা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কবির ছাত্রবয়সে লেখা একটি ইংরেজি কবিতা

FUTURE

Nirmalendu Prokash Goon
1st year I.Sc

Work, work and work-
In our daily life I see.
No leisure, no peace
Men though struggle like a bee.

What is life? What is future?
In this game all shall die must
But fame is the only thing
Which will ever last.

'What will our future be?'
Arise the question in my head
The answer is, to work for country,
And to feed the unfed.

* *

Ananda Mohan College Magazine

AMARBOI.COM

আমার কণ্ঠস্বর বইয়ের উৎসর্গপৃষ্ঠায় এই কবিতাটির আদি সংস্করণের প্রতিলিপি মুদ্রিত হয়েছে। এর পাদটীকায় কবি জানান, '১৯৬২ সালের আনন্দমোহন কলেজ ম্যাগাজিনে প্রকাশিত এই কবিতাটি আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক মুহম্মদ আবদুল জলিল তাঁর সংগ্রহ থেকে বন্ধু বিমল দে-র মাধ্যমে আমাকে পাঠিয়েছেন।'

এই কবিতা সম্পর্কিত মজার তথ্য রয়েছে *আমার কণ্ঠস্বর* বইয়ে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আত্মকথা ১৯৭১

আত্মজীবনী-রচনার ক্রম অনুসারে এটি কবির তৃতীয় রচনা। এ বইতে ১৯৭১ সালের ১ মার্চ থেকে মে মাসের ৫ তারিখ পর্যন্ত ঘটনা ও স্মৃতির বর্ণনা রয়েছে।

প্রথম প্রকাশিত হয় ২০০৮-এর একুশে বইমেলায়। এরপর দ্বিতীয় ও তৃতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত যথাক্রমে মে ২০০৮ ও ডিসেম্বর ২০১০-এ।

উৎসর্গপত্র

একাত্তরের পঁচিশে মার্চ সে আমার জীবন বাঁচিয়েছিল।
জিঞ্জিরায় গণহত্যা চলাকালে আমরা একসঙ্গে ছিলাম।
কুমিল্লার নির্জন কবরে সে আজ চিরনিদ্রায় শায়িত।
নজরুল ইসলাম শাহ
স্মরণে

AMARBOI.COM

উপক্রমণিকা

এক, নয়, সাত, এক। ১৯৭১। মাঝে মাঝে আমি খুব অবাক হয়ে অংকশাস্ত্রের এই চারটি বাংলা সংখ্যা দ্বারা সূচিত সময়গুলোকে মহাকালের ভিতর থেকে পৃথক করে আমার অনুভবের মধ্যে ধরবার চেষ্টা করি। সারা পৃথিবী জানে, বাংলাদেশের আকাশ, বাতাস ও মৃত্তিকা জানে; ওয়ার্ল্ড অ্যালমানাক সাক্ষী– ১৯৭১ হচ্ছে বাংলাদেশের জন্মসাল।

কী সৌভাগ্য আমার, আমি বাংলাদেশকে আমার চোখের সামনে জন্মাতে দেখেছি। এই পৃথিবীতে প্রতি মুহূর্তেই শত শত মানবশিশুর জন্ম হয়। কিন্তু একটি দেশের জন্ম তেমন সহজে হয় না। পৃথিবীর জনসংখ্যা যেখানে প্রায় ৬০০ কোটির মতো সেখানে এই ভূমণ্ডলে দেশের সংখ্যা মাত্র দুই শর কাছাকাছি। তাই একটি দেশের জন্মের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার সৌভাগ্য খুব কম মানুষেরই হয়।

রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল জন্মগ্রহণ করেছিলেন ব্রিটিশ শাসন কবলিত পরাধীন ভারতে। ভারতের স্বাধীনতার জন্য ভারতবাসীর মরণপণ আন্দোলন তাঁরা দেখেছিলেন, কিন্তু ব্রিটিশের গোলামি থেকে মুক্তি পাওয়া স্বাধীন ভারত দেখে যেতে পারেননি।

ভারতীয় বা বাঙালি হিসেবে নয়, ১৯১৩ সালে রবীন্দ্রনাথ কবিতার জন্য নোবেল পুরস্কার পান ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান পোয়েট হিসেবে। দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দ্বিখণ্ডিত হয়ে ভারত ও পাকিস্তান প্রায় দুই শ বছরের ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটিয়ে স্ব-শাসনের অধিকার লাভ করে ১৯৪৭ সালে। তার ছয় বছর আগে ১৯৪১ সালে বিশ্বকবির মৃত্যু হয়। এই একটা জায়গায় রবীন্দ্রনাথের চেয়ে আমি নিজেকে নিশ্চিত-কারণে সৌভাগ্যবান বলে ভাবতে পারি। বিশ্বকবিসম্রাট রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল যে সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হয়েছেন, নিঃস্ব কবি হয়েও আমি সেই অপার সৌভাগ্যে সিক্ত হয়েছি।

আহ! কী আনন্দ আকাশে বাতাসে...। ভাবতেই নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গের মতো এক অনির্বচনীয় অজানা আবেগে প্রাণ শিহরিত হয়। মানুষের জন্মসময় যিনি নিয়ন্ত্রণ করেন, সেই ঈশ্বরকে জানাই অজস্র ধন্যবাদ। হা ঈশ্বর, আপনার উদ্দেশে জানাই আমার চিরপ্রণতি।

সাল বিচারে আমার জন্মের সূচক সংখ্যাটি হচ্ছে ১৯৪৫। ১৯৭১-এর মতো, এই সংখ্যাটিও আমার খুব প্রিয়। আমি জানি, মানুষ হিসেবে আমার জন্ম না হলে, পাকিস্তান নামক নব্য-কলোনির আগ্রাসন থেকে মুক্তিলাভের মাহেন্দ্র মুহূর্তটিকে আমি প্রত্যক্ষ করতে পারতাম না। আমার হাজার বছরের জাতি-সত্তার ভয়ঙ্কর সুন্দর মুক্তিসংগ্রামের এই সাফল্যকে আমি নিজ চোখে প্রত্যক্ষ করতে পারতাম না। আমি যে তা পেরেছি, সে যে আমার কতো বড়ো গর্ব! সে যে আমার কতো বড়ো আনন্দের ধন! এ যে আমার কতো বড়ো পাওয়া!

পৃথিবীর খুব কম কবির ভাগ্যেই জোটে স্বদেশের স্বাধীনতার আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হতে পারার দুর্লভ সুযোগ। আর তার সফল পরিসমাপ্তি নিজ চোখে দেখার সুযোগ তো জোটে আরও কম কবির ভাগ্যে। আমি সেই সৌভাগ্যবান, হাতে গোনা বিরল কবিদের একজন। এই আনন্দকে প্রকাশ করা তো দূরের কথা, এই বিষয়টি উপলব্ধিতে আসতেও অনেক সময় চলে যায়। বর্তমান রচনাকর্মে নিজেকে নিয়োজিত করার পূর্বে আমিই কি আমাদের দীর্ঘ মুক্তিসংগ্রামের সফল পরিণতিতে, ১৯৭১ সালে আমাদের স্বাধীনতা লাভের বিষয়টির অন্তর্নিহিত গোপন ঐশ্বর্যের সন্ধান পেয়েছিলাম? না পাইনি। ফুলকে দেখা যায় চোখ দিয়ে, কিন্তু তার গন্ধ তো দেখা যায় না। সে হাওয়ার মধ্যে নিজেকে ছড়িয়ে দিয়ে উড়ে বেড়ায় ফুলের চারপাশে। ১৯৭১ সালটিও আমার কাছে তেমনি একটি ফুল। তার চারপাশে কাঁঠালিচাঁপার মৌ মৌ করা গন্ধ।

আসলে স্বাধীনতা জিনিসটার দুটো অস্তিত্ব আছে, এর একটি আমাদের বহির্জীবনকে বিন্যস্ত করে; সে সমৃদ্ধ করে আমাদের বৈষয়িক জীবনকে। তাঁর দ্বিতীয় আন্তরটি অন্তর্মুখী, দৃষ্টিগ্রাহ্য নয় অতোটা, কিন্তু আমাদের চিত্তকে সে-ই নিত্য শুদ্ধ করে চলে। তার মাতৃছায়ায় মূর্ত হয়ে ওঠে আমাদের ভাবজগৎ। ভাষার সাহায্যে সেই অনুভূতির যথার্থ প্রকাশ অসম্ভব।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সন্তানের জন্মের পর জনক-জননীর যে আনন্দ, আমার আনন্দও তারই কাছাকাছি। স্বাধীনতার স্থপতি বঙ্গবন্ধুর মুখে যা মানাতো, মাঝে মাঝে খুব ইচ্ছে করে, তাঁর কণ্ঠের অমূর্ত ভাষায় বলি, 'আমি বাংলাদেশকে জন্মাতে দেখেছি। বাংলাদেশ আমার সন্তান।'

ভারতচন্দ্রের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে বলি, 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে-ভাতে।'

আমার আত্মজীবনীর দ্বিতীয় খণ্ড (প্রথম খণ্ড বলি *আমার ছেলেবেলাকে*) *আমার কণ্ঠস্বর* পড়ে কেউ কেউ আমাকে অনুরোধ করেছেন, আমি যেন আমার আত্মজীবনী রচনা অব্যাহত রাখি। আমার প্রকাশকও আমাকে অনুরোধ করেছেন তৃতীয় খণ্ডটি লেখার জন্য। কিন্তু আমি রাজি হইনি। আমি জানি আমার প্রকৃতি। আমি অলস গোত্রের মানুষ। *আমার কণ্ঠস্বর* লেখার পর আমি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম। বাংলা একাডেমীর পুরনো পত্র-পত্রিকা ঘেঁটে আমার বুকে কফ জমে গিয়েছিল। হাই পাওয়ারের এন্টিবায়োটিক খেয়ে সেবার কোনোক্রমে জীবনটা বাঁচিয়েছি। হলফ করেছিলাম আর নয়। এটা আমার কাজ নয়। এটা ইতিহাস রচয়িতাদের কাজ। যার কাজ তারে সাজে। আমি কবি। আমি লাঠি হতে যাবো কেন? ইতিহাসনিষ্ঠ আত্মজীবনী রচনায় আমি বাধ্য নই। আমার কণ্ঠস্বরের ভূমিকায় আমি বলেছি সে-কথা।

> বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের ঘটনাটি, ভবিষ্যতে যদি কখনও একটি ভুল পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত্ও হয়; তা হলে, আমার এই দাবি অবশ্যই গ্রাহ্য হবে যে, আমার যৌবন এই বঙ্গীয় ভূখণ্ডের জনগোষ্ঠীর জীবন ও মৃত্যুর ওপর দিয়ে প্রবাহিত ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ সময়কেই প্রত্যক্ষ করেছে। খ্রিষ্টিয় সময়-রীতি অনুসারে যদি ঐ সময়কে চিহ্নিত করি, তাহলে ১৯৬৬-১৯৭১, এই অর্ধদশক-ব্যাপ্ত সময়কেই আমি বলব আমাদের সেই শ্রেষ্ঠ সময়।
>
> এই সময়খণ্ডের শুরু ১৯৬৬ থেকে বলব এজন্য যে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঐ বছরই বাঙালির অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মুক্তির লক্ষ্যে তাঁর ঐতিহাসিক ৬ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করে এমন এক আণবিক সংগ্রামের সূচনা করেছিলেন, যা লক্ষ লক্ষ প্রাণের মূল্যে, রক্তক্ষয়ী সশস্ত্র যুদ্ধের ভিতর দিয়ে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর এই ভূখণ্ডকে একটি সম্পূর্ণ স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত করেছিল।
>
> শিশুর জন্মের আবশ্যিক পূর্বশর্তগুলো যেমন মাতৃদেহের নানাবিধ পরিবর্তনের মধ্যে প্রতিফলিত হয়, তেমনি একটি স্বাধীন দেশের অভ্যুদয়ের লক্ষণগুলোও দৃশ্যমান হতে শুরু করে সমাজরূপী মাতৃদেহের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গে। সমাজরূপী মাতৃদেহের অভ্যন্তরের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পরিবর্তনসমূহ যে শিল্প-প্রত্যঙ্গে সবচেয়ে বেশি নির্ভুলভাবে ধরা পড়ে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তার নাম কাব্য। মানবজাতির ইতিহাস আর কাব্য সাহিত্যের ইতিহাস তাই এমন অভিন্ন ও অবিচ্ছেদ্য। আমাদের ষাট দশকের কাব্য-আন্দোলন আর আমাদের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক স্বাধীনতা লাভের আন্দোলন ছিল তাই মূলত একই আন্দোলনের অভিন্ন প্রকাশ।

কণ্ঠস্বর পত্রিকার সম্পাদক জনাব আবদুল্লাহ আবু সায়ীদের প্রস্তাব অনুযায়ী আমি যখন কণ্ঠস্বরের সঙ্গে আমার সম্পর্কবিষয়ক এই লেখাটি লিখতে শুরু করেছিলাম- তখন আমার সামনে স্মৃতি ছাড়া আর কোনো প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল না। ভেবেছিলাম কয়েক পাতার মধ্যেই আমি আমার লেখাটি শেষ করব। কিন্তু নিজের জীবন-অভিজ্ঞতার কথা লিখতে লিখতে, পেছনে ফেলে আসা ধূসর স্মৃতির পাতা উল্টাতে উল্টাতে প্রচণ্ড ঘোরের মধ্যে কীভাবে যে আমার সময় চলে যায়, আমি টেরই পাইনি। লেখাটি ক্রমশ বড় আকার ধারণ করে। আমি আমার ভিতরে কবির পাশাপাশি একজন ইতিহাসবিদের অস্তিত্ব অনুভব করি। কিন্তু ইতিহাস প্রণেতার একাডেমিক প্রশিক্ষণ বা ধৈর্য কোনোটাই আমার নেই। ফলে, পাকিস্তানের লৌহমানব আইয়ুব খানের পতনের পটভূমিতে অনুষ্ঠিত ১৯৭০ সালের ঐতিহাসিক জাতীয় নির্বাচনের কাছাকাছি পৌঁছে, আমার প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'প্রেমাংশুর রক্ত চাই' প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে আমি আমার রচনার আপাতত সমাপ্তি টেনে দিই।

আমি ১৯৭১-এর সামনে এসে থমকে দাঁড়াই, সমুদ্রের কাছে পৌঁছে মানুষ যেমন থমকে দাঁড়ায়। আমার ধারণা, ১৯৭১ একটি পৃথক খণ্ড দাবি করে। আমার খুব ইচ্ছে আছে, বর্তমান গ্রন্থটির মতো অন্তত আরও দু-তিনটে খণ্ড রচনা করার।

আমার কণ্ঠস্বর প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৯৫ সালে। রচনাকাল ১৯৯৪। পুরো একযুগকাল আলস্য যাপন শেষে, এবার ২০০৬ সালের অন্তিম পর্যায়ে এসে আমি ১৯৭১ নিয়ে লিখতে বসেছি।

পাঠক আমাকে আশীর্বাদ করুন, আমার জন্য দোয়া করুন—আমি যেন কারও প্রতি অনুরাগ বা বিরাগের বশবর্তী না হয়ে আমার রচনাকর্মটি সুচারুরূপে সম্পন্ন করতে পারি।

নির্মলেন্দু গুণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রক্তঝরা নভেম্বর ১৯৭৫

ক্রম-অনুসারে এটি কবির আত্মজীবনীর চতুর্থ পর্ব। এবং বর্তমান বইয়ের শেষ অংশ। প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৯৭-র একুশে বইমেলায়।

উৎসর্গপত্র

সৈয়দ নজরুল ইসলাম
তাজউদ্দীন আহমদ
এম মনসুর আলী
এ এইচ এম কামারুজ্জামান
মেজর জেনারেল খালেদ মোশাররফ
কর্নেল খন্দকার নাজমুল হুদা ও
লে. ক. এটিএম হায়দার

স্মরণে উৎসর্গিত

AMARBOI.COM

ভূমিকা

বাংলাবাজার পত্রিকার সঙ্গে আমার যুক্ত হওয়ার ঘটনাটি আমার গদ্য-রচনার জন্য খুবই ফলপ্রসূ হয়েছে। *আমার ছেলেবেলা* প্রকাশিত হওয়ার সাত বছর পর আমার আত্মজীবনীর দ্বিতীয় খণ্ড *আমার কণ্ঠস্বর* বাংলাবাজার পত্রিকার সাহিত্য বিভাগে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিলো। এবার, পত্রিকার সম্পাদকীয় পাতা ভরাট করার জন্য আমি যখন নব-পর্যায়ে নির্গুণের জার্নাল লিখতে শুরু করি, তখন পর্যন্ত এই গ্রন্থটি আমার চিন্তা বা পরিকল্পনার ভিতরে ছিলো না।

১৯৭৫-এর নভেম্বর নিয়ে উপসম্পাদকীয় লিখতে বসে আমি হঠাৎই অনুভব করলাম, আমার ভিতর থেকে কী যেন উঁকি দিচ্ছে। এটি যে একটি পূর্ণ-গ্রন্থ, তা বুঝতে পারলাম সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে দ্বিতীয় কিস্তিটি রচনা করার সময়। বিষয়টি যখন আমার কাছে ধরা পড়লো, তখন মনে হলো, —হাঁ, আমার ভিতরে এই গ্রন্থ রচনা করার গোপন প্রস্তুতি তো ছিলোই।

১৯৭৫ সালের নভেম্বর মাসটিকে আমি তো আমার বুকের ভিতরে গত একুশ বছর ধরে গোপন ক্ষতের মতো বয়ে বেরিয়েছি।

এটি তো অরচিত গ্রন্থ নয়। এই গ্রন্থটি আমার ভিতরে রচিত হয়েই ছিলো। তাই ডুবে যাওয়া জাহাজ শনাক্ত হওয়ার পর তাকে তুলে আনার কাজটি সমাপ্ত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করতে আমার একটুও বেগ পেতে হয়নি। ঐ ডুবে-যাওয়া জাহাজের মধ্যে দেশবাসীর বহু প্রিয় লাশের সঙ্গে আমার নিজের লাশটিও আটকা পড়ে ছিলো। তাই মমতা সহকারেই সময়সমুদ্রের অতল গহ্বর থেকে আমি ঐ জাহাজটিকে উদ্ধার করেছি, যার নাম হতে পারে *রক্তঝরা নভেম্বর ১৯৭৫*।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের সবচেয়ে বড় ট্রাজেডিগুলোর সঙ্গে আমার কবিজীবন অনতিক্রম্য ঘটনার আবর্তে কীভাবে ক্রমশ জড়িয়ে পড়েছিলো, *রক্তঝরা নভেম্বর ১৯৭৫*-এ আমি সেকথাই ইতিহাসের আদলে বলবার চেষ্টা করেছি। এই আত্মজৈবনিক গ্রন্থটি আমার ব্যক্তিজীবনকে অতিক্রম করে অনুসন্ধিৎসু ইতিহাস পাঠকের দাবি পূরণে যদি সক্ষম হয়, তাহলেই আমার শ্রম সার্থক বলে গণ্য করবো।

কবিতার পরিবর্তে, সময় যে আমাকে দিয়ে আমার দেশের ইতিহাস লিখিয়ে নিচ্ছে, এ এক রহস্যজনক ঘটনাই বটে।

নি.গুণ
পলাশী ব্যারাক, ঢাকা
২০ ডিসেম্বর ১৯৯৬

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেশ পত্রিকায় *আমার কণ্ঠস্বর*-এর আলোচনা

যে কবি সে-ই যোদ্ধা

সুরজিৎ দাশগুপ্ত

'আমার কাছে আমার কবিতা আমার চোখের মতো। আমার কাছে আমার কবিতা আমার আত্মার মতো। আমার কাছে আমার কবিতা আমার রক্তের মতো প্রিয়। আর, কবিতাও আমাকে ভালোবাসে বলেই হয়তো ষাট দশকের যেসব কবি পূর্ববঙ্গে জন্ম নিয়েছে তাদের মধ্যে যদি পাঁচজনেরও নাম করতে হয়– তবে আমার নাম অপরিহার্য।' এই কথাগুলো ১৯৬৮ সালে তখনকার পূর্ব পাকিস্তান থেকে নির্মলেন্দু গুণ ভারতে বড়দার কাছে চলে আসা ছোট বোন সোনালিকে লিখেছিলেন। এভাবে নিজের মূল্য নির্ণয় থেকে নির্মলেন্দুর নিজের প্রতি বিশ্বাস এবং মর্যাদা সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট ধারণা করতে পারি। আর নিজের অর্থাৎ বাঙালিসমূহের সম্বন্ধে তাঁর চেতনার একটা প্রতিফলন পাই একই চিঠির অন্য এক অংশে: 'তোমাকে সীমান্তে রেখে আসার সময় আমার খুব খারাপ লেগেছিল। আমার তখন মনে পড়ছিল জার্মানির কথা। রাজনীতির নিয়ন্ত্রণে জার্মানিও আজ এমনিভাবেই বিভক্ত। আমি জানি, সমস্যার সমাধানে সাধারণ মানুষ হচ্ছে ভাগ্যমুখ্য।' কথাটি লিখেই তিনি সাধারণ মানুষের মিছিল থেকে বেরিয়ে গিয়ে লিখেন, 'কিন্তু আমি ইতিহাসের দর্শকমাত্র নই– আমি ইতিহাস সৃষ্টিতেই বেশি আনন্দ পাই।' ছোট বোনকে লেখা একান্ত ব্যক্তিগত চিঠি বলেই মনে হয় এখানে, লেখক অনেক বেশি আন্তরিক ও সৎ। আর এই কথাগুলোর বিশেষ গুরুত্ব এজন্য যে, এই লেখনে প্রতিফলিত হয়েছে যেমন সাম্প্রতিক বাংলা কবিতার এক প্রধান কবির কবিতা সম্বন্ধে তীব্র ভালবাসা, কবিতার জন্য কবির ইন্দ্রিয় যন্ত্রণা এবং কবিতার সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক একাত্মতা তেমনই আপন কালের জন্য সজাগ চেতনা এবং স্বদেশের ঘটনা প্রবাহের মধ্যে আপন দায়িত্ব পালনের তাড়না।

প্রকৃতপক্ষে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার ফলেই বাঙালি তথা বাংলা ভাষাগোষ্ঠী আজ দুটি রাষ্ট্রে বিভক্ত। কিন্তু রাষ্ট্রিক বিভাগ সত্ত্বেও বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির অখণ্ডতা সমস্ত বাঙালি সত্তার পরিচয় এবং এই পরিচয়ের গৌরব ও মর্যাদার অংশীদার প্রত্যেক বাঙালিই। ভারতের যে সব বাঙালি-সন্তান সরকারি অনুদান বা বৃত্তির টাকার লোভে শিক্ষালয়ের স্তরে মাতৃভাষার পরিবর্তে সরকারি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভাষা গ্রহণ করেছে এবং পরে জনগণনার সময় হিন্দিকেই মাতৃভাষার স্থান দিচ্ছে তারা কোনদিনই হিন্দিভাষা গোষ্ঠীর শামিল হতে পারবে না, তারা চিরকালই ইতিহাসের জোয়ার-ভাটায় ভেসে বেড়ানোর শ্যাওলা হয়ে থাকবে। পক্ষান্তরে ভারতীয় বাঙালি ও বাংলাদেশি বাঙালি চিরকালই ভাষার বন্ধনে থাকবে পরস্পর পরম আত্মীয়। যে দেশের পাসপোর্ট নিয়েই তারা ব্রিটেনে ফ্রান্সে জার্মানিতে যাক না কেন, অন্যান্য দেশের শিল্প-সাহিত্যিকদের সমাজে তাঁরা একই বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী হিসেবে নিজেদের পরিচয় দেবেন। এই কারণেই ষাটের দশকের বাঙালি কবি হিসেবে নির্মলেন্দু গুণ, আবুল হাসান, রফিক আজাদ প্রমুখ বাংলাদেশের নাগরিকদের নাম এবং মলয় রায় চৌধুরী, দিব্যেন্দু পালিত, শান্তি লাহিড়ী প্রমুখ ভারতীয় নাগরিকদের নাম একই সঙ্গে মনে আসে। যে কবি হিসেবে প্রত্যেকেরই নিজস্ব ভূমিকা, নিজস্ব তাৎপর্য আছে এবং নিজ নিজ ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে নিজ নিজ নির্ধারণ আছে। উনসত্তর সালে প্রথম দিকে ঢাকা রেডিও থেকে এক পাঠের আসরের শুরুতে নির্মলেন্দু নিজের কাব্য-দর্শন সম্বন্ধে যা বলেছিলেন তা কৌতূহলোদ্দীপক এবং আলোচ্য গ্রন্থে উদ্ধৃত : 'অমিতব্যয়িতা আমার স্বভাব, ব্যক্তিগত জীবনে এবং স্বভাবতই কবিতাতেও। কবিতা কী? বুঝিনে। কাব্যবিচারের মানদণ্ড কী? জানিনে। ছন্দ কাকে বলে—ভালো করে বুঝিনে। আমি শুধু উড়নচণ্ডি প্রেমিকের মতো অবিবেচক, যুক্তিহীন এবং ব্যক্তিগত। আমার কবিতা তাই আমি যা লিখি। অন্যের কাছে সেটা গল্প হলেও ক্ষতি নেই, এলজাব্রা হলেও না।' নতুন কবিদের মধ্যে পাঠক বা শ্রোতারা মনে রোমাঞ্চ সঞ্চারের আগ্রহ থেকেই বারে বারে নতুন কাব্যধারার সূচনা হয় এবং সাম্প্রতিক বাংলা কাব্যের গতিপ্রকৃতি সম্বন্ধে যারা অবহিত তাঁরা ভাল করেই জানেন নির্মলেন্দুর কবিতার নতুনত্ব তথা বিশেষত্ব ও তাৎপর্য। আর তাঁর এই আত্মস্মৃতিমূলক বই 'আমার কণ্ঠস্বর'-এর আলোচনা প্রসঙ্গে তাঁর কাব্যের পরিচয় দেওয়ার ও বিশ্লেষণ করার অবকাশও নেই। এ-টুকু মনে রাখাই যথেষ্ট যে, এডোওয়ার্ড টমসন কথিত কবিতার দেশ বাংলার একজন অগ্রগণ্য কবি হলেন নির্মলেন্দু গুণ এবং কবিতার দেশ থেকে আন্তর্জাতিক স্তরে বাংলার রাষ্ট্রিক মর্যাদায় বাংলাদেশ নামে উত্তরণের প্রক্রিয়ায় নির্মলেন্দু গুণের মতো কবিদেরও বিশেষ ভূমিকা আছে। ভাবতে আশ্চর্য লাগে যে, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল থেকে শুরু করে শামসুর রাহমান, নির্মলেন্দু গুণ প্রত্যেকেরই অসামান্য দান আছে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে। আর কোন দেশের স্বাধীন সংগ্রাম কবিদের প্রেরণায় এই পরিমাণে উদ্বুদ্ধ। আর কোন দেশের স্বাধীন সংগ্রাম আর নতুন কাব্য রচনার সাধনা পরস্পরের সঙ্গে মিলে মিশে এমন একাকার? বাংলাদেশ প্রকৃতই কবির দেশ, কারণ বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের মূল শক্তি এসেছে বাংলা কবিতারই মানস সরোবর থেকে। বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম, গূঢ়তর অর্থে কবিতারই মুক্তি সংগ্রাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যে কবি সে-ই যোদ্ধা, কোনও না কোন অর্থে, এই কথাটা মনে হলো আমার 'আমার কণ্ঠস্বর' পড়তে পড়তে। অথচ নির্মলেন্দুর 'আমার কণ্ঠস্বর' সমাজের জন্য অনুকরণীয় বা আদর্শ কোনও চরিত্রের আত্মস্মৃতি নয়। কজন কবির জীবনই বা সম্পূর্ণভাবে সমাজসম্মত? তবে নির্মলেন্দুর জীবন এবং সেই সঙ্গে তাঁর কবিতাও যেন বিশেষভাবেই সমাজের প্রচলিত, আরও যথাযথ করে বলা যায় যে, সমাজের প্রতিষ্ঠিত কাঠামো ও ধ্যানধারণাগুলোর বিরোধী। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের নেত্রকোনা মহকুমার বারহাট্টা বিদ্যালয় থেকে ১৯৬২ সালে প্রথম বিভাগে আবাসিক বৃত্তিসহ উত্তীর্ণ হয়ে তিনি জেলা সদর ময়মনসিংহের আনন্দমোহন কলেজে ভর্তি হন।

কবি নির্মলেন্দু বিজ্ঞানের ছাত্র হিসেবে কলেজ জীবন শুরু করেন। 'স্বাধীন জীবন যাপনের প্রথম সুযোগ হাতে পেয়েই আমি হোস্টেল জীবনের প্রেমে পড়ি।' এখানে 'স্বাধীন' শব্দটির প্রয়োগ লক্ষণীয়। ময়মনসিংহে অচিরেই তার বন্ধুত্ব গড়ে 'অপেক্ষাকৃত খারাপ ছাত্রদের সঙ্গে।' নেশা ধরেন তিন তাসের জুয়ার। সেই সঙ্গে বুঝতে পারেন, 'শতকরা ষাট ভাগের নিচে নম্বর পাওয়ার স্বাধীনতা' না থাকাটা পরাধীনতারই নামান্তর। তাকে তাঁর 'স্বাধীন মানব' বলে মনে হয় যার আছে বছরের পর বছর ফেল করার স্বাধীনতা। দ্বিতীয় বর্ষে নির্মলেন্দু গুণ হোস্টেলের ম্যানেজার হন। অমনি শুরু করেন টাকা মারা। ধরা পড়ে দোষ কবুল করেন, আবার চৌর্যবৃত্তির পক্ষে যুক্তিও দেখান। সেবার রেহাই পান সবার কাছে মাফ চেয়ে ও ম্যানেজারিতে ইস্তফা দিয়ে। কিন্তু অচিরেই 'এক গভীর রাতে' যখন তার রুমে জোর জুয়া চলছে তখন দরজায় কড়া নাড়া পড়ে। আর এক জুয়ারি বন্ধুর কড়া ভেবে নির্মলেন্দু সাগ্রহে দরজা খুলে দেখেন, সাক্ষাৎ যম হোস্টেল সুপার। 'এটাই ছিল হিন্দু হোস্টেলের আমার শেষ রজনী।' তখন সামনে আইএসসি ফাইন্যাল পরীক্ষা। টিসি নিয়ে চলে এলেন নেত্রকোনা কলেজে। নেত্রকোনার 'উত্তর আকাশ' পত্রিকায় তিনি বিদ্যালয়ের স্তরে কবিতা লিখতেন। আনন্দমোহন কলেজ ম্যাগাজিনেও তিনি লিখেছিলেন জীবনের প্রথম ইংরেজি কবিতা। নেত্রকোনায় এসে নির্মলেন্দু পেয়ে গেলেন একটি চমৎকার সাহিত্য পরিমণ্ডল।

নেত্রকোনা কলেজ থেকে ১৯৬৪ সালে আইএসসি পরীক্ষায় নির্মলেন্দু গুণ একাই প্রথম বিভাগ এবং ফার্স্ট গ্রেড স্কলারশিপ পান। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতির জন্য এক বছর গ্যাপ দিয়ে যখন ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে চাইলেন তখন মনোনীত হলেন না। মনে হয় তাঁর বড় ভাই যে ভারতে থাকেন এ তথ্যটির ভিত্তিতেই তাঁকে অমনোনয়ন করা হয়। অগত্যা ফিরলেন আবার সেই ময়মনসিংহের আনন্দমোহন কলেজে। প্রথম কদিন কাটল। তারপর কলেজের নামটির আনন্দ শব্দটির ব্যাখ্যায় মেতে উঠলেন। 'মৃত্যুর মতো ভয়ঙ্কর এক নিশ্চিত অন্ধকারে নিঃশেষিত হবার জন্য আমার মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠেছে যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জীবন, বিমূর্ত আনন্দের আশায় কেন কষ্ট দেব তাঁকে, —ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আনন্দের অজস্র উপাদান যেখানে ছড়িয়ে রয়েছে জীবনের চারপাশে।...আমি রবীন্দ্রনাথের নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ শেষে নবীন উল্লাসে জেগে উঠি। মদ্য-পদ্য-সিদ্ধি-গণিকা-জুয়া এই পঞ্চভূতের পাদপদ্মে উৎসর্গ করি আমাকে।'

এটা সমাজবিজ্ঞানীদের সন্ধানের বিষয় হতে পারে যে, মার্কিন বিট প্রজন্ম কবিদের নিয়মভাঙা কবিতা ও জীবন ভাবনা কেন পঞ্চাশ ষাটের দশকের বাঙালি কবিদের প্রবলভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল? অথচ এই ছিল সেই যুগ যখন এশিয়া আফ্রিকা ল্যাটিন আমেরিকার মানুষ বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়েছিল রুশ-চীন-ভিয়েতনাম-কিউবার সমাজতান্ত্রিক আদর্শবাদে। মার্কিনপন্থীরা মুক্তির এরকম ব্যাখ্যা করেছিল, আর রুশপন্থীরা অন্যরকম। রাজনৈতিক ব্যাখ্যা যা-ই হোক না কেন, কবি কিন্তু নিজের মতো করে মুক্তির একটা ব্যাখ্যা করেই নেন। নির্মলেন্দু গুণ কবি হিসেবেই মুক্তির পর খোঁজা শুরু করেন। এবং নিজস্ব কবিতা উদ্ভাবনে সচেষ্ট হন। 'আমি কবি খ্যাতি অর্জনের দুর্মর বাসনায় ক্ষতবিক্ষত হচ্ছিলাম।' নেত্রকোনার 'উত্তর আকাশ' অতিক্রম করে ১৯৬৫ সাল থেকে ঢাকার বিখ্যাত নানা পত্রপত্রিকায়ও তাঁর কবিতা প্রকাশিত হতে শুরু করে, কোনো কোনো কবিতা খ্যাতিও লাভ করে। ময়মনসিংহের কলেজ থেকে বিএসসি পরীক্ষা দেয়ার পরে নেত্রকোনা থেকে 'সূর্য ফসল' নামে একটি কাব্যসংকলন নির্মলেন্দু সম্পাদনা করেন। সম্পাদকীয় ও সংকলনভুক্ত কিছু কিছু কবিতার জন্য পূর্ব পাকিস্তানের গোয়েন্দাবিভাগ নির্মলেন্দুর নামে হুলিয়া রুজু ও গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করে। স্পষ্টতই পূর্বে উল্লিখিত 'পঞ্চভূতের পাদপদ্মে' আত্মোৎসর্গ করে তিনি সন্তুষ্ট হননি। অন্য কোনো এক বোধের তাড়নায় তিনি মুক্তির জন্য শোষক শ্রেণীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ডাকও দিয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে তার আগে বিএসসি পড়ার সময়ই 'সশস্ত্র বিদ্রোহের মাধ্যমে পাকিস্তান নামক এই সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্রটিকে ভেঙেচুরে তছনছ করে দেবার বাসনা আমার মনে দানা বাঁধছিল।'

নির্মলেন্দুর এই বাসনার পেছনে শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন এক অনবদ্য প্রতীক। প্রথম সাক্ষাতের ঘটনাটি খুবই কৌতূহলোদ্দীপক। নির্মলেন্দু ১৯৬৪ সালের একদিন ছিপ হাতে নেত্রকোনা থেকে ট্রেনে নিজের গ্রামে ফিরছেন শেখ মুজিবের কামরার হাতল ধরে ঝুলতে ঝুলতে। একটু পরে দরজা খুলে ঝুলন্ত যাত্রীদের ভেতরে ডাকা হল। শেখ মুজিব ছিপটি চেয়ে নিয়ে কামরার মধ্যেই এমনভাবে ফেললেন যেন মাছ ধরবেন। বললেন, 'এটা আমার খুব প্রিয় নেশা ছিল।' তারপর নির্মলেন্দুর সঙ্গে কিছু কথাবার্তা বললেন। 'শেখ মুজিবের সান্নিধ্য লাভের আনন্দ নিয়ে আমি নেমে গেলাম।' তাঁকে নিয়ে ট্রেন চলে গেল। দেড় বছর পরে, ১৯৬৬ সালে, ঢাকা থেকে 'আমাদের বাঁচার দাবি ৬ দফা কর্মসূচী' পুস্তিকাকারে প্রকাশ করেন। তাঁর উত্থাপিত ওই বাঁচার দাবি 'বাঙালির অবচেতনায় আঘাত হানে। বাংলার মানুষ তাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে নতুন করে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভাবতে শুরু করে। শেখ মুজিব দেশব্যাপী গণজাগরণ সৃষ্টির লক্ষ্যে জনসভার পর জনসভা করে বেড়াতে থাকেন। তাই এক পর্যায়ে নারায়ণগঞ্জের জনসভা শেষ করে বাসায় ফিরলে পর ৮ মে তারিখে গভীর রাতে তাঁকে ধানমন্ডির বাসা থেকে পাকিস্তনের নিরাপত্তা আইনে গ্রেফতার করা হয়। একই রাতে গ্রেফতার হন তাজউদ্দীন আহমেদসহ আরো বেশ কয়েকজন প্রথম সারির নেতা।' পাকিস্তান সরকার মামলা সাজাল যে, শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর সহকর্মীরা আগরতলায় গিয়ে ভারতের সঙ্গে মিলে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছেন। এই মামলা আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা বলে পরিচিত।

নির্মলেন্দু যখন প্রথাসিদ্ধ সমাজের কাঠামো ভেঙ্গে কবি-খ্যাতির জন্য আর অন্যদিকে পাকিস্তানি সরকারের শাসন ভেঙে শেখ মুজিবের ডাকে সাড়া দেওয়ার জন্য ব্যাকুল তখন তিনি মিছিমিছি এক ডাকাতির মামলায় ফেঁসে গেলেন। শুরু হল তাঁর পলাতক জীবন। দাদা তো আছেন ভারতে। কিন্তু ভারতে পালানোর পথে অলঙ্ঘ্য বাধা হয়ে দাঁড়ালো নেত্রকোনা কলেজের বন্ধু সহপাঠী ইলিয়াস। সে বিশ্বাস করত যে, 'আগামী দিনগুলোতে শেখ মুজিবকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হবে বাঙালির স্বপ্ন ও সংগ্রাম।' নির্মলেন্দুকে ইলিয়াস বলেন, 'তোর কাজ হলো ভালো কবিতা লেখা। তুই কবিতা লিখবি মানুষের ঘুম ভাঙানের জন্য। পুলিশের ভয়ে তুই যদি দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাস, এ কাজ করবে কে?' ইলিয়াসের কথায় উদ্বুদ্ধ হয়ে নির্মলেন্দু পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী ঢাকায় এলেন। 'আমি নতুন স্বপ্নে বুক বাঁধি। সেই স্বপ্নটা হচ্ছে কবি হওয়ার স্বপ্ন।...আমি বেশ বুঝতে পারি যে, এই বৈরী রাষ্ট্রব্যবস্থায় আমার পক্ষে কবি হওয়া ছাড়া আর কোনও কিছুই হওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং শুরু হল ঢাকার সাহিত্য ও সংস্কৃতি জগতে নিজেকে কবি হিসেবে প্রতিষ্ঠার জন্য নির্মলেন্দুর মরিয়া লড়াই।

নির্মলেন্দু বুঝেছিলেন, 'এখন ঢাকাকে কেন্দ্র করে কলকাতার বিকল্প একটি নতুন সাহিত্য পরিমণ্ডল গড়ে উঠতে শুরু করেছে।...ক্রমে সেক্যুলার সাহিত্যের ধারাটিই যে এখানে প্রবল হয়ে উঠবে, তার লক্ষণ স্পষ্ট হচ্ছে।' তিনি স্থির করেছিলেন যে, প্রথমে বন্ধুদের কাছে তেজগাঁও পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের হোস্টেলে উঠবেন। 'তারপর মামুনকে সঙ্গে নিয়ে কণ্ঠস্বর পত্রিকার সম্পাদকের সঙ্গে দেখা করবো। নিশ্চয়ই সেখানে আমার কিছু একটা কাজ জুটে যাবে। না জুটলে রিকশা চালাবো।' যেমন ভাবা তেমন কাজ। ওই হোস্টেলের পুরনো দুজন বন্ধু ছাড়াও অনেক নতুন বন্ধু পেয়ে গেলেন। আবার এমন ছেলেও পেলেন, যে বলেছিল, 'এটা হচ্ছে মুসলমানের দেশ। আমি যেন অবিলম্বে ভারতে চলে যাই।...পরিস্থিতি আমি জীবনে আরও বহুবার মোকাবিলা করেছি। আমার খুব খারাপ লেগেছে। কিন্তু পরে যথারীতি ভুলে গেছি। আমার জন্মভূমির প্রতি খুব বাজে একটা ধরনের দুর্বলতা কাজ করত। ঐ জায়গাটায় আমি ছিলাম খুবই অসহায়।' ইতিপূর্বে আমরা জেনেছি যে, নির্মলেন্দু মেধাবী ছাত্র, জুয়ার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নেশাগ্রস্ত, অন্যান্য নেশাতেও অভ্যস্ত, নারীও তাঁর একটি বিশেষ দুর্বলতা, সবচেয়ে বড় দুর্বলতা হল কবিখ্যাতি এবং ঢাকার প্রসঙ্গে এসে জানলাম যে, তাঁর আরও একটি প্রধান দুর্বল জায়গা হল জন্মভূমি। অচিরেই একদিন মামুন তাঁকে নিয়ে তেজগাঁও ইন্টার মিডিয়েট কলেজের অধ্যাপক 'কণ্ঠস্বর' পত্রিকার সম্পাদক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদের কাছে যান। সম্পাদক মশায় নির্মলেন্দুকে 'কণ্ঠস্বর' পত্রিকার জন্য ছোটখাটো কিছু কাজ তো দিলেনই, সেই সঙ্গে নিজের সাইকেলটিও ব্যবহার করতে দিলেন। ওই সাইকেলে চড়ে নির্মলেন্দু ঢাকার নতুন নতুন কবি-সাহিত্যিকদের সঙ্গে যোগাযোগ করা শুরু করলেন। কিন্তু তাঁর 'উদ্বাস্তু-উন্মূল যৌবনসঙ্গী' কবি আবুল হাসানের সঙ্গে পরিচয় হয় 'কণ্ঠস্বর'-এর পৃষ্ঠায়। 'অর্থ নয়, বিত্ত নয়, প্রতিপত্তি নয়, এমনকি চূড়ান্ত অর্থে নারীও নয়—কবিতা, শুধু কবিতাই তার আরাধ্য।' তারা স্থির করলেন যে বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস করবেন, ঘুরবেন, বেড়াবেন, সুন্দরী মেয়েদের সঙ্গে প্রেম করার চেষ্টা করবেন: কিন্তু ডিগ্রি নেওয়ার চেষ্টা করবেন না। সব ব্যাপারে তাঁদের মতের মিল ছিল না, তাঁদের কাব্যভাবনার বিরোধ ছিল। নির্মলেন্দু মনে করতেন যে, কবি একই সঙ্গে সমাজের কাছে দায়বদ্ধ এবং ব্যক্তি অস্তিত্বের উপলব্ধি প্রকাশের দায়বাহী। হাসান মনে করতেন যে, কোন পূর্ব সিদ্ধান্তই শিল্পকে গ্রাস করবে না। তবে দুজনেই বিশ্বাস করতেন, 'আমাদের জীবন হবে অনেকটাই পরনির্ভর। বন্ধু-নির্ভর। ভক্তনির্ভর।

মোটের উপর ঢাকাতে নির্মলেন্দুর জীবন ছিল পুরোপুরি বোহেমিয়ান। কোনও বিছানাপত্র বা বাড়তি জামাকাপড় নিয়ে তিনি ঢাকায় আসেননি, বাঁহাতে বাবার দেয়া ঘড়ি আর ডান হাতে চার আনা সোনার একটি আংটি সম্বল করে বন্ধুদের ভরসায় এসেছিলেন। ঘড়িটি যায় জুয়ার আড্ডায় আর আংটিটি নিয়ে নেয় অবলা মাসির মেয়েরা। 'এরপর যথার্থ অর্থে আমি ছিলাম একেবারে ঝাড়া হাত-পা। কবিতার পাণ্ডুলিপি ছাড়া আগলে রাখার মতো আমার আর কিছু ছিল না; এজন্য কখনওই তাঁকে বিপন্ন মনে হয় না। পরনির্ভরতাকে তিনি জীবনাদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। এক জায়গায় লিখেছেন, 'দুর্বল স্মৃতির উপর নির্ভর করে আমার কোনও আশ্রয়দানকারীকে আহত করতে চাই না। আমি অনেকের কথা ভুলে গেছি। তবে কেউ স্মরণ করিয়ে দিলে একটু একটু মনে আসে। থাকা মানে তো থাকা নয় শুধু খাওয়াও।' আবার কখনও কখনও নবনির্মিত কমলাপুর রেল স্টেশনে, কখনও নির্মীয়মান বায়তুল মোকাররম মসজিদে, আবার কখনও নারিন্দা মসজিদে রাত্রিবাস করেন। নারিন্দা মসজিদে 'গভীর রাতের কোলাহলবিহীন নির্জনতা আমার মনকে স্পর্শ করে।' ভোরের আজানে ঘুম ভাঙে। 'আমিও মুসল্লিদের সঙ্গে চৌবাচ্চার জলে বিনিদ্র মাছদের নির্মিত দৃশ্যকাব্য দেখতে দেখতে হাত পা মুখমণ্ডল ধুয়ে পরিচ্ছন্ন হয়ে নিই। তারপর মাথায় রুমাল চাপিয়ে হাসানের পাশে গিয়ে নামাজের সারিতে দাঁড়াই। আমি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধার্মিক নই। আমি ইহজাগতিকতায় বিশ্বাসী। যে এক অজ্ঞাত-শক্তির প্রতি আমার এক ধরনের অব্যাখ্যাত দুর্বলতা আছে তাঁকে আমি আমার মতো করে ভাবি। আমার ভাষায় আমি তাঁর স্তব করি।...আমি অনুভব করি তার অসীমত্ব। ...অন্যদের মতো এক সময় আমারও নামাজ শেষ হয়, কিন্তু আমার মনের ভিতরেও এক অন্তহীন নামাজ চলতে থাকে। মানুষের কল্যাণের জন্য আমার নামাজের কখনও ছেদ পড়ে না। আমি ভুলে যাই আমি কে! শুধু মনে পড়ে, ভিন্ন ভিন্ন ধর্মে ভাগ হয়ে গেলেও একই ভাবে সৃষ্ট, আমি মাতৃগর্ভজাত এক অনাদি-আদিম মানব সন্তান। এটাই আমার প্রধান পরিচয়।

শেষের উদ্ধৃতিটি তুলছি, 'আমার কণ্ঠস্বর'-এর ১১২ সংখ্যক পৃষ্ঠা থেকে। এইভাবে, এত জায়গা নিয়ে, এই বইয়ের আলোচনা করলে আরও ১৫০ পৃষ্ঠার আলোচনায় আরও প্রায় দেড়গুণ জায়গা নিয়ে নেবে।

অমন দীর্ঘ আলোচনার এখানে অবকাশ নেই। কিন্তু ইতিপূর্বে প্রদত্ত ১১২ পৃষ্ঠার পরিচয় থেকেই বোঝা যাবে যে, 'আমার কণ্ঠস্বর' কী অসাধারণ কৌতূহলোদ্দীপক, পাঠকের অভিনিবেশের উপর তার দাবি কত গভীর ও ব্যাপক। একদিকে জুয়া-মদ-সিদ্ধি-গণিকার দিকে অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণ, অন্যদিকে কবি-খ্যাতির জন্য দুর্মর আকাঙ্ক্ষা। একদিকে সমাজের প্রতি কবির দায়িত্ববোধ, অন্যদিকে ব্যক্তিগত উপলব্ধিকে ব্যক্তিগত ভাষায় ও ব্যক্তিগত ভঙ্গিতে প্রকাশের জন্য প্রবল প্রবেগ, একদিকে দুর্বার নিম্নমুখিতা এবং এইসব পরস্পরবিরোধী প্রবণতার টানাপোড়েনের মধ্যে কোনও অজ্ঞাত অসীমের জন্য অপার আকুতি তাঁকে কোনও কোনও বিরল মুহূর্তে অভিভূত করে। আবার এই সব ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও অনুভবের পাশাপাশি আছে ১৯৬৭-৬৮ সালের পূর্ব পাকিস্তানি রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে অজস্র তথ্য প্রভৃত বিবরণ। এই বই লেখার সময়ে তিনি নিজেই একবার পেছনে ফিরে লিখেছেন যে, সেই ৬৮-৬৯ সালে 'শুধু কবি হওয়ার জন্য কী পাগলামিটাই না করেছি।' এবং ওই সময়েই পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে অলক্ষ্যে শুরু হয় বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার আন্দোলন। এই আন্দোলনের প্রাথমিক লক্ষণগুলোর একটি ছিল ১৯৬৮-র জুলাই মাসে ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটের মিলনায়তন মঞ্চে অনুষ্ঠিত পাঁচদিন ব্যাপী 'মহাকবি স্মরণোৎসব'। শুরু হয় মাইকেল মধুসূদনকে নিয়ে। রবীন্দ্রদিবসের অনুষ্ঠানের সভাপতি বলেন, 'যাঁহারা ইসলাম ও পাকিস্তানী আদর্শের নামে রবীন্দ্রসঙ্গীত বর্জনের ওকালতি করিতেছেন তাঁহারা শুধু মূর্খই নহেন, দুষ্টবুদ্ধি প্রণোদিত এবং তাঁহারা না বোঝেন রবীন্দ্রনাথ, না বোঝেন ইসলাম।' পাকিস্তানবাদীদের রবীন্দ্র বিরোধিতা বাংলা ভাষার ও বাঙালির মর্যাদা প্রতিষ্ঠার সংগ্রামকে বিপরীত দিক থেকে প্রবল প্রেরণা যোগায়। ইতিমধ্যে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় বন্দি শেখ মুজিব পূর্ব পাকিস্তানের জনমানসে পরিণত হন ১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থানের প্রধান অধিনায়কে। 'আওয়ামী লীগের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছয় দফা কর্মসূচীর লক্ষ্যে তখন দেশ জুড়ে আন্দোলন দানা বাঁধছে।' বাঙালি জাতীয়তাবাদী পত্রিকা 'ইত্তেফাক' সরকারি রোষানলে পড়ে বন্ধ। কিছুদিন বন্ধ থাকার পরে 'সংবাদ' আবার বেরোতে শুরু করলেও 'সংবাদ'-এর সাহিত্য বিভাগের সম্পাদক রণেশ দাশগুপ্ত তখনও কারারুদ্ধ। আইয়ুব খানের বাহিনী বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে সর্বত্র উদ্যত। সেই দুঃসময়ে শেখ মুজিবকে উৎসর্গ করে নির্মলেন্দু একটি দীর্ঘ কবিতা প্রকাশ করেন 'সংবাদ'-এ। 'ওটাই ছিল পূর্ব বাংলার নবীন নেতা শেখ মুজিবুর রহমানকে উৎসর্গ করা প্রথম কবিতা।' সেটা ১৯৬৭-র নভেম্বর মাসের কথা। তারপরে পদ্মা-মেঘনা দিয়ে বয়ে গেল কত জল। এল ১৯৬৯ সাল। ইতিমধ্যে আগরতলা ষড়যন্ত্রের মামলা রোমাঞ্চকর নাটকটি প্রতিদিন পত্রিকায় ফলাও করে প্রচারের ফলে বন্দি মুজিব বাংলার মানুষের মধ্যে দ্রুত জনপ্রিয়তা অর্জন করতে থাকেন।' ভারত উপমহাদেশের ইতিহাসে নতুন বছর ১৯৬৯ নতুন পর্বের সূচনা করে। বছরের শুরুতেই পূর্ব পাকিস্তানের আটটি রাজনৈতিক দল মিলে গঠন করে ডিএসি বা ডেমোক্র্যাটিক অ্যাকশন কমিটি। আটদিন পরে 'ডাক'-এর ডাকে পালিত হয় ঐতিহাসিক প্রতিবাদ দিবস। অগ্নিকন্যা মতিয়া চৌধুরীর নেতৃত্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীরা ঝাঁপিয়ে পড়ে আন্দোলনে। বছর শুরুতেই নির্মলেন্দু একটি নতুন কাজ পেয়ে যান। 'কাজটি হচ্ছে প্রতিদিনের ছাত্র মিছিলে অংশ নেওয়া, রাষ্ট্রীয় সম্পদ ভাঙচুর করা, গাড়িতে ও বাড়িতে অগ্নিসংযোগ করা ও পুলিশের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়া। সুন্দরী ছাত্রীদের সঙ্গে মিছিলে অংশগ্রহণের বিষয়টিও আমাকে দারুণভাবে অনুপ্রাণিত করে।' বিশে জানুয়ারি পুলিশের গুলিতে আসাদের মৃত্যুতে শামসুর রাহমান লিখলেন, 'আসাদের শার্ট আজ আমাদের প্রাণের পতাকা।' মৃত্যুর পর আরও মৃত্যু। মতিয়ুর, রুস্তম আলী, মকবুল। আল মাহমুদ লিখলেন, 'ট্রাক! ট্রাক! ট্রাক! ট্রাকের মুখে আগুন দিতে মতিয়ুরকে ডাক।' সে সব দিনের কাহিনী পড়তে পড়তে আজও গায়ে কাঁটা দেয়। নির্মলেন্দুর লেখনীতে জীবন্ত হয়ে উঠেছে সে সব দিন। পরিস্থিতি সামলাতে খোদ আইয়ুব খান এলেন ঢাকাতে। কিন্তু পূর্ব বাংলার মানুষ তাঁকে ভাল করে বুঝিয়ে দেয় যে, শেখ মুজিবকে দেশদ্রোহী সাজাবার মামলাটি প্রেসিডেন্ট ও গভর্নরকে গিলে ফেলতে হবে। বেপরোয়া পাকিস্তানি সরকার আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম অভিযুক্ত জহুরুল হককে হত্যা করে। জনতা খেপে গিয়ে তিনজন মন্ত্রীর বাড়িতে এবং একজন বিচারপতির বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয়। 'সান্ধ্য আইন উপেক্ষা করে ঢাকার মানুষ রাজপথে নেমে আসেন।' সেবার একুশে ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান সরকার ছুটি ঘোষণা করে। সেদিন ভোরে বাংলা একাডেমীর বটতলায় বসে শহীদদের উদ্দেশ্যে নিবেদিত কবিতাপাঠের আসর। ওই আসরে নির্মলেন্দু প্রথম ছোট একটি কবিতা পড়েন, তারপরে পড়েন 'প্রেমাংশুর রক্ত চাই' নামক বিখ্যাত কবিতাটি। ওই দিন রবীন্দ্রসঙ্গীতের বিরুদ্ধে বিবৃতিদানের অভিযোগে তিন দালাল সাহিত্যিককে ছাত্র-জনতা একাডেমীর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনুষ্ঠান থেকে বহিষ্কার করে। এর পরদিন বাইশে ফেব্রুয়ারি শেখ মুজিব মুক্তি লাভ করেন এবং ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহৃত হয়।

'আজ ২৩ জানুয়ারি ১৯৬৯। কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে ঢাকার সর্ববৃহৎ ময়দান রেসকোর্স মাঠে শেখ মুজিবের গণসংবর্ধনা।' সংবর্ধনার উত্তরে তিনি প্রথমেই বলেন, 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলাটির প্রকৃত নাম হওয়া উচিত ইসলামাবাদ ষড়যন্ত্র মামলা।' তাঁর ভাষণে তিনি বলেন, 'আমরা রেডিও-টিভিতে নিয়মিত রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনতে চাই। রবীন্দ্রনাথ আমাদের গর্ব। তিনি বিশ্বকবি। তাঁর গান আমাদের গান। এই গান কেউ বন্ধ করতে পারবে না।' তারপর তিনি একটি গল্প বলেন। পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর মোনায়েম খান নাকি বাংলার অধ্যাপক আবদুল হাই সাহেবকে বলেছিলেন, 'কী করেন সায়েব, রবীন্দ্রসঙ্গীত নিয়ে চিল্লাচিল্লি করেন, নিজেরা রবীন্দ্রসঙ্গীত লেখতে পারেন না?' ওই দিনই ওই সভাতে শেখ মুজিবকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করা হয়। 'চরম নাটকীয় সংঘাতের উত্তুঙ্গ চূড়া স্পর্শ করে শেখ মুজিব যখন মুক্তি লাভ করেন, তখন শুধু পূর্ব পাকিস্তানে নয়, পশ্চিম পাকিস্তানেও আনন্দের বন্যা বয়ে যায়।' অতঃপর আইয়ুব খান কর্তৃক আয়োজিত লাহোরে গোলটেবিল বৈঠক। লাহোর যাওয়ার পথে ঢাকা বিমানবন্দরে বঙ্গবন্ধু বলেন যে, কমিউনিস্ট পার্টিকে প্রকাশ্য রাজনীতি করার অধিকার দেওয়া উচিত।

'আজ ২৬ ফেব্রুয়ারি। বুধবার। গোলটেবিল বৈঠকের দিন।' সেদিনও যাঁর বিরুদ্ধে ছিল দেশদ্রোহিতার অভিযোগ, আজ তাঁর সঙ্গেই গোলটেবিল বৈঠক। রাজনীতি ব্যাপারটা এ রকমই। কাল যে রাষ্ট্রদ্রোহী, আজ সে দেশ প্রেমিক... এখানে কোনও স্থির নিয়ম নেই। অনিয়মই এখানকার নিয়ম—আইনই এখানকার আইন।' প্রেসিডেন্ট আইয়ুব প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার আর পার্লামেন্টারি পদ্ধতির সরকার গঠনে দুই দফা দাবি মেনে নিয়ে ১৩ মার্চ গোলটেবিল বৈঠকের সমাপ্তি ঘোষণা করেন। বঙ্গবন্ধু কার্যত শূন্য হাতেই ঢাকায় ফিরে আসেন। তবু তাঁকে ঢাকায় বীরোচিত সংবর্ধনা দেওয়া হয়। স্পষ্টত তিনি ততদিনে সমস্ত বাঙালির সমস্ত গৌরবের প্রতীকে পরিণত হন। অদ্ভুত কাণ্ড। পাকিস্তানের লৌহমানব আইয়ুব খান ২৪ মার্চ পাকিস্তান সেনাবাহিনীর অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খানের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করে রাজনীতির মঞ্চ থেকে অবতরণ করেন। সারা দেশে সামরিক আইন জারি করা হয়। এইভাবে নির্মলেন্দু আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে ও ছাত্রসমাজের বহু রক্তদানে পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালি জাতীয়তাবাদের অমোঘ অভ্যুত্থানের উত্তাল তরঙ্গমালার অত্যন্ত জীবন্ত পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশদ ও বিশ্বস্ত বিবরণ দিয়েছেন। বোহেমিয়ান জীবনের প্রচুর বিশৃঙ্খলার মধ্যেও তিনি সুষ্ঠুভাবে দিনের পর দিন লিপিবদ্ধ করে গেছেন তৎকালীন দামাল ঘটনাপুঞ্জের স্পষ্ট পঞ্জিকা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আইয়ুব খানের অবতরণের পর নির্মলেন্দু সংঘবদ্ধ আন্দোলনের থেকে অপসারণ করে ফিরে গেছেন নিজের কাছে। 'আন্দোলনের উন্মত্ততার মধ্যে আমি প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম, গ্রামে আমার একটি বাড়ি আছে। বাড়িতে আমার বাবা-মা-ভাই-বোনেরা আছে। আমি তাদের সঙ্গে যোগাযোগ না রাখলেও তারা আছে। তারা আমাকে নিয়ে ভাবে। তারা আমার জন্য দুশ্চিন্তা ভোগ করে। তারা ঢাকায় আমার অনিশ্চিত জীবন যাপনের কথা ভেবে কষ্ট পায়।' অতঃপর গ্রামে প্রত্যাবর্তন। তখন বাবা তাকে একান্ত অনুরোধ করে সে যেন নিজের পক্ষে গ্র্যাজুয়েট হওয়ার জন্য পরীক্ষা দেয়। একদা আবুল হাসানের সঙ্গে পরীক্ষা না দেওয়ার চুক্তি করেছিলেন, তবু নির্মলেন্দু বাবার অনুরোধে প্রাইভেটে বিএ পরীক্ষা দিয়ে তার সার্টিফিকেটটা গ্রামে বাবার কাছে পাঠিয়ে দেন। 'বাবার আনন্দবর্ধন করা ছাড়া আমার আর কোনও কাজে আসবে না।' ইতিমধ্যে গণঅভ্যুত্থানের সাফল্যেই হয়তো, উনসত্তরের প্রথম দিকে ঢাকা রেডিও ষাট দশকের পাঁচজন কবিকে নিয়ে কবিতা পাঠের আয়োজন করে। ওই আসরে নির্মলেন্দু কীভাবে নিজের পরিচয় দিয়েছিলেন তা আগেই তৃতীয় অনুচ্ছেদে উদ্ধৃত করেছি। ছেলের রেডিওতে কবিতা পাঠ সম্পর্কে বাবার প্রতিক্রিয়া ছিল বিচিত্র। তিনি লিখলেন যে, যে দিন জসীমউদ্‌দীন, সুফিয়া কামাল প্রমুখ কবিদের সঙ্গে নির্মলেন্দু কবিতা পড়ার সুযোগ পাবে সে দিন ছেলেকে বড় কবি বলে স্বীকার করবেন।

'পূর্ব বাংলার কাদামাটির দেশে জন্মগ্রহণ করলেও, কী কারণে জানি না, আমার রক্তের মধ্যে লুকানো ছিল পশ্চিমের বিট বংশের বীজ। জীবনের বিধ্বংসী প্রবণতাকে প্রকাশ করার জন্য যেরূপ প্রস্তুতি থাকা প্রয়োজন, আমার চারপাশের বিবেচিত বড় কবিদের মধ্যে ছিল তার প্রচণ্ড অভাব। আমাদের অধিকাংশ কবির বেলাতেই কণ্ঠস্বর বর্ণিত 'গৃহপালিত' অভিধাটি প্রযোজ্য ছিল। এমতাবস্থায়, মার্কিন বিট কবিদের কাছে মুক্ত, স্বাধীন ও বিধ্বংসী জীবনযাপনের পক্ষে সমর্থন লাভ করে আমি খুবই উপকৃত বোধ করেছিলাম।' আগেও ইঙ্গিত দিয়েছি যে, বিধ্বংসী প্রবণতা একটা যুগলক্ষণ বটে, কিন্তু এই যুগলক্ষণের মধ্যেই নিহিত থাকে নির্মাণের তথা সৃষ্টির প্রবণতা। ধ্বংস আর সৃষ্টি হয়ত একই প্রক্রিয়ার দুরকম প্রকাশ। তাই ধর্মের ভিত্তিতে গড়া পাকিস্তান ভাঙার আর তার পাশাপাশি সাহিত্যের ঐতিহ্য ও প্রথাসিদ্ধ ধারা ভাঙার সুবাদেই সৃষ্ট হয় নতুন কাব্য। নির্মলেন্দু যতই নিজেকে উড়নচণ্ডি ও বিধ্বংসী রূপে উপস্থাপনের চেষ্টা করুন না কেন, তিনি যে বাংলা ভাষাগোষ্ঠীর বিগত অর্ধ শতাব্দীর এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পর্বের প্রত্যক্ষ দর্শনের ভিত্তিতে ইতিহাস ও এক অসাধারণ মানবিক দলিল হিসেবে এমন একটি গ্রন্থ রচনা করেছেন এটাই প্রমাণ করে দেয় তাঁর নির্মাণ ও সংরক্ষণপ্রবণতা। অবশ্যই বিদ্যা ও শিক্ষার ক্ষেত্রে তিনি প্রশংসনীয় মেধার অধিকারী, কিন্তু পাশাপাশি জুয়া নেশা ইত্যাদির অধীনতা তিনি যেভাবে সানন্দে স্বীকার কচ্ছেন তা তাঁর স্বাধীনতার জন্য দুর্বার আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে কী করে মেলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বোঝা কঠিন, কবিতা তাঁর চোখের মতো, আত্মার মতো, রক্তের মতো প্রিয় আবার তেমনই তাঁর রাজনীতি ও সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা, আবার ওই দায়বদ্ধতার পাশাপাশি গুণগ্রাহী গ্রন্থবিক্রেতার দোকান থেকে নির্দ্বিধায় পাশ্চাত্য কাব্যসংকলন চুরি করা, উদ্দাম বোহেমিয়ানার গভীরে অন্তর্লীন আত্মীয়-স্বজন ও স্বগ্রামের প্রতি মমতা প্রভৃতি পরস্পরবিরোধী বৈশিষ্ট্যের সহাবস্থান নির্মলেন্দু চরিত্রকে বিশেষ আকর্ষণীয়, কৌতূহলোদ্দীপক, জটিল ও বর্ণাঢ্য করেছে। পড়তে পড়তে বারবার প্রশ্ন জাগে যে, একজন মানুষের মধ্যে এরকম অসংগতির ধারণাগুলো এমন ঘোর অসামঞ্জস্য হয় কী করে! কোনও কোনও প্রতিভার আচরণগুলো কেন ব্যাখ্যার অতীত হয় এটা বলা খুবই কঠিন। প্রকৃতপক্ষে সব মিলিয়ে 'আমার কণ্ঠস্বর' যুগ ও দেশের সম্বন্ধে এক মূল্যবান মানবিক দলিল পাঠের অভিজ্ঞতার অতিরিক্ত কিছু দেয়— ওই কিছুটা হল মানব মনের গহন জটিল রহস্যময় অরণ্যে প্রবেশের ও পর্যটনের রোমাঞ্চ। 'আমার কণ্ঠস্বর' আত্মস্মৃতিমূলক বাংলা সাহিত্যে এক সম্পূর্ণ অভিনব কণ্ঠস্বর— আন্তরিক, আদর্শের ও প্রবৃত্তির দ্বন্দ্বে উদ্ভ্রান্ত, শক্তিশালী ও সাহসী, সৎ ও সংরক্ত। বহু দিক থেকেই নির্মলেন্দু গুণের 'আমার কণ্ঠস্বর' অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসি দার্শনিক জাঁ জাক রুশোর লেখা 'স্বীকারোক্তি' নামক বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থের সঙ্গে তুলনীয়। স্বাধীনতার স্বপ্নে উদ্বেলিত, কিন্তু প্রবৃত্তির নাগপাশে জর্জরিত। এ গ্রন্থ মানবিক অস্তিত্বে এমন এক বহুমাত্রিক প্রকাশ, যা একাধারে নাটকীয় ও মর্মস্পর্শী।

[*দেশ*, বর্ষ ৬৩, সংখ্যা ১, ৪ নভেম্বর ১৯৯৫]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~